কালকূট

কালকূট

রচনা

রচনা

সমগ্র

সমগ্র

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা

‘কালকূট রচনা সমগ্র’র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হল। আমরা ঠিক কালানুক্রমিকভাবে কালকূট রচনা সাজাচ্ছি না এবং প্রকাশ করছি না কেন বর্তমান সংকলনের প্রারম্ভে বোধ হয় সে-জাতীয় একটা কৈফিয়ৎ পাঠকের পাওনা হয়ে গেছে। একথা ঠিক, ‘কালকূট’ নামের আড়ালে রয়েছেন যে-স্বনামখ্যাত লেখক, তাঁর নিজ নাম স্বাক্ষরিত রচনাগুলির বেলায় এ ব্যাপারটা দোষাবহ হত। কালকূটের বেলায় এটা ততটা দোষাবহ হবে না। কেন না, লেখাগুলির বিষয়ে যত বৈচিত্র্যই থাক, যত নানারঙের নানাছাঁদের মনমানুষের মেলায় মেলায় লেখক ঘুরে বেড়ান না কেন—রচনাগুলির প্রেরণা-উৎস তো মোটামুটি এক। সে ঐক্যের মূল কথা লেখকের আসক্ত অথচ অনাসক্ত, অনুরাগী অথচ বৈরাগী মনটিকে মেলে ধরা। চতুঃসীমাবন্ধ সংসার-যাত্রায় সে পীড়ন, তা থেকে মাঝে মাঝে লেখক বেরিয়ে পড়েছেন মুক্তির আকাশের সন্ধানে। সেই মহান আকাশবাউল তার বিপুল একতারায় যে গান গেয়ে চলেছে তার বিবরণ শোনাবার জন্য সালতারিখের হিশাব না রাখলেও বুঝি চলবে। সেই অনুমানের ওপর ভর করেই আমরা ‘নির্জন সৈকতে’, ‘বানীধ্বনি বেণুবনে’ এবং ‘কোথায় পাবো তারে’র প্রথমার্ধ একসঙ্গে সংকলিত করেছি।

‘নির্জন সৈকতে’-এর মধ্যে নভেলের উপাদান আছে, তবু সচেতন পাঠক বুঝতে পারেন, ‘নির্জন সৈকতে’ বিশুদ্ধ উপন্যাস নয়। আবার যেমন কালকূটের স্বভাব, এ ভ্রমণ নির্দেশিকাও নয়। তিনি সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেছেন আমাদের। স্বভাবতই সমুদ্রের এবং জগন্নাথ-মহিমার বর্ণনায় পঞ্চমুখ হলে, আমরা কেউ তাঁর নিন্দা করতাম না। কিন্তু পুরুষোত্তম অপেক্ষা পুরুষ (এবং নারী), সমুদ্র অপেক্ষা হৃদয়-সমুদ্র কালকূটের এ রচনায় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। সেই অর্থে এ নভেলের কাছাকাছি। কিন্তু তবু ‘নির্জন সৈকতে’ নভেল নয়। মাঝখান থেকে এর আরম্ভ, মাঝখানেই এর শেষ। কোনো গল্পই, কারো কাহিনীই এর মধ্যে যত্ন করে আসর সাজিয়ে শুরু হয়নি, ঠিকমতো ঘণ্টা বাজিয়ে শেষ হয়নি। যদি কেউ বলেন, তাতে কী হয়েছে, নভেলের তো কোনো বাঁধাধরা ‘ফর্ম’ নেই, আমরা যদি বলি এও একটা উপন্যাস-সম্ভব ‘ফর্ম’? তাহলে তার জবাবে কিছু বলার নেই। শুধু একটা বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা ক’রব। কাহিনীতে ধৃত চরিত্রগুলির সম্পর্কসূত্র যখনই জটিল হতে বসেছে, তখনই পটভূমি এগিয়ে এসেছে সামনে—ব্যক্তির উত্তাপ তখনকার মতো জুড়িয়ে গেছে। এটা উপন্যাসের লক্ষণ নয়; কালকূটের এ জাতীয় রচনারই লক্ষণ। এখানে মানুষগুলির নেপথ্য ছবি কখনোই ফুটে ওঠেনি

তা নয়, কিন্তু কালকূটের পক্ষপাত চরিত্রগুলির উদ্বেল মুহূর্তের প্রতি। উচ্ছলা, চঞ্চলা, কিন্তু স্বগত ভাবনায় ব্যাকুলা এখানকার নারী চরিত্রগুলি যেন কতকটা সমুদ্রেরই সারাদিনমান, সারা রাত্রির প্রতিচ্ছবি। কখনো মেঘম্লান, কখনো রৌদ্রোজ্জ্বল। কী খুঁজতে এসেছিল সেই সন্ন্যাসী—আর মৃত্যুর অনির্দেশ্য গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে কিসের ঠিকানা সে দিয়ে গেল!

'বানীধ্বনি বেণুবনে' রসের দিক থেকে স্বতন্ত্র। এরকম ভাবরসের বই কালকূট বোধহয় আর লেখেন নি। কালকূটের অন্য রচনায় দেখা যায় যে, তিনি পটভূমির প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন বটে, কিন্তু তিনি পটকে চরিত্র ছাড়িয়ে উঠতে দেন না। কিন্তু এই একটি মাত্র কালকূটের রচনা যেখানে তিনি নিজে অভিভূত হয়েছেন মহাকালের পদরেখাঙ্কিত ঐতিহাসিক পটপরিবেশে। সোনপাতিয়া-ঘটনা-বৃত্ত থেকেই যে আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি, তা নয়। পাঠক দেখবেন এই রচনার আঁট সাঁট গঠনের ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসের ছায়াপথ নজরে পড়ে। প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের মেশামেশির থেকেও বুঝি বিস্ময়কর হয়েছে রূঢ় বর্তমানের সঙ্গে হারানো অতীতের মেশামেশি। সবসুদ্ধ এফেক্ট্‌টা হয়েছে রোমান্টিক। বস্তুতঃ 'বানীধ্বনি বেণুবনে' কালকূটের কবিসত্তার পরিচয়কে বহন করছে। অতীতের স্বপ্ন কুহেলীর মাঝখানে নিশিপাওয়া মানুষের মতো মাঝে মাঝে লেখক ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমাদের ম্লান অস্তিত্বের শিয়রে সেই স্বপ্ন প্রদীপের মতো জ্বলে উঠেছে। তার আলোয় আছে স্নিগ্ধতা। এত তীব্রতায় পরিসমাপ্তিও কালকূটের আর কোনো রচনায় পাওয়া যায় না। সোনপাতিয়া এপিসোড এমন একটি অতিপ্রাকৃত অনুভূতির সৃষ্টি করে যা বর্তমান বাংলা কথা সাহিত্যে দুর্লভ। এবং এপিসোডটির জন্য লেখক যেভাবে প্রথম থেকে ধীরে ধীরে আবহাওয়া রচনা করেছেন সে লিপিকুশলতাও রীতিমত উপভোগ্য। জনকপুরের ধীরুমায়া-বৃত্ত থেকে রাজগৃহের সোনপাতিয়া-বৃত্ত পর্যন্ত একটা খরস্রোত ভেতরে ভেতরে বয়ে চলেছে। লেখক ব্যস্ত হননি সে স্রোতকে একটা মোহানায় পৌঁছে দিতে। সে টান শেষ মুহূর্তে হয়ে উঠেছে অধিকতর তীব্র।

'কোথায় পাবো তারে' কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের লেখা। শুধু যে 'নির্জন সৈকতে'র সঙ্গেই তার পার্থক্য তাই নয়, কালকূটের সমস্ত রচনা থেকে তা আলাদা। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'-তে যেমন পটপরিবেশ প্রয়াগসঙ্গমের কুম্ভমেলার, 'নির্জন সৈকতে' যেমন পুরী অঞ্চলের, 'বাণীধ্বনি বেণুবনে'-তে যেমন রাজগীর—'কোথায় পাবো তারে'-তে তেমন কোনো নির্দিষ্ট পটভূমি নেই। কোনো একটা গোণাগাঁথা সপ্তাহ বা কালখণ্ডও এখানে ব্যবহৃত হয়নি। নদী, প্রান্তর, স্রোতের চলিষ্ণুতা এবং লাল কাঁকরের স্তব্ধতা—সর্বত্র সঞ্চরমান একটি পথপাগল পথিকের বিচিত্র মাধুকরী এ লেখায় ফুটে উঠেছে। কোনো ভারতখ্যাত তীর্থভূমি, বা কোনো ইতিহাস-কীর্তিত পুরা-ভূমি এখানে লেখকের লক্ষ্য ছিল না। বরং বাংলার নিজস্ব বাউলের মতো এ-মেলা থেকে সে-মেলা, আনগাঁয়ে, ভিনগাঁয়ে—পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে, সেই ধুলোয় ধূসর হতে হতে এগিয়ে চলাই ছিল লেখকের ইচ্ছা। প্রথমার্ধের নদীতে ফুটে উঠল নদীর মতোই বন্ধনরহিত মানুষজনের ছবি। চোখের জলের খোঁজ তারা রাখে না—নদীর জলে সব ধুয়ে যায়। এক নদী বয় মাটিতে, আরেক নদী বয় মনে। 'কালকূট' দুই নদীতেই অবগাঢ় হয়েছেন। এর চেয়ে বড়ো তীর্থ আর তাঁর কাছে নেই। সেই তীর্থবারি তিনি অঞ্জলিবদ্ধ করেছেন 'কোথায় পাবো তারে' গ্রন্থে।

এই গ্রন্থটি কালকূটের—ব্যক্তি কালকূটের—সব থেকে প্রতিনিধিত্ব মূলক গ্রন্থ। নদীর বর্ণনায় অক্লান্ত লেখক বুঝি পূর্ববঙ্গের বাল্যস্মৃতির দ্বারা প্রাণিত, পশ্চিম

প্রান্তের রক্তিম কাঁকর-ধূলির বর্ণনায় বুঝিবা ফুটে ওঠে তাঁর প্রৌঢ়ত্ব। কিন্তু এত বর্ণনা, এত পট, পটান্তর কিসের জন্য? 'তারে' এই সর্বনাম কাকে আড়াল করে রেখেছে? কেনই বা তার জন্য এত আকুলতা? কালকূট নিজেও তা জানেন না। সেকথা জানা হয়ে গেলে আর কিসের লেখালেখি! সত্যি কথাই—'অরূপ খেলার আসর তো আর এমনি এমনি জমে না।' ভাবকে দরকার, ভাবীকেও দরকার।

'কালকূট রচনা সমগ্র' একসঙ্গে পড়লে ধীরে ধীরে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়। তাঁর এক একটা রচনার এক একরকম সুর, এক একরকম স্বর। কোনোটা পাহাড়ের মতো গম্ভীর, কোনোটা সমুদ্রের মতো উদার, কোনোটা জনপদের মতো জটিল। শুধু তাই নয়, আরো একটা বিষয় পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর এই জাতীয় রচনার জন্য তিনি যে নরনারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন, তারাও সকলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিজ নিজ নির্ধারিত পরিবেশে। 'নির্জন সৈকতে'র নরনারীর সঙ্গে রাজগীরে দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। 'কোথায় পাবো তারে'-র পটভূমিকা চঞ্চল—কিন্তু তাহলেও সেখানে 'বাণীধ্বনি বেণুবনে'র পাত্রপাত্রীদের বসানোই যাবে না। এই কথাই বলা যায় প্রথম খণ্ডের 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'র চরিত্রদের সম্বন্ধে—তাদের কাউকেই আমরা পেতে পারি না 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-র পটে। এই অর্থে এরা সকলেই লেখকের অভিজ্ঞতা ও অন্বেষার সঙ্গে যুক্ত।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৭, অরবিন্দ রোড
নৈহাটী/২৪ পরগণা

www.boiRboi.blogspot.com

সূচীপত্র

নির্জন সৈকতে	...	...	১
বাণীধ্বনি বেণুবনে	...	...	১৪৭
কোথায় পাবো তারে (প্রথমাংশ)		...	২০৩
বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়		...	৪১৩

www.boiRboi.blogspot.com

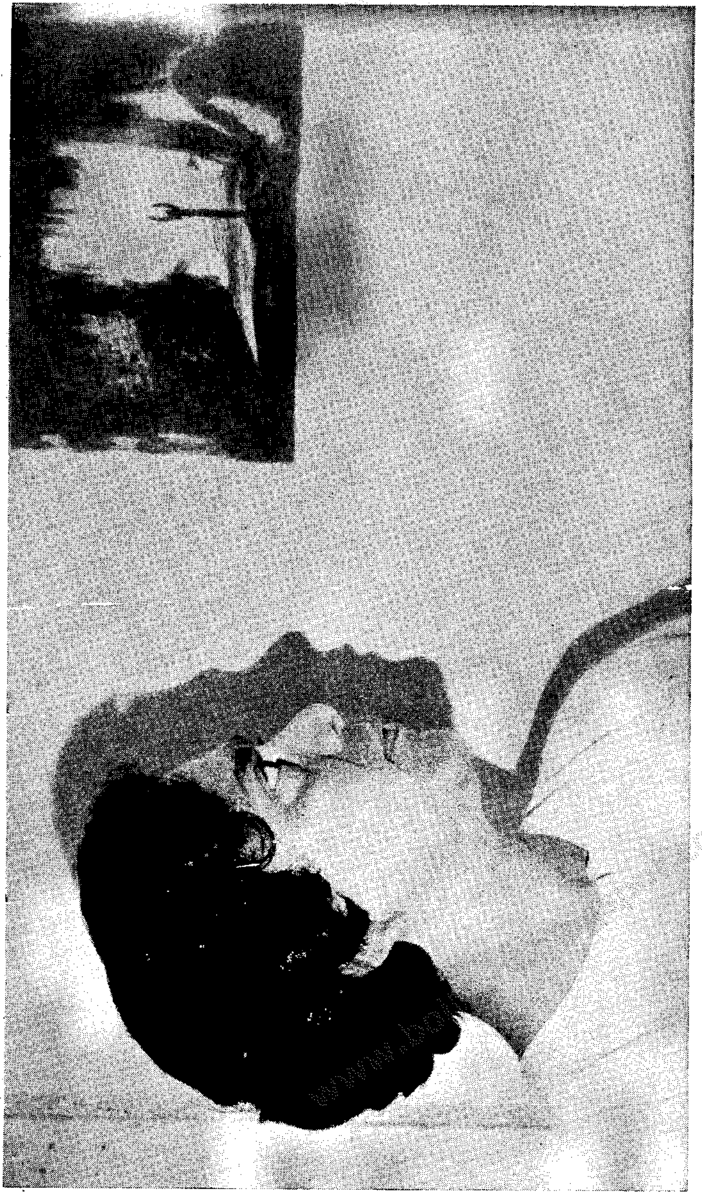

নির্জন সৈকতে

যদি বলতে পারতাম, হঠাৎ মনে হল, তাই বেরিয়ে পড়লাম, ঘুরলাম, দেখলাম, জয় করলাম, বিজিত বা কোথাও, তা হলেই নটেগাছটি মুড়োত, আমার কথাটি ফুরোত। কিন্তু এমন হঠাৎ মনে করা আর বেড়িয়ে পড়ার বিলাসিতা আমার চারপাশে নেই। মনে মনে যদি বা বিবাগী, বৈরাগ্যের ধূলাপথে জীবনের অয়ন চলন সবটুকু মিলিয়ে নেব, সে স্বাধীনতা পাই নি। ঘর ছাড়া যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, তখনই বাইরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই অপ্রতিরোধ্য বাসনার ভূমিকা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

কোন্ লগ্নে আমি সেই চিরকালের শূন্য কলসীটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ছাপাছাপি করে অমিয় ভরব বলে, আমার মনে নেই। রামায়ণের যুগে কিংবা মহাভারতের কাল থেকে, মনে নেই। যেন কোনো এক স্মরণাতীত কাল থেকে আমি বাইরের আহ্বানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

চিরদিনের সেই মেয়েটির মতো নাকি বুঝি নে। 'কালিনী নই কুল'-এর পথে যার ব্যাকুল আনাগোনা হয় কলসী কাঁখে। কিন্তু কলসী কখনো পূর্ণ হল না। কালিন্দীর সব জল যখন অমৃত হল, তখন সে রাজা হল মথুরায় গিয়ে। শুকনো খাতের কাঁটাঝোপে মেয়েটি রইল পড়ে তার কোমল বুক চেপে। রক্ত পড়ল বিন্দু বিন্দু। ফুল ফুটল লাল। দীর্ঘশ্বাসে বাতাস হল আলোড়িত।

কাঁটামনসার গায়ে বুঝি তাই ফুটল রক্তকণিকা। আজ দেখি, বিরহ তাকে শক্তি দিল। দুঃখ তাকে কঠিন করল। বজ্রকে সে নিল মাথায় পেতে।

সেই কলসী আমার বুকের কাঁখ থেকে কখনো নামে নি। বাইরে যখন যাই, তখন তাকে পূর্ণ করব বলে যাই। ইমারত আর আসবাব, স্থাবর আর জঙ্গম, যা বল, আমি তা সঙ্গে নিয়ে আসি নি। যাব না সঙ্গে নিয়ে।

কিন্তু জন্মলগ্নেই অপূর্ণ সেই পাত্র নিয়ে এসেছি। বিদায় নেব পূর্ণ কিংবা অপূর্ণকে নিয়ে। তাই সে আছে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

যখন তার আসল তৃষ্ণা মেটে না, শূন্যতা মরে হাহাকার করে, তখন বদ্ধ জীবনের আশেপাশে যা পায় তাই নেয় গণ্ডূষ ভরে। সে-গণ্ডূষের মিটানো পিপাসায় উঁকি দিয়ে দেখেছি! প্রথম তাকে চিনতে পারি নি। কিন্তু টের পেয়েছি তার মাদকতা। উল্লসিত হয়েছি। আর পান করেছি গণ্ডূষে গণ্ডূষে।

মনে করেছি, পৃথিবীর এ মুক্তাঙ্গনে মানুষের কাছে ফিরি আমার সকল কৃতজ্ঞতার ডালি নিয়ে। বাঁধা রাখি মন, করি রঙ্গ। দেখি, আমারই অঙ্গে যত পেখমের রংবাহার। প্রত্যহের লীলায় আমি নেচেছি তাল দিয়ে দিয়ে। অঘোরে নেচেছি, বেঘোরে নেচেছি।

মাতাল হয়েছি। বলেছি, এই আনন্দ। এই তো আনন্দ। এই তো মুক্তি। এই আমার মুক্তি।

লক্ষ্য করি নি, মানুষের মুক্ত অঙ্গন কখন তার অসীমের সীমা ফেলেছে হারিয়ে। কোন্ ফাঁক দিয়ে এসেছিল এক জাদুকর। সে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে সীমাহীন সেই দিগন্তকে। কখন আলগোছে ফেলে দিয়ে গিয়েছে একখানি গিল্টি সোনার ঘেরাটোপ। তখন মনে করেছি, আহা, কী সুন্দর এই ঘেরাটোপখানি। যেন, আবেশ জড়ানো দুটি হাত দিয়ে সে আমাকে আড়াল করে রেখেছে। ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। তার সারা গায়ে কী বিচিত্র বর্ণবাহার! সেই জাদুকরের কী আশ্চর্য কারুমিতি। তার প্রতিটি আঁচড়ে আখরে ফুটেছে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, আত্মীয়তা। একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন বর্ণচ্ছটায় ফুটেছে, এক কুলায় দুটি প্রাণীর নানা লীলা। দুজন আলিঙ্গনাবদ্ধ। একজনের অতৃপ্ত ব্যাকুল বাহুর বন্ধনে, আর একজন বিচিত্র বিভঙ্গে সমাহিতা। একজনের পেশীতে পেশীতে মহৎ লুণ্ঠনের নৃত্য, আর একজন বিন্দু বিন্দু দানে মদিরেক্ষণা। তার আকণ্ঠ গিয়েছে সুধায় ভরে। সে বাক্‌হীনা। তবু বিলুলিত বিম্বোষ্ঠ। নিঃশব্দ গানের ঝঙ্কারে তারা বলছে '...দুজনার বেশী, এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।'

দেখেছি, সেই ঘেরাটোপের সোনার আলপনায় আঁকা স্নেহ আর প্রেম আর বাৎসল্যের চিত্র সমারোহ। গুঞ্জনে বিভোর। আত্মীয়তা ও সামাজিকতার উল্লাস। বন্ধু সমাবেশের হিসাবহীন প্রহর বিলয়।

আসঙ্গ লিপ্সার মাদকতায় বলেছি এই তো ভালো লেগেছিল।

তারপর সেই ঘেরাটোপ কখন আরো ছোট হয়ে এসেছে। সহসা নিশ্বাস আটকে গিয়েছে বুকের মধ্যে। রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠেছি। দু'হাত দিয়ে সরাতে চেয়েছি সেই জাদুকরের ঘেরাও। দেখেছি, তার গিল্টির রঙ গিয়েছে মুছে। অতি রূঢ় কুশ্রী কালো হাতের কঠিন ঘায়ে সেখানে ফুটেছে, ঈর্ষা, মাৎসর্য! সৃষ্টিহীন কর্তব্যের তাড়না। অভ্যাসের অপদেবতার নখদন্তের ভীষণ আক্রমণ। অতি কাছাকাছি ধাক্কার উদ্যত প্রহার। উদ্ধত ছদ্মবেশী দোকানদারের মহাজনী। আমি তার হাতের কৌটোয় লেবেল আঁটা পসার। আমার ঠাঁইনাড়া হবার শক্তি নেই।

অসহ্য ব্যথায় চমক ভেঙে দেখেছি, সেটা একটা মঞ্চ। ইঁট কাঠ, ঘর বাড়ি, গাড়ি ঘোড়া—রাস্তার মঞ্চ। মঞ্চ পরিচালক ভাঙছে, গড়ছে, সাজাচ্ছে, বদলাচ্ছে। আলোক-শিল্পীর হাতে রৌদ্র-ছায়া, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় করছে খেলা। পরিচালকের অঙ্গুলি সংকেত আমার হাতে পায়ে চোখের তারায়। হাসতে গিয়ে পেলাম কাঁদবার নির্দেশ। আর সত্যি কথা বলতে গিয়ে মিথ্যের লহরী। ঘৃণা করতে গিয়ে মিঠে কথার কারসাজি। পেন্টার এসেছে ছুটে। নিভাঁজ মুখে তার তুলির পোঁচড়ায় এঁকে দিয়েছে লোলরেখা। আর রেখাবহুল জীর্ণ মুখে তার তুলির জাদু বুলিয়ে এঁকেছে নিটুট যৌবন। ড্রেসার এসে ধরল চেপে পোশাক। রদবদল করে বললে, অবস্থা আর স্বভাবকে না উল্টালে সব বেমানান হয়ে যাবে।

বিস্মিত ভয়ে দেখেছি, মঞ্চ ভরে সকলেরই তাই। সকলেরই রঙ-মাখা মুখ। মঞ্চের সবাই নট, সবাই নটী।

আর আমি? সেই আমি! বুকের ভিতরে স্বপ্ন-ভাঙা, মূঢ়, রঙ-ধোয়া, ধরাচূড়া খসা সেই আমি? তীরবিদ্ধ যন্ত্রণাকাতর সেই লুব্ধ হরিণ-আমি, ব্যাধের মৃগলুব্ধক তৃণভূমির ফাঁদে পড়েছি যে?

আমাকে দেখবে কে?

ওরা, ওই ওরা, সারি সারি, রাশি রাশি। যারা নিয়েছে দর্শকের ভূমিকা। তারা

কেউ ব্যঙ্গে ক্ষুরধার, বিদ্রূপে বক্র। কেউ স্নেহে স্নিগ্ধ, বিস্ময়ে মুগ্ধ। হাসিতে উচ্ছল, ব্যথায় করুণ। তারা কেউ দেয় হাততালি। গালে পাড়ে কেউ। ইস্! মানুষ নিয়ে আমার সব অহঙ্কার ধুলোয় লুটানো। তার কাছে বন্ধক দিয়েছিলাম নিজেকে। সেই বন্ধকী তমসুক দেখছি ছেঁড়াখোড়া, কুটিকুটি। আমি যে কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে নমস্কার করেছি, তা সে ফিরিয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুর হাসিতে।

মানুষ নামের মদে আমার বড় তৃষ্ণা। আকণ্ঠ পান করে আমি নেশা করেছি। তারপর নেশা গেছে, কিন্তু খোয়ারি কাটে না। তখন গড়াগড়ি যাই ধুলায়। তবু শক্তি পাই নে। অসহায় হয়ে বলি, আমার মুক্তি কোথায়? আমার আলোর মুক্তি, অশেষের মুক্তি?

তখন আমি পেয়েছি অকূল নীলাম্বুধির ডাক। স্বপ্নে দেখেছি তার দূর দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের হাতছানি। তার ফেনিলোচ্ছল অট্টহাসে কেঁপেছে সেই ঘেরাটোপ। ভেঙে পড়েছে তার করাঘাতে।

তাই চলেছি বাইরে।

যে-মুহূর্তে ডাক শুনেছি, দিয়েছি ছুট। হাতের কাছে যা পেয়েছি, তাই নিয়ে দিয়েছি দৌড়। আমি পরিব্রাজক নই, তাই আমার মাথার পাগড়ি খুঁজতে হয় নি। সাধু নই যে খুঁজব ডোর কৌপীন। লীলাক্ষেত্রে আমার কোনো ভূমিকা নেই। তাই গেরুয়াবাস রঙ করার দায় নেই আমার। রসকলির রঙ আর ছাপ সংগ্রহ করতে বসি নি আমি ঘরের কুলুঙ্গির ঝোলাঝুলির মধ্যে।

কে আমার ঈশ্বর, আমি তাই জানি নে। আমার কেন থাকবে দর্শন আর দানের ভাবনা। আমি সাধন জানি নে, ভজন জানি নে। আমার চাই নে খোলখঞ্জনী, ডারা-ডুপ্‌কি প্রেমজুরি। চাই নে প্রবালমালা সিন্দুর রুদ্রাক্ষ।

আমি পীঠস্থানের খোঁজে বেরুই নি। থানের ধুলোয় মাথা কুটে মানত মানসিক ট্যাঁকে গুঁজতে আসি নি। সার করি নি তীর্থ। তাই আমার ভেক নেই।

আমি ভিখিরিও নই। তাই আমার বয়েত নেই।

আমি সেই; যে অগুণতিরা ফেরে বাংলাদেশের নগরে গ্রামে। ঘর দ্বার সংসার, যা বল, সব পরিচয় তার সারা অঙ্গে নামাবলী হয়ে আছে। লোকে তাকে নাম দিয়েছে ভদ্রলোকের ছেলে। সেটাকে সে সাজিয়ে রেখেছে কোঁচার খুঁটের ভাঁজে ভাঁজে। ধরে রেখেছে একখানি ভদ্রগোছের কামিজে। তার ক্ষীদ অঙ্গ, দীন বেশ, যদি বল ভেক, তা হলে সেই তার ভেক।

আমি সেই; পড়ুয়া জীবনের স্বপ্ন যাদের জীবন-রুদ্রের প্রচণ্ড হাঁকে আর প্রহারে গেছে ভেঙে। যাদের মাথার ঘাম পা বেয়ে পড়ে শহরের কঠিন পথের তৃষ্ণা মেটাতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আর জগদীশচন্দ্র বসু হবার স্বপ্নভাঙা অসহায় চোখে যারা মরীচিকা দেখেছে অফিস, কারখানার বন্ধ দরজায় দরজায়। যাদের কৈশোরের উত্তোলিত শক্ত ঘাড় যৌবনেই পড়ল নুয়ে। অকাল রেখায় ছেয়ে গেল মুখ। কৈশোরের সাধের সঙ্গে, যৌবনের বাস্তবের চির অবনিবনায় যারা মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে ফিরল সারাদিনের ভূতের বেগার দিয়ে।

ফিরল সেই নিরুৎসবের অন্ধকার ঘরে। যার উঠোন জুড়ে অনেক স্বপ্ন-ভাঙা আর গড়ার দল। তার মুষ্টিভিক্ষাই যাদের জীবন মরণ, সোনা রুপোর কাঠি। আমি সেই এক বাঙালী।

আমি সেই অগণিতদের একজন। যাদের রক্ত মাংস মেদ বুদ্ধি বিকোল সওদাগরের গদীতে, যাদের শয্যা হল ছেঁড়া কাঁথা। তবু যাদের অমরত্বের তৃষ্ণা মিটল না।

যাদের অসন বসন অবয়ব দেখে চেনা গেল না, অথচ বুকের মধ্যে দীপকরাগ

সুরের তরঙ্গ বেজে চলে অহর্নিশ। ফুল ফোটে স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে। পাপড়িগুলি জ্বলে শিখায় শিখায়।

বুকে যখন তাদের সেই বহ্ন্যুৎসবের পালা, তখন তাদের অথিরবিজুরি কাল। জীবনকে তারা দেখল এক অচিন পাখির বেশে। গান জুড়ে দিল,

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তাহার পায়॥

আমি তো সেই একজনই। আমার বহ্ন্যুৎসবের পালায়, অথিরবিজুরি কালে, মনোবেড়ি নিয়ে আমি হাত দিয়েছিলাম খাঁচায়।

কিন্তু অচিন পাখি কোথায় গেল, দেখতে পেলাম না। দেখলাম, খাঁচায় সেই ঘেরাটোপের মধ্যে, সকলের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে মরছি।

মনোবেড়ি আমারই পায়ে। তখন যত কান্নাকাটি। তখন বড় ছটফটানি।

তাই আমার নেই কোনো ধড়াচুড়া। নেই কোনো প্রস্তুতি। আমার নেই তীর্থ স্বার্থ পরিব্রাজন। গেরুয়া ছোপের অসন বসন ভেক বিন্যাস। আমার নেই কোনো ধর্মাধর্ম। আমি তখন মনের দিক থেকে সেই, যার নাকি বাটপাড়ের ভয় নেই।

একে আমি ভ্রমণ বলব, তেমন সাহস নেই। আমার সে আয়োজনের সময় ছিল না। অকূলে যে ডোবে, মাটির আকাঙ্খা তার ভ্রমণবিলাস নয়। ঘরে যার আগুন লেগেছে, জলাশয় তার সাঁতার-রঙ্গ নয়।

আমি তেমনি চলেছি। আমি শ্বাসরুদ্ধ। নিশ্বাস নিতে চলেছি। আমার দু' চোখে দুঃস্বপ্নের অন্ধকার। আমি চোখ মেলতে যাব। আমার নষ্ট পিষ্ট মন নিয়ে দিয়েছি দৌড়। যা পেয়েছি হাতের কাছে, তাই নিয়ে ছুটেছি এই দিগন্তহীনের কাছে।

আমার ভূমিকা করার হাঁকডাকের গগন ফাটায়, কেউ যদি মনে করে, আমি বোম্বাইয়ের বন্দর কিংবা কলকাতার জাহাজঘাটা থেকে পাড়ি জমিয়েছি কোনো দূর দ্বীপের সন্ধানে, তবে সে আমার স্বভাবের দোষ। আমার বন্ধনমুক্তির বাচালতা।

আমি যাব না সেই দূর দ্বীপে, যেখানে আখক্ষেতের বিস্তারে, কাজু বাদামের বাগানে, গলে পড়ছে জোছনাধারা। গীটারের সুরের দোলায় যেখানে গোরা-গৌরী দুহুঁ দোঁহা মিললক রঙ্গে।

আমার দৌড় হাওড়া ইস্টিশনে। হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে, সে আমার পারের কড়ির পুঁটলি। যাত্রী হব রাতের গাড়ির। লোহিত-আরব-প্রশান্ত-নয়। রাত পোহাতে গাড়ি আমাকে নামিয়ে দেবে ঘরের কোণে, বঙ্গোপসাগরের কূলে।

যখন অপ্রতিরোধ্য আহ্বান পেলাম, তখন পাঁজি-পুঁথি গেল তল। আকাশ বাতাস দেখবার সময় পেলাম না।

আকাশ জুড়ে সেদিন প্রলয় মেঘের খেলা। আকাশে যেন মহাকাল তার কালো মেঘের রথ দিয়েছে চালিয়ে। চাবুক হানছে বিজলী। গর্জনে তার বজ্রপাতের হুংকার। আমি এলাম দিশেহারার মতো ছুটে।

মুখ গুঁজড়ে পড়ে ছিলাম আমার ঘেরাটোপের মাঝখানে। আমার দেহের ওপরে কোথাও একটু দাগ ছিল না। কিন্তু ভিতরটা রক্তারক্তি হয়ে উঠেছিল। আমি ধুলায় পড়ে ছিলাম না। বরং মসৃণ মোলায়েম সুরক্ষিত আশ্রয়ের, সেই ধরাবাঁধা সুখের বিভীষিকার মধ্যে আমি যেন শেষ প্রহরের পল গুণছিলাম। সুখ তার স্বার্থের ভয়াল থাবা দিয়ে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করেছিল। সুখের মধ্যেই দেখেছিলাম হিংসা। হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি। সন্দেহ অবিশ্বাস আর অপমানের হিংস্র প্রতিযোগিতা।

ভয়ংকর আতঙ্কে ভাবছিলাম, আমার মনের আয়ুষ্কালের শেষপ্রহরের ঘণ্টা বাজছে। সেই মুহূর্তেই এল ঘর ছাড়ার ডাক। বাঁশীর ধ্বনিতে সে বাজে নি।

কূজন-মুখর পাখির তমাল ছায়ায়, বেলা পড়ে আসা দীঘির ঘাটে জল ভরে নেবার অভিসারের আহ্বানে সে নয়। বুক কাঁপানো যে শঙ্খনাদকে মনে করেছিলাম, মধ্যবিত্ত সমাজে, এক যুবকের বিকাশকালের শেষ দিনের ঘোষণা, আসলে তা মহাকালের। দরবারের ডাক। রুদ্র ভৈরব উদারের দ্বারে, সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে, সাহসের ডাক।

বেরিয়ে এলাম। মুষলধারে বৃষ্টি আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করল। দেখলাম, পৃথিবীর সব আলো নিবে গেছে। মনে হল, যেন এই সেই মহানির্বাণের অন্ধকার। মত্ত দাদুরি ডাহুকীরা কামনায়, উচ্চরোলে ডাকছে তাদের নায়ককে। আকাশে বাজল ভেরী, আমার অয়ন-চলনের ঘোষণায়।

মফস্বলের গ্রাম শহর সব নিস্তব্ধ। মহানগরীর দ্বার বন্ধ। কী নিলাম, কী নিলাম না, দেখলাম না একবার ফিরে। যেন সম্মোহিতের মতো এসে উঠলাম হাওড়া স্টেশনে।

কিন্তু সেখানে চলমান প্রবাহের, নতুন নতুন যাত্রাপথের পূর্ব মুহূর্তের আবর্ত। সেখানে কলরব, ছুটোছুটি। থাকুক। থাকবেই। তবু তার মধ্যে আমার সেই ভেরী বাজতে লাগল। এই বহুর মধ্যে আমার এক-কে কে নেবে কেড়ে? আমি আছি আমার মধ্যে। বরং বেরিয়ে পড়ার আনন্দ যেন আমাকে সব কিছু থেকে মুক্তি দিল, এক বিচিত্র ছন্দের নৃত্য যেন আমার মনের পায়ে পায়ে।

শেষ মুহূর্তে এলাম। শুনলাম, মহাকালের সঙ্গে এখানকার ঘড়িও আজ উচ্চরোলে বাজছে! সময় নেই। টিকিট কেটে যাত্রী হলাম। আজ আমার বাছাবাছির দিন নয়, সময় নয়। যেখানে পেলাম, উঠে পড়লাম।

যত সহজে বলছি, তত সহজে নয় অবশ্য। দরজা আগলে উড়িষ্যাবাসীর ভিড়ই বেশী। আমার মতো আপদটাকে দেখে তাদের যেন বিরক্তির আর সীমা নেই। সবাই পাশের কামরা দেখায়। হিন্দী বাংলা ওড়িয়া, সমবেত ভাষায় একটা আপত্তির ঝড় এসে আমাকে উড়িয়ে দিতে লাগল। যেন আমি যাত্রী নই! আমার অধিকার নেই।

কেন? আমাকে কি ডেজার্টার বলে ঘোষণা করা হয়েছে নাকি? না হয় হলাম তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তবু তো যাত্রী।

লোকে বলে, চেংগিস্ খানের বাহিনীর সামনে ক্ষমা নেই কারুর। পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম সেই বাহিনী। নিষ্কৃতি পায় নি কেউ মারাঠা বর্গীর মুক্ত কৃপাণের কাছে। নিষ্ঠুরতায় নাকি তাদেরও জুড়ি নেই।

সেই সব ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন এবং পড়েছেন, আর পড়ে বিশ্বাসও করেছেন, তাঁরা কি কেউ তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে, কামরার দরজায় দরজায় মাথা কুটেছেন। যদি কুটতেন, তা হলে জানতে পারতেন, সেই সব ঐতিহাসিক বাহিনীর থেকেও নৃশংস নিষ্ঠুর বাহিনী আছে। আর তারা আছে আমাদেরই কাছাকাছি। একবার এসে দেখুন তো! শেষ অস্ত্র কী আছে? কান্না? চিঁড়ে ভিজবে না। উন্মুক্ত কৃপাণ থেকে তবু হয়তো দৈবাৎ বেঁচে যাওয়া যায়। কিন্তু এই রেলের কামরায়? একটি মাছিও গলবে না।

তবে আছে। শেষ অস্ত্র বলেও একটা জিনিস আছে। আর সেটাই শেষ পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হল। কথায় বলে, মাথা ঢুকলে, দেহ ঢুকবেই। কিন্তু মাথা ঢুকিয়ে বুঝলাম, কাজটা দুঃসাহসের। কারণ মাথাটা আমার। আর আমার ঘাড়ের শক্তিও সীমাবদ্ধ। কয়েকটি হাতের ধাক্কার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় সে অপারগ। তবু মন মানল না। কারণ গাড়ি তখন ছাড়ছে। শেষ অস্ত্রের নাম এ ক্ষেত্রে জীবনপণ। সেই জীবনপণ চেষ্টাই করতে হল।

মনে হল, একটা জগদ্দল পাথর ধসে পড়ল। আমি কামরার ভিতরে। শুধু বুকে নয়, চোখেও তখন আগুন জ্বলছে। নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার

থেকেও, আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে চোখ তুলে তাকালাম। কিন্তু হা-হতোস্মি। আমাকে ঘিরে যে-চারজন দাঁড়িয়ে, তারা যে কেউ আমাকে ঠেলে রেখেছিল, এমন মনে হল না। তারা কেউ অবাক, কেউ সপ্রশংস হাসিতে মুগ্ধপ্রায়। যেন ভোজবাজী হয়ে গেল।

যে আমার সবচেয়ে সামনে ছিল, তার পান খাওয়া ক্ষয়া দাঁতেই প্রথম হাসিটা ঝলকাল। ওড়িয়া সুরে বাংলায় বলল, 'আপনার খুব তাগদ আছে।'

বুঝলাম, আমার মতো একটি বঙ্গ-সন্তানের ক্ষীণ কলেবরই তাদের বিস্ময় এবং প্রশংসার কারণ। রাগে গা জ্বলে উঠল। আর একজন নিটোল বাংলায় বলে উঠল, 'খুব জোর উঠে পড়েছেন, হেঁ হেঁ...।'

পিত্তি যে জ্বলে, সেটাও অনুভব করলাম। তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, কামরার ভিতরে এমন কিছু ভিড় নেই। মোটামুটি একটা শোওয়া বসার অবস্থাতেই সবাই রয়েছে। অথচ বন্ধ দরজার সামনের অবস্থা দেখলে মনে হবে, ভিতরে একটা এলাহি কাণ্ড চলেছে।

কী বলব। কাকে বলব। এখন দেখছি, সকলেরই একটা আপ্যায়নের ভাব। গলা বাড়িয়ে, পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করব কার সঙ্গে। অথচ, এরা বোধহয় মানুষও খুন করতে পারে। দেখছি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। জয় হয়েছে, এবার সম্বর্ধনা।

কারুর সঙ্গে কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। গাড়ি তখন চলেছে। কিন্তু এটা রেলের কামরা, তা মনে হল না। শুধু যে চারিদিকে ভেজা কাপড় টাঙানো হয়েছে, তা নয়, ভেজা কাঁথা মাদুরও শুকোতে দিয়েছে। অন্যান্য লটবহরের কথা না তোলাই ভালো। এগিয়ে যাবার জন্যে যে কেউ পা সরাবে, এমন সদিচ্ছাও কারুর দেখা গেল না। বোঝা গেল, আর একটা সংগ্রাম আসন্ন। শেষ জয়টা হয় নি। আর এও বুঝলাম, এখানে মুখের কথা খসিয়ে বিশেষ লাভ হবে না।

প্রায় একটা শেষ দিকের ধারে গিয়ে হাতখানেক জায়গা দেখা গেল। আশ-পাশের লোকদের তাকিয়ে দেখার সবুর সইল না। মনে হল জায়গাটা কারুর দখলে নেই। গিয়ে বসে পড়লাম। কিংবা তখনো বসে পড়ি নি, মাত্র শরীর ঠেকিয়েছি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রায় ইলেকট্রিক শক-এর মতো একটি কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ আমার সারা গায়ে খেলে গেল। নারীকণ্ঠে শুনলাম, 'আ মলো! সেজদি, লোকটা যে এখানে এসে বসল।'

পুরুষকে অবহেলা করতে পারি, কিন্তু মহিলা! অসম্ভব। তার ওপরে মহিলার উচ্চারিত প্রথম কলিই কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পশল। এমন বাঙালী ভদ্রলোক দেখি নি, যিনি 'আ মলো!' শুনে থতিয়ে ওঠেন নি।

প্রায় ভয়ে ভয়েই মহিলার দিকে চোখ তুললাম। প্রৌঢ়া নিঃসন্দেহে। এবং বিধবা। চুলে বোধহয় পাক ধরে নি বিশেষ। কিন্তু ভাঙন ধরেছে মুখে। কালের আঁচড় লেগেছে বেশ নিশ্চিত-ভাবেই। তবু কালের সঙ্গে একটা যুদ্ধং দেহি-র ছাপ সর্বত্র। সে যুদ্ধ দেখছি মহিলার চশমার মাজাঘষা নিকেলের ফ্রেমে। মাঠ-কপালে পাতা কেটে লতিয়ে দেওয়া চুলের আবরণে। গলায় সোনার বিছে হার। পরেছেন সরু পাড় মিলের ফিনফিনে ধুতি। বিবরণের বাকিটা থাক উহ্য। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট, ওঁর বেঞ্চির ওপর তোলা পায়ের প্রান্তে লেস্ বসানো শায়ার আভাস ছিল।

এ আমার সমালোচনা নয়, বিবরণ। কিন্তু 'আ মলো' শব্দটার সঙ্গে কোথায় যেন একটা অমিল ঘোষিত হল।

সেজদি শুয়ে ছিলেন। উনি ততক্ষণে উঠে বসেছেন। ইনিও বিধবা। বপু কিঞ্চিৎ স্থূল এবং পাতা কাটা মহিলার মতো সাজগোজ বিশেষ নেই। বয়স অনুমান করা দুরূহ। সমবয়সী হতে পারেন। চুলে পাক ধরেছে বোঝা যায়। তাকানোর ভাবসাব

খুব সুবিধের মনে হল না।

মনে হল, মহিলাদের কামরায় উঠে পড়েছি। অথচ, আমার পাশে দেখছি একজন পুরুষ শুয়ে। শুধু শুয়ে বললে ভুল হবে। পরনের ধুতিতে যে খুব শালীনতা রক্ষিত হয়েছে, তাও মনে হচ্ছে না। বাকি দেহখানি মুক্ত। মুক্ত অঙ্গ ঘোর কৃষ্ণমূর্তির মুখ-ভরা যে গুয়া-গুণ্ডি, সেটা ফোলানো গালেই শুধু প্রমাণ নয়, একটু আধটু সুবাসও ছাড়ছে। একজন নয়, আশে পাশে কয়েকজনই এরকম আছে। তবে আমি কী অপরাধ করলাম, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ইতিমধ্যে আমার সামনেই রীতিমত আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। এবং লক্ষ্যণীয়, মহিলা আর দুজন নেই। তাঁদের সঙ্গে আরো তিনজন যোগ দিয়েছেন। সেই তিনজনও বিধবা। বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখা আর সম্ভব ছিল না। কারণ মহিলা।

সেজদি বললেন, 'ঢুকল কোথা দিয়ে?'

'কী জানি! ওই লোকটার সঙ্গে একটু ফাঁক রেখে বসেছিলুম। ও মা! টুকটুক করে এসে দিব্যি বসে পড়ল।'

পাতা-কাটা চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন একবার আমাকে। কারণ তিনি আমার সব থেকে নিকটে। সেজদির ভ্রূ জোড়া কোঁচকাল। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র।

এবার আর একটি গলা শোনা গেল, 'ঠাকুরঝি, ঝগড়া না করে, উঠে যেতে বলুন। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, এখন ঝগড়া বিবাদ করে লাভ নেই।'

যিনি বললেন, দেখছি, থানের প্রান্ত টেনে ঘোমটা টানা একমাত্র তাঁরই। বয়সও বোধহয় কম। কত কম, তা বলতে পারি নে। কণ্ঠস্বরে শুধু নয়, চোখে মুখেও যেন একটি স্নিগ্ধতা ফুটে রয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য! সেজদি কিংবা ঠাকুরঝি; যিনিই হোন, তাঁর ভ্রূ কোঁচকালেও, ঠোঁট দুটি কয়েক মুহূর্ত এঁটেই রইল। উনি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

নির্বিকার হবার চেষ্টা করছি আপ্রাণ। যেন কিছু শুনছি নে, দেখছি নে। কিন্তু এদিকে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। সেজদির আক্রমণটা কী ভাষায় কোন্‌দিক দিয়ে আসবে, কিছু বুঝে উঠতে পারছি নে। আমার পাশে লম্বমান মুক্ত অঙ্গ কৃষ্ণমূর্তি ঘুমিয়ে নেই। অত্যন্ত নির্বিকার, ভাবলেশহীন চোখে আমাকেই দেখছে। মাঝে মধ্যে মহিলাদের। এই নিঃশব্দ নাটকীয় দৃশ্যের সে যে একজন দর্শক, তাও পুরোপুরি বোঝবার উপায় নেই। হয় তো উড়িষ্যার কোনো দূর গ্রামের ঘরের স্বপ্ন দেখছে সে জেগে। নারকেল কুঞ্জের বেষ্টনীতে, অন্ধকার ঘরে এখন যে-চোখ দুটি বিনিদ্র, কাঁসার অলঙ্কার পরা যে-হাত দুটি স্খলিত, তবু কী এক লজ্জায় যেন শিহরিত, আজকের রাতকে বড় দীর্ঘ মনে করে যে চঞ্চল হাতে বারে বারে একলা ঘরে ঘোমটা টানছে, সেই মূর্তিকে সে হয়তো দেখছে।

কানে এল সেজদির কণ্ঠ, 'কিন্তু শিবি, সুরেন বারে বারে কী বলে দিয়েছে, মনে আছে তো?'

কণ্ঠস্বর একটু চাপা চাপা-ই মনে হল।

চুলে পাতা-কাটা বললেন, 'কী বল তো?'

'ও মা! এর মধ্যেই ভুলে গেলি। নাঃ, তোরাই দেখছি ডোবাবি।'

যাঁর ঘোমটা ছিল, তিনি বলে উঠলেন, 'মনে নেই শিবিদি, ভাসুরঠাকুর পই পই করে বলে দিলেন, খবর্দার যেন—'

'অ!'

পাতা-কাটা, অর্থাৎ যিনি শিবি, তিনি প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'হ্যাঁ,

তাও তো বটে। তা সে-সব তো আমরা বলতে যাচ্ছি না গো। বুঝবেই বা কেমন করে। কিন্তু যা-ও বা একটু ফাঁক ছিল, সেটুকুও জুড়ে বসলে, রাত ভোর যে আমায় কাঠ হয়ে থাকতে হবে।'

সেজদি এবার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'এই! এই!'

বুঝলাম, আমাকে। এবং এখানে তর্ক করে জায়গা দখলে রাখব, তেমন সাহস আমার নেই। অথচ গোটা কামরায় যারা ইতিমধ্যেই শুয়ে বসে জায়গা দখল করে আছে, তারাও যে কেউ দয়া করবে, সে আশা নেই।

শেষ চেষ্টা নিয়ে ফিরে তাকালাম।

সেজদি হাত নেড়ে বললেন, 'সর্ কর্ যাও। ইধার জায়গা নেই।'

হায়! এতদিন জানতাম, আর যা-ই হোক, চেহারায় একটা বাঙালী ছাপ আছে। আজ সে অহংকারটাও গেল। কী বলব, হঠাৎ ভেবে পেলাম না। নিজের দুর্ভাগ্যে নিজেরই হাসি পেতে লাগল। আর, জানি নে, কোন্ পরিবারের, কোন্ ভাইয়েদের ইনি সেজদি। ওঁর 'সর্ কর্ যাও,' মানে যে 'সরে যাও' তা নয়। উঠে যাওয়ারই ইঙ্গিত করছেন।

শিবি দেবী বলে উঠলেন, 'দেখছ তো কেমন ঠ্যাটা, বাক্যি ঝরছে না।'

সেজদি তাতে আরো উত্তপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'শুনতা হ্যায়? এই! তাকাকে তাকাকে দেখতা, সরকে যাও না।'

না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আমাকে বলছেন?'

পাঁচজোড়া চক্ষু যুগপৎ পড়ল আমার ওপর। এও সেই আমার শেষ অস্ত্র। অন্তত এ ক্ষেত্রের জন্যে ওইটুকুই শেষ ভেবে রেখেছিলাম। এখন খোদাও জানি নে, ভগবানও জানি নে। যা করেন এই বঙ্গদেবীরাই করবেন।

দেখলাম, সেজদি একটু থমকে গেলেন। শিবি এবার মুখ তুলে তাকালেন। দেখলেন আমার আপাদমস্তক। তাঁর তাম্বুল রঞ্জিত ঠোঁটের অসহিষ্ণু রুষ্টতায় একটু সহিষ্ণুতার ছাপ ফুটল। যিনি ঘোমটা টেনে ছিলেন, তিনি আর একবার ঘোমটাটা ঠিক করে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি তুললেন। বাকি যে দুজন, তাঁদের একজনকে অল্পবয়স্কা বলতে হবে। আর একজন বাকি তিনজনেরই সমবয়সী। তিনিও বিধবা। তাঁর সাজসজ্জাও শিবির মতোই প্রায়। নেই শুধু চশমা। চুলে পাক ধরেছে কি না ঠাহর করতে পারলাম না। একটু যেন বেশী ফোলানো ফাঁপানো। তাম্বুল রঞ্জনের গাঢ়তাও একটু বেশী। তাতেও খুব অবাক হই নি। অবাক হলাম একটু বিকট হাসির লাস্য দেখে। ওই বয়সের চোখে যা বেমানান, সেরকম একটি ঢুলুঢুলু ভাব দেখে। রঙটা ওঁর, শিবি কিংবা শিবানী, যা-ই হোক, তাঁর চেয়ে ফর্সা। তবু সন্দেহ হল, আধুনিক অঙ্গরাগের প্রলেপ কিঞ্চিৎ আছে। অপরাধ সেটা নয়। সাজনকে আমি সাধন বলে জানি। সাধনের অঙ্গহানি হলেই গোলমাল। তখন রুচি নিয়ে টানাটানি পড়ে। আর সাজতে গিয়ে চুরি, সেটাই বোধহয় সব থেকে বড় কারিগরের কাজ। কিন্তু যদি না পড়ে ধরা। তখন যে ধরা পড়ে, সে নির্বিকার। যার কাছে ধরা পড়ে, যত লজ্জা যেন তারই। এ ক্ষেত্রেও তাই।

বয়স যার অল্প, সে যে সধবা নয়, সেটা প্রত্যক্ষ। সীমন্তে সিঁদুর নেই, হাতে নেই শাঁখা কিংবা নোয়া। সধবাদের শাঁখা সিঁদুর নোয়া, কলকাতার সমাজের যে স্তরে পরিত্যক্ত হয়েছে, এ বাহিনী যে সে স্তর থেকে আসেন নি, সেটা নিশ্চিত। মহিলাটি বিধবা কি না, তারও কোনো বিজ্ঞপ্তি নেই। শাদা জামা, কালো পাড় শাড়ি, হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি। গলায় একটি জালি-বিছের মতো সোনার সরু চেন।

ঘরে নয় বাইরে নয়, ঘাটের পথ যাদের খোলা, সেই মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের উদার মনে করেন, বিধবাদের তাঁরা পোশাকের ব্যাপারে ওইটুকু লাইসেন্স

দিতে নাকি রাজী। হয় তো অকাল বৈধব্য বলেই ওইটুকু করুণা। এ ক্ষেত্রেও বোধহয় তাই। কেন না, এই বিধবা ইউনিটের মধ্যে যে একজন সধবা অথবা কুমারী প্রবেশপত্র পাবেন, সে সম্ভাবনা কম।

কিন্তু যাক সে কথা। শেষ অস্ত্র ছুঁড়ে বসে আছি। এখন তার ফলাফলের প্রতীক্ষা। এবং আর একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার জন্যে কি আপনাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

দলের যিনি নেত্রী সেই সেজদির দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলাম। ইতিমধ্যে চারজনের মধ্যে একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি হয়ে গেল। সেজদি বললেন, 'অসুবিধে মানে, আমরা কয়েকজন মেয়েমানুষ একলা কি না, তাই।'

শিবির কপালে পাতা-কাটার পাশ দিয়ে, দু'গাছি পাকা চুল তখন রীতিমত বেয়াদপি করে বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, 'এই আর কি!'

যেন, এমন বিশেষ কিছু নয়, এমনি একটা সুর তাঁর গলায়। তা ছাড়া, যদিও এঁরা কয়েকজন, তবু মেয়েমানুষ, তাই একলা। যদিও পথে বেরুতে সাহস করেছেন ঠিকই। আর সে সাহস যে ওঁরা রাখেন, আমি নিজেই তার প্রমাণ। ঝাঁজ এবং ঐক্য, দুই-ই তাঁদের বর্তমান। এবং আমার নিজের দিক থেকে কোনো কিছু প্রমাণ হল না বলে, আশেপাশে আর একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম। মেলে দেওয়া কাপড় কাঁথা মাদুরে গোটা কামরাটা চোখেই পড়ে না। যেটুকু পড়ে তাতে শোওয়া-বসা-ওয়ালাদের মাঝে কোনো ছুঁচের জায়গা রাখা হয় নি। অবিশ্যি এখানকার অভিজ্ঞতাও বড় তিক্ত। কারণ অধিকাংশ ছুঁচেরাই আবার ফাল হয়ে ওঠে। অতএব——

অতএব, শেষ পর্যন্ত সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে যাওয়া স্থির করতে হল। বললাম, 'একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পড়েছি কি না, তাই জায়গা রাখতে পারি নি। আচ্ছা, আমি দেখছি আর কোথাও একটু—'

উঠে দাঁড়ালাম।

শিবির গলাই প্রথম শোনা গেল, 'জায়গা কি কোথাও আছে?'

যাঁর চোখের কোলে ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু ঢুলুনি যায় নি, তিনি বললেন, 'আর থাকলেই কি দেবে নাকি?'

সেজদি বলে উঠলেন, 'ভালো মানুষ দেখলে তো কথাই নেই। এমন হেঁকে দেয়, যেন বাপের চাকরের সঙ্গে কথা বলছে। কেন রে বাপু, জায়গা কি তোদের কেনা নাকি?'

শিবি বলে উঠলেন, 'অই, বলে কে?'

হাওয়া দিক বদল করছে, সন্দেহ হল। কিন্তু কোন্ দিকে? সেজদির কথা থেকে মনে হল, ভালো মানুষের পাকা সার্টিফিকেট না হোক, একটা রেকমেণ্ডেশন পাওয়া গেছে। এদিকে যে দাঁড়িয়ে পড়েছি। যা হোক একটা কিছু স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। ওঁদের কথায় একটু ভদ্রতাসূচক হাসি টেনে ত্রিশঙ্কুর মতো অন্যদিকে তাকালাম। আসলে ভীষণ অসহায়তা বোধ করছি।

শিবি আবার বললেন, 'আমাদের সেই সন্ধ্যেবেলা থাকতে বেজা এসে তুলে দিয়ে গিয়েছিল তাই। নইলে কী হত, একবারটি ভাবো তো অবুদি।'

অবুদি, মানে দিন যার গত, তবু, ক্ষণকে যিনি ফাঁদ পেতে ধরবার চেষ্টায় আছেন, সেই ঢুলুঢুলু নয়না বললেন, 'তাই না বটে। তাও বেজার মতন ষণ্ডা ছেলে বলে পেরেছে।'

সেজদি বলে উঠলেন, 'ও মা, দেখলি নে, সেই মিন্‌সেটার সঙ্গে তো আর একটু হলে বেজার হাততালি লেগে গিয়েছিল। নেহাত লোকটার কোমরের কষি খুলে গেল—'

কথা শেষ হবার আগেই, সেজদি-শিবি-অবুদির হাসি ফেটে পড়ল। পরমুহূর্তেই

সেজদির চমক ভাঙল। থানের ঘোমটা পরা বর্ষীয়সী যেন কী বললেন তাকে। সেজদি বলে উঠলেন, 'তাই তো! ও মা, সরে বোস শিবি, ভদ্রলোকের ছেলেকে একটু বসতে দে।'

শিবি তাড়াতাড়ি সরে বসে বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে, বস ভাই, বস।'

একেবারে তুমি এবং ভাই! যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন শুধু রাত পোহাবার প্রতীক্ষা। জানি, ভিন্ প্রদেশের লোকের চোখে ব্যাপারটা একটু বিসদৃশই হত। উদার জাতীয়তাবাদের জ্ঞান যাদের কড়া, তারা এ ঘটনায় প্রাদেশিকতার গন্ধ পেতে পারেন। কিন্তু আসলে এটা দেশকালের সীমায় বাঁধা মনের নিরুপায় অবস্থা। অপরিচয়ের মধ্যেও একটি দূর-পরিচয়ের ভরসা। বরং প্রাদেশিকতার আবিষ্কারটাই এখানে সংকীর্ণতা।

বসে বললাম, 'আপনাকে আর বেশী সরতে হবে না, এতেই আমার হবে।'

সেজদি বললেন, 'তার কি দরকার বাবা, ভাল হয়ে বস। কী আর হবে, একটা রাতের তো ঝামেলা।'

তবু তো ঝামেলা। তাই বা নেয় কে? মনে করেছিলাম, ক্লাস-পালানো ছেলেটার মত ছুট দিয়েছি, কোনো দিকে ফিরে তাকাব না। তবু এই চলন্ত গাড়িতে একটু ঠাঁই পাবার জন্যে কাতর হয়ে উঠলাম! প্রায় কাঙাল হয়ে উঠলাম বলা চলে। কোনো দাবী যাদের মিটল না, এই তুচ্ছ দাবীর লড়াইয়ের দোলায় তারা টেঁকে। কি করব। নিজেকে আমি ছাড়িয়ে যেতে পারি নে।

তবু, সেই ভেবে আজ আমার ঘরের বার হওয়া। আমার নিয়ত তুচ্ছতার সব গ্লানিকে ভাসিয়ে দেব তরঙ্গে তরঙ্গে। হারিয়ে যাব এক মহা নিরুদ্দেশে।

'কোথায় যাওয়া হবে?' অবুদি নামধারিণী জিজ্ঞেস করলেন। রীতিমত ঘাড় বাঁকিয়ে, অপাঙ্গে তাকিয়ে, ঠোঁটের কোণ টিপে হেসে। কিন্তু ঘাড় বাঁকিয়ে অবুদি সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। তাতে আলোর ঝলকটা মুখের একদিক আলোকিত করে তুলেছে। সেই আলোয় দেখলাম, তাঁর মুখের রেখা গভীর। চোখের কোলের পরিখায় প্রলেপ।

বললাম, 'শেষ পর্যন্ত।'

সেজদি বললেন, 'তা মালপত্তর সব কোথায়? দরজার দিকে রেখে এসেছ নাকি?'

শিবি সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'তা হলেই হয়েছে। এতক্ষণে বোধহয় সব ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম 'আজ্ঞে না, আমার আর কিছু সঙ্গে নেই, এইটাই আছে।'

বৃষ্টিতে প্রায় ভেজা কাগজে জড়ানো পুঁটলিটা তুলে দেখালাম।

'ও মা! সে কি!'

অবুদি প্রায় শিউরে উঠলেন। সেজদি বলে উঠলেন, 'অ, যেখানে যাচ্ছ সেখানেই থাকা হয় বুঝি?'

'না তো!'

'তবে? ওতেই তোমার ডেরাডান্ডা সব?'

'হ্যাঁ।'

শিবি বললেন, 'চেনাশোনা কারুর বাড়ি যাচ্ছ বুঝি?'

কী বিপদ! চেনাশোনার বাইরে যাব বলেই আসা। বললাম, 'না, এমনি যাচ্ছি।'

আবার একটা স্তব্ধতা। সকলের চোখ চাওয়াচাওয়ি। সর্বনাশ! আবার একটা কী গোলমাল যেন করে বসলাম। অন্তত তিনজনের দৃষ্টি রীতিমত জিজ্ঞাসু সন্দেহে তীক্ষ্ন।

সেজদি বললেন, 'কোথায় থাকবে, কী করবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই?'

তাই তো! সেকথা তো একবারও ভাবি নি। ভাববার অবকাশ পাই নি। যে বেগের

ধারায় ছুটেছি, তার মধ্যে কোথায় যেন একটি আত্মহারা আচ্ছন্নতা ছিল। সেখানটা সজাগ হতে, এখন যেন কেমন একটু বিচলিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু সেটা টের পেতে দিলে চলে না। তাতে প্রশ্ন বাড়বে। সংশয় ঘনীভূত হবে আরো। যা আছে তা ভবিষ্যতের অন্ধকারে। ব্যবস্থা একটা না হবে কি। তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপাতত কোনো ঠিকানা নেই। তবে হয়ে যাবে।'

অবুদি হেসে হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তাই বল, ব্যবস্থা একটা কিছু আছে! গিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।'

প্রায় সমর্থন করেই, হাসবার চেষ্টা করলাম। ওদিকেও যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। শিবি বললেন, 'তাই ভাল। নইলে এই কি আর বিবাগী হয়ে ঘর ছাড়ার বয়স? না, তীর্থ করার সময়?'

সেজদি বললেন, 'পড়াশোনা কর বুঝি?'

মুশকিল। দেখছি নিস্তরঙ্গ জলে আমি ঢিলের মতো এসে পড়েছি। তরঙ্গ আর থামে না। আর ভেবেছিলাম, সেজদির দৃষ্টি একটু সাফ। কিন্তু শেষটায় ছাত্র বলে মনে করলেন আমাকে? ওটা প্রায় অপবাদের মতো মনে হল। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'না। ওসব পাট অনেক কাল চুকেছে।'

'অনেক কাল চুকেছে?'

অবুদি প্রায় সেজদির গায়ে ঢলে পড়লেন হাসতে হাসতে।

শিবি বললেন, 'তোমার আবার অনেক কাল কী ভাই। এই তো সবে শুরু।' বলেই, একটি কৌটা থেকে কী নিয়ে যেন টপ্ করে মুখে ফেলে দিলেন। দিয়ে ঠোঁট টিপে রইলেন।

এসব ক্ষেত্রে কিছু বলার নেই। তাই নীরব থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু সেজদি বলে উঠলেন, 'তবে বুঝি চাকরি কর?'

'বাপ মা আছে?'

'ক' ভাই বোন?'

'নাম কী?'

'বাড়ি কোথায়?'

'নিজেদের বাড়ি?'

ভয়ঙ্কর ব্যাপার। নিস্তরঙ্গ জলে নয়, আমি চাকের গায়ে ঢিল হয়ে এসে পড়েছি। কিন্তু এমন একটি পরিবেশ, জবাব না দেওয়াটাই অশোভনীয়। যতটা পারলাম, জবাব দিলাম।

কালো পাড় শাড়ি পরা অল্পবয়স্কা মহিলা এতক্ষণ নীরব ছিল।

মহিলার চেয়ে মেয়ে বলাই বোধহয় ভাল। মনে হচ্ছিল তার কথা বলবার অধিকার এখানে স্বীকৃত নয়। আর সেটা হয় তো বয়সের জন্যেই। এই আলাপে যে সে খুশি তা মনে হয় নি। অখুশি কি না, সেটা ধরা পড়ে নি। তবে, নির্বিকার সে থাকতে চেয়েছিল। চোখ তুলে সে তাকাচ্ছিল, কিন্তু তাতে একটি অন্যমনস্কতা দেখছি। সেই জন্যে একটু বেশী গম্ভীর মনে হয়েছে। এই দল থেকে কোথায় যেন একটি অদৃশ্য বেড়া ওকে আলাদা করে রেখেছে। মুখে কোথাও বিন্দুমাত্র প্রসাধনের ছাপ নেই; চুলে তেল নেই। বিনুনী জড়ানো বাংলা খোঁপাটি রুক্ষু। এমন কি শাড়িটিও ঘুরিয়ে পরে নি। বরং আঁচলখানি টেনে নিজেকে এমন করে ঢেকেছে, যেন শীতে ধরেছে মেয়েটিকে। থানের আঁচল টেনে ঘোমটা দেওয়া বর্ষীয়সী মহিলার মুখের সঙ্গে কোথায় যেন তার একটি মিল চোখে পড়ে। তবু কোমলতায় আর স্নিগ্ধতায় দূরত্ব থেকে গেছে। মেয়েটি যেন রোদের ছটায় অনেক দূরে তাকিয়ে রয়েছে। তাই তার ভুরু আর চোখের পাতা ঈষৎ কোঁচকানো। একটু রুক্ষতা তার লাবণ্যের মধ্যে যেন চেপে

বসেছে।

সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সহসা যেন মৌন সমুদ্রের দূর তরঙ্গে উত্থিত হল একটি চাপা অথচ স্পষ্ট শব্দ, 'আঃ। তোমরা যে কী আরম্ভ করলে!'

বলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্যদিকে। আর মুহূর্তে সকলের প্রশ্নবাণ যেন ধনুকহারা হয়ে থাতিয়ে গেল। মিথ্যে নয়, আমিও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। বিরক্তিটা স্পষ্ট। তাতে ওর নিজের লোকদের প্রতি কতখানি বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে জানি নে। কিন্তু চোটটা এসে যেন আমাকেও ঘা দিল। এমন মনে হয় না যে, ও আমার বিরক্তির আশঙ্কায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বরং ওর কথার সুরের স্বরলিপির পাঠ যেন বললে, কে না কে একটা রাস্তার লোক তার সঙ্গে তোমরা আরম্ভ করলে কী? বসতে দিয়েছ, মিটে গেছে, এবার চুপ করে বস সবাই।

আর সেটাই তো স্বাভাবিক। তবু মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন? মনে হল, যা আমার প্রাপ্য ছিল না, সেই খোঁচাটা ঘুরে এসে বিঁধলে আমাকে। তাই বলে কি এক হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা করে উঠে যাব আমি?

আমার মন বেঁধেই বা কেন? মেয়েটি একটি সত্যকে রূঢ় করে বলেছে। নইলে, অন্তত সেজদি-শিবি-অবুদির যে থামবার লক্ষণ ছিল না। আসলে, আমাকে ঘিরে কলরব বলে, আমার লেগেছে। আমি গা পেতে নিই কেন? আমার ঘেরাটোপের সোনার দেয়ালে বিষ মাখা তীরের ছড়াছড়ি। বিদ্ধ আমি কম হই নি। আজ আমি বাইরে এসেছি। আর কেন আমার বেঁধাবেঁধির অনুভব?

বরং ধন্যবাদ! অনশষ ধন্যবাদ! পথ চলার চেনা কলরবে এল নীরবতা নেমে। কিন্তু তাই কি কখনো সম্ভব। দেখলাম, শিবির ভ্রূতে কুঞ্চন। অবুদির চোখে একটি বিরূপ উপহাস। সেজদি রীতিমতো গম্ভীর!

অবুদির গলাই প্রথম শোনা গেল, 'বাবা!'

শিবি বলল, 'তোর বুঝি ঘুম পেয়েছে রেণু?'

রেণু সেই মুখ ফেরানো অল্পবয়স্কা। মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'হ্যাঁ।'

অবুদি বললেন, 'তা সে কথা বললেই হয়। ধমকাচ্ছিস কেন?'

জবাব এল, 'তবে কলরব কর।'

সেজদি বললেন, 'কলরব আবার কী লো! দুটো কথা বলছি বৈ তো নয়।'

শিবি একটি নিঃশব্দ ঝামটা মারলেন ঘাড় বাঁকিয়ে। আমার অবস্থা হয়ে উঠল আরো শোচনীয়। কী একটা যেন ঘটল। আর তার সব দায়টার ভার যেন আমি আমার ঘাড়ে অনুভব করলাম।

একমাত্র ঘোমটা পরা মহিলার বড় বড় চোখ দুটিতে বিষণ্ণ হাসি চিক্‌চিক্ করে উঠল। সেজদিকে বললেন, 'নাও ঠাকুরঝি, ওর কথায় কান দিচ্ছ কেন?'

শিবি ততক্ষণে থাবড়ে থাবড়ে বিছানা ঝাড়তে আরম্ভ করেছেন। আর সে থাবড়াগুলি বিছানার ওপরেই কি না, জানি নে। আসলে রেণু তাদের নিজেদের মেয়ে বলেই, অপ্রস্তুতের ঝাঁজটা প্রায় অপমানকর হয়ে উঠেছে। রেণু যদি গা টিপে লুকিয়ে বলত, তোমরা একটু চুপ কর, তাহলেই সব ঠিক থাকত। কিংবা যদি ইশারায় তার বিরক্তি জানাত। কাল হয়েছে আমার সামনে তার সরব প্রকাশ।

অবুদির কথায় যেন চিরচিরে লঙ্কার ঝাল ছিটিয়ে পড়ল। বললেন, 'কান টেনে বললে যে কানে না তুলে উপায় থাকে না ভাই, ছোট বউদি।'

বলে আবার চোখের কোণ দিয়ে মুখ ফেরানো রেণুকে দেখে নিলেন। ছোট বউদি নিঃশব্দে হেসে ফেললেন। সে হাসিতে কেমন যেন একটি বৈরাগ্য মাখানো দুঃখ। বললেন, 'তাই কি কখনো হয়, ও তোমাদের কান টেনে কথা বলবে।'

পরিবেশটা হয়ে উঠল গম্ভীর। তার ওপরে আর এক পোঁচড়া কালো রঙ গাঢ় করে

বুলিয়ে দিলেন অবুদি। বললেন, 'তবে বুঝি মনের শোকে মাথার ঠিক নেই?'

ছোট বউদির কোমল মুখখানি বিষাদে ঢেকে গেল। কিন্তু আশ্চর্য চরিত্র শিবি। সে হঠাৎ অবুদির দিকে ফিরে বলল, 'ও আবার কেমন কথা তোমার? রেণু দেখছি ঠিকই বলেছে।'

সেজদিও বলে উঠলেন, 'তাই না বটে! কথার ছিরি দেখ দিকিন? ছি!'

এবার অবুদির মুখ ফেরানোর পালা। এবং ফেরালেনও তাই। কিন্তু গম্ভীর হয়ে নয়। মুখের হাসিটি বজায় রেখেই। ওটা বোধহয় অবুদির ব্যাধি।

শিবি হঠাৎ আমাকে বলল, 'দেখছ তো ভাই, কেমন ঝগড়া করছি আমরা।'

আবার সেই আমার সঙ্গে কথা! এই সাতকান্ড রামায়ণের পর। আমি একবার চোরা চোখে রেণুকে দেখে, হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছোট বউদি ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম। হঠাৎ যেন মনে হল তিনি আমাকে চিনে ফেললেন। যেন আমাদের অনেকদিনের একটা চেনাচিনি ছিল। ওঁর সন্ধ্যাতারার মতো, স্নেহময়ী চোখের দর্পণে যেন আঁতুড়ঘর থেকেই বাঁধা পড়েছিলাম। এই প্রথম তিনি আমার দিকে স্পষ্ট চোখ মেলে তাকিয়ে হাসলেন। আর আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন। বুকের মধ্যে শুনতে পেলাম, তোমাকে নিয়ে কোনো বিষ-বাষ্প ছড়ায় নি এখানে।

তিনি বললেন, 'ঝগড়া আবার কোথায় শিবি ঠাকুরঝি। কিন্তু—'

ছোট বউদি আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'বলছিলাম কি বাবা, তুমি এবার ওই ভেজা জামাকাপড়গুলো ছাড়। নইলে একটা অসুখ-বিসুখ করবে।'

সত্যি, কিন্তু সে প্রবৃত্তি আর হচ্ছিল না।

সেজদি বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছ ছোট বউ। জামা একেবারে সেঁটে আছে গায়ে।'

শিবি বললেন, 'ওই তো একটা পুঁটলি! জামা কাপড় আর আছে কি না দেখ?'

ছোট বউদি বললেন, 'নেই?'

একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, 'আছে। আবার এই ভিড়ের মধ্যে—'

সেজদি বলে উঠলেন, 'হোক, এরপরও আর কথা নয় বাপু। খোল খোল, আর দেরী করো না।'

শিবি বললেন, 'আর না থাকে তো বল, কাপড় বার করে দিই।'

রেহাই নেই দেখছি। ছোট বউদি আবার বলে উঠলেন, 'চোখের সামনে না হলে তো বলতে যেতাম না। দেখে কি চুপ করে থাকা যায়? নিজের মা মাসীরা যদি সঙ্গে থাকতেন?'

আবার অবুদি মুখ খুললেন, 'বলছ মা আছেন, তা তিনিই বা কেমন? বাইরে বেরুচ্ছ, জিনিসপত্তর একটু দেখে শুনে দেন নি?'

না জানি আরো কী বলে বসবেন ভদ্রমহিলা। হয়তো আমার মায়ের সমালোচনায় মুখরা হয়ে উঠবেন! তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, মানে, মাকে বলে বেরুই নি।'

সেজদি বলে উঠলেন, 'সে তোমাকে দেখেই বুঝেছি।'

রেণু বাদে সকলেই হেসে উঠলেন। সেজদি আবার বলে উঠলেন, 'মায়ের সঙ্গে তো ওই করতেই আছ বাপু তোমরা। হাড় না জ্বালালে তোমাদের ভাল লাগে না।'

কী বলব। এ কথার কোনো জবাব নেই। আমার মায়ের মুখখানি একবার মনে পড়ল। দেখলাম, জ্বলেপুড়ে, বিস্মৃতির এক দূর কোন্ আঁধার থেকে তিনি তাকিয়ে আছেন। কোনো এক কালে যেন তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম। আজ তাঁর চোখে জল আছে কিনা টের পাই নে। ঠোঁটের বাঁকের রেখাটি হাসি কি না বুঝি নে। চোখে তাঁর নির্নিমেষ দৃষ্টি, নিয়ত ধারায় কী যেন বিগলিত। যেন বলছেন, সংসারের পথে একদিন নিজেই তোদের ছেড়ে দিয়েছিলাম আজ তোরা আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবু এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফেরাতে পারি নি।

উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পুঁটলিটা খুলে ফেললাম। জামা কাপড়ের আগে বেরুল দুটি একটি বিদেশী বই। একটি সাহিত্য, অপরটি দর্শন। তা ছাড়া একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। বুঝতে পারছিলাম, রেণু বাদে, চার জোড়া চোখ আমার এই বিদেশ ভ্রমণের সরঞ্জাম দেখছিলেন। কেমন করে তাদের বোঝাব এখন, আমি ভ্রমণে বার হই নি। বই ম্যাগাজিনের তলায় প্রায় দলামোচড়া পাকানো কয়েকটি ধুতি পাঞ্জাবি এবং আনুষঙ্গিক পোশাক।

চোখ তুলে তাকাতে ভয় হল। না জানি কী শুনতে হয়। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এখন নিজেরই চোখে যেন ব্যাপারটা কটু লাগছে। কিন্তু যখন বেরিয়েছিলাম, কটু অকটু, কোনো কিছু মনে পড়ে নি।

সেই যে আছে গান, 'মন চল যাই ভ্রমণে, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।' এ সেই ভ্রমণের মতো, গোঠের বাঁশী যাকে জীবনের শঙ্খরবে ডাক দিয়েছে। আজ, লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। আজ মান অপমান সামাজিকতা, সব তুচ্ছ।

কিন্তু সেই এক যে ছিল স্বভাব, তার ছিল এক মস্ত দোষ। সে তার আজন্মকালের আচার বিচার মানসিকতা, কোনোকালে ছাড়তে পারত না। যেন এমনি, রূপকথারই ছন্দে সে আমার রক্তে মজ্জায় মেশানো। চার জোড়া অভিজ্ঞ বর্ষীয়সী মহিলার সামনে আমার দিশেহারা বেগ থমকে উঠল। সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। একমাত্র ভরসা এখন, তাঁরা ধরে নিয়েছেন, গন্তব্যে পেঁছে নিশ্চয় আমার কোনো ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে।

শিবি বলে উঠলেন, 'জামা কাপড়ের থেকে বই বেশী দেখছি।'

ছোট বউদি বলে উঠলেন, 'যাও বাবা, কাপড় ছেড়ে এস আগে।'

জামা কাপড় দুটি নিয়ে, পা বাড়াতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠল। সেই বাথরুম অবধি যাওয়া মানে, বহু বাধা, বহু তর্কবিতর্ক। তবু এগোলাম। নানান্ কসরৎ করে যখন বাথরুমের দরজায় এসে পেঁছিলাম, সেখানেও বাধা। দেখলাম, একজন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। গায়ে একটি নতুন ধবধবে শার্ট। কিন্তু ধুতি দেখা যায় না। তবে আছে। নোংরা হবার ভয়ে এমন উঁচুতে তোলা যে শার্টেই ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হল, দেশে ফিরে যাওয়া হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবেন ভিতরে?'

জবাব পেলাম, 'না।'

'তবে আমাকে যেতে দিন।'

এক গাল হেসে বলল উড়িষ্যাবাসী, 'ভিতরে লোকো অছি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তবে আপনি দরজাটা ওরকম টেনে ধরে আছেন কেন?'

হেসে বলল, 'কী করব বাবু। দরজা বন্ধ করতে পারে না, ভয় পায়। তাই ধরে দাঁড়িয়ে আছি।' বলেই একটা হাঁক দিল, 'হলা?'

একটি ঝনাৎকার শোনা গেল। দরজা খুলল। হাত পা মুখ বিহীন একটি লাল রং-এ হলদে ফুল তোলা ছাপা শাড়ি বেরিয়ে এল। এটা উড়িষ্যার আবরুর চলন কি না, তখনো জানি নে! মারোয়াড়ী মহিলাদের দেখেছি, তবু তাদের অবয়ব একটু বোঝা যায়। এ একেবারে পুঁটলিতে পর্যবসিত। তা ছাড়া দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, তাতে আশ্চর্য হই নি! অপরিচয়ের প্রতি ভয়ের দরুণ, এ কাণ্ডটা এর আগেও দেখেছি। আজ যদি উপহাস করে হাসি, ওটা নিজেদের গায়ে ফিরে আসবে। আমরা যা চেয়েছি, তার যোগ্যতাকে অর্জন করতে পারি নি।

ফিরে যখন এলাম, তখন নিজেকেই নিজের করুণা করতে ইচ্ছে হল। জামা কাপড়ে ঘোর অমিল। তার ওপরে কুঁচকে সেগুলি ছোট হয়ে গেছে। মাথার চুল ভেজা, অবিন্যস্ত। বাংলাদেশে, এ বেশ দেখলে, বিশেষ একটি শ্রেণীর নাম ধরে বিদ্রূপ করা

হয়। তার থেকেও ভালো শুনেছিলাম, এক আত্মীয়ের মুখে। তিনি বাড়ির চাকরের এরকম বেশ দেখে বলেছিলেন, অমন গরুচোরের বেশে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? আর বলা বাহুল্য এ গরুচোরের বেশ নিশ্চয়, বিরাটরাজের গো-ধন-চোর দুর্যোধনের অনুচর ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার বেশ নয়। কিন্তু উপায় নেই।

কোনোরকমে এসে বসে পড়ব ভেবেছিলাম। কিন্তু আপাতত অভিভাবিকারা অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। সেজদি বললেন, বসছ কি? জামা কাপড় দুটো মেলে দাও?'

কিন্তু কিসের সঙ্গে কিসে বাঁধব, ভেবে কূল পেলাম না। ছোট বউদি হঠাৎ উঠলেন। হেসে বললেন, 'দাও, আমি একদিক ধরছি। তুমি ওই বাঙ্ক-এর লোহার সঙ্গে একদিক বাঁধ আগে।'

এ ব্যাপারে চিরকালের অন্ধত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। সবই করলাম। এই উপদেশ আর সাহায্য গা পেতে নিই নি। তবু কোথায় যেন কেবলই খচ্ খচ্ করতে লাগল। একজনের কাছে যে এসব নিকৃষ্ট আত্মীয়তার বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল, সেটাই আমাকে এখনো বিঁধছে। তবু আমি নিরুপায়।

আশ্চর্য! ছোট বউদির চোখে চোখ পড়তে আবার তিনি হাসলেন। এখন ওঁর ঘোমটা নেই। দেখলাম, কানের কাছে, চুলের গোছায় একটি বিচিত্র শুভ্রতা। কানে কানে যে-পক্ককেশ তাঁকে দিবানিশি মহাকালের মন্ত্র শোনাচ্ছে, সে-ই যেন একটি স্নিগ্ধ করুণায় দিয়েছে ভরে। হঠাৎ বললেন, 'পথ চলতে ওরকম একটু আধটু হয়।'

কেন বললেন, বুঝলাম না। তবু যেন সবই বুঝলাম। আর সহসা যেন লজ্জা পেলাম। ছোট বউদি আবার বলে উঠলেন, 'এভাবে কি ঘর ছাড়তে হয়? এত দিশেহারা?'

বুকের মধ্যে চমকে উঠল! অবাক মানলাম ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে। ঠিকই ভেবেছিলাম। তাঁর সঙ্গে যেন আমার অনেককালের চেনাশোনা। সম্বন্ধ যেন আঁতুড় ঘর থেকেই। একটি স্নেহের ভর্ৎসনা আমি শুনলাম তাঁর হাসিমাখা কথায়। একমাত্র তিনি জানেন, আর আমি জানি, রহস্যের মধ্যে কী সত্য যেন ধ্বনিত হল।

আবার হঠাৎ বললেন, 'দেখছি মনে মনে তুমি বড় অশান্ত বাপু। নইলে এমন পাগলের মত দৌড়ায় কেউ? লাভ কী?'

এবার আর না বলে পারলাম না, 'ছোট বউদি—!'

ছোট বউদি?

উনি যেন অবাক হলেন। এবার রেণু একবার ছোট বউদির দিকে ফিরে তাকাল। তারপরে তার সেই দূর থেকে দেখা ঈষৎ কুঞ্চিত চোখে আমাকে দেখল। কিন্তু তার মতিগতি আর আমার জানবার কৌতূহল হল না।

ছোট বউদি হেসে বললেন, 'পথচলতি যা শুনছ তাই তো বলবে। কিন্তু তোমার বউদি হবার বয়স বাপু আর আমার নেই।'

বললাম, 'না থাক; না হয় ডাকলাম ওই নাম ধরেই।'

বললেন, 'বেশ।'

আমি বললাম, 'ছোট বউদি, আমি যাচ্ছি একটু নির্জন সমুদ্রের ধারে। আর কোথাও নয়।'

ছোট বউদি যেন রহস্যময়ী। বললেন, 'বেশ। বেড়িয়ে ঘুরে আনন্দ করে আবার ঘরে ফিরে যেও। দেখো, যেন অসুখ-বিসুখ করে বস না।'

অসুখ-বিসুখ? কী অসুখ? কিন্তু আর কিছু বললেন না ছোট বউদি। হাসিতে তাঁর চোখ দুটি চিকচিক করতে লাগল। যেন মনে হয়, চোখ দুটি সব সময় জলে ভাসছে।

এদিকে ব্যাপার অন্যরকম। সেজদি-শিবি-অবুদি, সকলেই ঢুলছেন। শিবি শুয়েই পড়েছেন। অবুদি আধশোয়া। সেজদি বসে বসেই ঝিমুচ্ছেন।

ছোট বউদি চোখ বুজলেন। রেণু আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর হাতের ওপর মাথা দিয়েছে গুঁজে। খোঁপা তার অলস সাপের মতো, অর্ধ কুন্ডলীতে পিঠে পড়েছে লুটিয়ে।

মনে হল, ছোট বউদি ঘুমুচ্ছে না। যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন। ওঁর প্রৌঢ় ঠোঁটে পান খাওয়ার দাগ নেই। সব মিলিয়ে, কেমন একটি পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা, স্নিগ্ধতা, অথচ করুণ।

আমিও বই খুলে বসলাম। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারলাম না। ছোট বউদির কথার মতো, এই যে সত্যি এক পাগলের মতো ছুটে আসা, ছোট বউদির কথাগুলি যেন আমার সেই অশান্ত বেগের মধ্যে একটি প্রসন্ন গাম্ভীর্য আর সহনশীলতার প্রলেপ মাখিয়ে দিল। মনে হল, শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ, সব মিলিয়ে, কী এক আশ্চর্য রাগিণী যেন বাজছে আমার মনের মধ্যে। আর কেবলই মনে হচ্ছে, এ যাত্রা আমার শুভরেখায় অঙ্কিত হল। মহাদিগন্তের ডাকে এখন যেন আনন্দের ধ্বনি শুনছি।

বইয়ের মধ্যেই ডুবে ছিলাম। বিদেশী গল্পের নায়িকা, সেই দুঃখী মেয়ের ব্যথাটা যেন মনের এক সুগভীর অন্তরঙ্গতায় দোল খাচ্ছিল। পুরনো এক উপন্যাসের ডাইজেস্ট। ইতিমধ্যে গাড়ি কয়েকবার দাঁড়িয়েছে, ছেড়েছে। সেটা টের পেয়েছি, তাকিয়ে দেখি নি। ভয় করছিল, কারণ, দরজার কাছেই সেই প্রহরীদের প্রহরা ছিল ঠিকই। তর্কবিতর্ক জোরজবরদস্তি চলছিল সেই গভীর রাত্রেও।

হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রেণু। বাইরে যেন চির-অন্ধকার। একটি জোনাকির ঝিকিমিকিও নেই সেখানে। আকাশ মাটি সব যেন এক নিরেট কঠিন প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখলাম, শাড়ি জড়ানো সেই অসহনীয় আড়ষ্টতা নেই রেণুর। স্বাভাবিক ভাবেই তার পিঠের ওপর দিয়ে আঁচল এলিয়ে পড়েছে। জামাটিতে কোথাও একটি কারুকার্যের চিহ্ন নেই। ও যেন ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে, শক্ত হয়ে বসে আছে। ও কি উঠতে চেয়েছিল? যেতে চেয়েছিল কোথাও? ভাবখানি তেমনি, যেন উঠতে গিয়ে বসে রয়েছে নিস্পন্দ হয়ে। ওর বেণী এখন সম্পূর্ণ এলায়িত। চোখের চাউনি তেমনি। গভীর অন্ধকারের বুকে, এখন একটু যেন বেশী উন্মুক্ত পক্ষ। কেন যেন মনে হল, ওর শাড়ির কালো পাড়খানি শোকের চিহ্ন হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে গেল, অবুদির কথা, মনের শোকে মাথার ঠিক না থাকার খোঁটা।

মনে মনে কৌতূহল চাপতে পারলাম না। নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম, রেণু কি সদ্যবিধবা? যে রেণুর এত সম্বিত, এত যার চেতন, এখন সে একবারটি ফিরে তাকিয়েও দেখছে না। হয় তো আমি ভব্যতা ভুলেছি। তবু সহসা রেণুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। দেখছি, তার দীর্ঘশ্বাসের ভারী শব্দে যে অপরে চমকায়, সে খেয়ালটুকুও এখন নেই তার। কেন? কী হারিয়েছে মেয়েটি? এখন ও গম্ভীর নয়। বিরক্তিও নেই। শুধু যেন এক পাষাণভারে থমথমিয়ে আছে। অথচ, কত আর বয়স রেণুর। তার পাথরস্তব্ধ দেহের সীমা বাইশ-চব্বিশের একটি অটুট রেখায় আঁকা। তবু যেন মনে হয়, একটি বিষণ্ণ নম্রতায় সে মোচড়ানো। একটি তীক্ষ্ণধার খোঁচায়, অবনত বিভঙ্গে ম্রিয়মাণ।

ছোট বউদি পিছনে হেলান দিয়ে, তেমনি চোখ বুঁজে ছিলেন। হঠাৎ একটি হাত দিয়ে রেণুর কাঁধ স্পর্শ করলেন। কিন্তু চোখ তাকালেন না। রেণু চমকাল না। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি নত হয়ে এল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আর

সেই মুহূর্তেই চোখ তুলে সে আমাকে দেখল। এবং সহসা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। রক্তের একটা ঝলক লাগল তার মুখে। আঁচলটি ঘুরিয়ে বুকের ওপর টেনে, মাথা নীচু করে রইল সে।

মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যা দেখব না ভাবি, তাই চোখে পড়ে। আমি যেন একটি মূর্তিমতী শোককে দেখছিলাম।

হঠাৎ দেখলাম, ছোট বউদি রেণুর বেণী ধরে ওর মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিলেন। তারপর হাত দিয়ে, রেণুর চোখ দুটি চাপা দিয়ে রাখলেন। কিছু বললেন না। চোখ খুললেন না। রেণু যেন গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হয়ে গেল।

রাত্রির গভীর অন্ধকারে মহাকালের রথ চলতে লাগল। মানুষের তৈরি লৌহচক্রে যেন তারই প্রতীক-ধ্বনি শুনছি। চুপ করে রইলাম।

কিন্তু থাকা গেল না। এতক্ষণ আমার আর এক পাশে যে চুপচাপ শায়িত ছিল, মনে করেছিলাম সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। নাসিকাধ্বনিও যে এক আধবার শুনতে পাই নি, এমন নয়। হঠাৎ সে উঠে বসল। মুখের গুয়াগুণ্ডিই বোধ হয় গিলে ফেলল হঠাৎ কোঁৎ করে। তারপর খালি গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিশেহারা চোখে তাকাল আমার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কন্‌টিশন গেলা?'

বললাম, 'তা তো বলতে পারি নে ভাই।'

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। নিজের লজ্জা নিবারণের অবস্থা আছে কি না, সেটাও বারেক দেখা উচিত। কিন্তু সে খেয়াল নেই। কামরারই এক প্রান্তে তাকিয়ে, প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। সেখান থেকে জবাব এল প্রায় তেমনিভাবেই।

সেই মুহূর্তেই আমার পাশ থেকে একটি শব্দ উত্থিত হল, 'মরণ!'

দেখলাম, শিবি পাশ ফিরে শুলেন।

লোকটি একটু শান্ত হয়ে বসল। পা তুলে, উটকো হয়ে সীটের ওপর বসে, জানালার দিকে তাকাল। যেন কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তেই, প্রায় মত্ত দাদুরীর মতো সপ্তম গলায় গানের সুরে বলে উঠল,

'রক্ষা কেমন্ত করি, করিবা
মত্তকারী—
গতি কি এমন্ত বিচারি
রে সহচরি।'

প্রায় চমকে উঠেছিলাম। ভাবভঙ্গি দেখে একেবারে বুঝতে পারি নি, হৃদ-মিটারে এতখানি তাপ লেগেছে। মানেটাও প্রায় অনুমান করে নেওয়া গেল। 'কেমন করে রক্ষা করি। এ যে মত্তকরী হল এখন। সখী, মনে মনে এখন সেই গতির বিচার করি।'

একবার গেয়েই থেমে গেল। মনে হল, বিলম্বিত শব্দে বোমা গর্জাল, আবার থামল। বুঝলাম, যা ছিল প্রথম রাত্রের স্বপ্নময় চোখে, এখন তা চাপতে না-পারা শব্দভেদী বাণে একবার রূপান্তরিত হল মাত্র। জানি নে, এ গান সেই অন্ধকার গ্রামের বিনিদ্র-নয়নার কাংস অলঙ্কারের ঝনঝনায় তাল পেল কি না। কিন্তু এ মন যে এখন রক্ষা করা দায়, মত্তকরীও যে হয়েছে, এবং মনের সেই গতির বিচারও দুঃসাধ্য ও জটিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেবল কানের কাছে, প্রায়-ঘুমন্ত রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর আর একবার শুনলাম, 'মুখে আগুন।'

এবার ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পাশ ফিরে শুচ্ছেন সেজদি। অবুদির মুখের হাসিটি কি ঘুমন্ত না সজ্ঞান শ্লেষ, বুঝলাম না। নির্বিকার শুধু ছোট বউদি, রেণু। আর গায়ক স্বয়ং।

পুরী। পুরীধাম, শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলাম উপকূল শহরের দিকে। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাঁর ভগবানের দেশ দর্শন করতে এসে যে-শহরের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, চে-লি-টা-লো-চিং। সংস্কৃত শব্দে যার নাম চরিত্রপুর, চীনা ভাষায় ওই নাকি তার লিখন।

আমি এসেছি সেই প্রাচীন সমুদ্রোপকূলের নগর চরিত্রপুরে। যার আধুনিক নাম পুরী। চৈতন্যের শেষ প্রস্থানের নীলাচল। ইতিহাসের বিস্মৃত কক্ষ হাতড়েও যার সব কথা, সব কাহিনী আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু মানুষ মাটির তলায় ভিত্তি দেখে, পূর্ণ অবয়বকে কল্পনা করতে শিখেছে। সেই কল্পনাকে সে প্রমাণ করেছে নানান্ ভাবে। আর সেই প্রমাণের মধ্যে কথা বলে উঠেছে অতীত।

আমি দু' চোখ মেলে দেখলাম খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে নবম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশব্যাপী জৈন বৌদ্ধধর্মের লীলা চলেছে। হিউ-এন-সাঙ এ দেশের নাম উচ্চারণ করেছিলেন উ-ছা। অর্থাৎ উড়িষ্যা। ওড্রভূমি। তিনি দেখেছিলেন এ দেশের দিকে দিকে জৈন মন্দির, বৌদ্ধ স্তূপ, আর সংঘারাম। নগরে-গ্রামে, পাহাড়ে-পর্বতে-জঙ্গলে। কিন্তু হিন্দু মন্দির একটিও দেখতে পান নি। চীনা শ্রমণ তাঁর রোজনামচায় তাই লিপিবদ্ধ করেছেন।

হয় তো সত্যি। হয় তো সত্যি নয়। মনটা দোলে সংশয়ের দোলায়। আমার কোনো ধর্মের ভেক নেই। সব ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি। জৈন ধর্মের মধ্যে মুক্তির বাণী শুনেছি। বৌদ্ধ ধর্মের কাছে পেয়েছি অপরাজেয় আনন্দের সন্ধান। হিন্দুধর্মের কাছে মহৎ সাধনের মন্ত্র।

এই বিরাট দেশে চীনা শ্রমণ কোথাও হিন্দু মন্দির দেখতে পেলেন না, ভাবলে অবাক লাগে। কিংবা তাঁর চলার পথে চোখে পড়ে নি। ছিল হয় তো। নইলে ইতিহাসের উত্থান-পতনের মাঝখানে আবার হিন্দু ধর্ম এবং মন্দিরের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না।

কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নই। ইতিহাস বিচার আমার ধর্ম নয়। মন আমার কল্পনা করতে ভালোবাসে। কলিঙ্গে আত্মলগ্ন দেশ উড়িষ্যা। তার ইতিহাসে, প্রথম ভয়াবহ রক্তপাত ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে। নিরীহ নরনারীর রক্তে সেদিন স্নান করেছিলেন চণ্ডাশোক। রুদ্রাশোকের সৈন্যবাহিনী পুব সাগরের সৈকতে ঢেউ তুলেছিল উত্তাল রক্তের। আর সেই রক্তের মধ্যে ফুটেছিল একটি ফুল।

যে-দিগ্বিজয়ী শক্তির কাছে সকল শক্তি পরাভূত, যার ভয়ঙ্কর পদভারে ধরণী টলমল, যার দম্ভের আর কোনো শেষ নেই, অকস্মাৎ সেই নিষ্ঠুর হৃদয়ে ব্যথা করে উঠেছিল। দিগ্বিজয়ী সম্রাট তাঁর দু' হাত চোখের সামনে এনে দেখেছিলেন, রক্ত, রক্ত শুধু রক্ত। তাঁর কানে বাজছিল নির্দোষ নিরীহ নারী শিশুর কান্না। সম্রাট অন্ধকার ঘরের কোণে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে যেন কী বয়ে আসছে। হাত দিয়ে দেখলেন, তা জলের মতো। জিভে স্বাদ গ্রহণ করে দেখলেন, লবণাক্ত।

অনেক মানুষের চোখে সম্রাট সে জিনিস দেখেছিলেন। কিন্তু তার স্বরূপ জানতেন না। স্বাদ জানতেন না। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সাধারণ মানুষের মতো সম্রাটের চোখেও একই ধারা বয়। আর সেই ধারার উৎস, হৃদয়! সেই প্রথম ক্রুর কঠিন বজ্রনির্ভয় হৃদয় ফুলের মতো। পাপড়িতে তার অহিংসার লিখন। গন্ধে প্রেম।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে বুঝি দেশটাকে রক্তাভ বলে মনে হয়। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, প্রথম সূর্যের রৌদ্রতাপের রক্তাভা নয়। এ দেশের মাটিতে যেন এখনো দাগ লেগে রয়েছে রক্তের। তারপরে যে এসেছিলেন, প্রথম, দ্বিতীয়, নানা সংখ্যার কীর্তিবর্মনেরা, হর্ষবর্ধন আর পুলকেশীরা, রাষ্ট্রকূটের দাঁতিদুর্গা, জৈন রাজা অকালবর্ষ, চালুক্যদের

রাজরাজদেব, রক্তের ছাপকে কেউ আর পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি।

এই তো সেই দেশ, কালিদাসের রঘুবংশের কাব্যে যার কীর্তন হয়েছে। কলহন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিনীর গাঁথায় যার পরিচয়।

'কী? এত কি দেখছ?'

চমকে তাকিয়ে দেখলাম ছোট বউদি। লক্ষ্যই করি নি, কী এলাহি কাণ্ডটা চলেছে গোটা প্ল্যাটফরম জুড়ে। মানুষে মালে কুলিতে, তার সঙ্গে পাণ্ডাদের চিৎকারে চেঁচামেচিতে ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

রাত্রি জাগার ঈষৎ ক্লান্তি ছোট বউদির মুখে। কিন্তু কাল রাতের বেলায় যা দেখতে পাই নি, তাই দেখলাম সকালের আলোয়। ছোট বউদির দু' চোখের কূলে যেন এক সুগভীর নীল জলধারার স্তব্ধতা। তাকে আমি ব্যথা বলব কি না জানি নে। যদি বলি, তবে সেই ব্যথার মাঝে, চোখ দুটি যেন আনন্দ স্বরূপ।

বললাম, 'নতুন দেশ দেখছি ছোট বউদি।'

ছোট বউদি বললেন, 'দেখ। প্রাণভরে দেখ। কিন্তু একটা কথা বলব।'

ছোট বউদি আমাকে একবারও ভাই বলেন নি। উভয়ের ডাকাডাকির মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। বললাম, 'বলুন।'

'আগে বল, কতদিন থাকবে এখানে?'

'ঠিক নেই। হয় তো কালই চলে যেতে পারি। আবার এক মাসও থাকতে পারি।'

'কিন্তু তুমি যে নিরালা সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে এসেছ বলছিলে।'

বললাম, 'তাই তো। কিন্তু ছোট বউদি, নিরালায়ও যদি শান্তি না পাই?'

ছোট বউদি সহজভাবে বললেন, 'পাবে, আমি বলছি। সেই কথাই বলছিলাম। দেখ, হাহাকার আছে, তাকে কখনও বাড়তে দিতে নেই। ও তো আগুনের মতো কি না। যত বাড়াবে, তত পুড়বে। আমি তো তোমাকে কখনো, কোনোদিনের তরে দেখি নি। কাল দেখামাত্র টের পেলুম, হেসো না যেন, দেখলাম, ছেলেটাকে কালে খেয়েছে, বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই ছুটেছে পাগলের মতো। কেন, দুঃখকে এত বড় করে দেখছ কেন? ওর মুখের ওপর বসে, বুকের ওপর চেপে, প্রাণ খুলে হাস। যাও, সমুদ্রের ধারে গিয়ে, ওর সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে হাস।'

বলে ছোট বউদি হেসে উঠলেন। মনে হল, আমি পাখির মতো উড়ি, ডিগবাজী খাই শূন্যে। খিলখিল করে হাসি। কাকলী গাই গানে গানে।

বললাম, 'ছোট বউদি গল্পকে বিশ্বাস করি নে। বাস্তবকে করি। নইলে আপনার সঙ্গে দেখা হল কেমন করে। পরিচয় হল কেন?'

ছোট বউদি হাসলেন খিলখিল করে, যেন এক তরুণী। বললেন, 'হয়ে যায়। পথে পথে কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। মন যাদের মিলিয়ে দেয়, তাদের দেখাদেখি হবেই।'

হয় তো তাই। ছোট বউদি যদি বলতেন, গত জন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার জানাশোনা ছিল, তা হলেও অবাক হতাম না। জন্মান্তর মানি নে। ওটা তো কথার কথা। আসলে মনে মনে যাদের জানাজানি হয়, তারা আবহমান কাল ধরে মিলে এসেছে।

বললাম, 'ছোট বউদি, সে কথাই বলছিলাম যে, আপনি যে-কথা প্রকাশ করে বলতে পারলেন, আমার ভেতরে সেই কথাটাই গুমরে মরছে। আপনার মতো দুঃখের বুকে নিবিষ্ট হয়ে বসে তো আমি সব দেখি নি, তাই বলতে পারি নে।'

'না না, ও কি বলছ তুমি। আমি কিছু বলতে পারি নে, নিবিষ্ট হয়ে বসতেও পারি নি কোথাও আজ পর্যন্ত।'

বললাম, 'পেরেছেন ছোট বউদি। নইলে কি অমন করে বলতে পারতেন, দুঃখের বুকের ওপর বসে হাস। ছোট বউদি, সত্যি আমি হাসতে চাই। তাই এসেছি। সমুদ্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসব বলে এসেছি।'

ছোট বউদি বলে উঠলেন, 'রেণু মুখপুড়িকেও তো আমি সেই কথাই বলি।...'

বলতে বলতে থেমে গেলেন ছোট বউদি। মুখখানি যেন ছায়ায় ঢেকে গেল: চোখ সরিয়ে নিলেন আমার দিক থেকে। কেন? পাছে আমি কিছু জিজ্ঞেস করে বসি? করব না। আমি রেণুর যে রূপ দেখেছি, তাতে আর সেই রূপের ভিতরে উঁকি দিয়ে তার ভিতর দেখবার মন আমার নেই। সাহসও নেই।

বরং বললাম, 'ছোট বউদি, একটা কথা বলব?'

'বল।'

'রাত্রে আপনার চোখ দেখে বুঝেছিলাম, আমার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। তবু বলি, আপনাদের রেণুদেবীকে বলবেন, তাঁকে আমি ইচ্ছে করে বিরক্ত করি নি।'

ছোট বউদি বলে উঠলেন হেসে, 'আ রে দূর ছেলেটা। তুমি যা ভাবছ, ও তার কিছু ভেবেই বলে নি। তাই কি বলেছিস রেণু?'

রেণু! সাপ দেখার মতো প্রায় চমকে উঠলাম। ছি ছি। রেণু যে আমার দু'চার হাত পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। মরমে মরে গেলাম যেন।

কিন্তু তার কারণ ছিল না। রেণুকে দেখেই বুঝলাম, আমাদের দিকে তার চোখ নেই। মন নেই। বিস্রস্ত দলিত রেণুকে দেখে মনে হল, যেন পথ হারানো মেয়েটি একলা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বউদির কথায় ফিরে তাকাল। বলল, 'কী বলছ কাকীমা?'

ছোট বউদি বললেন, 'কিছু নয়।'

বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'ওসব ভেব না। আর দেবী-টেবী কেন বল বাপু। ওই তোমাদের ছেলেদের আজকালকার এক ফ্যাশান। দেবী বলো না।'

ছোট বউদির কথা বুঝি শেষ হয় নি তখনো। সেজদির বাহিনী এসে প্রবল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়লেন। শিবি, সেজদি, অবুদি। সঙ্গে পাণ্ডা ঠাকুর।

সেজদি বললেন, 'এই যে, তুমি আছ দেখছি।'

শিবি বললেন, 'আমি তো ভাবলাম, বাঙ্ক থেকে কাপড়টা খুলে আনতে ভুলে গেছ কি না।'

বললাম, 'ভুলি নি।'

অবুদি ইতিমধ্যে আরো পান ঠুসেছেন মুখে। চুলে কলপ দেন কি না, বুঝলাম না। এখন দিনের আলোয় ওঁর চুল দেখে অবাক হলাম। এমন রঙ বেরঙের চুল বোধহয় আর কখনো দেখি নি। শাদা কালো আর খানে খানে পিঙ্গল। ঢুলু ঢুলু হাসিটি ঠিক আছে। প্রায় আমার গায়ের ওপর এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কিন্তু চোখ দুখানি তোমার ভাই একটু ভুলো ভুলো।'

শিবি বলে উঠলেন, 'আমাদের অবলা ঠাকরুণের মতো অত নয়।'

এবং আশ্চর্য! অবলা ওরফে অবু ঠাকরুণ যেন সত্যি প্রশংসায় লজ্জাবতী লতাটির মতো লতিয়ে উঠলেন, সানুনাসিক গলায় আদুরে ঢংএ বললেন, 'দেখছ তো ভাই, কী রকম ঠাট্টা করছে।'

সেজদি ধমকে উঠলেন, 'আচ্ছা খুব হয়েছে। এখন যাবি, না কী?'

শিবি সামনের পাকা চুলের গুচ্ছ উড়িয়ে আমার কাঁধে এক চাপড় মেরেই বসলেন। নাম ধরে ডেকে বললেন, 'চলি হে ভাই। কোথায় থাকবে তুমি বললে না তো?'

অবসরই পাচ্ছিলাম না কিছু বলার। জবাব দিতে গিয়ে ছোট বউদির দিকে তাকালাম। ছোট বউদি বললেন, 'যেখানেই থাক, সমুদ্রের ধারে বিকেলে দেখা হবেই।

কী বল ?'

'হ্যাঁ।'

মনে মনে বললাম, কিন্তু যেন না হয়। ছোট বউদি ছাড়া আর কারুর সাক্ষাৎ চাই নে। এই সামান্য সময়ের আলাপে, এটুকু অনুমান করেছি, লোক হিসেবে এঁরা কেউ-ই মন্দ নন। রকমফেরে আমাদেরই কাকীমা মাসীমাদের তুল্য। কিন্তু আজ আমার নির্জনতার, আমার একলা হবার অয়ন চলনের সীমায় ওঁদের সরিয়ে রাখতে চাই। ওঁদের স্নেহ-প্রীতির বেষ্টনীর বাইরে আমি থাকতে চাই। কিন্তু ছোট বউদিকে খুঁজেছি, আমার নিরালার সঙ্গে তাঁর বিশেষ জানাজানি। তিনি নির্জনের ঝিল্লিস্বর। অন্ধকারের বুকে যে অন্ধকার তরঙ্গ রেখায় চিকচিক করে তিনি তাই। তাঁর কাছ থেকে আমার দূরে যাবার কিছু নেই।

মনে হল কে যেন আমার কাঁধে হাত দিল। কিন্তু খেয়াল করলাম না। সকলের 'চলি ভাই, আবার দেখা হবে' মিলিত গলার বিদায় বাণী শুনছিলাম। নিজেও অগ্রসর হচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে একবার রেণু ফিরে তাকিয়ে দেখল। বোধহয় তার ভদ্রতায় আটকাচ্ছিল, তাই। ওঁরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একবার জিজ্ঞেস করা হল না, রথযাত্রা ঝুলনযাত্রা দোল রাস অক্ষয় তৃতীয়া, কোনো পালা পার্বণই এখন নেই। এই অসময়ে ওঁরা কেন এদেশে।

তখন কাঁধের ধাক্কা বেড়েছে, 'অ বাবু, বাবু!'

'কে ?'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মাথায় একখানি সুবৃহৎ শিখা। কপালে তিলক। খালি গায়ের নানান্ খানে হরি নামের ছাপ। এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। চিনতে পারলাম না।

আমি চলতে চলতেই ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছেন ?'

'বাবু আপনাকে জগন্নাথো দর্শন করাব আমি, বাবু। আপনার তো কোনো পাণ্ডা নাই, না ?'

পাণ্ডা ? অনেক শুনেছি এদের নামে। বিশেষ পুরীর পাণ্ডাদের সম্পর্কে! মন্দিরের প্রহরী। এমন কি দেবতার শয়ন ঘরের দ্বারী। চড়া টেণ্ডারের দাম চুকিয়ে, স্বর্গের কণ্ট্রাক্টর। কিন্তু একে আমি কেমন করে বোঝাব, মন্দিরের দেবতাকে আমি দেখতে আসি নি। তাঁর শয়ন ভোজন, প্রত্যহের ক্রিয়াকলাপ দেখব, সে যোগ্যতা আমার নেই। পুণ্যবানদের জন্যে যে-স্বর্গ সাজানো রয়েছে কোনো এক অজানা রাজ্যে, সেখানকার কথা আমি ভাববার অবকাশ পাই নি। জানতেও চাই নে। এ আমার অহঙ্কার নয়। এইটুকু বুঝেছি জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে, লক্ষ কোটির লীলায়, আমি মহাকালের ঋণ মিটিয়ে যাব। না মেটালে, মিটিয়ে নেওয়া হবে। আজ যে আমার এখানে আসা, এ সেই ঋণ মেটাবারই পালা। হেসে-কেঁদে, প্রেমে-বিদ্বেষে, প্রীতি-মাৎসর্যে, আমার মকর থেকে কর্কট ক্রান্তির অয়নান্ত হবে। আমি তার বাইরে যাব, সে মহত্ত্ব নেই। এই মর্ত্যে আমি ধূলি হব, এই ধ্রুব বলে জানি। স্বর্গ নরক থাকুক আমার অচেনা। এই মর্ত্যে আমি মানুষ, সেই আমার পরিচয়। জীব জগতের ঊর্ধ্বে যাঁরা নিজেদের বিচরণশীল বলে মনে করছেন, সেই অমরাবতীতে আমার সাধ নেই।

কিন্তু তা বললে কি চলে ? কোন্ কঠিন জায়গায় পড়েছি, আমার মতো বাছাধনের তখনও সে খেয়াল হয় নি। খুবই শাদা ভাবে, নরম করে বললাম, 'আজ্ঞে আমার দরকার নেই।'

ভারী অমায়িক হেসে পাণ্ডা বললে, 'তা বললে কি চলে বাবু ? দরকার থাকতে হবে।'

তখন প্ল্যাটফরমের বাইরে এসেছি। বললাম, 'আপনি বললে তো হবে না,

আমার দরকার নেই।'

কিন্তু কথা শেষ হল না। দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন এসে ঘিরে ধরল।

'কী নাম বাবু আপনার?'

'আপনার বাবার নাম কী? ঠাকুর্দার নাম?'

'বাড়ি কোথায়? কোন্ জেলা? গ্রামে না শহরে?'

এ কি ব্যাপার! কেউ খাতা খুলছে, কেউ গায়ের উপর এসে পড়ছে। কাকে জবাব দেব, বুঝলাম না। আর এ ব্যূহ থেকে কেমন করে বেরুতে হয় সে কৌশলও শিখি নি। বাধ্য হয়ে প্রায় ঠেলে বেরুবার চেষ্টা করতে হল। বললাম, 'যেতে দিন, আমার পাণ্ডার দরকার নেই আমি বেড়াতে এসেছি।'

'তা বললে হয়? তুমি হিন্দুর ছেলে নও, না কী?'

রীতিমতো আক্রমণ! জেদের বসে যে বলব, 'না নই' তারও উপায় নেই। তা হলে বোধহয় এখান থেকেই ফিরতে হবে। বললাম, 'জগন্নাথ আমি একলাই দর্শন করব।'

'তাই কি আবার হয়?'

'তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দিবে না।'

'বাবা ঠাকুর্দার নাম বলতে লাগবে তোমাকে। কাহিঁ কি বলিবু না?'

কী দুর্দৈব! অদূরেই পাদুকাহীন প্রহরী। সে তাম্বুল চর্বনে রত। আর নির্বিকার চোখে এদিকে তাকিয়ে। এটা যে একটা ব্যাপার, তা তাকে দেখে বোঝবার যো নেই।

সাড়ম্বরে বাপ ঠাকুর্দার নাম বললাম। অমনি আঙুলে জিভের থুথু লাগালো, আর খাতার পাতার খসখসানি। কিন্তু কেউ কিছু খুঁজে পেল না। একটা বুড়ো এলো এগিয়ে। বোজা মুখ থেকেই দেখছি তার হস্তীদন্ত বেরিয়ে পড়েছে। সে চিৎকার করে বলল, 'তুণহু অ!'

মানে বুঝলাম না। নতুন কোনো আক্রমণের ইঙ্গিত কি না কে জানে। কিন্তু দেখলাম, সবাই চুপ করে গেল। বুড়ো বলল, 'বাবু, আর কখনো এসেছ?'

'না।'

'তবে? পাণ্ডা ছাড়া জগরনাথ দর্শন হয় না। তা তুমি যদি না চাও, তো যাও। কোথায় থাকবে?'

বললাম, 'তাও আমার জানা নেই।'

বলে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে, বুড়োর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারলাম না। যদিও মানুষের অমন দাঁত আমি দেখি নি। প্রথমেই একটা রিক্‌শায় এসে উঠলাম। বললাম, 'শহরে নিয়ে চল।'

রিক্‌শাওয়ালাটা সবে চলতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ আর একজন এসে উঠে পড়ল রিক্‌শায়। প্রায় আমাকে ঠেলেই বসে পড়ল পাশে। তাকিয়ে দেখি সেই বুড়ো। আর এবার মুখ বুজে নয়, পূর্ণ বিকশিত। চোখ দেখে বুঝলাম, ওটা হাসি। কিন্তু ব্যাপার কী? রিক্‌শা তো আমি একলা ভাড়া করেছি। শেয়ারে নয় যে আর একজন উঠে পড়বে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি উঠলেন যে?'

'বাবু বুড়ো মানুষ, হেঁটে হেঁটে যাব? তুমি যাচ্ছ, তাই উঠে পড়লাম।'

বলে, ভুরুর তলায় চোখ ঢেকে, মাথাটি নামিয়ে বসে রইল। কী বলা যায় এর পরে? হাসব না রাগ করব, ভেবে পেলাম না। দেখছি, রিক্‌শাওয়ালাটাও তেমনি। নির্বিকার চালিয়ে চলেছে। একটি কথাও বললে না। হয়তো এ দেশের আচার এমনি। তার চেয়ে নীরবে নতুন দেশ দেখি।

কিন্তু তার আগেই ঘড়ঘড়ে গলার প্রশ্ন, 'বাবু তুমি কোথা থাকবে?'

বললাম, 'জানি নে।'

বুড়ো তার হাতীর মতো কয়েকটি হলদে দাঁতের হাসি দেখিয়ে বলল, 'সেই কথা তো বলছি, কখনো আস নাই, কিছু জানো না, নতুন দেশ। জগরনাথ দরশন কর না কর, খাওয়া-পেয়া করতে হবে। থাকতে হবে, সে ব্যবস্থা চাই তো?'

কথাগুলি মন্দ লাগল না শুনতে। এই কথাগুলিই দশজনে মিলে, ফ্যাচাখেউ করে ধরলে, তিক্ত মনে হত। এখন বুড়োর ঘড়ঘড়ে গলায়, টানা টানা সুরে কথাগুলি আমার মর্মে প্রবেশ করল। জিজ্ঞেস করলাম, 'সমুদ্র কোন্ দিকে?'

'সে বাবু আলাদা রাস্তা। তুমি তো শহরের দিকে যাচ্ছ, জগরনাথের মন্দিরের কাছে।'

তা বটে। রিক্‌শাওয়ালাকে আমি শহরেই যেতে বলেছি। কিন্তু শহরের এ পথ যেন আমার অনেকদিনের অস্পষ্ট জানাজানির রূপ ধরে দেখা দিল। আমার ছেলেবেলায় ঢাকা শহরকে যেন আমি এমনি দেখেছিলাম। শুধু এখানে সিঁড়িতে বারান্দায় পাথরের ব্যবহার বেশী। প্রত্যেকটা বাড়ির ভিত অনেকটা উঁচু।

বুড়ো আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'বাবু।'

'হ্যাঁ।'

'আগে একটা থাকবার জায়গা কর।'

চিন্তাটা ফিরে এল আবার। কিন্তু নতুন দেশ, কিছু জানি নে। একটা আশ্রয় চাই। পরিব্রাজক নই যে, যেখানে হোক পড়ে থাকব। তার দায়িত্ব অনেক। যত্র আহার তত্র শয়ন, সে আমার নয়। মানুষ থাক, না থাক, মানুষের আশ্রয়ে যেতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'হোটেল নিশ্চয় আছে?'

বুড়ো বলল টেনে টেনে, 'আছে। তবে—'

সে আমার পিঠে হাত দিল। ভ্রূর তলা থেকে চোখ দুটি বার করে বলল, 'বাবু, আমার কথা শোন। হোটরে তোমাকে খারাপ খেতে দিবে, আর অনেক টংকা নিবে। তুমি ধরমশালাতে থাক গিয়া, হাঁ? আর আমার ঘরে খাওয়া-পেয়া কর। আমি ব্রাহ্মন্ পন্ডা অছি, সব শুদ্ধ পাবে। কাহিঁ কি মিছামিছি হোটরে খেতে যাবে?'

স্বীকার করতে হবে, বুড়োর কথাগুলি ভালো শোনাচ্ছে। এবং যুক্তযথ। আর আমার পিঠে তার হাতটা এখনো রয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম, বুড়োর দুটি গলা-গলা চোখে হাসি, কিন্তু যেন এক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। তবে, ওই দাঁত কটি যত গোলমাল করেছে। কথা বলতে গিয়েও যেন ওই জন্যেই থমকে গেলাম।

বুড়ো তাড়াতাড়ি আঙুলের কর গুণে বলল, 'হোটরে তোমাকে দুটো ব্যঞ্জন দিবে আর ডাল। পাঁচসিকা নিবে।'

সহসা যেন মনে পড়েছে আমার, এমনিভাবে তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিন্তু আমি তো মাছ খাই?'

'খিবে। খিবে বাবু, আমার বাড়িতে মাছ খিবে। বংগালী মাছ ছাড়া খায় না আমি জানি।'

আবার আমার সেই মন কথা বলছে। যাকে আমি, ছাড়ালে না ছাড়ে। বললাম, 'আপনি কত করে নেবেন?'

'বারো আনা করে দিও বাবু। দুবেলায় দেড় টংকা।'

আপত্তি করার কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। দর্শন-পুণ্য চাই বা না চাই, পেট তো আছেই। উনিও যে মহাকালেরই এক অঙ্গ। একা উনিই অনেক রঙ্গ করেছেন ইতিহাসে। অতএব সাব্যস্ত করলাম। বললাম, 'বেশ তাই হবে।'

বলে সামনের দিকে তাকিয়ে, নতুন ছবি দেখলাম। আমার মনের রূপ বদলে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

'জগরনাথের মন্দির বাবু।'

জগন্নাথের মন্দির। মন্দির আমি দেখতে আসি নি। দেবতা আবিষ্কারের মহৎ ভাবনা নেই আমার। তবু এই দৃশ্যপট যেন আমার বহুকালের মুগ্ধতার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করে দিল। শহরের দু'পাশের ইমারতের মাঝখান দিয়ে, আকাশ জোড়া মেঘের বুকে, ভারতবর্ষের কী বিচিত্র রূপ যেন আমি দেখলাম! এ আমার সংস্কার কি না, তা আমি জানি নে। কিন্তু আমার দ' চোখ ভরে গেল। আমি দেখলাম, সেই বিচিত্র ছাঁদ, মন্দিরের মাথায় পতাকা উড়ছে পত পত করে। আমার মন ভরে গেল, আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারব না।

কেবল মনে হল, এই তো আমি! এই তো আমার দেশ! এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে নাকো খুঁজে। সে যে আমার ভারতবর্ষ! এই তো আমার পরিচয়। এখান থেকেই যাত্রা আমার আধুনিকতার পথে। আমার যাত্রা লোকসভায়, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারখানায়, ইস্পাতের অগ্নিকুণ্ড ফার্নেসে। ওই পটে না দেখলে আমায় চিনবে না। কোনো তুলির অংকনে আমায় মানাবে না। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

মেঘ অম্বরে এই যে গম্ভীর বিচিত্র ছন্দ ধাপে ধাপে আপনাকে যেন বক্রতায় নত করেছে শীর্ষে, এর সঙ্গে আমার মন ও শোণিতের সম্পর্ক। এর অভ্যন্তরে যে দেবতারূপে অধিষ্ঠিত, সে আমার চিন্তার জটিলতা।...

হঠাৎ রিক্‌শা দাঁড়াল। একটা বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছে। উঁচু বারান্দায় দেখা যায় ভিতরে যাবার দরজা খোলা। দরজার দু'পাশে অর্বাচীন হাতের দুটি ছোট ছোট মূর্তি দেয়ালে গাঁথা। পোড়া মাটির কিংবা চুন-পাথরের হবে। দরজার মাথায় একটি কুলুঙ্গি, তাতে একটি গণেশ মূর্তি।

বুড়ো বলল, 'বাবু, এইটা আমার ঘরবাড়ি। বুঝলে কি না? ধরমশালায় গিয়ে ওঠ, নাওয়া-ধোয়া কর, দু'পহরে খেতে আসবে। বাড়ি চিনে রাখ।'

বাড়িটির অভ্যন্তরে তাকালাম খোলা দরজা দিয়ে। কিছু দেখা যায় না। অন্ধকার সুড়ঙ্গ বলে মনে হল। অচেনাকেই যত ভয়। কিন্তু আমার কী ভয় থাকতে পারে! চিনে নেবারও খুব অসুবিধে হবে না। বললাম, 'আচ্ছা, তাই আসব।'

কিন্তু বুড়ো রিক্‌শা থেকে নামল না। বলল, 'বাবু, দেড়টা টংকা দাও।'

অমনি আমার ভিতরটা গুটিয়ে গেল কেন্নোর মতো। কেন? খাবার আগে পয়সা, এ যে নিয়ম বিরুদ্ধ দাবী।

আবার গায়ে হাত।—'কনো ভয় নাই সোনাবাবু, তোমার পয়সা নিয়ে পালাব না। তোমার জন্য কিছু বাজার করতে হবে তো। আমার ঘরে কি তোমার খাবার ব্যবস্থা থাকে?'

বুড়োর চোখের দিকে তাকিয়ে 'না' বলা দুষ্কর! কেবল এই হলদে আইভরি—। যাক সে কথা। দেড়টি টাকা চুকিয়ে দিলাম বুড়োকে।

ঘাড় নেড়ে নেড়ে বুড়ো বললে, কনো ভয় নাই বাবু। তুমাদিগে নিয়া চলতে হয়, ফাঁকি পাবে না। বলে বুড়ো নামল। কিন্তু আমার চক্ষু স্থির। সর্বনাশ। বুড়োর ডান পা খানি যে সত্যি হস্তীর। এতক্ষণ দেখতে পাই নি। এ যে বিশাল গোদ। হায়, এখন আর কিছু করার নেই। বুড়ো কী যেন বলে দিল রিক্‌শাওয়ালাকে। সে এগিয়ে চলল। মনটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল।

মন্দিরের পাশ দিয়ে রিক্‌শা এগিয়ে গেল। একটি মস্ত বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে

বললাম, 'এইটা ধরমশালা বাবু।'

পয়সা চুকিয়ে নেমে গেলাম পুঁটলি হাতে নিয়ে। ধর্মশালায় ঢুকেই অফিস ঘর। মধ্যবয়স্ক এক উত্তরভারত কিংবা মারোয়াড়ের ভদ্রলোক বসে। হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই আপনার?'

বললাম, 'ধর্মশালায় একটু আশ্রয়।'

ভদ্রলোক চোখ তুলে একবার দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

'আর তো কেউ নেই।'

'একা?'

'আজ্ঞে।'

'হবে না।'

'হবে না?'

'না বাবুজী। নওজোয়ান একা যাত্রীকে থাকতে দেবার হুকুম নেই আমাদের। এখানে সব বালবাচ্চা অওরৎ নিয়ে আসে। আপনাকে তো সেখানে থাকতে দিতে পারি না।'

ভদ্রলোকের ফর্সা মুখখানিতে দৃঢ় হাসি। মনে হল, আমি যেন অগাধ জলে পড়েছি। কেন, জিজ্ঞেস করব, সে সাহস হল না। কেন না, ইঙ্গিত বড় সুবিধের নয়। 'একা নওজোয়ান' এর চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে জায়গা কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো?'

আমার হিন্দি শুনে ভদ্রলোক বাংলায় বললেন, 'ঔর অনেক ধরমশালা আছে, বোলে দেখেন না। এই রাস্তার উপরেই বহুত ধরমশালা আছে।'

নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু পিছনে একটা খোঁচা লাগছে যেন। ভদ্রলোক নিশ্চয় তাকিয়ে আছেন। চোখে তাঁর সন্দেহ, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। কী করব, উপায় নেই। দেখলাম, আর একটা ধর্মশালা। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম। প্রায় একই রকম অফিস ঘর। কিন্তু লোক নেই। আস্তে আস্তে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করব মনে করছি।

ঘরের এক কোণ থেকে প্রশ্ন এল, 'কেয়া মাংতা?'

দেখলাম, ঘরের এক কোণে খাটিয়ার বিছানায় শায়িত এক মস্ত গোঁফওয়ালা।

'ধর্মশালায় ঘর আছে?'

'আছে। ক' আদমি?'

সর্বনাশ! মনে হল থানায় এসেছি কোনো অপরাধ করে। বললাম, 'একজন।'

গোঁফজোড়া খাড়া হল কিনা ঠাহর করতে পারলাম না। কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। —'হোগা নেহি। এক আদমিকে রহনেকে লিয়ে ঘর নহী হ্যায়। দুসরা দেখিয়ে।'

বিদায় নমস্কারটা করবারও সুযোগ পেলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। এ কি বিপদ! এখন কি তবে এই পুরী শহর ঘুরে একটা সঙ্গী যোগাড় করতে হবে নাকি! তাও, সঙ্গী হলে হবে না। কথার ভাবে মনে হচ্ছে, সঙ্গিনী চাই।

আবার অগ্রসর। দোকান পসারের দিকে তাকিয়ে দেখব, সে মন নেই। এ যে বড় কঠিন ঠাঁই বলে মনে হচ্ছে। অথচ চিরদিন শুনে এসেছি, তীর্থক্ষেত্রে ঠাঁইয়ের অভাব হয় না।

আর একটা ধর্মশালায় এসে উঠলাম। এবার যার মুখোমুখী হলাম, তিনি প্রায় বৃদ্ধ। আরো হতাশ হলাম। কুঞ্চিত ভ্রূ এবং উন্নাসিক বক্ররেখায় একটি নিষ্ঠুর সুদখোরের মতো মনে হল। চুপচাপ বসে একটি বই পড়ছেন। ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

কিন্তু বড় দায়ে পড়েছি।

আস্তে আস্তে কাছে গেলাম।

চোখ দুটি তীরের মতো এসে বিঁধল। সপ্রশ্ন সেই চোখে যেন প্রথমেই পড়তে পেলাম, অওরৎ লোক হ্যায়? এক্‌লি নওজোয়ানকে—

'কী চান আপনি?'

জিজ্ঞাসাটা হিন্দীতেই শুনলাম। প্রথমেই বললাম, 'দেখুন, আমি একলা। ধর্মশালায়—'

'বৈজু!'

আমার কথার মাঝখানেই বৃদ্ধ হাঁকলেন। আমার বুকের মধ্যে চমকে উঠল। লোকে এখনো ভদ্রলোকের ছেলে বলে জানে। শেষে ধর্মশালার দরোয়ানের হাতে বে-ইজ্জৎ হব?

বৈজু উপস্থিত হল।—'জী!'

কিন্তু বৈজুকে খুব একটা ষণ্ডামার্কা মনে হল না। হাতেও যষ্টি নেই! বৃদ্ধ বললেন, 'সিঁড়ির নীচের ঘরে থাকতে পারবেন?'

অবাক হবার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'পারব।'

'বৈজু, বাবুকে বাগানের দিকে সিঁড়িঘরটা খুলে দাও। আর হ্যাঁ, এখানে খেতে পাবেন না। রাত্রি দশটার পর আমাদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বৈজু, বাবুকে নিও যাও।'

বৈজু বললে, 'আইয়ে।'

সব যেন এক মুহূর্তে ঘটে গেল। কিছু বলাবলির অবকাশ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অবাক হয়ে যে খুশি হব, সে সময়ও নেই। আর, এই লোকটাকেই আমি মনে করলাম, উন্নাসিক, নিষ্ঠুর, এমন কি সুদখোর। হায় আমার লোকচরিত্রের জ্ঞান। মুখে রঙ মাখা, সঙ সাজা বহুরূপীদের কৌতূহলী হয়ে দেখি। আর বাস্তবে যে কত বহুরূপী আশেপাশে রয়েছে, তাকিয়ে দেখি নে। চিনতেও পারি নে। মানুষের মতো বহুরূপী কে আছে?

বৈজু আমাকে নিয়ে চলল উঠোন দিয়ে। যে-উঠোনের চারপাশেই ঘর। উঠোনটার সর্বত্র ভেজা কাপড় মেলে দেওয়া হয়েছে। লোকজনের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে আশেপাশের ঘরে। কোন্ ঘরে যেন খঞ্জনী বাজছে। অস্পষ্ট ঘুম জড়ানো শব্দ আসছে, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...।

বৈজু একটা দরজা দিয়ে বাগানে নিয়ে গেল। তবু ভালো। ওই দমবন্ধ উঠোনের ঘরের থেকে, এই টগর করবী গন্ধরাজ যুঁই-ঝাড়, মানকচুর ভিড়ও অনেক ভালো। বৈজু তার কোমরের চাবির থলি বার করে, একটি ঘরের দরজা খুলে দিল। ঘর দেখে কেমন যেন দমে গেলাম। ঘর কই? প্রায় একটা সুড়ঙ্গ। ভিতরে দাঁড়ানো যাবে না। টগর করবী গন্ধরাজ যুঁই-এর আনন্দের সঙ্গে একে ঠিক মেলাতে পারলাম না। জানালা তো এ ঘরে অসম্ভব। দরজা বন্ধ করলে তো শ্বাসরোধ হবে।

তবু আশ্রয়! এ শহরের অন্ধি সন্ধি না-জানা পর্যন্ত এই ডেরাই ডেরা। বৈজু বললে একদিকে আঙুল দেখিয়ে, 'হুঁয়া কল কুয়া পায়খানা হ্যায়। আপকো তালা চাবি হ্যায়?'

'না তো?'

'তবে ভাড়া করে আনবেন। যখন বাইরে যাবেন, লাগিয়ে যাবেন। আর আপনার বিস্তারাঁ?'

বিছানা? তাই তো! বৈজু আমাকে দেখল যেন, একটি উৎকৃষ্ট উদ্ধবকে দেখছে। যাত্রী সে অনেক দেখেছে। কিন্তু এ রকমটা বোধহয় দেখে নি। বলল, 'ধরমশালাকো

সামনে সব চীজ ভাড়া মিলেগা। মগর বিস্তারাঁ নহী।'

বলে সে চলে গেল। আবার যেন অগাধ জলে পড়লাম। ঘরের দরজায় বসলাম চুপ করে। কী করব এখন?

কিছু না! কে যেন আমার ভিতর থেকে বলে উঠল। যা ভেবে আসি নি, গালে হাত দিয়ে তা ভাবতে বসব না। আমি যার কাছে এসেছি, তার কাছে আমার সব, আমার সব রইল বাইরে পড়ে। ধর্মশালার দরজায় বসে আমি সেই ঘেরাটোপের সীমায় ঘুরছি। আমার ডাকের শঙ্খ থামল না। আমি গালে হাত দিয়ে বসে আছি। কেন? আমার অভ্যাস আমাকে ছাড়বে না? আমার প্রত্যহ আমাকে দুশ্চিন্তার অন্ধকারে গুঁজে দেবে? কেন?

তবে আমাকে অপ্রত্যহে কে ডাকলে? স্বভাবের বাইরে? আমার দুঃখের বুকে কে মহাদিগন্ত জুড়ে হাসছে? আমি তার সঙ্গে যে হাসতে যাব। নিশান ওড়ানো ওই মন্দিরকে দেখব যে আকাশের পটে। সে আমাকে দেবে বহুকালের অতীত মনের ঠিকানা। মহাকালের আলখাল্লায় আঁকা রয়েছে সে। সে আলখাল্লায় আমি লগ্ন হব মগ্ন হব। কালাকালের ঊর্ধ্বে যাব নতুন মনের ঠিকানায়। তাই যে আমার আসা।

ও-সব আর ভাবব না। যা হবার তা হোক। যা পাওয়া যায়, যাবে। পথের শিক্ষা পথেই হোক। কী ধন আমার আছে! যা হারাবার ভয়ে করব পুতুপুতু? এই দেহ? যা আমার সাধ্যে আছে, তাইতে সে কুলোবে। তাকে দুঃখ দিতে চাই নে। না কুলোলে, কে তাকে রক্ষা করতে পারে?

ভেজা জামা কাপড় আর পত্রিকার পুঁটলি রেখে, বাইরে গেলাম। সত্যি! তীর্থক্ষেত্রের মতো জায়গা নেই। তালা চাবি ভাড়া করলাম। তেলের শিশি কিনলাম। দোকানদার বলল, 'বাবু, থালা বাসন উনুন বালতি সব ভাড়া পাওয়া যায়। কয়লা ঘুঁটে যা চান, সব সব পাবেন।'

হেসে বললাম, 'কিন্তু রাঁধবে কে?'

'তাও লোক পাবেন। ঠাকুর বলেন ঠাকুর, মেয়েলোক বলেন, তাও। পয়সায় বাবু সব হয়।'

মনে মনে ভাবলাম, জগন্নাথকেও পাওয়া যায় বোধ হয়। কিন্তু অত-তে আমার দরকার নেই। আপাতত একটি ছোট গামছা কিনে ফিরে আসতে গেলাম। মনে পড়ল, বিছানা! ঘুরে ঘুরে দুটি খবরের কাগজ কিনলাম। বিংশ শতাব্দীর এই কালে, খবরের কাগজ থাকতে আবার বিছিয়ে বসার ভাবনা। এবার সিঁড়ির নীচের সুড়ং-এর দরজার সামনে এসে মন খারাপ হল না। চটকলের বস্তি কি এর চেয়ে ভালো? সেখানে এমনি একটি সুড়ং-এ কয়েকজনকে দলা পাকিয়ে দিনযাপন করতে দেখেছি। এই উড়িষ্যারই দরিদ্র অধিবাসীদের আমার নিজের প্রদেশে দেখেছি এমনি ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে। তাও, যে সারারাত্রি কাৎ হয়ে শোবে, তার ভাড়া মাসে বারো আনা। চিৎ হয়ে শুয়ে বেশী জায়গা নিলে, এক টাকা।

তার প্রাণের দায়। আর আমার? আমারও তাই। শখের ভ্রমণ যে করে সে করে। তার সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। আমি ছুটি প্রাণের দায়ে। কাল অকাল ঠাঁই অঠাঁইয়ের গণ্ডী আমার নেই।

ফ্যাসাদ হল কুয়োতলায় গিয়ে। সেখানে এমন কিছু ভিড় নয়। কিন্তু যা আছে, তাতেই অনেক দেখলাম, মাথায় জটা এক গেরুয়াধারিণী চাতালে বসে। আর এক গেরুয়াধারিণী ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে। আর এক গেরুয়াধারী বাবাজী কপিকলের দড়িতে টেনে টেনে জল তুলছে। আবার গুনগুন করে গান চলেছে তার মধ্যেই,

ও রাই, আগে পিছে দেখিস ফিরে
পড়িস নে কাল্ সাপের ফেরে...।

মনে হল, যে ঝামা ঘষে দিচ্ছে গুনগুনানিটা তার গলায়। তার চুল খোলা। স্বাস্থ্যবতী শ্যাম দেহে জামা নেই। গেরুয়া কাপড়ে কোনো পাড় নেই। বয়স বোধ করি ত্রিশের মধ্যেই। যার পা ঘষা হচ্ছে, তার বর্ণে একটা তাম্রাভা। যেন সুগৌরী ঘুরে ঘুরে পুড়ে পুড়ে, রোদ্র জল ধুলোর পালিশে বুরুশ করা। শুধু তার মাথাতেই জটা। তার গায়েও জামা নেই। স্বাস্থ্য দেখে বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য। চল্লিশ পঞ্চাশ হতে প্যারে। পঁচিশ হওয়াও কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। আকর্ণবিস্তৃত চোখের কথা শুনেছি। তখনো দেখি নি। জটাধারিণীকে দেখে মনে হল, তার চোখ বুঝি তাই। পুষ্ট হাত দুটি মৃণালভুজ নয়। রীতিমতো শক্তিতে দীপ্ত পুষ্ট। একটি পাথুরে ঔদ্ধত্য তার দেহে। চোখ ঈষৎ লাল, কিন্তু তীরের মতো তীক্ষ্ন দৃষ্টি। একবারের বেশী চোখ তুলে তাকানো যায় না। গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা। ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি। বোধহয় গান শুনে।

গেরুয়াধারী যে কালো পুরুষটি জল তুলছে, তার দড়ির টানে দেখছি গানের তাল লেগেছে। মাথায় বেশ তৈলাক্ত আঁচড়ানো লম্বা চুল চুড়ো করা। বয়স বোধ হয় মাঝামাঝি। প্রায় যেন একটি গানের আসর। আমাকে কেউ ফিরে দেখল না। কেবল জটাধারিণী ছাড়া।

ভাবলাম, বোধ হয় ভুল করেছি। এ বোধ হয়, মহিলাদের কুয়োতলা। অন্যদিকে হাঁটা ধরলাম। এদিক ওদিক ঘুরলাম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। ফিরে আবার সেইখানে। গানের কলি তখন বদলেছে,

ও রাই, ও মহাসর্প সবার দর্প হরে
তুই পথ চলিস দেখে ঝাড় ফোড়ে।

পুরুষটি বালতিতে টান দিয়ে সুর করে বলে উঠল, 'ও রাই, রাইলো।'...

জটাধারিণীর ভাঙা ভাঙা গলা শুনলাম, 'অই বাবা, চামড়া তুলে ফেলবি নাকি গো? নে, এবার ছাড় বাপু।'

আর একবার সেই আকর্ণবিস্তৃত রক্তিম চক্ষু আমাকে বিদ্ধ করল। আবার বলল, 'দ্যাখ সব লোকজনরা এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তুই আমার পা ঘষছিস।'

শ্যামাঙ্গিনীর মুখ পিছন ফেরানো ছিল। ফিরে তাকাল। বোঁচা নাক, দীর্ঘ-পক্ষছায় চক্ষু। গানের সঙ্গে হাসির রেশ মুখে ছড়ানো। কপালে অস্পষ্ট একটি বাসি রসকলির ছাপ। অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল, 'চান করবেন বাবু?'

সঙ্কোচটা আমারই হল। বললাম, 'থাক না হয়, একটু পরেই করব।'

বলল, 'কেন বাবু, করে নিন না। খেপী মাকে, আজ ধোয়াবার হুকুম পেয়েছি। আজ আমাদের একটু দেরী হবে।'

বলে হাসল শাদা ঝকঝকে দাঁতের ঝলকে। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে নয়। যে জল তুলছিল সেই পুরুষটির দিকে তাকিয়ে। গেরুয়া বসন একটু দূর করেছে। নইলে এ যেন ঘরে ঘাটে দেখা আমাদের চেনা বউটি। কিন্তু খেপী মা? সে আবার কি? সব মিলিয়ে পরিবেশে একটু ভিন্ ভাবের রঙ। যেন এই জগতের এ কালের ছোঁয়া লাগে নি। জগৎ কালের বাইরে যেন আপন রসে এরা ভাসো ভাসো। ভাবতে গেলে জিজ্ঞেস করতে হয়, এরা খায় কি, করে কি? কত ধানে কত চাল, খবর রাখে না বুঝি এরা?

কিন্তু এহ বাহ্য। ভারতবর্ষের পথে পথে যে ঘুরেছে, এদের দেখা সে-ই বোধ হয় পায়। গেরুয়া-জটা-গান, এ দেশের কোথায় নেই। প্রশ্ন করে লাভ নেই। কিন্তু

শ্যামাঙ্গিনীর হাসিটি লাগল বড় ভালো। ছোট জগতে বাস। বেশী কিছু তো দেখি নি। তাই মনটা কেমন রঙীন হয়ে গেল। অমন হাসি একজনের দিকে একজনেই হাসতে পারে সংসারে।

এমন পরিবেশে কোনোদিন স্নান করি নি। না-ই করেছি। আজ করব। কুয়োর পাশেই জল কল। গিয়ে কল ঘোরালাম।

পুরুষটি বলে উঠল, 'ও বাবু উনি কান মোচড়ালেও রা করেন না। আজ বাবু তিন দিন ধরে আছি। টের পেলাম না উনি কখন ঢালেন, কখন শুকোন।'

খেপী নামধারিণী বলে উঠল, 'বা কালাচাঁদ, বেশ বলেছ। উনি কখন ঢালেন, কখন শুকোন, টের পেলাম না। ওলো বিন্দু, শুনলি?'

শ্যামাঙ্গিনী বলল, 'শুনি নাই আবার?'

বলে কালাচাঁদ আর বিন্দুতে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখে চোখে যেন দুটি অদৃশ্য তরঙ্গের স্পর্শে চারদিকে নৃত্যের দোলা লাগল। নীপবন হল স্থান। কদম ফুল ফুটল। পেখম হল বিস্তৃত। কেকা রব যেন শুনলাম।

কালাচাঁদের ভ্রূর নৃত্য, একবার চাউনি হেনে নাচল আমার মুখে। বিন্দুর সলজ্জ কটাক্ষপাত হল একবার। বিন্দু বলল কালাচাঁদকে, 'আমি বলি কি গোঁসাই, বাবুকে আপনি দু বালতি জল ঢেলে দেন না মাথায়।'

খেপী বলে উঠল, 'বাঃ, এই তো কাজের কথা। আমি ভাবি কি যে বিন্দু বুঝি গান গেয়ে গেয়ে খালি আমাকে ভয় দেখাতেই জানে।'

বিন্দু সচকিত হয়ে বলে উঠল, 'ও মা গো, ও কি কথা মা? তোমায় ভয় দেখাব আমি! আমার মুখ খসে যাবে যে?'

'ও লো ধু-র বেটি! ঠাট্টা ঝামটা বুঝিস না। ও গান যে নিজেকে শুনোয়ে অষ্টপোহর গাই।'

বলে হাসতে হাসতে খেপী এক দিকে কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়ল। মিথ্যে বলব না, দৃষ্টি একটু থমকে গেল খেপী মহিলার দিকে তাকিয়ে। মনে হল, কোনো বিদেশী শিল্পীর তুলিতে আঁকা, ভেনাস-এর দেহ সৌষ্ঠবের ভঙ্গি যেন এমনি দেখেছিলাম।

খেপী চোখ তুলল আমার দিকে। তাড়াতাড়ি চোখ সরাতে গেলাম। দেখলাম, তার চোখে কোনো অনুসন্ধিৎসা নেই। হাসিতে ঝিলিক হানছে। কিন্তু চোখ সেই একটু আরক্তভাবের। বলল, 'বসেন বাবা, আপনি বসেন, কালাচাঁদ জল ঢেলে দিক।'

কালাচাঁদের মুখভরা হাসি। বলল, 'বসেন বাবু, একটু সেবা করি।'

এসব কথা আবার ভালো লাগে না। বললাম, 'বালতিটা ছেড়ে দিলে, নিজেই ঢেলে নিতে পারি।'

বিন্দু হঠাৎ ঘোমটা টেনে, হেসে বলল, 'আজ আর তা হবার যো নেই বাবু।'

কালাচাঁদ বলল, 'হ্যাঁ, মা হুকুম করেছেন, কিরপা করে বসেন বাবু।'

বলে সে হুড়মুড় করে বালতি নামিয়ে দিলে। উপায় নেই। এখানকার এ স্রোত এখন আপন খেয়ালে চলন্ত। আপনাতে আপনি আবর্তিত। আমারও সময় নেই। বসে পড়লাম।

বিন্দু আবার গুনগুনিয়ে উঠল,

'ও রাই, পায়ের নূপুর কেন বাজে
শব্দেতে সাপ আসবে রঙ-এর ঝাঁজে
এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত-আট-নয়,
নবম দ্বারে বাঁধ লো নূপুর, নয় পদ্মদলের হারে।'

কালাচাঁদ গেয়ে উঠল, 'ও রাই, রাই লো।...'

খেপী বলে উঠল, 'বা বিন্দু বা। জয় বাবা! জয় গুরু! হরিবোল হরিবোল!'

এখন আমার অবস্থাটা ভাববার! এদিকে মাথা পেতে বসে আছি। কিন্তু জল দেখছি দুসরা গাঙে বয়। আমারও যে হরিবোল অবস্থা। তবু মনের কোথায় যেন একটা তাল লেগে গেছে। নিজের কাছে সেটা অস্বীকার করতে পারব না।

বিন্দু হঠাৎ চোখ তুলে বলল, 'রাগ করবেন না বাবু। কই গো—'

কালাচাঁদ হুড়মুড় করে আমার মাথায় জল ঢেলে দিয়ে বলল, 'এই যে।'

আঃ! শীতল হল দেহ। প্রতিটি কোষ যেন জল চাইছিল দেহে। কত বালতি যে ঢালল কালাচাঁদ, তার হিসেব রাখলাম না। এক সময়ে বললাম, 'আর না, থাক।'

উঠে দাঁড়াতেই খেপী বলল, 'ঠান্ডা হয়েছে তো বাবা?

হাসিটি কেমন যেন রহস্যময়ী মনে হল। যেন এক কথার আর এক মানে। চর্যাপদের সন্ধ্যা ভাষার মতো। কানের চেয়ে মন দিয়ে শুনতে হয় বেশী। তবু বললাম, 'হ্যাঁ।'

খেপীর শরীর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল হাসিতে। মাথায় জটা না থাকলে বলতাম, এক সর্বনাশের রঙ্গ যেন রঙ্গিণী নারীর সর্বাঙ্গে। তাই দেখে কালাচাঁদ আর বিন্দুর চোখে চোখে যেন শব্দহীন কবিতার কলি ফুটতে লাগল। দুজনেই তাকাতে লাগল আমার দিকে।

হঠাৎ বিন্দু একবার অপাঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা।'

'অ্যাঁ।'

'বাবুকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন?'

'দেখেছি। মালসায় আগুন ভরা।'

কালাচাঁদ বিন্দু দুজনেই হাসির ঝংকারে ফিরে তাকাল আমার দিকে। নতুন গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে অবাক হলাম। এ আবার কী রহস্য!

খেপী হঠাৎ হাত জোড় করে বলল, 'রাগ করো না বাবা।'

রাগ করার কারণ চাই, কারণই বুঝতে পারলাম না। আপনি থেকে তুমি হয়েছি। তাতে আমার মান যাবে না। বললাম, 'রাগ করব কেন?'

খেপীর গলায় যে একটি কোমল পর্দা আছে, সেটা এবার শোনা গেল। বলল, 'কখন কাকে কী বলি। সকলের মেজাজ তো সব সময়ে ঠিক থাকে না। তাই বলছি। তবে আমি মিছা বলি নাই।'

কিসের সত্যি, কিসের মিথ্যে? জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের?'

'অই তোমার মনের মালসা। তাতে যে আগুন ভরা।'

হেসে ফেললাম, বললাম, 'দেখা যায় বুঝি?'

'যায় বৈ কি। নইলে দেখলাম কেমন করে?'

ছোট বউদির কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললাম, 'আমি জানি নে।'

খেপী বলে উঠল, 'তুমি যে পোড়া বাবা। জানবে কেমন করে। আমরা জানি।'

পোড়া বাবা! বেশ! নামটি আমার পছন্দ হল। আমি যে মনে মনে চিৎকার করতে করতেই এসেছি, জ্বলে গেল! জ্বলে গেল।

বললাম, 'আচ্ছ, চলি।'

খেপী বলে উঠল, 'পাঁচ নম্বর ঘরে এস পোড়া বাবা। তোমার সঙ্গে একটু জমিয়ে ভাব করব।'

টের পেলাম, লজ্জায় আমার মুখের রঙ বদলে গেল। বিন্দু আর কালাচাঁদ হেসে উঠল। বললাম, 'যাব।'

খেপী আবার বলে উঠল, 'ভাবের ভাবী অনেক পাবে গো!'

www.boiRboi.blogspot.com

খেপীর দিকে আর একবার তাকিয়ে চলে এলাম আমার সুড়ং ঘরে। মানুষগুলি যেন ভাবের ঘোরে রয়েছে অষ্টপ্রহর। বাস্তব জগতের সঙ্গে বেমানান। তবু, মনটা হারিয়ে যায় কেন? তখন ভাবি, আমার বাস্তবের জগৎ কি সব জগতের বড়? তার কি সীমা-পরিসীমা নেই? তবে, এক চক্র দিলেই কেন হাঁপিয়ে উঠি।

বরং কূল পাই নে মানুষের ভাবের জগতের। দেখি, যেখানেই যত রূপ অরূপের মেশামিশি। চেনা অচেনার ভিড়ে কী এক মহারহস্যের অস্পষ্টতা। সেখানে যেন সকলের সঙ্গে সকলের ছাড়াছাড়ি, বাঁধাবাঁধি। সেখানে সবাই ভ্রমে পাশাপাশি, আঘাত লাগে না।

ওই ভাব জগতের সঙ্গে আমার প্রাত্যহিক কঠিন জগতের অমিল। তা বলে, তাকে আমি মন্দ বলতে পারব না। তার ভাবের হাতে কুণ্ঠা নেই। অ-ভাবের হাত উঁচিয়ে আছে, টিকেট দেখবে বলে। ভদ্রলোক না ছোটলোক? মানী না অমানী? অনামী না নামী?

ভাবের ঘরের একটা সাহস! সবাইকে সে একখানে ডাক দিয়ে বলতে পারে, আমরা সবাই সমান। ভাবে আর বাস্তবে মিলবে, সেই তো আমার যুগের সাধন।

না, আর দেরী নয়। ওদিকে আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডা আছে বসে। বেলা হল। কিন্তু তালাচাবি লাগাতে গিয়ে হাসি পেল। এই তো নির্জন বাগান। কী বা নেবে আমার! ওই তো দুখানি ভেজা জামাকাপড়।

ভাবের ঘরে ওইটে বোধ হয় ভুল। ওই জামাকাপড়েই যদি কারুর ভাব লেগে যায়, তখন? অতএব কুলুপকাটি।

বাড়ি চিনতে অসুবিধে হল না। কিন্তু দরজাটি বন্ধ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা। পোড়োবাড়ি নাকি? কী বলে ডাকব, তাও তো জানিনে ছাই।

ভাবতে ভাবতেই অনেক দূরে একটি দরজা খুলে গেল। সেখানে দেখলাম দিনের আলো। স্বয়ং বুড়োই এগিয়ে এল। ডাকল, 'আস বাবু, আস।'

পা টিপে টিপে গেলাম তার পিছনে। অন্ধকার গলি পার হয়ে এসে পড়লাম একটি সিমেণ্ট-ওঠা বারান্দায়। বারান্দার নীচেই কুয়ো। চাতালটি মনে হল সাক্ষাৎ মৃত্যু। সবুজ শ্যাওলায় চক্‌চক্‌ করছে। দেখলাম, সেই বারান্দাতেই ইতিমধ্যে পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করা হয়ে গেছে। বুড়ো বলল, 'বস বাবু।'

বলে গলা তুলে, ঘরের দিকে মুখ করে কী যেন বললে। তার পরে বুড়ো বসল। সামনের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এল। একটি বুড়ি। আর খাওয়া বুঝি মাথায় উঠল। বুড়ির দুটি পায়েই শুধু গোদ নয়, মহাগোদ। সেই গোদে আবার কাঁসার খাড়ু এঁটে বসেছে। কপাল অবধি ঘোমটা বুড়ির। নোলক ঝুলছে ঝলঝলিয়ে।

কিন্তু এ কি সর্বনাশ! বুড়োবুড়ি দুটিতে যে দিব্যি পা ছড়িয়ে সামনেই বসল। আতিথেয়তা? অতিথির পেটে যে অন্নপ্রাশনের ছিটেফোঁটা এখনো আছে। একটু কি দয়া হয় না? মুখ তুলে বলতেই গেলাম, বুড়ো মানুষ কেন কষ্ট করে বসে থাকা। আমি ঠিক খেয়ে নেব।

কিন্তু ততক্ষণে গণেশবধু দেখা দিয়েছে। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে কলাবউ। সেই গতকাল রাত্রের ট্রেনে, বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসা বউটিরই মত। তবে এক্ষেত্রে, কাঁসার বলয় পরা হাত দুখানি ঢাকা যায় নি। কারণ, ভাতের থালা ধরা। কিন্তু পড়ে না যায়। সে ভয় নেই। এল সহজেই। আর যা-ই হোক, পদযুগল দেখা গেল, এবং সেই জিনিসটা নেই। ফর্সা আর পরিচ্ছন্নও বটে। যদিও লালপাড় শাড়িটি—। থাক, না

ভাবাই ভালো। ভাত দিয়েই কলাবউ উধাও।

আহা! প্রায় আলতায় চোবানো বোলতার ডিমের মতো ভাত। অন্তত জনা-তিনেকের খাদ্যের পরিমাণ! থালাটি অবশ্য বড় এবং কাঁসারই। একপাশে চাকা চাকা আলু ভাজাই হবে।

কলাবউ আরো বারদুয়েক এসে তিনটে বাটি দিয়ে গেল। তরকারি, ডাল এবং মাছ। এবার স্বাদ। মুখ তুলতেই, ঘোমটার তলায় কী দেখলাম যেন! ইস্! আমারই অন্যায়। চোখ তুললাম কেন? সেখানেও যে দুটি চোখ আছে এবং সেদিকে দৃষ্টিপাত করা অশোভনীয়, মনে ছিল না, যাক, বুড়োবুড়ির দিক থেকে, জোর করে চোখ ফিরিয়ে অন্ন পর্বত ভাঙলাম। তারপরেই, আলুভাজা মুখে দিলাম। দু'বার চিবিয়েই থমকে গেলাম। সর্বনাশ, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। যাকে আমার চিরকালের ভয়, এ যে সেই কচু!

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কী হলা বাবু?'

না তাকিয়েই বললাম, 'এ যে কচু!'

বুড়ো বোধ হয় হেসেই বলল, 'না বাবু, আলু অছি। নিজে কিনে এনেছি।'

আলু! কী জানি। রাতারাতি জিভ বদলে গেল, নাকি এ দেশের আলুই এমনি, কে জানে। সন্দেহ যখন একবার হয়েছে, আর নয়। ডাল ঢাললাম। মন্দ না। তরকারিটা যেন জল জল ডালনা বিশেষ। আলু তুলে মুখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বার করবার আগেই, একেবারে গলার কাছে। এ কি, আবার কচু!

বুড়ো আবার বলল, 'কী বাবু!'

বললাম, 'এ তো কচুই।'

এবার আরো অমায়িক হাসি। বলল, 'না বাবু, আলু অছি।'

এও আমার ভুল? বললাম, 'কিন্তু—মানে, হড়কে যাচ্ছে কেন তবে?'

জবাবে বুড়ো হাসল। তাকিয়ে দেখলাম বুড়োর আইভরিতে বড় মধুর হাসি ঝলকাচ্ছে। বলল, 'না বাবু, সব আলু।'

সব আলু। আমার চোখও আলু-কানা। জিভও আলু-ভোঁতা। বুড়ি বলে উঠল, 'কাঁহিকি কচু দিবে?'

কেন দেবে, তা কি আমি জানি। তাহলে বলতে হয়, পান্ডা-কর্তা গিন্নি আমার জন্যে আলুর ব্যবস্থাই করেছিল। কলাবউ এ কীর্তিটি করেছে। কিন্তু, লোকচরিত্র বোঝার জ্ঞান আমার যদিও নেই, এ ক্ষেত্রে তা মানতে পারব না। বউটির এ সাহস অসম্ভব।

বাটি থেকে মাছ নিয়ে, অনেকক্ষণ চোখে দেখে হাতে নিয়েও অনুমান করতে পারলাম না, কী মাছ। এ ব্যাপারে অবশ্য আমার অজ্ঞানতা স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ সমুদ্রের মাছের সব হদিস আমার জানা নেই।

সব মিলিয়ে ভোজন হল চমৎকার। উঠতে যেতেই বুড়ো হা হা করে উঠল, 'অ বাবু, কিছু খেলে না যে।'

বললাম, 'খেয়েছি।'

বউটি এসে তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল বসিয়ে দিয়ে গেল কাছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখ ধোবার নির্দেশ পেলাম। মুখ ধুয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে একেবারে দরজার দিকে। বুড়ো প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। ভ্রূর ভিতর থেকে বুড়ো আমার মুখের ভাব দেখে বলল, 'বাবু রাতে তোমাকে খুব ভালো করে খাওয়াব। রুটি খাবে, না ভাত খাবে বাবু?'

বললাম, 'যা তোমার খুশি।'

'আচ্ছা বাবু, আচ্ছা, তাড়াতাড়ি আসবে।'

আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম। বুড়োর হাত এসে গায়ে পড়ল। বলল, 'গরীব মানুষ বাবু, তোমরাই ভরসা। গোঁসা কর না বাবু।'

বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রাগ করতে পারলাম না। অন্তত শেষের কথাটা সত্যি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাকিটা অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে। আমি মুখে বলে তার সংশোধন করতে পারব না। বললাম, 'না, রাগ করব না।'

চোখ মেলে খানিকক্ষণ অর্ধচেতন বিমূঢ়তায় স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কোথায় আছি, কী করছি, কিছুই যেন ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। শুধু মনে হল, সারা গায়ের মধ্যে হুল ফোটার জ্বালা। অসম্ভব চুলকোচ্ছে। আর বহু দূরে, জনতার শোরগোল যে রকম শোনা যায়, সে রকম একটা শব্দ যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। একটা আধো অন্ধকার অবস্থা।

কয়ক মুহূর্ত পরে ঘোর কাটল। ঈষৎ উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে একটু আকাশ দেখা গেল। সন্ধ্যাবেলার আকাশ কিংবা মেঘে ঢাকা, বুঝতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেই সিঁড়ির নীচের ঘরে। দেখলাম, খবরের কাগজ পাতা। অস্পষ্ট আলোয় সংবাদ আর বিজ্ঞাপন। একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আর মশা!

প্রথমেই দরজা দিলাম খুলে। মশা যে টেনে নিয়ে যায় বলে, এর থেকে তার বড় প্রমাণ আর কখনো হাতে হাতে পাই নি! টেনে কি আর সশরীরে নিয়ে যায়। শরীরের আসল জিনিসটি নিয়ে কেটে পড়ে। তারপরেই মনে পড়ল, গোদ। এই যে সহস্র মশা ঢুকে পড়েছে, এর একটিও কি কোনো গোদওয়ালাকে আর কামড়ায় নি? তাড়াতাড়ি পা দুটি একবার দেখলাম। অবিশ্যি, এর মধ্যেই কি হবে? বুদ্ধি তখন লোপ পেয়েছে।

খবরের কাগজ তুলে চারিদিকে ঝাপটা মারতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু খুব একটা নিরীহ জাতের মশা বলে মনে হল না। বরং নিশ্চিন্ত রক্তপানে বাধা পেয়ে আর এই আক্রমণে তারা যেন আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। গর্জন আরো বাড়ল। কিন্তু আমি থামছি নে।

কতক্ষণ এ মশা-মারা লড়াইটা চলত, জানি নে। হঠাৎ একটি মানুষের মূর্তি দরজায় দেখে একবার থামলাম এবং একেবারেই থামতে হল। অবাক হয়ে কিছু বলবার আগেই একটি অস্ফুট জিজ্ঞাসা শুনতে পেলাম, 'আপনি!'

বিস্ময় এবং সংশয়, দুই-ই ছিল সেই কণ্ঠে। আমি যতটা বিস্রস্ত এবং এলোমেলো হতে পারি তাই। গোটা দেহ ঘামে প্লাবিত। চোখমুখের চেহারাও নিশ্চয় খুব সভ্য নেই। তখন আমি এক আদিম মশা-মারা। কী করব ভেবে পেলাম না। আমিও ওইটুকুই বলতে পারলাম, 'আপনি!'

কিন্তু দাঁড়াবারও উপায় নেই। নীচু হয়ে, দরজা অবধি এসে উঠে দাঁড়ালাম। এবং সেই নিঃসংশয় বিস্ময়ে দেখলাম, রেণুই। বাইরের আলোয় এবার তাকে স্পষ্ট দেখলাম। এখন তার চুল আঁট খোঁপায় বাঁধা। তাই মুখখানি যেন ঈষৎ লম্বা দেখাচ্ছে। মুখটিও ধোয়া মোছা ঘষা। পোশাকের তারতম্য একেবারেই নেই। শাড়িটি বদলানো হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত খয়েরী পাড় আটপৌরে শাড়ি। এখন তার গলায় একটি হার পর্যন্ত নেই। দেখলাম, হাতে তার গুটি কয় পাতাসহ গন্ধরাজ ফুল।

সেই একই মেয়ে, একই মুখের ভাব। কিন্তু এ ব্যাপারটা তাকে যে অবাক করেছে, সেটা সে চাপতে পারে নি। তবু এখনো যেন তার সংশয় ঘোচে নি। এমনি এক দৃষ্টিতে সে আমাকে লক্ষ্য করছে। তার মধ্যে কোনো সংকোচ নেই।

রেণু বলল, 'আপনি, মানে, কাল রাত্রে গাড়িতে তো আপনিই—'

হ্যাঁ, আমিই সেই লোক। কাল রাতে গাড়িতে যে রেণুকে বিরক্ত করেছিল? কিন্তু সে কথা বলা যায় না। বললাম, 'হ্যাঁ।'

রেণুর কথা একটু ধীর। কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ ভারী। কিন্তু সুর যেন টান টান। বলল, 'আপনি এখানে উঠেছেন বুঝি?'

জানি নে, এ কথা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কী। শুধু ভদ্রতা হলে কোনো বাধাই নেই। কিন্তু রেণুকে আমি ঠিক চিনে উঠতে পারি নি। যদি ভেবেই বসে, পশ্চাদ্ধাবন করেছি! আবার বললাম, 'হ্যাঁ।'

প্রতিটি মুহূর্তে অন্ধকার নামছিল। কিংবা মেঘ গাঢ় হয়ে আসছিল আরো। বাতাস নেই। ভেজা গুমোটের মধ্যেও ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমেই একের সঙ্গে এক জড়িয়ে পড়ছিল অন্ধকারে। তাদের পাতা আর চেহারার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছিল। তবে সাদা ফুলগুলি দেখা যাচ্ছিল। আমি রেণুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম না।

রেণু বলল, 'শুনলাম এদিকে একটা বাগান আছে। দেখবার ইচ্ছে হল খুব। এসে দেখি, মেলাই ফুল ফুটে আছে। মাত্র এই কয়েকটা তুলেছি। এমন সময় মনে হল, ঘরটার মধ্যে কী একটা হুলুস্থুল যেন হচ্ছে।'

ও, আমি রেণুর পুষ্প চয়নে বাধা দিয়েছি। আবার তাকে বিরক্ত করেছি কি না, কে জানে। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করা কিংবা বলা যায় না। তা ছাড়া, গোটা ব্যাপারটাতে আমি লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে উঠেছি। বললাম, 'ও!'

রেণু আবার বলল, 'নির্জন বাগান, অচেনা জায়গা। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

কিন্তু রেণুকে দেখে আমার মনে হয় না, ওর প্রাণে কোনো ভয় আছে। এমন কি, কৌতূহলও আছে তার এ জীবনে। তবু রেণু আমার দরজায় দাঁড়িয়েছিল কৌতূহলী হয়ে।

বললাম, 'জানতাম না যে আপনি আছেন। আমি মশা মারছিলাম।'

'মশা?'

রেণুর চোখ বোধহয় একটু বড় হল। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমাকে কামড়ে প্রায় খেয়ে ফেলেছে।'

রেণু বলল, 'আপনার বুঝি মশারি নেই?'

আমার সারা গায়ে তখন মশার কামড়ে চুলকোচ্ছে। কিন্তু রেণুর সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার দায়ে দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে হল। লুকিয়ে চুলকোনো যতটা সম্ভব, তাই চালিয়ে গেলাম। বললাম, 'না।'

রেণু আবার বলল, 'তাও তো বটে। অবুদিরা যে বলছিলেন, কোথায় নাকি আপনার ব্যবস্থা সব পাকা আছে, আপনি সেখানেই উঠবেন। তবে আপনি এখানে যে?'

রেণু যে এত কথা বলতে পারে, জানা ছিল না। বুঝতে পারছিলাম, সে ভদ্রতার খাতিরেই এ সব প্রশ্ন করছে। কিংবা গতকাল রাত্রের ব্যবহারের শোধ দিচ্ছে? অথচ কাল রাত্রে আমি মিথ্যে কথা কিছুই বলি নি। অবুদিরা নিজেরাই স্থির করে নিয়েছিলেন, আমার নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা আছে। বললাম, 'না মানে ঠিক—'

দেখলাম রেণু আমার ঘরের ভিতর লক্ষ্য করছে। আবার চোখ তুলল রেণু। তার মুখ আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু তার টিকলো নাক আর ভাসা ভাসা চোখ দুটি দেখতে পেলাম। এখন তার চোখের পাতা ততখানি কুঞ্চিত নয়।

কয়েক মুহূর্ত ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা গেল। তারপরে কী একটা অস্ফুট শব্দ যেন শুনলাম। রেণু চলে গেল।

পরমুহূর্তেই নিজেকে কী রকম অভদ্র মনে হতে লাগল। মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করাও হল না, ওরাও এই ধর্মশালায় উঠেছে কি না? রেণু এখানে এলই বা কোথেকে। এই তো আমার মন। এসেছি উদারের সঙ্গে একাত্ম হব বলে। ভাবলাম, যত আবর্জনা দেব অতল তলায় ডুবিয়ে। কিন্তু ফাঁকিজুকি নিজের সঙ্গে কতখানি চলে। গতকাল রাত্রে, রেণুর অনিচ্ছাকৃত ব্যবহারের কথা আমি ভুলতে পারি নি। তাই আমি তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারলাম না। কে যেন আমাকে ভিতর থেকে টেনে ধরে রাখল। সেই আমার সংকীর্ণতা?

সেই শোকময়ী মূর্তির কথা আমার মনে পড়ল। ছোট বউদির কথা থেকে অনুমান করেছিলাম, রেণুর বুকে কাঁচা ক্ষত। ধারণা করেছি, রেণু সদ্য-বিধবা। গতকাল রাত্রে রেণুকে ছোট বউদির কোলে টেনে নেবার দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল।

কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই। রেণুর ভাবনা দিয়েই, এ বাগান যেন আমাকে গ্রাস করল। চাপা চাপা ফুলের গন্ধে অন্ধকারের ঝুপসিতে, ঝিল্লিস্বরে, প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা আলোর ঝলক লাগল চোখে। তারপরেই চোর তাড়া করার মতো একটা প্রবল হাঁক, 'কই, কোথায় সে দেখি।'

ব্যাপার কী? গলার স্বরেই অবশ্য মানুষ চিনতে পেরেছিলাম। সেজদি-শিবি-অবুদি। সেজদির হাতে একটি হ্যারিকেন।

শিবি বললেন, 'তবে যে তুমি বললে, কোথায় তোমার থাকবার ব্যবস্থা আছে?'

অবুদি বলে উঠলেন, 'ধাপ্পা মেরেছে আমাদের! ওর মুখ দেখে বুঝছিস না, মোটেই সুবিধের ছেলে নয়!'

সেজদি বললেন, 'আর এ ধর্মশালাতেই আসবে যদি তো বাপু আমাদের বল নি কেন?'

অবুদির কথার কোনো জবাব নেই। ধাপ্পাবাজ এবং অসুবিধেজনক ছেলে আমি। কিন্তু আমি একবারও বলি নি আমার কোনো ব্যবস্থা আছে। তখনও স্থির করি নি, এ ধর্মশালাতে উঠব।

আমি বললাম, 'না মানে ব্যাপারটা—'

'থাক বাবা, বুঝেছি।'

শিবি ধমকে উঠলেন। অবুদি চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না।'

চালাকি? কেন আমি এঁদের সঙ্গে চালাকি করতে যাব?

সেজদি বলে উঠলেন, 'তা তোমার অত লজ্জা কিসের বাপু? আমাদের তো এখানে আসার কোনো ঠিক ছিল না। মহেন্দ্র আশ্রমে নেহাৎ কতগুলো আপদ এসে জুটেছে কোথেকে। দু' তিন দিন বাদে চলে যাবে, তখন আবার স্বর্গদ্বারেই চলে যাব। এখানে উঠবে, আমাদের বললেই পারতে?

কাকে কী বোঝাব? বললাম, 'সেজদি, আমি এ দেশে জীবনে কোনোদিন আসি নি। কিছুই জানি নে।'

শিবি বললেন, 'তবে তুমি ওই ছোট পুঁটলিটা নিয়েই বাড়ি থেকে চলে এসেছ? সত্যি?'

অবুদি বলে উঠলেন, 'কী একটা খারাপ কাজ-টাজ করে বোধহয় পালিয়েছে বাড়ি থেকে।'

আর আমার কী শোনা বাকি রইল? বাড়ি থেকে পালাবার বয়সও কি আমার

আর আছে? অবুদির চোখ না হয় একটু ঢুলুঢুলু। তা বলে কি নজর নেই একটুও।

ততক্ষণে সেজদি আমার ঘরে উঁকি দিয়েছেন আলো নিয়ে। বলে উঠলেন, 'ইস্! ছি ছি ছি, এ ঘরে মানুষ থাকে। দ্যাখ শিবি, অ অবু, একবার দ্যাখ তোরা।'

অবুদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'বাঃ, কী বাহারের বিছানা!'

শিবি বললেন, 'খেলে কোথায়?'

যতটা পারলাম, দ্বিপ্রাহরিক আহারের বর্ণনা করলাম। তিনজনেই হাসতে হাসতে আর ঘেন্নায় 'অ্যা ম্যা গগ! অ্যা ম্যা গগ!' করে গায়ে গায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। আলু-কচু এবং গোদ-ই অবশ্য এতটা হাসি ঘেন্নার কারণ।

সেজদি বললেন, 'আগে জানলে তো আমরাই দুটি খেতে দিতে পারতাম। মাছ না হয় না-ই হত। আবার দেড় টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে!'

শিবি বললেন, 'মুখ দেখে তো হাবা গোবা বলে মনে হয় না।'

অবুদি বললেন, 'ওর নিশ্চয়ই ইচ্ছে ছিল। নইলে কি আর ফুঁসলে নিয়ে গেছে? পুরী শহরে আর খাবার জায়গা পাওয়া গেল না?'

ইতিমধ্যে শিবি সেজদিতে কী কথা হল। সেজদি বললেন, 'নাও, জামা পরে এবার এস দিকি নি।'

মনে প্রাণে আমি তাই চাইছিলাম। বেরিয়ে পড়া দরকার। জামা পরে, দরজা বন্ধ করে ওঁদের সঙ্গেই বাড়ির ভিতরের উঠোনে গেলাম। আমি পা বাড়ালাম বাইরের দিকে।

শিবি বললেন, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? এদিকে এস।'

অবুদি বললেন, 'পথ ভোলা রোগ আছে দেখছি।'

দেখলাম ধর্মশালার দরোয়ান বৈজু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। জানি নে সে কি ভাবল! তিনজনের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলাম। উঠেই ছোট বউদির সঙ্গে দেখা। মুখে সেই হাসিটি। বললেন, 'ধরা পড়ে গেছ তো?'

সেজদি বলে উঠলেন, 'ধরা পড়া মানে? যেখানে আছে সে ঘর যদি তুমি দেখতে।'

'আমি শুনলাম রেণুর মুখে।'

'আর খাবার কথা তো শোন নি।'

তিনজনেই হৈ চৈ করে উঠলেন। ছোট বউদি কিন্তু তাকিয়ে ছিলেন আমার চোখের দিকে। যেন তিনি সবই জানতেন।

আমি বললাম, 'ছোট বউদি, থাকা খাওয়া ভাত ব্যঞ্জন নিয়ে সময় চলে গেল। যার কাছে আসা, তাকে এখনও দেখি নি। আমি একবার বেরুব।'

সেজদি বলে উঠলেন, 'কোথাও বেরুবে না। এখন আমাদের সঙ্গে বাজারে যাবে। একটা ব্যাটাছেলে সঙ্গে থাকবে, ভালোই হবে। বাজার করে ফিরে রাঁধব, খাবে, তারপর যাবে।'

শিবি বললেন, 'এ্যাই! বুঝেছ?'

অবুদি বললেন, 'বাড়ি থেকে ভেগে-পড়া ছেলে, এসব বোধ হয় সুবিধের লাগছে না ওর।'

ছোট বউদির চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। বললাম, 'সেজদি, কিন্তু আপনাদের তো রাত্রে রান্না হবে না। আমার জন্যে শুধু শুধু বাজার করে এত রাত্রে আবার রান্নাবান্না—'

সেজদি বললেন, 'বাজার আমরা করতামই। উনুনও আমাদের ধরাতে হবে। আমরা তো আর উপোস করব না। ভাত না হয় খাব না।'

ছোট বউদির মুখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'সেই বেশ ভালো। আমার

ভারী আনন্দ হচ্ছে।'

যাঁর কাছে মুক্তি চাইতে গেলাম, তিনিও দেখছি সেজদিদের স্রোতেই ভেসে গেলেন। কিছু বলতে পারলাম না। আর সেজদিদের দল তো কিছু শোনবার প্রয়োজনই বোধ করলেন না। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম তাঁদের সাজো সাজো রব।

ছোট বউদি বললেন, 'কী হল?'

বললাম, 'আপনাদের এমনি করে কষ্ট দিতে চাই নি।'

ছোট বউদি হেসে বললেন, 'ভুল করলে। মেয়েমানুষ সধবা হোক বিধবা হোক, তীর্থে যাক আর ঘরে থাক, এক জায়গায় সব সমান। এই কিছুক্ষণ আগে সবার গা টিস্ টিস্ করছিল, হাই উঠছিল। এখন দেখ, কী আনন্দ। আমারও তাই। আমাদের বোধ হয় এমন একটি না হলে চলে না।'

ছোট বউদির কথা শুনতে শুনতে মনে হল, স্নেহের ধারায় স্নান করে উঠলাম। রঙ মিলনোর ছন্দ বোধ হয় এই। ঘরকে করি বাহির, বাহিরকে করি ঘর। আসলে, সেজদিরা যে মা-কাকীমার দল, এটা আমি ভুললেও তাঁরা ভোলেন কেমন করে? এই আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবনে পথের মাঝে ছিল একটি এমনি প্রস্রবণ।

ছোট বউদি আবার বললেন, 'জানো তো ভাই, লোকে বোঝে না। না বুঝে তারা বলে, আদিখ্যেতা। কিন্তু আমরা আদিখ্যেতা করতে ভালোবাসি, তাই যে সকলের ভালো লাগে।'

ছোট বউদি এই প্রথম ভাই বললেন, তবু আমার কিন্তু-কিন্তু গেল না। আমি একবার ঘরের দিকে তাকালাম। চোখ ফেরাতে গিয়ে চোখ পড়ে গেল ছোট বউদির চোখে। ছোট বউদি হেসে বলে উঠলেন, 'ভুলটা দেখছি তোমার কাটে নি। রেণুকে তুমি ভুল বুঝেছ। আত্মসম্মান জ্ঞান মেয়ের আমার একটু বেশী, কিন্তু কাউকে সে ইচ্ছে করে দুঃখ দিতে পারে না। আজ সকালে ও তোমার কথা কী বলছিলো জানো?'

একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। যদিও হবার কিছু নেই। যদি খুব খারাপ কথাই বলে থাকে, তাতেই বা কী যায় আসে। রাত পোহালেই আমরা কে কোথায় চলে যাব। পথের গ্লানি মনে করে রাখব না।

ছোট বউদি বললেন, 'বলছিল, ভদ্রলোক শহুরে না গ্রামের, কিছু বোঝা যায় না, না কাকীমা? তবে একটু গোবেচারা গোছের।'

ছোট বউদি হাসলেন। কী জানি, আমার কী দেখে রেণুর গোবেচারা বলে মনে হয়েছে। ছোট বউদি হঠাৎ বললেন, 'ও মা, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এস, ঘরের ভেতর এস।'

আপত্তি করলাম না। প্রথমে একটি ছোট ঘর। পিছনের ঘরটি বড়। দেখলাম, বড় ঘরটি প্রায় গ্রীনরুম হয়ে উঠেছে। ছোট বউদি আমাকে মাদুরে বসতে দিয়ে ভিতরে গেলেন। কিন্তু এ চোখকে কোনোদিন শাসন করতে শিখলাম না। দেখলাম প্রৌঢ়া বিধবা অবুদি মুখে যেন কী মাখছেন। হাতে তাঁর একটি ছোট আয়না।

সেজদির চুপিচুপি গলা শুনতে পেলাম, 'লজ্জার মাথা কি একেবারে খেয়েছিস অবু?'

শিবির গলা, 'ওর আবার লজ্জা, তার আবার মাথা।'

অবুদির গলা, 'কেন বাপু, তোমাদের তো আগেই বলেছি, মুখে একটু **শাঁখের গুঁড়ো** না মাখলে আমার ভালো লাগে না।'

'শাঁখের গুঁড়ো! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। যেন তোকে আজ চিনছি।'

গলাটা শিবির। তারপরেই সেজদির গলা, 'ছেলেটা কী ভাববে?'

অবুদির গলা, 'কী আবার ভাববে। টের পেলে তো! কেন তোমরা আমার পিছুতে লাগছ? শিবি কি সাজে না?'

হল! লড়াই লাগবে বোধ হয়। বেরুনো আর হবে না। কিন্তু না। ছোট বউদির গলা শোনা গেল, 'ছেড়ে দাও না ঠাকুরঝি। অবু ঠাকুরঝির যা ভালো লাগে করুক।'

বাইরে যখন এলাম, তখন পুরীর রাজপথে আলো জ্বলছে। আর আমাকে দেখে কে বলবে, দিগন্তের পথে ছোটা, সমাজ-ছাড়া পরিবার-ছাড়া মানুষ। যেন বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গেই বেরিয়েছি। সেজদি আমার হাতে একটি চটের থলি দিয়েছেন তুলে। সেটি আমি শিরোধার্য করে নিয়েছি।

গলির মধ্যে ঢুকে বাজার। মনে হল, রাস্তাই বাজারে পরিণত। মন্দিরের প্রাচীর-সীমাতেই তরি-তরকারীর ঝুড়ি সাজানো। সেজদি-বাহিনীর কে যে কী দর করছেন, ঠিক করতে পারছি নে। আমি প্রায় তল্পিবাহকের মতো ঘুরছি।

হঠাৎ অবুদি আমাকে আঙুলের খোঁচা দিলেন।—'কই হে, তুমি যে কিছু করছ না। ব্যাটাছেলে সঙ্গে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর বাজার করব আমরা?'

তাও তো বটে। সামনে যে দোকানী ছিল, তাকেই বললাম, 'দাও তো, আলু আর বেগুন দাও, আর ওগুলো কী?...'

শিবি দিলেন আর এক ধাক্কা—'আর থাক, খুব হয়েছে।'

প্রায় ভেংচে উঠে বললেন, 'তোর মুরোদ আমি বুঝে নিয়েছি।'

সবাই হেসে উঠলেন। রেণু বাদে। কিন্তু শিবির তুই সম্বোধন শুনে আমার ঘর ছাড়া মনের ওপর কোথায় যেন একটা চড়া সুরের ঝংকার লাগল। মেলামেশার যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল, সেটুকুও দূর হয়ে গেল।

সকলের কেনাকাটার ব্যস্ততার ফাঁকে এক সময়ে শিবি একান্তে বললেন, 'রাগ হয় নি তো?'

'কেন?

'তুই বললাম বলে?'

'মোটেই নয়। বরং এই মনে হল, বাইরে এসেও ঘর আমাকে আর একভাবে ধরে আছে। শিবিদি, সেই গানটা আমার মনে পড়ছে, 'মায়ার বাঁধন ছেঁড়া কি গো যায়।'

শিবিদি বললেন, 'তা যাই বলিস ভাই, তোকে আমার খুব ভালো লেগে গেছে। মনে হল তুই যেন আমাদের কতদিনের আপন।'

বললাম, 'সেই ভয় শিবিদি, আপনত্বের মধ্যে যেন কোথায় একটা আঘাতের ব্যথা লুকিয়ে থাকে। কখন যে সে—'

'থাক।' শিবিদি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'অমন ভারী ভারী কথা বলিস নে ভাই। সময়কালে সব হলে তোর মতো একটা ছেলে থাকত আমার।'

বলতে বলতেই শিবিদির চোখে জল এসে পড়ল বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠলাম। বুঝতে পারি নি, শিবিদির হৃদয় তার চোরাবানে কোন্ দিকে ভেসে গেছে। কিন্তু চোখের জলের ওপরেই হেসে উঠলেন শিবিদি। বললেন, 'জীবনটা এমনিতেই ভারী। আমি তোর মুখে আর ভারী কথা শুনতে পারব না বাপু।'

বলে জল মুছলেন চোখের। সংসারের চোখে জল দেখব না বলে এই আমার দিগন্তের পাড়ি। কিন্তু আমার মুক্তির কূলে কূলে সেই চোখের জলের ছপছপানি যায় না। সে আমাকে বাঁধতে আসে নি। জানিয়ে দিলে, সে আছে সবখানে। রূপ দেখে যাকে চেনা যায় নি, চোখের জলে জানাজানি হল তার সঙ্গে। বুঝলাম, ব্যথা আছে বলেই, এ মানুষের চেহারা চলন বলন আলাদা।

এদিকে বাজারের বোঝা হল মন্দ নয়। কিন্তু ধর্মশালায় ফিরে যাবার কথা ভাবতে

পারছি নে। ছোট বউদিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সমুদ্রের পথ কোন্ দিকে।'

ছোট বউদি বললেন, 'এখন আর যেও না। আজ দিনে যখন যাও নি, একেবারে কাল সকালে প্রথম দর্শন করো। বরং জগন্নাথের মন্দিরে চল। তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

সেজদির দল একটু অনিচ্ছাতেই ফিরে চললেন। মাঝখানে পড়ে গেল রেণু। ছোট বউদি বললেন, 'তুইও চল আমার সঙ্গে। একটু বসে থাকবি সেখানে।'

রেণু বলল, 'তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো কাকীমা?'

ছোট বউদি হেসে বললেন, 'ও মা, তুইও ওই রা ধরেছিস্? দেখছি যত সুবিধে অসুবিধের কথা তোরা দুজনেই বলছিস!'

ছোট বউদি আমার দিকে তাকালেন। হেসে বললেন, 'কী, অসুবিধে হবে?'

'আমার? কেন?'

'তাই তো আমি দেখছি। তুমি দেখছ রেণুর অসুবিধে, রেণু দেখছে তোমার অসুবিধে। কী ছেলেমানুষ বাবা সব! চল, চল।'

যাবার প্রাক্কালে দেখলাম, অবুদি যেন ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ চোখে দেখলেন রেণুকে। শিবিদি বললেন আমাকে, 'দেখিস্, জগন্নাথের ধ্যানে বসে যাস্ নে যেন।'

মন্দিরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। দেবতা রয়েছেন কোথায়, কে জানে। দু'পাশে দুই বিচিত্র প্রস্তর শার্দুল মূর্তি দেখি চেয়ে। দরজার ওপরে, খিলানে রয়েছে নৃত্যরতা নর্তকীরা। রঙের বিন্যাসে ভঙ্গিময় পুতুল দেখার কৌতুকে নয়, অবাক মানি পাথর কাটার ছন্দ দেখে। জীবন্ত ভঙ্গি, পেশীতে পেশীতে প্রাণের স্পন্দন। শার্দুল হুঙ্কার দিয়ে উঠলেই হয়। নূপুরের ধ্বনি যেন এই মাত্র স্তব্ধ নৃত্যের সঙ্গে থমকে গেল।

ছোট বউদি বললেন, 'আচ্ছা পাগল যা হোক। পুরীর মন্দিরে দিনের বেলা অজস্র মূর্তি দেখতে পাবে। তখন ধ্যানমগ্ন হয়ে দেখো, এখন চল। স্যাণ্ডেল দুটো খুলে রাখ ওই দোকানীর কাছে।'

তাই রেখে, অনুসরণ করলাম ছোট বউদিকে। রেণু আগে আগে চলেছে সিঁড়ি দিয়ে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে হল চলেছি এক অতীত ইতিহাসের পথ ধরে। যদি আঁকা থাকত সেই সব চরণচিহ্ন, আমার আগে যারা শতাব্দীকাল ধরে আরোহণ করেছে এই মন্দিরে। যারা আমার মতো, ছোট বউদি, রেণুর মতো অজস্র মানব মানবী। শত শত বর্ষ আগে, সেই সব নরনারীর প্রাণে কী কথা তখন নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়েছিল!

পুণ্যার্থীর প্রাণের কথা হয় তো সত্যি জানি নে। কিন্তু একজনের কথা জানি। একজন! তাঁর কথা চিন্তা করতেই, এই প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আমার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল সহসা। তাঁর সুগৌর চরণ যেন আমি দেখতে পেলাম। এই পৃথিবীতে তাঁর শেষ চরণচিহ্ন এই সিঁড়িতেই পড়েছিল। তিনি আরোহণ করেছিলেন, আর কোনোদিন অবতরণ করেন নি। এই নীলাচলেই তো নিমাইয়ের শেষ বাস, এই মন্দিরেই তাঁর দেহের শেষ লয়।

আমার পা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতে চাইল। কুণ্ঠায় নত হয়ে পড়লাম। আমি মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে ভুলে যাই, তবু এই সিঁড়িতে পা দিয়ে, আর একজনের পাদস্পর্শের কল্পনায় সশ্রদ্ধ কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে উঠি। মনে মনে প্রণাম করি বারে বারে।

তাঁর কথা জানি। তাঁর সশব্দ এবং অনুচ্চারিত কথা জানি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ অলৌকিকতায় মাথা নত করে না। বরং কল্পনায় শিউরে উঠি, নিমাইয়ের রক্ত কি একদা এই বিশ্বপতি বিগ্রহের প্রাঙ্গণে পড়েছিল? যিনি বলেছিলেন, আচণ্ডালে দাও

প্রবেশাধিকার দেবতার দুয়ারে। ঐতিহাসিকেরা যাঁকে বলেছেন, অস্ত্রহীন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা। বিপ্লবী বীর। সেই পরম পুরুষ, নরদেব নিমাই কি শহীদ হয়েছিলেন এই পুরুষোত্তমের অঙ্গনে? কেন এমন কল্পনা আমাকে আচ্ছন্ন করে, কুসংস্কারান্ধ উন্মত্ত নিষ্ঠুর মূর্খ, শিখা ও উপবীতধারীরা নিমাইকে পাথরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রক্তাক্ত করেছে?

ওরা চিরকাল ধরেই হত্যালীলা চালিয়ে আসছে। নিমাইকে ওরা তিন হাজার বছর আগে, কাঁটার মুকুট পরিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল পৃথিবীর আর এক প্রান্তে। ওরা রক্তপাত করে, কিন্তু হার স্বীকার করে চিরকাল। প্রায়শ্চিত্ত করে সারা জীবন।

এই মন্দিরের দেবতাই নিমাই।

কিন্তু ওরা যদি জানত, এ মন্দির সত্যি বর্ণাশ্রম-সৃষ্ট দেবতা জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের নয়। সে শুধু নাম আরোপ করা মাত্র। তাঁদের নাম, বুদ্ধ ধর্ম সংঘ। একদা বুদ্ধের দাঁত রক্ষিত হয়েছিল এখানে। খৃষ্ট জন্মের চারশো বছর আগে একবার সেই পুণ্য দন্ত পাটলিপুত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল আবার। তখনও দূরান্তের তীর্থযাত্রীরা এসেছে এখানে। সিংহলীরা আসত সমুদ্র পথে। পুরী থেকে ভুবনেশ্বরের পথ দিয়ে যেত তাম্রলিপ্ত। সেখান থেকে রূপনারায়ণের স্রোত ধরে বিহারে, বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান দর্শনে। তারপর ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের কোনো এক অন্ধকার আবছায়া সময়ে, তিনশো এগারো খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের পুণ্য দন্ত সিংহলে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

কিন্তু সম্পূর্ণ বৌদ্ধ চিহ্ন মুছে দিয়ে যেতে পারে নি। তাদের ত্রিরত্ন দেব দেবীরাই, হয় তো কিছুটা বিদ্রূপপূর্ণ উপহসিত, হাত পা কাটা মূর্তি নিয়ে রয়ে গেছেন। বুদ্ধ ধর্ম সংঘ হয়েছেন জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম। বৌদ্ধদের মতে, ধর্ম স্ত্রীলিঙ্গ। তাঁকে সুভদ্রা করতে অসুবিধে হয় নি। যদিও পুরাণ আর কপিলসংহিতায় এই ত্রিমূর্তির ধ্যান ভিন্ন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি তাঁর রানী গুণ্ডিচার অনুরোধে এই তিন দেবদেবীর মূর্তি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। বন্ধ দরজা ঘরে যখন মূর্তি গঠিত হচ্ছিল, রাজা সেই সময়ে দরজা খুলে ফেলেছিলেন। এবং তিনি যে-অবস্থায় দর্শন করেছিলেন, দেব দেবীরা সেই পর্যন্তই বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। হাত পা বিহীন অসম্পূর্ণ অপরূপই তাঁদের রূপ। কারণ মর্ত্যের মানুষ একবার দেখবার পর, পূর্ণতা সম্ভব ছিল না।

জানি নে, এ কাহিনীর মধ্যে সত্য কতটুকু আছে। তাতেও বৌদ্ধদের ছায়া পড়ে না। জগন্নাথই তো বুঝি একমাত্র দেবতা, যাঁর মহাপ্রসাদ অন্ন কখনো অশুচি হয় না। যে মহাপ্রসাদ এক পাত্রে সকল জাতি হাত মিলিয়ে গ্রহণ করলেও জাত যায় না! আরও অবাক লাগে, মূল মন্দির পশ্চিমে অবস্থিত, বিগ্রহ পূর্বমুখী। উড়িষ্যার প্রাচীন সকল মন্দিরের এই নাকি বৈশিষ্ট্য! হিন্দু মতে যে, একেবারে বিপরীত!

কিন্তু এহ বাহ্য! ত্রিরত্নের প্রতীক বা এল কোথা থেকে। হিন্দু ধর্ম থেকেই নয় কি। শুধু পাত্রাপাত্রে রূপের ভেদ যেন! একরূপে যে অনেক কাল গেল। আর এক রূপে দেখি। সে কালও গত হল। এবার দুয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুনতর করি। মিলিয়ে মিশিয়ে যিনি, তিনি জগন্নাথ। ইনি বর্ণাশ্রমের হিন্দু দেবতা নন। ইনি বিশ্বপতি।

বিশ্বপতির দুয়ারে মহারাজা গঙ্গেশ্বর এই সিঁড়ি দিয়েই কি আরোহণ করেছিলেন, গঙ্গাবংশের আদি রাজা এই মন্দিরের স্রষ্টা। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরোহণ করেছিলেন কবি জয়দেব। কল্পনায় জিজ্ঞাসু হয়ে উঠি, তাঁর পাশে পাশে পদ্মাবতী কি ছিলেন? পদ্মাবতীর অলক্তরাগরঞ্জিত পায়ের অরুণচিহ্ন কি এই পাথরের ধাপে আছে কোথাও?'

বাতি বহন নিষিদ্ধ। জগমোহন, ভোগমণ্ডপ, রেখ দেউলের গায়ে, বিমানে, অরুণস্তম্ভে, প্রায়ান্ধকার এই পরিবেশে, মন্দিরের প্রাকার-গাত্রে যেন ছায়াদের ভিড়।

মূক মৌন সেই সব প্রস্তর ছায়াদের চক্ষে অপলক তৃষাতুর চাহনি। বাণী তাদের স্তব্ধ। রেখায় তারা এঁকে চলেছে শত শত বৎসরের কাহিনী। কত সুখ দুঃখ এসেছিল, গিয়েছে কত। আজ তার অঙ্গন পূর্ণ এই জনতার ভিড়ে, বর্তমান সুখ দুঃখের আরো শত সহস্র ঢেউ।

কারা এল দেবতা দর্শন করতে জানি নে। দূর অন্ধকারের কালের কৌতূহল এসে ঘিরে ধরল আমাকে। বাদ্যের যে ঝংকার তুলে সন্ধ্যারতি হচ্ছে, দূরকালের ধ্বনি তাতে শুনলাম।

ছোট বউদি বললেন, 'আরতি দেখবে?'

বললাম, 'না। কোথাও একটু বসি।'

ছোট বউদি বললেন, 'সেই ভালো।' রেণুকে বললেন, 'তুই দেখবি?'

রেণু বলল, 'একটু দেখি।'

ছোট বউদি আঙুল তুলে, মন্দির চত্বরের একটি কোণ দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে আসিস, আমরা বসছি।'

রেণু ঘাড় নেড়ে ধীরে ধীরে জগমোহনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছোট বউদি সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন। চোখে ওঁর ব্যথাকরুণ দৃষ্টি। সহসা একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'চল।'

চত্বরের এক কোণে, মাটিতেই বসলাম ছোট বউদির কাছে। বসে বললাম, 'ছোট বউদি, যদি দোষ না নেন, তা হলে একটু কৌতূহল প্রকাশ করব।'

ছোট বউদি করুণ হেসে বললেন, 'জানি। মনে কিছুই করব না ভাই। তোমাকে দেখে যেমন চিনতে আমার একটুও দেরী হয় নি, এও তাই। হয় তো রকমফের আছে। লুকোছাপার কিছু নেই। আমার রেণুর যা হয়েছে, এ তো আজকাল আখচার ঘটছে। তোমাদের যুগটাই এমনি। দোষ কাকে দেব?'

যুগের কথা কেন? রেণুর জীবনে কি আর-কিছু ঘটেছে? সে কি তবে বিধবা নয়?

ছোট বউদি বললেন, 'তুমি কি ভেবেছ জানি নে। শোনার মতোও কিছু নয়। ও একটি ছেলেকে ভালোবাসত। রেণুর বাবা, আমার ভাসুর ঠাকুর সেটা পছন্দ করতেন না। আমার জা-ও না। লেখাপড়া জানা ছেলে, বংশও ভালো। তবে জাত আলাদা। তা মিথ্যে বলব না, আমিও কিছু এ-কালের লোক নই বটে, কিন্তু আমার খারাপ লাগে নি। কী হয়েছে? যার কপালে যা আছে, কে তা খণ্ডাবে? নিজের জীবনটা দিয়েই তো দেখলাম। আর রেণুকে আমি জানি। কথায় বলে বটে, মায়ের চেয়ে বড় যে, তাকে বলে ডান! তা বলতে পারে। কিন্তু রেণুর বাবা মা আমারই ভাসুর-জা। তাঁদের চেয়েও মেয়েকে আমি বেশী চিনি। ছেলেবেলা থেকে ও কোনোদিন আমার কাছ ছাড়া থাকে নি। আমার হাতে মানুষ। নিজের না থাকাটা ওর জন্যেই কখনও টের পাই নি। তা যাই হোক এমন বলতে পারব না, একটা ছেলেকে ভালোবেসেছে বলে, কোনোদিন বেচাল দেখেছি। আর আজকাল সব ভালোবাসা হলে ছেলেমেয়েদের যা সব কাণ্ড দেখি, তার কিছু আমি রেণুর মধ্যে দেখি নি। কিন্তু তাই নিয়ে কী কেচ্ছা, কী কেলেঙ্কারী! দুটো বছর ধরে মেয়েটাকে বাপ মা আত্মীয়স্বজন আর পাড়ার লোকেরা পর্যন্ত কী অপমানটাই না করেছিল। রেণুর বাবা পর্যন্ত একদিন অত বড় মেয়ের গালে এক চড় কষালেন। আর যত দুর্নামের ভাগী আমি এই কাকীমা। কী? না, আমি মেয়েকে প্রশ্রয় দি। কিন্তু আমার রেণুকে আমি একবারও টস্‌কাতে দেখলাম না। সেই ছেলেকেই সে বিয়ে করবে। ছেলে তার প্রস্তাব দিয়েই রেখেছে। তার বাপ মায়েরও আপত্তি ছিল না।'

একবার থামলেন ছোট বউদি। বোধ হয় দেখে নিলেন, রেণু আসছে কি না। আর আমি যেন বহুশ্রুত কাহিনী নতুন করে শুনছিলাম ছোট বউদির মুখে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, তবে আমি রেণুকে কেন বিধবা বলে অনুমান করে নিয়েছিলাম।

ছোট বউদি আবার বললেন, 'শেষে, সবাই হার মানল রেণুর কাছে। সত্যি বলছি ভাই, আমি ভগবানের কাছে মানত করেছিলাম। রেণুর বাবা যখন বললেন, ওই ছেলের সঙ্গে রেণুর বিয়ে দেবেন, আমি ঘরে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, তুমি আছ, তুমি আছ। রেণুকে দেখে ভাবলাম, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে যাবে বুঝি। কিন্তু ভাই, মেয়েটা আমার বড় শক্ত সেদিকে। এখন ভাবি ও যদি অজ্ঞান হয়ে থাকত, তবেই ভালো হত।'

ছোট বউদির গলার স্বরে চমকে উঠলাম। না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'কেন ছোট বউদি?'

ছোট বউদি একটিও নিশ্বাস না ফেলে বললেন, 'সব যখন ঠিকঠাক, সেই ছেলেই বসল বেঁকে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, বিয়ে সে করবে না। কেন? না তার ইচ্ছে নেই। এবার আমরা সবাই উঠে পড়ে লাগতে গেলাম। ইচ্ছে নেই, মগের মুলুক পেয়েছ? দু' বছর ধরে মেয়েটা উজান ঠেলে এল, তুমিই ডেকে নিয়ে এলে। এখন সরে পড়ার তাল! কিন্তু রেণু আমাদের এক কথায় থামিয়ে দিলে। বললে, তোমরা এ রকম করলে আমি গলায় দড়ি দেব। ওকে আর একটি কথাও বলো না।

রাগ হয়ে গেল শুনে। বললাম, তবে এতদিন কি দেখে তুই ওকে ভগবান করে রেখেছিলি? মানুষ চিনিস না? রাক্ষুসি হাসলে। সে হাসি যে মানুষ কেমন করে হাসে, তুমি বোধ হয় বোঝ। বললে, চিনি বলে যে মনে করেছিলাম কাকী। বললাম, এখন কি করবি তবে? বললে, কেন, যা করছিলাম। সংসারের কাজ করব। একটু লেখাপড়া করব, তবে কাকী পুরীতে তোমার সেই মহেন্দ্র আশ্রমে যদি নিয়ে যাও, তবে এখান থেকে কিছুদিনের মতো চলে যাই। ভেবে দেখলাম, সেই ভালো। স্বর্গদ্বারে মহেন্দ্র আশ্রম আমার গুরুর ঠাঁই। তাই চলে এলাম।'

ছোট বউদির একটি নিশ্বাস পড়ল। আমিও দমন করতে পারলাম না। ছোট বউদির ভাষায়, আখচারের ঘটনাই বটে। সংসারে নিয়ত তরঙ্গ আছে বলেই তো, নিরন্তর অবাক মানি, হাসি, রাগি, কাঁদি। তার নিরন্তর চঞ্চলতাই তো চির চেনা। ভিতরের গভীরতাকে যদি দেখতে পেতাম একটু।

রেণু ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। নতুন করে দেখলাম ওকে মনে মনে। আর মনে হল, ছোট বউদি যেমন করে বলে গেলেন, রেণুর আঘাত তার থেকে অনেক বেশী। আঘাত তাকে দুঃখের চেয়ে অনেক গভীরে হেনেছে। শোক লেগেছে তার। বিশ্ব চোখে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। তার আজন্মকালের বিশ্বাসগুলি আজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। দুঃখ পেয়ে কাঁদবার আগে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ছোট বউদি বললেন, 'এবার বুঝলে তো ভাই?'

বললাম, 'বুঝেছি। ছোট বউদি, ঘটনাটা আখচারেরই বটে। শুনলে মনে হয়, একটু নির্জনে গিয়ে বসে থাকি।'

ছোট বউদি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'জানি, মানুষ নিজেকে দেখবার জন্যে নির্জনেই যেতে চায়।'

আশ্চর্য কথা ছোট বউদির। আরতির বাজনা থামল। জনতা ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। কমে যেতে লাগল ভিড়। ছোট বউদি বললেন, 'মেয়েটা আবার কোথায় গেল? চল তো দেখি।'

দুজনেই উঠলাম। জগমোহনের ভিতরে দেখে এলাম। জগমোহনই দর্শনার্থী

জনতার নির্দিষ্ট স্থান। রেণু সেখানে নেই। আবার বাইরে এসে, অন্যান্য মন্দিরের বারান্দায় দেখলাম। ভোগমণ্ডপে, বাইরে পাতালেশ্বরের সামনে, লক্ষ্মীমন্দিরের দুয়ারে। রেণু নেই কোথাও। ছোট বউদির চোখে যেন শঙ্কার ছায়া দেখতে পেলাম। আমার মনটা বিমর্ষ উৎকণ্ঠায় ছেয়ে গেল। ছোট বউদি আমার কথা ভুলে গেলেন। ছুটতে লাগলেন চারদিকে।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। কালো পাথরের গায়ে কারুকার্য খচিত নরনারীর বিচিত্র লীলার ভিড়ে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেণু। মাথা তার নত। নিশ্চল শরীর। মনে হল, সেও যেন পাথরের গায়ে এক বিশেষ ভঙ্গির মৌন মূক মূর্তি। যে এই শতাব্দীকে দেখছে অবাক হয়ে।

সামনে মুখোমুখী মানুষ দাঁড়াতে দেখে তার সম্বিত ফিরল। মুখ তুলল। আমি বললাম, 'ছোট বউদি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

রেণু যেন পাথর-স্তব্ধতা থেকে জেগে উঠল। নেমে এল প্রাচীরের মিছিল থেকে। বলল, 'ও। কোথায় কাকীমা?'

বললাম, 'এবার বোধ হয় ওঁকে খুঁজতে হবে।'

দুজনেই এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বউদি তখন একজন পাণ্ডাকে কী বলছেন। আমাদের আসতে দেখেই ছুটে এলেন। বললেন, 'কোথায় ছিলি?'

রেণু বলল, 'ওই তো, দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'আর আমি খুঁজে মরছি। চল ফিরে যাই।'

একটি পাণ্ডা এসে বলল, 'পেয়েছ মা?'

'হ্যাঁ বাবা, পেয়েছি।'

পাণ্ডা বলল, 'কোথায় আর যাবে?'

বলে হাসল। যেন কী একটা রহস্য তার কথায়। রেণু চকিতে একবার আমার দিকে চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল।

ফিরে এলাম আমরা। সেখানে এসেই হৈ হট্টগোল। দেখলাম শিবিদি একটি ঠেঁটি কাপড় পরে রীতিমত রান্নায় নেমে পড়েছেন। অবুদি যোগানদারণী। নিরামিষ তরকারির একটা গন্ধে তখন আমোদিত। আমার বুড়ো পাণ্ডা হয় তো এ-বেলা সত্যিকারের আলুর ব্যঞ্জন নিয়ে বসে আছে।

সারা রাত খানিকটা দাপিয়ে, খানিকটা ঘুমিয়ে রাত প্রায় ভোর হয়ে এল। মনে হল, সারা গা-টা পাথুরে উঁচু নীচু রাস্তার মতো হয়ে উঠেছে মশার কামড়ে। রাত্রে, দোতলার বারান্দায় বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেজদিরা। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে নেবারও একটা সীমা আছে। অতটা পারি নি।

মনে হল, রাত প্রায় শেষ। মেঘের জটা তাকে ধরে রেখেছে এখনও গভীর অন্ধকারে। দরজাটা খুলেই রেখেছিলাম। একটু বাতাস বইছে। যুঁই আর গন্ধরাজের গন্ধ আসছে বাতাসে। কোনোদিকে না তাকিয়ে, একটানে জামা তুললাম গায়ে। দরজা বন্ধ করে এলাম বাইরে। গেটের কাছে এসে দেখলাম, বৈজু শুয়ে আছে। কিন্তু সেই ম্যানেজার বৃদ্ধ আলো জ্বালিয়ে, ঠিক তেমনিভাবেই কী যেন পড়ছেন। আমি বলতে গেলাম, দরজাটা বন্ধ, আমি বাইরে যাব। তার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'হুড়কো খুলে চলে যান।'

অদ্ভুত লোক। সব যেন ওঁর জানা। থাকবেন? থাকুন। যাবেন? চলে যান। হুড়কো খুলে বাইরে এলাম। নির্জন, নিস্তব্ধ চারিদিক। ভয় হল, বৃষ্টি বুঝি এল।

মনে মনে সেই গানটা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল, 'বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি দ্বারে।' প্রায় ছুটতে ছুটতেই গেলাম। আর এক সময়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল, বাতাস নেই, কিন্তু কোথায় যেন ঝড় উঠেছে। তার প্রবল গর্জন এসে আঘাত করছে কানে। আমার দু'পাশের গাছগুলি মৃদু বাতাসে কম্পিত। কিন্তু গর্জন কোথা থেকে আসছে? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে নেই বিদ্যুতের হানাহানি। নেই বজ্রপাতের লক্ষণ। মনে হল, সেই গর্জন এসে পেঁৗছেছে আমার পায়ের মাটির তলায় তলায়।

আমি ধীরে পা টিপে টিপে অগ্রসর হলাম। সেই প্রবল গর্জন বাড়তে লাগল। অথচ আমার আশেপাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ, নিদ্রিত। যেন এই শব্দ তাদের ঘুমন্ত কক্ষে পেঁৗছায় নি। তারপরে বাঁক ফিরলাম। সেই মুহূর্তে আমার দু'চোখ ভরে দেখলাম, আমি যেন এক সমাপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি যেন আর এক শুরুতে এসে পেঁৗছেছি। দেখলাম, শুরু আর সমাপ্তি এখানে কোলাকুলি করে খেলছে। সেই গর্জন আমার কানে কি বিচিত্র দুর্বোধ ভাষে অনেক কথা বলতে লাগল। যে গর্জন হয়ে বেজেছিল সে যে আমারই মহাদিগন্তের অট্টহাস। আঃ! এই তো এলাম তোমার দ্বারে। অস্পষ্ট অন্ধকারে মাখামাখি করে রয়েছে সে। বহুদূরে দেখতে পেলাম কেবল একটি উজ্জ্বল রেখা। যেখানে মহা অম্বর আর মহা নীলাম্বুধি, পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে যেন আবেশে মূর্ছিত প্রায়।

আমি বালুচরের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলাম। আস্তে আস্তে সেই দূর উজ্জ্বল রেখা থেকে মেঘের খেলা স্পষ্ট হতে লাগল। আর সমুদ্র তার ফেনিলোচ্ছল হাসির ঝলকে যেন আমার বুকের ওপর এসে ভেঙে পড়তে লাগল।

বিড়ম্বিত জীবনেও যারা বদ্ধ ঘরের অন্ধ কোণে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ, আমি তাদের মতো মহৎ হতে পারি নি। আমি এসেছি এই স্বর্ণাভ বালুবেলায়। আমার মুক্তির, আমার যেমন-খুশির ঢালাও শয্যায়।

আঃ! কী অগাধ, কী বিরাট! এই তো, আছড়ে পড়া উচ্চ ঢেউয়ে সে হাসছে অট্টহাসি। দূরের তরঙ্গে শুনছি তার বাণীর ঝংকার। নিরলস গানে সে ফেনিল।

এই আমার পরম সৌভাগ্য, আমাকে যখন সে ডাক দিয়েছে, তখন সে নির্জন। তারা গেছে ফিরে, যারা পদ্মপাতায় এক বিন্দু জলের মতো টলোমলো ছুটির দিনগুলিতে এসেছিল।

যারা এসেছিল ঘর ছেড়ে। কিন্তু পাতায় তাদের অস্থির বিচরণ। নগর ছেড়ে নাগরিক আর নাগরিকারা এসেছিল। কিন্তু প্রত্যহটা তাদের পিছন ছাড়ে নি। তারা এসেছিল 'সী-সোর'-এর রম্যভ্রমণে। নগরের কলকণ্ঠ কলরবকে নিয়ে এসেছিল দল বেঁধে। তারা আসে নি নগরের দ্রুতগতি চক্র ছেড়ে। যেন অস্থির হতেই এসেছিল তারা। বাতাসে ছিল তাদের টয়লেটের গন্ধ। যেন সমুদ্রকেই আড়াল করতে চেয়েছিল তাদের রঙ বেরঙের পেখমে।

তারা ছবি দেখতে এসেছিল। ফিরে গেছে ছবি দেখে। গায়ের বালি ধুয়ে ঘরে গেছে টুরিস্ট-এর দল। চিহ্ন তাদের পড়ে আছে চকোলেটের কাগজে, ম্যাগাজিনের ছিন্ন ছবিতে। পরিত্যক্ত চুলের রিবনে আর ভাঙা কাঁটায়।

এই আমার পরম সৌভাগ্য। এ আমার অহংকার নয়। এই যে আমার সময়। আমি যেন এই স্বার্থপর ছেলেটার মতো। মায়ের ভাগ যে কাউকে দেবে না। মায়ের সারা দেহে কারুর ছোঁয়া যে একটু সইবে না। সেই একা-বৃষ স্বার্থপরটির মতো এই নির্জন বেলাভূমিতে আমি লুটোচ্ছি। গড়াগড়ি যাচ্ছি। ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছি।

আঃ। আমার রুদ্ধশ্বাস বুকের যত বিষাক্ত বায়ু, নিশ্বাসে নিশ্বাসে পেল মুক্তি।

সেই বন্ধ জলাশয়ে গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করা মাদক রস সে গ্রহণ করল তার তিক্ত লবণাক্ত তরঙ্গের হাসির লহরে।

এই আমি চেয়েছিলাম। আজি নির্জনে দেখব এই চিরদিনের খেলা। এই বেলাভূমির চির-তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি দিয়ে সমুদ্রকে দেখা। আর নিয়ত সাড়া দিতে সমুদ্রের ছুটে ছুটে আসা। তাদের এই চিরদিনের কোলাকুলি, মাখামাখি, চাখাচাখি রঙ্গ।

সহসা চোখে পড়ল মানুষ। যেন মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সেই নগ্ন পুরুষ। সুদূরে নিবদ্ধ তাঁর চোখ। বালির ঢিবিতে কনুই দিয়ে হেলান দেওয়া এলায়িত দিগম্বর। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে পিছু হটতে পারলাম না। কৌতূহলের হাতছানিতে চিরদিনই রহস্য ভর করে থাকে। ভীরু বিস্ময়ের স্তব্ধতায়, মৃত ভেবেই দাঁড়ালাম থমকে। জীবিত হলে, পাগল ছাড়া কিছু নয়।

ভেবেছিলাম সব ছেড়ে এসেছি। কিন্তু দু' চোখ ভরে আমার আজন্ম অভ্যাস কোথায় যাবে? আমার লজ্জা, আমার সংকোচ আমি রেখে আসতে পারি নি। চোখ ফেরাব ফেরাব মনে করেও দেখেছিলাম জীবিতের নিশ্বাস-তরঙ্গ সেই দেহে। মাথার জটা তার বালিতে লুটানো। বাতাসে বালি ছড়ানো তার দাড়িতে।

মনে করেছিলাম, এত ভোরে কেউ থাকবে না। তারপরে ভাবলাম, সমুদ্রের সঙ্গে যাদের জীবন মরণ খেলা, এ বুঝি সেই নুলিয়া। কিন্তু তাদের দেহেও শেষ পর্যন্ত একটি চিল্‌তে, সভ্যতার চিহ্ন বহন করে।

মনে মনে ছিঃ শব্দের ধিক্কারটা উঠল বিরক্ত বিস্ময়ে। সেই মুহূর্তেই শুনলাম একটি পরিষ্কার গ্রাম্য বাংলা গলা, 'আমাকে কী দেখছ? যাঁকে দেখার তাঁকেই দেখ।'

অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম। বুঝতে পারি নি, কথাটা আমারই উদ্দেশে কি না। মানুষটির মুখ ফেরানো ছিল সমুদ্রের দিকেই। আমার প্রায়ান্ধকার আশেপাশে কেউ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলছেন?'

খানিকক্ষণ কোন জবাব পেলাম না। ভাবলাম, পাগলের সঙ্গে আমিও পাগল হলাম বুঝি। তা ছাড়া সত্যি বলতে কি আমার একটু যেন ভয় ভয়ও করল। সমুদ্র নাচছিল যেন তার বিশাল হাতে তালি দিয়ে। তড়িৎমালা গলায়, থেকে থেকে ঝিলিক-হানা মেঘে বাজাচ্ছিল ডমরু। উচ্ছ্রিত, উৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের ঝাপটায় জলকণা সৃষ্টি করছে কুয়াশামণ্ডল। তার অট্টহাসির গর্জনে এক প্রলয় যেন আসন্ন। জনমানবশূন্য বালুবেলা। মনে হল, আমার পায়ের তলায় বেলাভূমি কাঁপছে। নাচের তালের ঝন্‌ঝনা যেন পৌঁছল ধরিত্রীর গহন গহ্বরে। আমার পিছনে লোকালয় ঢাকা পড়ে গিয়েছে বালির ঢিবিতে। আর আমার সামনে জটা ছড়ানো নগ্ন মানুষ।

পায়ে পায়ে পিছু হটা বিধেয় মনে করলাম। আর সেই সময়েই নড়ে উঠতে দেখলাম মূর্তিকে। হাত বাড়াতে দেখলাম সামনের দিকে। লক্ষ্য করি নি, সেখানে পড়ে ছিল ভেজা ছোট একটি লালপাড় গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড। নাভির নীচে থেকে কোমরে জড়িয়ে, উঠে দাঁড়াল মূর্তি। বয়স আমি সঠিক অনুমান করতে পারি নে। রীতিমত মেদহীন বলিষ্ঠ পুরুষ। আমার দিকে ফিরে তাকাতে দেখলাম, যেন সদ্য ঘুম ভাঙা চোখ। গভীর সুপ্তি থেকে সেইমাত্র যেন মেলেছে চোখ। দাড়ির অন্ধকারে একটু হাসির আভাস লুকিয়ে ছিল কি না টের পাচ্ছি নে। মনে হল, কথায় রয়েছে একটা গ্রাম্যে টানের সারল্য। বললে, 'আর তো কারুকে দেখি না। কাকে আর বলব?'

এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল হাসির আভাস। নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে দেখলাম একটি রুদ্রাক্ষের মালা। কোথায় পড়ে ছিল, লক্ষ্য করি নি। কুড়িয়ে নিয়ে গলায় পরে আবার বললেন, 'এই তো হয়ে গেল, এখন আর দেখবার কিছু নেই। বলছিলাম, সামনে এত

বড় জিনিস থাকতে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে গেলে? কেন?'

সামনে আঙুল তুলে সমুদ্র আর আকাশ দেখিয়ে বললেন, 'ওঁরা কি কিছু পরে আছেন? ওঁদের আকার মানুষের মতন নয় বলে বুঝি?'

হাসিটা এবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সারা মুখে।—'সবই স্বভাব। মানুষের স্বভাব। কোনোটা নকল স্বভাব, কোনোটা আসল। তবে মনে রেখ, ওঁদের একটা দাবী আছে। সময় সুযোগ পেলে মানুষকে সেটা মেটাতে হয়।'

একটি দুর্নিরীক্ষ্য ইঙ্গিত যেন ছিল কথার মধ্যে। কিন্তু বুঝতে পারি নে। পাগল যে নন, তা বুঝতে পারছি। ভয়টাও কাটছে, সাহসও পেলাম একটু। বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে আবার দাঁড়ালেন। বললেন, 'ভাবছ ধর্ম করছি? তা করছি বৈ কি। মানুষ মাত্রেরই ধর্ম থাকে। তা যাই হোক। বলি বিজ্ঞান-টিজ্ঞান পড়া আছে তো?'

বললাম, 'পড়া আছে বলতে পারব না। তবে ওই কিছু কিঞ্চিৎ—'

'ওই কিছু কিঞ্চিৎ হলেও তো জানবার কথা। মনে করেছ বুঝি ছোট ছোট খোকাখুকুদেরই খালি ন্যাংটা করে আলো বাতাস রোদ খাওয়াতে হয়?'

মাথা দুলিয়ে হাসলেন। একবারও মনে হয় নি, আমি কোনো সাধু সন্ন্যাসীর কথা শুনছি। যেন এক প্রসন্ন গম্ভীর প্রৌঢ় পুরুষ। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি তা বলে বাবা মুক্ত হাওয়া খেতে আসি নি। আমি একটু মিলতে এসেছিলাম। এক হতে, একাত্ম হতে এসেছিলাম। ইচ্ছে করে, ভালো লাগে। একবার অন্তত নিজেকে জীবজগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই। নইলে সব সময়ে ধড়াচুড়া বড় স্পর্ধা বলে মনে লাগে, এই আর কি!'

বলে ফিরে তাকালেন সমুদ্রের দিকে। আমারও যেন চমক ভেঙে গেল। দেখলাম, চোখের কুলে হারিয়ে যাওয়া সমুদ্রের শেষ দিগন্তে মস্ত বড় একটি রুপার পাত বাঁকা রেখায় ছিন্ন করেছে আকাশকে। রৌদ্র নয়। হয় তো মেঘেরই শুভ্র রেখা যেন ঝলকে উঠল। পুবে-পশ্চিমে যোজনব্যাপী কৃপাণের মতো। একটি আশ্চর্য আলোর ঝলক লাগল তরঙ্গে তরঙ্গে।

উনি বলে উঠলেন, 'এ'র কাছে আমাকে কী দিয়ে ঢাকব?'

ফিরে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'মানুষের লজ্জা কেবল মানুষের কাছে। যাওয়া যাক।'

বালিতে পা ফেলে ফেলে, ধীরে ধীরে গুনগুন করতে করতে চলে গেলেন দক্ষিণ দিকে। প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম এক মানুষকে। ফিরে যাবার সময়ে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনে হল, একজন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি।

যেন দু' চোখ ভরে দেখলেন ব্রহ্মাণ্ডকে। বিস্মিত হলেন, আনন্দিত হলেন, তারপরে নির্বিকার। যখন আসে সব অন্তরালের তুচ্ছতা।

এই অশেষের কুলে, এই স্বর্ণাভ বালুবেলায়, আমার মুক্তির, আমার যেমন-খুশির ঢালাও বিছানায় আমি যে লুটোই, ছড়াই; ভাবি, আমিও এক শিশু। ভাবি, আমার সব আবরণ, সব অন্তরাল মিথ্যা।

কিন্তু এলাম নির্জন সৈকতের দিগন্তহীন নিরালায়। প্রথম বারেই, থমকে গেলাম মানুষ দেখে। প্রথম শুনতে পেলাম, 'আমাকে কী দেখছ? যাঁকে দেখবার তাঁকে দেখ।'

যেন আমার কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। সত্যি, আমি যে চিটেগুড়ের

মৃত্যুফাঁদ থেকে উড়ে-আসা মাছিটার মতো এসেছি। মানুষ নয়, মানুষের সমাজ নয়। এই সমুদ্র, এই আকাশ, এই বালুচর, আর আমি। আর কেউ নয়।

বালিতে ঘষব আমার পাখা, বাতাসে দেব মেলে। আমার মরা ফুসফুসে নেব সমুদ্রের প্রাণদায়িনী শক্তি। মানুষের পায়ে পায়ে নয় আর। আমার ভুলে-যাওয়া একাকীত্বের ব্যথাকে আমি নতুন আনন্দে অনুভব করব। আমার একলা-কে আমি ছড়িয়ে দেব এই বিশালের মাঝে। কী পাই নি, তার হিসাব মেলাব না। আমি সেই গানটার মতো বলব, চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিছে। আনন্দ, আজ আনন্দ রে!

কিন্তু উদার মহতের সেই অপরূপকে দেখতে গিয়ে, চোখে পড়ল মানুষ। বিচিত্র সে বটে। সে নগ্ন। তবু মানুষ। হায়, মন ছিল আমার অগোচরে। জানতে পারি নি। সব ছেড়ে আসা যায়। তবু নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না।

নইলে মানুষ দেখে অভ্যাস কেন থমকে দিয়েছিল? কেন মন ভরে ছিল কৌতূহলে ও মুগ্ধতায়?

মুক্তিরও কি বাঁধন আছে তবে?

কী জানি! জানি নে।

বোধ হয় এইটুকু আমার বারে বারে সান্ত্বনা। আমার পাওনা। আমি তাই এসেছি। এ যেন আমার নব নব জন্মান্তর।

এবার আমার চোখ পড়ল, সৈকতের পান্থশালাগুলির উপরে। মনে হল যে এ বাড়িগুলি পান্থ বিবর্জিত, নিঃশব্দ। নির্জন সৈকতের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বাড়িগুলিও যেন দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। অচেনাকে বরাবরই বড় সংশয় লাগে, তবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম একটি বাড়ির দিকে। ঢোকবার আগেই কয়েক হাত উঁচু, আর বেশ চওড়া পাঁচিলের উপরে দেখলাম এক যুবক কাত হয়ে শুয়ে। আর এক যুবতী তার শিয়রে বসে আছে এলিয়ে। যেন সমাজ নেই কাল নেই, আছে শুধু 'দুজনার মুখোমুখি বসিবার' চিহ্নহীন মুহূর্তের সমষ্টি। পায়জামা পাঞ্জাবি কুঁচিয়ে পরা শাড়িতে ওদের ফেলে আসা পরিচয় তবু লেগে রয়েছে। এই শ্রাবণেরই কোনো লগ্নে বুঝি ওদের মিলন হয়েছে। মধুচক্র যামিনীর প্রহর কাটছে এখানে। দেখে মনে হল না যে, আমি একটা মানুষ ওদের সামনে দিয়ে চলেছি। বিগত রাত্রির স্বপ্ন, দেহের ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে ওরা দূর সমুদ্রে তাকিয়ে আছে। এই বোধ হয় প্রকৃত নির্জনতা, যা বাঁধা পড়েছে ওদের দুজনার মাঝখানে

কিন্তু, বালি ছড়ানো ছোট লন্ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে দেখছি, এক পক্বকেশ ভদ্রলোক বসে আছেন। বোধ হয় কাগজ পড়ছেন। খালি গা, ফর্সা ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, এই চখা-চখির দিক থেকে অত্যন্ত নির্বিকারভাবে পিছন ফিরে বসে আছেন। আমার সেই সিঁড়ির নীচে সুড়ঙ্গ আর ক্রুদ্ধ মশার আক্রমণ মনে পড়ল। মনে মনে স্থির করলাম আর সেখানে নয়। আশ্রয় নেব এই পান্থশালাতেই। আমার দিগন্তহীন স্তব্ধতা যেখানে কল্লোলে মুখর।

লন্ পেরিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পায়ের শব্দে পক্বকেশ ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। মনে হল এক শার্দুলের সামনে পড়েছি। ওই রকম এক জোড়া গোঁফের দিকে তাকিয়ে কথা বলাই দুষ্কর। চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল পড়া-না-করা ধরা-পড়া ছেলে মাস্টারের সামনে। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?'

প্রথমে কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন থতিয়ে গেলাম। তারপরে বললাম, 'ভাবছিলাম এখানে—'

'থাকবেন। তা থাকুন। থাকবার জন্যেই তো জায়গা। আপনার মালপত্র কোথায়?'

বললাম, 'ধর্মশালায় আছে। কিন্তু কি খরচ খরচা—।'

ভদ্রলোক একবার আমার আপাদমস্তক দেখলেন। দেখে প্রায় মুখস্ত বলার মতো বলে গেলেন, ওপরে এই রেট, নীচে এই রেট, আর তারই সঙ্গে সকাল, সন্ধ্যে, বিকেল, রাত্রে, খাবার ফিরিস্তি। শুনে বুঝলাম, খুব একটা অসাধ্যের ব্যাপার হবে না। বললাম, 'তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।'

উনি বললেন, 'আসুন।' বলেই ঘুরে আবার খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন।

ধর্মশালায় এসে ঢুকলাম প্রায় চোরের মতো। উঠোন পেরিয়ে বাগানের দিকে এসে ঘর খুললাম। আবার সেই পুঁটলী নিয়ে আমার নতুন যাত্রা। ভেবেছিলাম ছোট বউদিদের আর জানাব না। কিন্তু উঠোন ডিঙোতে গিয়ে প্রথম ধরা পড়ে গেলাম শিবিদির চোখে। প্রায় ধমকে উঠে বললেন, 'এই, কোথায় যাচ্ছ?'

যেন চোর ধরা পড়েছি। শুনতে পেলাম সেজদির কণ্ঠস্বর, 'কে রে?'

বলতে বলতেই সেজদি উদয় হলেন দোতলার রেলিঙে। তারপর একে একে সবাই, রেণু ছাড়া। অবুদি চোখ দুটো ছোট করে তাকিয়ে বললেন, 'হাতে ওর সেই পুঁটলী রে শিবি। ছোঁড়া পালাচ্ছে।'

শিবিদি প্রায় চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ও, এই জন্যে তোমায় কালকে রেঁধে বেড়ে খাইয়েছি?'

আমি বললাম, 'না মানে—।'

সেজদি বলে উঠলেন, 'আগে উঠে এস।'

দেখলাম, ছোট বউদির চোখে সেই স্নেহস্নিগ্ধ হাসি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই শুনলাম অবুদি বলছেন, 'শিবি, তুই আবার সাত সকালে ওকে চা রুটি করে পাঠাতে যাচ্ছিলি।'

মাথা নীচু করে এসে অপরাধীর মতো দাঁড়ালাম সামনে। কি করে বোঝাব, এঁদের স্নেহের সুযোগ নিয়ে এ ব্যবস্থা আমি চলতে দিতে পারি নে। সেজদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিলে?'

বললাম, 'সমুদ্রের ধারের একটা হোটেলে।'

সেই মুহূর্তে বিস্ময়সূচক ধিক্কারে সেজদি—শিবিদি—অবুদি কলবল করে উঠলেন। তাতে বুঝলাম, তাঁরা আমার জন্যে কি কি ব্যবস্থা ভেবে রেখেছিলেন। ছোট বউদির দিকে তাকালাম। ছোট বউদি বললেন, 'ঠাকুরঝি ওকে যেতে দাও। ও পুরুষ মানুষ, ও এখানে ঘুরবে, সেখানে ঘুরবে, ওকে কি আমরা ধরে রাখতে পারি। তাতে আমরাও হেনস্থা হব, ও-ও হেনস্থা হবে। পুরীতে থাকলে দেখা হবেই।'

আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমিয়ে উঠল। জানি, আমার চলে যাওয়াটা সেজদিদের মতো ছোট বউদির প্রাণেও বেজেছে। কিন্তু ছোট বউদির দৃষ্টি অনেক দূর অবধি দেখতে পায়। তাই বিদায় দেবার কথাটা তিনিই সহজে বলতে পারলেন। আর সেজদিদের যে-স্নেহ আমি পেয়েছি, তা চিরদিন ধরে অক্ষয় রাখা আমার কর্তব্য বলেই চলে যেতে হবে। কিন্তু সে কথা বুঝিয়ে বলা যায় না।

মুখ তুলে কথা বলতে গেলাম কিছু। কিন্তু ছোট বউদি ছাড়া সবাই চলে গেলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তা আর তার নিখাদ ঐশ্বর্য যেন নতুন করে ধরা পড়ল। ছোট বউদি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'ও রকম হয়। তোমার কাজ তুমি কর। কিন্তু দাঁড়াও, রেণুকে ডেকে দিই। যদি আর দেখা না হয়?'

বলতে বলতেই ছোট বউদি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। যেন আর এক নতুন পরীক্ষায় পড়লাম। রেণু বেরিয়ে এল একলা। খুবই যেন সহজভাবে বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

কিন্তু হাসি নেই রেণুর মুখে। যেন কোন্ এক দূর জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে। আমার কিছু মনে হল না তাতে। আমি এখন রেণুকে বুঝতে পারছি। সে আর আমার অচেনা নয়। খয়েরি পাড় শাড়িটি তার পরনে এখনো। বাসি খোঁপা শিথিল।

বললাম, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। ছোট বউদির আদেশ, আপনার সঙ্গেও দেখা করে যেতে হবে। এর মধ্যে হয় তো কিছু অসুবিধে—।'

রেণু বলে উঠল, 'বুঝতে পারছিলাম, ও কথাটাই বলবেন। কিন্তু আমি তো জানি, অসুবিধে আপনারই হয়েছে। আপনাকে আমাদের সকলেরই ভালো লেগেছে।'

কথাগুলি যেন প্রাণহীন। যেন শেখানো। কিন্তু কে শেখাবে? ছোট বউদি সে-মানুষ নন। তবে এ সব ভাববার কিছু নেই। আমি জানি, রেণু ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ঊর্ধ্বে। বললাম, 'আচ্ছা, চলি।'

রেণু চুপ করে রইল। আমি ঘরের দিকে একবার ফিরে তাকালাম। তারপর নীচে নেমে এলাম। নীচের পাঁচ নম্বর ঘরে তখন ডারা-ডুপকী-প্রেমজুরি সহযোগে গান চলেছে। হয় তো খেপীর গলাই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু দেখা করবার সত্যরক্ষার দায় এখন আর সম্ভব নয়।

সমুদ্রের সারা কালো বুক জুড়ে ফেনপুঞ্জ শাদা ওড়না উড়িয়ে যেন এক অদৃশ্য সঙ্কেতের নির্দেশে সারিবদ্ধ হয়ে নাচছে। কিংবা এই হয় তো, সমুদ্রের খোলা বেণীর ঢেউয়ে ছড়ানো তার শ্বেত-কুসুমের মালিকা। মেঘ আবার ঘন হয়ে এসেছে। দেখলাম, চখা-চখী নেই। হয় তো হারিয়ে গেছে বাইরের নির্জনে কিংবা ঘরের কোটরে।

আমি অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, পক্ককেশ ভদ্রলোক মুখ তুললেন। আমাকে দেখে, গেটের রাস্তার দিকে তাকালেন মুখ ফিরিয়ে। বললেন, 'কই মালপত্তর কোথায়?'

বগলে পুঁটলীটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'এই যে।'

মনে হল শাদা গোঁফ জোড়া খাড়া হয়ে উঠল। প্রায় ব্যাঘ্র-অনুসন্ধিৎসু দুটি চোখে আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ হুঁ দিলেন কি হুংকার দিলেন, বুঝতে পারলাম না। বলে উঠলেন, 'বাঃ! বাহবা। বাহবা! বিদেশে বেড়াতে আসার মতই মালপত্তর বটে! এত বড় একটা বোঝা।...'

ওঁর কণ্ঠস্বরে বোধ হয় একটি চাকর ছুটে এল। কিন্তু ওঁর গোঁফ জোড়ার পাশে একটা কঠিন রেখা উঠল ফুটে। চোখ কুঁচকে বললেন, 'পলাতক?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, মানে—'

'বুঝেছি।'

এক কথায় থামিয়ে দিয়ে, বেশ সহজভাবে বসে, আমার দিকে তাকালেন। মোটা ভ্রূর তলায় সেই ব্যাঘ্রচক্ষু দিয়ে বিঁধিয়ে বললেন, 'বিয়ের জন্যে বাপ মেয়ে-টেয়ে দেখছেন বুঝি? আর ছেলে এদিকে অন্য জায়গায়—?'

'না না, কী বলছেন?'

'হুঁ। তবে? টাকা পয়সা কামানো নিয়ে বাড়িতে ঝগড়া?'

কী বলব। এ যে আরো মারাত্মক। বললাম, 'দেখুন, ওসব কিছু নয়।'

'তবে কী বিশ্বাস করতে হবে আমাকে? নিতান্তই বেড়াতে, না? কিন্তু এ জীবনে অনেক দেখলাম বাবা। অবশ্যি আমার আর কী! এসব আমার জিজ্ঞাসা করা আইন-সম্মত নয়, তবে—'

কট্‌কট্ করে আবার তাকালেন আমার দিকে। গোঁফের দু'পাশে কঠিন বিদ্রূপের ঝিলিক। বললেন, 'চেহারা আর বয়সেই সব প্রমাণ। যাক, এখানে তো শুধু তক্তপোষ আছে, শোওয়া হবে কিসে?'

'ওই—'

'শুধু তক্তপোষেই, না? বাঃ চমৎকার! আর একজন মানুষের যে নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসগুলির দরকার হয়, তার কি হবে? এই যেমন তেলটা, সাবানটা, মাজনটা? পুঁটলীর কলেবর দেখে তো মনে হচ্ছে না, সে সব কিছু আছে।'

কি যে জবাব দিতে যাচ্ছিলাম তা নিজেই জানি নে। তার আগেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পুঁটলীটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে বাবা হোটেলটারও তো একটা প্রেস্টিজ আছে, না কি?—দেখি, ওতে কি আছে, আমি দেখতে চাই। না না, লজ্জার কিছু নেই, আমি দেখতে চাই।'

অগত্যা আমি পুঁটলীটা খুলে ওঁর সামনে ধরলাম। হেসে উঠলেন, কিংবা একটা ক্রুদ্ধ শব্দ করলেন, বুঝতে পারলাম না। বললেন, 'বাঃ বাঃ বাঃ সুন্দর! আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া। দুটো জামা কাপড় নেই, দু' দুটো মোটা মোটা বই, পত্র পত্রিকা? এ তো দেখছি দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতির পত্রিকা, সবই আছে। হুঁ, আন্ডার-গ্রাউন্ডে আসা হয়েছে নাকি?'

আমি বললাম, 'না, না, ওসব কিছু নয়। দেখুন, বলছিলাম কি আপনার বোধহয় অসুবিধে আছে আমাকে রাখার। তাই বলছিলাম—'

'অন্য কোনো হোটেলে যাওয়া যাক, কেমন? অমনি আত্মসম্মানে লেগে গেল? কিন্তু এ ভাবে দেখলে কেউ না বলে পারবে?'

বলে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আপন মনেই মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কি বলব। ওরে সঞ্জয়—'

যে চাকরটা এসে দাঁড়িয়েছিল সে বলে উঠল, 'হুঁ বাবু?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বড় দাদাবাবুকে ডাক।'

বলতেই, লোকটা যে কোথায় অদৃশ্য হল টের পেলাম না। কিন্তু একটা ডাকাত-পড়া চিৎকার শুনতে পেলাম, 'অ বড়া দাদাবাবু। কর্তাবাবু ডাকুচি।'

এদিকে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে, উনিও কোনো কথা বলছেন না, মহা ফাঁপরে পড়েছি মনে হল। হবে হয়তো, ওই বড় দাদাবাবু এসে স্থির করবেন, আমায় রাখা হবে, কি না হবে। কিন্তু তার কি দরকার। বিনা পয়সায় তো থাকতে আসি নি। অত বলাবলি হাঁকডাক কেন। ভাবতে ভাবতেই একজন এসে উপস্থিত হলেন। চশমা চোখে ধুতি শার্ট পরা। তাকে দেখেই পক্ককেশ ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওরে খোকা, এই ভদ্রলোক থাকবেন। তা এই পুঁটলীটি ওঁর সম্বল। এখন দায় তো আমার। বউমাকে গিয়ে আমার নাম করে বল, একটা সিঙল্ তোষক, চাদর, বালিশ, আর মশারিও একটা, আর হ্যাঁ, একটু তেল সাবান, পারলে—'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'নিমের ডালে চলবে?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'দেখুন এই সবের—'

'বুঝেছি। বুঝলি খোকা, ওই সব পাঠিয়ে দিতে বল। ওই সঞ্জয়কে নিয়ে যা। ওকে দিয়ে একেবারে দোতলার গাড়ি-বারান্দার সামনের ডবল-সিটেড ঘরে পৌঁছে দিতে বল।'

নিরীহ খোকা ভদ্রলোকটি চশমার ফাঁক দিয়ে একবার আমাকে অবাক হয়ে দেখে চলে গেলেন। সত্যি পলাতকও নই, চুরি ডাকাতিও করি নি। তবু অপরাধীর মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এবার ভদ্রলোক আমার নাম, ধাম, পিতার নাম জিজ্ঞেস করে লিখে নিলেন। লিখে খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন সই করার জন্যে। সই করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, হোটেলের প্রোপ্রাইটারের নাম মহিম রায়। আরও লক্ষ্য করলাম, এই হোটেলের দুই ঘর বাসিন্দাদের নাম। এক ঘর বোধহয় নীচের, সেই চখা-চখীর।

উপরের এক ঘরে আরও তিনজন মেম্বারের নাম। দুই নারী এক পুরুষ। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

পক্ককেশ গৌরবর্ণ সুপুরুষ, মাঝারি দোহারা মহিমবাবু। মহিম রায়। চোখ দুটি ছোট, দৃষ্টি তীক্ষ্ন। প্রথম দর্শনেই মনে হয়, একটি ঘুন ব্যবসায়ী। প্রায়-সুগোল মুখে, কোথাও একটি কোমলতার ছাপ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শাদা গোঁফে ঈষৎ পিঙ্গল ছাপ। প্রায় একটি সিংহের মত রাশভারী গাম্ভীর্যের ভারে থমথমিয়ে আছে মুখখানি। কোনো মহা আবিষ্কারকের পক্ষেও সেই মুখে হাসি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ভ্রূকুটি করে তাকালে তো, চোখ তুলে কথা বলাই অসম্ভব। একজন হোটেল মালিকের পক্ষে, এর কোনোটাই বড় গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে তার মধ্যেও একটা কিছু ছিল তাঁর সারা অবয়ববের মধ্যে, যা সম্ভ্রমকে জাগিয়ে তোলে। হঠাৎ মনে হয়, সামনে বাবা কাকা কেউ বসে আছেন। কিংবা এ হয়তো কেবলমাত্র আমার নিজের মনের গঠন দিয়ে বিচার।

লেখালেখির মধ্যেই বিছানাপত্র এসে পড়ল। ভদ্রলোক বললেন সঞ্জয়কে, 'এঁকে নিয়ে যা।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এবারে যাওয়া হোক তাহলে এর সঙ্গে।'

উনি আমাকে আর আপনি তুমি কিছুই বলছেন না। ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হয়েছেন কি বিদ্রূপ করছেন, তাও বুঝলাম না। কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব, তারও উপায় নেই। যাবার আগে তাই একবার ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। উনি বললেন, 'কি, অস্বস্তি হচ্ছে? তাহলে তো বাবা আমার কিছু করার নেই। হয় এই ব্যবস্থা মানতে হয়, নইলে অন্য হোটেল দেখতে হয়।'

আমি ওঁর গোঁফের ফাঁকে আর চোখের দিকে তাকিয়ে রাগ কিংবা বিদ্রূপ দেখতে পেলাম না। বরং যা দেখতে পেলাম, তাতে মনের সকল দ্বিধা এই মহা কল্লোলে গেল হারিয়ে। আমি সঞ্জয়ের পিছনে পিছনে দোতলায় গিয়ে উঠলাম। যে ঘরে এনে আমায় সে দাঁড় করালো, দেখে সত্যই মন ভরে গেল। ঘরের সামনে ছোট একটি গাড়ি-বারান্দার ছাদ, তারপরেই দিগন্ত জুড়ে মহাসমুদ্রের খেলা। মহা অম্বরে মেঘের মেলা। এই চেয়েছিলাম। আর কিছু নয়। সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হোটেলে এখন লোকজন নেই?'

সঞ্জয় বলল, 'এই যে বাবু, বারান্দার বাঁদিকের চার নম্বর ঘরে দুই দিদিমণি আর এক দাদাবাবু আছেন। আর নীচে আর এক দাদাবাবু দিদিমণি আছেন। বর্ষাকালে কে আসবে বাবু এখানে। এখন ফাঁকাই থাকে।'

বলতে বলতে সে আমার বিছানা পাতছিল। তারপর অবাক হয়ে দেখলাম, সে টেবিলের ওপর, তেল, সাবান, দাঁতন শুধু নয়, মায় একটি আয়না এবং তোয়ালেও, সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, 'যাই বাবু আপনার খাবার নিয়ে আসি।'

ঘরটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, কে বলবে এ আমার আবাস নয়। মহিমবাবুকে পাগল বলব এমন সাহস নেই। কিন্তু এই চরিত্রকে কি বলব তাও জানা নেই। বাস্তব জগতে এটাই মিথ্যে। সত্যের রূপটাই বুঝি আমাদের কালে এমনি অসম্ভবের আলোয় ঝলকে ওঠে। চিৎকার করে বলতে পারি, ভুলব না। কাকে ভুলব? নিজেকে? সেটাই হবে অকৃতজ্ঞতা। পথের ধূলিতে কুড়িয়ে পাওয়া আমার স্বর্ণ-ভান্ডারে একথা চিরকাল মৌনসুরে বাজুক।

চমক ভাঙল সঞ্জয়ের ডাকে। খাবার যেন প্রস্তুতই ছিল। সাজিয়ে গুছিয়ে হাতের

www.boiRboi.blogspot.com

সামনে এগিয়ে দেওয়ার যা বাকি। কিন্তু আশ্চর্য, আত্মহারা ভাবনায় এতক্ষণ সঞ্জয়কে লক্ষ্য করে দেখাই হয় নি। জানি নে, রোগে কিংবা আর কোনো কিছু লক্ষ্যভেদে তার একটি চোখ হারিয়েছে। দেখলাম, সঞ্জয় একচক্ষু। এবং ওর এক চোখের তারায় দেখছি শত চোখের লক্ষ্যভেদী তীক্ষ্ণতা। কালো রঙ, কত কালো, তা বলতে পারব না। রঙ তার কবেকার অন্ধকার উড়িষ্যার তিন সহস্র পূর্ব বর্ষের নিশা। প্রায় এ ভাবে বললেই হয়। কোনো এক মান্ধাতা আমলে কাচা গেঞ্জিটা সঞ্জয়ের গায়ে বেশ ফর্সাই দেখাচ্ছে। তবু মানো বা না মানো, নাম সেই তৃতীয় পাণ্ডবের, সঞ্জয়।

টেবিলের ওপর খাবার রেখে, প্রায় মেয়েলী গলায় বলল, 'খাবার খান বাবু, চা নিয়ে আসছি।' যদিও এক চোখ, ঘোর কৃষ্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূল, উচ্চতায় ফুট সাড়ে চার, এবং তার ওপরে গলার স্বর ঈষৎ সানুনাসিক চাপা, কিন্তু সুরটি যেন বর্ষীয়সী স্নেহময়ী মহিলার। খানিকটা ফিরে আবার প্রায় অমায়িক ঠাকরুণের মত জিজ্ঞেস করল, 'ঘর পছন্দ হয়েছে তো বাবু?'

লবঙ্গলতা দেখি নি কখনো। ললিতভঙ্গি দেখেছি। সঞ্জয়ের পেশল নিটুট কালো পুরুষের অঙ্গে সেই ললিতভঙ্গির বিচিত্র মহিমা। বললাম, 'খুব। এমনি একটি ঘরই চেয়েছিলাম।'

সঞ্জয় কৃতজ্ঞতায় প্রায় নুয়েই পড়ল। বুঝে ওঠা দায় হল, হোটেলের বোর্ডার আমি, না খাস সঞ্জয়েরই অতিথি। সে আবার বলল, 'হ্যাঁ বাবু, আমাদের বাবু কি আপনার চেনা শুনা?'

'না।'

'অ! তবে কি আপনি কুনো কোম্পানির এজেণ্টো?'

কোম্পানির এজেণ্টো? সে আবার কি! আমার হকচকানো অবস্থা দেখে, তেঁতুল-বীচি দাঁতে অমায়িক হেসে বলল, 'বুঝতে পারলেন না? মানে কথা, আপনি কোন্ আপিসের লোক? অনেক সময় উঁয়ারা আসেন, সঙ্গে মালপত্তর কিছুই থাকে না। আমাদের বাবু তখন সব দেন।'

অনুমান করলাম, নানান্ কোম্পানির রিপ্রেজেণ্টেটিভদের কথা বলছে। যাদের সময় নেই, অসময় নেই। যারা অধিকাংশই দরকারি সময়ের অতিথি। সজন নির্জনের কথা তাদের মনে থাকে না। এ জায়গাটা সমুদ্র সৈকত, কিংবা পর্বত, তারা মনে রাখে না। পরিচয় তাদের এক, প্রতিনিধি। কাজ একটি, পসরার গুনগান। এক জায়গায় বাঁধা তার খুঁটি, দোকান।

কিন্তু আমাকে দেখে কেন সঞ্জয়ের এজেণ্টো ভাবনা? বললাম, 'কে বলল তোমাকে আমি কোম্পানির এজেন্ট?'

লজ্জায় জড়িতপ্রায় ব্রীড়াময়ী সঞ্জয় বলল, 'না, কেউ বলে নি। এ সময়ে এখানে আর কোনো বাবুরা তো আসে না। তাই বলছি। যা ও বা দু'চার দল আসিছিলো, মেঘ করতে সব পালিয়ে গেছে।'

সেই হয় তো আমার সহায়। বললাম, 'না সঞ্জয়, আমি এজেণ্ট নই, কোনো অফিসের বাবুও নই। আমি বেড়াতে এসেছি।'

সঞ্জয় তাতে অখুশি নয়। বলল, 'তা বাবু বেশ করেছেন। মন যদি বলে বেড়াব, তবে আর কী করা যাবে, অ্যাঁ? হোক ঝড়বিষ্টি যা খুশি।'

মানে?

লোকটা আমাকে ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু সঞ্জয়ের এক চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে একটি দুর্বোধ ঝিকিমিক। পানের ছোপ-ধরা দাঁতে প্রায় যেন স্নেহের হাসি। ঠাট্টা কিংবা বিদ্রূপে, তা বুঝতে পারলাম না। আবার বলল, 'কিন্তু

বাবু, আপনার সহিতে তো ছাতা নাই। আর সেই বিষ্টির সময় যে জামা গায়ে দেয় বাবুরা? কিছু যে আনেন নাই বাবু?'

বৃষ্টির সময়ের জামা নিশ্চয় রেনকোট। কিন্তু সে সব আয়োজনের কথা কে ভেবেছিল? কোথায় ছিল সে সময়? আমি তো ভ্রমণে আসি নি। আমি ছুট দিয়েছি দিশেহারা হয়ে। অত সবের কথা আমার মনে থাকবার কথা নয়।

সত্যিই তো! মন বলেছে, তাই এসেছি। হোক ঝড় বৃষ্টি!

আমি এসেছি এখন দেশকাল ছাড়িয়ে। মরশুম অমরশুমের সীমা পেরিয়ে। এই মেঘ আমাকে নিরালা করেছে। কিন্তু স্বার্থপর করে নি। সমুদ্রতটবর্তী দেশে এ তার শুভ অভিসার। আজ জন থাক, গণ থাক। আজ আমি একা হতে এসেছি সেই অদৃশ্যলোকের মহাভবের এক কোণে। আমি থাকব খোলামেলায়। তবু আমার লুকিয়ে থাকা কেউ টের পাবে না। আমি কথা বলব সরবে। তবু আমার কথা কেউ শুনতে পাবে না।

কিন্তু সঞ্জয় যে নড়বার নাম করে না। বরং এগিয়ে এসে বলল, 'দেখুন তো বাবু, পছন্দ হয়েছে?'

আবার কি পছন্দ হবে। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সঞ্জয়ের সেই প্যালা কুড়োনো চোখ। প্রায় সলজ্জভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ইঙ্গিতটা বিছানার প্রতি। বিছানা নয়, শয্যা রচনা হয়েছে প্রায়। নিভাঁজ নিটুট বিছানা।

বললাম, 'খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু সঞ্জয়, বাথরুমটা—'

সঞ্জয়কে বিদায় করার ও ছাড়া আর উপায় ছিল না বোধহয়। তাড়াতাড়ি বলল, 'এই যে বাবু, বাইরে আসুন, বারান্দার ধারেই। তা হলে বাবু আপনি হাত মুখ ধোন। খাবার খান, আমি আপনার চা নিয়ে আসি।'

সঞ্জয় গেল, কিন্তু তেমন অশান্বিত হতে পারলাম না। তার তাড়াতাড়ি যাওয়াটা যেন আরো তাড়াতাড়ি ফেরার তাড়া।

তবু স্বস্তি পেলাম। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলাম আমার ঘরে। এ হোটেলের নাম 'নোঙর-ঘর'। মনে হল, এ বাড়ি যেন সত্যি নোঙর-ঘর। সমুদ্রের শাদা ফেনায় হাসির ঝিলিক। সামনের শূন্য বালুবেলায় অজস্র পায়ের দাগ। বহু যুগ আগে যারা এসেছিল, তাদেরই পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। দূর সমুদ্রযাত্রা শেষ করে যে-ঘরে তারা বিশ্রাম করেছিল, আমি সেই ঘরেই বসে আছি। এই যেন সেই ঘর। সেই বাড়ি, যেখানে দিগন্তহীনের পাড়ি জমিয়ে ক্লান্ত মাঝিরা এসেছিল।

'বাবু!'

সঞ্জয়! যা ভেবেছি তাই। তাড়াতাড়ি আসবার জন্যেই তাড়াতাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু এত করিৎকর্মা হলে তো মুশকিল। না হয় একটু ডাকাডাকিই করতাম। চিরকাল তো জানি, হোটেল-বয়দের দশবার ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না। বিশ বার ডাকলে কাজ আদায় হয়। কিন্তু 'নোঙর-ঘর' হোটেলের বয়ের বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন?

চা টেবিলের ওপর রেখেই বলে উঠল, 'বাবু, বড় ঠান্ডা বাতাস। চা জুড়িয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেন।'

বলেই চলে গেল। তাতে আমারই অবাক হবার কথা। যা ভেবেছিলাম, তা নয় তবে। নিশ্চিন্ত হয়ে চা নিয়ে বসলাম। আকাশ জুড়ে মেঘ রয়েছে, তবু পূর্ব বাতাসের প্রকোপটা ছিল। গরম চা শুধু আর চা নয়, অমৃত।

কিন্তু আবার সঞ্জয়! হাতে জলের গেলাস। তবে, না। দেখছি, আমারই ভুল। গেলাস রেখেই আবার ছুটল সে। পিছনে শব্দ পেলাম দরজা বন্ধের। বেচারী! নিশ্চয় কাজের তাড়া দিয়েছেন মনিব।

পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। এবার হৃৎকম্প, তারপরে রাগ হল। আবার সঞ্জয়! এবং এবারে তার ব্যস্ততা নেই। বেশ একটি শান্ত ভাব।

তাকিয়েছিলাম ভ্রূ কুঁচকে। কিন্তু সঞ্জয়ের এক চোখে বোধ হয় তা গোচর হল না। তেঁতুলবীচি রঙ দাঁতগুলি দেখিয়ে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসলেম বাবু। আপনার ঠান্ডা লাগবে কি না।'

তা বেশ তো। ঠান্ডা লাগবে বলে দরজা বন্ধ করেছে। কিন্তু আবার ঘরে কেন? মুশকিল এই সরাসরি জিজ্ঞেস করব, সেটা পারি নে। সোজা চলে যেতে বলব, কিন্তু সে রকম বলতে শিখি নি। সংসারে সোজা কথা সোজা বলে যারা গর্বিত, তাদের আদর্শটা কোনোদিন গ্রহণ করতে পারি নি। দেখলাম, সঞ্জয় রীতিমত হাঁটু মুড়ে জাঁকিয়ে বসল।

ছেলেবেলায় পিতৃদেব গীতা পাঠ করতেন। তখন বুঝতাম না, 'সঞ্জয় উবাচ' মানে কী। এবার বুঝলাম। পুনরায় সঞ্জয় উবাচ, 'আমার আর কাজ কি বাবু। আপনাদের ফাই ফরমাশ খাটা কাজ। মুনিবের যা হুকুম তাই করছি। তা এই তো কটা লোক। আপনি, ওপাশে দুই দিদিমণি, দাদাবাবু। নীচে দুজন। চা জল-খাবারের পাট মিটিয়ে দিয়েছি। আবার সেই দুপুরে খেতে দেব।'

সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার এখন কোনো কাজ নেই সঞ্জয়।'

সঞ্জয় এক গাল হেসে বলল, 'তা কি আর আমি জানি না বাবু? আপনি বলবার আগে আমি সব করে দেব। আর বাইরে যদি পাঠাতে হয় কোনো কাজে, বলবেন। যা বলবেন, যখন বলবেন, দু'-পহর রাতে হলেও এ সঞ্জয় নায়ক সব পারে।'

নায়ক পদবী, কিন্তু নায়কোচিত গুণ-গরিমায় কিছু কম নয় সঞ্জয়। চিরকাল ধরে জানি, যা খুশি, ওটা নায়কদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমার যা খুশি, যখন খুশি বলে কোনো বস্তুর দরকার নেই। কেবল এখন একটি প্রার্থনাই করযোড়ে করতে পারি, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

আর সেই মুহূর্তেই বিগলিত হাসির সঙ্গে প্রশ্ন, 'নায়ক কি বুঝলেন তো বাবু?'

বললাম, 'জানি। পদবী।'

'কী জাত বলেন তো?'

কী আশ্চর্য! হেসে হেসে ঘাড় দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়। যেন কি এক আজব মজা! কেমন করে জানব? আর কী জন্যে জানব? এ দেখছি, যে যায় বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে, সেই দশা। যে যায় নির্জনে, যত জন জনতা তার সনে। এই আমার চিরদিনের ভাগ্য! এই দুস্তর পারাবারের নিয়ত মহাভাষের কাছে এলাম স্তব্ধ হতে। এখন মনে হল, তার দূর তরঙ্গেও কোথায় যেন একটি হাসি মিটি মিটি করছে আমার অবস্থা দেখে!

বললাম, 'জানি নে।'

'খন্ডাইত জাত বাবু।'

'ও!'

'হ্যাঁ। কিন্তুম্ তষা নয় বাবু।'

কিন্তুম্ কিন্তু, কিন্তু তষা আবার কি? জিজ্ঞেস করলাম, 'তষা মানে?'

এত বড় অবুঝ দেখে, কেশো গলার হাসি আর চাপতে পারল না সঞ্জয়। বলল, 'চাষা, চাষা। আমাদের চাষা বললে, খুনোখুনি হয়ে যায় বাবু।'

তা শুনে আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। তাকে আমি চাষা বলব না, খুনোখুনি হবার কোনো কারণও নেই। তবু বলতে হল, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ বাবু। তবে কি না বাবু, আমরা চাষ-আবাদই করি।'

এখন বোঝ, এর কি জবাব আছে। চাষ-আবাদই করে, কিন্তু চাষা বললেই খুন। আর সেই খুনের খড়্গ রকমফেরে এখন আমার ওপরেই উদ্যত দেখছি।

'আর লিখাপড়া শিখলে, আমরা করণ হয়ে যাই। মানে ভদ্দরলোক, বুঝলেন?'

'বুঝেছি।'

প্রায় ভয়ে ভয়ে বলতে হল সঞ্জয়ের এক চোখের দিকে তাকিয়ে। কী জানি, আবার যদি সন্দেহ করে বসে করণ মানে জানি নে। আবার বোঝানো, আবার ব্যাখ্যা।

কিন্তু সঞ্জয়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চুপ করে রইল, মাথা নামিয়ে। আমিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই সঞ্জয় উবাচ, 'কিন্তুম্ বাবু, এই খণ্ডাইত থেকে গেলাম, তাতেই যত গোল হয়েছে। সন্সারে টিকতে পারলাম না।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'তা তো বটেই।'

সঞ্জয় হেসে বললে, 'না, তা নয় বাবু। আমার ছয় মান ভূমি আছে। চাষ করতে আমি ভয় করি না। আমার খাওয়া পেওয়ার দুঃখু নাই। আমি কেন এ হোটেলে কাজ করতে আসব? কিন্তুম্, টিকতে দিল না বিম্বাধরী। আর তাকে আমি কী দেই নাই?'

চরিত্র এবং ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। দেখলাম, সঞ্জয়ের অন্ধ চোখটাই কাঁপছে এখন বেশী। আর এক চোখের সপ্রশ্ন দৃষ্টি তার আমার দিকে! হাসি তবু ভালো লেগেছিল। এখন দেখছি, জিজ্ঞাসায় করুণ চাহনি।

কিন্তু আমি যে চরিত্রদের ছেড়ে এসেছি। ঘটনার বাইরে এসেছি। কাহিনী জমেছে অনেক। সেই গ্লানির ছকে আর আমি বাঁধা পড়তে চাই নে। আমি কাহিনী-হীন রূপের দুয়ারে এসেছি।

কিন্তু একটিমাত্র মানুষ যেখানে, সেখানেই কাহিনী। সঞ্জয়ের দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প আমাকে ঘিরে গণ্ডী রচনা করতে লাগল। সহসা যেন দেখলাম, একচোখো মানুষটার মধ্যে কোথায় একটা অসহায়তা চেপে রয়েছে। মনে হল, কী একটা অব্যক্ত যেন ব্যক্ত হতে চাইছে আর সেটা, আমার এই কাহিনী-হীন রূপের দুয়ারে ছুটে আসার মতই অপ্রতিরোধ্য। আমি চুপ করে রইলাম।

সঞ্জয় বলল, 'বাবু, কাজে কামে থাকলে সময় কেটে যায়, নইলে মনটা উড়ুত পুড়ুত করে। তাই আপনাকে দুটো কষ্টের কথা বলছি। এই দেখেন শাওন যাই যাই করছে। বিয়ালি ওঠবার সময়। সামনে বিরি বোনবার কাজ। কী হচ্ছে, কে জানে।'

না বুঝলাম বিয়ালি, না বুঝলাম বিরি। এবার না জিজ্ঞেস করে উপায় রইল না, 'বিয়ালি আর বিরি কী, বুঝলাম না।'

এবার আমাকে অর্বাচীন ভেবে হাসল না সঞ্জয়। বলল, 'আপনি বুঝবেন না বাবু। বাংলা দেশে যাকে বলে আউস ধান, তাকে বলে বিয়ালি। আর বিরি হল বাবু বিরি। মানে কি আপনার, এই যে হোটেলে আপনারা কড়াইয়ের ডাল খান, সেই রকম। কলাইয়ের মতন, কিন্তুম্ কলাই নয় বাবু। বুঝলেন? তা কি বলব বাবু, মনটা আকুলি পাকুলি করছে। কী জানি, চাষ হল কি না হল...। বাবু, বাপ-ঠাকুন্দা বলত আমরা খণ্ডাইত, খণ্ডা নিয়ে লড়াই করতাম। খাঁড়া যাকে বলে বাবু। তো সে খাঁড়া ভেঙে আমরা লাঙল বনাইছি! চাষ-আবাদের সময় হলে মন ঠিক থাকে না। তা কি করব! বিম্বাধরী আমাকে ঘরে রইতে দিলে না! আঃ! হে মহাপরভু, আমার মেনকার না জানি কী হাল হয়েছে। বাবু, এই ভুঁয়ে বসে বলছি বাবু, পীরিতি ভালো নয়।'

পীরিতি ভালো নয়। ভুঁয়ে বসে হলপ করে বলছে সঞ্জয়। হাত নাড়ছে ঘন ঘন। আমি দেখলাম, আমার মুক্তি আমার সঙ্গে তার চুক্তি ভঙ্গ করল। যে মহতের দ্বারে

আমি সকল তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে, মহাপ্রেমের লেনাদেনায় এসেছিলাম, দেখলাম, তার নাচের ফিরতি তাল এসে মিলল সঞ্জয়ের কথায়। নির্ভুল সমে এসে তাল দিল। আর তার বারেবারের পুনরাবৃত্তিতে বাজাতে লাগল সেই পুরনো কলিটা, 'পীরিতি বিষম জ্বালা'...

দিগন্তহীন। আমি যে ওই পুরনো কলি-র পংক্তি থেকে তোমার কলিহীন সুরসায়রে এসেছি। কিন্তু আমার মুক্তির এ কি অসহায়তা!

সঞ্জয়ের চোখে কিন্তু জল নেই, ওর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাসির একটা অচ্ছেদ্য ভাব। কেবল ওর একটি চোখের দৃষ্টি এখন বাইরে। সুদূরে নিবদ্ধ। আমি নীরব রইলাম।

সঞ্জয় পা ঘষে ঘষে আমার তক্তপোষের কাছে এগিয়ে, উবু হয়ে বসল। হাত দিয়ে, তক্তপোষের গায়ে আঙুলের দাগ কেটে কেটে বলল, 'বাবু, আমি গরীব, আমি তষা। (ভাগ্যিস। ও নিজেকে তষা বলছে!) কিন্তুম বিম্বাধরী যখন যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। তার হাত খালি ছিল, তিন সের কাঁসা দিয়ে দু'টি খড়ু (বাউটি) গড়িয়ে দিয়েছি। পায়ের গোড়বালা গড়িয়ে দিয়েছি, সেও বাবু খাঁটি কাঁসার। পিতলের চুড়ি আর রেশমী চুড়ি দিয়েছি কত। হ্যাঁ বাবু, দিবার মতন হাত তার। আমি এক চোখ দিয়ে দেখেছি, গাঁয়ের সকলে দু' চোখ দিয়ে দেখেছে, বিম্বাধরীর তুলনা নাই। হে জগড়নাথ, পাপ নিও না।...বাবু, জগড়নাথের মন্দিরে পাথরের ভগবতীর মতন বিম্বাধরীর গড়ন। তার সাধ না মিটালে পাপ হয়। তার কানে আমি কাঁসার বদলে রুপার কানফুল গড়িয়ে দিয়েছি। মুদী দিয়েছি তিনটা, মানে আংটি বাবু! রুপা আর পিতল দিয়ে গড়া। রুপার তারে গলার মালা, সে বাবু বিম্বাধরীর গলায় ছাড়া সন্‌সারে আর কারুকে মানায় না। কী বলব আমি!'

কী বলবে সঞ্জয়। কতটুকু বলেছে! যাকে অদেয় কিছু নেই, সে যে শুধু বিম্বাধরী নয়। সে ভুবনেশ্বরীও যা, সঞ্জয়েশ্বরীও তাই। রাজরাজেশ্বরীকে মণি মুক্তায় মানায়। তিনি সিংহাসনে বসে ঝলক হানেন। কিন্তু মানাবে কি সেই অসামান্য রুপোর তারে গাঁথা প্রবাল হারে? তাঁর কি ঝলক লাগবে, পিপাসিত-প্রেম-হৃদি সিংহাসনে বসে। উঁহু! হৃদয় রাজা সঞ্জয় তা মানবে না। সে কী বলবে!

বললাম, 'সত্যি, বলার কিছু নেই।'

'কিন্তুম্ না বলে থাকতে পারি না বাবু।'

স্মৃতি-মন্থিত ভারী একটা করুণ হাসি চিকচিকিয়ে উঠল তার তেঁতুলবীচি দাঁতে। কী জ্বালা। সংসারে সে কেমন কথা, যা বলা যায় না। কিন্তু না বলেও থাকা যায় না। এ যেন সেই, বুকে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে। পোড়ানির জ্বালায় আগুন ভিতর থেকে বাইরে না এনে উপায় থাকে না। তাতে না জুড়োয় জ্বালা। পোড়ানির দাগ দেখিয়ে শুধু কলঙ্ক।

কিন্তু যার ভিতর পুড়েছে, বাহির পুড়েছে, তার কলঙ্কের কী ভয়? তখন কলঙ্ক তার প্রেমের ভূষণ, প্রেমের বসন, প্রেমের পসরা। সঞ্জয়কে আমি চুপ করতে বলব কেমন করে?

সঞ্জয় বলল, 'বাবু সে কথা কি বলবার?—বিম্বাধরীর সঙ্গে আমার কাঁচপড় হবার পরদিন ঘোর সাঁঝে পিণ্ডার উপর গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিসি বলল, রুপোর বেসর চাই আমার কালি বিহানে। বাবু, বিয়ালি আমার মাঠে, ঘরে চারগণ্ডা নগদ পয়সা নাই। মহাজনের কাছে ধার করে গড়িয়ে দিয়েছি। দিতে হয়, কেন জানেন তো?'

কী করে জানব? বেসরের যুগ থেকে সরে এসেছি অনেক কাল। মা কাকীমাদের নাকেও সেই অলঙ্কার কোনকালে দেখি নি। কারণ জানব কেমন করে। বললাম, 'না,

জানি নে।'

এবার অবাক হল সঞ্জয়। বাঙালীরা যে পুরোপুরি হিন্দু নয়, এমন একটা নাক-উঁচনো অভিযোগ উড়িষ্যার অনেক হিন্দুর মধ্যে দেখেছি। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালেও। ক্ষুব্ধ স্পষ্টোক্তি শুনেছি, বাঙালীর আবার জাত কিসের? কিসের বিচার?

জাত নয়, আসলে বর্ণের বিচার সেটা। ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার। খাওয়া-পরার বিচার। সংস্কার আর নিয়ম পালনের বিচার। কিন্তু উড়িষ্যাবাসী সেই সব বন্ধুদের বলতে দ্বিধা করি নে, সেই সুদিনের সূর্য বাংলা দেশ আজও দেখে নি। তেমন দিন কবে আসবে, যেদিন আমরা সত্যি সত্যি হিন্দুত্বের খোলসটাকে একেবারে ছাড়তে পারব। হিন্দু হতে পারব মনে প্রাণে। যেদিন আমাদের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার সত্যি শেষ হবে। খাওয়া-পরার মুক্তি আসবে। আচণ্ডালে কোল দেব আমরা। যেদিন ছাপার অক্ষরের বক্তৃতাতে সীমাবদ্ধ থাকব না। মনে প্রাণে গ্রহণ করব।

নীলাচলের মহাপ্রস্থানের পথে সেই শহীদকে উড়িষ্যাবাসীরা আর কোনো দিন ভুলতে পারবে না। সেই দিন সমাগত, উড়িষ্যার নতুন সন্তানেরা যে-রক্তের ঋণ মেটাতে আজ অগ্রসর।

থাক সে কথা। সঞ্জয়ের কথা শুনি। তার উন্নাসিকতা নেই। বিদ্বেষের বিষ নেই। তার আছে বিস্ময়। আছে আমার মত অজ্ঞের প্রতি করুণা। বলল, 'জানেন না বাবু? মেয়েছেলের নিশ্বাসে খারাপ হাওয়া থাকে, কিনা তাই। মানে কি আপনার বাবু, তাদের ভিতরে একটা ডাকিনী-শাকিনী থাকবেই।'

'তাই নাকি?'

একটি চোখ বড় করে, চাপা গলায় বলল সঞ্জয়, 'হ্যাঁ বাবু। দেখবেন, পায়ের আঙুলে আঙুটি কেন দেয় মেয়েছেলেদের? ডাগর বউ ঝি-দের? অলক্ষ্মী তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে যে! তাই পায়ে বন্ধন দিতে হয়! যাতে খারাপ পথে না যেতে পারে।'

একথা আমার জানা ছিল। বললাম, 'এটা শুনেছি।'

'শুনেছেন তো বাবু? এও সেই রকম। মেয়েদের ভিতর থেকে যে খারাপ নিশ্বাস বেরোয়, নাকে সোনা রুপা থাকলে সেটা শুদ্ধ হয়ে যায়। নইলে সোয়ামী সন্তানের গায়ে লাগবে তো সে নিশ্বাস। অকল্যাণ হবে যে!'

তর্ক বৃথা। নারীর অপমান? সে তর্কেও সঞ্জয় আগেই হার মানিয়ে রেখেছে। বিম্বাধরী নামে এক নারীর জন্যেই যার উথালি-পাথালি প্রাণ, সে যে সজ্ঞানে নারীর অপমান করবে, একথা বিশ্বাস করতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে না হয় স্বামী সন্তানের কল্যাণে, বিষাক্ত বায়ুর আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু দুধের শিশু-মেয়েকেও তো দেখেছি, সাধ করে নাক ফুটো করতে। যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ বেচারীর নীল হতে দেখেছি। জল পড়তে দেখেছি চোখ ফেটে। তারপরে সোনা রুপো বিহনে শুধু খড়কে গুঁজে হাসতে দেখেছি। স্বপ্নের হাসি, একদিন সে নাসিকাভরণ পরবে। সে সাজবে। সুন্দরী হবে।

সন্ধ্যাবেলা, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে, বিম্বাধরী যে চুপি চুপি বলেছিল বেসরের কথা, সে কি শুধুই সংস্কার। হায় সঞ্জয়, তুমি আমি চিরদিন ধরে সেই এক অনাবিষ্কারের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি।

সঞ্জয় বলল, 'বাবু, মেয়েমানুষের নাকের বেসর হল স্বামীর আয়ু। নইলে আমার জোয়ান হুন্ডার মতন দাদা, অমন পটাং করে মরে যাবে কেন? আধি নাই ব্যাধি নাই, মানুষটা মাঠ থেকে এল। মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল ঘরে। গাঁয়ের সকলে

বললে, ভূতখণ্ডিয়ায় পেয়েছিল লোকটাকে।'

'ভূতখণ্ডিয়া কী?'

'আজ্ঞে বাবু, সেই ঘূর্ণী ঝড় বলে না, তাই! বন্ বন্ করে ডাক ছাড়ে, আর শুকনা পাতা, বিচালী সব নিয়ে পাক খেতে খেতে ছোটে, তাকে বলে ভূতখণ্ডিয়া। অনেক লোকে তাইতে মরে যায়। সবাই বললে, আমার দাদা তাইতে মরেছে। তো বাবু, আমার ধন্দ যায় নাই। ভূতখণ্ডিয়ায় পেলে, ঘরে ফিরে আসা তার দায়। কী করে আসবে? তাকে দলে মুচড়ে আছড়ে ফেলে রেখে দেবে না! কিন্তুম্ পঞ্চায়েতের বিচার তাই, কী আর বলব।'

মৃত্যুতেও পঞ্চায়েতের বিচার, এ-কালে শুনি নি। বললাম, 'পঞ্চায়েতের কী আছে এতে?'

'পঞ্চায়েত বিচার করবে না বাবু? গাঁয়ের মধ্যে একটা দোষ ঢুকল, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগবে না? গাঁয়ে মহাকাল শিব আছেন, তাঁকে পুজো দিতে হয়েছিল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বউদির বুঝি নাকে বেসর ছিল না?'

মুখটা নামিয়ে নিল সঞ্জয়। যেন একটা অপরাধ এসে ভর করল তার ওপরে। চোখ নামিয়ে নিল সে। নীচু গলায় বলল, 'ছিল বাবু। তা সে বাবু, আমার পাপ হয়েছিল, তাই জগড়নাথ আমাকে আজ শাস্তি দিচ্ছেন। আঃ। বাবু, আমি মুচীর অধম, খণ্ডাইতের জাত নষ্ট করেছি। বাবু, দাদা বেঁচে থাকতেই বিম্বাধরীর সঙ্গে আমি খারাপ হয়ে গেছিলাম। আমি পিণ্ডাতে শুয়ে থাকতাম, বিম্বাধরী ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। বাবু, বিম্বাধরীকে দেখলে আমার ধর্ম জ্ঞান থাকত না। সেই আন্ধারি রাতের কথা আমি ভুলব না। বিম্বাধরী চুপি চুপি এসে ডাকল। হে মহাপরভু। দেখলাম তার চুল খোলা, চোখ দুখানি ঝকমকাচ্ছে। উঠানের পলিগাদার পেছুতে চলে গেলাম দুজনে। সেদিনে বাবু পাহাড়ি বাতাস সন্সন্ করছিল। আকাশে যেন তারাগুলানের জায়গা কুলায় না। সেইদিনই বেসরটা কোথায় ছিঁড়ে পড়ে গেল। আর খোঁজ পাওয়া গেল না।'

তা তো বুঝলাম। কিন্তু এদিকে আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম বউদির কথা, শুনছি বিম্বাধরীর অভিসার কাহিনী। বললাম, 'আমি তোমার বউদির কথা জিজ্ঞেস করছি।'

সঞ্জয় চোখ তুলে একবার হাসল। সেটাকে বোধ হয় শোকের হাসি বলা যায়। বলল, 'তার কথাই তো বলছি বাবু! ওই যে তখন বললাম, তার সঙ্গে আমার কাঁচপড় হয়েছে। মানে দ্বুতিয়া বুঝলেন? বিম্বাধরী তো দাদার বউ ছিল। ঘরের বউ যাবে কোথায় বাবু? মেয়েমানুষ বাবু ভাদুরে মহানদীর লৌকা। তার হাল ধরতে লাগে। এক মাঝি গেলে, আর এক মাঝিতে ধরে। নিজেদের লৌকা বাবু কাকে দিব? আমাদের খণ্ডাইতের ঘরে অইরকম নিয়ম। ঘরের বউ ঘরেই থাকে। আর এক ভাইয়ের সঙ্গে তার কাঁচপড় হয়। মানে দ্বুতিয়া। কেউ কেউ বলে পেহেঁকালি। সে বিয়েতে খালি বাঁশী বাজে। শাঁখের মতন শব্দ হয় সে বাঁশীর। তার নাম পেহেঁকালি।'

পেহেঁকালি বুঝলাম না, কাঁচপড়ও অগাধ জলে। শব্দগত ভাবে বুঝলাম শুধু দ্বুতিয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয়া। এবং দ্বিতীয়বার বিবাহের ওইটিই পরিভাষা। আমার চিরকালের সংস্কারাচ্ছন্ন মন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। দ্বিতীয়বার বিবাহ, সেটা যদি বা মানি, দাদা জীবিত থাকতে বউদির সঙ্গে লুকিয়ে দৈহিক প্রেম, চিন্তার দিক থেকে সেখানে আমিও একজন খণ্ডাইত। সেখানে আমার মনও 'তষা'-র মন। সেখানে পাপচিন্তা থেকে আমিও মুক্ত নই।

কিন্তু তাকে কি করে অস্বীকার করা যায়, যে ধর্ম ভুলিয়েছে, কর্ম নিয়েছে

কেড়ে, সে যে বিম্বাধরী! তখন যে বিম্বাধরীরই ধর্ম। সে-ই কর্ম। কেমন করে স্বীকার করব যে বিম্বাধরী শুধু মাত্র রক্তকে জাগিয়েছিল। আমার সামনে যে বসে আছে, তাকে দেখে তো মনে হয় না, রক্তের উল্লাস মেটানো এক তৃপ্ত শয়তান।

জানি নে বিম্বাধরী কাকে জাগাতে চেয়েছিল। হয় তো, নিজের অজান্তেই খণ্ডাইত রূপসী কোন এক মুহূর্তে একটি ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে দিয়েছে। আমি দেখছি, সেই জাগ্রত হৃদয়কে।

আমার আড়ষ্টতার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল না সঞ্জয়। দেখলাম তার একটি চোখ বাইরে নিবদ্ধ। দেখলাম সঞ্জয়ের একটি মাত্র চোখ বড়, আয়ত, কালো। সেই কালো স্থির চোখের গভীরে ঢেউ উচ্ছলিত সমুদ্রের ছায়া। উচ্ছ্রিত তরঙ্গের কম্পন। বলল, 'বাবু, বিম্বাধরীর কাঁচপড় হল আমার সঙ্গে। সে নতুন বেসর পরল নাকে। আমার আয়ুর জন্যে। আমার দাদার এক মেয়ে হয়েছিল বিম্বাধরীর পেটে। তার নাম মেনকা। সে আমাকে বাবা বলল। বাবু, ছয় মান জমি আমার। আমার কী দুঃখু। প্রাণের ভয় গেল। বুক ভরে পেলাম বিম্বাধরীকে। সঞ্জয় নায়কের সুখ দেখে, গাঁয়ের লোকের হিংসা হত।...সত্যি বলব বাবু, মনে হয়েছিল, আমার আয়ু বাড়ল। সত্যি কথা বলব, তাতে পাপ নেই। বিম্বাধরীর অনেক গুণ, আমার দাদার দুখানি চোখ থাকতে কোনোদিন মেলে দেখে নাই। বিম্বাধরীর বড় মিষ্টি গলা। তার গান জানা ছিল। বাবু, পুরুষের মন যখন মাতাল হয়, তখন তার চালের বিচার থাকে না। একদিন বললাম, বিম্বাধরী তুই নাচ আমি দেখব। আঃ। আমি খণ্ডাইতের বেটা খণ্ডাইত, আমার কত সাধ। আঃ। আমি রাজা, আমি শ্রীক্ষেত্রের সবার বড় পণ্ডা। আমি নাচ দেখব। তা বাবু, আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। আমি দেখলাম, বিম্বাধরী নাচছে। 'পখাল'-এর জল খেয়ে বুঝি নেশা লেগেছিল বিম্বাধরীর। আমানীর জলে বুঝি ক্ষেপে গেছিল। আমি নাচ দেখলাম। ভুলে গেলাম বাবু, আমি একচোখ কানা। আমার এক চোখ হাজার চোখ।

...তারপর একটা পেলা হল বিম্বাধরীর। বাবু, তাতে মেনকাকে কোনোদিন হিংসা করি নাই। নিজের ছেলে থিকে সে বেশী। মনে করলাম, বিম্বাধরী আমাকে সব দিছে। আমিও তার কোনো সাধ বাকি রাখি নাই। কেউ বলতে পারবে না, বিম্বাধরীর মুখ কখনো খালি দেখেছে। গুয়াগুণ্ডি পান সব সময়ে মুখে থাকত। চুটা এনে সব সময়ে ঘরে রেখে দিয়েছি। ভালো মান্দ্রাজি চুটা। বিম্বাধরীর যখন খুশি, ফসর ফসর দিয়াশলাই জ্বালিয়ছে আর চুটা ধরিয়েছে। সে দিতে চায় নাই, আমি তার মুখেরটা নিয়ে দু'টান দিয়েছি। বিম্বাধরীর উল্‌কি পরার শখ হল বাবু। উত্তারণের মেলায় গিয়ে, তার সারা গা ভরে উল্‌কি পরিয়েছি। বড় লজ্জার কথা বাবু, শরীলের যেখানে যা উল্‌কি পরতে চেয়েছে, তাই রাজী হয়েছি। কিন্তুম্ বাবু, বিম্বাধরী চার বছরের পর আর আমাকে ঘর করতে দিল না।'

'কেন?'

'জানি না বাবু। পাপ করলে মহাপরভু সাজা দেন, তান্‌কে বুঝি। কিন্তুম্ বিম্বাধরীর কাছে তো কখনো পাপ করি নাই। তবে কেন সে সাজা দিল? বাবু, সন্‌সারের সব কি জানি? সব কি বুঝি? দু'কুড়ি বয়স হয়ে গেল আমার। দেখলাম, ভগমানের মতিগতি বোঝা যায়, মানুষের যায় না। তার মেঘ দরকার নাই, হুড়মুড় করে বিষ্টি নেমে যায়। বাজ পড়ে যায় খচাৎ খচাৎ। কোত্থেকে পড়ে, দেখা যায় না। সেই রকম...বিরিটা আস্‌টা নিয়ে বিম্বাধরী বাজারে যেত, আমি মাঠে যেতাম। মেনকা তার ভাইটিকে নিয়ে থাকত ঘরে।...একদিন বাজার থেকে এল বিম্বাধরী, সঙ্গে এল গাঁয়ের মহাজনের ছামাকরন। মানে, হিসাব যে লেখাপড়া করে। কী ব্যাপার? না,

বাজার করে ফেরার পথে দেখা, ওই কথা বলতে বলতে একেবারে বাড়ি। তো বাবু! সেই যে বিম্বাধরীর সঙ্গে ছামাকরনকে দেখলাম, তেই বিনা মেঘে আমার বুকে মেঘ ডেকে উঠল। বাজার করে ফেরার পথে কত লোকের সঙ্গে দেখা হয় বিম্বাধরীর। কত লোকের সঙ্গে কথা হয়। গাঁয়ের কত মেয়ে পুরুষেরা বাজারে যায়। বিম্বাধরী তো বামুন করনের ঘরের বউ না যে বাড়ির উঠানের বাইরে যাবে না। কোনোদিন আমার কিছু মনে হয় নাই। কিন্তুম্ ছামাকরণের সঙ্গে দেখে কেন আমার বুক ডেকে উঠল?'

সঞ্জয় ওর এক চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। আমাকে নয়, আসলে নিজেকেই জিজ্ঞেস করছে ও। নিজেকে জিজ্ঞেস করছে ওর বহুদিনের পুরনো প্রশ্নটা। আর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ভুলে গেলাম, কোথায় এসেছি। ঘেরাটোপের বেড়া আমাকে ঘিরল। সমুদ্রের কল্লোল যেন হারাল আমার শ্রবণ থেকে। এই আমার ভাগ্য! এবার চুপ করুক সঞ্জয়। আর বলবার দরকার নেই। বাকিটুকু থাক উহ্য। বলা অনেক হয়েছে। আর যা বাকি আছে, তা বলার চেয়ে না বলারই বেশী। কারণ এবার অন্ধকার। সেই বড় কথা। এবার অন্ধকার, সেখানটা দেখা যায় না। অনুভব করা যায় শুধু।

কিন্তু সেটা হল সাজিয়ে কথা বলার কারুমিতি। যাকে আমরা বলতে শিখেছি মাস্টার স্টোরি টেলার। সঞ্জয়ের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। কালি কলমের মনোরঞ্জন সে জানে না। সোনার সঙ্গে খাদ মেশানো কারবার নয় তার। পাঠকের কাছে তার ভেবে বলার দায় নেই। এ সেই বাস্তব, সব থেকে বড় শিল্পকার্য যার স্বভাবের মধ্যে। কল্পনার রঙ দিয়ে গাঢ় হালকা করার অবকাশ যেখানে নেই। বাস্তবের রূঢ়তা, ভয়ংকরতা, তার বিস্ময়কর অভিনবত্বকে কে কবে কল্পনা দিয়ে নকল করতে পেরেছে।

কেন বলছে আমার কাছে? বলছে, কারণ, সঞ্জয় হল সেই মানুষ, ঘা যে লুকিয়ে ফিরতে শেখে নি। ওকে করুণা করব, সে সাহস তবু আমার নেই! অস্বীকার একেবারেই নয়। ও সেই জীবটার মতো, চলতে ফিরতে যে অনবরত ল্যাজ দিয়ে ঘায়ের মাছি তাড়াচ্ছে। ঢাকা দিতে শেখে নি। দেখিয়ে বেড়াচ্ছে না। আপনি দেখা যাচ্ছে। তাই চুপ করতে পারল না। বলল, 'বাবু, তেই আমার চোখে কেন বিজলী হানল। রাগে, আগুন জ্বলতে লাগল বুকের মধ্যে। কেন বাবু, আপনি জানেন?'

সঞ্জয়ের প্রৌঢ় মেয়েমানুষের মত গলা সেই বোধ হয় প্রথম আবেগরুদ্ধ কম্পনে বিচিত্র শোনাল। আমার কথা এখন না বলাই ভালো। কিন্তু সঞ্জয়ের উৎসুক প্রশ্নের সামনে না বলে পারলাম না, 'ছামাকরনকে দেখে?'

সঞ্জয় ঘাড় নাড়ল। —'না। না না বাবু, না। বাবু, ছামাকরনের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরে এল বিম্বাধরী। আমি দেখলাম, বিম্বাধরীকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। আঃ। বাবু বিম্বাধরীর রূপ ছিল, কিন্তুম্ সেদিনকার মতন রূপ যেন আর কোনদিন দেখি নাই। তার পান খাওয়া দাঁতের হাসি অনেক দেখেছি। কিন্তুম্ সেদিনের মতন হাসি আর কখনো দেখি নাই। কেন? এত সুন্দর লাগছে কেন বিম্বাধরীকে বুঝলাম না, অমনি খালি ভয় হতে লাগল, রাগ হতে লাগল। আর বিম্বাধরীকে আবার দেখার জন্যে মনটা আকুপাকু করতে লাগল। সড়া ছামাকরনটাকে মনে হল কুপিয়ে কাটি। কিন্তুম্ লাভ? যে নাকের বেসর পরে আমার পরমায়ু বাড়ল, তার হুরদয় থেকে খসে পড়ে গেছি। ছামাকরনকে কেটে আমার লাভ?'

চোখটি নামাল না সঞ্জয়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বিম্বাধরীর হুরদয় থেকে খসা। অর্থাৎ হৃদয় থেকে। ওড়িয়া ভাষায় ঋ-কারের স্থান নেই।

এবার প্রায় চুপি চুপি বলল সঞ্জয়, 'বাবু, তবু ছামাকরনকে ঠ্যাঙা নিয়া তেড়ে উঠেছি। কিন্তুম্ বিম্বাধরী? আমার যে মনে পড়ল, দাদার সামনে বিম্বাধরীকে যে-রকমখান দেখাত, আমার কাছে এলে তার রূপ আরো বেড়ে যেত, ছামাকরন ছোঁড়ার কাছে সেই রূপ আরো বাড়ল। বাবু, মানুষের রূপের তাহলে শেষ নেই? রূপ কি তবে পরতে পরতে সাজানো থাকে? কোথায় থাকে? দেখতে তো পাই না। এ যেন বাবু বড় সড় আন্ধার ঘরখানির মতন। টিম্‌টিমে কেরাচিনের ডিবেটা দিয়ে যখন যেটুকখানি দেখা যায়। আর যে কত জায়গা মরে রইল, কে জানে। আলো যখন পড়ে, তখন ঝলক দিয়া ওঠে। দেখে মনে হয়, এ আবার কি হল? এ তো দেখি নাই?...বাবু, এটা আমি বুঝি। এই যে তাকিয়ে আছি, একটা দিক দেখছি। আর একটা দিক বাবু অন্ধকার। তা, বাবু, মনে মনে বললাম, অ সঞ্জয় নায়ক! তুই চোখ কানা না, মন কানাও বটে। কেরাচিনের ডিবা এখন ছামাকরনের হাতে। ঘরের যে-খানটায় কোনোকালে বাতি পড়ে নাই, এখন সেখানটা ঝলকাচ্ছে।...'

একটি নিশ্বাস ফেলে চুপ করল সঞ্জয়। আবার ফিরে এল সেই বিগলিত অমায়িক হাসিটি। সেটা বড় বেমানান মনে হল এখন। কারণ, এখন আর বিগলিত মনে হল না। অমায়িকও মনে হল না। এ যেন ভেজা চোখের কৈফিয়তে, বালি পড়ার অজুহাতের মতো। রুদ্ধকণ্ঠের খাকারি। তার চেয়েও ও মুখ অন্ধকার করে থাকলে ভালো হত। তাতে সঞ্জয়-কাহিনী নীরবে দোল খেত আমার বুকে। কষা টানের ঝংকারে বাজত না। কারণ, হাসি দিয়ে যে ও আমাকে আসল উপলব্ধিটাকে ভোলাতে চাইছে।

বললাম, কিন্তু ঘর ছেড়ে এলে কেন?'

হেসে বলল সঞ্জয়, 'আস্তান কোথায় বাবু?'

'কেন, তোমার বাড়িঘর, চাষবাস? তোমার ছেলে মেয়ে?'

'সেটা অবিশ্যি মিছা বলেন নাই বাবু। কিন্তুম্ পারলাম না, বিম্বাধরী যে আমাকে কোনোদিন বলেছে, 'তুমি সব ছেড়ে চলে যাও,' তা না। বাবু, সন্‌সারে বলার কথা আছে, না বলার কথাও অনেক আছে।'

যেন আমার কয়েক মুহূর্ত আগের ভাবনার জবাব দিয়ে দিল সে। বলল, 'বাবু, হাঁক ডাক চেঁচামেচি করে কি নদীর জোয়ার আটকানো যায়? না কেন্দে-কেটে হয়? যার যেখানে যাবার সে চলে গেছে। আমি দেখলাম, আমার ঠাঁই গেছে। কোন্ পেয়াদার লুটিশে আমার পিন্ডা বাঁচবে? বাবু, আমার ঘর উঠোন কেউ নিল না, কেয়াবনের নিরালা ঠান্ডা ছায়ায় আমার ঠাঁই যেয়ে লুকিয়ে রইল আর একজনের বুকে। তো সেই আমার বাপ ঠাকুন্দার ভিটা ছাড়া হতে হল। ঘরটার আলো যেখানে জ্বলল, সেখানটার কী দোষ বাবু?'

কী বলব এই সঞ্জয়কে? কাপুরুষ? ভীরু? পরাজিত? ওকে দেখে, ওর কথা শুনে তো সে-কথা আমার একবারও মনে হচ্ছে না। আমি যেন 'রূপনারায়ণের কূলে'-র সেই মানুষটিকে দেখতে পেলাম, যে বলল,

'চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।'...

খন্ডাইতের ঘরের এই কালো খর্বকায় এক-চোখ অন্ধ কৃষকটির এই অমায়িক হাসি আমার বুকে একটি টাটানো-বিস্ময়ের মতো এসে বিঁধল। আমার বুকের ভিতরের

যে-অন্ধকারকে আমি আলোয় আলো করব বলে এসেছি। এই মুক্তাঙ্গনে, ওর এখনকার হাসিটি এসে বিঁধল যেন সেই অন্ধকারে। মনে করেছিলাম, ওর জীবনের বাষ্প দিয়ে আড়াল করল আকাশ সমুদ্রকে। এখন দেখছি, সেই উদারের সঙ্গে ওরই মিলন হল। আমি দেখছি চেয়ে চেয়ে।

মনে হল, যে-রাশি রাশি লবণাক্ত জল অন্ধকার চোখের কূলে গোপনে ঝরেছিল, সে-ই ফেনিলোচ্ছল হয়ে ঝাঁপ দিয়েছে আমার ভাঙা-গরাদ জানালায়। জনপদের ছোট ঘরে যা উপচে উঠে ডুবিয়ে মারে, শ্বাসরুদ্ধ করে, কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর দেখায়, এখানে সে মহাসত্যের তরঙ্গে দোল খায়।

সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক মেনে চুপ করা ছাড়া কী করার আছে। যে-কথাটা জানব বলে, বন্ধ ঘরে, বড় যাতনায় হাজার পাতার পুঁথি উল্টে কূল পাই নি, সেই কথাটি এই নোঙর-ঘরের ধুলোয় বসে, ধুলোর মানুষ সহজ সত্যের সাহসে বলে দিল।

তবু না বলে পারলাম না, 'কিন্তু তোমার ছয় মান জমি এখন তবে কে চাষ করছে?'

'কেন বাবু, বিম্বাধরী আর ছামাকরন, দুজনেই।'

আশ্চর্য! আমিই শুধু জিজ্ঞেস করতে বাধা বোধ করি। ও জবাব দেয় সহজেই। বললাম, 'তুমি তো আর একটা বিয়ে-টিয়ে করে দিব্যি—'

সঞ্জয়ের বোঁচা নাকের দু'পাশের ছড়ানো হাসিটি এবার প্রায় উপহাসে পরিণত হল। বলল, 'বাবু, তারার আলোয় কোনোদিন জ্যোছনা হয়? একা চাঁদেই হয়। তা সে যাক বাবু, মেয়েটা আর ছেলেটার জন্যে মন কেমন করে। বছরে একবার করে গিয়ে দেখে আসি।'

কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলে তখন?'

'কে বাবু?'

তোমার বিম্বাধরী!'

'সবই বলে। হাসে, যতন করে খাওয়ায়। যখন চলে আসি, তখন কাঁদে।' বলতে বলতে হাসল সঞ্জয়।

আঃ! এবার আমারও সঞ্জয়ের মতো বলতে ইচ্ছে করল, বিম্বাধরী, তোমার অপরিচিত অন্ধকারে আলোর ঝলক লেগেছে। এখানেও অপরিচিত অন্ধকারে আলোর বান দেখলাম আমি। তোমাকে দোষ দেব না। তবে, তোমার সত্য যত নিষ্ঠুর, ওর সত্য ততোধিক মর্মান্তিক। তোমার সত্য, রূপের ঘরে প্রত্যহের ক্ষয়ের সুন্দরে। সঞ্জয়ের উত্তরণ তাই অরূপের ব্যথার আনন্দে। তাই বোধ হয় ও চলে আসার সময়ে, ওর সঙ্গে তোমার চোখের দু' ফোঁটা জল এই সমুদ্রেই আসে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর ছামাকরন?'

'ঝগড়া কি আর হয় বাবু? আর হয় না। খণ্ডাইতের মেয়েমানুষের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে, ও এখন সমাজে পতিত হয়ে গেছে। কোথায় আর যাবে। বিম্বাধরীর ঘরেই থাকে। তো এটা একটা অনাচার হল কি না। পঞ্চায়েত বিচার করেছে। পঞ্চায়েতকে ক্ষীরপিঠা খাইয়ে দিয়েছে। তাতেই সব মিটেছে। তা মিছা বলব না, আমাকে খাতির করে।'

আবার হাসল সঞ্জয়। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'কিন্তুম্ বাবু, মেয়েটার কথা ভেবে আমার সোয়াস্তি নাই। ছেলেটার কথা অত ভাবি না। আমার মেনকা এখন বেশ ডাগর-সাগর হয়েছে। এবার তার বাহা না দিলে নয়।'

'তোমাকেই দিতে হবে বুঝি?'

ভুরু দুটি বিস্ময়ে কুঁকড়ে উঠল সঞ্জয়ের। বলল, 'আর কে দিবে বাবু? আমার

মেয়ে না সে? বিম্বাধরীর পেটে হয়েছে। আর বাবু, বলব কি মেয়ে আমার এর মধ্যেই সকলের চোখে পড়েছে। আপনারা যাকে খিড়কী দুয়ার বলেন আমাদের বলে বাড়ির দরজা। তা বাবু এখন বাড়ির দরজাতে গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোনের বড় ঘুরঘুর লেগেছে। সেই যে বললাম বাবু, ভরা নদীর লোকা, তো মেয়ে এখন তাই। হাল ধরবার চাই। কিন্তুম্ মেয়েকে আমার করনেরা তাদের ঘরে নিতে চেয়েছে। খন্ডাইতের ঘরে আর বাহা দিব না। এখন দরকার খালি টঙ্কার। অনেক টঙ্কার দরকার।'

'তা তো বটেই।'

সঞ্জয়ের হাতখানি বিছানায় প্রায় পায়ের কাছে এসে পড়ল। এবার তার হাসিটি সব থেকে বিস্ফারিত। এক চোখ ভরে এমন একটি হাসি ফুটল বিশ্বজয়ের দিন থাকলে এতেই সম্ভব হত। বলল, 'নইলে বাবু, যে-দিকে মন যায় চলে যেতাম, এখানে আসব কেন? কিন্তুম্ সে আমি যেতে পারি না বাবু, আপনারা সব এখানে আসেন, আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি। তা বাবু সত্যি বলছি, মুখ দেখলে বোঝা যায় কোন্ বাবু কেমন।'

আর একবার হাসল সঞ্জয়।—'আপনার গোলাম বলে জানবেন বাবু, সঞ্জয়কে। মন পরাণ দিয়ে সেবা করব। বকশিস বলে কিছু চাইব না, আমার মেনকাকে আপনি আশীর্বাদ করে যাবেন।'

কথা যে এখানে এসে থামবে, তা বুঝতে পারি নি। প্রায় মূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম, খন্ডাইতের হাত দুটি জোড়হস্তরূপ ধারণ করেছে। এ রূপ আলাদা, আকস্মিক, কিন্তু যেন অন্ধকার ঘরের অপরিচিত কোণে, কেরোসিনের ডিবার ঝলক লাগল। দেখলাম, ওর চোখের মণি আমার মুখ থেকে সরে না। আলাদা রূপ বটে, একটি স্থূলত্বের প্রলেপ আছে। কিন্তু অসংশয় ভালোবাসার সত্যও আছে।

এসেছিলাম জনতাহীন নির্জনে। জনপদের বহিঃসীমায়। কিন্তু বারেবারের মতো, মুক্তির সঙ্গে মানুষের যুক্তিকরণ আমার ললাটলেখার অদৃশ্যে আঁকা। অঢেল আমার নেই। আমার বাঁধা অঙ্কের সীমা থেকেই সানন্দে অঙ্গীকার না করে পারলাম না, 'তা করব। আমি যাবার আগে তোমার মেয়েকে আশীর্বাদ করে যাব।'

আবার! এতক্ষণ পরে আবার সেই লজ্জাবতীটির মতো কুঁকড়ে উঠল খন্ডাইত পুরুষ। লতিয়ে উঠল, দুমড়ে পড়ল। কিছু বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আমার খোলা পা দুটি চাদর দিয়ে ঢাকতে গেল।

বললাম, 'থাক থাক, আমিই দিয়ে নিচ্ছি।' বলে, চাদর টানবার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলাম। সঞ্জয়ের অবস্থাও তথৈবচ। দরজায় দাঁড়িয়ে নোঙর ঘরের মালিক। সেই সূচীবিদ্ধ গোঁফ, তীরবিদ্ধ চোখ। আপন মহিমায় নিটুট, মহিম রায়।

সঞ্জয় বলল আস্তে আস্তে, 'যাই বাবু এখন। কর্তা আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।' বলে, কাপ প্লেট ইত্যাদি নিয়ে, মনিবের প্রায় কুক্ষির তলা দিয়ে সে গলে বেরিয়ে গেল।

মহিমবাবু ভ্রূ কুঁচকে সঞ্জয়কে দেখলেন একবার। আমি ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছি। বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই গপ্পো জুড়েছিল?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'ওই আর কি, একটু সুখ-দুঃখের কথা।'

'সুখ-দুঃখ তো ওর একটাই। সেটাই চালিয়েছে বোধহয়?'

আমি মহিমবাবুর চোখের দিকে তাকালাম।

মহিমবাবু বললেন, 'আরে, ওর সেই বিম্বাধরী না লম্বোদরীর কথা তো। ব্যাটা আমাকে জ্বালিয়ে খেলে। যে আসবে তাকেই—' হঠাৎ থেমে বললেন, 'সে যাক গে, সব ঠিক আছে তো?'

আমি কৃতকৃতার্থ হয়ে বললাম, 'এত বেশী ঠিক আছে যে, প্রায় লজ্জা করছে।'

'বটে!' বলে আমাকে প্রায় বিদ্রূপে বিদ্ধ করে সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে চোখ ফিরিয়ে আর একবার আমার দিকে দেখে চলে গেলেন।

কদিন যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল জানি নে। আমার সেই ঘেরাটোপের বাইরে এসে যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পৃথিবীর বিচিত্র খেলা দেখলাম। কখনও দেখলাম সমুদ্র স্থির। কূলে-কূলে তার খোলা বেণী ঢেউয়ের চঞ্চলতায় আছড়ানো। আর সারা দিগন্ত জুড়ে সে যেন চিত্রার্পিতের মতো মূর্ছিত। আর আকাশ তখন তার বিচিত্র নৃত্য-লীলা দেখিয়ে চলেছে। কখনও সে কালো জটা খুলে মহাভৈরব হরষে এল নেমে। কখনও বিদ্যুতের মালা দুলিয়ে, বজ্রে তুলে বাঁশীর সুর, নাচল যেন তড়িতছন্দে। কখনও পুঞ্জে পুঞ্জ শাদা মেঘের ওড়না উড়িয়ে, ঘাগরা ফুলিয়ে, দুরন্ত ঘূর্ণীর বেগে হল উধাও। তারপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল কখনও রুপালি ঝলক, কখনও লাল, আসমানি, বেগনি হাউইয়ের ছটা। কখনও বর্ষণের আবরণে ঢেকে দিল সমস্ত পৃথিবীকে। আবার এক সময়ে সে তার খেলা গুটিয়ে যেন অনেক দূর উচ্চের অস্পষ্টতায় রইল বসে গালে হাত দিয়ে। আর তখন সমুদ্র হল লীলা-চঞ্চলা। তরঙ্গে তরঙ্গে নাচের উন্মাদনায় তার সুগভীর নীল ঘোমটা গেল খুলে। ফেনিলোচ্ছল শুভ্র বাহু দিয়ে ডাক দিল আকাশকে। তালি দিল তার সহস্র হাতে হাতে। মাতাল উন্মাদনার নাচের সাথে এসে ভেঙে পড়ল স্বর্ণাভ বালুবেলায়। পরমুহূর্তেই যেন আকাশকে কুর্নিশ করে ভেসে গেল দূর দেশান্তরে। কখনও বা দুজনের একত্র খেলায় শুনলাম,—

'উতল সাগরের
অধীর ক্রন্দন,
নীরব আকাশের
মাগিছে চুম্বন।'

দেখে দেখে ভাবলাম, ঘেরাটোপের তুচ্ছ দুঃখটাকে নিয়ে কেন প্রতিদিন মরি, প্রতিদিন বাঁচি। এই মহৎ উদারতায় আমি রয়েছি। এখানে দেখছি আঘাত প্রত্যাঘাতে পরম প্রসন্নতা বিরাজিত। একই দেশের এ কোণে, ও কোণে রয়েছে সঞ্জয় আর বিম্বাধরী। ওদের সমগ্র জীবনের মধ্যেও কত আঘাত প্রত্যাঘাতের খেলা। কিন্তু জীবনটা যে কোথাও থেমে আছে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছে, এমন মনে হয় না। মনে হয়, ওদের জীবন-দেবতাও স্বচ্ছন্দ। ওদের জীবনলীলার স্বাভাবিক বেগ থেকে, সে তার পাওনা আদায় করে নিচ্ছে। আকাশ সমুদ্র পরস্পরের কাছে থেকেও আপন লীলায় তারা লীলায়িত। কার অমোঘ অঙ্গুলি সংকেতে সে চলেছে? আমি কেন পারি নে? চার দেয়াল কেন আমার কাছে জীবন-মরণ হয়ে ওঠে? হে মহাদিগন্ত, হে উদার, তোমাদের জীবনমন্ত্র দাও আমাকে।

মহিমবাবু এই কদিনে গুটি দুই তিন কথা বলেছেন। শুনলে মনে হত, আমার এই একলা চুপচাপ বসে থাকাকে বুঝি বিদ্রূপ করছেন। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি একেবারে আত্মহারা হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম। সহসা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'ইয়েস্ মাই বয়, ইট ইজ সো বিগ এ্যান্ড সো ডীপ, দ্যাট উই

উইল কাম এ্যান্ড গো, বাট নট বি এব্‌ল টু ডিসকভার দি ওসেন বাই টু হিউম্যান হ্যান্ডস্‌। ফিল্‌ ইট উইথ ইয়োর লাভ এ্যান্ড প্যাশান্‌!'

সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই শার্দুল-সদৃশ বৃদ্ধ মহিমবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হয়েছিল যেন ঈশ্বর এসে আমার সামনে দৈববাণী করলেন। মহিমবাবুকে হঠাৎ যেন বড় বেশী কোমল আর করুণ মনে হল। কিন্তু সে একবারই দেখেছিলাম।

চার নম্বর ঘরে যে তিনজন আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি। সঞ্জয়ের মারফৎ জেনেছি, জ্যেষ্ঠা কৃষ্ণাঙ্গী এবং কনিষ্ঠা গৌরাঙ্গী। যুবতী দুটি দুই বোন। সঙ্গী যুবকটি তার দাদা। কিন্তু এই ভাইবোনেরা যেন এক বিচিত্র জগতের মানুষ। মনে হয় কেমন যেন লোক এড়িয়ে চলার ইচ্ছে। কোথায় একটু লুকোচুরির ছায়া। সেটা পরিষ্কার টের পেয়েছি প্রথম দিনেই। সঞ্জয় বোধ হয় না জেনেই, চারজনের দুপুরের আহার পরিবেশন করেছিল, একই টেবিলে, পিছনের বারান্দায়। আমিই গিয়ে আগে বসেছিলাম। চারজনের আয়োজন দেখে, স্বভাবতই বসে ছিলাম হাত গুটিয়ে। যদিও অস্বস্তি ছিল, তবু এক টেবিলে যখন, ভদ্রতার বাধা অনুভব করেছিলাম।

কিন্তু প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছি, সে সময়ে এল সঞ্জয়। বলল, 'বাবু, আপনি শুরু করেন, ওঁয়ারা ঘরে খাবেন।'

অবাক হয়ে তাকালাম সঞ্জয়ের দিকে। আমার আপত্তির কোনো কারণই থাকতে পারে না। তবু আমার সামাজিক সত্তা একটু আহত হল। বিরক্তও।

সঞ্জয় ওর এক চোখে, চকিতে একবর চার নম্বরের ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওঁয়ারা ওইরকমই বাবু। কারুর সাথে কথাবার্তা নাই, নিজেদের মনে থাকে। অপনার সঙ্গে খাবে না।'

সঞ্জয় একে একে খাবার পৌঁছে দিল চার নম্বর ঘরে। আশ্চর্য, একলা হতেই চেয়েছিলাম। তবু খেতে খেতে নিজেকে কেমন যেন একঘরে মনে হয়েছিল।

এর পরে আলাপ হওয়া তো আরও দুস্তর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা তো ওরা বলে। বোবা নয় নিশ্চয়। আশ্চর্য, কথা বলতেও শুনি নে কখনও। ওরা ঘরে থাকলেও দরজা বন্ধ। না থাকলেও দরজা বন্ধ। এমন নয় যে, ওরা নীচের ঘরের চখা-চখীর মত। ওরা তো ভাই বোন। বরং নীচের ঘরের দুটিকেই দেখেছি, বেসামাল। ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায়। পর্দাটা টেনে দেবার কথাও ওদের মনে থাকে না। কিংবা, সময় পায় না। ওদের বেআবরু অবস্থা দেখে, চোখ নামাতে হয়। কিন্তু ওদের নির্দোষ শশব্যস্ততা ও চকিত লজ্জা দেখে বিরক্ত হতে পারি নে। উল্‌টে, মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোতে হয়। মনটা খুশি হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, সমুদ্রের দিকে ফিরে ওদের সুখের পরমায়ু যাচঞা করি। যদিও ওরাও কোনো দিন কথা বলে নি, কাছে ঘেঁষে নি। তা হলেই অবাক হতাম। হয়তো বিরক্তও। ওরা যা, ওরা ঠিক তেমনি আছে বলেই, কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা দেখি নে। আকাশ আছে, সমুদ্র আছে, আর ওরা জানে, 'আমরা আছি দুজনে। সমুদ্রের যত লীলা, আকাশের যত রঙ-ফেরতা, সব আমাদের জন্যেই।'

অথচ, আমার পাশের ঘরে যেন সমুদ্রের অট্টহাসি ঢোকে না। চার নম্বরের দরজায় হয়ে পারি নি। দেখেছি, গৌরাঙ্গী কনিষ্ঠা ভগ্নী, একলা একলা কখনো গাড়ি-বারান্দায়, ছাদে দাঁড়িয়ে এই তিন নম্বরের মানুষটাকে লুকিয়ে লক্ষ্য করার প্রবৃত্তি আছে ওদের। তার থেকেও বেশী কৌতূহলিত বিস্ময় অনুভব করেছি একটি বিষয়ে। যার দুয়ারের নির্জনতায় এসেছি, এ যেন তারই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। কৌতূহলিত না হয়ে পারি নি। দেখেছি, গৌরাঙ্গী কনিষ্ঠা ভগ্নী, একলা একলা কখনো গাড়ি-বারান্দায়,

কখনো নির্জন সৈকতে। একটু আনমনা, একটু বা বিষণ্ণ। কিন্তু চার নম্বরের দরজা তখন বন্ধ। কনিষ্ঠা যেন সেখানে আলাদা। ত্রয়ীতেও যেন একটু খাপছাড়া। একটু যেন নিরালা খোঁজার ঝোঁক। কেন? কালকূটের তিক্ততা কি আছে নাকি ওর প্রাণেও? বিষের জ্বালায় আনচান করে নাকি? অথচ, কনিষ্ঠার বয়সের ভার নেই। কতই বা, কুড়ি বাইশ? দু'একবার চকিত চোখাচোখিতে অনুমান করেছি, ওর চোখের রোদে ছায়া রয়েছে চেপে। বাতাসে ওড়া চঞ্চল আঁচলটাকে যেন ভারী হিংসে। মেয়েটির মন্থরতা যেন ওর নিজের স্বভাব নয়।

কিন্তু জানি, সংসারে প্রশ্ন আছে অনেক। জবাব আছে কম। এই সত্যকে প্রসন্নতা দিয়ে নেব। ওই চার নম্বরে আরও অনেক নরনারী এসেছিল, আসবেও। তিন নম্বরেও তাই। আমরা সবাই কক্ষচ্যুত নক্ষত্র। জবাব আমাদের কারুরই নেই।

হঠাৎ বেলা নটা নাগাদ একদিন এলেন একজন। মুণ্ডিত মস্তকে গেরুয়ার ফালি বাঁধা, গেরুয়া পাঞ্জাবি আর অকচ্ছ কাপড়। হাতে গুটিকয়েক বই। চেহারাটি বিশাল, তার মধ্যে পেটের দিকটাই বেশী। মুখের ভাবটা রীতিমত কর্কশ। নাকের পাশের গভীর রেখায় বিশ্বের প্রতি একটি কেমন শ্লেষ বিরাগের ভাব। নাকের ডগায় চশমাটি ওঁকে চৌ-নয়ন করেছে। বোঝা গেল উনি লেন্স দিয়ে দেখেন না। লেন্সের বাইরেই ওঁর চোখ। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালাম। পরিবর্তে উনি আমাকে অপাঙ্গে দেখে একটি শব্দ করলেন, 'অ—।'

তার পরেই বিনা অনুমতিতেই ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়লেন। বসে, ধীরেসুস্থে বইগুলি রাখলেন। ওপরের বইটি দেখলাম শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা। প্রথমেই ঘোষণা করলেন, কোন্ আশ্রম থেকে তিনি আগত। তার পরেই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে বললেন, 'বাঙালী যুবক নিশ্চয়ই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হুঁ, নইলে অমন ঢুলু ঢুলু চোখ, মিঠে মিঠে চাউনি, ননীচোরা ননীচোরা ভাব হবে কেন?'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না তো?'

প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বোঝা যাবে। ওই রসিক কেষ্টঠাকুর বাঙালীর সব সর্বনাশ করেছে। গীতার শ্রীকৃষ্ণের কথা কিছু জানা আছে?'

ভাবখানা দেখছি প্রায় যুদ্ধং দেহি। বললাম, 'তা একটু আধটু জানি বৈকি।'

গেরুয়াধারী চাপা চাপা গলায় যেন সুর করে বলে উঠলেন, 'কই, তার কিছু দেখছি না তো? বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পড়া আছে?'

উনি দেখছি গুরুমশায়। বললাম, 'তা বাঙালীর ছেলে যখন, একটু আধটু পড়া থাকাই স্বাভাবিক।'

অমনি বলে উঠলেন, 'বেশ, তা হলে এই গীতাটা কিনুন। আর আমাদের আশ্রম থেকে এই বইটিও বেরিয়েছে, দেখুন শ্রীকৃষ্ণ, কংস ও জরাসন্ধ। এটাও কিনুন।'

কি আশ্চর্য! এমন বিচিত্র বিক্রেতা তো আর কখনও দেখি নি। বললাম, 'কিন্তু দেখুন, ও বই আমার দরকার নেই।'

স্বামীজী কিংবা বাবাজী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আরে সে তো আমি মুখ দেখেই বুঝেছি। ও চোখ কিসের ধ্যান করছে সে কি আমি বুঝি নে?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কি বলুন তো?'

উনি আঙুল নেড়ে নেড়ে, সুর করে করে বলতে লাগলেন,

'পাহিল বদ্‌রী কুচ পুন নবরঙ্গ
দিনে দিনে বাঢ়য় পীড়য় অনঙ্গ—'

আমি বলে উঠলাম, 'মানে?'

উনি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললেন, 'ওই চোখের যা ধ্যান, তাই বলছি।'

সে পুন ভৈ গেল বীজকপোর।'
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর।'

আমি বললাম, 'আপনি এই সব বলছেন কেন ঠিক বুঝতে পারছি নে।'

'যে রস তুমি চাও বাবা। ওসব না শুনলে যে তোমাদের ভালো লাগে না। এখন বড় ভালো লাগছে এসব শুনতে, না?'

বলে চোখ দুটি আরও ছোট করে রীতিমত শ্লীলহীন ইঙ্গিত করে বললেন,

'রসবতী নারী রসিক বরকান
রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান।'

গেরুয়াধারীর ভাবভঙ্গি রীতিমত আপত্তিকর মনে হল। ওঁর বলার ভঙ্গিতে মনে হল বিদ্যাপতির পদাবলী খেউড় ছাড়া আর কিছু নয়। বললাম, 'দেখুন, আমার এ সব ভালো লাগছে না। আপনি বৃথাই এই সব বলছেন।'

গেরুয়াধারী বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি। মন চাইছে আরও শুনতে, কেমন? তবু এসব বই একটি কেনা হবে না। কিন্তু বাবা রসের বই তো আমি ফিরি করি না, এখন উপায়?'

'কিসের উপায়?'

'আশ্রমের জন্যে কিছু সাহায্য চাই তো। বইও নেবে না, দুটো রসের কথা শুনিয়ে পয়সা নেব, তাও হবে না, তা এখন কি সেই রসবতীকে ধরে আনতে হবে?'

এঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তর্ক বৃথা। বিবাদ আরও মারাত্মক। তাড়াতাড়ি দু' আনা পয়সা বের করে দিয়ে বললাম, 'আপনাকে কিছু দিতেও হবে না, শোনাতেও হবে না। এই নিন, নিয়ে আমায় রেহাই দিন।'

দু' আনা পয়সা কোথায় যে ওঁর গেরুয়া জোব্বার মধ্যে ঢুকল বুঝতে পারলাম না। বললেন, 'আর দু' আনা বের কর বাবাজী।'

এমন অস্ত্রের সম্মুখীন কখনও হই নি। এতক্ষণ রাধার দেহের বর্ণনাই শুনেছি। এর পরে হয়তো মিলন বর্ণনা শুনতে হবে ওঁর মুখ থেকে, ওঁর বিশেষ ভঙ্গিমায়। তাড়াতাড়ি আরও দু' আনা বাড়িয়ে দিলাম।

পয়সা নিয়ে উনি যেন চাপা গলায় শাসিয়ে বললেন, 'খুব বুঝতে পারছি, কি ধ্যান করছ দিন রাত্রি। আমার মুখে শুনতে যত খারাপ লাগছে। নেশা কেটে যাচ্ছে চোখের। জেনে রাখ, এই জন্যেই আমি ও রকম করে বলি।'

অতীব সুখের কথা। মনে মনে ভাবলাম, বৈষ্ণব কবিতার কিশোরী রাধিকার যে মূর্তি রোমান্টিক কবি-কল্পনার চির-প্রতীক, সেই রাধাই ওঁর বর্ণনায় ধূল্যবলুণ্ঠিত। উনি যাবার জন্যে দরজা অবধি গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কতদিন থাকা হবে?'

চোখ কান বুজে মিথ্যে কথা বলে দিলাম, 'আগামী কাল পর্যন্ত।'

বাবাজী ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালকেই চলে যাব শুনে বাবাজী যেন বিক্ষুব্ধ হতাশ। কিংবা ঠিক বিশ্বাস করলেন না। আস্তে আস্তে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'আচ্ছা।'

আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলেন। সাংঘাতিক লোক। এ প্রায় আর এক ধরনের 'ব্ল্যাকমেলিং' মনে হল। হয় পয়সা দাও, তা নইলে খেউড় শোন।

ভাবলাম, যাক তবু আপদ গেল এবং মাত্র চার আনা মুদ্রা ব্যয়ে। মানুষ যে কত রকমের আছে। কত বিচিত্র তাদের রূপ।

কিন্তু আমি শালুক চিনেছি বটে গোপাল ঠাকুর। রইল আমার রূপ দেখার দার্শনিকতা। ভুলে গিয়েছি, বাকি আছে অপরূপ দেখা। এক দিন বাদ দিয়ে, সকাল বেলায় অপরূপ এসে আবার হাজির আমার দরজায়। এবং একেবারে যাত্রার ঢঙ-এ ডায়লগ শোনা গেল, 'হুঁ হুঁ, পরশুদিন সকালেই বুঝেছি, চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছি, ছলনা, ছলনা, মহা ছলনা।'

আমার বুকের মধ্যে ধুক করে উঠল। তাকিয়ে দেখি, বই বগলে সেই বাবাজী। এ ক্ষেত্রে মিথ্যে বলে যে খুব একটা অন্যায় করেছিলাম, এমন মনে হয় নি। সোজা কথায় ধমকে একজন অনাহূতকে বিদায় করতে অভ্যস্ত না হই যদি, সেখানে 'মিথ্যা বলিব না' প্রতিজ্ঞা টেঁকে না। কিন্তু আপাতত আমার বিব্রত অসহায় হাসিটুকু গোপন করা গেল না। বললাম, 'আরে, আপনি!'

ঝোলা-জোব্বা দুলিয়ে বাবাজীর সবেগে প্রবেশ এবং বাণী 'হ্যাঁ আমি, মরি নি। আর আমার নাম সবাই বলে খেঁকিয়ানন্দ, পুরীতে এক ডাকে সবাই চেনে। তখনি বুঝেছি, আমাকে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। কিন্তু এতই সহজ!'

'প্রবঞ্চনা?'

'হ্যাঁ বাবাজী, প্রবঞ্চনা।' প্রায় ভেংচি কেটে, শিরোবস্ত্রসহ মাথাটি দুলিয়ে বললেন ব্রহ্মচারী খেঁকিয়ানন্দ।

সার্থক নামদাতা তারা, যারা বাবাজীর ওই নামটি দিয়েছে। নামের সঙ্গে চরিত্রের এমন রাজ-যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, একজন এসে মিছিমিছি প্রবঞ্চক বলে যাবে, এটা ঠিক সহ্য হল না। আর জানি নে, চার নম্বর ঘরে কথাগুলো গিয়ে পেঁছয় কি না। বাবাজীর কাণ্ড কারখানা দেখলে মনে হবে, সত্যি না জানি কী করে বসেছি। ভ্রাতা ভগ্নীরা এতক্ষণে বোধহয় ভাবতে আরম্ভ করেছে, একটা মারাত্মক লোক তাদের ঘরের পাশে।

প্রতিবাদের জন্যে মুখ খুলতে যাব, তার আগেই খেঁকিয়ানন্দ খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এ্যাঁ, এ্যাই, বলেছি তো, মুখখানি এত ভালো মানুষের মতো, ভাসা ভাসা চোখ, তুমি যে বাবা বৃন্দের কালো বেড়াল, হুঁ হুঁ।'

বলেই বাবাজী সুর করে বললেন,

'ওই বেড়ালের চোখেতে আগুন
বেড়াল মানুষ করে খুন
ললিতে কালো বেড়াল কে আনিল পাড়াতে।
হুঁ হুঁ ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানো না।'

আমি বললাম, 'দেখুন খেঁকিয়ানন্দ বাবু—'

'কী খেঁকিয়ানন্দবাবু? আমাকে চিপ্‌টেন কাটা হচ্ছে? কাটো কাটো, ওতে আমার কিস্‌সু হয় না। গোটা পুরীর লোকেরা বলে। তা বাবা বললেই তো হত, আরো কড়া ডোজ ছাড়তাম। কাব্যিকে কাব্যিও হত, তুমিও খুশি হতে, আর আমারও—।' প্রায় একটা ইঙ্গিতেই কথা শেষ করলেন।

বললাম, 'কড়া ডোজ মানে?'

বলতেই খেঁকিয়ানন্দ জয়দেবের 'সুপ্রীত পীতাম্বর' অংশ থেকে রাধাকৃষ্ণের রতি-বিহার আবৃত্তি শুরু করলেন। রাধাকৃষ্ণের নাম আছে তাই রক্ষে! এ কবিতার ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য নিশ্চয় অতুলনীয়। এবং খেঁকিয়ানন্দর নির্ভুল উচ্চারণ ও আবৃত্তি শুনে মনে মনে অবাক না হয়ে পারলাম না। কিন্তু তাঁর চোখ মুখের ইঙ্গিতে এবং

ভঙ্গিতে, 'সুপ্রীত পীতাম্বর' হয়ে উঠল অতি ভয়াবহ পর্নোগ্রাফি। মনে হল, আমার কানের মধ্যে কেউ তরল আগুন ঢেলে দিচ্ছে। আর বাবাজীর কণ্ঠস্বরখানি বেশ উচ্চগ্রামে বাঁধা। নীচে থেকে মহিমবাবু যদি শোনেন, ভাববেন, আমিই ডেকে রতি-বিহার শুনছি। পাশের ঘরে ভ্রাতা ভগ্নীরা সম্ভবত এতক্ষণে শিউরে কাঁটা হয়ে উঠেছে। আর মনশ্চক্ষে দেখলাম, চারদিকে যেন লোকের ভিড়। তাদের ধিক্কারপূর্ণ দৃষ্টি আমার উপর। ওদিকে তখন রাধাকৃষ্ণের দ্রুত নিশ্বাস ও মত্ততার নিটুট বর্ণনা গম্‌গম্‌ করছে। আমি প্রায় চিৎকার করেই ধমকে উঠলাম, 'আপনি থামবেন?'

থামলেন, এবং থেমে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। আর কিছু বলবার আগেই, আমি দরজার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বললাম, 'যান, আর একমুহূর্তও নয়। খেউড় শুনিয়ে পয়সা রোজগারের জায়গা এটা নয়। উঠুন তাড়াতাড়ি।'

চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল, বাবাজী এতটা আশা করেন নি। আমি আমার নিজের চোখ মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু খেঁকিয়ানন্দ প্রায় সংকুচিত অসহায় মুখে উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে দরজার কাছে গিয়ে বললেন, 'জয়দেবের কবিতা খেউড়?'

'অন্তত আপনার মুখে তাই শোনাচ্ছে। কিন্তু আপনি ভুল জায়গা বেছে নিয়েছেন। এখানে ওসব হবে না। যান।'

ভেবেছিলাম, খেঁকিয়ানন্দ শুধু দ্বিরুক্তি করবেন না, বিবাদও করবেন। কিন্তু বাবাজী মাথা নত করে, নিঃশব্দে চলে গেলেন।

আমি এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে, সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। মেঘের ফাঁকে রোদ উঠেছে। কিন্তু সমুদ্রের সর্বাঙ্গে সে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। যেখানে ছায়া নীলাম্বুধি, সেখানে অন্ধকার। রৌদ্র যেখানে, সেখানে নীলকান্তমণির ছটা। চোখ পড়তেই দেখলাম, তার রৌদ্রছায়া খেলার তরঙ্গে, অট্টহাসি ফেটে পড়ছে ফেনায় ফেনায়। আমি ভুলে যাই, কার আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় আমার গ্লানি। এই তো, এই তো সেই সুদূর নিরন্তর। সে তো বিব্রত নয়, লজ্জিত নয়, শ্লীল অশ্লীলের পরোয়া নেই তার। সে যেন আমার ক্ষুব্ধ উত্তেজনার মুখের ওপর হাততালি দিয়ে হাসছে।

মনটা সহসা বিমর্ষ হয়ে উঠল। নিজেকে কখনো একটু ছাড়াতে পারি নে। খেঁকিয়ানন্দকে অমন করে না বললেই পারতাম। লোকটির অতখানি প্রতাপ যে এ রকম লঘুক্রিয়া করবে, বুঝতে পারি নি। তাই বাড়াবাড়িটা যেন আমিই করে ফেলেছি। শেষমুহূর্তে বেচারীকে আর খেঁকিয়ানন্দ মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, দুখিয়ানন্দ।

চুপ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কানে আসছিল কীর্তন গানের সুর। মহিমবাবু নীচে রেডিও খুলেছেন কি না, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু পুরুষ গলার আবেগ মথিত কীর্তনের সুর যেন খুব কাছেই শোনা যাচ্ছে—

'সই, ও বুলি না বল মোরে
(ও তিন আখর, আর বলো না
বলো না বলো না বলো না গো)
পিরীতি অনলে পুড়িয়া মরিব
রহিব বিষের ঘোরে
পায়ে ধরি, ও বুলি না বল মোরে।'

গানের আকর্ষণ দাঁড়াতে দিল না। দেখলাম, সমুদ্র যেন সেই তালেই নাচছে। এমন আকুতি ও ভাবের তরঙ্গে কে ভাসছে! পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকে। গানের সঙ্গে একটি তারের যন্ত্র সঙ্গত করছে মনে হল। নেমে বাঁদিকে বেঁকেই,

মহিমবাবুর ঘর। এবং ঘরের দরজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিশ্বাস করা দায়। দেখলাম, গান করছেন স্বয়ং খেঁকিয়ানন্দ। শ্রোতা মহিমবাবু এবং দরজার আড়াল থেকে সঞ্জয়। আর বিঘত খানেক লম্বা ছোট একটি তারের যন্ত্র বাজাচ্ছে সম্ভব, একজন ওড়িয়া বৈষ্ণব ভিক্ষাজীবি। আমাকে তাকিয়ে দেখল সঞ্জয় আর খালি গা যন্ত্রবাদক। মহিমবাবু এবং খেঁকিয়ানন্দ, দু'জনেরই চোখ বোজা। দু'জনের কেউ আমাকে দেখতে পেলেন না।

আমি অবাক হয়ে খেঁকিয়ানন্দকেই দেখছিলাম। সন্দেহ হল, তাঁর চোখে জল। দু'হাত কোলের ওপর ছড়ানো। মাথা নেড়ে নেড়ে গাইছেন,

'বলো না বলো না, বলো না গো।
এ ঘর করণ   বড় নিদারুণ
পিরিতি পরের বশে
হেন করে মন   হউক মরণ
আর যত অপযশে।
তবু, আর বলিস নে লো,
এ তিন আখর আর বলিস নে।'

আমি বাস্তববাদী, আমি আধুনিক, আমার নানা অহঙ্কার। তবু আমার প্রাণের মধ্যে আছে আর এক অচিন প্রাণ। যে যুগের প্লাবনেও ধুয়ে যায় না। খেঁকিয়ানন্দর গানের মধ্যে এমন কিছু ছিল, পিরীতি-বিলাপ আমার অচিন প্রাণে চাবি দিল ঘুরিয়ে। সঞ্জয়ের দিকে চোখ পড়তে বিরহ বিলাপের সুর যেন মোচড় দিয়ে উঠল আরও। দেখলাম ওর শূন্য চোখটির কোলে জল।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরতে গেলাম। মহিমবাবু ডেকে উঠলেন, 'যাচ্ছ কেন? শুনে যাও।'

আশ্চর্য, ভেবেছিলাম, ওঁর চোখ বোজা। এখন দেখছি, আবেগের বাষ্পে উনিই একমাত্র গলেন নি। বোজা চোখের ফাঁকেও দৃষ্টি ছিল ঠিক। কিন্তু যার থামবার, তিনি থেমেছেন। মহিমবাবু ডাকতেই, চোখাচোখি হল খেঁকিয়ানন্দর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ। গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ চলি মহিমবাবু।'

মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, সে কি অমৃতানন্দজী। অনেকদিন পরে আজ একটু জমেছে, গৌরাঙ্গকেও পাওয়া গেছে। ও তো আজকাল এদিকে ভিক্ষে করতে আসেই না। আর আপনার গলায় আজ আক্ষেপ খুলেছে দারুণ। আরে, এই, সঞ্জয়!'

'বাবু!' দরজার কাছ থেকেই জবাব দিল সে।

মহিমবাবু বললেন, 'অমৃতানন্দজীকে একটু চা খাওয়া।'

আমার পরিচিত খেঁকিয়ানন্দ বললেন, 'থাক না মহিমবাবু, আবার এ অসময়ে।' কথা শেষ না করেই একবার আমাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিলেন। তারপর ঘাড় গোঁজ করে বসলেন।

মহিমবাবু বললন, 'হোক একটু। আপনার তো অত আচার বিচার নেই।'

আমাকে বললেন, 'কই বস। অমৃতানন্দজীর গান শোন। উনি খালি মঠের বই ফিরি করেন না।'

সেটা বিস্ময়কর রকমেই প্রত্যক্ষ করছিলাম। এবং উনি যে সত্যি অমৃতানন্দ, সে কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। এই বিশাল রুক্ষ চেহারা, কর্কশ কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে এমন একটি সুকণ্ঠ ভাবময় কীর্তনীয়া লুকিয়ে ছিল, একটুও বুঝতে পারি নি।

হায় আমার মানুষ চেনা! এবং এখনো আমার দিক থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে

যে রকম ঘাড় গ‍ুঁজে বসে আছেন, তার মধ্যে একটি শিশু চরিত্রের হাসির **খোরাক** ছিল। কিন্তু একটি আশ্চর্য করুণ রসও ছিল।

আমি আর কাছে না গিয়ে, পিছনেই একটি চেয়ারে বসলাম। খেঁকিয়ানন্দ (আমি এই নামেই বলি। পুরনো নামের পরিচয়টাই থাক আমার কাছে ওঁর চরিত্রের মতই, অমৃতানন্দ থাক আমার অন্তরে।) আবার গান ধরলেন—

আমার অঙ্গের কালি দেখে, সবাই হাসে
সখী, সখী কী বলি! এ কালা কালি কী বায়ে উছসে।
সখী, যত ঘষি, মসী তত অঙ্গে পশে
এ কালা কালি কী বায়ে উছসে।
(রাধা নাম যে ভোলে সবাই, কালামুখী কালি কালি বলে)
আমার সবই গেল।
রূপ গেল, নাম গেল, মান গেল।
আমার সবই গেল।
যতেক আলো সখী, মাখামাখি মথুরাকাশে॥
আমি মথুরা যাব।...'

যত শুনছিলাম, ততই খেঁকিয়ানন্দর কণ্ঠ মাধুর্যে, গানের অভিব্যক্তি এবং ভাবে ডুবে যাচ্ছিলাম। কীর্তনে ভাবের আতিশয্য অনেক দেখেছি। সব সময়ে তা প্রাণে তরঙ্গ তোলে না। যদি বা তোলে গায়ক সম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু খেঁকিয়ানন্দর গান শুনতে শুনতে মনে হল, এই রুক্ষমূর্তি মানুষটা, যাকে ভেবেছিলাম পয়সা আদায়ের ফিকিরে ঘোরে নানান্ ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে, এ সবই ওর ছদ্মবেশ। প্রাণের গভীরে কোথাও একটা ক্ষতের যাতনা না থাকলে গানের এমন অভিব্যক্তি হয় না। ব্যথার মোচড় না থাকলে, সুরের এমন তরঙ্গ খোলে না। তবু অবাক লাগে এই ভেবে, দুঃখটা গানের প্রসন্নতায় তাল মিলিয়েছে।
চুমুক দিলেন। ওড়িয়া বৈরাগী চলে গেল ভিতরের উঠোনের দিকে।

মহিমবাবু পিওনের হাত থেকে চিঠি নিতে নিতে বললেন, 'অনেকদিন বাদে আপনার গান শুনলাম। মাতিয়ে দিয়েছেন।'

গান শেষ হবার আগেই এল পিওন। সঞ্জয় এনে দিল চা। দিয়ে প্রায় সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম করল। কিন্তু খেঁকিয়ানন্দ কোনো কথা বললেন না। চোখ বুজে চায়ে

খেঁকিয়ানন্দ হাসলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু আড়চোখে যে একবার আমাকে দেখলেন, সেটা টের পাওয়া গেল। তাঁর ভাব ভঙ্গি দেখে মহিমবাবু ভ্রু কুঁচকে একবার আমার দিকে তাকালেন। বোধ হয় একটু কৌতূহল এবং প্রশ্ন ছিল ওঁর চোখে। ইঙ্গিত করতে সাহস পেলাম না যে, অমৃতানন্দ আমার ওপর রাগ করেছেন। মনে মনে আমি তখন শিল্পী খেঁকিয়ানন্দর কাছে অপরাধ স্খালনের কথা চিন্তা করছি। এখন ভাবছি জয়দেব যিনি অমন করে আবৃত্তি করতে পারেন, তাঁকে অশ্লীলতার এক ধাক্কায় সরিয়ে দেওয়া যায় না। এখন আমার মনে হল, হয় তো খেঁকিয়ানন্দর দ্বিতীয় গানটি আমাকে শুনিয়েই গাওয়া। 'আমার অঙ্গের কালি দেখে, সবাই হাসে।' ভ্রমণবিলাসীরা হয় তো তাঁর মুখে বিদ্যাপতির কিশোরী-বর্ণনা আর 'সুপ্রীত পীতাম্বর'-এর রতি-বিহার শুনে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, খাতির করেছিল, পয়সা দিয়েছিল, বিকৃত উল্লাসে। খেঁকিয়ানন্দর উপায় কী? চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। গায়ে তাই কালি মাখতে হয়েছে।

মহিমবাবু আবার বললেন খেঁকিয়ানন্দকে, 'আজ নিজেও বেশ মেতে আছেন মনে হচ্ছে।'

চায়ের কাপ নামিয়ে খেঁকিয়ানন্দ বললেন, 'মাতি কি আর মহিমবাবু? মাতায়। চলি।' বলেই উঠে একেবারে হন হন করে বাইরে চলে গেলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মহিমবাবু বললেন, 'কী হল?'

বললাম, 'ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

মহিমবাবু ভ্রু তুলে একবার আমাকে অপাঙ্গে দেখে শুধু শব্দ করলেন, 'হুঁ।'

বাইরের আঙিনা পেরিয়ে আসতে আসতেই, খেঁকিয়ানন্দ রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। গলা তুলে ডাকতে গিয়ে থমকে গেলাম। সর্বনাশ। আর একটু হলেই খেঁকিয়ানন্দবাবু বলে ডেকে ফেলেছিলাম। না ডেকে, পা চালিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'শুনুন।'

খেঁকিয়ানন্দ ফিরলেন। গম্ভীর মুখ, কথা নেই একটিও।

বললাম, 'আপনার গান বড় ভালো লাগল।'

খেঁকিয়ানন্দর ঠোঁটে কুলুপ। কোনো জবাব নেই। কেবল আমার মুখের ওপর তাঁর চোখের বিদ্যুৎ কষা হানল।

আবার বললাম, 'আপনি বোধ হয় আমার ওপর রাগ করেছেন। কিন্তু মানে—'

অস্বস্তিতে আমার কথা আটকে গেল। খেঁকিয়ানন্দ চুপ। এর পরে মরীয়া হয়ে বললাম, 'বলছিলাম, বইয়ের সত্যি আমার দরকার নেই। তাই আশ্রমের জন্যে সামান্য কিছু যদি—'

কথা শেষ না করে গুটিকয়েক টাকা বাড়িয়ে ধরলাম। খেঁকিয়ানন্দ প্রায় অভিমানাহত শিশুর মতো একবার সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন। এবং মুখ না ফিরিয়েই, কাঁধের ছোট ঝুলির মুখটি ফাঁক করে, এগিয়ে ধরলেন। আমি টাকা কটি তার মধ্যে ফেলে দিলাম।

খেঁকিয়ানন্দ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবু মুখ খুললেন না। তারপরে হঠাৎ পিছন ফিরে এগিয়ে গেলেন। আমি হেসে মুখ ফেরাতে যেতেই, খেঁকিয়ানন্দ ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'একটা কথা ছিল।'

আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'কিছু বলছেন?'

খেঁকিয়ানন্দ চকিতে একবার আমার মুখ দেখে নিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যেবেলার দিকে মাঝে মাঝে আশ্রমে এলে খুশি হব।'

'নিশ্চয় যাব। গিয়ে আপনার গান শুনব।'

কিন্তু খেঁকিয়ানন্দর চোখের কোণ কুঁচকে উঠল। তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'হুম্। প্রথম দর্শনেই তো বলেছি, ও চোখ-মুখ খুব সুবিধের নয়। কিন্তু না গেলে তখন দেখব।'

একটু যেন হাসির ঝিলিক দেখতে পেলাম বাবাজীর চোখে। পরমুহূর্তেই পিছন ফিরে হনহনিয়ে চলে গেলেন। আমি সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। সেই একটু রোদের ঝলক এখন অপসৃত। কিন্তু সেই বিশাল নীলাম্বুধির তিক্ত জলরাশির ঢেউয়ের তালে তালে যেন শুনতে পেলাম,

'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কী
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কী
হায় বুঝি তার খবর মেলে না।'

হোটেলের দিকে ফিরলাম। দৃষ্টি পড়ল, দোতলার চার নম্বরের জানালার দিকে। চাইতেই চোখে পড়ল, গৌরাঙ্গী কনিষ্ঠাকে। চোখে চোখ পড়তেই, জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। কেন? আমি কি দৃষ্টিকটু কিছু না কি? নাকি চোখের বালি? চার নম্বর

যেন সমুদ্রকূল থেকে অনেক দূরে, অন্তরালের রহস্য নিঃশব্দের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।

আর একটু এগিয়েই চোখ পড়ল বালুচরের একটি নৌকার দিকে। নৌকার আড়ালে, বালির ওপর এলানো কেশ। শাড়ির আঁচলের ইশারা। আর চওড়া মনিবন্ধে ঘড়িসহ একটি পুরুষের হাত এলানো কেশের ওপরে। চিনতে একটুও ভুল হয় না, নীচের তলার চখা-চখী। ঘড়িটা কী বলছে। সময় নাই রে, সময় নাই। কিন্তু মিথ্যে বলব না, আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠল। যদি হতাম সুকণ্ঠ বিহগ, তবে ওদের কাছে উড়ে গিয়ে সম্বর্ধিত করে আসতাম। এই তো ধর্ম, এই তো সহজ। লজ্জা? এই আকাশ, এই সমুদ্রের কি লজ্জা আছে। নির্জনতার ওরাই অলঙ্কার।

হোটেলে ফিরে দেখলাম, মহিমবাবু নেই। হয় তো বাড়ি চলে গেছেন। শুধু সঞ্জয় গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে অফিস ঘরে। কিন্তু খরিদ্দারের জন্যে যে খুব একটা ডিউটিফুল হয়ে বসে আছে, এমন মনে হল না। আমি ঘরে ঢুকতেই তার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল সঞ্জয়?'

সঞ্জয় মাথাটা নীচু করে রেখেই বলল, 'না বাবু, কিছু না। ওই বাবাজীর গান শুনলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

তা বটে। বিরহ শক্তি দিতে পারে। ব্যথা ভোলাতে পারে কি!

রাত্রিবেলা মনে হল সময়ের মধ্যে একটু মন্থরতার সুর বেশি বাজছে। উড়িষ্যার দেব-দেউলের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি আমি। ভাবলাম, পথের দিশা জেনে নিয়ে, এবার যাব নিরালা দেউলের মৌন মূর্তিদের ভিড়ে। এই নির্জন সৈকতের কূলে কূলে যারা পাথর হয়ে আছে।

কিন্তু যা ভাবা যায় তা হয় না। রাত্রে বৃষ্টিহীন বালুচর থেকে ঘরে এসে যখন শুয়ে ছিলাম, তখন ছিলাম একরকম। সকালবেলা ঘুম ভাঙল বাক্স প্যাঁটরার দুমদাম শব্দে। চার নম্বর খালি হচ্ছে নাকি? কারণ শব্দগুলি যেন তিন নম্বরের দেয়াল ঘেঁষেই হচ্ছে। যদিও তিন নম্বরের দেয়ালের গায়েই চার নম্বর নয়। তিন আর চারের মাঝখানে একটা গলি আছে গাড়ি-বারান্দায় যাবার। সেই গলিতে দেখেছি একটি কাঠের পার্টিশান দেওয়া কামরা আছে। দরজা তালাবন্ধ। মনে হল, শব্দ হচ্ছে সেই প্যাটিসশানের মধ্যে। তবে হয় তো নতুন কেউ এল।

বাথরুমে যাবার জন্যে ঘরের বাইরে এসে দেখলাম, তাই। পার্টিশানের দরজা খোলা। ভিতরে তক্তপোশের ওপর সঞ্জয় বিছানা পাতছে। দরজার কাছে বিরাট আকারের দুটি ট্রাঙ্ক।

আমাকে দেখে সঞ্জয় বলল, 'সেই এজেণ্টোবাবু এসেছেন। পরণবো বাবু, বিলাতী কোম্পানির সাহেব, খুব মজার লোকো আছি।'

সঞ্জয়ের উৎসাহ দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। আর, কোনো কারণে উৎসাহিত হয়ে উঠলেই দেখি, ওর বাংলা কথায় একটু দেশীশব্দের মিশেল বেশি হয়। আর হয় তো আমি সত্যি স্বার্থপর। একেবারে দেয়াল ঘেঁষেই মজার লোকের বসত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মজা টের পেতে হবে হয় তো আমাকেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কত নম্বর ঘর সঞ্জয়?'

সঞ্জয় ঠোঁটের ফাঁকে তেঁতুলবীচি দেখিয়ে বলল, 'এ ঘরের তো লম্বর নাই বাবু। এটা ইস্‌পেশালো।'

'ইস্‌পেশালো?'

'আঁজ্ঞা। পরণবো বাবুর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। হপ্তা দু' হপ্তা অন্তর আসেন

কি না।'

কিন্তু মনটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইল। যদিও, ঘর বেঁধেছি সরাইখানায়, ভিন্ মুসাফিরের ভাবনা আমি ভাবতে চাই নে। তবু, আর দেরী নয়। এবার আরও দূর নির্জনের খোঁজে চল।

কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে ফিরে দেখি, আমার ঘরে লোক। আমার চেয়ারে অচেনা লোক অর্ধশয়ান। কালো ট্রপিকালের প্যাণ্ট, শাদা সিল্ক টুইলের শার্টের ওপরে, বাতাসে উড়ছে লাল টাই। চোখে চশমা। হাতে আমারই বই, মনোযোগও সেই দিকেই। প্রায় একটু বিরক্তির সঙ্গেই মনে মনে জিজ্ঞাসু হলাম, বিলাতী কোম্পানির এজেণ্টো, ইনিই কি পরণবো? বয়স বোধহয় চার দশের ঘরে। আমার সাড়া পেয়েই ফিরে তাকালেন। হাত তুলে নমস্কার। তারপরেই, 'কিছু মনে করবেন না ভাই। বিনা অনুমতিতেই ঘরে ঢুকেছি। অন্তত এই হোটেলটায় ঢুকে আর ফর্মালিটি রক্ষা করতে পারি না। আর কাকাবাবু সার্টিফিকেট দিলেন, তিন নম্বরে নাকি একটি খাসা আজব ছেলে এসেছে।'

খাসা এবং আজব? তা না হয় হল। কিন্তু কাকাবাবুটি কে? নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললাম, 'কাকাবাবু—?'

'মানে মহিমবাবু, মহিম রায়, প্রোপ্রায়টর অব্ দি নোঙর ঘর।'

'ও!'

'হ্যাঁ। মশায়, যখন বাহির করেছি ঘর, তখন সব দিক দিয়ে করাই ভালো। পরকে আপন করতে না পারি, কাকা জ্যাঠা বলতে আপত্তি কি। কিন্তু আপনার অসুবিধে—?'

'না না। অসুবিধে আর কি!'

'তা হলে মশায় বসি। বুঝতেই পারছেন, বাইরে-ঘোরা মানুষ, অচেনাকে আর অচেনা বলে বুঝতে পারি না। আলাপ পরিচয় করবার নিয়ম গেছি ভুলে। বরং চেনা মানুষ দেখলেই একটু থমকে যেতে হয়। পরিচয়ের সূত্রটা মনে করতে আঙুল কামড়ে মরি। কী জানি, ইনি আবার সত্যিকারের মামা কিংবা মেসোশ্বশুর, কে জানে। কে জানে, ইনি আবার আমাকে কী চোখে দেখেন, কী জানেন আমার সম্পর্কে। অস্বস্তি না অস্বস্তি! তার চেয়ে বাবা, এস যত অচেনার দল! আমরা কেউ কাউকে চিনি না। সম্পর্ক একটা বানিয়ে নাও। কেবল বাবা বলতে পারব না।'

তোয়ালেটা তখনও কাঁধ থেকে নামাবার অবকাশ পাই নি। বললাম, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বললেন, 'সমর্থনের ভঙ্গিটা আপনার ভালো।'

চকিত হলাম বিব্রত লজ্জায়। ভদ্রলোক বিদ্রূপ ভাবলেন নাকি? বললাম, 'না না—'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর একবার ভদ্রতা না করে পারছি না। সত্যি আপনাকে অসুবিধেয় ফেললাম না তো?'

'না না, বসুন।'

'বসেই আছি। তার আগে আমার পরিচয়টা দেওয়া দরকার।'

আমি বললাম, 'বোধহয় বিলাতী কোম্পানির এজেণ্টো, আপনি পরণবোবাবু?'

প্রণববাবু হেসে উঠে বললেন, 'ফাইন! সঞ্জয়ের সেবা পাচ্ছেন, বোঝা গেল। অতএব নাম পেশা জেনেই গেছেন। ধাম—।'

'পথে পথে।'

'রিয়্যালি! তবে, ওই আর কি, বাঁধা পথের ঠিকানায় কিছু কাকা জ্যেঠা করে রেখেছি! মহিমকাকা তার মধ্যেই একজন। কিন্তু, আপনার নাম ধাম জিজ্ঞেস করার আগে জানতে চাই, কতদিন এসেছেন?'

'সপ্তাহান্ত হল।'

'থাকবেন কতদিন?'

'সেটা ঠিক জানি না।'

'বাঃ! আমার ভিতরে একো শুনতে পাচ্ছি যেন। কবি নাকি?'

'কেন?'

'এই ক্লাউডি ওয়েদার, রাফ্ সী, লোনলি বীচ্, এ সময়ে তো সচরাচর কাউকে আসতে দেখি না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, খিদে পেলে দারুণ খাই, ঘুম পেলে ভীষণ ঘুমোই, ফরাসী কাটের দাড়ি রাখি নি, আর মাথায় অসম্ভব তেল মাখি, দেখতেই পাচ্ছেন।'

প্রণববাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'ব্রিলিয়াণ্ট্! ব্রিলিয়াণ্ট! আপনি কথাকার। ওই নামেই আপনাকে ডাকব।'

এ বিষয়ে আগেই ভদ্রলোক দোষ খণ্ডন করে নিয়েছেন। অচেনার রাজ্যে, পরস্পরকে যা হোক একটা নাম ধরে ডাকলেই হল। এবং প্রণববাবুকে এ বিষয়ে বাধা দিয়ে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমার অনুমতির বোধ হয় প্রশ্নই নেই।

'আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে ভাই কথাকার!'

মিথ্যে বলতে পারব না, প্রণববাবুর কথার ভঙ্গি এবং সম্বোধনটা শুনতে খারাপ লাগছে না। বোধ হয় আপনাতে মত্ত, ফর্ম্যালিটি নেই, তাই আন্তরিকতার সুর শোনা যায়। বললাম, 'বলুন?'

টেবিলের ওপর থেকে দর্শনের বইটি তুলে নিয়ে বললেন, 'কথাকার ভায়ার কি বইখানি খুব প্রিয়?'

বললাম, 'প্রিয় অপ্রিয় জানি নে। পড়তে ভালোই লাগে।'

'বোঝাই যাচ্ছে। নইলে কাঁধের ঝোলায় গৃহস্থালি না থেকে এ বই থাকবে কেন। কিন্তু এই বইয়ে যে সব মতামত ব্যক্ত এবং আলোচিত, তাতে বিশ্বাসও আছে নাকি?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে পড়ি নি। জানবার জন্যে পড়েছি।'

'মনের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগছে না কোথাও?'

'লাগলেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই। গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যেতে পারব। অপরের মতো আমার অসহিষ্ণুতা নেই।'

'ভেরী গুড, আসলে কথাগুলো ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করছিলাম। আমার ভাই, নিয়তিবাদ বলুন আর অস্তিত্ব অনস্তিত্ব বলুন, আস্থা নেই কোনো কিছুতেই। পর মতে যখন আপনি সহিষ্ণু, জানিয়ে রাখি, আমি কিন্তু বেহদ্দ অবিশ্বাসী।'

'অবিশ্বাসী?'

'হ্যাঁ।'

প্রণববাবু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দেখলাম, ওঁর বড় বড় ফাঁদি চোখের চারপাশে, মাকড়সার জাল সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যেই সম্ভবত চোখের ঝিলিক একটু বেশী! বয়স ভেবেছিলাম চার দশের ঘরে। হয় তো তাই। তবু কোথায় যেন এখনও একটি তারুণ্য জড়িয়ে আছে। কিংবা সেটা ওঁর চঞ্চলতা। হয় তো, ভিতরের ক্লান্তি যত ভরে উঠছে, চপলতা তত উপছে পড়ছে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'মরুর বুকে
থাকতো সুখে
সেই এক অবিশ্বাসী।
নেইকো খোদা

দুনিয়া মুর্দা
শরাব্ পিয়াসী॥'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি ভাই জাহান্নামবাদী! মিশতে আপত্তি নেই তো?'

বললাম, 'আপনিই তো বলেছেন, আমরা সবাই অচেনা। ঘর করতে ঠোকাঠুকি সে ভয় আমাদের নেই।'

প্রণববাবুর কথা থেকে আন্দাজ হয়, নিজের সম্পর্কে পরের কাছে, কোথায় যেন ওঁর দ্বিধা আছে। কিন্তু পথের ধারে পান্থশালায়, কার কী আসে যায়। আজ দেখা, কাল নেই একদিন মনের পলিতে ঘাস গজিয়ে যাবে। আর হয় তো কেউ কাউকে মনে করতেও পারব না। 'ভুলব না' কথাটা যে কত অলীক, মানুষ বারে বারে তা প্রত্যক্ষ করে। তবু বলতে ভালোবাসে, 'ভুলব না।' সময় শুধু তার বাঁকা-স্রোত-ঠোঁটে মিটিমিটি হাসে।

প্রণববাবু বললেন, 'তবে সেই ভরসাতেই, কথাকারের সঙ্গে আমার বেআবরু মেলামেশা।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনার কাছে জানবার কথা ছিল কয়েকটা।'

প্রণববাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আমার কাছে? আফটার অল্—'

বললাম, 'ভয় পাবেন না। বলছিলাম, অনেকদিন তো ঘুরছেন এ দেশের পথে পথে। নিতান্ত ট্যুরিস্ট-এর মত ঘুরতে চাইনে বলে জানতে চাই, কোন্ পথে কোণারক যাওয়া যায়?'

'ও', এই কথা! সে হবে 'খনি। যত রকমের পথ আছে, সব বলে দেব। কিন্তু এখন নয়।'

'আজকালের মধ্যেই বেরুব ভাবছিলাম।'

'অসম্ভব। এখন কয়েকদিন ছাড়াছাড়ি নেই। একটা সত্যি কথা বলব?'

'বলুন।'

'আপনাকে ভালো লেগে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন, ভালো-লাগাটা আমার অভ্যাস নয়। যদিও তেমন ভান করে থাকি প্রায়ই। এখানে যে সে ভান নেই, সেটা বুঝতে পারছেন আশা করি। আর যদি বলেন ব্যাখ্যা করতে কেন ভালো লাগল, তা আরো দুরূহ। কিন্তু জানেন তো, মন গুণে ধন। কথাকারকে আটকে রাখব কয়েকদিন।'

এবার আমাকে দ্বিধায় পড়তে হল। ইতিমধ্যে সঞ্জয় এল চা-জলখাবার নিয়ে। প্রণববাবুকে বলল, 'বিছানা পেতে, বাক্স ঢুকিয়ে সব ঠিক করে দিয়েছি।'

প্রণববাবু বললেন, 'বেশ করেছ। এখন আমার চা-টাও এখানেই নিয়ে এস।'

'আজ্ঞা।'

কিন্তু প্রণববাবু নীরব থাকার পাত্র নন। বললেন, 'আসলে কী হয়েছে জানেন কথাকার, নিজেকে যদি চিনে থাকি, তা হলে বলতে হয়, একলা থাকতে ভয় পাই।'

'ভয় পান!'

'হ্যাঁ, ভীষণ ভয় পাই।' বলতে বলতে সমুদ্রের দিকে ফিরলেন। একটু যেন আচ্ছন্ন হয়েই পড়লেন। বললেন, 'এত ভয় পাই, মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মরেই যাব। আর সেটা ভূতের ভয়।'

'ভূত?' হেসে ফেললাম।

প্রণববাবু হাসলেন না। বললেন, 'সে ভূত বাস করে সর্বের মধ্যে। অর্থাৎ আমার মধ্যেই। অনেকটা নিশি পাওয়ার মতো।' বলে নিঃশব্দে একটু হাসলেন।

কিন্তু আমি হাসতে পারলাম না। হয় তো প্রণববাবুর জীবনকলির প্রথম উন্মেষে কোথাও একটা ব্যথা ছিল। একদা তা যাতনা দিয়েছে। এখন দুঃস্বপ্নের তাড়া খেয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সঞ্জয় এল চা নিয়ে। প্রণববাবু বললেন, 'ঘরের দরজাটা বন্ধ করেছ?'

'আজ্ঞা, করেছি।'

সঞ্জয় চলে যাবার পর বললেন, 'আপনাকে অবশ্য নিশি পাওয়ার মতো ধরব না। ওই যে বললাম, ব্যাখ্যা করতে পারব না, কিন্তু আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, পথ চলতে এই মানুষটার কাছে একটু নিরিবিলিতে কথা বলা যায়।'

'হয় তো আমার ওপর অবিচার করছেন।'

'মোটেই নয়। যদিও জানি, আপনার সঙ্গে আমার চরিত্র আর মনের কোনোই মিল নেই। আর এসব ক্ষেত্রে মিল থাকলে বোধ হয় দুজনকে দুজনের কাছ থেকে ছিটকে যেতে হত। আসলে আপনি শুধু পরমতসহিষ্ণু নন, আপনাকে দেখে আমার মনে হল, আপনি পরবন্ধু। আপনার বাছবিচারের ছুঁৎমার্গতা নেই।'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'দয়া করে একটু থামুন। আমাদের আলাপ এক ঘণ্টাও হয় নি।'

'তা ঠিক, কিন্তু এর মধ্যেই কত ঢেউ এল, কত ঢেউ গেল, লক্ষ্য করেন নি। সময় একটুখানি, অথচ প্রথম দর্শনেই যেন আপনাকে চিনতে পারলাম। আপনার হাত দেখি নি, আপনার কোষ্ঠি জানি না, তবু হলপ করে বলতে পারি, আপনার নিয়তি আপনাকে পরবন্ধু চরিত্র দান করেছে। আপনার রেহাই নেই। পরবন্ধু মাত্রেরই মনোকষ্ট ও কলঙ্ক চিরকালের সঙ্গী। অতএব, দু-একটা দিন থেকে যান, আপনার সঙ্গে কাটাই।'

প্রণববাবুর গুণগানের প্রতিবাদ নিরর্থক। আমার পরবন্ধু চরিত্র বিচারের প্রবৃত্তি নেই। মনে মনে শিরোধার্য করে বললাম, 'ঘুরতেই তো বেরিয়েছি, থাকব আরও দু-একদিন, আপনার যদি ভালো লাগে।'

প্রণববাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আপনার হয় তো খারাপ লাগবে। মহিমকাকা শুনলে আশ্চর্যই হবেন, এমন করে আমি আপনাকে ধরে রাখতে চাই বলে। অবিশ্যি, অনেক লোককেই আজ অবধি আটকেছি, ছেড়ে দিয়েছি এবং তার জন্যে জুয়া খেলার মতো পণ ধরেছি। কিন্তু তাদের কথা আলাদা।'

ঘাড় দুলিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলেন প্রণববাবু। একটু যেন রহস্যের দাগ টানলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তারা কারা?'

দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, যেন দূর থেকেই বললেন, 'তাদের কথা আপনাকে পরে বলব। তবে এটুকু বলতে পারি, তাদের জন্যে আমার বুদ্ধির দরকার হয়। বিবেকটাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিই।'

আমি কথাগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করছিলাম।

প্রণববাবু কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ রইলেন। তার পর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'নাঃ, অনেক বাজে বকেছি। আর একটু চা খাওয়া দরকার, কী বলেন? 'পুবসাগরের পার হতে' যে রকম বাতাস দিচ্ছে। ওহে সঞ্জয়ো!' ঘর থেকেই চিৎকার করে উঠলেন প্রণববাবু।

নীচের থেকে সাড়া এল, 'যাই বাবু!'

'আসতে হবে না। একেবারে দু' কাপ চা হাতে করে এস।'

'আজ্ঞা আচ্ছা।'

এতক্ষণে একটু বাইরে তাকাবার অবসর পেলাম। বললাম, 'চলুন, সিঁড়ি-বারান্দায় যাওয়া যাক।'

'চলুন।'

মনটা যে খচখচ না করছে, এমন নয়। এসেছিলাম একলা হতে, যে অশেষের পাড়ে, তার ঢেউয়ের উচ্চরোলে কী কথা বাজে, আমি বুঝতে পারি নে। অপরিবর্তনীয়ের দ্বারে এলাম আমার নিয়ত পরিবর্তনকে নিয়ে। কিন্তু সে যে বারে বারেই নানান্ রঙের পর্দা খোলা বন্ধের খেলা খেলছে। সে তো জানে, আমি টনটনালে বাজি। আঘাত পেলে বোল তুলি। সেই আমার মর্ম আমার ধর্ম। বেতালের আঘাত পড়লে আমি নির্বাক হয়ে যাব।

কিন্তু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখছি, ফেনিলোচ্ছল তার হাসি। মহানন্দ হাসি. অসংশয় নির্ভয়ের হাসি। নির্জনতার স্বাদ কি শুধু নির্জনতায়! বিপরীত না থাকলে রীতিকে বোঝা যায় কেমন করে।

'কী দেখছেন?'

চমকে উঠে বললাম, 'না কিছু না। মেঘের যেন আজ সাজ সাজ রব।'

প্রণববাবু বললেন, 'তবে অবিশ্বাসী। এখুনি হয় তো দেখবেন, সমুদ্রের বুক থেকে মেঘ ফালা দিয়ে কেটে, রোদ একটা তরোয়ালের মতো উঠে আসছে। আমি অবিশ্যি ভাবছিলাম, আপনি বুঝি ওই দুটিকে দেখছেন।'

লক্ষ্য করি নি, মেঘ-ছাওয়া বালুবেলায় চখা-চখী ঝিনুক কুড়োচ্ছে। বললাম, 'বেশ লাগে ওদের দুটিকে।'

প্রণববাবু বললেন, 'যেন চির-বেশ থাকে। কিন্তু চার নম্বরের ব্যাপারটা কী রকম বলুন তো কথাকার?'

বললাম, 'বুঝতে পারি নে। পাশাপাশি থেকেও দেখছি, ওরা অনেক দূরে।'

'দিন বারো তেরো আগে যখন এসেছিলাম, তখনই ওদের দেখে গিয়েছি।'

আমরা দুজনেই যুগপৎ ফিরে তাকালাম চার নম্বরের বন্ধ দরজার দিকে। সকাল থেকেই ভাই বোনেদের বেরুতে দেখা যায় নি। অনুমান করা যায়, ভিতরেই রয়েছে সবাই। সাড়া শব্দ নেই একেবারেই।

প্রণববাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কোথায় একটু গোলমাল আছে। সেবারে সময় পাই নি, এবার ঠিক আবিষ্কার করে ফেলব।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আবিষ্কার করবেন কি মশাই?'

'ওদের বন্ধ-দুয়ারের রহস্য।'

'রহস্য কেন? এ-সংসারের মানুষ কত রকমের হয়।'

'এটা ভাই কথাকারের মতো কথা হল না। কত রকমের মানুষ আছে বলেই আবিষ্কারের কৌতূহল জাগে।'

'হ্যাঁ, তা যদি হয়—'

'কিন্তু মোটেই তা নয়। আপনি যাকে আবিষ্কার বলেন, আর আপনার কৌতূহল, তার সঙ্গে আমার তফাৎ অনেক। আপনারা হলেন মানব মনের ডুবুরি। আমাদের আবিষ্কারের মজা হচ্ছে, পাশের বাড়ির কেচ্ছা জানার মতো।'

আমি বললাম, 'আপনি কি চার নম্বরের কেচ্ছা আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন নাকি?'

'কেচ্ছা থাকলে তো আবিষ্কার করব। হয় তো শেষ পর্যন্ত জানা যাবে, ছেলেটি টি-বি রুগী। অসুখের কথা চেপে হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। স্বভাবতঃই ওরা লোক এড়িয়ে চলে, মুখে ওদের হাসি নেই।'

মনে মনে চমকে উঠলাম। চমকানোটা সংস্কার। যদিও কথাটা নিছক সত্যি বলে মানতে পারি নে। আবার অসম্ভব না-ও হতে পারে, কিন্তু ক্ষয়রোগী যদি হয়, দুই বোনকে কি সে সঙ্গে রাখত?

প্রণববাবু হেসে বললেন, 'ভয় পাবার কিছু নেই।'

আমি বললাম, 'ভয় পাই নি।'

'তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে কাকাবাবুর দৃষ্টি খুব কড়া। সকালবেলা বলছিলেন. 'ছেলেমেয়ে কটির ভাব বুঝতে পারি না।' সত্যি, কতই যে দেখলাম এই সব পান্থশালায়।'

সঞ্জয় আবার চা দিয়ে গেল।

বললাম, 'অনেক দেখেছেন, না?'

'অনেক। যদি লেখক হতাম, তাহলে লিখতাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমি নিজেও এই পান্থশালার এক চরিত্র হয়ে গেছি।'

বললাম, 'নিজের কথাও লিখবেন।'

'না মশাই, সে ক্ষমতা নেই। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখব, সে দৃষ্টি আমার নেই। তাছাড়া...তাছাড়া, আমার চরিত্র বোধ হয় লিখবার মতো নয়। সে কথা আপনাকে পরে বলব।' বলে, প্রায় এক চুমুকে চা শেষ করে বললেন, 'কিন্তু আর নয়। এবার আপনার ছুটি—। আবার ঠিক সময়েতে এসে পাকড়াব।'

বিদায় নেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে, টাই উড়িয়ে প্রণববাবু চলে গেলেন। হয় তো নিজের ঘরেই গেলেন। কেমন যেন আত্মসম্মোহিত মানুষ। এ বিশ্বের সকল মানুষই সম্ভবতঃ কম বেশী আত্মসম্মোহনের পথ ধরে চলে। যাদের বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাদের ব্যতিক্রমগুলো চোখে না পড়ে যায় না। যে সতীরা স্বেচ্ছায় চিতায় ঝাঁপ দিত, ঈশ্বরের কাছে যারা আত্মবলি দিত, অনেকটা তাদের মতো। যাদের অপ্রতিরোধ্য, ভবিষ্যৎ একটি নিশ্চিত পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়, নিজেরই অবচেতনের সম্মোহন-যন্ত্রের চাপে। ওটা অনুশীলিত বিশ্বাস নয়।

মনে হয় প্রণববাবু যেন তেমনি এক সম্মোহনের টানে চলেছেন। ওঁর মুখের ছায়ায়, চোখের ভাষায় তাই যেন দেখলাম। ওঁর কথার মধ্যে তাই যেন শুনলাম।

কিন্তু কী যায় আসে। সামনে এই যে বিশাল, এই যে বিরাট, এখানে সকল প্রণবের, সকল আমি-র সব লীলা তার নিরন্তরে হারিয়ে গেছে। যাবেও। আমি এই নিরন্তরকেই দেখি।

কিন্তু নিরন্তরের ইশারা বুঝি দেখতে পাই নে। তাই বেলা তিনটেয় যখন একটু কাগজে কলমে মনে মনে খেলছি, তখনই শুনতে পেলাম, 'আমি উপস্থিত। অন্য কথা বলবার আগে আগেই একটা নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখি। আজ থিয়েটার দেখতে যাব সন্ধ্যায়, নাটকের নাম শর্মিষ্ঠা, ভাষা ওড়িয়া।'

গন্ধ তেল, পাউডার আর অডিকলনের গন্ধে আমার ছন্নছাড়ার ঘর গেল ভরে। ফিরে দেখি, প্রণববাবু।

বললাম, 'থিয়েটার, মানে?'

'মানে, থিয়েটার মশাই! নাটক যাকে বলে, পাবলিক স্টেজে। এ দেশের নাটক দেখেছেন কখনও?'

স্বীকার করতে হল, সে সৌভাগ্য হয় নি ইতিপূর্বে। বললাম, 'পাবলিক স্টেজ আছে বুঝি?'

'রীতিমত। খালি কি আপনাদের কলকাতাতেই আছে?'

'তা নয় নিশ্চয়। জানা ছিল না।'

প্রণববাবু এগিয়ে এলেন কাছে। দেখলাম, দু'হাত ওঁর পিছনে। বললেন, 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাব বলে এলাম।'

বললাম, 'বসুন।'

www.boiRboi.blogspot.com

বললেন, 'বসব। সঞ্জয়কে আমি চায়ের কথা বলে আসি। ততক্ষণ আপনি দেখুন। এগুলো হল এই নোঙর-ঘর হোটেলের কাহিনী। বলে, একটি লাল ফিতে বাঁধা পুঁটলি এগিয়ে দিলেন। হাসতে হাসতে আবার বললেন, 'এসব আমার সীক্রেট, কিন্তু ওপন্' সীক্রেট।'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'তাহলে থাক না প্রণববাবু।'

বললেন, 'কথাকারকে দেখাব বলেই তো নিয়ে এলাম। দেখবেন, রাগ-টাগ করবেন না যেন।'

বেরিয়ে গেলেন প্রণববাবু। পিজবোর্ডের বেশ বড় বাক্সের পুঁটলিটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হতে লাগল। কৌতূহল যে নেই, তা বলব না। তবু মনের বাধো-বাধো যায় না। কী আছে, কেন দেখব। তায় আছে সীক্রেট, যদিও নাকি ওপন্।

শেষ পর্যন্ত খুলেই ফেললাম। দেখলাম, ভাঁজে ভাঁজে সাজানো অনেক চিঠির তাড়া। মেয়েদের কিছু ফটো, নানান্ বয়সের। যদিও প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাদের ভিড় নেই। মুহূর্তে যেন সমস্ত কিছু দেখতে পেলাম। তবু শেষ মুহূর্তের কৌতূহল, একটি চিঠি খুলে ফেললাম।

"—জীবনে এ কথা কখনো ভাবি নি যে, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে, সমাজ সংসার স্বামী সব ভুলে যাব। সাত বছরের বিবাহিত জীবনে, এ কথা জানতাম না, নোঙর-ঘর হোটেলে তোমার সঙ্গে দ্বিচারিণী হবার ভবিষ্যৎ লেখা ছিল। নিজেকে চেনার দুঃখটা তাই কলকাতায় ফিরে ভয়ঙ্কর বেশী লাগছে। কিন্তু তুমি কি আমাকে সত্যি ভালোবেসেছ?—"

আর না পড়ে তাড়াতাড়ি চিঠিটা বন্ধ করলাম। রাখতে গিয়ে আর একটি অন্য চিঠির কয়েকটা লাইন চোখে পড়ে গেল,—"আপনি যে চরিত্রহীন, ভলোবাসা-টাসা যে সব বানানো কথা, তা আমি বুঝেছি, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। আপনাকে আবার আমি আমার ফটো দেব? ভগবান আপনাকে একদিন চরম শাস্তি দেবেন। একটি আঠারো বছরের মেয়ে আপনার ছদ্মবেশ ধরতে পারে নি, তাই—।"

আর পারলাম না। এই অসংখ্য চিঠি খোলবার সাহস হল না আর। দ্রুত হাতে সব বন্ধ করে, ফিতে বেঁধে ফেললাম। কুণ্ঠায়, লজ্জায়, বিব্রত হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে, গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

আঃ! এ কি বিড়ম্বনা! নিশ্বাস কেন রুদ্ধ হয়ে আসে। মুক্তি নিয়ে এলাম যে-ঘেরাটোপ ভেদ করে, তারই নানান্ খেলা আমাকে হাতে হাত দিয়ে ঘিরে ধরতে আসে। কেন? সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চাপা গর্জনে সে ফুলছে, কিন্তু অট্টহাসিতে চল্‌কে উঠছে না। গাঢ় মেঘের বুকে একটি ভ্রূকুটি গাম্ভীর্য থম্‌থম্ করছে। অথচ আমি যেন দেখলাম, সমুদ্র তার বহুদূর বুকে উত্তোলিত হাততালিতে তাথৈ তাথৈ নাচছে।

'কী হল, কথাকার যে একেবারে অচ্ছুৎজ্ঞানে স্পর্শই করেন নি আমার নোঙর-ঘরের ভাণ্ডার।'

পিছনে প্রণববাবুর গলা শুনেই বুঝতে পারলাম, আমার মুখ কালো হয়ে রয়েছে। আর সেই মুহূর্তেই আমার ভিতর থেকে যেন কেউ অবাক বিস্ময়ে হেসে উঠে বলল, কী লাভ আছে এই কালো মুখের। রুষ্টতা আমাকে কী দাম দেবে এই পারাবারের কূলে।

প্রণববাবু কাছে এসে বললেন, 'এর মধ্যেই সব হয়ে গেল?'

আমি বললাম, 'শুনেছি হাঁড়ির ভাত দুটি টিপে দেখলেই বাকিগুলো বোঝা যায়।'

প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'করেক্ট! কিন্তু কথাকার কি রাগ করেছেন আমার ওপর?'

রাগ? আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করি, রাগ করেছি নাকি সত্যি? কই, তার চিহ্ন তো দেখি নে কোথাও! একটা বিষণ্নতা যদিও ছেয়ে আছে মনের মধ্যে।

বললাম, 'না, রাগ করি নি।'

'তবে? বিতৃষ্ণা বোধ করছেন?' প্রণববাবুর গলায় লঘু সুরের তারল্য থাকলেও গাম্ভীর্যের ছোঁয়া লেগেছে।

আমি ওঁর দিকে ফিরে বললাম, 'প্রণববাবু, সংসারের নানান্ রঙ দেখে যারা বিতৃষ্ণা বোধ করে, তাদের গলা চিরকাল শুকিয়েই থাকে। আমি সে দলের দলীয় নই। কিন্তু এতে কি সুখ আছে?'

প্রণববাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মশাই আপনি যে সত্যি ঠাট্টা করছেন, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'ঠাট্টা কেন?'

'ঠাট্টা নয়? আপনার মতো মানুষ তা নইলে সুখের কথা বলেন? যার কোনো অস্তিত্বই পৃথিবীতে নেই।'

প্রণববাবুর হাসিতে এবং মুখের ছায়ায় সম্ভবত ওঁর সেই নিশি পাওয়ার ঘোর লাগছে। আমি স্পষ্টই দেখলাম, প্রণববাবু মিথ্যে বলেন নি। ওঁর জীবন বিচরণের ভৌগলিক সীমায় সত্যি সুখ দেখা যায় নি।

বললাম, 'সুখ না থাক, শান্তি কি একটুও পেয়েছেন?'

প্রণববাবু তেমনি হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি কথাকার, আপনি সেই রূপকথার সোনার কাঠির খোঁজে আছেন, এই বাস্তব জগতে যা কেউ কখনো দেখে নি। এই শব্দগুলো, সুখ শান্তি, কোথাও দেখেছেন নাকি ওসব?'

বললাম, 'প্রণববাবু, সত্যি দেখেছি।'

'কোথায়?'

'দেখেছি তাদের, যারা সাহস আর শক্তি দিয়ে সুখ ও শান্তি সৃষ্টি করেছে।'

'তাহলে হেরে গেলাম। আমার সে সাহস আর শক্তি নেই।'

'কিন্তু প্রণববাবু, সকালবেলা যে কবিতাটি বলছিলেন, সম্ভবতঃ সেই কবিকে আমিও চিনতে পেরেছি। তবু, এখানে তো সেই আনন্দ ও প্রসন্নতা দেখতে পাই নে।'

'সেই কবির সঙ্গে আমার মিল মাত্র এইটুকু, অবিশ্বাস আমাদের মূলমন্ত্র। একজন আনন্দিত ও প্রসন্ন, আর একজন...কী বলব, আর একজন নিতান্তই নেশাগ্রস্ত। এই আমার নিশি পাওয়া।'

প্রণববাবু সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন। আমি দেখলাম, এক দুর্ভাগা আমার সামনে। নেশা যে আকণ্ঠ করেছে। খোয়ারিতে যে মরছে। সত্যি, রাগ করতে পারছি কোথায়? বিতৃষ্ণা বোধেও বিমুখ হতে পারছি নে তো। ওঁর চোখের চারপাশের ছায়ায় দুঃস্বপ্ন আর ক্লান্তি। যেন কক্ষচ্যুত শূন্যতায় ছিটকে দিশেহারা হয়ে ছুটছে। আমি দেখছি একটি অসহায় করুণ মূর্তি। প্রণববাবু আমার থেকে বয়স্ক। একদিনের আলাপ, একবেলার বলা চলে। সখ্যতাও গড়ে ওঠে নি আমার মনে। নইলে ওঁর কাঁধে হাত দিতাম। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতাম।

প্রণববাবু বললেন, 'এ নেশা কাটাবার কোনো ওষুধ আছে নাকি আপনার কাছে?'

হেসে বললাম, ' সে জন্যেই এসব দেখালেন?'

'না। দেখালাম, সত্যি আপনাকে ভালো লেগেছে বলে। ইচ্ছে হল, কেন হল জানি নে, আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে দিই। কোথাও কোথাও নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে।'

আমি বললাম, 'তা হলে বলি প্রণববাবু, ওষুধের প্রয়োজন যদি হয়, নিজেই খুঁজে

পাবেন একদিন।'

'কেমন করে?'

'কিছু মনে করবেন না যেন, যেমন করে মৎস্যভোজী বেড়াল আর মাংসভোজী কুকুর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, একেবারে বিপরীত খাবার ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, কাউকে দেখিয়ে দিতে হয় না, বলে দিতে হয় না, নিজের প্রবৃত্তির বশেই খায়, তেমনি।'

'স্ট্রেঞ্জ! উপমাটা সত্যি আশ্চর্য রকম হয়েছে। বিশ্বাস করতে পারি না যদিও, তবু হয় তো একদিন বিপরীত পথেই ছুটব। সেদিন আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

সে দাবী আমার নেই। চুপ করে রইলাম।

প্রণববাবু আবার বললেন, 'কিন্তু কথাকার, এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে?'

বললাম, 'আমার বিশ্বাস, ব্যাখ্যা করলে, সকল জিনিসেরই ব্যাখ্যা আছে। তাতে কী লাভ। আপনার অতীত জানবার কোনো কৌতূহল আমার নেই।'

প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'এমন কি আমি বিবাহিত কি না, সেটাও আপনি জিজ্ঞেস করেন নি।'

'তার প্রয়োজন নেই। বিবাহিতে অবিবাহিতে কী যায় আসে? বর্তমানের সূত্র-সন্ধানের একটা খেই? তাতে কোনো সুরাহা হবে না। আরোগ্যলাভের পদ্ধতির কথা তো আপনাকে বললাম। এখনে কোনো ডাক্তারির দরকার দেখি নে।'

প্রণববাবু আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলাম, মেঘের গায়ে, পুবে পশ্চিমে একটা বিরাট ফাটল ধরেছে। যেন ওই ফাটলের ফাঁক দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল ঝরে পড়বে। কিন্তু সহসা দেখলাম, একটি তীক্ষ্ন রেখায় আলো ঝলকে উঠল। আর সমুদ্রের মাঝখানে শুভ্র ফেনা চিকচিকিয়ে উঠল। অস্ফুট কথার শব্দে প্রণববাবুর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, প্রণববাবুর ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু কথা বুঝতে পারলাম না। কেবল ওঁর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি দেখতে পেলাম।

সঞ্জয় এল বিকেলের চা খাবারের ট্রে হাতে। এমন সময়ে সহসা চার নম্বরের দরজা গেল খুলে। শব্দে আমরা দুজনেই ফিরলাম। এক মুহূর্ত, দেখলাম কনিষ্ঠা গৌরাঙ্গী। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি হেসে ফেললাম। প্রণববাবু চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

ছটা নাগাদ প্রণববাবুর সঙ্গে বেরুলাম। নীচে আসতেই প্রথম সাক্ষাৎ মহিমবাবুর সঙ্গে। চোখাচোখি হতেই মনে হল, চাউনিটা তীক্ষ্ন এবং থমথমানো। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

বললাম, 'প্রণববাবুর সঙ্গে একটু এদেশী থিয়েটার দেখতে।'

প্রণববাবু আমার কাছেই ছিলেন। সেদিকে না তাকিয়েই মহিমবাবু প্রায় একটি হুংকার দিলেন, 'হুম্! রাত্রে ফেরা হবে তো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মহিমবাবুর কটাক্ষ আসলে প্রণববাবুর প্রতি। প্রণববাবু ফিরে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন কাকাবাবু। আপনার বাউন্ডুলে সাহিত্যিক-বোর্ডারকে রাত্রি দশটার মধ্যেই ফেরত পাবেন।'

মহিমবাবু চশমাসহ চোখ নামিয়ে বললেন, 'আমার আর কী! তুমি তো হাতের বাইরে। ইনি আবার সাহিত্যিক, তাতেই ভয়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভূতে পেলে, পুরী শহরের কোন্ অন্ধকারে গিয়ে পড়বে কে জানে।'

ওঁর কথা থেকে অনুমান করা যায়, পুরী শহরে, অদৃশ্য অন্ধকার-জগতের নানান্ আকর্ষণ আছে। আমি বললাম, 'ভয় নেই।'

মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'হাতে আলো থাকলে অন্ধকারকে আর ভয় কী। ঘুরে এস। তবে এসব জায়গায় ঠান্ডা খাবার খেলে আমাশা হয়, এই বলে রাখলাম। অনুগ্রহ করে যেন তাড়াতাড়ি ফেরা হয়।'

আমার বিস্ময়-চমকানো চোখের সঙ্গে চকিতে একবার মহিমবাবুর দৃষ্টি বিনিময় হল। এমনি এক একটা আশ্চর্য কথা উনি অত্যন্ত সহজে আচমকাই বলেন। 'হাতে আলো থাকলে অন্ধকারকে ভয় কী।' এবং তারপরেই গরম খাবারের সঙ্গে পৈটিক ব্যাধির উল্লেখ, কথার গুরুত্বকে যেন ধরা পড়তে দেয় না। বুঝতে পারছিলাম, প্রণববাবুর সঙ্গে বাইরে যাওয়াটা ওঁর পছন্দ নয়। জানি নে হাতে আমার আলো আছে কি না। ভয়ও নেই।

বাইরে এসে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সন্ধ্যার অন্ধকার, মেঘ আর সমুদ্র, সব মাখামাখি করে আছে।

রিক্‌শায় উঠে প্রণববাবু বললেন, 'মশাই, আপনি দেখছি ঈর্ষার পাত্র। নোঙর-ঘরের মালিকের মনটি কেড়েছেন। অথচ আপনি তো একেবারে ননকমিটাল লোক নন।'

হেসে ফেললাম।—'কেন, ননকমিটাল হলে লোকে মন কাড়তে পারে নাকি?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আমার উল্টো ধারণা। ননকমিটাল লোকেরা অবহেলা আর করুণাই পায়।'

'জানি নে তা হলে কোথায় আপনার চাবিকাঠি।'

বললাম, 'প্রণববাবু, চাবিকাঠি যদি থাকত, তবে ছুটে বেড়াতাম না।'

প্রণববাবু বললেন, 'আমার আর কিছু বলার নেই।'

রিক্‌শা সমুদ্রের ধার থেকে বেঁকে গেল। প্রণববাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মহিমকাকার বিষয় কিছু জানেন আপনি?'

'শুনেছি, সারা জীবন স্বদেশী করে জেল খেটেছেন।'

'হ্যাঁ, আর শেষ বয়সে, সামান্য যা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তা বিক্রি করে দিয়ে, সমুদ্রের ধারে এসে বসেছেন, যেখানে সমাজ সংসারের কোনো বাঁধন নেই। তবু ওঁর একটা পারিবারিক জীবন আছে।'

'জানি।'

'কিন্তু সেই জীবনটার কথা আমরা কেউ জানি না।'

বললাম, 'তেমন কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখি নি তো। পুত্র, পুত্রবধূ সব নিয়ে বিপত্নীক—'

'বিপত্নীক!' প্রণববাবু যেন একটু রহস্য করে হাসলেন। বললেন, 'কোনোদিন সত্যি বিবাহিত ছিলেন কি না কে জানে।'

'তবে, এই এত বড় সংসার?'

প্রণববাবু বললেন, 'কথাকার, পৃথিবীতে কিছু লোক আছে, যারা নিজের জন্যে বাঁচে না। চিরদিনই অপরের ভালো মন্দ সব বোঝাই নিজেদের কাঁধে বয়ে বেড়ায়।'

আমার সংশয় গেল না। বললাম, 'কেমন করে জানলেন?'

'আভাসে একবার শুনেছিলাম কাকাবাবুরই এক বন্ধুর মুখে।'

'প্রত্যক্ষ নয়।'

'না। সমুদ্রের সবটুকু কি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি?'

আমার মনে পড়ে গেল মহিমবাবুর কথা, ইট ইজ্ সো ভাস্ট...।

জানি নে, এ সবের মধ্যে কোনো সত্যি আছে কি না। কিন্তু মহিমবাবু যেন

আরও মহিমময় হয়ে উঠলেন আমার কাছে। আমার প্রথম দিনের পরিচয়ের ব্যাখ্যা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল একটু।

ইতিমধ্যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে, শহরের কেন্দ্রে এসে পড়েছি। চারিদিকে প্রণববাবুর যে রকম আলাপের বহর দেখছি, বোঝা যাচ্ছে, তিনি এখানকার পুরনো মানুষ। ওড়িয়া ভাষাতেও ওঁর আশ্চর্য দখল। বলে না দিলে ধরবার উপায় নেই।

থিয়েটারের সামনে এসে একটু দমে গেলাম। মাইকে হিন্দি গান চলছে কান ফাটানো শব্দে। টিকেট-ঘরের সামনে প্রচন্ড ভিড়। মারামারি লাগবে কি না বুঝতে পারছি নে। তবে কলরবের মধ্যে যে 'বড়কুটুম' সম্বোধনাদি চলেছে, তা বুঝতে পারছি। গালাগালটা কালারাও নাকি শুনতে পায়। আর সম্ভবতঃ, পৃথিবীর যে কোনো দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি দিলেও মানুষ বুঝতে পারে। কারণ, গালাগাল কিনা!

আমি বললাম, 'প্রণববাবু, টিকেট কাটা তো—'

প্রণববাবু হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমরা তো নিমন্ত্রিত, বললাম না আপনাকে? আসুন, এদিক দিয়ে আসুন।'

অন্যদিকে নিয়ে গেলেন প্রণববাবু। একটি ঘরের সামনে আসতেই, চকচকে টাক, টকটকে মুখ, ঝকঝকে আদ্দির পাঞ্জাবি শোভিত একজন স্থূলদেহ ব্যক্তি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করে বাংলায় বললেন, 'আসুন প্রণববাবু, আসুন!'

প্রণববাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, 'থিয়েটারের ম্যানেজার, শ্রীপতিবাবু। তাঁর বন্ধু।'

নমস্কার বিনিময়ের পরেই, ম্যানেজার আমাদের নিয়ে একেবারে হলে চলে গেলেন। প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারিতেই নিমন্ত্রিত অতিথিদের স্থান হয়েছে বটে। কিন্তু ঢুকেই হোঁচট খেলাম।

প্রণববাবু আমাকে ধরে ফেললেন।—'একটু সাবধানে!'

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁচা মাটির মেঝে। তার ওপরে খানে খানে ইঁট পাতা। কাদার ওপরেই যে ইঁট পাতা হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। অসম্মান করার কোনো প্রশ্নই নেই। সততার সঙ্গে বর্ণনা দিতে গেলে, টিনের-চালা-ঢাকা বড় মালগুদামের কথা মনে হয়। সামনেই রাম লক্ষ্মণ সীতার ছবি আঁকা সীন ঝোলানো রয়েছে। ভিতরে গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কিছু কিঞ্চিৎ বেশী। ওপরে কিছু নেই বলে, দাঁড় টেনে মহিলাদের ব্যবস্থা নীচেই করেছে। এতদ্দেশীয় মহিলাদের একসঙ্গে এত ভিড় আর দেখি নি। বোঝা যাচ্ছে, গোলমালটা সেখানেও কম নয়।

ম্যানেজার বললেন, 'আমাদের দল ট্যুর করে বেড়ায়। পাকাপোক্ত ব্যবস্থা কিছু নেই। এখানে সিনেমাও হয়, থিয়েটারও হয়। বসুন আপনারা, আর বেশী দেরী নেই।'

বসলাম। চেয়ারটির বেশ একটি দোলনা দোলনা ভাব আছে। চেয়ারের পায়া অসমান কিংবা ঢেউ খেলানো মেঝের দরুণ এই দোলন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আরশুলা দু-একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমন এক-আধটা তো কলকাতার প্রথম শ্রেণীর হলেই দেখা যায়। এমন কি ধেড়ে ইঁদুরও। এখানেও তা আছে কি না জানি নে। কিন্তু অসম্ভব! থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় গোটা শরীরটা পাক দিয়ে উঠতে লাগল। প্রণববাবু তখন কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। অথচ প্রথম শ্রেণীর আরও কয়েকজন দর্শক দেখছি অতীব নির্বিকার ভাবে পান চিবোচ্ছেন। দৃষ্টি সীনের দিকে। বোঝা যাচ্ছে সকল মনযোগ সেখানেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু আমার এ রকম হচ্ছে কেন? তা হলে কি শুধু এই চেয়ারটিতেই তাদের বাসা?

নীচু হয়ে তাকালাম। যা ভেবেছি! কাঠের চেয়ারের প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, ফাটলে ফাটলে, সেই অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়াবহ জীবেরা যেন পিট্‌পিট্ করে তাকাল আমার দিকে। মনে পড়ল, ছেলেবেলায় পড়া সেই 'রক্তচোষার দিগ্বিজয়।' এবং এরাও যে

নির্জন সৈকতের নিরালায় যাবে আমার সঙ্গে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রণববাবু বললেন, 'কী, ছারপোকা?'

আমি বললাম, 'মানে হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

প্রণববাবু অত্যন্ত সহজ গলায় বললেন, 'আর বলবেন না, একেবারে পিঁপড়ের মত সার বেঁধে ওঠে। ও কিছু নয়। থিয়েটার আরম্ভ হলেই সব ভুলে যাবেন।'

জয় জগন্নাথ! যেন তাই হয়। যেন ভুলে যেতে পারি।

কিন্তু ভোলা গেল না। নাটক শুরু হল। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে কেন্দ্র করে, অরণ্যের সখীরা ঘুরে ঘুরে নাচল, গাইল, তারপরে ধনুর্বাণ হস্তে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির প্রবেশ। যদিও ভাষা বুঝতে পারছিলাম না। বোঝার চেষ্টাও অসম্ভব। কারণ, ভাষা, নাটকের গতি, কুশীলবদের রূপদর্শন এবং কাষ্ঠাসনের বুভুক্ষু বাসিন্দাদের আক্রমণ, আর একই সঙ্গে প্রণববাবুর মাঝে মাঝে, 'ওই যে শর্মিষ্ঠার পার্ট করছে, মেয়েটি দেখতে ভালোই, কী বলেন, অ্যাঁ? ওর নাম মায়া মিত্র। বাঙালী, কিন্তু বাঙলা জানে না। কয়েক পুরুষ ধরে এখানেই...আমার বান্ধবী...। দেবযানীর নাম মিস্ পূর্ণিমা সাহু, জব্বর মেয়ে মশাই...।' ইত্যাদি, সব মিলিয়ে আমার অবস্থাটা প্রাণান্তকর হয়ে উঠল। আশ্চর্য, একলা আমারই কি এই অবস্থা?

এক মাত্র মুক্তি ছিল কয়েকটি 'বিশ্রাম'-এর ফাঁকে। এবং শেষ পর্যন্ত যযাতির বানপ্রস্থ, এদিকে আমারও বানপ্রস্থ অবস্থা। দৃশ্য শেষ হবার আগেই, প্রণববাবু আমার হাত ধরে বাইরে চলে এলেন। তবু একটা সান্ত্বনা, শেষ মুহূর্তে প্রণববাবুকেও অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। প্রণববাবুর গতি দেখছি, স্টেজের ভিতরে যাবার দরজার দিকে।

বললাম, 'ওদিকে কোথায়?'

প্রণববাবু বললেন 'চলুন, আপনার সঙ্গে মায়া মিত্রর আলাপ করিয়ে দিই। সময় থাকলে না হয় ওর বাড়িতে গিয়েই একটু বসা যাবে।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। বিশ্বাস করি, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। কিন্তু আমি দেখলাম, প্রণববাবুর চোখে সেই নিশির ঘোর। ওঁর গলার সুরেও তারই রেশ। ওঁকে সম্ভবতঃ এখন আর কোনো কিছুতেই বাধা দেওয়া যায় না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বাসনা কখনো আমার 'আমি'কে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। সে প্রবৃত্তি তখন আর আমার ছিল না। বোধ হয়, এই বিশেষ মায়া মিত্রকে না চিনলেও মায়া মিত্রদের জীবন একেবারে অচেনা নয় আমার, তাই প্রত্যক্ষ কোনো কৌতূহল নেই।

বললাম, 'প্রণববাবু, রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে!'

প্রণববাবু আমার হাত ধরে টেনে বললেন, 'তাতে কী। আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। ওর বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন সবাই আছে।'

বললাম, 'থাকাই স্বাভাবিক। তাতে পুরুষ বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে, এত রাত্রে আপ্যায়ন করতে ওর অসুবিধেই হবে।'

প্রণববাবু হেসে উঠলেন। বললেন, 'আপনি যে নতুন কথা শোনালেন মশাই। এ কি আজ নতুন যাচ্ছি নাকি? আপনাকে দেখে মায়া মিত্রের চোখ দুটি কেমন নেচে উঠবে, আমি তাই দেখব।'

আমাকে দেখে কেন মায়া মিত্রের চোখ নাচবে, জানি নে। আর যদি নাচে, তাতে যে আমার মনে মনে ঠ্যাং খোঁড়া হবে, তাতে সন্দেহ নেই। হেসে বললাম, 'প্রণববাবু, চোখের নাচটা আপনার নিজেকে দেখিয়েই নাচান, বাধা দেব না। আমাকে যেতে হবে।'

প্রণববাবু এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। ওদিকে নাটকের শেষ ঘণ্টা পড়ল। প্রণববাবু একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাঃ, এক যাত্রায় পৃথক ফল করে লাভ নেই।

চলুন যাই।'

এ বিষয়ে প্রণববাবুর সিদ্ধান্তের ওপরে আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। বাইরে এসে রিক্‌শায় উঠলাম।

প্রণববাবু বললেন, 'আপনি মশাই সত্যি বেরসিক।'

হাসা ছাড়া আমার কোনো জবাব ছিল না।

প্রণববাবু আবার বললেন, 'ভেবেছিলাম, নিতান্তই মনসুনে লোন্‌লী বীচ্‌-এর কাব্য নয়, কথাকারের প্রাণে বোধ হয় কোথাও ঘা আছে, তাই নির্জনতায় নির্বাসন বেছে নিয়েছেন।'

কথাগুলো সত্যের কাছাকাছি। বললাম, 'একেবারে মিথ্যে বলেন নি। মনটা প্রত্যহের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে মার খাচ্ছিল।'

প্রণববাবু বললেন, 'সেই জন্যেই তো মশাই একটু বৈচিত্র্যের যোগান দিতে চেয়েছিলাম।'

হেসে বললাম, 'প্রণববাবু, মায়া মিত্রের সান্নিধ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে কি কেউ সমুদ্রের ধারে ছুটে আসে? ওগুলো তো আমাদের প্রত্যহের ঘেরাটোপের গায়ে পার্মানেণ্ট ছবি। একতারাটার তার রোজ বেজে বেজে ছিঁড়ে যাবার ভয়েই দোতারার খোঁজে এসেছি। বলতে পারেন, সুর হারিয়ে সুরের খোঁজে এসেছি।'

'পেলেন কিছু?'

'পাচ্ছি।'

'কী?'

এবার বোধ হয় আমার গলাতেই নিশির ঘোর লাগল। বললাম, 'মহানুভবের সান্নিধ্য। সত্যের সাহস।'

'কী রকম?'

'দেখলাম, জীবনের যে তুচ্ছতাকে নিয়ে মরি বাঁচি, নিরন্তরের হাসিতে তা হারিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে।'

'তবে সব ছেড়ে দিয়ে কি আপনি সাধু হতে চান?'

'মোটেই নয়। সত্য দর্শনে একটু সাহস পাওয়া যায়।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই রিক্‌শা বাঁক নিল। অন্ধকারের বুকে ফস্‌ফরাসের নীল রেখায় ঝিলিক-হানা হাসি বেজে উঠল মহানাদে। বাতাস এল ধেয়ে। আকাশ আর সমুদ্রের সীমারেখা হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। তবু এ অন্ধকার যেন প্রাচীরের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। পৃথিবীর বাইরে, এক অসীম জগত যেন তার আপনাকে নিয়ে সুপ্ত হয়ে আছে।

প্রণববাবু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'বুঝতে পারলাম না ভাই। এইটুকুনি বলে রাখি, রাতে আপনাকে অনেকক্ষণ জ্বালাব।'

হেসে উঠে বললাম, 'তথাস্তু।'

হোটেলে ঢুকতে গিয়েই থমকে গেলাম। দেখলাম গেটের পাশে ইজিচেয়ারে কে বসে আছেন অন্ধকারে। বুঝতে অসুবিধে হল না, মহিমবাবু। নিঝুম অন্ধকার নোঙর-ঘর। শুধু অফিস ঘরে একটি আলো জ্বলছে। সে আলোর রেখা মহিমবাবুকে স্পর্শ করে নি। মহিমবাবু নড়লেন না, উঠলেন না। অন্ধকার থেকে শুধু ওঁর গলা শোনা গেল, 'হল?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

আবার বললেন, 'নীচেই খাবার ব্যবস্থা করেছে। একেবারে খেয়ে ওপরে ওঠ।'

প্রণববাবু বললেন, 'কাকাবাবু, এখনো বাড়ি যান নি?'

'এইবার যাব।'

'আপনি কি আমাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন?'

'না। অন্ধকারটা বেশ লাগছিল।'

উঠে দাঁড়ালেন। দেখলাম, গায়ের জামাটা খুলে কাঁধে নিয়েছেন। আর কিছু না বলে গেটের বাইরে চলে গেলেন। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে নোঙর-ঘরের প্রাচীর ঘেঁষে গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন।

জীবনের সবটাই কি বিস্ময়কর! এতক্ষণ প্রণববাবু ছিলেন কাছে। আর এইমাত্র মহিমবাবু যাচ্ছেন। এই দুই অমিলের মাঝখানে সমুদ্র যেন মহাকালের বিষাণ বাজিয়ে চলেছে। সবটুকু বুঝতে পারি নে। তবু এই সীমাহীনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, মানুষ-রসের বিচিত্র স্বাদে প্রাণ টলমলিয়ে ওঠে।

খাওয়ার শেষে, ঘরে এসে, গাড়ি-বারান্দার দরজা খুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে ছিলাম। ভেজা বাতাস বইছে বেগে। চোখ জুড়ে এলেই শুয়ে পড়ব। প্রণববাবুও সম্ভবতঃ ক্লান্ত বলেই ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। অতএব—।

'কথাকার, ব্রাদার শুনুন।'

প্রণববাবুরই উত্তেজিত চুপি চুপি গলা বাতাসের মধ্যে শোনা গেল। উনি আমার বিছানার কাছে এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'একবারটি আসুন আমার ঘরে, প্লীজ।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

প্রণববাবু আমাকে টেনে তুলে বললেন, 'আস্তে! কথা বলবেন না। আসুন, দেখাচ্ছি।'

প্রায় আমাকে টেনেই নিয়ে গেলেন ওঁর ঘরে। অন্ধকার ঘরে ওঁর বিছানার ওপর বসিয়ে, কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'একদম কথা বলবেন না যেন। বলে, চার নম্বর ঘরের যে-বন্ধ দরজাটা এই ঘরের দেয়ালের দিকে পড়েছে, সেখানে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। একটি সরু ছিদ্র দেখিয়ে বললেন, 'এখান দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখুন।'

আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে এলাম। প্রণববাবু আমার হাত চেপে ধরলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'কী হল?'

আমি আমার রুষ্টতা চাপতে পারলাম না। বললাম, 'মাফ করবেন প্রণববাবু, যা-ই ঘটুক, কারুর ঘরে উঁকি মারতে আমার রুচি নেই।'

আমি উঠে একেবারে প্রণববাবুর ঘরের বাইরে চলে এলাম। প্রণববাবুও এলেন। এসে আবার আমার হাত ধরে বললেন, 'প্লীজ কথাকার, আপনার পায়ে পড়ি, এক-বারটি দেখুন।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'অসম্ভব প্রণববাবু। ওটা আমি পারব না।'

প্রণববাবু দেখলাম কি রকম অস্থির হয়ে উঠলেন। ওঁর গলায় উত্তেজনার উল্লাস। বললেন, 'বলেছিলাম কল্পনাকে আমি আবিষ্কার করব। দরজায় একটা ফুটো আছে, মাকড়সার জালে ঢাকা। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সেটা সাফ করে নিয়েছি। তাই তো আপনাকে বললাম, এবার ঠিক আবিষ্কার করব। বলেছিলাম আপনাকে, নির্ঘাৎ একটা গোলমাল আছে। যা ভেবেছি! দেখি কি—।'

শুনতে শুনতে সঙ্কোচে লজ্জায় এবং অস্বাভাবিক কিছু শোনার ভয়ে, আমার গা-টা যেন ঘুলিয়ে উঠল। বাকিটা শোনবার আগেই বলে উঠলাম, 'আমার ঘুম পাচ্ছে প্রণববাবু।'

'এখন ঘুম পেলে কি করে চলবে মশাই। ছোট মেয়েটাকে যে খুঁজে দেখতে হয়।'

'কাকে?'

'ছোটটাকে। ফর্সা, অল্পবয়সী মেয়েটা, যেটাকে ছোট বোন বলে পরিচয় দিয়েছে,

সে ঘরে নেই। ওদিকে দুটিতে ঘরের মধ্যে—যাকগে, সে আর কী বলব! ঘরের আলোটা নেবানো থাকলে আমি কিছুই দেখতে পেতাম না। তা পর্যন্ত করে নি। দুটোতে এক জায়গায়—যা তা! যাকগে, এখন কথা হচ্ছে, ছোটটার কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। সম্পর্কটা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ধরুন যদি সুইসাইড-টুইসাইড করতেই বেরিয়ে থাকে?—আচ্ছা দাঁড়ান, গাড়ি-বারান্দাটা দেখে আসি।'

সবটাই প্রণববাবুর নিশির ঘোর কি না বুঝতে পারছি নে। কিন্তু অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। চিন্তিত হয়ে উঠলাম। সত্যি মিথ্যে ধরতেও পারছি নে। অথচ আত্মহত্যার সম্ভাবনা ইত্যাদি শুনে একটু যেন ঘাবড়েই গেলাম।

বললাম, 'গাড়ি-বারান্দায় কেউ নেই আমি জানি।'

'তবে? সমুদ্রের ধারে যাওয়া, এত রাত্রে, একলা, খুব খারাপ। দেখে আসব একবার?'

কী বলব, বুঝতে পারছি নে। আমার ঘরের দরজার পাশ দিয়ে সমুদ্রের দূর অন্ধকার চোখে পড়ছে। ভেজা বাতাসে যেন ঝড়ের সংকেত। হাওয়া-ঠাসা আটকানো সত্ত্বেও দরজা জানালাগুলি নানান্ অস্ফুট শব্দ করে চলেছে। নোঙর-ঘর হোটেলে যেন একটা ভৌতিক আবহাওয়া থমথমিয়ে উঠল।

বললাম, 'কিন্তু যাবেন কি করে, নীচের দরজা তো বন্ধ।'

'ভেতর থেকে তো খোলা যায়।'

'কিন্তু সঞ্জয় তো সেখানে শুয়ে থাকে। আর এত ভাবছেন কেন। উনি হয় তো—।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রণববাবু বললেন, 'বাথরুমে? নেই। আমি দেখেছি।'

আমি বললাম, 'না, বলছিলাম হয় তো ঘরেই আছেন, আপনি—।'

প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম নট ড্রাঙ্ক অর ইনটক্সিকেটেড। চার নম্বরে দুটো খাট। একটা ফাঁকা আর একটাতে ওরা, সে নেই ওখানে। থাকা সম্ভব নয়। ও হ্যাঁ, দাঁড়ান, ছাদে যাবার সিঁড়ির দরজাটা খোলা আছে কি না দেখে আসি।' বলেই বারান্দা দিয়ে চলে গেলেন।

আমি খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্যাপারটা যে ঠিক কী ঘটছে, হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। বেশ তো ছিল সব। আজ প্রণববাবু এলেন, আর আজই এসব ঘটতে শুরু করল!

প্রণববাবু আবার উদয় হলেন অন্ধকারে। কাছে এসে বললেন, 'পাওয়া গেছে। মেয়েটা ছাদে, আল্‌সে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।'

আমার একটা নিশ্বাস পড়ল। বললাম, 'যাক, যে সব অশুভ চিন্তা করছিলেন, সে সব কিছু নেই। এবার মন থেকে ওদের ত্যাগ করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান।' বলে অন্ধকারের এই ভৌতিক অবস্থাটা দূর করবার জন্যে, হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিলাম। প্রণববাবু যেন একটু হকচকিয়ে গেলেন। ভ্রূ কোঁচকালেন। কিন্তু দেখলাম, ওঁর চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দৃষ্টি তীক্ষ্ন সুদূর। যেন শিকারের আঁচ-পাওয়া চকিত বাঘ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আর একটি সুইচ টেপার শব্দ শোনা গেল। প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'চার নম্বরের আলো এতক্ষণে নিবলো। কিন্তু শুতে যাব কি মশাই। ব্যাপারটা আমাকে সব জানতেই হবে।'

বললাম, 'প্রণববাবু, হয় তো সত্যি কিছু জানার নেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমরা যাদের ভাই বোন বলে জেনেছিলাম, তাদের অন্যতর কোনো সম্পর্ক আছে। সে অনুসন্ধানে কিছু লাভ আছে?'

'অনেক। এই নোঙর-ঘরে যে কত দেখেছি। এই নোঙর-ঘরের আত্মা আমার ওপর

ভর করেছে। এখন আর আমি চুপ করে থাকতে পারব না। আই মাস্ট নট্।'

বললাম, 'তা হলে আমি শুতে যাচ্ছি।'

'যান।'

এক কথায় প্রণববাবু অনুমতি দিলেন। তাতে বুঝলাম, আমাকে ধরে রাখবার প্রেরণা এখন আর উনি বোধ করছেন না। প্রণববাবু হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা নিবিয়ে দিলেন। আমি ঘরে ঢুকলাম। দরজা আমার খোলাই থাকে রোজ। আজও রইল। বিছানায় গা ঢেলে দিলাম। কিন্তু চোখ বুজেও বারবারই মনে হতে লাগল, এই মুহূর্তে আমার আশেপাশে একটি নাটকীয় ঘটনাই হয় তো ঘটছে।

আঃ! আশ্চর্য! মানুষ কী আশ্চর্য! তার থেকেও বিচিত্রতরের অট্টহাসির প্রবল রোল একটা ছন্দে এসে বাজছে আমার কানে। এই পৃথিবীর চক্রাবর্তের তালে যে জোয়ার ভাঁটায় চলেছে, আসছে। সৃষ্টির শুরু থেকে মানবলীলার সকল তরঙ্গ যার বুকে একইভাবে ডুবছে, ভাসছে, দুলছে, নাচছে। আমি সেইদিকে মুখ করে চোখ বুজলাম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। দেখলাম, বাতাসের বেগ কমেছে। মেঘের গাম্ভীর্য যায় নি। কিন্তু সমুদ্র যেন ক্ষেপে উঠেছে। কিংবা মাতাল উচ্ছ্বাসের কলরবে গাঁজলা উঠেছে চারদিকে।

নোঙর-ঘর স্তব্ধ। এখনও সবাই নিদ্রিত। জামা গায়ে চাপিয়ে নীচে নেমে এলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু দরজা খোলা রয়েছে। বেরিয়ে পড়লাম। বালি ভেঙে নেমে গেলাম সমুদ্রের ধারে। ঢেউ এল ছুটে। আমার পা ডুবে গেল। ছুটে এল আবার। যেন একটা খেলা। যেন ঢেউ হাসছে, আমিও হাসছি। আমার সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল শীতল স্পর্শে। হাঁটতে লাগলাম একদিকে।

দেখতে দেখতে কখন যেন মেঘ রক্তিম হয়ে উঠল। রৌদ্র নেই। কিন্তু ভেজা বালিতে রক্তিম আলো পড়েছে। বেলাভূমি একটি সুবৃহৎ আয়নার মতো দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কতার মধ্যেও লক্ষ্য পড়েছিল দূরে একটি মূর্তি। ভেজা রক্তিম বেলাভূমির আয়নায় তার প্রতিবিম্ব পড়েছে। অন্যমনস্কতার দরুণই তাকে আবার ভুলে গেলাম। ছেলেমানুষের মতো ঝিনুক কুড়োলাম। ছোট ছোট কাঁকড়ার সঙ্গে ছুটে ছুটে খেলা করলাম। ছোট ছোট পোকাগুলি অদ্ভুত বেগে ছোটে। টুক্ টুক্ করে গর্তে ঢুকে যায়। ঢোকবার আগেও একবার দেখে নেয়, মানুষের পা দুটি এগিয়ে আসছে কি না। পোকাগুলি নিশ্চয় বুদ্ধিমান নয়। এই প্রকৃতির মাঝখানে জীবনলীলার প্রবৃত্তিতেই ওরা চলে। অথচ দেখে মনে হয়, দাঁড়া দিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে, ভাবছে, ঠিক পথে ছুটছে এবং ঠিক নিজেরই গর্তে গিয়ে ঢুকছে। এও লক্ষ্য করে দেখলাম, সভ্যতা শালীনতায়ও ওরা কম নয়। ভুল করে পরের বাসায় ঢুকে পড়লে, হঠাৎ থমকে যাচ্ছে। যেন বলছে, 'সরি, কিছু মনে করো না ভাই!' বলেই আবার নিজের বাসায় গিয়ে ঢুকছে। অথচ একটি দুটি নয়। হাজার হাজার কাঁকড়া, হাজার হাজার তাদের বাসা। এবং বাসা চিনতে কারুর ভুল হয় না। পরের বাসায় অনধিকার প্রবেশের ব্যাপারে মানুষের থেকেও যেন সচেতন। জীবজগতের এ সবই প্রবৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত বলে জানি। জেনেও তবু অবাক মানি। আর নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভাবি, বিশ্বরহস্যের কতটুকুই বা জানলাম। দেখলাম কতটুকু!

ঝিনুক কুড়িয়ে আর কাঁকড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, দূরের সেই মূর্তির কাছে এসে পড়েছি! আবার একবার মুখ তুলেই থমকে গেলাম। রেণু! তৎক্ষণাৎ মনে হল, ভুল

করেছি এখানে এসে। আরও আগেই পশ্চাৎগামী হওয়া উচিৎ ছিল। এ আমার ভিতরের দুর্বলতা বলে মানতে পারি নে। মানুষ এবং পরিবেশ গুণে মনের ক্রিয়া ঘটে। ভাবতে পারতাম, কী যায় আসে। কে জানত, মেঘভারাক্রান্ত সকালে, লোকালয় থেকে অনেকখানি দূরের, এই নিরালা সৈকতে রেণু থাকবে দাঁড়িয়ে। দূর সমুদ্রে ওর চোখ। যদি ভুল না দেখে থাকি, মনে হল যেন একটি যাতনাবিদ্ধ ব্যাকুল প্রশ্ন ওর দূরবিসারী দৃষ্টিতে। রেণুর জীবনের একটি ঘটনাই জানি। মনের কথা জানি নে। তবু যেন মনে হল, ব্যথা ও অপমানের ছায়ায় ঢাকা পড়ে রয়েছে। অশেষে নিবন্ধ ওর চোখের জিজ্ঞাসা যেন সরব হল আমার শ্রবণে, 'এত বড় অপমান কেন লিখেছিলে আমার কপালে? কেন, কেন?'

এ সব কথা মনে উদয় হল বলেই, সংকুচিত হলাম। এই সব ধারণা থেকেই, সন্দেহ হল, যদি রেণু ভাবে, ওকে দূর থেকে দেখেছি বলেই পায়ে পায়ে এসেছি। মানুষের মনের সাম্য যখন হারায়, তখন তার সকলই বিপরীত।

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমিও রেণুর চোখে পড়েছি। তবু চলে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে? হোক। এ ক্ষেত্রে অভদ্র বিশেষণ শ্রেয়।

'শুনুন।'

আহ্বান শুনতে পেলাম, অনেক নিকটে, আমার পিছন থেকে। আর কণ্ঠস্বর যে রেণুরই তাতে সন্দেহ নেই। সময় নেই আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের। পিছন ফিরতে হল।

রেণু কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। বলল, 'তাই ভাবলাম, পিছন থেকে মনে হল যেন আপনিই যাচ্ছেন! আমাকে বুঝি চিনতে পারেন নি?'

সন্দেহ হল, রেণুর গলায় ক্ষোভের সুর। বললাম, 'চিনতে পেরেছিলাম বৈ কি! আপনাকে দেখে আপনার ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছে করছিল না।'

'ধ্যান!'

একটু কি বক্র হল রেণুর ঠোঁট। ব্যঙ্গ রয়েছে নাকি ওর স্বরে। বলল, 'ধ্যান আবার কী করব। দেখছিলাম চুপচাপ।' বলে রেণু আবার তাকাল দূর সমুদ্রের দিকে।

কিন্তু আমি দেখলাম, রেণুর ভিতর দুয়ারের অর্গল বন্ধ। ওর বাহির দুয়ারে এ ফেনতরঙ্গের খেলা কোনো ভাবের সঞ্চার করছে না। ভয় হল, পাছে নিশ্বাস ফেলে এ পরিবেশ করুণ করে তুলি।

বললাম, 'একলাই বেরিয়েছেন? ছোট বউদিরা কোথায়?'

রেণু আস্তে আস্তে ফিরে বলল, 'আশ্রমে।'

'আশ্রমে?'

'হ্যাঁ, আমরা তো মহেন্দ্র আশ্রমে চলে এসেছি ধর্মশালা থেকে। ওই তো কাছেই, দেখা যায়।'

রেণু চোখ দিয়ে নির্দেশ করল তীরের দিকে। বলল, 'আমি সেই ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়েছি। আপনি তো হোটেলে উঠেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কতদূর?'

বললাম, 'এখান থেকে অনেকখানি। এবার ফিরব।'

রেণুই আগে পা বাড়াল। কেউ কোনো কথা বললাম না। বলবার কোনো কথা সম্ভবত ছিল না। কিন্তু পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। পা চালিয়ে আগে চলে যাব, সেটাও ঠিক উচিত মনে হল না।

'আপনি বোধহয় অস্বস্তিবোধ করছেন।' রেণু হঠাৎ বলে উঠল।

দেখলাম, ও নীচের দিকে তাকিয়ে চলেছে। এবং এবার আমাকে মিথ্যে করেই

বলতে হল, 'না না, অস্বস্তিবোধ করব কেন? বরং আপনার—'

'জানি, ওই কথাটা বলবেন।' বাধা দিয়ে বলে উঠল রেণু। বলল, 'কিন্তু আমি—আমি—'

রেণুর আড়ষ্টতা দেখে, আমি হেসে উঠে বললাম, 'কিন্তু আপনি, এসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ধারে কাছেও নেই। আপনাকে দেখলেই তা বোঝা যায় বলেই আপনাকে কোনোরকমে ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। আমি এ কথাটাই বলতে চাইছিলাম।'

রেণু একবার তাকাল আমার চোখের দিকে। একটু বোধ হয় লজ্জিত হল। তারপর অন্যদিকে চোখ তুলে, একটু পরে বলল, 'কত বড় বাড়িটা!'

লক্ষ্য করি নি। রেণুর কথায় তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি, বিশাল ক্যাসল-সদৃশ বাড়ি। সমুদ্রতীরের সমস্ত বাড়িগুলিকে ছাড়িয়ে, অনেক দূর এগিয়ে এসেছে এই ইমারত। যেন সাধ ছিল, সিন্ধুতীরে ঢেউয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করবে নিয়ত। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। এখন গোটা একতলাটাই বালিতে ভরে গিয়েছে। দরজা জানালা প্রায় একটিও নেই। লোকালয়কে ছাড়িয়ে এসেছে বলেই বাড়িটার পরিত্যক্ত শূন্যতায় একটি হাহাকার শোনা যায় যেন। রিক্ততায় যেন খা খা করছে।

খানিকটা আনমনেই পরিত্যক্ত অট্টালিকার বালির ঢিবিতে উঠতে লাগলাম। রেণুও এল পাশাপাশি।

রেণুই বলল, 'কত আশা করে না জানি করেছিল এত বড় বাড়িটা।'

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'তবু ফেলে যেতে হয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক, আর্থিক দুর্দশা, কিংবা মৃত্যুই হয় তো ঘটেছিল, যিনি সাধ করে তৈরি করিয়েছিলেন, এবং পরবর্তী বংশধরদের হয় তো সাধ্যে কুলোয় নি এসে বাস করা বা কোনোরকমে ব্যবহার করা।'

আকাশে মেঘ ছিল বলেই এই বিশাল ইমারতকে বেশী বিবর্ণ মনে হচ্ছিল। পাল্লা-বিহীন জানালা দরজার ভিতরে থমথম করছিল শূন্য ঘরের অন্ধকার। হয় তো সেখানে একজনের অপূর্ণতা দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত হচ্ছে।

আমি আবার বলে উঠলাম, 'জীবনটা খুবই আশ্চর্য।'

রেণু বলল, 'কেন?'

'জীবনের ধর্ম অনুযায়ী মানুষকে নিরবধি ছুটে চলতে হয়েছে। পিছনে ফেলে যেতে হয়েছে কত কী! ছেড়ে যেতে হয়েছে অনেক কিছু। হাসি আনন্দ শোক দুঃখ...।' বলতে বলতে রেণুর দিকে ফিরতে গিয়ে থমকে গেলাম। দেখলাম, রেণু সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। ওর বিষণ্ণ গাম্ভীর্য যেন সহসা থমথমিয়ে উঠেছে। আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। মনে মনে চমকে উঠলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম, যে-কথা বলতে গেলাম সিন্ধুতীরের পুরনো ইমারতকে নিয়ে, সেই কথাই যেন আর এক দিক দিয়ে রেণুকে স্পর্শ করে। সেই অভীপ্সা কি ছিল আমার চেতনায়! ভেবে দেখি নি, বুঝতে পারি নি। কী করব? মাপ চাইব?

না। আমার ভিতর থেকে যেন কে নির্দেশ করল, না। এ যদি আমার অবচেতনার উদ্গার হয়ে থাকে, তবে তাই থাকুক। মিথ্যে ভাষণ তো হয় নি। রেণুকে অসম্মান করা কিংবা দুঃখ দেবার জন্যে তো বলি নি। স্বল্প পরিচয়ের দ্বিধা? এই নির্জন বেলাভূমির ঘাটে ঘাটে আমাদের তরী যে কোন্ দিকে খেয়া দেবে, কেউ জানি নে। এ তো আমার ঘেরাটোপের বেড়া নয়। মুক্তাঙ্গনের বিহার। দ্বিধা সঙ্কোচের বেড়ি আমি পরব না। বরং স্পষ্ট করে যদি বলতে পারতাম, রেণু, জীবন তোমাকে একদিন পিছন থেকে চোখ ফিরিয়ে দেবে নিশ্চিত। তখন পিছনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সামনেটাকেই তৈরি করতে হবে।

রেণু চোখ নামিয়ে, আস্তে আস্তে নামতে লাগল বালুর ঢিবি থেকে। বাসি খোঁপাটা শিথিল রুক্ষ। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আকৃতি ওর দেহের অঙ্গনে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে অকৃপণ দানে। যেন ভালোবেসেই দিয়েছে, ভালো লেগেছে বলে। কিন্তু অসময়ের শীতে যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বিবর্ণ ম্লান করুণ, ব্যথায় স্তব্ধ।

কোনো কথা বলল না রেণু। পাশাপাশি চলতে চলতে, এক সময়ে মোড় নিল ও। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েক পা গিয়েই রেণু থমকে দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে তাকাল। বলল, 'আসবেন না?'

বললাম, 'এখন আর যাব না। বেলা হয়েছে বেশ।'

রেণু চকিতে একবার আমার চোখের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ওঁরা শুনলে কিন্তু আপনার ওপর খুব রাগ করবেন।'

মনে মনে জানি, রাগ করবার অধিকার তাঁদের আছে বলেই, ক্ষমা পাবার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি। কিন্তু এখন গেলে শিবিদি অবুদিদের হাত থেকে এ বেলা আর ছাড়ান পাব না। এবং এই কদিনেই বুঝতে পেরেছি, মহিমবাবুও চিন্তিত হয়ে পড়বেন। যা আমি পড়ে-পাওয়া করে পেয়েছি আমার এই নির্জন সৈকতের ভ্রমণে, তাকেও আমি দু'হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবহেলা করব না।

বললাম, 'যাতে রাগ না করেন, সে ভার আপনাকে দিলাম।'

রেণু আর একবার তাকাল। মনে হল, কিছু বলবে। কিন্তু বলল না। কেবল মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিল। আমি এগিয়ে গেলাম।

হোটেলের অফিস-ঘরে মহিমবাবু নেই। চখা-চখীর দরজায় তালাবন্ধ। কিন্তু দোতলায় যেন রীতিমত গল্পের আসর বসেছে। নতুন বোর্ডার এল নাকি? হাসি ও কথার শব্দ ভেসে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রায়, যাকে বলে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। নতুনতর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। দেখলাম, সকালের আহারে, এক টেবিলে বসেছেন চার নম্বরের তিনজন, এবং তাদের সঙ্গে প্রণববাবু। আমাকে দেখেই প্রণববাবু হাঁক দিয়ে উঠলেন, 'আরে কথাকার, আসুন আসুন। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

বাকি তিনজনও আমার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলাম, টেবিলের এক ধারে পাশাপাশি প্রণববাবু এবং কনিষ্ঠা গৌরাঙ্গী। অন্য দিকে দুজন। প্রণববাবু দেখছি, সত্যি যাদু জানেন। কাল রাতের অন্ধকারে কোথায় কী কলকাটি নাড়াচাড়া হয়েছে। আজ নোঙর-ঘরের দোতলার মঞ্চে নাটকের গতি ফিরে গিয়েছে।

ঘরের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'আমি হাত মুখ ধোব, আপনারা ততক্ষণ চালিয়ে যান।'

প্রণববাবু বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ কি, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ নেই নাকি? এঁরা চার নম্বর রুমে থাকেন, শিশির সোম, মিস্ বিথী, মিস্ মমতা। আর এঁকে আমি নাম দিয়েছি কথাকার। লোকটিকে দেখেই বুঝতে পারছেন, প্রায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অথচ একটি অয়স্কান্ত, অর্থাৎ লৌহাকর্ষক মণি।'

আমার এহেন পরিচয় দিয়ে প্রণববাবু হেসে উঠলেন। বাকি সকলেও। নমস্কার বিনিময়ের পর আমি ঘরে গেলাম। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, শিশির যে পদবীতে সোম, সেটা জানা গেলেও, বাকিরা মিস্। অথচ পদবীটা বলেন নি প্রণববাবু।

এহ বাহ্য! ঘটনা কিছু আছে, সেটা বোঝাই গিয়েছে। নতুন করে কৌতূহলিত হয়ে লাভ নেই। কিন্তু, বাথরুম থেকে বেরিয়ে অবাক হলাম। দোতলার রঙ্গমঞ্চ ফাঁকা। কারুর সাড়া শব্দ নেই। সঞ্জয় আমার খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এ'রা সব কোথায় গেলেন।'

সঞ্জয় বলল, 'পরণবোবাবু? ওই চার নম্বরের ওঁয়াদের নিয়ে রিকশায় করে বেরিয়ে গেলেন কোথায়।'

প্রণববাবুকে বোধহয় ওঁর সেই নিশিতেই পেল। হয় তো, এখন ওঁর দিন-রজনী-মাস-বছর, নিশিঘোরেই কাটে। যতটুকু বুঝেছি, তাতে, প্রণববাবু যখন কাল আমার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেটাও যেমন সত্যি, আজকের এই ভুলে যাওয়া, এটাও ওঁর জীবনের সত্যি। এই ব্যাকুল হওয়া, আর ভুলে যাওয়াটাই সম্ভবতঃ ওঁর জীবন। আর, চার নম্বরের স্তব্ধতা ভেঙেছে। রুদ্ধদ্বার খুলেছে, গতি পেয়েছে। এই গতি ওদের সবাইকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, কে জানে। হয় তো প্রণববাবুর চিঠি এবং ফটোর তালিকায় আর একটি নাম বাড়বে।

সঞ্জয় এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'কিছু বুঝতে পারি না বাবু।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কী বুঝতে পারো না?'

গলা নামিয়ে সঞ্জয় বলল, 'এই চার নম্বরের দাদা-দিদিমণিদের, আর পরণবোবাবুকে।'

সঞ্জয়ের একটি চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বেচারী সত্যি বড় ভাবিত হয়ে পড়েছে। বললাম, 'বোঝবার দরকার কী?'

'তা বটে।'

সঞ্জয় বলল বটে, কিন্তু কথাটা যে মানতে পারে নি, তা বোঝা গেল। কারণ পরমুহূর্তেই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'কিন্তু বাবু, পরণবোবাবুর মতিগতি আপনি জানেন না। কত কী যে দেখলাম এই হোটেলে। তা ওঁয়াকেই বা কী দোষ দিব। জগতের যা মতিগতি দেখি। আমাদের ছামাকরণের কী দোষ দিব বাবু। বিম্বাধরীর মন চাইলে—।' কথা শেষ হল না। নিশ্বাস পড়ল সঞ্জয়ের। বলল, ' তবে কিনা বাবু, আমার বড় ডর লাগে।'

'কেন?'

'বাবু, মানুষের মন তো জানেন। কী ঘটতে কী ঘটবে, পরণবোবাবুকে কেউ একদিন প্রাণে মেরে ফেলবে। এক বগ্‌গা কি সব চলে বাবু?'

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। সঞ্জয়ের দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এ ক্ষেত্রে সঞ্জয়ের অভিজ্ঞতা আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। একদা ছামাকরণের প্রতি সে মনে মনে ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সবাই সঞ্জয় নয়। আর মানুষের মনই তো পৃথিবীতে সব থেকে বেশী রহস্যময়। প্রণববাবুর এই ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণসংশয়ের দুর্ঘটনা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

সঞ্জয় আবার বলল, 'দু' একবার তো খুব গোলমাল হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ বাবু। একবার একটি বউয়ের সঙ্গে কী সব হল। আর সেই বউয়ের স্বামী সমুদ্রে নাইতে গিয়ে পরণবোবাবুর মাথাটা জলে চেপে ধরেছিলেন। সেইবারেই সব শেষ হয়ে যেত। অনেক লোকজন দেখে ফেলেছিল, তাই রক্ষা। আচ্ছা বাপু, তুমি ঘর সামলাতে পারো না, বাইরে লোক হাসিয়ে কী হবে।'

সমস্ত দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। যারা ঘর সামলাতে পারে না, তারা সব থেকে দুর্ভাগা, সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাগা যখন তাকে নিষ্ঠুর করে তোলে, তখন সেও ব্যাধিগ্রস্ত। বলব না, এতে বিষক্ষয় হয়। ব্যাধিতে ব্যাধিতে মড়ক আর প্রাণহানি ঘটে।

'যাই বাবু।'

সঞ্জয় চলে গেল। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আমি যেন স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি, নতুন আহ্বানের ঘণ্টা। আর এখানে নয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে।

উঠে পড়লাম। নীচে গিয়ে দেখলাম, মহিমবাবু খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। ডেকে বললেন, 'এস।'

বসে বললাম, 'কোনারক যাব ভাবছি।'

মহিমবাবু মুখ না তুলেই বললেন, 'এ সময়টা তো কোনারকের পক্ষে খুব সুবিধের নয়। রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। মোটরগাড়ি বোধ হয় যাচ্ছে না।'

'অন্য কোনো ভাবে যাওয়া যায় না?'

'গরুর গাড়িতে যাবে?'

'গরুর গাড়ি?'

মহিমবাবু খাতাপত্র সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'তবে হেঁটে যেতে হবে। আমি অবিশ্যি বলব, গরুর গাড়ি একটা সঙ্গে থাকা ভালো। কারণ, একদিনেই ফিরতে পারবে না। আর ওখানে কেউ যে বিছানাপত্র দেবার মতো লোক থাকবে, এমন মনে হয় না। চাল ডালও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেই ভালো হয়। বলা যায় না, কী অবস্থায় গিয়ে পড়বে।'

আমি বললাম, 'কয়েকদিন থাকার জন্যেই যেতে চাইছি। শুনেছি পি ডবলিউ-র বাংলো আছে।'

'তা আছে। থাকবার অসুবিধে এখন খুব হবে না। কবে যাবে?'

'আজই যদি—'

মহিমবাবু আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'নাঃ, নিতান্তই দেখছি তুমি বাইরে বেরুবার অনুপযুক্ত। এটা কি কলকাতা শহর যে, বাই উঠলেই কটক যাওয়া যায়? গাড়িওয়ালাদের খবর দিতে হবে, তাদের সুবিধে-অসুবিধে আছে। দু' একটা দিন দেরী হবে।'

এবার আমার চোখ নামিয়ে নেবার পালা। কারণ, মহিমবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার যেতে চাওয়াটা যেন ওঁকে খুশি করে নি। প্রায় অপরাধীর সুরে বললাম, 'কয়েকটা দিন একটু ঘুরে আসতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বিছানাপত্তর তো নিয়ে যেতে হবে।'

ওঁর প্রশ্নের উদ্দেশ্য না বুঝে বললাম, 'তা তো বটেই।'

'তা হলে আবার ফিরতে হচ্ছে তোমাকে।'

'ফিরব তো বটেই।'

মহিমবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে, হাত নেড়ে বললেন, 'তা হলে সে কথাটা বললেই তো হয়। আর এখন দু' একদিন ঘুরে আসাই ভালো। দেখি, আমি ব্যবস্থা করছি।' বলেই বেশ জোরে গলা খাঁকারি দিলেন। সহসা আবার প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন বোঝা গেল। কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তবে কথা হচ্ছে, কোন্ পথ দিয়ে যাবে? পথ তো একটা নয়, কয়েকটা।'

আমি বললাম, 'যে পথ সব থেকে ভালো।'

'অর্থাৎ যেটা সব চেয়ে কম?'

'হ্যাঁ, অথচ একঘেঁয়ে লাগবে না।'

মহিমবাবুর গোঁফ জোড়া একবার কেঁপে আবার স্থির হল। বললেন, 'এখন অবিশ্যি তোমাকে সংক্ষিপ্ত পথেই যেতে হবে। কিন্তু একঘেঁয়ের বদলে দুঘেঁয়ে তিনঘেঁয়ে লাগবে কি না বলতে পারি না। এই যেমন ধর, গ্রাম-জনপদ-অরণ্য-সমুদ্র, সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া

এখন সম্ভব নয়। দুটো পথ এখন তোমার মোটামুটি সহায়। একটা হচ্ছে, পুরী থেকে লিয়াখিয়া দিয়ে কোনারক। আর একটা হচ্ছে, সোজা এখান থেকেই অর্থাৎ পুরী থেকে কোনারক।'

লিয়াখিয়া! নামটা যেন আমার প্রাণ চমকিয়ে দিল। শোনা মাত্র জেগে উঠল। মনে পড়ল, অবন ঠাকুরের লেখায় পড়েছি 'লিয়াখিয়া' নদীর বর্ণনা। যেখান থেকে বিষণ্ণ মধুর অব্যক্ত বিস্ময় অতীত এক স্বপ্নের দুয়ারে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সুরুচি কুরুচি ছিল না। শ্লীল অশ্লীল ছিল না। বিস্ময় অতীত এক স্বপ্নের দুয়ারে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহিমবাবুর কথা তখনও শেষ হয় নি। বললেন, 'পুরী থেকে সোজা কোনারক খুব সুবিধের হবে বলে মনে হয় না। কেবল বালি আর বালি, জল আর জল। তোমার হয় তো এ পথই ভালো মনে হতে পারে। কিন্তু আমি বলব, লিয়াখিয়া দিয়ে যাওয়াই বেস্ট। আর এ দুটোর দূরত্বও সমান।'

আমি বলে উঠলাম, 'আমারও সেই অভিমত। লিয়াখিয়াকে দেখতে চাই।'

'কেন বল তো?'

'অবনীন্দ্রনাথের লেখায় ও জায়গাটার একটা ছবি যেন ভাসছে চোখের সামনে।'

মহিমবাবু একটি শব্দ করে বললেন, 'হুম্। আমি ভাবলাম, অন্য কথা। লিয়াখিয়া নামের একটা প্রচলিত গল্প আছে, সেটা বোধ হয় শোন নি?'

'না তো।'

'লিয়াখিয়ার লোকেরাই অবিশ্যি বলে। চৈতন্যদেব একবার নাকি কোনারক গিয়েছিলেন। ফেরার পথে, কুশভদ্রার ধারে একটু বিশ্রাম করেছিলেন, খিদেও পেয়েছিল। কাছেই এক বুড়ি তখন খৈ বিক্রি করছিল। এদেশে লিয়া শব্দের অর্থ হল খৈ। খিয়া হল খাওয়া। চৈতন্যদেব বুড়ির কাছ থেকে খৈ খেয়ে আবার যাত্রা করেছিলেন। সেই থেকে নাকি জায়গাটার নাম, লিয়াখিয়া।'

আমি বলে উঠলাম, 'বাঃ!' মনে মনে ভাবলাম, বাঙালীর ছেলে আমি। শব্দের ধ্বনিকে ভালোবেসেছি আজন্ম। নিমাইয়ের স্মৃতি আছে বলেই কি লিয়াখিয়া নামে কাব্যের ঝংকার শুনি।

মহিমবাবু ডেকে বললেন, 'কী হল?'

সচকিত হয়ে বললাম, 'আর কিছু নয়, এই পথেই যাওয়া স্থির।'

'হুম্! তার ওপরে যদি তোমার ভাগ্য ভালো হয়, তবে, এই পথে মাঠে হরিণের পালও চোখে পড়তে পারে।'

হরিণের ছোটার বেগ লাগল আমার প্রাণেই। বললাম, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে, দাঁড়াও—' বলে দেয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, শুক্লপক্ষই বটে। সবই ভালো, তবে সময়টা তো খুবই সুন্দর বেছেছ। মেঘ বৃষ্টি, কিছু নেই। এখন তোমার কপালে যদি আকাশ পরিষ্কার লেখা থাকে তবেই। নইলে মজাটা টের পাবে।'

হয় তো তাই টের পাব। হয় তো ঝড়ে মথিত হব, বৃষ্টিতে ধুয়ে যাব। কথাগুলি শুনতেও আপাতত কাব্যিক মনে হচ্ছে। কিন্তু তেমন অভাগা আমি হতে রাজী নই, নগরের অলিগলি থেকে ছুটে এসে মুক্ত পথের এই আনন্দদায়ক পথের কষ্টটুকু মাথা পেতে নেব না? সেই তো আমার আনন্দ, আমার পথচলার বৈচিত্র্যে পাব বর্ণবাহারের স্বাদ। শুনতে পেলাম, মনপাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে ভিতরে। ফেনিলোচ্ছল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হল, যেন যাত্রার ইঙ্গিত তরঙ্গে তরঙ্গে। আর দেরী নয়, ত্বরা, ত্বরা, ত্বরা।

বললাম, 'আপনি তা হলে একটু দয়া করে...কষ্ট হবে জানি...তবু...' মহিমবাবুর ভ্রূকুটিকুটিল চোখের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করতে পারলাম না। বিব্রত হয়ে একটু

হাসলাম।

মহিমবাবু উচ্চারণ করলেন, 'দয়া...কণ্ট, হুম্! কতই যে জানো। ওগুলো থাকলে, অনেক আগেই মহিম রায়কে নোঙর-ঘরের নোঙর খুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে হত।' বলেই উঠে একেবারে সোজা ভেতরে কীচেনের দিকে চলে গেলেন।

সত্যি তো, মহিমবাবুর কী ওসব থাকতে আছে? প্রথম দিনের কথা আমি ভুলে যাই কেন? আমি একেবারে চলে যাচ্ছি না শুনে, ওঁর প্রসন্নতার কথা কি আমার মনে থাকে না? উপযাচক হয়ে ওঁর এত যে পথের নির্দেশ দেওয়া, তাও আমি ভুলে যাই? তবু দয়া আর কষ্টের কথা তুলি!

ভয়ে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে ভিতরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে কী বলছেন। আমি নিশ্চিন্ত। নির্জন সৈকতের যাত্রী, এবার নির্জনতম সৈকতের দেবদেউলের পথে যাব।

সমুদ্রের কলকল্লোলে মগ্ন হয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম, জানি নে। বালুচরের ঢালুতে নেমে বসেছিলাম লোকালয়কে আড়াল করে।

'যা ভেবেছি তাই। কথাকার নিশ্চয় এমনি কোনো জায়গাতেই আছে। এদিকে বেলা কত হল জানেন?'

চকিত হলাম, সম্বিত ফিরল। প্রণববাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'বেলার হিসেব আর রাখছি নে।'

'আপনি তো রাখছেন না। ওদিকে কাকাবাবু যে বসে আছেন।'

কী আশ্চর্য সমস্যা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটে গেছে?'

'অনেকক্ষণ। এসে অবধি আপনাকে খুঁজছি।'

আমি উঠতে গেলাম। প্রণববাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'এখন তাড়াতাড়ি করে লাভ কি। কাকাবাবু এইমাত্র চলে গেলেন। আর আপনার তো খিদে তেষ্টা কিছু নেই। চার নম্বরের কাহিনীটা শুনে যান। কাল রাত্রে তো মশায়—'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'থাক প্রণববাবু, চার নম্বরের কাহিনী শোনা আমার সম্ভবতঃ উচিত হবে না।'

প্রণববাবু বালুর ওপরে বসে পড়ে বললেন, 'কেন?'

কেন! কেমন করে প্রণববাবুকে বোঝাব, অনেক সময় অনেক কথা শুনতে ভয় হয়। আত্ম-পর সম্মানহানির ভয়ে নয়। আর যাই হোক, আমি মানুষটা তো পাথরের নই। কেন মিছে এক অজানা অন্ধকারের রহস্যে ঢুকে, আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করব? সে অন্ধকার প্রতিমুহূর্তে আবর্তিত হয়ে মনকে ক্লান্ত বিষণ্ণ করে তুলবে হয় তো। প্রসন্নতা যাবে দূরে। বললাম, 'আমার অধিকার নেই।'

'ও!'

প্রণববাবু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। হাত দিয়ে বালু ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। বললেন, 'কৌতূহলও নেই একটু?'

হেসে বললাম, 'থাকলেও, দমন করছি।'

'তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি জানি, আপনার ভয়টা হল, রুচিবিগর্হিত কিছু শোনবার ভয় আর, আমাকে এবং আমাকে ঘিরে যা কিছু, সমস্তটার ওপরেই আপনার একটা ঘৃণা—'

আমি অস্বস্তিতে বলে উঠলাম, 'না না।'

প্রণববাবু বলে চললেন, 'সেটাই স্বাভাবিক। আমি নিজেকে আপনার কাছে গোপন

করি নি। বরং একটা প্রবণতাই বোধ করেছি, নিজেকে ওপ্‌নে করে দেবার। এবং এটাও নিশ্চয় বুঝেছেন, সুখী মানুষ হিসেবে মোটেই নিজেকে প্রকাশ করি নি। দুঃখী বলে, করুণা চাইছি, মনে হতে পারে। তাও নয়। দুর্ভাগা বলতে পারেন, নিয়তিচালিত দুর্ভাগা। নিজের জন্যে তাই লজ্জিত হতে বা দুঃখ পেতে আমি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ আমার মতো লোকের দেখা আপনি আরও পেয়েছেন, পাবেনও। আমি নিজের জীবনের ব্যাখ্যা করতে পারি নে। জানি নে বলেই, শিখিও নি, তবে—।'

প্রণববাবু সহসা উঠে দাঁড়ালেন। হেসে উঠে বললেন, 'আপনার ইচ্ছে না থাকলেও, আমার ইচ্ছেতেই আপনাকে জানাই, গতকাল রাত থেকে আমি নোঙর-ঘর হোটেলের ছাদে প্রেমে পড়েছি।' বলতে বলতে আবার হেসে উঠলেন প্রণববাবু। তার মধ্যে বিদ্রূপ বা আনন্দ ছিল কি না বুঝতে পারলাম না। একটা বিকারের ঘোর ছিল নিঃসন্দেহে। বললেন, 'নোঙর-ঘর হোটেলের সঙ্গে আমার অদৃশ্য বন্ধনের খেলা ওটা, আমার নিয়তিরই অঙ্গুলি-সংকেত বলতে পারেন, দ্যাট আই অ্যাম ইন লাভ! আই অ্যাম ইন লাভ উইথ হার, ছোট মেয়েটির সঙ্গে। ওই ছেলেটির ছোট বোন ও। বিকার, ভয়, সর্বনাশ, আগুন, সবই আছে এই প্রেম-রহস্যের খেলায়। কী করে বোঝাব আপনাকে, এর মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র নেই, আমি কাউকে আক্রমণ বা ধর্ষণের জন্যে ছুটি না। কিন্তু ব্যাখ্যাহীন এ ঘটনাগুলো আমার জীবনে ঘটেছে। বোধ হয়—বোধ হয়, নোংরা বলুন, কুৎসিত বলুন, আমার প্রার্থনার মধ্যে কোনো খাদ নেই। তৃষ্ণাটা খাঁটি, ভেজা গলায় তৃষ্ণার্তের ভান করি না। আর তারই শিকার এই সব—'

থামলেন প্রণববাবু। হোটেলের দিকে ফিরে তাকালেন। তাকিয়ে, ঢালু বেয়ে উঠে, ফিরে চলতে লাগলেন। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না।

আবার দাঁড়ালেন প্রণববাবু। উঁচুতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চার নম্বরে একটা ইম্‌মর‍্যাল গেম চলছিলই, তারই বিষ চুঁইয়ে ঢুকেছে ছোট মেয়েটির মধ্যে। সম্ভবতঃ সেখানেই আমার জয়। এ যুগেও এমন বোকার মতো ঘটনা কেউ ঘটায়, আমার জানা ছিল না। বড় মেয়েটি, অর্থাৎ বীথি, শিশির সোমের বোন নয়, বান্ধবী। মমতাই হল শিশিরের বোন। ভাই বোনের সঙ্গে পুরীতে আসাটা বীথিদের বাড়িতে গোপন আছে। ভয় যে মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়! ভয়ে, এখানে দুজনকেই বোন বলে পরিচয় দিয়েছে। মমতার নিশ্চয় দাদা এবং বীথির প্রেমে সমর্থন ছিল। নইলে ও আগেই, কলকাতায় বেঁকে বসতে পারত, বা বাড়িতে বলে দিতে পারত। কিন্তু এখানে এসে, একই ঘরে, স্বর্গীয় প্রেমের কল্পনাটা ওর ভেঙে গেছে। ওর কাছে সবই এখন ফদর্য লাগছে। তাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এবং, এ্যাট দি সেম টাইম, মমতার নিষ্পাপ মন এই প্রথম কু-প্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এবং...নাঃ, যা বলার বলেছি। আপনাকে একটা খবর দিই, আজ সন্ধ্যেবেলা, চার নম্বরের সবাই আর আমি চিল্কার দিকে রওনা হচ্ছি। তারপরে ওদের নিয়তির কী নির্দেশ তা জানি না। আমারটাও নয়। চলি—'

প্রণববাবু চলে গেলেন। আমি উঠতে পারলাম না। কিছুক্ষণ আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি শূন্য হয়ে গেল। সমুদ্রকে দেখতে পেলাম না। যেন কোথায় কোন্ অর্থহীনতায়, দৃশ্যহীনতায় ডুবে রইলাম। কেবল প্রবল ফুঁসে-ওঠা গর্জন বাজতে লাগল আমার কানে।

সহসা ঠাণ্ডা স্পর্শে, চকিত হলাম, তাকিয়ে দেখি, তরঙ্গ আমাকে স্পর্শ করেছে। জোয়ার এসেছে বুঝি। চকিত হতে না হতেই, প্রকাণ্ড ঢেউ আবার গর্জনে ফেটে পড়ল। ছুটে এল, স্পর্শ করল। যেন আমাকে ডাক দিল। এই যে, এই যে আমি! দেখলাম, কলকল্লোল মাতাল। হাসিতে তার ফেনা পুঞ্জ পুঞ্জ। আমার আচ্ছন্নতাকে দিলে ঘা। চোখের সুমুখে আর কোনো ঘোর নেই। সীমাহীন স্পন্দিত নিরন্তর। সে ভাসিয়ে

নিয়ে গেল সকল সংশয় অসংশয়, বিশ্বাস অবিশ্বাস।

তীর-তরঙ্গের এই তো খেলা। মানুষ এবং প্রকৃতি, সকলই সীমাহীন। সেই সীমাহীনের অঙ্গনে, আমি বা প্রণববাবু কিংবা চার নম্বর, সবাই যে ব্যক্তি হিসেবে তুচ্ছ হয়ে যাই। সমগ্র লীলাস্রোতে আমরা ভাসমান। সমগ্রের এক অঙ্গে, আমরা বিবিধ রূপরাশি। প্রণববাবুর বিচার?

মানুষ যেন সে স্পর্ধা না করে। আত্মহত্যার অধিকার বাস করে প্রকৃতির মধ্যে। মানুষ তো একদা যাত্রা করেছিল আরোগ্যের ওষুধ সন্ধানে।

স্বল্প ছোঁয়ায় মন ভরল না। স্নানের জন্যেই ডুব দিলাম সমুদ্রে নেমে।

সন্ধ্যাবেলা মনে হল, নোঙর-ঘর হোটেলে আর একটিও জনমানব নেই। বাইরে দেখতে পাচ্ছি সারি সারি রিক্‌শা দাঁড়িয়ে। প্রণববাবু এবং চার নম্বরের ওরাই শুধু নয়। সঞ্জয় জানিয়ে গেল, নীচের চখা-চখীও অন্য কোনো নীড়ের সন্ধানে চলেছে। এবং এই সন্ধ্যার গাড়িতেই। বাইরে কিছু কোলাহল শোনা যাচ্ছে। মালপত্র উঠছে।

আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘ। সামনেই, রাস্তার ওপরে বিজলীবাতিগুলির আলোর বৃত্ত সমুদ্রকে যেন আড়াল করতে চাইছে।

পিছনের দরজায় টকটক শব্দ হল। ফিরে দেখলাম, প্রণববাবু। ডাকলাম, 'আসুন।'

প্রণববাবু বললেন, 'না, এবার যাব। বলতে এলাম, রাগ করবেন না যেন।'

'না না, রাগ করব কেন?'

প্রণববাবু হাত বাড়িয়ে, আমার একটা হাত ধরলেন। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'প্রণববাবু আপনি কি বিবাহিত?'

প্রণববাবু হেসে বললেন, 'এই শেষ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করলেন? তা হলে বলেই যাই,—হ্যাঁ, বিবাহিত। বছর তিনেক স্ত্রীর সঙ্গে সংসারও করেছিলাম। একটি ছেলে আছে।...'

প্রণববাবুর গলা হঠাৎ থেমে গেল। যেন তাঁর গলায় হঠাৎ কিছু আটকে গিয়েছে। আমি আমার হাতে চাপ অনুভব করলাম।

প্রণববাবু হাসলেন। বললেন, 'বিয়ের আগে কিন্তু নির্ভেজাল খাঁটিই ছিলাম। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর রিপালশান্‌...। যাক সে কথা।'

প্রণববাবু আমার হাত ছেড়ে দিলেন।

আমি বললাম, 'কিসের রিপালশান্‌?'

'বোধ হয় রূপ এবং হৃদয়ের দৈন্যের। কিন্তু মিথ্যেও হতে পারে, এ হয় তো আমার বানানো। এখন শুধু ভাবি, ছেলেটা—ছেলেটা যেন—। আচ্ছা, গুডবাই! চলি।'

প্রণববাবু চলে গেলেন। বোধ হয় নিশির ডাকেই চলেছেন। ঘরে বসে শুনতে পেলাম, একে একে রিক্‌শা চলে যাবার শব্দ।

পিছনে আবার পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালাম। মহিমবাবু। উঠে দাঁড়ালাম।

মহিমবাবু বললেন, 'তোমাকে ডিসটার্ব করব না, বস।'

আমি বললাম, 'না না, ডিসটার্ব আবার কী!'

মহিমবাবু কিন্তু কথা বললেন না। চুপ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অন্ধকার সকল সীমা ঢেকে দিয়েছে। নিরন্তর ঢেউয়ের মাথায় কেবল ঝিলিক হানছে ফস্‌ফরাসের হাসি।

মহিমবাবু হঠাৎ বললেন, 'সত্যি একলা থাকতে ভালোবাস?'

একটু অবাক হলাম ওঁর প্রশ্নে। বললাম, 'না। তবে মাঝে মাঝে একলা না হলে,

কিছু যেন বুঝতে পারি না।'

মহিমবাবু বললেন, 'একলা থাকার জন্যে সাহসের দরকার, কী বল?'

কী বলব ভেবে পেলাম না।

উনি নিজেই আবার বললেন, 'কিন্তু মানুষ তো একলাই, তাই না!'

এবারও কিছু জবাব দিতে পারলাম না। মহিমবাবু আমার দিকে তাকিয়ে নেই। সন্দেহ হল, কথাগুলি আমাকে বলছেন না। হয় তো স্বগতোক্তি করছেন।

মহিমবাবু শব্দ করলেন, 'হুম্!' তারপর নীচে নেমে গেলেন। কেন এসেছিলেন, কেন সহসা কথাগুলি বললেন, বুঝতে পারলাম না। মহিমবাবু যে কেবলমাত্র হোটেলের মালিক নন, তা জানি। এও জানি, হোটেলটা ঠিক ওঁর জীবনধারণের, প্রতি মুহূর্তে হিসাবের কড়ি গোনা জীবন-মরণ সংগ্রামের ক্ষেত্র নয়। আরও কিছু বেশী। হয় তো ওঁর পরম একাকীত্বের অনুভূতি, চেনা-অচেনা নানান্ মানুষের মাঝখানে একটু সান্ত্বনা খুঁজতে চাওয়া। আজ সন্ধ্যাবেলা নোঙর-ঘরের এই মুহূর্তের নিঝুমতা তাই বোধ হয় ওঁকে বিমনা করে তুলেছিল।

ভোরবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। ঋতুর সঙ্গে আজ যেন তার বিবাদ বেধেছে। ছিন্ন মেঘের টুকরো আছে এদিকে ওদিকে বটে। তাও থাকবে না মনে হচ্ছে। তার সর্বাঙ্গে ধোয়া মোছার ছাপ, প্রায় পরিপূর্ণ নীল। বাতাসও তেমন ভেজা নয়। স্বভাবতই, সমুদ্র আজ আকাশের প্রতিবিম্বে স্ফটিকের রঙ ধরেছে। তার মত্ততায় একটু যেন সহবত হবার প্রেরণা।

সূর্য যে কোন্ দিগন্তে রথ ছুটিয়েছে, টের পাচ্ছি নে। জানি নে, পুরী-সৈকতে সূর্যোদয় সত্যি দেখা যায় কি না। মেঘের জন্যে একদিনও দেখতে পাই নি। আজ ভোরেও দেখছি, সমুদ্রের শেষ রেখায় কোথাও তার ইশারা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে খবর পৌঁছেছে নিশ্চিত। আকাশ বাতাসের সর্বত্রই আলোর স্পর্শ লেগেছে।

আজ দিগ্‌ভ্রান্ত হলাম। কোন্ দিকে যে যাব স্থির করতে পারলাম না। খানিকটা চলে বালির ওপরে লুটিয়ে বসলাম। কিংবা বলা যায়, তখনও বসি নি। কানে এল বামা কণ্ঠ, 'ওই যে!'

যদিও কণ্ঠ বামা, তবু সুরে যেন চৌকিদারের শাসানি। ফিরে তাকিয়ে প্রথমেই যাকে চোখে পড়ল, তিনি শিবিদি। তারপরেই শ্রীযুক্তা অবলা দেবী, অর্থাৎ অবুদি, এবং পশ্চাতে সেজদি। হেসে বলতে গেলাম, 'এই যে আসুন।'

তার আগেই শিবিদির গলায় শোনা গেল, 'কী রে, বেইমান!'

বে-ইমান! কই, বে-ইমানের মত কোনো কাজ—।

অবুদি বলে উঠলেন, 'বেইমান কি বলছিস। তার বেশী ও, নিমকহারাম।'

ততক্ষণে বেষ্টিত হয়ে পড়েছি। দূরে দেখলাম ছোটবউদিও আসছেন। রেণু তাঁর সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে ছোটবউদিই সম্ভবত আমার উদ্ধারকর্ত্রী।

আমি বললাম, 'খুব সকাল সকাল সব বেরিয়ে পড়েছেন দেখছি।'

সেজদি বলে উঠলেন, 'ওই শোন্ তোরা। আর দেরী করলে ও পালাতে পারত।'

বলতে গেলাম যে, এসব কিছুই ভাবি নি।

শিবিদি তার আগেই বলে উঠলেন, 'আমি ভাবি বুঝি, এই আসে এই আসে। যাই হোক, খবরটা তো পেয়েছে রেণুর কাছে।'

বাতাসে, অবুদির কানের কাছে কিছু শাদা চুল বেআবরু হয়ে পড়েছিল। সেগুলি হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বললেন, 'তুই যেন আবার কী ভেজে খাওয়াবি বলছিলি?'

সেজদি বলে উঠলেন, 'পটলী।'

অবুদি বললেন, 'মরণ! ওর বলে কত বেগুনী কুমড়ি পড়ে আছে চার দিকে। চোখ দেখছিস না। আমাদের কথা ওর কখনও মনে থাকে! ওর এখন—।'

অবুদির জিভকে বড় ভয় লাগে। বিষ নেই, কিন্তু এত বেশী জারক রস থাকে যে, শিউরে উঠতে হয়। বললাম, 'না না, অবুদি, আমি ঠিক—।'

শিবিদি বলে উঠলেন, 'থাম রে ছোকরা। বলি, নিজের দিদি মাসী পিসির সঙ্গেই যদি আসতে হত, তবে?'

অবিশ্যি, শিবিদির পটলীর সংবাদেই আমি অনেকখানি কাবু হয়েছিলাম মনে মনে। তার ওপরে এই অভিযোগের উত্তরে কোনো কথাই থাকতে পারে না। নির্জন-সৈকত বোঝাব? বোঝাব, আমার নির্জনবাসের তত্ত্ব আর উদ্দেশ্য? জানি, ধোপে টিকবে না। কারণ, ঘর ছেড়ে-আসা এই শিবিদিদের প্রাণের তত্ত্ব ততোধিক অমূল্য। তাকে তুচ্ছ করি, তেমন সাহস আমার নেই। কিন্তু কী করে জানব, রেণুর কাছে খবর পেয়েই ওঁরা ধরে নেবেন, আমি যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে ছোটবউদি এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। স্নেহস্নিগ্ধ হাসি তাঁর দুই চোখে। কিন্তু কিছু বললেন না।

আমি বললাম, 'বুঝতে পারি নি শিবিদি।'

'এর মধ্যে আবার বোঝাবুঝির কী আছে। আলাপ পরিচয় যখন হয়েছে, ইচ্ছে না থাকলেও, খবর পেলে লোকে একবার যায়।'

এ শুধু নিছক ভদ্রতার কথা নয়। শিবিদির গলায় একটু যেন অভিমানেরই ছোঁয়া লেগেছে।

অবুদি আবার তার ওপরে আর একটু চাপ সৃষ্টি করলেন, 'তুই আবার বললি শিবি, সকালে এল না, বিকেলে তো আসবে। তখন ওকে ওই ঠান্ডা পটলী গিলতে দেব।'

নিতান্ত সোজাসুজি কথা। এখন তুমি যা-ই মনে কর। মনে হল, ঘরের মানুষ, আত্মীয়-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। প্রায় করুণ চোখে ছোটবউদির দিকে ফিরে তাকালাম। বললাম, 'সত্যি বলছি শিবিদি, একেবারে বুঝতে পারি নি।'

শিবিদি প্রায় ভেংচেই উঠলেন, 'একেবারে বুঝতে পারি নি।'

অবুদি মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'ন্যাকা!'

সেজদি ধমক দিলেন, 'তুই থাম।'

ছোটবউদি বললেন, 'আর বলো না শিবি ঠাকুরঝি।'

শিবিদি বললেন, 'হাবার মতন তাকিয়ে আছিস কি। আয়, নাইবি আয়।'

বুঝতে পারি নি সমূহ আর এক বিপদ ওঁত পেতে আছে। এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল, সকলেরই হাতে কাঁধে কাপড় গামছা রয়েছে। সকলেই স্নানযাত্রায় বেরিয়েছেন।

বললাম, 'আমি পরে করে নেব। আপনারা করুন, আমি দেখি।'

অবুদি বলে উঠলেন, 'তা দেখবে না। আমরা চান করব, উনি দেখবেন!'

বলতে বলতেই সকলে হেসে উঠলেন। শিবিদি বললেন, 'ওর সামনে আবার লজ্জা! তবে তাই দ্যাখ বসে। ডুবি তো বাঁচাস।'

সকলেই জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ছোটবউদি ফিরে তাকালেন একবার। জানি, ছোটবউদির মনে ঈষৎ সংশয়, শিবিদিদের কথায় আমি বিরক্ত হয়েছি কি না। এবং জানি, তাঁর চোখে সে সত্যটুকু ধরা পড়বে, ঘরে বাইরে কোথাও জীবনের সহজ আবেগকে আমি অসহজ করে নিই নে।

ছোটবউদি আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন একমুহূর্ত। তারপর নেমে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে, আমার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি,

রেণু কয়েক হাত দূরেই, একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয় তো চায় নি, তবু আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। কিঞ্চিৎ ভদ্রতা এবং দ্বিধা করেই যেন দু পা এগিয়ে এল। হাসতেও চেষ্টা করল সম্ভবত। কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, ওর প্রাণের ভিতরে কোথাও হাসির লেশ নেই। ছায়া ওকে ঘিরে আছে। তবু বললাম, 'আপনি গেলেন না?'

রেণু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করে না।'

বললাম, 'দূর থেকে হয় তো ইচ্ছেটা বুঝতে পারছেন না। জলে নামলে দেখতেন, ইচ্ছে করত।'

রেণু কোনো জবাব দিল না। ওদিকে অবুদি হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছেন, 'শিবি, একটু ধর না ভাই।'

কিন্তু এক হাত জলে নামতেও সাহস পান নি। হাতে করেই সারা গায়ে জল ছিটোচ্ছেন।

শিবিদি ডাকছেন, 'আয় না। কোনো ভয় নেই।'

'না ভাই, তুই আয়।'

শিবিদি এসে অবুদির হাত ধরলেন। বললেন, 'আয়।'

তৎক্ষণাৎ অবুদি প্রাণপণ চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে ব্যবা, শিবি তোর পায়ে পড়ি ছেড়ে দে। ও শিবি, তোর পায়ে পড়ি ভাই।'

'মরণ! আয় না।'

শিবিদি আর এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। অবুদি একেবারে চিৎপাত। এক হাঁটু জলেই মনে হল, তাঁকে কেউ ডুবিয়ে মারছে। প্রায় মৃত্যু-আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওরে, ওরে শিবি, আমাকে খুন করবার মতলব তোর।'

শিবিদি এবার বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'তবে যা, ভীতুর মরণ, বালি মেখে চান করগে যা।'

অবুদি প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই বালির ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু আমার পক্ষে হাসি চাপা দায় হয়ে উঠল। দেখলাম, রেণুর পক্ষেও হাসি চাপা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ওর মুখে আঁচল চাপা, শরীর কাঁপছে। এই প্রথম! এই প্রথম আমি রেণুকে, এমনি করে, স্বাভাবিকভাবে হেসে উঠতে দেখলাম। ছোটবউদি যদি দেখতে পেতেন! তিনি দূর সমুদ্রের দিকে মুখ করে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ছেন। ইচ্ছে হল, এই হাসির বেগটাকে, আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের মতো উচ্চকিত করে তুলি।

কিন্তু না, নিজেকে তাড়াতাড়ি শান্ত করলাম আমি। আমার খুশির বেগ প্রবল হয়ে বেজে উঠলে হয় তো রেণুর এই আত্মহারা হাসি থমকে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমি যেন দেখি নি, এমনি করেই অবুদির দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখলাম।

সেই মুহূর্তেই অবুদির দৃষ্টি পড়ল এদিকে। বেচারী! ভেজা মুখে শুকনো বালি লেগে, অবুদির চেহারাটি হয়েছে বিচিত্র। নিজের মুখখানি যদি নিজে দেখতে পেতেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমাকে দেখে খুব তো হাসি হচ্ছে দুজনের। ডাঙায় দাঁড়িয়ে ও রকম সবাই হাসতে পারে।'

ইতিমধ্যে রেণুর হাসি স্তিমিত হয়ে এসেছে। এবং একটু যেন লজ্জিত হয়েই বলল, 'কী করব বলুন তো। অবু পিসির ব্যাপার দেখে কেউ না হেসে থাকতে পারে?'

বললাম, 'নিতান্ত কাঠ না হলে পারে না। তবে, প্রমাণ করতে পারলে ভালো হত যে, জলে নেমেও হাসা যায়।'

রেণু চোখ তুলে তাকাল না। দৃষ্টি ওর সমুদ্রের দিকে। বলল, 'জামা কাপড় কিছুই আনি নি যে।'

রেণুর স্বাস্থ্যের কথাই এক্ষেত্রে আমার ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু সে ভাবনা বজায় রাখতে পারলাম না। ওকে জলে নামাবার প্রেরণাটাই প্রবল হয়ে উঠল। বললাম, 'না হয় ভেজা কাপড়েই ফিরবেন।'

রেণু এবার চোখ তুলে আমার মুখের দিকে দেখল। বলল, 'আপনিও নামবেন নাকি?'

বললাম, 'তা হলে আর একলা পড়ে থাকব কেন?'

'কিন্তু সমুদ্রের জল বেশীক্ষণ গায়ে থাকলে, গা চট্‌চটিয়ে ওঠে। আর আমাদের তো সেই আশ্রমে ফিরে গিয়ে কুয়োর জল না ঢালা পর্যন্ত—'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'আমার আস্তানাটা সামনেই, ওই দেখা যায়। কলের জল আছে অঢেল, বাথরুম পাবেন নিরালা। অন্ততঃ ভেজা গা'টা ঝরঝরিয়ে নিতে পারবেন। যদিও সমুদ্রের জল গায়ে শুকানো ভালো।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ। সমুদ্রের গর্জনও যেন শুনতে পেলাম না। ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা দপদপ করতে লাগল। রেণু কি নামবে?

ঠিক সেই মুহূর্তেই রেণুর ছায়া পড়ল। দেখলাম, ওর খালি পা সমুদ্রের ঢালুতে এগিয়ে চলেছে। নিত্যকালের লীলা বোধ হয় এমনি। আরোগ্যের সূচনা বোধ হয় এমনি করেই হয়। উত্তুরে বাতাসের প্রতিরোধ ভেঙে যেমন সহসা একদিন বিনা নোটিশে দক্ষিণা বাতাসের ক্ষণিক ঝলক দিয়ে যায়, এ যেন তেমনি। এবার আমাকেও কথা রাখতে হয়। কিন্তু পরকে জলে নামাবার পণে, নিজেকেও কবুল করে বসেছি বটে, চিরদিনের সঙ্কোচ কাটিয়ে জামা খুলি কেমন করে।

তারপরে ভাবলাম, খুলব কেন? সঙ্গে এমন কিছু নেই যে, সব নিয়ে ডুব দেওয়া যাবে না। এগিয়ে গেলাম। জামা নিয়েই ডুব দেব। ছোটবউদির দু চোখ ভরে বিস্মিত আনন্দ ও স্নেহ-স্নিগ্ধ আলোর ঝলক। রেণুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'নাইবি রেণু?'

রেণু ঈষৎ হেসে জলে পা দিতে গেল। তার আগেই ঢেউ এসে তাকে স্পর্শ করল। সেই ঢেউয়ের বেগে ছোটবউদি এগিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে রেণুর হাত ধরলেন। যেন বুকের কাছে টেনে নিলেন। চকিতে একবার আমার দিকে চোখ তুলে দেখলেন। তারপর দুজনেই হাত ধরাধরি করে, উন্মত্ত ঢেউয়ের উথালিপাথালি খেলায় মেতে গেলেন।

এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। দৃষ্টি চলে গেল দূরে, সীমাহীন অশেষে। আমার ভিতরে যেন কেউ বারে বারে বলে উঠল, 'হে অগাধ, ধৌত কর, ধৌত কর।'

শিবিদি ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'কই রে, আয়।'

অবুদি আমার কাছেই, বালিতে ঠেসে জমপেশ্‌ হয়ে বসেছেন। বলে উঠলেন, 'ওকে চিনিস না শিবি। দ্যাখ্‌ এখনো জামা খোলে নি।'

বললাম, 'জামাসুদ্ধই জলে নামব। আসুন অবুদি, আমার হাত ধরে নামুন।'

বলে অবুদির দিকে এক পা এগোতেই, অবুদি ত্রাস-চকিত স্বরে বলে উঠলেন, 'এই দ্যাখ্‌, মারব কিন্তু, খবরদার।'

মারা তো অনেক দূর, অবুদি তাড়াতাড়ি বালি আঁকড়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করলেন। স্নান করাতে নয়, যেন কেউ তাঁকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি হাসতে হাসতে ঢেউয়ের বুকে ঝাঁপ দিলাম।

স্নানের পর, সবাই যখন শুনলেন, রেণু হোটেলে যাবে কলের জল ঢালতে, তখন ছোটবউদি ছাড়া সবাই বলে উঠলেন, 'তাহলে আমরাও যাই। এখানে আর কাপড় ছাড়ব না, একেবারে বাথরুমে গিয়েই সব সেরে নেব।'

একমাত্র ছোটবউদিই আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন। বললাম, 'কোনো অসুবিধে নেই। সবাই একটা করে বাথরুমে ঢুকে পড়তে পারবেন। হোটেল একেবারে

ফাঁকা।'

ছোটবউদি পুরোপুরি না হলেও, একটু আশ্বস্ত হলেন। আর পাঁচজন মহিলার ভেজা শরীর, ছপ্‌ছপ্‌ শব্দের মিছিল নিয়ে আমি নোঙর-ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। মনে মনে ভাবলাম, হায় আমার মেঘমেদুর দিনের নির্জন-সৈকতের নিবিড় আত্মসমাহিত হওয়ার বাসনা! মনে হল, আমার পিছনে সমুদ্র যেন মহানন্দে হাততালি দিয়ে নাচছে, ফেনা ছিটিয়ে হাসছে। যেন এই রঙ্গ তার নিজের সৃষ্টি। তার এই খেলা শুধু আমার সঙ্গে।

হোটেলের বারান্দায় পা দিয়ে এক মুহূর্ত থমকে গেলাম। আসল লোকের কথাই তো আমার মনে ছিল না। মহিমবাবুর গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে না উঠলেও, সেই শার্দুল-সদৃশ মুখ আমি দেখতে পেলাম। দেখলাম, সামনের ঘরে, তিনি চেয়ারে বসে। বিস্মিত ভ্রূকুটি দুই চোখ আমাদের প্রতি স্থির নিবদ্ধ। তাঁর পাশে স্বয়ং খেঁকিয়ানন্দ মহারাজ। মহারাজের চোখও অসহায় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসু। এবং সঞ্জয়ও ভিতরে যাবার দরজায় উপস্থিত. তার একটি চোখই একেবারে অপলক। আমাদের আপ্যায়ন করবার জন্যে হাসা উচিত কিনা বুঝতে পারছে না।

মনে হল, ঘরটিতে যেন বজ্রপাত হয়েছে।

আমি চকিত মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত করে ফেললাম। বলা-কওয়া যা হবে, তা পরে। আগে ওপরে চলে যাই। পিছন ফিরে, ঘাড় নেড়ে সবাইকে অনুসরণের ইঙ্গিত করে, ঘরের মধ্য দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। একে একে সবাই এলেন। ঘরের নৈঃশব্দ এতই গভীর, পিন পড়লে শব্দ হয়।

ওপরে উঠে অবুদিই প্রথম, প্রায় হাউমাউ করে উঠলেন, 'নীচে ওই গুঁপো লোকটা কে রে? আমার বুকটা কী রকম কেঁপে উঠেছিল সত্যি। এমন করে তাকিয়েছিল, যেন ভস্ম হয়ে যাব।'

শিবিদি ঘাড় নেড়ে মুখ ভেংচে বললেন, 'দেখিস, একেবারে হার্টফেল করিস না।'

সেজদি বললেন, 'তোর চোখ পড়েই বা কেন ওদিকে?'

অবুদি অসহায় ভাবে বললেন, 'বা রে! তা কী করব।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই অবুদি। উনি এই হোটেলের মালিক, লোক খুব ভালো।'

রেণু বলে উঠল, 'কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমার সারা মুখের মধ্যে নোনা বালি কিচ্‌কিচ্‌ করছে।'

আমি তাড়াতাড়ি রেণুকে আমার বাথরুমটাই দেখিয়ে দিলাম। জানা ছিল, আরো অন্ততঃ তিনটি বাথরুম ওপরেই রয়েছে। লক্ষ্য পড়ল, সঞ্জয়ও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে বাথরুম দেখিয়ে দেবার দায়িত্বটা তাকেই দিলাম। ছোটবউদিকে আমার ঘরটা দেখিয়ে বললাম, 'এ ঘরটা আমারই। আপনারা সেরে নিন। কিন্তু একটা কথা, আপত্তি না থাকলে, সবাইয়ের জন্যে এক কাপ করে চায়ের কথা বলব ছোটবউদি?'

অবুদি আগেই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তোর এই বারো জাতের ছোঁয়া হোটেলের চা খাব আমরা।'

শিবিদি বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি খাব। চানের পর যা জমবে।' বলতে বলতে শিবিদি বাথরুমের উদ্দেশে ছুটলেন।

অবুদি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তা হলে আমিও খাব। মিছিমিছি বাদ যাই কেন, কী বলিস রে, এ্যাঁ?'

ছোটবউদি হেসে ফেললেন। বললেন, 'অবুঠাকুরঝির যেন ছেলেবেলার পিঠোপিঠি বোনেদের মত অবস্থা। একজন কিছু করলে, আর একজনের ছাড়াছাড়ি নেই।'

অবুদি অসহায় ভাবে বললেন, 'তা কী করব। সিঁদুর ঘুচিয়ে অবধি তো শুনেছি, ওসব হোটেল-মোটেলের চা খাওয়া চলবে না। তা শিবির যদি চলে, আমারও চলবে।' বলে চলে গেলেন।

ছোটবউদি হেসে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাদের আপত্তি নেই, অন্তত কানে শুনলেই হবে, আমিষ বাঁচিয়ে হয়েছে। কিন্তু তোমার কোনো—'

'অসুবিধে নেই ছোটবউদি। বরং খুশি হই।'

ছোটবউদি বাথরুমে চলে গেলেন। সেজদিও আগেই গিয়েছিলেন। সঞ্জয়কে আমি চায়ের কথা বলে দিলাম। সে যাবার আগে একবার না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'ইঁয়ারা কে বাবু?'

পরিচয় দেওয়া তো বড় মুশকিল। নিতান্ত পথের চেনা বললেও সঞ্জয়ের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হবে। পথের এ ক'দিনের চেনা জানাতেও যে তুই-তোকারিতে দাঁড়ায়, সেটা অনেকের পক্ষে বুঝতেই অসুবিধে হবে। পথ বাদ দিয়ে তাই বলতে হল, 'আমার চেনা শোনা এঁরা।'

সঞ্জয় নিজেই কথার খেই ধরিয়ে দিল, 'পুরীতে বেড়াতে এসেছে, আর আপনার সাথে দেখা হয়ে গেছে। সে আমি বুঝেছি।'

তেঁতুলবীচি দাঁতে হেসে সঞ্জয় চলে গেল। আমি ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে গাড়ি-বারান্দার ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে সূর্য দেখা দিয়েছে। বালুচর চিকচিক করছে, দৃষ্টি-সীমার সবটুকুই রৌদ্রে মাখামাখি করে আছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, দূরে নুলিয়াদের নৌকাগুলি ঢেউয়ের বুকে ভেসে উঠছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে চকিতে। হয় তো ওরা ভোররাত্রে, কিংবা আরো গভীর রাত্রে নৌকা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আকাশ ও সমুদ্রের ভবিষ্যৎ মর্জির কথা ওরাই জানে। দুর্যোগের আভাস আগেই টের পায়। সুযোগ পেলেই ডিঙা ভাসায়। ওদের বসে থাকার সময় নেই।

যদি বা বসে থাকতে হয়, দেখেছি, বালুর ওপরে কাত হয়ে শুয়ে গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে দূর সমুদ্রের দিগন্তে। জীবনের যত ওঠা নামা, সবই তার আবর্তিত হচ্ছে সমুদ্রে। শুধু জীবন ধর্মের একটা অংশ পালনের জন্যে ভূমিতে তার বাস। কে জানে, হয় তো সেজন্যেই ওদের ডাঙার বাসাগুলি শ্রীহীন। ওদিকটাতে যেন তেমন নজর নেই। আমার ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে ওদের পাড়াটাই শুধু চোখে পড়ে। দেখি, মাটির দেয়াল এবড়ো খেবড়ো, সব সময়েই জীর্ণ। মাথার চালে খড় ছাওয়া নেই ভালো করে। নিশ্চয় বৃষ্টি এলেই ঘরে জল পড়ে। ঘরের আশে পাশে আবর্জনার স্তূপ। দেখেছি, গৃহস্থালীর সরঞ্জামের মধ্যে, উনুন, ভাতের হাঁড়ি আর জলের পাত্র প্রধান। তার তীরের বাসায় আর সবই গৌণ। এমন কি, জামাকাপড়েও। মেয়ে পুরুষের এত সংক্ষিপ্ত পোশাক বোধ হয় আর কোথাও দেখি নি। পুরুষেরা একেবারে উলঙ্গ বললেই হয়। লজ্জা নিবারণের এক চিল্তে কাপড়। মেয়েদের তার চেয়ে কয়েক হাত বেশী, কারণ তাদের লজ্জার পরিধি আর একটু বিস্তৃত। ছোটদের গায়ে কখনো জামাকাপড় দেখেছি বলে মনেই হয় না।

কিন্তু ওদের মতো আশ্চর্য দেহসৌষ্ঠব কম দেখেছি। কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ শরীর, সামান্য নড়াচড়ায় প্রতিটি পেশী সর্পিল হয়ে ওঠে। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, দীর্ঘদেহ মানুষগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়, দুরন্ত স্রোতের উজানে ওরা চলে। উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ওদের দেহের পেশী গঠিত। ওদের প্রাণস্পন্দনের যন্ত্রটাকে সব সময়ে চালু রেখেছে সমুদ্রের অহর্নিশ গর্জন। তাই আমরা ভীরু বিস্ময়ে চেয়ে দেখি ওদের প্রত্যহের সমুদ্র যাত্রা। আর ওরা আজন্মকালের চেনা এই অসীম সমুদ্রে অবলীলাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবু না ভেবে পারি নে, ওদের মতো সাহস আমার নেই।

মৃত্যু ও ক্ষুধা, এই দুই ওদের প্রত্যহের সঙ্গী।

পিছনে শব্দ পেয়ে, ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, রেণু বাথরুম থেকে বেরিয়ে, কোথায় যাবে, স্থির করতে পারছে না। ভেজা কাপড়ের জলে, ঘর ভিজে যাওয়ার সংকোচ ওর চোখে। দৃষ্টি ওর ভিতরের বারান্দার দিকে। আমাকে লক্ষ্য করে নি। তাই ও নিজের দিকে ভালো করে বারে বারে দেখল। ভেজা কাপড়ে শালীনতা রক্ষার সংশয়ে যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। অথচ এ দ্বিধা ওর সমুদ্রের ধারে ছিল না। দেখলাম, স্বাস্থ্যের স্নিগ্ধতা আর ঔজ্জ্বল্য, ওর প্রাণের নিরানন্দকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে। আর তাতেই রেণু বিব্রত।

আমি ডাক দিয়ে বলে উঠলাম, 'এই ছাদে চলে আসুন।'

রেণু যেন চমকে উঠল। লজ্জার বাধায় এক মুহূর্ত একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

এবার উদ্বেগ বোধ না করে পারলাম না। এ-ভাবে ভেজা কাপড় গায়ে শুকোলে, অসুখ করা অসম্ভব নয়। অথচ ওকে জলে নামাবার উৎসাহ আমারই বেশী ছিল। এখন নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

বললাম, 'কী দিয়ে সুরাহা করা যায় বলুন তো?'

রেণুর কপালের দু'পাশ দিয়ে ভেজা চুলের গোছা বুকের ওপর এলানো। চুলের ছায়ার মধ্য থেকে ওর ডাগর চোখ দুটিতে বিস্ময় দেখা দিল। বলল, 'কিসের?'

'এই ভেজা কাপড়ের? মানে—আমার আবার...'

রেণুর চোখে মুখের গাঢ় ছায়া যে এই স্নানের ধারায় কিছুটা ধুয়েছে, তা বোঝা যায় ওর মুখের ঔজ্জ্বল্যে। ঈষৎ হেসে বলল, 'যত দূর জানি, আপনার কাপড় মোটে দুটি।'

এ কথা বলতেই ভুলেছি, দুটি পায়জামা আমাকে দীর্ঘ দিনের মুখ চেয়ে কিনতেই হয়েছে। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, কাপড় এখন আছে শুকনো, দেখুন আমি পায়জামা পরেছি।'

রেণুরও যেন নতুন করে লক্ষ্য পড়ল। বলল, 'সে কি! বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে, তারপরে আপনার জামাকাপড় কেনার কথা মনে পড়ল?'

বললাম, 'না—মানে, ঠিক সময়ের কথা ভেবে বেরুই নি তো, তাই। দেখলাম দরকার হয়ে পড়ল।'

রেণু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। সহসা সেই চোখে চোখ রাখতে গিয়ে একটু সংকুচিত হয়ে পড়লাম। রেণু যেন দৃষ্টি দিয়ে আমার চোখে কিছু সন্ধান করছিল। আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। রেণুও সম্ভবতঃ সজাগ হল। বলল, 'কাপড় দিলেও আর দুটো জিনিস তো দিতে পারবেন না। তাই ওসব ভেবে লাভ নেই। আমার বেশ ভালোই লাগছে, কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

প্রায় অপরাধীর মতোই একটু হেসে চুপ করতে হল আমাকে। সত্যি, বলার কিছু নেই। একটা ধুতি যদি বা চোখ কান বুজে দিতে পারি, সেটাও অত্যন্ত আপত্তিকর নিঃসন্দেহে, কারণ রেণু এমনিতেই রঙীন শাড়ি পরে না, তার কোনো সাজসজ্জা নেই। তার ওপরে সরুপাড় ধুতি-পরা বেশে ওর দিকে তাকাতে কষ্টই হবে। তা ছাড়া শায়া ব্লাউজই বা পাব কোথায়।

রেণু আবার বলল, 'স্নান করে কিন্তু খুব ভালো লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে, আবার গিয়ে জলে নামি।'

ইতিমধ্যে একে একে সবাই গাড়ি-বারান্দার ছাদে এসে জড়ো হলেন।

অবুদি বললেন, 'আঃ, কল খুলে দিয়ে চান করতে যে কী ভালো লাগল। আর

আশ্রমে থাকলে কুয়োর দড়ি টেনে টেনেই হাঁপিয়ে মরতাম।'

শিবিদি বললেন, 'ঘরখানিও দ্যাখ, একবারে যেন সমুদ্রের বুকে।'

অবুদি বললেন, 'ইচ্ছে করছে এখানেই থাকি।'

সেজদি বলে উঠলেন, 'তবেই হয়েছে। দেখ বাপু, শুয়ে পড়ার তাল করো না যেন।'

অবুদি মুগ্ধ চোখে একবার ঘরের দিকে দেখে বললেন, 'তাতেই বা ক্ষতি কী, কী বলিস ভাই। এত আরামে আছিস, তোর কি আর মহেন্দ্র-আশ্রমে পা দিতে ইচ্ছে করবে?'

কিন্তু শিবিদি লক্ষ্য করছিলেন অন্যান্য বিষয়। রীতিমত তীক্ষ্ন চোখে চারদিক দেখে বললেন, 'এই দ্যাখ, তোকে বাপু একটু যেন কেমন কেমন লাগছে আমার। তুই এলি একটা কাগজের পোঁটলা হাতে, রয়েছিস এ রকম হোটেলে, খরচও মেলাই নিশ্চয়। এখন দেখছি জিনিসপত্তরও দু একটা বেড়েছে। রহস্যটা কী একবার বল্ দিকিনি।'

শিবিদি প্রায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। শিবিদি যদি দারোগা, অবুদি তাঁর সার্থক সেপাই। এখন তাঁর কপালের কাছে পাকা চুল শুধু নয়, মাথার অনেকখানিই অল্প চুলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হুঁ, আমারও কথাটা মনে আসছিল, মুখে আসছিল না। এলি তো যেন একেবারে ছন্নছাড়া, এখন তো দেখছি বেশ মৌজে আছিস।'

সর্বনাশ, তাকিয়ে দেখি সেজদির চোখেও যেন সেই প্রশ্ন। ভঙ্গিটাও ভালো নয়। কেবল ছোটবউদির সদ্যস্নাত মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি। রেণু তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু মনে হল, ওর শ্রবণ এদিকেই।

হেসে বললাম, 'বিশ্বাস করতে পারেন, ছন্নছাড়ার কপালেও মাঝে মাঝে সুখ জুটে যায়। এই বিছানাপত্র সাজিয়ে দেওয়া সবকিছুই মহিমবাবুর দয়া, নিচে যাঁকে দেখলেন। মায় তোয়ালেখানিও। এ ঘর থেকে বেরুলেই, আমি আবার যে-কে সেই।'

পরমুহূর্তেই শিবিদির প্রশ্ন, 'কত টাকা করে নেয় রোজ?'

বললাম। ছোটবউদি ছাড়া সকলেরই যেন চোখ কপালে উঠল। অবুদি বললেন, 'কী কী খেতে দেয়?'

উপায় নেই, বলতেই হল। সকাল থেকে রাতের একটা ফিরিস্তিও দিতে হল। দিয়ে বললাম, 'হিসেব করলে টাকাটা বেশী নয়।'

শিবিদি বললেন, 'ছোঁড়া বলে কী গো! তোর একার একদিনের খরচা যে আমাদের পাঁচজনের রোজ খরচা!'

অবুদি ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন, 'টাকার থোকাটা তোর বেশ বড়। বাপের টাকা ভাঙাচ্ছিস, না?'

হায়, আর কী যে বাকি রইল শুনতে! বললাম, 'বাবা অনেকদিন গত হয়েছেন। কিছু রেখে যাবার সামর্থ্য তাঁর সত্যি ছিল না।'

শিবিদিই আবার অবুদির দিকে ঘুরে বলে উঠলেন, 'তোর যেমন কথা। টাকা কি খালি বাপেরই থাকে, ওর নিজের থাকতে পারে না?'

অবুদি বললেন, 'ওর দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। কী করে ও। ব্যবসা না চাকরি, কোন্‌টা?'

আমি খানিকটা নিরুপায় অসহায়ের মতো হাসতে লাগলাম। কিন্তু সকলেরই চোখে জিজ্ঞাসা। সকলেই একটা সন্তোষজনক জবাব চান, তা বোঝা যাচ্ছে। বললাম, 'যা করি, সেটা চাকরি না ব্যবসা, ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছি নে। তবে খেটে খাই, এটা বিশ্বাস করতে পারেন।'

অবুদি বললেন, 'শুনছিস শিবি, জবাবটা শোন্, তার মানে, ও ওই ঢুলুঢুলু চোখ দুটি নাচিয়ে আর এমনি মিষ্টি হেসে হেসে ঘুরে বেড়ায়, এই যেন ওর খাটুনি আর পেশা, তাই আমাদের বোঝাতে চাইছে।'

কী বিপদ, মনে করেছিলাম, প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের পালাটা অনেক আগেই সারা হয়েছে। এসব প্রশ্ন যে আবার নতুন, নিখুঁত করে শুরু হবে, কে জানত। একটা জবাব দেবার জন্যেই মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম।

ছোটবউদি হঠাৎ হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমার বলতে অসুবিধে হলে, আমিই বলে দিই। আমার এই ঠাকুরঝিদের দোষ নেই, ওঁরা পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারেন না। ভেবেছিলাম, রেণু অন্ততঃ তোমার পরিচয়টা, নাম শুনেই চিনতে পারবে। পারলে ও আমাকে আগেই বলত। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই মনে রেখেছি।'

এবার ছোটবউদির দিকে সকলের বিস্মিত চোখ। রেণুও চকিত বিস্ময়ে ফিরে তাকাল। আমি যেন বিশ্বাস করেও করতে পারছিলাম না। কিন্তু ছোটবউদির হাসি হাসি স্নিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃসংশয়ে বুঝলাম, উনি আমাকে চেনেন।

ছোটবউদি বললেন, 'ও বই লেখে। ওর নাম শুনেই চিনেছিলাম।'

রেণুর ভুরু কুঁচকে উঠল একবার। পরমুহূর্তেই শব্দ করল, 'ওঃ!'

শব্দের মধ্যে লজ্জাটাই বড় হয়ে উঠল। মনে মনে জানি, এ লজ্জা বৃথা। আমার পরিচয়ের পরিধি সম্পর্কে আমি সজাগ ও সচেতন। তা ছাড়া রেণুর মনের অবস্থা আমার অজানা নয়। সে অবস্থায় ওর সদর দিয়ে কারা এল, গেল, অন্দরে তার খবর পৌঁছবার নয়। পৌঁছলেই বরং অবাক হতাম। রেণুকে চিনতে অসুবিধে হত। তাই আমার আত্মাভিমানে কোথাও একবিন্দু লাগে নি। যদি লাগত, জানি তাতে এ বিশ্বের কিছু আসত যেত না, মাঝখান থেকে আত্মগ্লানির পাঁকে পড়তাম নিজেই।

কিন্তু আমার বিস্ময় ছোটবউদি। তাঁর দুটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চোখের দিকে আমি ফিরে তাকালাম। ছোটবউদিও আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হাসছিলেন। আবার বললেন, 'নামটা শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তোমার চেহারাটা হবে আরো বড়সড়, বয়স হবে আরো অনেক বেশী, ভারী গম্ভীর একজন পুরুষ। কিন্তু ও মা! এ যে এক-ফোঁটা ছেলে! তাই একটু সন্দেহ হয়েছিল বলে চুপ করে ছিলাম। পুরী স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার সন্দেহ ছিল না, এ সে-ই। যখন দেখলাম, নতুন দেশে পা দিয়েই আত্মভোলা হয়ে দেখতে লাগলে। তবু পরিচয়টা ফাঁস করলাম না, ভাবলাম, এ তবু বেশ কথা বলা যাচ্ছে। যা ইচ্ছে তাই বলছি। তারপরে আর বলা যাবে না।'

ছোটবউদির কথায়, খুশি এবং লজ্জা আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। কিন্তু এদিকে অবস্থা খুব সঙীন। শিবিদি অবুদি সেজদি রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। সহসা তাঁরা তিনজনেই যেন একটু বেশী শালীন হবার জন্যে, গায়ের কাপড়-চোপড় টেনে, মাথায় কাপড় দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন। আমি যেন হঠাৎ খানিকটা অপরিচয়ের দূরত্বে সরে গিয়েছি। তিনজনেই, একবার আমার আর ছোটবউদির মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

অবুদি ফিস্‌ফিস করে বললেন, 'ও কী বই লেখে ছোটবউ? নাটক নভেল নাকি?'

ছোটবউদি আমার দিকেই চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, গল্প উপন্যাস লেখে।'

সেজদিও নীচু গলায় বললেন, 'তা কী করব, আমরা তো ওসব পড়ি না। তুমি আগে বল নি কেন ছোটবউ?'

এই বিচিত্র পরিবর্তনে আমার হাসির বেগ ভিতরে ভিতরে প্রবল হয়ে উঠল।

আমি যেন এক অচেনা লোক; এমনি ভাবে অবুদি চকিতে একবার আমাকে দেখে আবার বললেন, 'আগে বললে, একটু সামলে নিতে পারতাম নিজেদের। একেবারে তুই-তোকারি—'

আর সামলানো গেল না। আমি হেসে ফেললাম। ছোটবউদিও। হাসতে হাসতে ছোটবউদি বললেন, 'তাতে কী হয়েছে অবু ঠাকুরঝি। ও আমাদের কাছে যা, তাই আছে।'

আমি বললাম, 'অবুদি, এই পরিচয়টা নিয়ে তো সংসারে জন্মাই নি। আমাকে আপনারা যেমনটি দেখেছেন, আমি তাই।'

শিবিদি বলে উঠলেন, 'তা না হলেই বা আর কী করব বাপু। ও তো গায়ে ছাপ মেরে আসে নি যে, ও বই লেখে। প্রথম তো নেহাত ফচকেই ভেবেছিলাম, তারপরে দেখলাম, না, একটু ভালোমানুষ আছে, সহবত জানে, মনটা পরিষ্কার। তা, একটু ভালোবেসেছি বলে তো আর দোষ হয়ে যায় নি।'

চমৎকার! আমার প্রাণের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হাসি ফেটে পড়ল।

ছোটবউদি হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক বলেছ শিবিঠাকুরঝি।'

আমি বললাম, 'দোষ বলছেন কি শিবিদি, এই তো আমার পরম ভাগ্য।'

শিবিদি বললেন, 'ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তা জানি না।'

অবুদি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, যা বলেছিস্। আর তা ছাড়া নাটক নভেল, ওসব লেখা বাপু ভালো কাজ নয়।' বলে অবুদি ঠোঁট ওল্টালেন।

শিবিদি বললেন, 'তোর ওসব সেকেলে কথা রাখ দিকিনি।'

আর একবার হাসি উপচে পড়তেই সঞ্জয় চা নিয়ে এল। ট্রে থেকে আমি হাতে তুলে দিতে গেলাম। তার আগেই যে যার কাপ হাতে তুলে নিলেন। ছোটবউদি রেণুকে চা তুলে দিলেন।

রেণুর মুখে স্নানের প্রসন্নতাটুকু আছে। কিন্তু একটু যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। চা দেখে সে অবাক হল। বলল, 'এর মধ্যে আবার চায়ের কথা কখন হল?'

ছোটবউদি বললেন, 'হয়েছিল। খেয়ে নে, ভালোই হবে। তারপরে চল্ তাড়াতাড়ি যাই, ভেজা কাপড় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে শুকোচ্ছে।'

চা শেষ করে আবার সেই বাহিনী নিয়ে যাত্রা। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেই দেখি মহিমবাবু আর খেঁকিয়ানন্দ। যেন কোনো কথাবার্তা হচ্ছিল। আমাদের দেখেই থেমে গেলেন। সেজদি আর অবুদি প্রায় এক গলা ঘোমটা টেনেছেন। অবুদি তো 'গুঁপো' লোকটির ভয়ে নিশ্চয়। সেজদির বোধ হয় ভয়টা সংক্রামক। মহিমবাবু আর খেঁকিয়ানন্দের সেই একই ভ্রূকুটি বিস্ময় স্তব্ধতা।

হোটেলের বাইরে এসে শিবিদি আগেই বললেন, 'আশ্রম অবধি যাবি। তা তোর যা-ই ল্যাজ গজাক।'

ল্যাজ নিশ্চয় গজায় নি। কিন্তু এখন গিয়ে যদি সত্যি সেই গতকালের পটলী খেতে হয়, তা হলে পটল আর কিছু করার মতো ঘটনাই হয় তো ঘটাবে। আর এমনিই আশ্চর্য, এ সময়েই ছোটবউদির সঙ্গে চোখাচোখি হল। বললেন, 'অসুবিধে থাকলে, থাক না এখন।'

বললাম, 'অসুবিধে আমার কিছু নেই। আপনারা গিয়ে এখন তো রান্নাবান্না করবেন।'

শিবিদি বললেন, 'আমরা তো রাঁধব পাঁচ হাতে, আমাদের রোজই ফিস্টি। আমরা গল্প করতে করতেই রাঁধব, কোনো অসুবিধে নেই।'

সেজদি বললেন, 'জায়গাও চেনা হয়ে থাকবে।'

অতএব পা বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু স্বর্গদ্বারের কাছে এসেই দল আবার ঠেকে গেল। সবজী তরকারির দোকানগুলি একবার না ঘুরে নাকি যাওয়া চলে না। কেবল রেণু কোনোদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল। সন্দেহ হল, আবার রেণু বিরক্ত হয়ে উঠল কিনা।

ছোটবউদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি একটু রেণুর সঙ্গে যাও, আমরা এলাম বলে। কিছু মনে করো না যেন।'

বলে ছোটবউদি সলজ্জ হাসলেন। কোনো কথা না বলে, রেণুকেই অনুসরণ করলাম। জানি নে কী ভেবে ছোটবউদি কিছু মনে না করার কথা বললেন। পরিচয় বাড়ে বলেই তো ভয়। তবু, পথের যা কিছু, সে তো পথেই ছিটিয়ে রেখে যাব। জীবনের ধন যেমন কিছুই ফেলা যায় না, তেমনি কিছুই নিয়ে যাওয়া যায় না।

রেণু আমার একটু আগে আগে চলেছে। পথ চলতে গিয়ে ভেজা শাড়িখানা দু' হাত দিয়ে আরো শালীন করে জড়িয়েছে। স্বর্গদ্বারের পাড়া প্রায় শেষ করে, বাঁদিকে মোড় নিয়ে, বাগান-ঘেরা একটা একতলা বাড়ির গেট দিয়ে রেণু ঢুকল। প্রায় দশ মিনিটের এই পথ চলার পর রেণু প্রথম পিছন ফিরে বলল, 'আসুন।'

প্রথমটা অনুমান করেছিলাম, ওকে যে আমি অনুসরণ করছি, তা হয় তো ও জানে না। কিন্তু পিছন ফিরে বলার ভঙ্গি দেখেই বুঝলাম, সবই যেন ওর নখদর্পণে ছিল। আমি গেট দিয়ে ঢুকলাম।

সামনেই বড় দালান। সিঁড়ি দিয়ে উঠে রেণু যেন একটু দ্রুতই একটি ঘরে ঢুকে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল। ওর হাতে একটি বেতের মোড়া। দালানের দেয়ালের কাছে সেটা রেখে বলল, 'বসুন।'

আমি দালানে উঠে বসলাম। চকিতে একবার রেণুর মুখের দিকে দেখলাম। এবং এখন আমার আর কোনো সন্দেহ নেই, ওর সর্বাঙ্গ বেষ্টিত শোকের ছায়া তেমনি আছে। তার দাগ একটুও যেন ঘোচে নি। আমি বললাম, 'যান, তাড়াতাড়ি কাপড়টা বদলান।'

রেণু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি আশ্রমের চারপাশ লক্ষ্য করে দেখলাম। কাঠগোলাপ গন্ধরাজ আর বেলফুলের ঝাড় চারপাশে। সিঁড়ির কাছেই ঝাড় বেঁধে মাধবীলতা উঠে গেছে। বাঁশ বাকারি লোহার শিক, যা পাওয়া গেছে, তা দিয়েই অর্ধচক্র খিলানের মাথায় লম্বা মাচা করা হয়েছে। মাধবীলতা তার ওপরেই আপনাকে ছড়িয়েছে। উঠোনের পূর্বদিকে ছোট একটি পাঁচিল ঘেরা পাতকুয়ো রয়েছে। দালান থেকে তার কপিকল দেখে বোঝা যাচ্ছে। পূর্বদিকে আরো কয়খানি ঘর রয়েছে দেখা যায়। উঠোনটি পরিষ্কার, নিশ্চয় প্রত্যহ ঝাঁট পড়ে। তবু বাতাসে প্রতিনিয়তই বালি এসে পড়ছে। বালি একেবারে কখনো পরিষ্কার করা যায় না।

দালানের বাঁদিকের বড় বন্ধ দরজাটিই হয় তো মহেন্দ্রনাথ সাধকের স্মৃতিমন্দির। এই আশ্রমের মূল মন্দির। দরজার মাথায় তাঁর গৈরিক বসন, পদ্মাসন ছবি। জন্ম মৃত্যুর তারিখ লেখা রয়েছে। দালানের দেয়ালে দেয়ালে, তাঁরই অনুগামী বিশিষ্ট সাধক শিষ্যদের ফটো আর বাণী। হঠাৎ একটি ছবির দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টি থমকে গেল। কোথায় দেখেছি এ মুখ? ছবির মুখ আমার চেনা চেনা লাগছে। খুবই চেনা!

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল, প্রথম দিন ভোরবেলার সেই সমুদ্র তীরের কথা! সেই বিচিত্র নগ্ন মূর্তি! এ তো সেই মুখ! মাথায় সেই জটার চুড়ো, মুখে দাড়ি। দাড়ির অন্ধকারে হাসির ইশারা। যেন বলছেন, 'আমাকে কী দেখছ? যাঁকে দেখবার, তাঁকে দেখ।' এই তো আমার সমুদ্র তীরের প্রথম মানুষ, প্রকৃতির প্রথম প্রেমের গূঢ় পথের দীক্ষাদাতা।

পিছনে রেণুর গলা শোনা গেল, 'চেনেন নাকি?'

'অ্যাঁ?'

'খুব তন্ময় হয়ে দেখছেন সর্বেশ্বর দেবকে।'

'সর্বেশ্বর দেব?'

'তাই তো জানি। ওই নামেই ওঁকে ছোটবউদিরা ডাকেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি এই আশ্রমেই থাকেন?'

রেণু বলল, 'হ্যাঁ, এ আশ্রমের এখন উনিই সব কিছু, ছোটবউদির গুরুদেব।'

ছোটবউদির গুরুদেব! ছোটবউদির সেই হাসি-স্নিগ্ধ মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছোটবউদির সেই কথাগুলিও আমার মনে পড়ে গেল, 'দুঃখের বুকের ওপরে বসে হাসো। একটু শান্ত হও, তুমি বড় অস্থির।' অমন করে দেখার দৃষ্টি কে তাঁকে দান করেছেন? এই সর্বেশ্বরদেব নাকি? আমি আবার ছবির দিকে তাকালাম।

রেণু বলল, 'আপনি বসুন, আমি কাপড়টা ধুয়ে মেলে দিয়ে আসছি।'

রেণু নেমে গেল। দরজা খুলে রেখে গেল। সেখান দিয়ে বেগে বাতাস এল। ছোটবউদিরাও এসে গেলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

শিবিদি বলে উঠলেন, 'যাচ্ছিস কোথায়? এবার আমাদের চায়ের পালা। এখুনি স্টোভ ধরাব, চা খেয়ে যাবি।'

অবুদি বললেন, 'পটলীও পাঁচ মিনিটে সব হয়ে যাবে।'

ছোটবউদি তখন সর্বেশ্বরদেবের ফটোর দিকে মুখ করে নমস্কার করছিলেন। নমস্কার করে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমাকে একটু চা না খাইয়ে শিবি ঠাকুরঝি ছাড়বেন না দেখছি। একটু বসেই যাও।'

অগত্যা, অনুরোধ শিরোধার্য।

সেজদি বললেন, 'তুমি কি আবার এখন বসবে নাকি ছোটবউ?'

ছোটবউদি একবার সর্বেশ্বরদেবের ফটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, আজ আর বসব না। জানো তো, আমার পুজোপাঠ আচার আচরণের কোনো সময় বিধিনিষেধ নিয়ম নেই। আমার গুরুর তাই নির্দেশ। তিনি বলেন, সব কিছুর মধ্যেই যখন আর মন মানবে না, যখন আর থাকতে পারবে না, তখন আমার কাছে এসে বোস। তা যদি দুপুরের ভরপেট খাবারের পরে হয়, তবে তাই বোস। যদি মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে ইচ্ছে হয়, তবে তাই বোস। যা তোমার প্রাণের বিষয়, যা তোমার ভিতরের বিষয়, তাকে কি কখনো সময় দিয়ে বাঁধা যায়? এ কি তোমার অফিস না কোর্ট কাছারি যে, ওপরওয়ালার বাঁধা সময়ে তুমি চলবে?'

ছোটবউদির কথা শেষ হয় নি। আগেই দেখলাম, সেজদি মুখখানি গম্ভীর করে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে তখন ঘর গেরস্থালি ডেয়ো-ঢাকনার নানান্ শব্দ। শিবিদি অবুদির নানান্ কথা, 'বঁটি নে, পটল কোট। স্টোভে তেল আছে তো? আ মরণ! বাতাসের যেন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। দে, দরজা বন্ধ করে দে। চা পাতা কোথায়?' ইত্যাদি।

আমিই বলে উঠলাম, 'কিন্তু ছোটবউদি, সব ধর্মেরই দেখি, তার সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনার একটা বিশেষ সময় নির্দেশ করা আছে। কেউ তা শাঁখ বাজিয়ে জানান দেয়, কেউ ঘণ্টা বাজায়, কেউ চিৎকার করে ডাকে।'

ছোটবউদি বললেন, 'আছে বইকি, তাও আছে। ছোট ছেলেপিলেদের মনকে নিবিষ্ট করার জন্যেই তো তাদের ছেলেবেলা থেকে পড়ানো হয়, 'ওঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ'। তারপরে যখন সে বড় হয়, কলেজে

যায়, ডাক্তারি পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, তখন কি আর তার সকাল সন্ধ্যের ঘণ্টা বাজানো নিয়ম থাকে? তখন সে যে কখন পড়ে, কখন ক্লাসে যায়, ছোটরা বুঝতে পারে না। ভাবে, দাদারা বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের কি বোঝানো যায়, বড়রা তখন নিজের টানেই চলে, ছোটদের পরের টান দিয়ে, নিজের টান শেখানো হয়। আমার গুরু বলেন, সাবালকত্ব চাই। তোমার অন্তরে যদি পাক না ধরে, তবে বিধি মানো। মেনে মেনে পাকা হও।'

আশ্চর্য লাগে শুনতে। এই নীতির মধ্যে উদারতা শুধু নয়, একটা শক্তি আছে যেন। নিয়ম নীতির আচার আচরণ তো কেবল মাত্র অভ্যাস! তোমার প্রার্থনা কি কেবল মাত্র অভ্যাস? তোমার ঈশ্বর কি মাত্র তোমারই ঘড়ি ধরা সময়ের প্রার্থনা শোনেন? তিনি কি সকল সময়ে, সর্বচরাচরে নেই? তোমার সম্পর্ক কি শুধু মাত্র ভয় ও ভক্তির? প্রেম নেই? যদি থাকে, তবে সময় কিসের?

অথচ ভারতের ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে দেশ বিদেশের পাতায় রচন বচনে ভরে যায়। তার এই উদার মুক্ত আনন্দলোকের সংবাদ কেউ রাখে না। আমি দেখছি,, এ তো শুধু ধর্ম নয়, মনন। আমি তো ঈশ্বর খুঁজি না, আমি তো মন্ত্র-তন্ত্রের গলি-ঘুঁজি-রাজপথ কিছুই চিনি না, কিছুই জানি না। তবু যেন মনে হয়, ছোটবউদির ধর্মের মধ্যে কোথায় মানবিক জগতের শ্রেষ্ঠ অনুশীলন আছে।

বললাম, 'আপনার গুরুদেবকে আমি চিনি ছোটবউদি।'

ছোটবউদি বললেন, 'তাঁকে সবাই চেনে। সবাই দেখতে পায়। ভারী সোজা সরল মানুষ যে। যাও না, মন্দিরের পিছনে গিয়ে দ্যাখ, হয় তো সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে বসে সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছেন। জটা আছে, গেরুয়া পরেন, আবার সিগারেটও খান, সে আবার কী! এই দেখে তো সেজদিদের ভারী অভক্তি। কিন্তু উনি যে কেন গুরুদেব, ওঁর কাছে না বসলে, কথা না শুনলে বোঝা যায় না।'

পরমুহূর্তেই ছোটবউদিদের যেন সংবিত ফিরল। বললেন, 'রেণু কোথায় গেল?'

বললাম, 'কাপড় মেলে দিতে গেলেন যে?'

'বস, একটু দেখে আসি।'

কিন্তু আমার বিস্মিত কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। ছোটবউদির গুরুদেবের কথাগুলি মনে পড়তে লাগল। ধর্ম আশ্রম, ইত্যাদির চিরাচরিত ধারণার সঙ্গে কোথায় যেন সর্বেশ্বরদেব ও তাঁর কথার অনেক অমিল। অলৌকিকতা দূরের কথা, অধ্যাত্মের নির্দেশও যেন সহজে চোখে পড়তে চায় না। ইচ্ছে হল, উঠে গিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

সেই মুহূর্তেই শিবিদির ডাক, 'ভেতরে এসে বোস, বাইরে আর কতক্ষণ থাকবি।'

উঠে ঘরের মধ্যে গেলাম। কড়ার গরম তেলে তখন পটলীর আর্তনাদ, স্টোভের গর্জন। শ্বেতপাথরের মেঝেয় সকলের আলাদা বিছানা গোটানো। সেজদি তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিতে এলেন। পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেয় আমি বসে পড়লাম।

'মাটিতে বসলে কেন?'

'মাটি নয় সেজদি, পাথর। এই ভালো।'

ছোটবউদি এসে ঢুকলেন। শিবিদি বললেন, 'রেণু কোথায় গেল?'

'বসে আছে বাইরে। ডাকলাম, বললে পরে আসছে।'

দেখছি, সবাই আপনার মতো করে আপনি আপনি ব্যস্ত। কেবল আমিই ভুলে বসে আছি যেন, কোথায় এসেছি, কেন এসেছি। এখন যেন নিজেকেই বিশ্বাস করানো দায়, কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলার স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ার লোভ আমার নেই।

চা ও পটলী পর্ব শেষ করে যখন যাবার জন্যে পা বাড়ালাম, শিবিদি কথা আদায় করে ছাড়লেন, দিনান্তে একবার তাঁদের দেখা দিতে বাধ্য থাকব। তথাস্তু। এটাকে এখন আমার নির্জন-সৈকতের নিয়তি বলেই মেনে নিতে হচ্ছে। কথা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসে রাস্তা দিয়ে যাবার ইচ্ছে হল না। আশ্রমকে প্রদক্ষিণ করে, সমুদ্রের ধারে পা বাড়ালাম। আজ যেন বাতাসের সকল দুয়ার খুলে গেছে। আলোর সকল রন্ধ্র মুক্ত। স্ফটিক রঙ সমুদ্র ফেনিলোচ্ছল হাসিতে ফুলছে। স্বর্গদ্বারের লোকালয়ের রাস্তা দিয়ে তো একবার এসেছি। আর তা নতুন করে দেখতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু এই অশেষ দিগন্তহীন কখনো চোখে ক্লান্তি আনে না। ক্ষণে ক্ষণে তার বিচিত্র রঙে মনের মধ্যে নানান্ কল্পনা ও প্রতীকের খেলা জেগে ওঠে। একমাত্র এমনি অশেষের দিকে তাকিয়েই যে, নিজের সকল অন্ধকারের দরজা খুলে, সব কিছু ঘেঁটে দেখতে সাহস হয়। লজ্জা ঘৃণা ভয়, কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

কয়েক মুহূর্ত একটি উঁচু বালুর ঢিপির ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে, বাঁক নিয়ে নামতে গিয়ে দেখি, রেণু বসে আছে নীচে। ওর আঁচল বাতাসে লুটিয়ে পড়েছে বালিতে। চুল উড়ছে। দৃষ্টি দূর সমুদ্রে। টের পায় নি, আমি এত কাছে।

মনে পড়ল, আমাকে বসিয়ে রেখে, কাপড় মেলে দিতে গিয়ে আর ফেরে নি। এর পরে আর নতুন করে ওকে অকারণ ডাকব না। হয় তো ইতিমধ্যেই ওর মনের শান্তি অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। আমি পিছন ফিরলাম। জানি এর মধ্যে একটা মিথ্যে লুকোচুরি আছে। এমনি করে পিছন ফিরে পালিয়ে যাবার আমার কোনোদিক থেকেই কোনো কারণ ঘটে নি। কিন্তু কখনো কখনো স্বস্তি পাবার জন্যেই এমনি একটু লুকোচুরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পিছন ফিরে পা বাড়াতেই, প্রায় চোরদায়ে ধরা পড়ার মতোই শুনলাম, 'চলে যাচ্ছেন যে?'

দাঁড়াতে হল। ফিরে বললাম, 'ভাবছি রাস্তা দিয়েই যাব।'

রেণু এক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি নিশ্চয় সমুদ্রের ধার দিয়েই যাবেন। তাই আর ঘরের ভিড়ে যাই নি। কিন্তু দেখলাম, আপনি আসতে আসতে পিছন ফিরলেন।'

সহজভাবেই হেসে বললাম, 'আপনার ধ্যান ভাঙাতে চাই নি।'

রেণু বলল, 'ধ্যান কিসের। আমি বরং আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

বলে রেণু একবার চোখ নামাল। আবার তাকাল। বলল, 'আপনার ওপর আমাদের সকলেরই অত্যাচারের মাত্রাটা বড় বেড়ে গেছে। তারপরে আজ আপনার পরিচয়টাও জানা গেল। কেমন যেন অবাকই লাগছে আপনার কথা ভেবে।'

দেখলাম সত্যি সত্যি রেণুর চোখে কৌতূহল ও বিস্ময়ের ঝিকিমিকি। তাতে ওর মুখের অন্ধকার কাটে নি। কিন্তু একটা বিষণ্ণ হাসি আছে। এ হাসিটাকে সামাজিকতার লক্ষণও বলা যায়।

আমি তাড়াতাড়ি হেসে উঠে বললাম, 'দেখবেন দোহাই, এর পরে ক্ষমা-টমা চাইবেন না যেন। তা হলে আরো বিব্রত হয়ে পড়ব। অবাকই বা কেন হচ্ছেন, বুঝতে পারছি নে।'

রেণু নিচু হয়ে বালি ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, 'তা জানি না। বোধ হয় আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি নে বলে।'

কথার সুরে বোঝা গেল। রেণুর কাছে প্রায় রহস্যময় হয়ে উঠেছি। বললাম, 'এর চেয়ে আপনার ক্ষমা চাওয়াই ভালো, কিন্তু আমাকে মিছামিছি খুব জটিল কিছু ভাববেন না।'

রেণু হেসে উঠল। আমিও হাসলাম। আবার বললাম, 'আপনার পটলী ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমার মুখে এখনো তারই স্বাদ।'

'ইচ্ছে করছে না যেতে।'

'বাতাস আছে বটে, তবু রোদটা বেশ কড়া। বরং তাহলে একটু ছায়া খুঁজে বসুন গিয়ে কোথাও।'

রেণু বলে উঠল, 'ছায়ায় বসতে গেলে, সমুদ্রকে কাছে পাওয়া যায় না।'

আমি জবাব দেব না ভেবেই চুপ করে রইলাম। তবু আমার ভিতর থেকে যেন কেউ কথা বলে উঠল, 'একটু দূরে থেকে দেখলেও সমুদ্রকে একরূপেই পাবেন। ওকে যেন চলমান জীবনের মতোই মনে হয়। কিন্তু বেলা বাড়াটা কিছুক্ষণের, এ রোদটাও তাই, এটা সত্যি, তবু পরিহার করলে যদি ভালো হয়, পরিহারই করুন না। রৌদ্রের সব রূপ তো স্বাস্থ্যকর নয়। অস্বাস্থ্যকরও বটে।'

রেণু চকিতে একবার আমার চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য ঠোঁট দুটি টিপে শক্ত করে রইল। তারপরে হঠাৎ বলে উঠল, 'শহরের ধারে বসে বলছেন। যদি মরুভূমিতে থাকতেন, তা হলে কোথায় ছায়া খুঁজতেন?'

চকিত মুহূর্তের জন্য অবাক না হয়ে পারলাম না। রেণু যে এমন করে আমার কথার ইঙ্গিত ধরতে পারবে, ধারণা করতে পারি নি। দেখলাম, ওর অপ্রসন্ন মুখে, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। শক্ত মুখে, চুল ঝাপটা খাচ্ছে বাতাসে। বললাম, 'মরুভূমিতে যেখানে ছায়া আছে, সে জায়গাটি খুঁজতাম। খুঁজে বের করতাম। নইলে মরুবাসীরা বাঁচে কেমন করে?'

রেণু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ফিরে তাকাল না। নীচু উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'জানি না আপনি কী শুনেছেন আমার সম্পর্কে। সব যদি জানতেন, তা হলে আর এসব—এসব...'

কথা শেষ না করেই রেণু মুখ ফিরিয়ে দ্রুত আশ্রমের দিকে চলে গেল। এক মুহূর্ত দিশেহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মুখ তুলে প্রায় ডাকতে গিয়েও থমকে গেলাম। না, না থাক। অনধিকার চর্চা করেছি কিনা বুঝতে পারছি নে। কিন্তু একটা কষ্ট, একটা গ্লানি আমার বিব্রত হাসির মুখে চেপে বসল। রেণুকে আঘাত করে বসলাম! অথচ জানি, ভুল কিছুই বলি নি। শান্ত ছায়া নিবিড়তায় সব আগুন নেভাবার আরোগ্যই তো ওর দরকার।

সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। হাসছে, ফুলে ফুলে উঠে, ফেটে পড়ে ফেনা ছড়িয়ে অট্টহাসি হাসছে যেন আমারই মুখের ওপর। যেন বলছে, এ তো তোমার ঘেরাটোপ নয়। মনের ভিতর থেকে যা বাইরে উপছে পড়ছে, তা পড়ুক। এখানে কোনো ত্রুটি নেই, ভুল নেই।

সত্যি, পিছনের ডাকে কেন ফিরি। রেণু ওর নিজের সত্যে প্রকাশ পাক। আমার তাতে কোনো দায়ভাগ নেই। আমি আমার সত্যের আনন্দে কেন চলি না! আমার কেন দ্বিধা, আমার আবার দ্বন্দ্ব কিসের!

আমার কোন দায়ভাগ নেই। রেণুর ব্যথার দাগ শুধু আমার হাসিতে একটু মাখানো থাকবে। সেইটুকু আমার নির্জন-সৈকতের পুঁজি।

হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

বিকেলে সমুদ্রের ধারে যাব বলে নামতে গিয়ে দেখলাম, মহিমবাবু আছেন। কথা বলছেন আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। হোটেলের যাত্রী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু

ভদ্রলোকের বসার ভঙ্গিটা অন্যরকম। পা ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে প্রায় আধশোয়া হয়ে বসেছেন। দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। মহিমবাবুরই সমবয়সী হবেন। মুখটি মস্ত বড়। স্ফীত মাংসল মুখখানি তামাটে, গাল দুটি লাল। শৌখীন ধুতির কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির হীরে বসানো বোতামের ঘর খোলা। ভিতরে দেখা যাচ্ছে রক্তাক্ত বুক। ভুল যদি না দেখে থাকি, তা হলে ভদ্রলোকের চোখ দুটিও রক্তিম। ঘরের মধ্যে যেন একটু আতরের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। এবং সব থেকে আশ্চর্য, ওঁর একটি হাত মহিমবাবুর চেয়ারের হাতলে এলিয়ে আছে। সেটি খুব সহজ ব্যাপার নয়।

আমার পায়ের শব্দে ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। এক মুহূর্ত দেখে, মহিমবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'এঁর কথাই তো বউমা বলছিলেন?'

মহিমবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এস হে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম সিদ্ধকাম চক্রবর্তী—।'

মহিমবাবুকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'উঁহু, ওইটি তুমি ভুল কর। সিদ্ধকাম নয়, শুদ্ধকাম।'

মহিমবাবু বাধা দিলেন, 'আঃ! দেখছ ছেলেমানুষ। ওকে কেন আবার ওসব বলছ?'

'যা সত্যি তাই বলছি। শুদ্ধকাম নামটা যদি এফিডেভিট করিয়ে নিই, তখন তো তোমাকে তাই বলতে হবে। আর তুমি ছেলেমানুষ বললেই তো হবে না। ছেলেমানুষ কাকে বলে? এই তোমাকে, তোমার মত লোককে আসলে ছেলেমানুষ বলতে হয়। এই একটি নোঙর আটকে বসে আছ, কোথাও নড়াচড়ার নামটি নেই। আরে এটা কি একটা ম্যাচিওর লোকের জীবন হতে পারে কখনো? তুমি কি বল হে ভায়া?'

জিজ্ঞাসাটা আমাকেই। কী জবাব দেব বুঝতে পারছি না। আপাততঃ আমাকে ধরেই নিতে হচ্ছে, ওঁর নাম সিদ্ধকাম চক্রবর্তী। কিন্তু ইনি কে, কী পরিচয়, এবং প্রথম দর্শনেই যে 'বউমা'-র কাছে আমার কথা শুনেছেন, তিনিই বা কে, কিছুই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি নে। বিব্রত হয়ে মহিমবাবুর দিকেই তাকালাম।

মহিমবাবু বললেন, 'আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে। আগে ওকে তোমার পরিচয়টা দিতে দাও।'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'সেটাও আমিই দিয়ে দিচ্ছি। নামটা তো শুনেছই। বাস করি রম্ভায়, পেশা ব্যবসা, নেশা—।'

আবার বাধা দিলেন মহিমবাবু, 'যাক, আর নেশার কথা বলতে হবে না। ওটা এখন ক্ষ্যামা দাও বাপু। যা খাচ্ছ, তারই ঢেকুর তুলছ।'

দেখলাম মহিমবাবুর মত নিটুট গম্ভীর মানুষও রীতিমত বিব্রত অসহায় হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিরক্ত নন, বরং ওঁর দৃষ্টিতে এবং গলার স্বরে একটি স্নেহের সন্ধান পাওয়া যায়।

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'তা আমিষ খেয়ে কেউ কি আর নিরামিষের ঢেকুর তোলে? কথায় বলে, কাঠ খেলে আঙরা...'

কথা শেষ না করেই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ওসব যাক। এস ভায়া, বস। তোমার কথা শুনলাম মহিমের বউমার কাছে, তুমি লেখ-টেখ। মহিম ওসব কিছু জানে না, বউমা বই-টই পড়ে, তাই জানে। তা এই হাজা-পজার মরশুমেও যখন পুরী এসেছ, তখন বুঝতেই হবে তোমার মাথায় একটু পোকা আছে। শুনে ভাবলাম, যাক, তবু একটা মানুষ পাওয়া যাবে। এস এস, বস।'

আমার দৃষ্টি মহিমবাবুর দিকেই। বললেন, 'বস।'

সিদ্ধকামবাবুর পাশের চেয়ারেই বসলাম। বসেই গন্ধ টের পেলাম, উনি মদ্যপান করেছেন। অবশ্য ওঁর কোঁচা লুটিয়ে এলিয়ে বসার ভঙ্গি, রক্তাভ চোখ এবং গাল দেখেই ঈষৎ সন্দেহ হয়েছিল। এখন নিশ্চিত হওয়া গেল। এবং উনি নিজেই বলে উঠলেন, 'বুঝতেই পারছ ভায়া, কিঞ্চিৎ পান করেছি।'

মহিমবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'সে আর তোমাকে বলতে হবে না। ও নাকে কাপড় দিয়ে নেই।'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'তবু বলা দরকার, নইলে মনে মনে সাত সতেরো ভেবে বসে থাকবে। তা ভায়া, তোমারও একটু-আধটু চলে নাকি?'

মহিমবাবু স্নেহের সুরে ধমক দিলেন, 'আঃ, কী যে বল।'

সিদ্ধকামবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'আমার কাছে ওসব লজ্জা-টজ্জা নেই। পান করবার জিনিস পান করবে, তাতে এত ধমক-ধামকের কী আছে।'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে না, আমার চলে না।'

সিদ্ধকামবাবু হতাশ ভঙ্গিতে হাত উল্টে বললেন, 'ভগবান তোমাকে বঞ্চিত করেছেন। এই উড়িষ্যায় দেখেছি, মদ খেয়েছি টের পেলেই অনেকে দৌড়তে আরম্ভ করে। মাতালকে যে স্পর্শও করতে নেই। মাতাল তো দূরের কথা, একবার গাঁয়ে এক ঠাকুর মশাইকে দেখলাম, রাস্তা থাকতেও, কেবলই বাদাড়ে নেমে এদিক ওদিক দিয়ে এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? ভাবলাম, রাস্তায় বড় পাইথন-টাইথন শুয়ে আছে বোধহয়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। দিব্যি ভালো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে নানান্ গাছ, তার ছায়া পড়েছে। তবে ঠাকুরমশাইটি এ রকম করছেন কেন? পথে কোনো নীচ জাতীয় লোক-টোকও নেই যে, ছুঁয়ে ফেলার ভয় অছে। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে হল, 'ঠাকুরের হল কী। রাস্তায় কিছু আছে নাকি?' ঠাকুর ঘাড় নেড়ে, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন। অঙ্গুলি সংকেত লক্ষ্য করে দেখলাম, কয়েকটি খেজুর গাছ। জিজ্ঞেস করলাম, 'তাতে কী হয়েছে?' বললেন, 'বাবু ও গাছের ছায়া মাড়াব না, জাত যাবে।' কেন? চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করতে ঠাকুর জবাব দিলেন, 'ওর রস গেঁজিয়ে গেলে মদ হয়।' বোঝ একবার ব্যাপারটা!

আমার পক্ষে হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠল। মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'সিধু, কেন মিছিমিছি এ গল্পগুলো বানাচ্ছ?'

সিদ্ধকামবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি গল্প বানাচ্ছি? তুমি বলতে পারলে? জানো, আমার ভেতরে বাইরে কোনো মিথ্যে নেই? ওসব সামাজিক ভদ্রলোকের জীবন আমি অনেককাল কাটিয়ে ফেলেছি। কেন, এ রকম ব্যাপার তুমি জানো না?'

মহিমবাবু বললেন, 'তুমি যে রকম বলছ, সে রকম নয়। তবে এ দেশের অনেক সেকেলে বামুনকে দেখেছি, তারা খেজুর গাছ স্পর্শও করে না। কারণ ও গাছের রসে মদ হয়।'

সিদ্ধকামবাবু আমার দিকে ফিরে বলে উঠলেন, 'ওই! ওই শুনেছ? খেজুর গাছ ছোঁয় না। যারা গাছ ছোঁয় না, তারা যে অনেকে ছায়াও মাড়ায় না, এ তো জানা কথা। দিব্যি করে বলছি, আমি নিজের চোখে এ ঘটনা দেখেছি।'

প্রথম হেসেছিলাম মিথ্যে ভেবে। এখন সত্যি জেনে, আর একবার অবাক-হাসি সামলানো আমার দায় হল। মহিমবাবুর কথা থেকেই বোঝা গেল, সিদ্ধকামবাবু নিতান্তই গল্পটা তৈরি করেন নি। তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতারই কাহিনী। এ সেই ভারতবর্ষের নিষ্ঠুর রীতিরই অবিকল আর এক সংস্করণ। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্পর্শ

করা দূরের কথা, ছায়াও মাড়াবে না। জানা ছিল না, উড়িষ্যায় গাছেরও জাতিভেদ আছে, এবং খেজুর গাছ একেবারে খাঁটি শূদ্দুর! হায় খেজুর গাছের জিরেন কাঠের রস! সাঁজো রস! উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা তোমার রসের মর্ম বুঝল না। তবু ভালো, বাংলার সেকালের ব্রাহ্মণদের এ বাতিক ছিল না। রসের ঘরে তাঁদের কারবার বেশ তেজী।

সিদ্ধকামবাবু আবার বললেন, 'তবে আমি ছাড়বার পাত্র নই। ঠাকুরকে ছাড়লাম না, চেপে ধরলাম। বললাম, 'ঠাকুরমশাই, খেজুর গাছের ছায়া না হয় না মাড়ালেন, ওতে মদ তৈরি হয়, কিন্তু তণ্ডুলো? অন্ন কি তবে ত্যাগ করবেন? আসল মদ যে ওতেই তৈরি হয়!' ঠাকুরমশাই হুংকার দিলেন, 'মিছা কথা।' হাতজোড় করে বললাম, 'মাইরি ঠাকুরমশাই, বিশ্বাস করুন।' ব্যস্, আর যায় কোথায়, বাঙালীর চোদ্দ পুরুষ নিয়ে ঠাকুর আরম্ভ করলেন, 'তোমরা বাঙালীরা ম্লেচ্ছ, কেরেস্তান, তোমরা হিন্দু ধর্ম মানো না, তোমরা কুকড়া (মুরগী) খাও, তুমি তো এসব বলবেই।' ইস্! বেহ্মতেজ যদি থাকত, তো সেদিনই নিকেশ হয়ে যেতাম।'

আমি হাসতে হাসতে মহিমবাবুর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। মহিমবাবুর যদিও ভ্রূ কোঁচকানো, তবু তাঁর শুভ্র বিশাল গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে যে হাসির ঝিলিক হানছে, তা দেখতে পেলাম। বললেন, 'আচ্ছা নাও হয়েছে, ওসব রসের কেচ্ছা রাখ তো, অন্য কথা বল।'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'বললাম এই কারণে, মদের ব্যাপারে ভায়ার আবার তেমন ছুঁৎমার্গিতা নেই তো? আমার পাশে বসে আমাকে ঘেন্না করবে, তা হয় না।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না, সে কি বলছেন! ও সম্পর্কে আমার কোনো কুসংস্কার নেই।'

'বাঁচালে ভায়া!'

আমি একবার চকিতে মহিমবাবুর মুখ দেখে নিলাম। আমার কুসংস্কার না থাকায় আবার ওঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটাও জানা দরকার। প্রতিক্রিয়া খারাপ নয়। এটা তো বোঝা যাচ্ছে, সিদ্ধকামবাবু ওঁর পরিচিত এবং ওঁর পাশেই বসে আছেন।

দেখলাম, সিদ্ধকামবাবু যেন হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। খানিকটা যেন আপন মনেই বললেন, 'সংস্কারটা একদিক থেকে খারাপ, আর একদিক থেকে বোধ হয় তার একটা দামও আছে।'

বলতে বলতে সিদ্ধকামবাবুর মুখখানি যেন আরো রক্তাভ হয়ে উঠল। দৃষ্টি হারিয়ে গেল দূর দিগন্তে।

মহিমবাবু আমাকে বললেন, 'সিদ্ধকাম আমার বন্ধু—।'

কথা শেষ হল না। সিদ্ধকামবাবু তাঁর স্তব্ধ চেতনা থেকে ফিরে এলেন হঠাৎ। বললেন, 'ছিলাম, এখন আর তোমার বন্ধু নই, সেটাও বলে দাও। যখন রাজনীতি-টাজনীতি করেছি, জেল খেটেছি একসঙ্গে, তখন তোমার বন্ধু ছিলাম। এখন তোমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ, আমি তো যাকে বলে, উঞ্ছ দি গ্রেট! নেহাত দয়া করেই বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছ।'

মনে মনে চমকে উঠে, নতুন বিস্ময় নিয়ে সিদ্ধকামবাবুর দিকে তাকালাম। ওঁকে দেখে, একবারও রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিমবাবুর সহযোদ্ধা বলে মনে হয় নি। বিলাস ও ঐশ্বর্যের যে একটা গাঢ় অন্ধকার দিক আছে, সিদ্ধকামবাবুর সর্বাঙ্গে আমি সেই অন্ধকারেরই ছায়া দেখছি। উনি যে একদার রাজবন্দী, এ কথা একবারও মনে আসে নি।

মহিমবাবু বললেন, 'আমি দয়া করে তোমাকে বন্ধু বলে পরিচয় দেব?'

'তা ছাড়া আর কী বল। আমি একটা ভিন্ন জগতের লোক, তোমার সঙ্গে কোনো মিল নেই। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবু কেন সময়ে অসময়ে পুরীতে তোমার কাছে ছুটে আসি, তার জবাব হল, থাকতে পারি না বলে। বলেছি তো, আমি হলাম শুদ্ধকাম।'

মহিমবাবু মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'তা হলে তোমার কথা তুমিই বল।' স্পষ্টতই মহিমবাবু অভিমান করেছেন। এ আর এক বিচিত্র দৃশ্য! দেখলাম দুই প্রৌঢ় প্রায় ছেলেমানুষের মতো মান অভিমান করছেন। মহিমবাবুর প্রকাণ্ড মুখে, বাঘের মতো গোঁফ জোড়ায়, বন্ধুর প্রতি অভিমানে যে কী অপূর্বই দেখাচ্ছে!

আমিই কথা বললাম, 'আপনি যে একজন পুরনো রাজনৈতিক, জেলখাটা লোক, তা বুঝতে পারি নি।'

সিদ্ধকামবাবু মহিমবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে, এই শ্রীমানের পাল্লায় পড়ে। এখন আবার আমার ওপর রাগ করছে। আরে বাবা, যা সত্যি আমি তো তাই বলছি। তোমার সঙ্গে এখন আর আমার কোথায় মিল আছে? কোথাও না। বেশী এলে-টেলে বিরক্ত হবে, তাও জানি, তাই আসাই তো ছেড়ে দিয়েছি।'

মহিমবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'যা বলছিলে তাই বল না।'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'বুঝলে, তোমাদের এই মহিমভায়া, কলেজ থেকে আমাকে ভাগিয়েছে, ভাগিয়ে ওই রাজনীতিওয়ালাদের দলে টেনে নিয়ে গেছে। কী বলব তোমাকে, সোনার খাঁচায় যে নানা রঙের দিনগুলো কাটাবার কথা ছিল, সেগুলো ইংরেজের লোহার খাঁচাতেই কেটে গেছে। জেল থেকে যখন বেরুলাম, তখন জীবনের রঙ রস সব বেপাত্তা। চারদিকে হাতড়ে এমন স্বজন সুহৃদ পেলাম না যে একটু বিয়ে-টিয়ের কথা বলে। নিজের সে সাহস ছিল না। রাজনীতির সাধ তখন সরে গেছে। জিজ্ঞেস করতে পারো, কোন্ স্বার্থ চিন্তা নিয়ে তা হলে ওসব করতে গিয়েছিলাম। কোনো চিন্তা-টিন্তা যদি থাকত, তা হলে তো বাঁচাই যেত। সম্বল তো সামান্য, দেশপ্রেম। জেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, তার মূল্য কানাকড়িও নেই। সিদ্ধকাম চক্রবর্তীরা সব ঢুঢুরাম চক্কোত্তি, টামাক ডুডুর জন্যে তখন রাজনীতির আলাদা খেল্ জমেছে। দেশবাসীরও আমাদের কথা মনে রাখবার কোনো কারণ নেই। কারণ ইতিহাসে জায়গা পাবার মত প্রতিভা আমাদের ছিল না। মানুষ মুখে যা-ই বলুক, একটা কিছু প্রতিদান সে চায়। কিন্তু দেখলাম, আমরা সেই 'আস্লি পিপ্ল'-এর মধ্যে পড়ে গেছি, না ঘরকা না ঘাটকা, ধোবী কা গাধা। আমার তো তবু একরকম, মহিম যে আবার এক হৃদয়ের কারবার করে রেখে গিয়েছিল—।'

মহিমবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আঃ, মুখ খুললে তোমার আর মনে থাকে না, কাকে কী বলছ। এ আমাদের থেকে অনেক ছোট, ছেলেমানুষ। তা ছাড়া—'

কথা অসমাপ্ত রাখলেন মহিমবাবু। সিদ্ধকামবাবু থমকে গেলেন। বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলাম, মহিমবাবুর মুখে একটি অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। তাঁর দৃষ্টি টেবিলের ওপর।

সিদ্ধকামবাবু মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। মহিমবাবু মুখ তুলে বন্ধুর দিকে একবার তাকালেন। মাঝখান থেকে অস্বস্তিবোধ হতে লাগল আমার। হয় তো সিদ্ধকামবাবু যে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তার কিছু অংশ প্রণববাবুর মুখ থেকে শুনেছি। তাতে এইটুকু জানা আছে, এই নোঙর-ঘরের বাইরে, মহিমবাবুর যেখানে ঘর গেরস্থালি আছে, সেখানকার পুত্র কন্যারা কেউই তাঁর নিজের সন্তান নয়। ছেলেবেলা থেকে তাদের মানুষ করেছেন, সংসারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ সূত্র ধরে এটুকুও বুঝতে পেরেছি, এই ছেলেমেয়েদের যিনি মা, তাঁর

কাছেই মহিমবাবুর অঙ্গীকার ছিল। তাঁরই মুখ চেয়ে, এই আজীবন সংসারীর ছদ্মবেশ মহিমবাবু নিয়েছেন। এখন সিদ্ধকামবাবুর অর্ধেক উচ্চারিত কথা শুনে ধারণা করতে ইচ্ছে করে, হয় তো সেই মহিলার কাছেই প্রথম যৌবনে মহিমবাবু তাঁর হৃদয়কে বন্ধক রেখেছিলেন। ওঁর বর্তমান জীবনটা হয় তো সেই বন্ধকী তমসুকের হিসাব নিকাশের পরিণাম।...কিংবা এসব কিছুই নয়, আর কিছু, অন্য কিছু আছে। এই অস্পষ্টতাটুকুই থাকুক, একটু আবছায়াই তো ভালো। আমি তো এটুকু বুঝেছি, কোনো গাঢ় বেদনা থেকে উৎসারিত যে এক আশ্চর্য প্রসন্ন নিবিড়তা আসে, মহিমবাবুর মুখে তারই ছায়া। আমি তার প্রত্যক্ষ কিছুই জানতে চাই না।

এই দুই বন্ধুর মাঝখান থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এবার উঠে যাব ভাবলাম। তার আগেই সিদ্ধকামবাবু বলে উঠলেন, 'তা ঠিক বলেছ, এভাবে হঠাৎ কিছু বলা যায় না। যাই হোক, এটুকু শুনে রাখ ভায়া, জেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম, মহিমের বিরাট কাজ বিরাট দায়িত্ব পড়ে আছে, সেখান থেকে ওর নড়বার উপায় নেই। সত্যি বলতে কি, জেল থেকে বেরিয়ে ওর ওই ঠাসবুনুনি জীবনটা দেখে, ওকে হিংসেই করেছিলাম।'

মহিমবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি যখন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ওর কাছে একেবারে জীবনবৃত্তান্তই বলতে শুরু করেছ, তখন সবই বল তা হলে। আমাকে সাহায্য করবার জন্যেই তুমি মাড়োয়ারী ফার্মে উদয়াস্ত চাকরি নিয়েছিলে।'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'সে তো তুমিও নিয়েছিলে। আর তোমারও নিজের পেট চালাবার জন্যে নয়, বিরাট এক সংসারের দায়িত্ব তোমার মাথায়। তোমার অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না। কাজটা নিতেই হয়েছিল।'

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহিমবাবু জেল থেকে বেরিয়ে যে-পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তার মধ্যে সিদ্ধকামবাবুরও কিছু অবদান আছে। সত্যি, না ভেবে পারি নে, কে সেই ভাগ্যবতী মহিলা, যিনি তাঁর সন্তান সন্ততিসহ অসহায় জীবন নিয়ে, এই দুটি পুরুষের সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি কি বিধবা ছিলেন? না কি তাঁর স্বামী কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে অসুস্থ ছিলেন? কিংবা স্ত্রী ত্যাগ করেছিলেন?

সিদ্ধকামবাবু আবার বললেন, 'তা সে যাক গে, বুঝলে ভায়া, সে আবার আর এক গেরো। দু-এক বছর বাদে দেখলাম, মহিমের আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমি আবার মনের দিক থেকে যে বেকার সেই বেকার। তবে দেখ ভায়া, সত্যি সত্যি যদি লেখক হয়ে থাক, তা হলে নিশ্চয়ই মানবে, প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে একটা কথা আছে। আমার তখন বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বয়স। নিজের ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখি, আগুনের থেকে ছাই বেশী, তবু জ্বলুনি যায় না, কারণ মনের হাপরে দিবানিশি টান পড়ছে। কথাটা বুঝলে তো হে ভায়া? বাসনা! বাসনা যাকে বলে! রক্তে মাংসে তার দৌরাত্ম্য। তখন থেকেই মনে মনে নাম নিলাম, সিদ্ধকাম নয়, শুদ্ধকাম। প্রচুর টাকা চাই, ঐশ্বর্য চাই, ভোগ চাই। এক রাজার সঙ্গে আলাপ হল। রাজাটি ছাঁ-পোষা, তবে অনেক বড় বড় রাজাদের সঙ্গে ভাব আছে। তার সঙ্গেই উড়িষ্যায় এসেছিলাম। রম্ভায় গিয়ে আর জায়গাটা ছাড়তে পারি নি। দেখলাম, তান্ত্রিকের পক্ষে যেমন মহাশ্মশানই হল সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, রম্ভাও আমার মতো ভোগীর পক্ষে সেই রকম জায়গা। সেও এক মহাশ্মশান, ভোগীর শ্মশান। জমপেশ হয়ে বসে গেলাম সেখানেই। আর রম্ভা, বুঝলে ভায়া ভারতবর্ষের অন্যতম বিরাট শস্যের বাজার। আড়তদারী ধরিয়ে দিলে একজন, চালানদারের খাতায় নাম লেখালাম। আমি হলাম এস, চক্রবারটি, পূর্ব আর পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলের বিগ গ্রেন ম্যাগনেট।'

আমি কৌতূহলিত হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'জায়গাটা উড়িষ্যার কোথায় বলুন তো?'

সিদ্ধকামবাবু উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, 'উড়িষ্যার স্বর্গে হে। আমি ও জায়গাটার নাম দিয়েছি, হেভেন অব ওড়িষ্যা। চিল্কা হ্রদ যেখানে শেষ হয়েছে, তার হাঁসুলী বাঁকে রম্ভা। একদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা, আর একদিকে হ্রদ। ভায়া, হ্রদের জলে পূর্বঘাট পাহাড়ের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে ওখানে। ওদিকে প্রকৃতি দেখছেন তাঁর ছায়া, এদিকে রম্ভাতে আমিও আমার ভেতরের ছায়াটা দেখতে পেলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ স্টেশনে নামতে হয়?'

'কেন, রম্ভা স্টেশনেই নামবে। চিল্কা, কালিকোট্টা ছাড়িয়ে গেলে রম্ভা পাবে। জায়গাটা হল উড়িষ্যা আর অন্ধ্রের সীমানায়। বুঝতেই পারছ, জায়গাটার অবস্থাও আমার মতো, না ঘরকা না ঘাটকা। কেবলমাত্র সীমানা বাড়াবার জন্যে, কখনো অন্ধ্র বলেছে ওটা আমাদের, কখনো উড়িষ্যা বলেছে আমাদের। সে কখনো অন্ধ্রের সঙ্গে ঘর করছে, কখনো উড়িষ্যার সঙ্গে। এই যার অবস্থা, তার ওপর কারুরই তেমন মায়া মমতা নেই, বিশ্বাসও নেই। দুয়ের মাঝখানে, রম্ভার চরিত্রটা তাই একটু বাঁকা বাঁকা। কে কখন কোন্‌দিকে কটাক্ষ করছে ঠিক বোঝবার উপায় নেই। আর দু জায়গা থেকেই হেনস্থা হয়ে রম্ভাও ভাবে, আমার কাঁচকলাটি বয়ে গেছে। আমি পুরো না নেব ওড়িয়া সংস্কৃতি, না পুরো নেব তেলেগু সংস্কৃতি। আমি দুজনকেই মানব, আবার দুজনকেই মানব না। আমি ওড়িয়া ভাষাও শুধু বলব না, তেলেগু ভাষাও শুধু বলব না, আমি দুয়ে মিশিয়ে কথা বলব। বুঝলে ভায়া, সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। পুরীর মানুষকেই রম্ভার লোকের কথা কান খাড়া করে শুনতে হয়, নইলে সব কথা বুঝতে পারে না। পুরুলিয়ার খাস বাসিন্দাদের মত। অতএব এদের চরিত্রও একটু বেয়াড়া ধরনের। সীমান্ত-লোকদের যা হয়ে থাকে। তা সে একই রাজ্যের দুই প্রদেশ হলেও, উপায় নেই।'

কে বলবে, সিদ্ধকামবাবু নেশার ঝোঁকে কথা বলছেন। মনে হল, একটা গোটা অঞ্চলের সামাজিক চরিত্র বিপুলভাবে বর্ণনা করে চলেছেন। তারই সঙ্গে প্রাকৃতিক। পূর্বঘাট পর্বতমালা তার প্রতিবিম্ব দেখে চিল্কা হ্রদের জলে। শুধু এইটুকু শুনেই আমার ঘরবিবাগী মন কৌতূহলের সীমানা দৌড়ে পার হয়েছে। পথ চলার মদে আমার চুমুক পড়ে গিয়েছে, রম্ভার হাতছানি আমি দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'শহরটা কেমন?'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'বাংলা দেশের যে কোনো দূর গঞ্জ বাজারের মতোই। কিন্তু তোমাকে ওসব ভাবতে বলছে কে? আমার শেষ কথাটা তো শোন নি হে। আমার এ-যাত্রা পুরী আসাটা সার্থক করা যাক। আমি আগামীকাল ফিরে যাব, তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি। তুমি আমার সঙ্গে চল।'

মনটা নেচে উঠল। নতুন দেশ, নতুন মানুষ। তার সঙ্গে আমার এই চোখের দুয়ারের অশেষ যাবে হ্রদের দেশে। আমার নির্জন-সৈকতে ছুটে আসার সে আর এক বৈচিত্র। নির্জন-সৈকতের সঙ্গে পূর্বঘাটের নির্জন অরণ্যের মেলামিশিতে আমি আর একবার খানাতল্লাসী করব।

কিন্তু মনে পড়ে গেল, কোনারকের যাত্রা আমার আসন্ন। কথা সব পাকাপাকি হতে চলেছে। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম মহিমবাবুর দিকে। সর্বনাশ। শার্দূল যে তীক্ষ্ন অপলক চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন! রম্ভা যেতে মানা নাকি?

সিদ্ধকামবাবুকে বললাম, 'আগামী কালই আপনার সঙ্গে যেতে পারব না, আমার কোনারক যাওয়ার কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে প্রায়। সেখান থেকে ফিরে এসেই—'

কথা শেষ করতে পারলাম না। সিদ্ধকামবাবু প্রায় হেঁকেই উঠলেন, 'কোনারক এখন থাক না ভায়া। আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, চল দুজনে মিলে কেটে পড়ি।'

উপায় নেই। আমি নিজেকে তো জানি। আমার সকল মন প্রাণ কোনারককে অগ্রিম সমর্পণ করা হয়ে গিয়েছে। এখন সেখানে যেতে হবে। বললাম, 'এই ব্যাপারে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন, ফিরে এসেই আমি যাব।'

সিদ্ধকামবাবু হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন, 'তবেই হয়েছে, তোমার আর কোনোদিন যাওয়া হবে না। বিশেষ করে যে গার্জেনের পাল্লায় পড়েছ, তিনিই তোমাকে রম্ভা যাওয়ায় রম্ভা দেখিয়ে দেবেন।'

বলে রক্তাভ চোখে একবার আড়ে তাকালেন মহিমবাবুর দিকে। মহিমবাবুর সেই তীক্ষ্ন অপলক দৃষ্টি এখন শান্ত। বললেন, 'এটা তোমার ভুল ধারণা সিধু। ও এসেছে বেড়াতে, আর আমাদের বরাবর দেখা ট্যুরিস্ট ও নয়। বেরিয়ে পড়া বলতে যা বোঝায়, ওরটা তাই। ওকে আমি বাধা দেব কেন?'

সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'কে জানে। তোমার আবার রম্ভা নামটা সহ্য হয় না তো। বেশ, তাই হবে। খুব তাড়াতাড়ি চলে এস ভায়া, অনেক কিছু দেখাব।' তারপর গলা একটু নামিয়ে বললেন, 'আসল রম্ভা কে ছিলেন জানো তো?'

আসল রম্ভা? একমাত্র পৌরাণিক উপাখ্যানের, স্বর্গগণিকা রম্ভাকেই তো আসল রম্ভা বলে জানি। বললাম, 'স্বর্গের অপ্সরী—।'

সিদ্ধকামবাবু বলে উঠলেন, 'অনেকের ধারণা, ওই স্বর্গবেশ্যার আদি বাসস্থান নাকি ওখানেই। তার জন্যেই নাকি জায়গাটার নামও তার নামেই। অসম্ভব কী করে বলি, বল ভায়া। প্রকৃতির যা চেহারা ওখানে, অপ্সরীর জন্মস্থান হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য নয়। আর জানো তো, এই পুরী অঞ্চলে প্রবাদই আছে, জগন্নাথদেবের মন্দিরে যত দেবদাসী, তারা নাকি সব রম্ভা থেকেই আসে।'

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রধান প্রবেশের মুখেই, দরজার মাথার ওপরে নর্তকী দেবদাসীদের মূর্তি কয়টি। সুঠাম দেহ, শ্রীময়ী, নৃত্যরতা নারী, শাড়িতে কচ্ছ, পায়ে নূপুর, অবগুন্ঠনহীনা মুখ, আয়ত চোখ।

কৌতূহলিত হয়ে বললাম, 'প্রবাদ কি সত্যি?'

'তা জানি নে ভায়া। বলে জগন্নাথবিলাসিনী দেবদাসীরা সব রম্ভার মেয়ে।'

মনের মধ্যে নানান্ প্রশ্ন জট পাকিয়ে উঠল। তাতে প্রশ্নের দিশা হারালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে তারা আসে? তাদের কি ডেকে নিয়ে আসা হয়?'

'ডেকে আনতে হয় বটে, শুনেছি, তারও অনেক নিয়ম-কানুন আছে। আগেকার কালে তো নাকি বাপ মায়েরা তাদের শিশু মেয়েদেরই দান করে দিত, দেবতাকে উৎসর্গ যাকে বলে। নিশ্চয়ই তার মধ্যে মেয়ের শিশু বয়সেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী থাকত 'তোমার এ কন্যার দেখছি ভ্রষ্টা হবার কুলক্ষণ রয়েছে। একে এখন থেকেই ঈশ্বরে সমর্পণ করে দাও।' তা ছাড়া সুন্দরী শিশুকন্যার বাবার দারিদ্র্যও একটা কারণ। তবে শুনেছি, যত দেবদাসী-লক্ষণাক্রান্তা মেয়ে, সব রম্ভার গ্রামেই আছে। শিশু বয়স থেকেই যখন তাকে উৎসর্গ করা হয়ে যায়, তখন থেকে তার লালন পালন শিক্ষা, সব কিছুই জগন্নাথদেবের সম্পত্তির খরচায় চলে। তারপর যখন সে তন্বী শ্যামা শিখরদশনা হয়ে ওঠে, তখন মন্দিরে তার অভিষেক হয়। তখন তার গৃহ আলাদা, জীবনধারণও আলাদা। বুঝতেই পারছ, সে মানবী বটে, কিন্তু মানব সংস্কারের চারদিকেই তার কাঁটাতারের বেড়া। আমাকে যদি ভায়া সত্যি কথা বলতে বল, তবে এটাও সেই সতীদাহের প্রথার মতো। ভারতবর্ষের এই প্রথা যেমন সারা বিশ্বে আমাদের এক দিক থেকে মহৎ করেছে, আর একদিক থেকে তেমনি হীনও করেছে। পৃথিবীতে স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে আত্মলয়ের এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটে নি। এ অহংকার আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা এটাকে বাধ্যতামূলক প্রথায় দাঁড় করিয়েছি,

সেদিন থেকে কাপুরুষ আর খুনী হয়ে উঠেছি। দেবদাসী প্রথাটাও তাই। বিশ্বাস গেলে, শুধু প্রথার ধরাচুড়া আর কতদিন থাকে? জগন্নাথদেবের মন্দিরকে কেন্দ্র করে, আড়ালে অন্ধকারে যদি কোনো পাপাচারের কাহিনী শুনি, তা হলে আমি অবাক হব না। আমি অবাক হব না, যদি শুনি মন্দিরের অল্পবয়সী যুবক পাণ্ডারা রাতের রক্ষণাবেক্ষণা কাজেই বেশী থাকতে চায়। সাধারণের জন্যে যখন রাত্রে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়, তখনই দেবদাসীরা আসে। রাত্রেও পাণ্ডাদের নানান্ করণীয় থাকে, তাদের সবাইকেই রুটিন অনুযায়ী ডিউটি দিতে হয়। অল্পবয়সী যুবক পাণ্ডাদের ভিড় যদি সে সময়েই বেশী হয়, তা হলে মোটেই অবাক হব না। এমন কি নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, বিষ দিয়ে খুনোখুনী হলেও নয়।'

মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'তুমি কাকে এসব বলছ? জানো, ও একটা লেখক মানুষ, কখন কোথায় কি ব্যক্ত করে বসে থাকবে, তারপরে লাগুক ফ্যাসাদ।'

সিদ্ধকামবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ফ্যাসাদ লাগার মতো কথা আমি কিছু বলি নি মহি। আমি কাউকে দোষ দিই নি, আমার আশঙ্কার কথাই বলছি মাত্র। তবে ভায়া বুঝলে, এসব হল পাপ মনের কথা। দেবদাসী বললেই আমার শিবনেত্র ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে না, ওদেরও আমি নিতান্ত মানুষই মনে করি। আর মানুষের মতো ব্যাপারও অনেকে করেছে। যদি তার নজীর চাও, চল দেখিয়ে দিচ্ছি। এমন মেয়ে তুমি পাবে, যে একদা দেবদাসী, এখন সে মানুষের ঘরণী হয়েছে। যতদিন তুমি দেবদাসী-জীবন যাপন করতে পারবে ততদিন মন্দিরের বিত্ত বৈভব প্রসাদ, দামী বস্ত্র অলঙ্কার সবই ভোগ করতে পারবে। মায় বিশাল ভূসম্পত্তি পর্যন্ত। যেদিন থেকে পারবে না, সেদিন থেকে তোমাকে এসব ছেড়ে যেতে হবে। সেদিন থেকে তুমি ধর্মে কর্মে উত্তাপে, হাসিতে কান্নায়, সুখে দুঃখে মানব সঙ্গিনী।'

আমি যেন বাকরুদ্ধ মুগ্ধ বিস্ময়েই সিদ্ধকামবাবুর কথা শুনছিলাম। তাঁর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যেই শুধু জাদু ছিল না, বিষয়ের মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য আর দূর দিগন্তের সন্ধান ছিল। তিনি আবার বললেন, 'তবে এসব কথা তোমাকে বলতে চাই নি। যে কথার জন্যে এত, সেটাই বলি। এখন বিশ্বাস করি, স্বর্গের সেই বারবধূ রম্ভার আত্মা এখনো রম্ভাতেই বিরাজ করছে। বলতে ইচ্ছে করে, অপ্সরীর ট্র্যাডিশনটা যেখানে সেই পৌরাণিক যুগ থেকে অদ্যাপি সমান। আর আমিই একমাত্র মানুষ সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে আছি।'

বলে হো হো করে হেসে উঠলেন। মিথ্যে বলব না, আমার চোখে যেন এক বিচিত্র স্বপ্নরাজ্যই ফুটে উঠল। কিন্তু সিদ্ধকামবাবুর হাসিটা খুব স্বাভাবিক লাগল না। শুধু মাতালের হাসিও নয়। মনে পড়ে গেল, একটু আগে ওঁরই কথা, 'সংস্কারটা একদিক থেকে খারাপ, আর একদিক থেকে বোধ হয় তার একটা দামও আছে।' সংস্কারের দাম দিতে চেয়েছিলেন কেন তিনি? যাতে মানুষের সকল কিছুর সীমা থাকে? একেবারে বাধাবন্ধনহীন না হয়ে যায়? উনি কি সেই বাধাবন্ধনহীনেরই শিকার? নইলে তাঁর উন্মত্ত প্রগল্‌ভ হাসির মধ্যে, আমি কান্নার সুর শুনি কেন?

মহিমবাবু বললেন, 'চুপ কর।'

সিদ্ধকামবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, 'তবে ভায়া আমরা তো সব মানুষ-ইন্দ্ররাজ, দেখ সারা গায়ে কী রকম কুৎসিত বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। ভেতরের আগুন এখন প্রায় নিভু-নিভু, শুকনো পাতা-পাতকো যা পাচ্ছি, তাই ছুঁড়ে দিয়ে দিয়ে, আগুন বজায় রাখার চেষ্টা। পুড়ছি হে, পুড়তে বড় আনন্দ, বড় আনন্দ! সেই জন্যেই বলছি ভোগের মহাশ্মশান সেটা। কিন্তু কতদিনই বা আর বাঁচব। তাই বলছি, তাড়াতাড়ি এস, তাড়াতাড়ি!...'

শেষ দিকে সিদ্ধকামবাবুর গলা খাদে নেমে অস্ফুট শোনাল। সেই মুহূর্তেই সমুদ্রের গর্জন যেন প্রবল গর্জনে বেজে উঠল। দেখলাম, সিদ্ধকামবাবুর মুখে সেই রক্তাভা যেন আর নেই। তাঁর নিশ্বাসও যেন আর পড়ছে না। নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি। কিন্তু সারা মুখে যেন একটা সহসা ছুরি-বিদ্ধ ব্যথা লেগে রয়েছে।

মহিমবাবু বললেন, 'চুপ কর, চুপ কর সিধু। তুমি নিজের জন্যে পৃথিবীর কাউকেই দোষারোপ করতে পারো না।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন সিদ্ধকামবাবুর চোখের পরিখা গভীর অন্ধকার হয়ে উঠল।— মনে হল, ওঁর চোখের চারপাশে যেন ভয়াবহ বাসনার মাকড়সা তার বিষাক্ত রস ক্ষরণ করে দাগ ফেলেছে। মুখের অজস্র রেখাগুলি সহসাই ফুটে উঠল। এতক্ষণের **মানুষটাকে** অচেনা মনে হতে লাগল।

হাত নেড়ে বললেন, 'দোষারোপ করব কেন কাউকে? এটা তোমার বড় ভুল ধারণা হে মহি, বড় ভুল ধারণা। আসক্তির একটা যন্ত্রণা আছে, তুমি তা বুঝবে না। ত্যাগে আমার মতিগতি নেই, তুমি জানো। আসক্তির মধ্যে আমার অশান্তির যন্ত্রণা নেই, আমার যন্ত্রণা, ভোগে অমর হবার বাসনায়। আমি আরো আগুন চাই, আরো আগুন।...'

মহিমবাবু আবার বললেন, 'চুপ কর, শান্ত হও।'

আমার মনে হল, অতৃপ্ত বাসনার ক্রন্দন অনেক শুনেছি। কিন্তু এমন গভীর, এমন নিখাদ বাসনার কান্না কখনো শুনি নি। মানুষের বেলায় পতঙ্গের এমন বহ্ন্যুৎসবের পাখার গুঞ্জন শুনি নি। কে জানত, সোনার ঘেরাটোপ ছেড়ে, ছুটে আসা আমার নিরালা সৈকতে এমন বাসনার প্রতিমূর্তিকে দেখব।

সিদ্ধকামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'নাঃ, সব যেন কেমন ছানা কেটে গেল। দেখি, আরো কয়েক ঢোক গিলে আসি।'

বলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন। মহিমবাবুও ওঁর হাত ধরতে গিয়ে, ধরবার অবসর পেলেন না। আমিও হতবাক হয়ে, সামনে তাকিয়ে দেখি, রেণু এসে দাঁড়িয়েছে। কী বলব, ভেবে ওঠার আগেই, রেণু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু বাইরে আসবেন? কথা ছিল।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'যাব।'

বলে মহিমবাবু আর সিদ্ধকামবাবু, দুজনের দিকেই ফিরে তাকালাম। সিদ্ধকামবাবু একবার রেণু আর একবার আমার দিকে তাকালেন। মহিমবাবু শুধু আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন তখন। আমি বললাম, 'আমি ঘুরে আসছি একটু।'

রেণু ততক্ষণে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছে। লক্ষ্য করি নি, সঞ্জয় কখন ঘরের আলো জেবলে দিয়ে গিয়েছে। বাইরে এসে টের পেলাম, ঘরের ভিতর থেকে আমি যাকে এখনো বেলা শেষের আলো দেখছিলাম, আসলে তা দশমীর চাঁদের আলোর মায়া। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু ধোয়া আকাশে চাঁদের আলো সমুদ্রের দিগন্তেও এমন একটু আলো ছুঁইয়ে রেখেছে, যেন প্রায় সন্ধ্যার আভাস ছড়ানো। অথচ সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

রেণু ডাক দিয়ে, রাস্তা থেকে নেমে বালুচরে এগিয়ে গেল। খানিকটা গিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ রেখেই দাঁড়াল। আমি ওর কাছে গেলাম। অবাক হয়েছিলাম তো বটেই। একটু আশঙ্কাও করছিলাম, আশ্রমে ওঁদের কোনো বিপদ আপদ হল কি না।

আমি কাছে যেতেই রেণু আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু ওর চোখ নিচে, মুখ নত। নত মুখেই বলল, 'আমার সকাল বেলার ব্যবহারটা অন্যায় হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

আশ্চর্য! এই কথা বলার জন্যে রেণু আমাকে ডাকতে চলে এসেছে! নতুন বিস্ময়ে

কিছু বলবার আগেই, ও আবার বলল, 'অনেক আগেই এসেছিলাম, দূর থেকে দেখলাম, আপনি কথায় ব্যস্ত। কয়েকবার গেটের সামনে ঘুরেছি, যদি দেখতে পান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত...'

কথাগুলি দ্রুত বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রেণু। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকেই, প্রায় অস্ফুটে বলল, 'যাচ্ছি।'

বলেই বালুচরের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। কয়েক মুহূর্ত কী বলব, ভেবে পেলাম না। দেখলাম, চাঁদের আলোয় সমুদ্র যত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বালুচরের সীমায় তা নয়। একটু দূরেই যেন এক অস্পষ্ট ধূলিধূসরতায় সবকিছু ছেয়ে গেছে। রেণু ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। খানিকটা দূরেই, উঁচুতে আগুনের লেলিহান শিখা, একটা চালার আড়াল থেকে জেগে জেগে উঠছে। আগুনের সীমায় অনেকখানি রক্তিম দেখাচ্ছে।

সহসা রেণুর জন্যে মনটা একটা অব্যক্ত কষ্টে ব্যাকুল হয়ে উঠল। এখন মনে হল, সকালে আমিই হয়তো রেণুকে আঘাত করেছি, ও আমাকে আঘাত করে নি। হয় তো সত্যি বলেছি, কিন্তু রেণুর শূন্যতায় তা স্পর্শ করে নি। সংসারে কত সত্যিই তো আছে, ঠিক-স্থানে তাকে স্থাপন করতে না পারলে, অনেক ক্ষেত্রেই সে মূল্যহীন প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া...তাছাড়া, নিজের কাছে কেমন করে এ কথা অস্বীকার করি, রেণু সারাদিন এ কথাই ভেবেছে। বারবার মনে মনে ভেবে দুঃখিত হয়েছে, আমাকে ও আঘাত করেছে, অন্যায় করছে, তাই ছুটে এসেছে। রেণুর প্রাণে যে সদ্য আঘাতের চিহ্ন, তা কি শুধু আমার কথায়, আমার ইচ্ছায় নিশ্চিহ্ন হবে? কোন্ আঘাত সারতে কতখানি সময় নেয়, কতটুকু জানি।

রেণুর অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমুদ্রের ধারেও কেউ নেই। হয়তো মরসুমের সময় হলে এ সন্ধ্যা-রাত্রে সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য থাকত। কিন্তু এখন, এই চাঁদের আলোয়, ধূলিধূসরতায় কুয়াশার আভাস সৃষ্টি করা নির্জন তীর ধরে রেণু একেবারে একলা চলেছে। কিছু দূরেই ওই আগুনের আভা নিশ্চয় শ্মশানের। আমার সামাজিক মন সচেতন হয়ে উঠল। রেণু কিছু মনে করলেও উপায় নেই। এভাবে ওকে একলা যেতে দিতে পারি নে।

আমি প্রায় চিৎকার করেই ডাকলাম, 'দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।'

রেণু শুনতে পেল কি না, কে জানে। দাঁড়িয়েছে কি না তাও ঠিক বুঝতে পারছি নে, এতই অস্পষ্ট লাগছে ওর মূর্তি। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলাম। কাছে গিয়ে টের পেলাম, রেণু খুব মন্থর পায়ে, যেন বালিতে পায়ের দাগ দেগে চলেছে। অনুমিত হল, ও আমার ডাক শুনতে পেয়েছে। কারণ, আমি ওর প্রায় পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও মুখ তুলে তাকাল না। আমিও আর কিছু বললাম না। পাশাপাশিই চলতে লাগলাম।

স্বর্গদ্বারের ঘাটের নিচে যখন এলাম, দেখলাম উঁচুতে বালু ঢিবির ওপরেই শবদাহ হচ্ছে। চিতার আগুনেই লক্ষ্য পড়ল, কালো কালো কয়েকটি মূর্তি এদিকে ওদিকে বসে আছে। হয়তো তারা মৃতের আত্মীয় এবং শোকগ্রস্ত। কারুরই চোখ মুখ দেখা যায় না। এমন ভাবে ঘাড় গুঁজে বসে আছে, মানুষের মূর্তি বলে চিনতে ভুল হয়। দু তিনটি কুকুরের ছায়া ঘুরছে তাদের আশেপাশে। কেবল একজনকেই মানুষ বলে চিনতে পারা যায়, যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে দিচ্ছিল, অর্ধদগ্ধ শবকে আগুনের মধ্যে ঠিক ভাবে গুঁজে দিচ্ছিল।

এই বহ্নিমান চিতা, নিরালা সৈকত, সমুদ্রের গর্জন, আর বহু দূর পর্যন্ত সমুদ্র যেন এক কুহেলী আলোয় উদ্ভাসিত, সব মিলিয়ে এ এক বিচিত্র পরিবেশ। মৃত্যুর মাঝখানে, চিতার অগ্নিশিখা আর সমুদ্রের গর্জন যেন জীবনের দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির

মতো আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। রেণু জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমিও দাঁড়ালাম।

রেণু হঠাৎ বলে উঠল, 'ও লোকটা কী খোঁচাচ্ছে?'

রেণু যে একটু ভয় ও অস্বস্তিতে এ কথা জিজ্ঞেস করেছে তা জানি। কারণ, চিতার মাঝখানে গনগনে আগুনের মধ্যে শবদেহ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বললাম, 'আগুন আর দেহ, দুই-ই।'

রেণু চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, 'কী নিষ্ঠুর।'

আমার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। বলব না মনে করেও বলে ফেললাম, 'আমার কাছে নিষ্ঠুর মনে হয় না।'

রেণু আবার চলতে লাগল। মুখ না তুলেই খানিকক্ষণ পরে বলল, 'কেন?'

কথা বলাটা আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য নয়। বক্তব্যই প্রধান। তাই চুপ করে থাকতে পারি নে। তবু মুখ খুলতে সংকোচ হল, রেণু আবার কী ভাবে নেবে। জবাব না দিয়ে রেণুর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। রেণু আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমাকে কথা বলতে হল। বললাম, 'ওই মানুষটিকে যদি কেউ জীবন্ত পোড়াত তা হলে আমার নিষ্ঠুর বলে মনে হত। বলতে গেলে হয় তো বড় কথা হয়ে যায়, তবু মৃত্যুকে আমরা দুঃখের চোখে দেখেছি তাই, নইলে বলুন তো এর থেকে আর স্বাভাবিক কী আছে। পরিপূর্ণ সৎকার, সে-ই তো ভালো, সুন্দরও বটে। আমরা আমাদের চোখের সামনে মনের চারপাশে কতগুলো মিথ্যা মায়া দিয়ে ভরে রেখেছি, যার সঙ্গে সত্যের কোনো বনিবনা নেই। তারপরে সেই মায়া যখন মিলিয়ে যায়, আমরা কষ্ট পাই। এ কষ্ট নিরর্থক।'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলাম। ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠলাম, 'কিছু মনে করবেন না যেন। মনে হল তাই বললাম।'

রেণু তখনো মাথা নিচু করে চলছিল। বলল, 'থামলেন কেন?'

'পাছে আপনি কিছু ভেবে কষ্ট পান।'

রেণু বলল, 'আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।'

কী শুনতে ইচ্ছে করছে রেণুর? আমি ওর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি না তো! সেটা বড় বিশ্রী হবে। কিন্তু সংসারে এমন অনেক কথা থাকে, যেখানে নিজের কথা না বললে স্বস্তি হয় না। রেণু যা বলে, রেণুর বর্তমান জীবনটাই তো আমার সেই ছেড়ে-আসা চিত্রবিচিত্র রংবাহার ঘেরাটোপের ছবি। আমি তো ওকে মোটামুটি চিনতে পারছি, বুঝতে পারছি। তাই চুপ করে থাকতে পারছি নে।

হেসে বললাম, 'শোনাবার মতো কিছু বলি নি। আপনার কথার জবাব দিচ্ছি মাত্র। দেখুন, আমার ধারণা, সংসারে কত লোক যে জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে, তা যদি একটু আমরা চোখ মেলে ভালো করে দেখতাম, তবে মৃতদেহ সৎকারকে নিষ্ঠুর বলে মনে হত না, এই বলতে চাইছিলাম। যে কোনো জিনিসকেই, যদি মৃত বলে জেনে থাকি বা বুঝে থাকি, তবে তা যথার্থরূপেই ঘুচুক। জীবিতের সব কিছুই সহ্য করতে পারি, কারণ তাতে একটা আশা থাকে। মৃত তো শুধু দৌরাত্ম্যই করে।'

রেণু মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'আর একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনি কি শুধু মানুষের জীবিত মৃতের কথাই বলছেন?'

'না। মানুষ বলব কেন শুধু। সব কিছুর কথাই বলছি। যা কিছুর মধ্যেই জীবনের লক্ষণ আছে, তা হাজার বছরের পুরনো হলেও, আমার কাছে জীবন্ত। যা কিছু আমার জীবনের, মনের প্রাণের রসদ যোগায়, তার কোনো বয়স নেই আমার কাছে। যেমন ধরুন রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধের বাণী, কালিদাসের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ।

অথচ, হয় তো গত বছরেই কোনো এক রাত্রিব্যাপী, কোনো এক বই পড়েছিলাম, মুগ্ধও হয়েছিলাম, কয়েকটা দিন হয় তো সেই বইয়ের কথা বারবার মনে হয়েছে, তার চরিত্রদের কথা, তার বাচনভঙ্গি। হয় তো তখন কাউকে বলেছি, অপূর্ব! এ কখনো ভুলতে পারব না। এবং তখন যে জেনে শুনে মিথ্যে কথা বলেছি, তাও নয়। তখন তাই মনে হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যেই ডুবে ছিলাম, তারই পাতায় পাতায় আমার মন বিচরণ করেছিল, সেই জন্যেই বলেছিলাম। আর আজ মাথা খুঁড়লেও হয় তো সে-বইয়ের নাম মনে করতে পারব না। সে মুগ্ধতা কবেই হারিয়ে গেছে, চরিত্রদের কবেই ভুলে গেছি। কারণ আমার মধ্যে সে ওইটুকু ক্রিয়াই করতে পেরেছিল। তার বেশী তার ক্ষমতা ছিল না।'

হঠাৎ আমি থামলাম। বুঝতে পারছি, আমি আমার নিজের গণ্ডীর মধ্যে কথাকে টেনে এনেছি। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী। রেণুর সঙ্গে তো আমি চালাকি করতে চাই নি। আমি ওকে দুটো ভালো ভালো কথা শোনাতে চাই নি। শুধু একটু না হেসে পারলাম না। মানুষ তার নিজেকে কি কিছুতেই ছাড়াতে পারে না?

রেণু নীরবে চলেছে, তেমনি মাথা নীচু করে। হয় তো আমার কথাগুলি নিয়েই ও মনে মনে আলোচনা করছে। সমুদ্র প্রতি মুহূর্তে গর্জন করে চলেছে, ছুটে ছুটে আসছে, ফিরে যাচ্ছে। আর অল্প জ্যোৎস্নায়, ফস্‌ফরাসের উজ্জ্বলতা তরঙ্গে তরঙ্গে ঝলকাচ্ছে। বালিকণা চিকচিক করছে। আমরা চলেছি ছুটে আসা তরঙ্গের শেষ সীমানা ধরে। একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে ছোট ছোট কাঁকড়ার দল দিনের বেলার মতোই লুকোচুরি খেলছে।

আমি হেসে আবার বললাম, 'বুঝতেই পারছেন, কথার মধ্যে নিজের তুলনাকেই টেনে এনেছি। জীবনের থেকে সাহিত্য বড় নয়, কিন্তু ওটাই আমার প্রকাশের ক্ষেত্র। তাই আমিই তো সব থেকে বেশী জানি দু দিন পরে আমার একটি লেখা ভুলে যাবার ব্যথা কতখানি। কষ্ট হয় তো পাই, কিন্তু আমি কী থেমে থাকব? আমি থামব না, থামতে পারি নে। আর যদি আমার সেই প্রকাশের সত্ত্বাটাই মরে যায়, তা হলে তো থামা না থামার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই বলছি, আমি শুধু মানুষের কথা বলি নি, মানুষের সব কিছুর কথাই বলেছি। পৃথিবীর একজন নাম-করা লোকের একটা কথা বলব আপনাকে?'

'হ্যাঁ বলুন।'

'তিনি একজন পূর্ব-মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। অল্প বয়স, ভালো লিখতেও পারতেন। হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন সে দেশ দখল করলে, উনি তখন দেশে গোপনে গোপনে গুপ্ত আন্দোলন গড়ে তোলেন হিটলারের বিরুদ্ধে। কিন্তু ধরা পড়ে যান নাৎসীদের হাতে। প্রতিদিন স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে প্রহারে প্রহারে মারা যান। মারা যাবার আগে তিনি প্রায়ই গুপ্ত পথে, পেন্সিলে লিখে, চিরকুট পাঠাতেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে। একটা চিরকুটে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রিয়তমা, আমার মৃত্যু সম্ভবত নিশ্চিত। তাই সময় থাকতেই তোমাকে একটি অনুরোধ জানিয়ে যাই। আমার মৃত্যুর পরে, তুমি আবার বিবাহ করো। কারণ শূন্য বাগানের অসুন্দর ব্যর্থতার থেকে পূর্ণ বাগানের শূন্যতাই শ্রেয়।'

আমার গলার স্বরের আবেগ আমি নিজেই শুনতে পাচ্ছিলাম। চুপ করলাম আমি।

রেণু যেন রুদ্ধশ্বাস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সেই মহিলা কি আর বিয়ে করেছেন?'

বললাম, 'যতদূর জানি, করেন নি। তাঁর বাগান তো শূন্য হয় নি, তা পূর্ণতার শূন্যেই ভরা ছিল। কারণ তাঁর স্বামীর ভালোবাসার মধ্যে জীবনের রস ছিল, তা মৃত ছিল না, তাই প্রয়োজন হয় নি।'

রেণু থেমে পড়েছিল, তাই আমিও হাঁটা বন্ধ করেছিলাম। রেণু সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল, এবং সহসা লক্ষ্য পড়ল, ওর চোখে জল। আমি কুণ্ঠিত হয়ে উঠলাম, সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। কী বলব, হঠাৎ ভেবে পেলাম না। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললাম, 'আপনাকে হয় তো দুঃখ দিয়ে ফেলেছি—'

রেণু বলে উঠল, 'না না, আমি দুঃখিত হই নি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কী সুন্দর! কী সুন্দর কথা বললেন আপনি। আপনার জীবিত মৃতের কথা এখন আমি বুঝতে পারছি।'

মিথ্য নয়, রেণুর গলার স্বরেও একটি আনন্দের আবেগ ধ্বনিত হচ্ছে। এই চোখের জল আসলে ওর অন্ধকারে আটকে থাকা প্রসন্নতার দরিয়া। আমার মনটাও প্লাবিত হয়ে উঠল। রেণু আমাকে ভুল বোঝে নি।

কিন্তু না বলে পারলাম না, 'আপনাদের আশ্রমটা কোথায়?'

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রেণু বলল, 'পিছনে ফেলে এসেছি।'

'অনেক দেরী হয়ে গেছে কিন্তু। ওঁরা নিশ্চয়ই—?'

'খোঁজ করছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বকুনিও খেতে হবে খুব। তাড়াতাড়ি চলুন।'

'আমিও আবার যাব নাকি এখন?'

'যাবেন না? আমি একলা গেলে তো সবাই আরো রাগারাগি করবে। কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

সে তো আর এক বিপদ তা হলে! শেষে পুরীর পুলিসবাহিনী বেরুবে খোঁজ করতে, সেটা খুব সুখদায়ক হবে না। বললাম, 'কিন্তু ওঁরা খুব দুশ্চিন্তা করছেন নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, ফিরতে হবেই এখুনি। চলুন যাই।'

রেণু হাঁটতে আরম্ভ করল। চলতে চলতেই রেণু বলল, 'আপনার কথা শুনলাম—।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আমার কথা?'

রেণু বলল, 'না, আপনার মানে, আপনার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, আপনার কথা। আমার কথা কিন্তু আপনাকে কিছুই বলি নি।'

রেণু চোখ তুলে অস্পষ্ট আলোয় আমাকে দেখতে চাইল। আমি শুধু উচ্চারণ করলাম, 'বেশ তো—।'

কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখতে হল। রেণু আবার বলল, 'ইচ্ছে করছে বলতে।'

রেণুকে বেশ সহজ মনে হচ্ছে এখন। ওর আকুঞ্চিত প্রাণের পাপড়ি, এমন সহজ আবেগে যেন আর মেলতে পারে নি। ওর শিথিল তারে যেন টান পড়েছে, ঝংকৃত হচ্ছে। বললাম, 'আমি শুনব। দু একদিনের মধ্যেই হয় তো আমি বেরিয়ে পড়ব, ইচ্ছে আছে, কোনারক ভুবনেশ্বর হয়ে দিন দশেক পরে ফিরে আসব।'

রেণু দাঁড়িয়ে পড়ে, বিস্মিত হতাশায় বলে উঠল, 'তাই নাকি? কবে যাবেন?'

বললাম, 'আজ রাত্রেই গরুর গাড়ির লোক আসবে। তার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে গেলে হয় তো আগামী কালই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু আপনারা তো এখনও কিছুকাল নিশ্চয় আছেন।'

রেণুর গলার স্বর একটু স্তিমিত শোনাল, 'তা বোধ হয় আছি। আপনি তা হলে চলে যাচ্ছেন?'

'না, চলে যাচ্ছি না। কয়েকদিন একটু ঘুরতে যাচ্ছি।'

রেণু চুপ করে রইল। আমরা সমুদ্রের ধার থেকে বালুর ঢিবির ওপর উঠতেই আশ্রম বাড়ি চোখে পড়ল। হ্যারিকেন হাতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। একজন

নয়, দুজন। আমরা যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম, হ্যারিকেনের আলোও তত এগিয়ে আসতে লাগল।

রেণু বলে উঠল, 'এই রে, শিবি পিসী আসছেন। পেছনে আবার অবু পিসী। কী যে বলে উঠবেন, কে জানে।'

আমারও প্রায় বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। শিবিদির থেকে আমার অবুদিকেই আবার ভয় বেশী। ওঁর মুখের তো একেবারেই রাখ-ঢাক নেই।

একটু দূর থেকেই শিবিদির গলা শোনা গেল, 'রেণু না?'

রেণু বলল, 'হ্যাঁ পিসী আমি।'

আর কিছু শোনবার অবসর হল না। শিবিদি মুহূর্তে পিছন ফিরে অবুদিকে বলে উঠলেন, 'অবু, শীগ্গির যা, দ্যাখ ছোটবউ আবার অমর্তবাবার সঙ্গে হোটেলে চলে গেল কিনা খুঁজতে।'

অবুদি সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন। কেবল অস্ফুটে শুনতে পেলাম, 'আগেই জানি!'

বেচারী অবুদি। মোটা মানুষ, বালি ঠেলে ঠেলে প্রায় থপথপিয়ে দৌড়চ্ছেন। কিন্তু আবহাওয়া যে এতখানি উৎকণ্ঠিত গম্ভীর হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে পারি নি। অমর্তবাবাটিই বা কে, তাও বুঝতে পারলাম না। আমিও উৎকণ্ঠা অস্বস্তিতে কুঁকড়ে উঠলাম।

শিবিদির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেন চোর ধরেছেন, এমনি করে তাকালেন দুজনের দিকে। এর ওপরে যদি জলবৎ তরলং সন্দেহটি দেখা দেয়, তা হলেই গিয়েছি। তবু তো অবুদি আপাতত অদৃশ্য।

রেণু বলল, 'কোথাও যাই নি শিবি পিসী, কাছেই ছিলাম। ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম একটু। ছোটকাকী খুব খোঁজাখুঁজি করছে বুঝি?'

শিবিদি গম্ভীর গলায় বললেন, 'তা বিদেশ বিভুঁয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থাকতে পারলে কী করবে বল্। বেরিয়েছিস তো সেই সন্ধ্যের কত আগে।'

রেণু বলল, 'ওঁর হোটেলে গিয়েছিলাম একটা কথা বলতে। উনি ব্যস্ত ছিলেন বলে দেখা করতে পারছিলাম না।'

শিবিদি কট্‌কট্ করে আমার দিকে তাকালেন।

রেণু বলল, 'আমি যাই শিবি পিসী, তোমরা এস।'

রেণু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল। শিবিদি তখনো চোখ নামান নি। কী যে বিপদ! কোনো অপরাধ না করেও, শিবিদির দিকে তাকাতে পারছি নে। ভুল হয় তো একটু হয়েছে। রেণু যদি এদিকে এসে আগে আশ্রমে একটু সংবাদ দিয়ে দিত, কিংবা আমরা আশ্রমের সামনেই দাঁড়াতাম, তা হলে আর উদ্বেগ অশান্তি হত না।

বললাম, 'আসলে কী হয়েছে জানেন শিবিদি—'

শিবিদি বলে উঠলেন, 'থাক, আর আসল নকল বোঝাতে হবে না, বুঝেছি। কথা বলতে বলতে তোমাদের আর খেয়াল ছিল না, এই তো?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'হ্যাঁ মানে যে আমরা ভেবে মরে গেলাম। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ খুশি কথা বলুক, তাতে তো কিছু যাচ্ছে আসছে না। কথা বলাই তো ও ছেড়ে দিয়েছে। একটু যদি মুখ খোলে, তা হলে তো বাঁচা যায়। কিন্তু মেয়েটা তো সোমত্ত, একলা একলা বেরুলে দুশ্চিন্তা বা রাগ হয় কি না হয়, সেটা আমাকে বল্।'

আমি বললাম, 'তা তো নিশ্চয়!'

শিবিদি ভেংচে বললেন, 'তা তো নিশ্চয়, তবে মরণ, একটু খবর দিয়ে কথা

বলতে কী হয়েছিল?'

অতীব যুক্তিপূর্ণ কথা। বললাম, 'তা তো ঠিকই।'

'আর থাক, হয়েছে, এখন এস, ছোটবউকে শ্রীমুখখানি দেখিয়ে যাও।'

'চলুন।'

আশ্রমের সমুদ্রের দিকে কেউ ছিল না। আমরা ঘুরে উঠোনের ওপর দিয়ে গেলাম। ব্যারান্দায় একজন ছাড়া কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল, ঘরের মধ্যে কথা হচ্ছে।

শিবিদি ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোটবউ কোথায়?'

ঘর থেকে ছোটবউদির গলা শোনা গেল, 'এই যে ঘরে আছি। ওকে নিয়ে ঘরে এস শিবিঠাকুরঝি।'

শিবিদি আমাকে ডাকলেন, 'আয়।'

কিন্তু শিবিদির সঙ্গে বারান্দায় উঠে থমকে গেলাম। সামনে স্বয়ং খেঁকিয়ানন্দজী! ওরফে অমৃতানন্দ। বললাম, 'আপনি এখানে?'

খেঁকিয়ানন্দের ভাবসাব খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না। মুখের ভাব রীতিমত অপ্রসন্ন গম্ভীর। প্রায় ক্রুদ্ধ চোখেই যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। বললেন, 'কেন, তোমার কোনো অসুবিধে করলাম নাকি?'

শুধু রাগ নয়, তার সঙ্গে শ্লেষে ঠোঁট বক্রও বটে। বললাম, 'না না, অসুবিধে আবার কী হবে। আপনাকে এখানে দেখব, ভাবি নি কি না, তাই।'

শিবিদি বলে উঠলেন, 'অমর্তবাবা তো তোমাকে চেনেন বললেন।'

অমর্তবাবা! অমৃতানন্দের অপভ্রংশ হয় তো তাই।

শিবিদি আবার বললেন, 'উনি এমনি হঠাৎ এসে পড়েছিলেন আজ। আমাদের কয়েকখানি কেত্তনও শুনিয়েছেন। ভারী সুন্দর, চমৎকার! তুই শুনেছিস?'

বললাম, 'হ্যাঁ, শুনেছি, সত্যি চমৎকার!'

শিবিদি বললেন, 'ওঁর সঙ্গেই তো ছোটবউ তোর হোটেলে যাচ্ছিল।'

খেঁকিয়ানন্দ এখন যেন খেঁকিয়েই আছেন। বললেন, 'এই শ্রীক্ষেত্রের যেখানেই যাবে, আমার দেখা পাবেই, এই বলে দিলাম।'

যেন সাবধান বাণী শোনাচ্ছেন। বললাম, 'তাই নাকি?'

ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আচ্ছা চলি মা ঠাকরুন। মেয়েটির খোঁজ পেয়েছেন, স্বস্তি হল।'

শিবিদি বললেন, 'কোথায় আর যাবে। ওরা সমুদ্রের ধারেই গল্প করছিল। কিন্তু আপনি যাবেন না, একটু দাঁড়ান।'

শিবিদি তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে একটি আধুলি বের করে, অমর্তবাবার হাতে দিয়ে বললেন, 'আবার আসবেন কিন্তু গান শোনাতে। সেদিন বইও কিনব।'

'তথাস্তু মা, তথাস্তু।'

আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললেন, 'এখন কি হোটেলের দিকে যাওয়া হবে?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এসেছি যখন, সকলের সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

'হুম্! আচ্ছা এস। আমি ততক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে একটু দেখা করি।'

অর্থাৎ আমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন। কে জানে, রেণুকে খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে উনি আবার কী ভেবেছেন। একটা কিছু ঠাউরেছেন নিশ্চয়। ভাবভঙ্গি বিশেষ সুবিধের নয়।

শিবিদির সঙ্গে আমি ঘরের মধ্যে গেলাম। দেখলাম সকলেই প্রায় বৈঠকী চালে বসেছেন। মাদুর পাতাই ছিল।

শিবিদি বললেন, 'বোস।'

অগত্যা যেন বিচারকের মুখোমুখি বসলাম। কিন্তু বিচারকদের বিচারে মতিগতি আছে বলে মনে হল না। কেবল অবুদি ছাড়া। ওঁর দেখছি, চোখ কোঁচকানো, নজর তেরছা। আমি বসা মাত্রই বলে উঠলেন, 'বলি কোন্ দখিন দোরে গিয়ে বসেছিলে যে, খুঁজে পাই নে?'

বললাম, 'বসবার সময়ই পাই নি অবুদি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা আর শেষ হচ্ছিল না।'

শিবিদি বললেন, 'থাক, আর কিছু বলিস নে রে অবু। আমি খুব বকেছি।'

দৃষ্টি পড়ল ছোটবউদির দিকে। রেণুকে পাশে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছেন। তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকেই। স্নেহের হাসিতে চোখ দুটি টলটলে। যতটা গুরুতর ব্যাপার ভেবে ভয়ে ভয়ে ঢুকেছিলাম, আবহাওয়া তত খারাপ নয়। ছোটবউদির মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হলাম। সেখানে কোনো কটু প্রশ্ন তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র অপ্রসন্নতার আভাসও ছিল না।

সেজদি বললেন, 'অনেক কথা বলেছ, এবার একটু চা দিই, গলা ভেজাও।'

ছোটবউদি বললেন, 'সেই ভালো। আর কথা নাকি ও খুব ভালো বলে। মেয়ে তো আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!'

আমি রেণুর দিকে তাকালাম। তার আগেই ও দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছিল। বুঝতে পারি নি, ইতিমধ্যেই ছোটবউদির কাছে রেণুর রিপোর্ট করা হয়ে গিয়েছে।

শিবিদি বললেন, 'তা হবে না! এখন তো জানি, ও তো কথা বেচেই খায়।'

অবুদি বললেন, 'শুধু কথা?'

বলে ঘাড় কাত করে এমনভাবে চোখ কুঁচকে তাকালেন, সকলেই হেসে উঠলেন। সেজদিও ইতিমধ্যে স্টোভ নিয়ে বসে গিয়েছেন। এই পরম ভাগ্য, যে-ঘটনা সবাইকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে পারত, অকারণ অপমানের কালি মেখে ফিরতে হত আমাকে, সকলের প্রসন্ন হাসির ঝংকারে সে-দুর্যোগ কেটে গিয়েছে।

ছোটবউদি বললেন, 'কিন্তু ওকে আমার একটা কথা বলার আছে, তোমরা সবাই শোন।'

ওকে বলতে ছোটবউদি চোখ দিয়ে আমাকেই নির্দেশ করলেন। একটু সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আবার কী কথা বলবেন উনি! এবং সবাইকে সাক্ষী রেখে! ওঁর দিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু সেই হাসিটিতে কোনো মালিন্য তো লাগে নি।

ছোটবউদি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'জানি না, আমার কথা শুনলে হয় তো তোমার খারাপই লাগবে। খুব যদি অসুবিধে বোঝ, তা হলে পরিষ্কার করে বলো, আমরা কিছু মনে করব না।'

বলে ছোটবউদি রেণুর দিকে তাকালেন। রেণু অল্প একটু হেসে মুখ নামিয়ে নিল। আমি শুধু হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। রীতিমত বুক ঢিপ ঢিপ করতে আরম্ভ করল। কী বলতে চান ছোটবউদি। বললাম, 'কী বলুন।'

সকলেই ছোটবউদির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেজবউদি তো স্টোভে পাম্প করতেই ভুলে গেলেন। ছোটবউদি বললেন, 'তুমি নাকি কোনারক যাচ্ছ?'

কথা শুনে হুস্ করে আমার একটা নিশ্বাস পড়ল। এই কথা! কিন্তু বাকি সবাই কলকল করে উঠলেন, 'কবে? কী ভাবে?'

আমি আর একবার রেণুর দিকে ফিরে তাকালাম। রেণুর মুখ নত। হাসি আছে কি না টের পেলাম না।

বললাম, 'হ্যাঁ সব স্থির করেছি। এ সময়ে মোটরের রাস্তায় বোধ হয় যাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, গরুর গাড়িতে ভিন্ন পথে যাবারই আমার ইচ্ছে। তবু একটু দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।'

ছোটবউদি বললেন, 'আমরা তোমার সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধে হবে? জানি তুমি একলা মানুষ, পথে বেরিয়েছ, আমরা সঙ্গে থাকলে তোমার ঝামেলা মনে হবেই।'

এভাবে বললে প্রতিবাদ করতেই হয়, সামাজিকতার সব কিছুই যে পিছনে ফেলে আসতে পেরেছি, তেমন বলতে পারব না। সেটা আমাদের মজ্জাগত। আর বলছেন এমন একজন, যে-ছোটবউদিই শিবিদিদের বারবার বলেছেন, 'ওকে ছেড়ে দাও ঠাকুরঝি। ওকে আটকাতে যেও না।' যে-ছোটবউদি আমাকে সব থেকে বেশী বুঝেছেন।

বললাম, 'ঝামেলা বলছেন কেন ছোটবউদি?'

'বলছি, কারণ আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে বোধ হয় তাই মনে করতাম। তুমি যেভাবে ছুটে এসেছ, সত্যি তোমাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না। তবে এইটুকুনি কথা দিতে পারি, তুমি নিজের মনে থেক, একটুও ব্যতিব্যস্ত করব না। তুমি আমাদের আগে আগে আছ কিংবা পিছনে আছ, এটুকু জানা থাকলেই যথেষ্ট। মেয়ে হয়ে যে জন্মেছি, এটা নিজেরাও ভুলতে পারি না, এ সংসারটা ভুলতেও দেয় না।'

এর পরে আর ছোটবউদির কথায় দ্বিধা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে, ছোটবউদি আমাকে কখনো জড়াতে চাইতেন না। জানি, এ প্রস্তাব করার আগে তাঁকেই অনেক দ্বিধা করতে হয়েছে, অনেক ভাবতে হয়েছে। এবং সন্দেহ আমার দৃঢ় হচ্ছে, রেণুর ইচ্ছাই বোধ হয় ছোটবউদির সব দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছে।

বললাম, 'বেশ তো ছোটবউদি, আপনাদের যদি কোনো কষ্ট না হয়, আমার কি আপত্তি থাকবে? আমি আগেও না, পিছেও না, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব।'

শিবিদি বলে উঠলেন, 'বেঁচে থাক। সত্যি তোকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

অবুদি বললেন, 'সত্যি, কি আনন্দ যে হচ্ছে! যদি না নিতে চাইতিস, যা গালাগালি দিতাম, মাইরি বলছি।'

সেজদি বললেন, 'এখন ভেবে দেখ, গাড়িতে যদি ওর সঙ্গে দেখা না হত। ভগবান ওকে মিলিয়ে দিয়েছে।'

মানুষ যে কেন অতিশয়োক্তি করতে ভালোবাসে, এখন বুঝতে পারছি। ভাবের ঘরে বাতাস লাগলে কবি। আমাকে ভগবানের মিলিয়ে দেওয়ার কল্পনায় সেজদিকেও সেই আখ্যাই দিতে ইচ্ছে করছে। ভগবান কিংবা তাঁর মিলিয়ে দেওয়া না দেওয়া কিছুই আমি বুঝি নে, জানিও নে। যে যেটাকে যেমন ভাবে নেয়। নইলে আমি যে এসেছিলাম, দুয়ার ভেঙে, ভিতরে তখন আমার অনেক রক্তপাতের আঘাত।

খোলা দরজা দিয়ে সমুদ্রকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ঢেউয়ের মাথায় ফেনিয়ে ওঠা ফসফরাসের হাসি। আমার মুক্তির তরঙ্গে ওই কুহেলি হাসির কী রহস্য লুকিয়ে আছে, কে জানে।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে, রাস্তায় খানিকটা এসেছি। লোকালয় বটে, কিন্তু শহরের সেই কর্মব্যস্ততা নেই। সম্ভবতঃ এসব পল্লীতে মানুষও কম। যারা আছে, তারা ইতি-মধ্যেই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তা একেবারে নির্জন। পিছনে ডাক শুনতে পেলাম, 'একটু দাঁড়িয়ে।'

খেঁকিয়ানন্দ। ইতিমধ্যে ভুলেই বসেছিলাম, উনি এখনো আছেন। বললাম, 'ভুলেই

গিয়েছিলাম, আপনি রয়েছেন।'

'তা ভুলবে। এখন বল তো। মেয়েটির ব্যাপার কী?'

অবাক হলাম। একটু বিরক্তও। কিন্তু খেঁকিয়ানন্দের চরিত্র ইতিমধ্যেই যেটুকু জানা হয়েছে, তাতে সহসা ওঁকে ভুল বুঝলেই বিপদ। ওঁর কথাবার্তার ছিরিছাঁদ একটু আলাদা।

বললাম, 'কই, ব্যাপার-ট্যাপার তেমন কিছু জানি নে তো।'

খেঁকিয়ানন্দ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। বললেন, 'কেন মিছে বলছ বাবা। তোমার কথার আগেই যে টের পেয়েছি, মেয়েটির কোথায় একটা গোলমাল আছে।'

বললাম, 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

যে রকম জোর দিয়ে বললেন, আমারই ভড়কে যাবার অবস্থা! বললাম, 'কী রকম?'

'তবু তুমি কবুল করবে না?'

'আমি যে সত্যি কোনো গোলমালের কথা জানি নে।'

'এই হরিদাস আখড়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলছ?'

তাও তো বটে, হাঁটতে হাঁটতে যে অনেকখানিই এসে পড়েছি। কিন্তু হরিদাসের আখড়ার সামনে দাঁড়িয়ে বললেই কি খেঁকিয়ানন্দ আমাকে বিশ্বাস করবেন? আর সত্যি যখন জানি নে, উনি কী ধরনের গোলমালের কথা বলছেন। যদিও এ রকম আলোচনাতেও আমার অরুচি। গোলমাল আছে কি নেই, তার থেকেও বড় কথা, একটি মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ এমন আলোচনা করতে যাব কেন? বললাম, 'তা আখড়া যখন আছে, তখন তার সামনেই বলছি।'

খেঁকিয়ানন্দ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মেয়েটি তো বাপু, হিসেবে বুঝলাম, মাত্তর ঘণ্টা দুয়েক বাড়ির বাইরে ছিল। কিন্তু বাকিদের সবাইকে একটু বেশী দেখলাম। আমার যেন মনে হল, পাছে মেয়েটি আত্মঘাতী হয়ে কোনো বিপদ আপদই ঘটিয়ে বসে, এমনি একটা ভয়ে যেন সকলের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। কেন? কী জন্যে?'

তা যদি হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই ছোটবউদিরা একটু বেশী ভেবেছেন। বললাম, 'হবে হয়তো, কিছু দুঃখজনক ঘটনা আছে। কিন্তু ভয়ের যে কিছু নেই, সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। অতএব—'

'হুম্।'

খেঁকিয়ানন্দ আগেই বলে উঠলেন, 'সে তো দেখলামই। কথাটি বেশ এড়িয়ে গেল। কী বললে? 'কিছু দুঃখজনক ঘটনা।' হুম্, বেশ, তা যেন হল। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই, মেয়েটা তোমার কাছে গিয়েছিল কেন?'

বললাম, 'কথাবার্তা নেই নয়, ছিল।'

'ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আলাপ পরিচয় ছিল বলেই গিয়েছিল। আপনি মনে করে দেখুন, দুপুরবেলা সমুদ্রে স্নান সেরে, মেয়েটিও হোটেলে গিয়েছিল, আপনি দেখেছিলেন।'

'আহা, সে তো দেখেছি বটেই, দেখেছি বটেই। কিন্তু সাঁঝবেলায় আবার একলা একলা গিয়েছিল কেন?'

খেঁকিয়ানন্দের কথার মধ্যে একটা কটু সন্দেহের সুর। তার মধ্যে একটা খোঁচাও আছে, যেটা অপমানের মতো বাজে। এত জেরা ভালো লাগল না। বললাম, 'বলেছি তো আলাপ পরিচয় ছিল, এবং সেজন্যেই মেয়েটি গিয়েছিল।'

খেঁকিয়ানন্দ বললেন, 'পথের আলাপ পরিচয়, খবর আমি সব পেয়েছি। তাতে দুঃখ থাকুক, যাই থাকুক, তোমার কাছে ছুটে গেল কেন?'

বিরক্তি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠল। বললাম, 'দেখুন খেঁকিয়ানন্দ, ওসব কেন-টেন আমি জানি নে। ওর ইচ্ছে হয়েছিল, তাই গিয়েছিল।'

খেঁকিয়ানন্দ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ, মোটেই তা নয়। কুহক, কুহক হে!'

'কুহক!'

'হ্যাঁ, কুহক। 'অল্প বয়সী বালা, গাঁথনি কুহক মালা, থোড়ী দরশনে আশ না মিটল, বাঢ়ল মদন জ্বালা।' এদিকে যখন মেয়ের কাকী পিসীদের ভয়, মেয়ে বিবাগিনী হল, না কি আত্মঘাতিনী হল, তখন দেখলাম মেয়ের ভার ভার মুখখানিতে কেমন যেন একটু টসটসে হাসির আভাস। ওসব তো আমার কাছে লুকোনো চলবে না। দেখি, দেখি তোমার ডান হাতখানা একবার দেখি, হাতের রেখাগুলো একবার বিচার করি। নিশ্চয় তোমার শুক্রস্থানে একটা বেকায়দার ব্যাপার কিছু আছে।'

খেঁকিয়ানন্দ হঠাৎ আমার হাত ধরে টানলেন। এবং সব থেকে আশ্চর্য, আমরা তখন স্বর্গদ্বারের শ্মশানের কাছে এসে পড়েছি। পথের আলো অত্যন্ত নিষ্প্রভ। উনি আমাকে আলোর জন্যে জ্বলন্ত চিতার দিকে টেনে নিয়ে চললেন। চিতার আলোয় উনি আমার হস্তরেখার শুক্রস্থানের বেকায়দা খুঁজে বের করবেন। অন্য সময় হলে কী হত জানি নে, কিন্তু বিরক্তি আমার শেষ সীমায় পেঁৗছেছে। দেখলাম, খালি গায়ে কিছু শোকগ্রস্ত লোক এখানে সেখানে, চিতার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তারা সকলেই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল আমাদের দিকে।

আমি হাত টেনে নিয়ে বললাম, 'আঃ, ছাড়ুন। প্রথম কথা, একটি মেয়ের সম্পর্কে এসব চিন্তা করবার অধিকার আপনার নেই। দ্বিতীয় হল, আপনার এসব কল্পনা আর আবিষ্কারের কোনো ভিত্তি নেই।'

বলে আমি হোটেলের দিকে হাঁটা ধরলাম। খেঁকিয়ানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার সমস্ত মনটা বিষাদে বিরক্তিতে যেন পূর্ণ হয়ে গেল। জীবনের এ কী গোলক ধাঁধাঁ, যা ছেড়ে আসতে চাই, ছাড়িয়ে আসতে চাই, তা-ই আমার পিছু আসে। বেড় দিয়ে ধরে।

মনে করেছিলাম, খেঁকিয়ানন্দ আর অনুসরণ করবেন না। কিন্তু পিছনে ডাক শুনতে পেলাম, 'শোন।'

আমি ফিরে না তাকিয়েই বললাম, 'বলুন!'

'তুমি আমাকে অপমান করছ কর, কিন্তু তোমাকে আমি কোন দোষ দিয়েছি?' খেঁকিয়ানন্দের গলায় রীতিমত ক্রোধের সুর।

বললাম, 'দোষ দিয়েছেন কি না জানি নে।'

আমি চলতে চলতেই কথাটা বললাম। কয়েক মুহূর্ত খেঁকিয়ানন্দের গলার স্বর শুনতে পেলাম না। পায়ের শব্দও পেলাম না পাশে পাশে। কী হল? একটু কৌতূহলিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। দেখলাম, খেঁকিয়ানন্দ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আমি মুখ ফেরাতেই বললেন, 'তুমি বলতে চাও আমি কানা? আমার চোখ নেই? যদি কোনোদিন চোখ ফোটে তো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখো।'

বলেই পিছন ফিরে হনহন করে চলে গেলেন। আমি তখন স্বর্গদ্বারের মোড় পেরিয়ে, হোটেল-পাড়ার সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি। খেঁকিয়ানন্দ হঠাৎ ফিরে যাওয়ায় একটু থমকে গেলাম। সমুদ্রের বালুবেলা একেবারে জনহীন। রাস্তাটাও নির্জন। সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকিয়ে, মনে মনে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি কী দেখব?

রেণুর মুখটি আমার মনে পড়ল। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে, ঘণ্টাখানেক আগে তার সেই মুখ আমার মনে পড়ল। স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র মুখ। আজ যেন চোখের জলে ওর সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গিয়েছে। আজ যেন ওর সমস্ত চোখে মুখে, যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উজ্জ্বল আলোর ছড়াছড়ি দেখেছি আমি। কিন্তু তার মধ্যে আমি খেঁকিয়ানন্দর রহস্যের ছায়া তো কিছু দেখি নে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এখনো সেই কুহেলি হাসি তার যেন শুভ্র তরঙ্গে তরঙ্গে। কেমন একটা ছায়া ছায়া আবেশে আকাশ সমুদ্র একাকার। তার মধ্যে কেবল শুভ্র হাসি, বহু দূর দূরান্ত থেকে যেন আপনাকে বিস্তার করতে করতে, বিস্ফারিত হয়ে ফেটে পড়েছে। তার কুহেলি অস্পষ্টতা থাক, ছায়ার আবেশ থাক, নিরন্তর চলমানতায় তো কোথাও বন্ধগতি স্তব্ধতা আসে নি।

আমি তো এসেছি এই নিরন্তরতায়। কোনো মুখের ছবির ছায়ায় আমার নিরন্তরতা বাঁধা পড়বে না। হয় তো প্রাণের ঝুলি পূর্ণ হয়ে উঠবে অনেক জটিলতার ভারে। বিশ্বসংসারের সকল দায় এড়িয়ে যাব, তেমন ক্ষমতা আমি পাই নি।

হোটেলে যখন ফিরলাম, তখন রাত্রি নটাও বাজে নি। এসে দেখলাম, মহিমবাবু একলা বসে আছেন তাঁর চেয়ারে। দু একজন নতুন লোকের আনাগোনা দেখে মনে হল, নতুন যাত্রী এসেছে। এ সময়ে কোথা থেকে কী গাড়ি পুরীতে আসে জানি নে। দেখলাম, দেয়ালের দিকে মেঝেতে আরো দুটি লোক বসে আছে। তাদের গায়ে কোনো জামা নেই। কাপড়ও হাঁটুর ওপরে।

মহিমবাবু তাঁর শার্দুল চোখে আমাকে কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'সিদ্ধকামবাবু কোথায় গেলেন?'

'ওপরে।'

বলেও মহিমবাবু চোখ নামালেন না। আমি অস্বস্তি কাটাবার জন্যেই বললাম, 'নতুন লোক এসেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

সংক্ষিপ্ত জবাব। জানি, মহিমবাবু সরাসরি কৈফিয়ৎ কিছু চান না। কিন্তু রেণুর সঙ্গে চলে যাওয়ার কথাটাই, একরকমের জিজ্ঞাসা হয়ে ওঁর চোখে ভাসছে। কী করে বোঝাই, আমার বলার বা ব্যাখ্যা করবার কিছু নেই।

মহিমবাবু নিজেই হঠাৎ বললেন, 'মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে এলে?'

'হ্যাঁ।'

'এবার এদের সঙ্গে কথা বলে নাও, অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছে। এঁরাই তোমাকে কোনারক নিয়ে যাবে।'

বলে তিনি, মেঝেয় বসা লোক দুটির দিকে নির্দেশ করলেন। আমি ব্যস্ত উৎসুক চোখে তাদের দিকে ফিরে তাকালাম। বললাম, 'ও, এসে গেছে?'

লোক দুটি দেখলাম বাংলা বোঝে। আমার দিকে দণ্ডবৎ হয়ে নমস্কার করল। আমি মহিমবাবুর দিকে ফিরে তাকালাম। উনি বললেন, 'কোন্ পথে যেতে চাও, ওদের বল। ওরা খাস কোনারকেরই গাড়োয়ান। আমি ওদের জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, কোথাও জল ভাঙতে হবে কি না। ওরা বলছে, বৃষ্টি তেমন হয় নি, এক জায়গায় সামান্য জল ভাঙতে হবে।'

একজন গাড়োয়ান জানাল, 'হঁ বাবু, একটু জলে হাঁটতে হবে, বরষাকাল তো। তবে খুব কম। আপনি একলা যাবেন তো বাবু?'

আমি কথা বলবার আগেই মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবু একলাই যাবেন। পুরী থেকে লিয়াখিয়া হয়ে একেবারে কোনারক। একবার লিয়াখিয়ায় বিশ্রাম নিলেই হবে। অথবা রামচণ্ডীতেও বিশ্রাম নিতে পারবে একবার।'

গাড়োয়ান বলল, 'রামচণ্ডীতে বিশ্রাম দরকার হবে না বাবু। লিয়াখিয়াতেই ভালো।'

'তা সে পথ চলতে যা হোক একটা বেছে নিলেই হবে।'

এদিকে আমার ভিতর ফাটছে, মুখ ফুটছে না। ওদিকে ব্যবস্থা সব পাকাপাকি, এদিকে আমার পা বাঁধা। বলে উঠলাম, 'কিন্তু একটা কথা আছে।'

'কী কথা?'

মহিমবাবু ফিরে তাকালেন। প্রায় ভয়ই করতে লাগল আমার। তবু না বলে উপায় নেই। বললাম, 'আরো দুটো গরুর গাড়ি চাই।'

'আরো দুটো?'

মহিমবাবুর গোঁফজোড়া প্রায় ঝুলে পড়ার মতো হল। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন?'

আমি বাইরের দিকে হাতটা দেখিয়ে বললাম, 'ওঁরাও যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছেন।'

মহিমবাবু দরজার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'কারা? ওখানে কারা আছে?'

আমি বললাম, 'না না, ওঁরা এখানে আসেন নি এখন। সকালবেলা যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথা বলছি।'

মহিমবাবুর গোঁফজোড়া খাড়া হল। চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

আবার বললাম, 'আমি যাব শুনে, ওঁরাও যাবার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।'

মহিমবাবু প্রায় একটা হুংকার দিলেন, 'হুম্! তা তোমার ব্যাপার তুমি দেখ। হ্যাপা যদি পোয়াতে পারো, নিয়ে যাবে।'

'হ্যাপা পোয়ানোর বোধ হয় কিছু নেই। ওঁরা সকলেই মোটামুটি সমর্থ—।'

'কিন্তু মহিলা। এ রকম যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তা বেশ। যাক গে, আমি কোনো বক্তৃতা দিতে চাই নে। কাঠ খেলে শুনেছি আঙরা ত্যাগ করতে হয়। যা পারো তাই করবে।'

গাড়োয়ানদের দিকে ফিরে বললেন, 'কী রে, তোদের গাড়ি ক'টা আছে?'

গাড়োয়ান বলল, 'আজ্ঞে গাড়ি তো এখন দুটো আছে। তিনটে গাড়ি নিতে হলে আরো দুটো দিন বসে থাকতে হবে। আমাদের আরো কয়েকখানা গাড়ি এসে পড়বে।'

মহিমবাবু আমার দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন। আমি বললাম, 'তাহলে দু দিন অপেক্ষাই করা যাক। তোমরা বরং আরো দুটি গাড়ির ব্যবস্থা কর।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।'

গাড়োয়ানরা বিদায় নিতে যাচ্ছিল। মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'ওরে শোন্, তাহলে তোরা বালিঘাই আর লিয়াখিয়া দিয়ে যাস্। পথের দু জায়গায় বিশ্রাম না নিলে হবে না।'

গাড়োয়ান দুজনেই বলে উঠল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, যেমনটি বলবেন।'

ওরা বিদায় নিল। দেখলাম, মহিমবাবু চুপ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হল, আমার সঙ্গে আর ওঁর কথা বলার ইচ্ছে নেই। ভাবে মনে হচ্ছে, আমি কোনো অপরাধ করেছি। এক্ষেত্রে কী বলার আছে, বুঝতে পারছি নে। উনি যদি আমাকে কোনোরকম ভুল বোঝেন, তাহলে আমার কষ্টই হবে।

আমি ওপরের দিকে পা বাড়ালাম। পিছনে মহিমবাবুর গলা শোনা গেল, 'ওঁদের তাহলে জানিয়ে দিও, কী কী নিয়ে যেতে হবে। খাবারদাবার যা-ই নিন, নেবেন। বলে দিও, মশারিটা এসেন্শিয়াল।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

'কথাটা তোমার ক্ষেত্রেও তাই।'

'আমাকে তাহলে আপনাদের মশারিটাই—'

'হ্যাঁ, আমাদের মশারিটাই, অনুগ্রহ করে আপনিই ব্যবহার করবেন, ওটা আর কাউকে দয়া করে দিতে যাবেন না। তাহলে মশার কামড়েই শেষ হয়ে যাবেন।'

আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ওপরে উঠে গেলাম। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আলো জ্বালানো ছিল না। গাড়ি-বারান্দার ছাদের দরজাটা খোলা, তাই একেবারে অন্ধকার মনে হচ্ছে না।

ঘরে ঢুকেই ছাদের বাঁদিকে লক্ষ্য পড়ল। সেখানে একটা টেবিল, গোটাকয়েক চেয়ার সব সময়েই পাতা থাকে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, সিদ্ধকামবাবু বসে আছেন। পানীয় সহ গেলাসও দেখছি টেবিলে রয়েছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ছাদের সুইচটা টিপে দিতেই সিদ্ধকামবাবু ধমকে উঠলেন, 'কে, কে আলো জ্বালছে!'

উনি ফিরে তাকালেন। দেখলাম, ওঁর গোটা মুখটা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছে। রক্তাভ উজ্জ্বল চোখের ওপর চোখ রাখা কঠিন। বললাম, 'আমি।'

বলে উঠলেন, 'নেবাও নেবাও, তাড়াতাড়ি বাতি নেবাও।'

আমি সুইচটা অফ করে দিলাম। সিদ্ধকামবাবু শব্দ করলেন, 'আঃ! এই তো বেশ! বাতি জ্বালিয়ে তুমি একেবারে আকাশ পাতালের ফারাক করে দিয়েছিলে। বস।'

এক পাশের একটি চেয়ারে বসলাম সমুদ্রের মুখোমুখী হয়ে। সিদ্ধকামবাবু গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে ঠক করে গেলাসটা রাখলেন। কাপড়ের কোঁচা তুলে মুখ মুছলেন। ভাবলাম, হয় তো কিছু বলবেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। কাত হয়ে এলিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে রইলেন। অস্পষ্ট আলোয় বুঝতে পারলাম না, ওঁর চোখ বুজে আসছে কি না। আমিও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে রইলাম।

কতক্ষণ একভাবে বসেছিলাম জানি নে। এক সময়ে মনে হল, আমি যেন আর তীরে নেই, সমুদ্রের তরঙ্গে দুলে দুলে ভাসছি। আমার সারা জীবনের সকল মানুষ, সকল পরিবেশ যেন এই অশেষ, দিগন্তহীনের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আমি ভেসে চলেছি, কিন্তু কিছুই ছাড়িয়ে যেতে পারছি নে। আমি কোথায় চলেছি, তাও জানি নে। অথচ আমি কিছুই ফেলে যাচ্ছি নে। দেখলাম, নিরন্তরের যাত্রা আমার একলার নয়, সকল বিশ্বসংসারও চলেছে।

হঠাৎ আমার নামটা আমি শুনতে পেলাম। কে যেন আমাকে গম্ভীর ক্লান্ত গোঙানো স্বরে ডাকছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতোই সাড়া দিলাম।

'তোমাকে সন্ধ্যেবেলা যে মেয়েটি ডেকে নিয়ে গেল, ও কে?'

আমার চমক ভাঙল। আমি আমার আচ্ছন্নতা থেকে নোঙর-ঘর হোটেলের গাড়ি-বারান্দার ছাদে ফিরে এলাম। দেখলাম, সিদ্ধকামবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু তাঁর শরীর তেমনি এলানো, অনড়। মুখ সমুদ্রের দিকে।

বললাম, 'ওর নাম রেণু, পথেই পরিচয়।'

সিদ্ধকামবাবু একই ভাবে বললেন, 'বড় বেদনাহত। মনটা অসুখে ভরা। ওর একটু শুশ্রূষার দরকার। মুখখানি বারবারই মনে পড়ছে। এ মুখগুলো বড় চেনা। বড় চেনা।...'

আমি গভীর বিস্ময়ে কথাগুলি শুনলাম। সিদ্ধকামবাবু চুপ করলেন। আমি

ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। উনি তেমনি অনড়। এ কি শুধু মাতালের প্রলাপ? যিনি শুধু আগুন আগুন করে পাখা ঝাপটে মরছেন, যাঁর চোখের চারপাশের গভীর পরিখায় দেখছি ভোগের অসুস্থ কালো অন্ধকার, রেণুর বেদনাহত মুখ তাঁর কেন বড় চেনা বলে মনে হয়?

আশ্চর্য! মানুষ, মানুষই দেখছি চির-চেনার সীমায় থেকে চির অচেনা হয়ে ফেরে! সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। নিরন্তরের সেই ফেনিলোচ্ছল শুভ্র হাসি ঝলকাচ্ছে।

পরদিন সারাটা সকাল দুপুর কাটিয়ে দিলাম ঝাউবনের সীমায় বসে। হালকা মেঘ সারাদিনই আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে। সমুদ্রের দিগন্তে সব সময়েই প্রায় চিকুর হানাহানি করছে। বজ্রের সর্প-জিহ্বা অনবরতই দূরের আকাশটাকে ছোবলাচ্ছে।

সিদ্ধকামবাবু সকালবেলাই চলে গেছেন। যাবার আগে বারবার অনুরোধ করে গেছেন, রম্ভায় যাবার জন্যে। কথা দিয়েছি, কোনারক থেকে ফিরেই যাব। কিন্তু রেণু সম্পর্কে উনি আর আমাকে কিছু বলেন নি।

বিকেলের দিকে একবার আশ্রমে গেলাম। ওঁদের যাবার আয়োজনের প্রস্তুতি-পর্বটা যাতে ঠিকমত হয়। শিবিদি দেখেই বললেন, 'এবেলা যদি না আসতিস তা হলে মনে করতুম, তুই আমাদের ওপর চটেছিস। তা হলে আমরাও কোনারক যেতাম না।'

ছোটবউদি আজ তাঁর গুরুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ করিয়ে দিলেন। সর্বেশ্বরদেব গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, 'জয়গুরু জয়গুরু। এ তো আমার চেনা মুখ দেখছি। এস, আমার কাছে এসে বস।'

একবার দ্বিধা করে প্রণাম সেরে বসলাম। সর্বেশ্বরদেব বললেন, 'যামিনীর (ছোটবউদি) মুখে তোমার কথা শুনেছি। তা দেখছি যামিনী ঠিক যেমনটি বলেছে, তুমি তেমনটিই। দেখি একবারটি।'

ধর্মের দেখছি সবই বিচিত্র! সব কিছুতেই রহস্য। আমি মুখ তুললাম। সর্বেশ্বরদেব বললেন, 'সব ঠিক আছে, কেবল একটু স্থির হওয়া দরকার। তামাক চলে?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আজ্ঞে না।'

সেখান থেকে উঠে আবার ছোটবউদিদের ঘরে। সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি, রেণুকে নয় কেবল। চায়ের আসর বসবার আগেই তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'রেণু কোথায়?'

ছোটবউদি সমুদ্রের দিকের দরজাটা খুলে দিলেন। দেখলাম, বালুর উঁচু ঢিপির চূড়ায় রেণু সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। কেন জানি নে, রেণুকে আমার কেমন যেন একটু নতুন লাগছে। অথচ ওর বেশেবাসে কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছি না। তবু মনে হচ্ছে, একটু অন্যরকম।

চা-পর্বের মধ্যেই কোনারক যাত্রার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিলাম। যখন উঠলাম, তখনো দিনের আলো আছে। পশ্চিমের আকাশে হালকা মেঘে অস্তাভার রক্তিমতা। মেঘ না থাকলে হয় তো রোদ দেখা যেত।

রেণু কখন উঠে এসেছিল লক্ষ্য করি নি। আমি বেরুবার উদ্যোগ করতেই, দরজার পাশ থেকে বলে উঠল, 'সমুদ্রের ধার দিয়ে চলুন না, আমি একটু সঙ্গে সঙ্গে যাই।'

বলে, রেণু ছোটবউদির দিকে তাকাল। ছোটবউদি বললেন, 'যা না, ঘুরে আয়। বেশী দেরী করিস নে।'

শিবিদি বললেন, 'হ্যাঁ বাপু, দেখিস আবার, খুঁজতে-টুজতে না বেরুতে হয়।'

রেণু একটু হাসল। আমি একবার ছোটবউদির দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেলাম।

বালি ভেঙে, একবারে সমুদ্রের ধারে চলে গেলাম। রেণুও এসে দাঁড়াল। আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম। কাছে এসেও আমার সেই রকমই মনে হল, কোথায় যেন একটু নতুন লাগছে রেণুকে।

পরমুহূর্তেই মনে হল, রেণুর চুলে তেল পড়েছে, চুল টেনে বেঁধেছে, যেটা এতদিন একবারও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তারই সঙ্গে ধোপদুরস্ত কালোপাড় শাড়ি ও শাদা জামা। সব মিলিয়ে, একটি অটুট পরিচ্ছন্নতাই, পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগিয়েছে।

রেণু বলল, 'বসবেন না হাঁটবেন?'

বললাম, 'যা বলেন।'

'আপনার বুঝি কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই?'

রেণুর পরিচ্ছন্ন মুখে লাল মেঘেরই ছায়া পড়েছে যেন। বললাম, 'আপাতত আপনার ইচ্ছেটাকেই শিরোধার্য করতে চাই।'

'তা হলে চলুন, ওখানটায় বসি।'

রেণু একটু দূরেই একটি বালু-ঢিপির নিচের অংশ দেখিয়ে দিল। দুজনেই এগিয়ে গিয়ে সেখানে বসলাম। রেণু আমার মুখের দিকে তাকাল। যেন কী বলতে চায় ও। বললাম, 'কী?'

রেণু মুখ নত করে শুধু উচ্চারণ করল, 'বলব।'

আমার মনে পড়ে গেল, রেণু ওর কথা আমাকে বলতে চেয়েছে। জানি নে, তাতে কার দুঃখ কিংবা সুখ বাড়বে। দুজনের মধ্যে কেউ আড়ষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ব কি না। কিন্তু রেণুর মুখে এই বলার মধ্যে যদি কোথাও ওর জীবনের শান্তি থাকে, ও যদি মুক্তি পায়, পথ চলায় সেটাও আমার পরম সৌভাগ্য বলে মেনে নেব। বললাম, 'নিশ্চয় বলবেন।'

রেণু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোনো দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে না তো?'

বললাম, 'আপনার না হলে, কোনো কারণ নেই।'

রেণু আবার তাকাল আমার দিকে। তারপর ওর কাহিনী বলল। খুব সাধারণ এক কাহিনী, যা এই বিশ্বচরাচরে প্রতিদিন সম্ভবতঃ অগণিত ঘটছে। ছোটবউদি যা বলেছিলেন, তার থেকে একটু বিশদ। যা ছোটবউদির অজ্ঞাত, যে-কথা রেণু মুখ ফুটে তাঁকেও বলতে পারে নি। ছোটবউদি শুধু প্রত্যাখ্যানের কথাই জানেন। তার চেয়ে বড় অপমান, রেণু প্রতারিত হয়েছে।

'...সেই নিখিল,' রেণু বলল, 'সেই নিখিলের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে আমার বুক কাঁপছিল। ওদের পারিবারিক জীবন, বংশ মর্যাদা, জাতের বিচার, যেগুলো বাবার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল, সে সব তো কখনোই চিন্তা করি নি। ভালোবাসা যে কাকে বলে, তাও আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। শুধু এইটুকু জানতাম, নিখিল সব। নিখিল ছাড়া জীবনের একটা বিন্দুও নেই। তাই, আমার কাছে অপ্রাপ্য তো ওর কিছুই থাকতে পারে না। চাওয়া পাওয়ার কথা ভাববই বা কেমন করে। যাকে সবটুকুই দিয়েছি, সে কতখানি নেবে না নেবে, তার হিসেব আমি কেমন করে রাখব? আমি আমার জন্যে কিছুই রাখি নি। সব ওকে তুলে দিয়েছি।...কিন্তু বাড়িতে নানান্ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, নিখিলের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। নিখিলও আসত। সেজন্যেও অনেক অপমান গঞ্জনা সহ্য করেছি। আস্তে আস্তে মনে হল, আমার বুকটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কোথাও নিখিলের দেখা পাই না। মনের মধ্যে নানান্ সন্দেহ ছোবল মারতে লাগল। নিজেকে শাসন করলাম, যা তা ভাবলাম। বারে বারে বললাম, আমি ছোট, আমি নীচ, তাই নিখিলকে সন্দেহ করছি।...কিন্তু এই চোখ দুটি যদি না

থাকত, যদি অন্ধ হতাম, যদি কান দুটি থাকতেও শুনতে না পেতাম, তা হলে বেঁচে যেতাম। দেখলাম, আমি একলা নয়, আমার মতো অনেক রেণু ওর আছে। তারা কেউ আমার মতো করেই ওকে দিয়েছে কিনা জানি নে, কিন্তু আমি ওর কাছে সকলের সমান। রাগ করেছি, অপমানে মুখ গুঁজে থেকেছি। তবু থাকতে পারি নি, নিখিলের কাছে ছুটে গিয়েছি, ওর পায়ে পড়ে কেঁদেছি। বলেছি, এমনি করে, নিখিল, এমনি করে আমাকে ভেঙেচুরে দিয়ো না। এমনি করে একেবারে কালি মাখিয়ে দিয়ো না। নিখিল, ষোল বছর বয়স থেকে, আমার প্রথম চোখ মেলার সময় থেকে, এই সাত বছর তোমার মুখ ছাড়া আমি মুখ চিনি না।...'

বারবার ইচ্ছে করল, রেণুর হাতটা চেপে ধরি, ওকে একটু স্নেহ করে সান্ত্বনা দিই। মনের মধ্যে নানান্ স্বভাব-অভ্যাসের বাধা, পারলাম না।

এক সময়ে রেণু চুপ করল। আমি তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। যাবার জন্যে নয়। একটি অতি সাধারণ কাহিনীর ব্যথা যে অনেক সময়ে এত গভীর হয়ে বাজে, অস্থির করে তোলে, জানতাম না।

রেণু চোখ মুছল। এবং দেখলাম, রেণুর মুখে হাসি। বলল, 'উঠে পড়লেন যে?'

বললাম, 'এমনি।'

রেণু বলল, 'জানেন, কী মনে করবেন জানি না, নিখিলের ওপর থেকে আমার রাগ অভিমান সবই চলে যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না। ও যেন এতদিন একটা ভয়ংকর ভয়ের মতোই আমাকে ঘিরে ছিল। মনে হত, আমার চারদিকে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তাই কষ্টটাও ভীষণ হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর সে রকম কষ্ট আমার মনে হচ্ছে না।'

রেণুর চোখে জল, কিন্তু ও হেসে উঠল।—'কী মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে, নিখিল যা-ই করুক, ভালো বা মন্দ, ওর সবটা তো ও-ই ভোগ করবে। আমারটাও আমারই ভোগ করতে হবে। ওকে দায়ী করে, নিজেকে কেন অপমান করছি?'

আমি রেণুর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। চোখের জলে ভেজানো এমন সুন্দর স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি এর আগে কখনো রেণুর দেখি নি। ওর কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছিল, ওকে বোধ হয় এ কথাই আমিও বলতে চেয়েছিলাম। বললাম, 'আপনি যা ভাবছেন, তার নামই জীবন।'

রেণু আমার দিকে তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে নিল।

কোনারকের পথে চলেছি। দুর্গতি যে অনেক ছিল, আগে তা বুঝতে পারি নি। বাড়ি থেকে যখন গাড়ি ছেড়েছিল, তখন উড়িষ্যার ভিতরে গ্রামের অবস্থা কিছুই বুঝতে পারিনি। অন্ততঃ এক মাইল কি দেড় মাইল, পায়ের পাতা ডুবিয়ে শুধু জলের ওপর দিয়ে হেঁটেছি। তবু বলতে হবে, এ পথের আনন্দ ভোলবার নয়। লিয়াখিয়া পেরিয়ে যখন ছোটবউদিরা বালুচরে রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে রাত্রি এক অবিস্মরণীয় রাত্রি। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র আকাশের মেঘ তার হাত গুটিয়ে নেওয়া বন্ধুত্ব দান করেছিল। ত্রয়োদশীর চাঁদ ছিল আকাশে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায়, দূরের সমুদ্র পর্যন্ত প্লাবিত হয়েছিল।

আর পূর্ণিমার চাঁদের মতো একটি সুগোল টিপ পরেছিল সেদিন রেণু। সেইদিনই প্রথম দেখলাম, রেণুর গায়ে উঠেছে রঙীন শাড়ি। সেইদিনই প্রথম শুনলাম, রেণুর গলায় সুরের গুঞ্জন।

এক সময়ে ছোটবউদির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই, তাঁর চোখ ফেটে জল এসে

পড়ল। আমাকে কাছে টেনে চুপি চুপি বললেন, 'তোমার কি পরম ভাগ্য, আমার রেণুর গায়ে আবার সাজ তুলেছ তুমি।'

কী ভেবে বললেন ছোটবউদি জানি নে। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আমার জন্যে কেন ছোটবউদি। রেণু নিজেকে নিজেই সাজাচ্ছে।'

ছোটবউদি বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝো না। রেণুরও পরম ভাগ্য, তোমার মতো একজন বন্ধু পেয়েছে।'

বন্ধু! ছোটবউদি এমন সহজ সরল ভাবে বললেন, আমার অশান্তির সকল ছায়া দূর হয়ে গেল। আমরা সকলেই সমুদ্রের এই নির্জন তীরে, জ্যোৎস্না রাত্রে, বিচিত্র চড়ুইভাতিতে মেতে উঠলাম।

এক সময়ে রেণু আমাকে একলা পেয়ে বলল, 'একটা দীক্ষা দেবেন?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কী?'

'আপনার মতো পথে পথে এমনি করে ঘুরব।'

হেসে বললাম, 'রেণু, প্রকৃতি জয় বলে একটা কথা খুব শোনা যায়। আসলে জয় বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতিকে আর একভাবে কাজে লাগানো। তাই মেয়েদের সংসারের কথা বলে চিরাচরিত উপদেশ দিতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করা চলে না। তাকে নতুন আয়ত্বে নিয়ে এসে, তার হাত ধরেই চলা যায়। আমি আজ পথে, কাল হয় তো আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন?'

'সেখানে আমার কর্ম। জীবন সেখানে আর একটা হাত বাড়িয়ে আছে। মানুষ হয়ে জন্মেছি, ঋণ যে আমার অনেক। সেই বাড়িয়ে রাখা হাতের দেনা না মিটিয়ে কোথায় যাব?'

রেণু বলল, 'ঘরকে কি বাহির করা যায় না!'

একটু অবাক হয়ে রেণুর দিকে তাকালাম। বললাম, 'একাকারের সাধনা করি, আমাদের শক্তিতে কুলোয় না বলে ভাগাভাগি।'

রেণু দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি সে সাধনাই করব।...'

পরদিন কোনারক পৌঁছুবার আগেই, মাঠে হরিণের পাল চোখে পড়ল। সমস্তটা পথ শিবিদি অবুদি সেজদির জীবন কাহিনী শুনতে শুনতে এসেছি। তারপর দূর থেকে যে মুহূর্তে কোনারক চোখে পড়ল, প্রথমেই একটা আইডিয়া মনের মধ্যে ভেসে উঠল, ব্ল্যাক প্যাগোডা। দূর থেকে, কালো রঙের এক স্তব্ধ বিশাল কালো প্রস্তর স্তূপের মতো সূর্যমন্দিরকে দেখতে পেলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই পৌরাণিক কাহিনী; কৃষ্ণের ঔরসে শম্ভবতীর গর্ভজাত পুত্র, সুপুরুষ শাম্বের সঙ্গে কোনো কারণে দেবর্ষি নারদের বিবাদ হয়। দেবর্ষি নারদ তাঁর কৌশল অনুযায়ী শাম্বর ওপর প্রতিশোধ নেন। তিনি একদিন শাম্বকে নানান্ কথায় তুষ্ট করে ভুলিয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে যান, যেখানে কৃষ্ণের ষোলশো গোপিনী স্নানবিলাসে রত ছিলেন। শাম্বকে সেখানে পৌঁছে দিয়েই, নারদ অবিলম্বে কৃষ্ণকে খবর দেন। এদিকে গোপিনীরা শাম্বের রূপে মুগ্ধ হয়ে, সকলেই তাঁকে কামনা করতে থাকেন। এই সময়ে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হন এবং শাম্বকে সেখানে দেখেই ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার রূপ ও যৌবন, সমস্তই কুষ্ঠ রোগে বিনাশ হবে।' শাম্ব সেই মুহূর্তেই কুষ্ঠে আক্রান্ত হলেন। তিনি পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। শাম্বের কাছে সব শুনে কৃষ্ণের বোধোদয় হল। কিন্তু একবার অভিশাপ দিয়ে

আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বললেন, 'অভিশাপ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তুমি মৈত্রেয় অরণ্য সংস্কার করে, সেখানে গিয়ে বারো বৎসর সূর্যদেবের আরাধনা কর। তিনিই তোমাকে আরোগ্য করবেন।' শাম্ব তাই করলেন। বারো বৎসর কঠিন তপস্যার পর সূর্যদেব তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন। শাম্বের সর্বাঙ্গ তখন গলিত মথিত। সূর্যদেব তাঁকে চন্দ্রভাগা নদীতে ডুব দিয়ে আসতে বললেন। চন্দ্রভাগাতে স্নানের পর শাম্ব আবার তাঁর পূর্ব রূপ ও যৌবন ফিরে পান। পরদিন আবার স্নানের সময়, চন্দ্রভাগাতে স্বচ্ছ জলে তিনি একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কার করেন। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তিনি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সূর্যমন্দিরের সঙ্গে পুরাণের এই কাহিনী জড়িত। কিন্তু পুরাণকে বাস্তবে খুঁজে আমরা পাই নে। মানুষের বিশ্বাসকেই পাই। ইতিহাস তারই সাক্ষী দেয়। ইতিহাস বলে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষে প্রথম সূর্য উপাসনার শুরু। উত্তরাঞ্চল থেকে একদা ভারতের নানান্ অঞ্চলে সূর্য পূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকের ধারণা, বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান থেকেই সূর্যপূজার প্রচার কমে আসে। তবু জানি, এখনো বাংলা দেশে মাঘী সপ্তমীতে মেয়েরা সাতটি পাতা মাথায় নিয়ে অবগাহন স্নান করেন। সাতটি পাতা সাতটি অর্কের প্রতীক। সূর্যের সপ্তরশ্মির সপ্ত অর্ক।

পুরাণ থাক, ইতিহাসও থাক, সূর্যপূজার মাধ্যমে তো আমরা পবিত্র হতেই চেয়েছি। আমরা কেউ শাম্ব নই, আমরা কেউ শ্রীকৃষ্ণের অভিশপ্ত সন্তান নই। কিন্তু ইহকালের যে ক্ষণিক জীবন নিয়ে আমাদের সংসার যাত্রা। যেখানে ব্যাধি আমাদের প্রতি-মুহূর্তের সঙ্গী, মানুষ তার ক্ষণিক জীবন নিয়ে তাই সূর্যের পবিত্র কিরণকে প্রার্থনা করেছে।

সম্ভবতঃ বর্ষাকালের মরসুম বলেই ডাকবাংলোতে জায়গা পেয়ে গেলাম। তারপরে যখন মন্দিরের চত্বরে গেলাম, তখন মনে হল, যে-জীবন আমার প্রত্যহের নানান্ রূপের মধ্যে রয়েছে, তারই এক অপরূপ স্বপ্নময় পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমি নির্জন সৈকতের বুকে নিজেকে যে খুঁজতে চেয়েছিলাম, দেখলাম আমার আপনাকে দেখারই আয়না কোনারকের মন্দির গাত্র। কে বলেছিল, এ মন্দির অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ? যদি শিল্পের দেবতা কেউ থাকেন, তবে সেই সব রুচিবাগীশের জন্যে কি তিনি করুণা করে হাসেন নি! এই যে পাথরের বুকে মানুষ তার স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছে, একটা বিশ্বাস নিয়ে, বিশ্বাসের আনন্দ নিয়ে, আপনার স্বেদ মেদ অস্থি মজ্জা সকল কিছু উৎসর্গ করে, এ কি কখনো শুধু মাত্র বিকৃত বিলাস?...আমাকে ক্ষমা চেয়েই এক পণ্ডিতের উক্তির বিরোধিতা করতে হচ্ছে। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে তিনি বলেছেন, 'আধুনিক কুলী কামিনরা যেমন শ্রমের ফাঁকে ফাঁকে অশ্লীল গান গেয়ে, কথা বলে, হাসি ঠাট্টা করে, শ্রম অপনোদন করে, কোনারকের, এই বন্ধকাম মূর্তিগুলিও তাই। এই বিশাল মন্দির তৈরি করতে গিয়ে শ্রমিকদের আনন্দবর্ধনের জন্যেই এই সব মূর্তি তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে।' জানি নে, উড়িষ্যার ত্রয়োদশ শতকের রাজশক্তি শ্রমজীবিদের এই যশোবৃত্তির কাছে সত্যি আত্মসমর্পণ করেছিল কিনা। বিশ্বাস করতে বাধে। কিন্তু যদি শুধু মাত্র শ্রম অপনোদনের ফাঁকে ফাঁকেই বন্ধকাম মূর্তিগুলি তৈরি হয়ে থাকে, তবে এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করি, কোনারক মন্দিরের সমগ্র মূর্তির শতকরা প্রায় আশী ভাগই বন্ধকাম মূর্তি, সবগুলিই কী শুধু শ্রমিকদের বিশ্রাম বিলাস? শতকরা চল্লিশভাগ বন্ধকাম হলেও একটা বিশ্বাস-যোগ্য কথা ছিল। আর কোনারকের এ-মন্দির ও মূর্তি কি অশিল্পী শ্রমিকদের কীর্তি হতে পারে? শিল্পী ছাড়া এরূপ কল্পনা কি সম্ভব?

কিন্তু কেন এই কূট তর্ক মনে আসে? রূপের দুয়ারে বসে কেন অরসিকের ভাষণে

কান দিই? আমি যে দেখছি সুন্দর এখানে আপনার সকল বসন মুক্ত করেছে। মানুষ নামক জীবেরা সূর্যের স্পর্শে আপনাকে সকল আড়াল থেকে মুক্ত করে এসেছে। যে আলো পবিত্র, সে যে সকল অন্ধকারর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায়, সে যে আমার সবটুকুকে দেখায়। আমার সকল লজ্জা হরণ করে। এ কথা কোথাও লেখা নেই কোনারকে, এই চিত্রলেখাই জীবনের সার, মোক্ষ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কি একবার বুকে হাত দিয়ে তার তৃষ্ণার মূলকে স্বীকার করতে পারবে না? তার কর্মের মধ্যে কি জীবধর্ম কিছুই নয়? কিছু না হলে কি এই বিশাল মন্দির, হাজার হাজার মানুষের পরিশ্রম ঈশ্বরের দরবারে এমন করে কেউ উৎসর্গ করে?

আমি দেখলাম, শিবিদিরা সঙ্কোচে আমার সামনে থেকে চলে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু গেল না। আমার কথা ওকে বলতে ইচ্ছে হল, এই মন্দির সম্পর্কে আমার বিশ্বাসের কথা। আমি ওকে বললাম, 'ঈশ্বর বিশ্বাস করি কিনা, জানি নে, কিন্তু সূর্যকিরণের মতোই পবিত্রতা ও আনন্দকে বিশ্বাস করি। আমার কোনো কুসংস্কার নেই। আর এ কথাও বিশ্বাস করি নে, বিকার একটা এত বড় দেবমন্দির তৈরি করতে পারে।'

পূর্ণিমার দিন রাত্রে জ্যোৎস্নার প্লাবন নামল কোনারকের চত্বরে। শিবিদিদের সংস্কার ও লজ্জা কেটে গিয়েছে, দেখলাম অবুদি আর শিবিদি নাটমন্দিরের সামনে হাত ধরাধরি করে গুনগুনিয়ে ফিরছেন। ছোটবউদি আর সেজদি নাটমন্দিরের সিঁড়িতে যেন ধ্যানস্থ।

রেণু যেন ছায়াচারিণীর মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আমি যেন নিশি পাওয়ার মতো প্রতিটি মূর্তির পাশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। মৈত্রেয় অরণ্যের ঝাউবনের হাওয়ায় শন্‌শন্‌ শব্দ।

এক সময়ে মনে হল, কেউ নেই, সবাই চলে গেছেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, রেণুও নেই। আমি যেন সহসা নিজেকে খুঁজে পেলাম। এই অপরূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলাম, 'ভারতবর্ষ হে ভারতবর্ষ, তোমার এত বৈচিত্র্যের মাঝখানে, তোমার আত্মাকে একটু দেখতে দাও! একটু দেখতে দাও!...'

সহসা সামনের নিশ্চল স্তব্ধ কিন্নরী মূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখলাম। জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম, তার চোখে আলোর ঝিকিমিকি। তার শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার কেশপাশ বাতাসে দুলছে। আমি বলে উঠলাম, 'কে?'

জবাব এল, 'আমি রেণু।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যান নি?'

রেণু যেন অনেক দূর থেকে বলল, 'না। আপনার সঙ্গে যাব!'

সহসা আমার সংবিত ফিরল। আমার মনে হল, রেণুর গলায় একটা অবান্তর স্বপ্নের সুর। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'চলুন তাহলে যাই।'

রেণু বলল, 'এখুনি যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যান তাহলে, আমি থাকি।'

'সেটা উচিত হবে না। অনেক রাত হয়েছে, আপনাকে একলা রেখে তো আমি যেতে পারব না।'

রেণু কোনো কথা বলল না। চুপ করে বসে রইল। আমি ডাকলাম, 'শুনছেন?'

রেণু জবাব দিল না। আমি আবার ডাকতে যেতেই রেণু বলল, 'আমাকে একটা

কথা বলবেন?'

'কী?'

'ধরুন যদি সুখের অবধিও না থাকত, তবু বেঁচে থাকার কি সার্থকতা?'

আমি অবাক হয়ে রেণুর দিকে তাকালাম। আমি যেন রেণুর মুখে, শেষ প্রশ্নের পর, শেষ যাত্রার ধ্বনি শুনতে পেলাম। যে-যাত্রা ভারতকে তার সকল সুখ থেকে বৃহৎ জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে, তার সুখের থেকে অনেক বড়, নিত্যে, অরূপে। রেণুর মনে হয় তো বেদনা থেকেই এ প্রশ্ন জেগেছে।

আমি পরিবেশকে একটু হাল্কা করার জন্যেই হেসে বললাম, 'দেখুন, সব কথার জবাব দিতে পারব, তা নয়; তবে আমি বিশ্বাস করেছি, প্রতিটি মুহূর্তের কাছে নিজেকে নিয়ত উৎসর্গ করা, যাতনা থেকে আনন্দের রস আহরণ করা।'

দেখলাম রেণু যেন গভীরভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি সহজ ভাবেই ওর মাথায় একটি হাত দিলাম, সহজতর স্বরে বললাম, 'রেণু, একটু শান্ত হও।'

যখন জগমোহনে নেমে এলাম, দেখলাম নাটমন্দিরের সিঁড়ির কাছে ছোটবউদি চুপ করে বসে আছেন। অদূরে হাফপ্যাণ্ট পরে যে লোকটি ঘুরছে, চিনতে পারলাম সে চৌকিদার। সবাই গিয়েছেন, ছোটবউদি যেতে পারেন নি। রেণুকে ফেলে তিনি কেমন করে যাবেন?

কাছে যেতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'আমার হাতটা ধর, মনে হচ্ছে উঠতে পারছি নে।'

আমি ছোটবউদির এক হাত ধরলাম, রেণু আর এক পাশ থেকে ধরল।

পুরী ফিরে এলাম। প্রচণ্ড বর্ষা নামল কয়েক দিন ধরে। হোটেল থেকে একেবারে বেরুতে পারলাম না। সারাদিন আকাশ আর সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জিত লীলা দেখতে লাগলাম। সমুদ্রের কাছে থেকে মনে হল, সমস্ত পৃথিবী যেন থরথরিয়ে কাঁপছে।

যেদিন বৃষ্টি থামল, সেই দিনই রম্ভা যাবার জন্যে পথে বেরিয়ে পড়লাম। একবার মনে হয়েছিল, আশ্রমে ওঁদের সংবাদটা নিয়ে আসি। কিন্তু যাই নি। বারেবারেই মনে হয়েছিল, পথ-চলায় এত সৌজন্যতার শপথ তো আমার ছিল না। তবে খেঁকিয়ানন্দকে খুবই আশা করেছিলাম। একদিনও আসেন নি। মহিমবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'গাঁজাখোর বোষ্টম, কোথায় গিয়ে পড়ে আছে, কে জানে। এলে তবু একটু গান শুনে বর্ষাটা কাটানো যেত।'

রম্ভা। একদিকে পূর্বঘাট পর্বত, আর একদিকে চিল্কা হ্রদ অর্ধচন্দ্রাকারে শেষ হয়েছে, সেইখানেই রম্ভা। সিদ্ধকামবাবু যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনটিই। রম্ভারা আছেন কিনা জানি নে, তবে প্রকৃতিটি পুরোপুরি অপ্সরীদের বাসযোগ্য, সন্দেহ নেই।

সিদ্ধকামবাবুর ডেরা খুঁজে পেতে দেরী হল না। তাঁর বাসস্থান দেখে মনে হল, কোনো প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। দেখা হতেই, বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুদিনের জায়গায় দশদিন আটকে রাখলেন। আদিবাসী জীবন থেকে শুরু করে, রম্ভাদের দূর অন্দরমহল পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বিচরণ করলেন। আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়েছে এখানে রম্ভাদের বাস। সিদ্ধকামবাবুর প্রাসাদেই দেবদাসী নৃত্য দেখেছি। আরো দেখেছি, সিদ্ধকামবাবুর প্রাসাদেই অনেক রম্ভাদের বাস। এবং তারা

যে সকলেই সিদ্ধকামবাবুর আশ্রিতা ও রক্ষিতা, তাও জেনেছি। উনি যে বলেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে আছেন, সেটা মিথ্যে নয়। ভোগের আগুনের মধ্যেই ওঁর বাস। এই পোড়ার আনন্দের মধ্যে কতদিন টিকে থাকবেন, কে জানে।

সিদ্ধকামবাবু আমাকে নিয়ে নৌকায় করে চিল্কার দ্বীপে দ্বীপে গিয়েছেন। দ্বীপের এক প্রাসাদে রাত্রি যাপনও করেছি এবং সেখানে ভোগ ও নগ্নতার ভয়াবহ রূপ দেখেছি। ভোগের মধ্যে আর একটি, সিদ্ধকামবাবুর পাখি শিকার। যে-শিকার শুধু শিকারের জন্যেই। দেখেছি অজস্র পাখি হত্যা করে শুধু চিল্কার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন আর হা হা করে হেসেছেন।

চিল্কার বুকে, একদিন একটি গাছপালা তৃণহীন রুক্ষ পাথুরে দ্বীপ দেখিয়ে বললেন, 'স্থানীয় লোকেরা নাকি এখানে ঈশ্বরের কাছে মানত পশু উৎসর্গ করে যায়। নিজেদের হাতে হত্যা করে না। মুরগী অথবা পাঁঠা, ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়ে যায়। আর এই পাথুরে রুক্ষ দ্বীপে, খাদ্যাভাবে কয়েকদিন পরে তারা আপনিই মরে যায়। বলি দেবার রূপটা একটু ভিন্নতর।'

সিদ্ধকামবাবু হেসে বললেন, 'মানুষ তার নিজের জীবনকে অনুকরণ করে। এই দ্বীপটাকে দেখলে, আমার মানুষের সমাজের কথাই মনে হয়। তারা ভাবে না, এই পৃথিবীর দ্বীপে মানুষও তাই।'

প্রতিবাদ নিরর্থক। কারণ, সিদ্ধকামবাবুর জীবনধারণের মধ্যে মানুষ উৎসর্গীকৃত বলি বলেই প্রতিভাত হয়। আমি দেখলাম, মহাশ্মশানেই উনি বাস করছেন।

বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় হঠাৎ সিদ্ধকামবাবু বললেন, 'সেই মেয়েটির কি খবর, যার নাম বলেছিলে রেণু?'

বললাম, 'ওরা আছে পুরীতে। কোনারক থেকে ফেরবার পর আর দেখা হয় নি।'

'ওর মনটা এখন ভালো আছে তো?'

'আগের থেকে ভালোই বোধ হয়।'

সিদ্ধকামবাবু আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বড় নিরপরাধ পবিত্র আর দুঃখী বলে মনে হয়েছিল।'

আবার নোঙর-ঘর হোটেল। সঞ্জয় প্রথমেই খবর দিল, 'আশ্রমের মা ঠাকরুনেরা রোজ আপনার খোঁজ করতে এসেছেন। বলেছেন, আপনি ফিরে এসেই, ওনাদের সঙ্গে দেখা করেন যেন।'

ফিরে এসে একটা দিন অপেক্ষা করে, আশ্রমে গেলাম। কেমন যেন নিঝুম মনে হল। ছোটবউদিদের দরজাটা যদিও খোলা, কিন্তু কারুর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বারান্দায় উঠে ডাক দিলাম, 'শিবিদি—'

কোনো সাড়া শব্দ নেই। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে উঁকি দিলাম। দেখলাম, একেবারে খালি নয়, তবে ঘরের জিনিসপত্র অনেক কম। আর একবার ডাক দিলাম, 'ছোটবউদি—'

কোনো সাড়া নেই। ঘরের মধ্যে পা দিলাম। দেখলাম, সমুদ্রের দিকে দরজাটা খোলা। রেণু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, স্বর্গদ্বারের দিকে মুখ করে। সমুদ্রের গর্জনে আমার ডাক ওর কানে পৌঁছয় নি। এত নিবিষ্ট হয়ে কী দেখছে রেণু? যেন কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি একটু এগিয়ে যেতেই রেণু ফিরে তাকাল। বিস্মিত হয়ে হাসতে গিয়েও যেন এক মুহূর্ত ওর বিশ্বাস করতে দেরী হল, আমাকেই দেখছে কি না। তারপরে প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'আপনি?'

বললাম, 'হ্যাঁ, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

রেণু কাছে এসে, মুখখানি হঠাৎ ভার করে বলল, 'কী করে বিশ্বাস করা যায় বলুন। কোনারক থেকে ফিরে যে ওভাবে হঠাৎ চলে যাবেন, বুঝতে পারি নি তো।'

'খবর দেবার সময় পাই নি।'

রেণু বলল, 'বড্ড দূরে যে, কী করে সময় পাবেন?'

রেণু মুখ নামিয়ে রাখল। বললাম, 'রাগ করেছ বুঝি?'

হঠাৎ দেখি রেণু দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, রাগ করে নি। কিন্তু ওর চোখের কোণে জল। অবাক হওয়ার চেয়ে, এই চোখের জলে আমি ভয় পেলাম বেশী। ডাকলাম, 'রেণু—'

রেণু তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, 'শিবিপিসীরা চলে গেছেন। খালি আমি আর ছোটকাকী আছি এখন।'

এ সংবাদে মনটা মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বললাম, 'চলে গেছেন!'

'হ্যাঁ। কলকাতা থেকে চিঠি এল, তাই আর থাকা হল না। শিবিপিসী আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।'

রেণু কুলুঙ্গি থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ দিল। আমি উৎসুক হয়ে চিঠি খুললাম। লিখেছেন, 'তুই যে ছেলে, এটা হাতেনাতে প্রমাণ করে গেলি। পাজী, তোকে যে কী বলে গালাগাল দেব, ভেবে পাচ্ছি নে। একেবারে গায়েব হয়ে গেলি? আমাদের কাঁদিয়ে বুঝি খুব সুখ পাচ্ছিস? না কি তোকে সবাই মিলে খুব কষ্ট দিয়েছি বলে, এমনি করে পালিয়ে গেলি? দেখিস্ রাগ করিস নে যেন। ছোটবউকে (ছোটবউদি) আজ বললাম, তোর মতো যদি আমার একটা ছেলে থাকত। তা দ্যাখ সময়কালে হলে সে তোর মতোই হত।'...

চিঠিটা আর পড়তে পারছি নে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। শিবিদির মুখখানা মনে পড়ছে, আর বুকের ভিতরটা বড় টনটনিয়ে উঠছে। লক্ষ্য করি নি, ছোটবউদি এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলে উঠলেন, 'দেখেছ তো, আমরাও তোমাদের কাঁদাতে পারি। যেমন না বলে কয়ে চলে যাওয়া, এখন বোঝ?'

রেণু যেন প্রতিজ্ঞা করে বসল, আমার নির্জন সৈকতের একলা নিবিড়তায় ও ঝিল্লিস্বর হয়ে থাকবে। আমার সকাল বিকাল ওর হেফাজতে। অন্য কোথাও সরে যেতে পারি। কিন্তু তা করি নে। আর কদিনই বা। আমার আবার যাবার সময় হল। ভুবনেশ্বর হয়ে, সমুদ্রের তীর ধরে আরো দক্ষিণে নেমে যাব এবার। সংবাদটা আগে ছোটবউদিদের জানাই নি।

যেদিন যাওয়া স্থির করলাম, সেদিন সকালবেলা আশ্রমে সংবাদটা দিতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই রেণু এসে পড়ল। দেখলাম, ওর চুল খোলা, মুখ কঠিন, দৃষ্টি স্থির। যেন দৌড়ে এসেছে, তাই হাঁপাচ্ছে। এমন করে সিঁড়ি ভেঙে একেবারে আমার ঘরে ওকে ছুটে আসতে দেখি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

রেণু প্রথমে কিছুই বলল না। একটা চেয়ারে চুপ করে বসে পড়ল মুখ নীচু করে। আমি কাছে গেলাম। রেণু মুখ তুলল, বলল, 'নিখিল এসেছে।'

'কে নিখিল?'

বলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। বললাম, 'কোথায়?'

'আশ্রমে।'

'তুমি এখানে এলে যে?'

'কথা বলে আর থাকতে পারলাম না।'

বলে রেণু আমার চোখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'নিখিল এসে ক্ষমা চাইছে।'

আমি সহসা কিছু বলতে পারলাম না। বলবার মতো কিছু আছে বলেও মনে হল না। আমি চকিতে একবার রেণুর মুখের দিকে দেখে, হেসে বললাম, 'তাই বুঝি?'

রেণুর গলায় যেন চাপা উত্তেজনার সুর, 'কিন্তু তাকে ক্ষমা করব আমি?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

দেখলাম রেণুর চোখে বিস্ময়, কিন্তু জলে ভিজে উঠেছে। প্রায় চুপি চুপি করে বলল, 'কাকে ক্ষমা করব আমি? নিখিলের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ওকে আমি চিনি নে। বিশ্বাস করুন, আমি যেন স্মরণ করতেও পারছি নে, ও একদা আমার পরিচিত ছিল। তাই আমার রাগ অভিমান কিছুই নেই, আমি কাকে ক্ষমা করব?'

আমিও অবাক হয়ে রেণুর দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নিজেই ও বিস্মিত। দেখলাম, নিখিলকে ও অনেক আগে ক্ষমা করেছে বলেই, ওকে একেবারেই ভুলে গিয়েছে। এর মধ্যে কোথাও বিদ্বেষ নেই।

রেণু আবার বলল, 'আমি নিখিলকে এ কথাই বলেছি। কিন্তু ছোটকাকী আমাকে বুঝতে পারছেন না। আমি কী করব?'

আমি বললাম, 'আর একবার ভাবো রেণু। ভবিষ্যতের কথা ভাবো।'

রেণু অপলক চোখে আমার দিকে দেখল। তারপর সমুদ্রের দিকে ফিরে বলল, 'ভেবেছি।'

এমন সময়ে একজন অচেনা লোক দরজায় এসে দাঁড়াল। একটি মঠের নাম করে বলল, 'অমৃতানন্দবাবাজীর বড় অসুখ। আপনাকে একবারটি যেতে বলেছেন।'

মহিমবাবুর মুখে শুনেছিলাম বটে, খেঁকিয়ানন্দ খুবই অসুস্থ। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'এখুনি যাচ্ছি।'

রেণু বলে উঠল, 'আমি যাব আপনার সঙ্গে?'

'যাবে? কিন্তু দেরী হলে ছোটবউদি ভাববেন।'

'আমি তো বলে এসেছি।'

'চল।'

পুরী শহরের এক অখ্যাত আখড়ার কাঁচা মাটির অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার ঘরে দেখলাম খেঁকিয়ানন্দ শুয়ে আছেন। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমাকে দেখে চোখ দুটি একবার বড় বড় হয়ে উঠল। তার পরে চোখের কোণ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল। আমি কাছে বসলাম। রেণুও বসল।

প্রায় স্খলিত ফিসফিস স্বরে খেঁকিয়ানন্দ বললেন, 'বালিশের তলায় একটা কাগজ আছে, বের কর।'

বের করে দেখলাম একটি চিরকুট, তাতে একটি ঠিকানা লেখা। 'শ্রীমতী ননীবালা দেবী। —গ্রাম। জেলা হুগলী।'

খেঁকিয়ানন্দ বললেন, 'একবারটি এই ঠিকানায় যেয়ে, তাকে বোল, এই পঁচিশ বছর তাকে ছেড়ে যে ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, সে ঈশ্বরকে খুঁজে পাই নি। শুধু তার কথাই ভেবেছি, তার মুখই মনে পড়েছে। সে-ই আমার ঈশ্বরের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে।...'

জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কে?'

প্রায় অস্ফুটস্বরে বললেন, 'ননীবালা আমার পরিবার।'

রেণু ওর হাত খেঁকিয়ানন্দের কপালে মুখে বুলিয়ে দিল। ওর চোখও শুষ্ক নেই। বেলা প্রায় চারটের সময় অমৃতানন্দ মারা গেলেন। ফিরে আসতেই আমারও যাবার সময় হয়ে গেল। আবার সেই ঝুলি কাঁধে।

রেণু অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন এখন?'

বললাম, 'আজ ভুবনেশ্বর, তারপরে অন্য কোথাও। আমি আর আশ্রমে যাবার সময় পাব না, তুমি একটু ছোটবউদিকে বলে দিও, কেমন?'

রেণু যেন বিশ্বাস করতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত, তারপর হঠাৎ ওর মুখখানি হাসিতে ভরে উঠল। স্নিগ্ধ সুন্দর সেই হাসিতে চোখের জলটাও যেন একটি আনন্দের ঔজ্জ্বল্যে চিকচিকিয়ে উঠল। ও নত হয়ে আমার পায়ে হাত দিতে গেল। বাধা দিয়ে আমি ওর হাত ধরলাম। এই হাসিটুকুর জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। রেণু যেন আমাকে মস্ত বড় একটা সাহস দিল। কিন্তু সে কথা আমি ওকে বললাম না।

রেণুই আবার বলল, 'চিরদিনের নিমন্ত্রণ কিন্তু রইল। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই হবে।'

আমি কথা বলতে গেলাম। রেণু বলে উঠল, 'থাক, কিছু বলতে হবে না।'

মহিমবাবু এসে দাঁড়ালেন। ওঁর দেনা পাওনা সবই মেটানো হয়েছে। সঞ্জয়ের মেয়েকেও আশীর্বাদী দিয়েছি।

মহিমবাবু বললেন, 'তোমার রিক্শা এসেছে।'

নিচে নেমে এলাম। রিক্শায় ওঠবার আগে মহিমবাবুকে নমস্কার করলাম। তিনি শুধু মুখের দিকে তাকালেন, কিছুই বললেন না। রিক্শায় যখন উঠলাম, মহিমবাবু তখন রেণুর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। বলে উঠলেন, 'ভাসতে ভাসতে যখনই ইচ্ছে হবে, এখানে এসে নোঙর কোর।'

চোখ ঝাপসা হয়ে এল আমার। সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। শরৎকাল এসে পড়েছে। আকাশ আর সমুদ্র উজ্জ্বল নীলিমায় চিরস্পর্শহীন মুখোমুখী করে হাসছে।

www.boiRboi.blogspot.com

বাণীধ্বনি বেণুবনে

সেই এক গল্প শোনা ছিল, ফকিরের বাঁশি শুনে, ভাবত গ্রামের ইঁদুর তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। ফকিরের সেই ইঁদুরমোহন বাঁশিতে কী তুক ছিল, আমার জানা নেই। গর্তের ঘর-কন্না ফেলে, বৌ-বাচ্চা নিয়ে, ইঁদুরের পাল, কিসের টানে কোথায় যেত, তাও বুঝি না। কেবল এইটুকু বুঝি, সে-বাঁশির ডাক শুনলে গর্তে থাকা দায়। তখন মন আনচান। পাকা ধানের দিকে চোখ নেই গৃহস্থের ঘরে ঢুকে, খাদ্য নিয়ে টানাটানি, আর যাবত বস্ত্রে, দাঁত দিয়ে, কুটুর কুটুর কুটি কুটি, কোনো দিকে ধ্যান নেই। সেই না বাঁশি বায়ে চড়ায়ি কালিনী নই কূলে। শুনে, ধৈরজ না ধরে প্রাণ। তেমনি গুণ ফকিরের বাঁশিতে, এখন চল্ গো ত্বরা করে।

আমি কোন্ ফকিরের বাঁশি শুনি! কোথা থেকে সে বাজায়, কোনোদিন দেখতে পেলাম না। কী তার রূপ, কোনোদিন প্রত্যক্ষ হল না। অথচ, আমার সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে, শ্রবণ চকিত করে দিয়ে, সে বাজাতে শুরু করেছে, আর কোনোদিন থামে নি। অনেকটা সেই ইঁদুরমোহন বাঁশির মতোই। ঘরে থাকাই দায়। অভিভাবকের সজাগ দৃষ্টি, গুরুমশায়ের রক্তচক্ষু, কালনাগিনীর ফণার মতো লিকলিকে দোদুল্যমান যষ্টি, তার চেয়ে তীব্র বিষবৎ তার দংশনের যন্ত্রণা, কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারে নি।

এখন, যখন সংসারের নাগপাশে বাঁধাবাঁধি, তখনো শুনি, বাঁশি বেজে ওঠে কোথা থেকে। দেখি, নাগপাশের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে, অবশ হয়ে সে পড়ে থাকে সংসারের চৌকাটে। আমি যাই বাঁশির ডাকে ডাকে। সে যে রূপ দেখাবে বলে, কেবল আমার মুগ্ধদৃষ্টি নয়ন সুখের সংবাদ নিয়ে আসে, তা-ই না। অরূপের স্বাদে, রূপসাগরের তৃষ্ণা মেটাবে, সুরে তার এমন ইশারা বাজে। তখন রইল পড়ে, কানাকড়িকে সংসারের ওম্ দিয়ে হীরে তৈরির অধ্যবসায়। আয় রে ঝোলা কাঁধে। তাল দিয়ে চল সুরে সুরে।

ছলনে ভুলি চল কী না, সে হিসাব পরে। মিটল কী না, মিটবে কী না, হিসাবে যদি মন রাজী থাকে, তখন দেখা যাবে। এখন, মন চল যাই, অরূপ রূপের অন্বেষণে।

এটা ফেরার পথের কথা। মাঘের হিসাবের দিন বলতে পারি না, তবে বেজায় শীত। কিন্তু শীত ভোগের অবকাশ নেই। হাজার মানুষের শরীরের উত্তাপ, মনের উত্তাপ, হাসির উল্লাসের গানের উত্তাপ। শীত ভোগের অবকাশ কোথায়। তবে, উৎসবের শেষে, এখন ফেরার পালা। সকলের সবকিছুতেই, এখন উত্তাপ একটু কম। দুদিনের ধকল তো। উৎসবের বিশ্রাম ছিল না। যেমন তেমন উৎসব তো না, উপলক্ষ্য শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ। আমরা সকলেই বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

যেমন তেমন বিবাহ না, ভাগ্যে না থাকলে, এমন বিবাহের বরযাত্রী হওয়া যায় না। চলত সবহি জনকরাজপুরী, সাথহি সিরামচন্দ্র। দশরথপুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ের বরযাত্রী আমরা। এ বিবাহের নিমন্ত্রণ নিয়ে, কেউ দরজায় এসে কড়া নেড়ে হাতজোড় করে বলে না, 'হেঁ হেঁ, অনুগ্রহপূর্বক...!' এ বিবাহের নিমন্ত্রণের বার্তা নিয়ে, প্রজাপতি ছাপা, লাল অক্ষরে লেখা, হলুদ রঙ ছোঁয়ানো চিঠি নিয়ে, কোনো ডাক-পিওন আসে না, যাতে লেখা থাকবে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবেন।' অমন নিয়মতান্ত্রিকতা আর শালীনতার, দেঁতো হাসি শুষ্ক ব্যাপার এটা না। এ নিমন্ত্রণ আসে প্রকৃতির কাছ থেকে, মাঘ মাসের এক তিথি-নক্ষত্র দেখে। এ নিমন্ত্রণ আসে, মাঘের উত্তরিয়া বাতাসে আকাশের নীলে, রোদের ঝলকে। যখন মূল ফসল গোলায়, গোয়ালের নয়া বাছুরের গা চাটে গাভী। এ নিমন্ত্রণ আসে, ঝরা পাতায়, উঠোনের মাঝখানে পায়রার দলের পাখা-ঝাপটায়। প্রকৃতির এই খুশি ভরা নিমন্ত্রণের ডাক যায়, ভারতবাসী জনে জনে ঘরে ঘরে, নরনারী নির্বিশেষে, দেশে দেশান্তরে।

উপলক্ষ্য রামের বিবাহ, সবাই বরযাত্রী।

যুগান্তরের বুদ্ধি তোমার, ভাব সে যুগ কোথায়, অযোধ্যা কোথায়, রাজা দশরথ কোথায়, জনকরাজা কোথায়, হরধনু কোথায়, রামচন্দ্র কোথায়। কোথায় গিয়ে মিলবে বা সীতা।

যুগ তো অন্ধ। তার দৃষ্টি নেই। যুগ অনুভূতিহীন, তার মন নেই। মন সব দেখতে পায়। সেই জন্য, অলক্ষ্যে তার লক্ষ্য। যুগের মন-প্রাণ নেই, সে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে। মন দেখতে পায়, সবই আছে, অযোধ্যা দশরথ জনকরাজ জানকী রামচন্দ্র। তাই প্রকৃতির নিমন্ত্রণ পেয়ে বরযাত্রীদের মাতামাতি। চল যাই রামচন্দ্রের বিবাহে।

কিন্তু জায়গাটা কোথায়? এখানকার হিসাবে বলতে হবে, নেপাল রাজ্যে, নেপাল তরাইয়ের জনকপুরে। আমাদের যাত্রা, পুরনো দিনের মতে মিথিলা সীমান্ত থেকে, জনকরাজার রাজ্যে। একালের দ্বারভাঙ্গার সীমান্ত ইস্টিশন, জয়নগর থেকে, জনকপুরে। দূরত্বের সীমা আঠারো মাইল। এখন যাত্রা কিসে?

যান আছে, হাওয়ার গাড়ি। বাষ্পযন্ত্রে চলে যে, তার নাম হাওয়ার গাড়ি। এযুগে অচল, তবে অন্য যুগে বিরহিনীদের গান, 'হাওয়ার গাড়ি চলে গেল গো, আমার বন্ধু এল না। কলিকাতার রেশমি চুড়ি এনে দিল না—আ আ আ।'...এখনকার লোকে বলে রেলগাড়ি। জয়নগর থেকে, জনকপুর যাবার রেলগাড়ি আছে। অমন রেলগাড়ি দেখলে চক্ষু সার্থক।

তার আগে আছে, দুই রাজ্যের সীমান্ত। এপার থেকে ওপারে যেতে হবে। তবে হালে একটু দেখাশোনার ব্যাপার হয়েছে, আগের দশকে, ভারতের বড় প্ল্যাটফরম থেকে ছোট গাড়ির ছোট প্ল্যাটফরমে চলে গেলেই হল। জয়নগর পর্যন্ত ভারতের মাশুল, তারপরে নেপাল সরকারের। তার ইস্টিশন আলাদা, টিকেট-ঘর আলাদা। কিন্তু বরযাত্রীদের ভিড়ে, টিকেট কাটবে সে মুরোদ ক'জনের আছে, সন্দেহ। অন্ততঃ আমার নেই। ঘাড়ের ওপরে মাথা, মাথার ওপরে পা। তবে সন্দেহ একটা জাগে, যত লোকে টিকেট কাটছে তারা যাবে কিসে? খোকা-খুকুর একখানি খেলনা গাড়ি, যেটি দাঁড়িয়ে আছে, তার তো ছাদ থেকে চাকার ধার পর্যন্ত জায়গা নেই।

ছাদের কথা বলছি বটে, কুল্যে দুখানা বগীর ছাদ আছে। বাদবাকী সবই খোলা। ছাদ নেই, দেওয়াল নেই, জানালা নেই, চাকার ওপরে লোহার পাতের মেঝে। চারপাশে বাঁশ দিয়ে রেলিং করা। লোহার তার আর দড়ি দিয়ে সেই বাঁশের রেলিং বাঁধা। সেই ধরে সব দাঁড়িয়ে, মাঝখানে যারা বসেছে, তাদের দেখা যায় না। একবার যদি

রেলিং ভেঙে পড়ে, তবে শুয়ে শুয়ে পপাতঃ ধরণীতল। কিন্তু সেদিকে কারোর হুঁশ আছে বলে তো মনে হয় না। তার মধ্যেই নারী পুরুষ পাশাপাশি, হাতে হাতে, হাতে গায়ে জড়াজড়ি। জিলেবি লাড্ডু খাওয়া-খাওয়ি। হাসাহাসি, ঢলাঢলি। তাল আছে ঢোলকে, দুই টুকরো লোহার ঝন্‌ঝনিতে। তারই মধ্যে কোনো বগীতে, নাচও শুরু হয়েছে।

যারা বলে, নপুংসকের মুখ দেখলে অযাত্রা এ বরযাত্রায় তাদের অযাত্রা, দিকশূল। কারণ, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। এ দেশের বরযাত্রায় যদি মওগা (মানে যা ই কর) না নাচল, তবে আর বিবাহের আনন্দ কিসে, বরযাত্রীর দিলখুশ বা হয় কেমন করে। তাই নেপালরাজের এই ছাদ-দেওয়াল ছাড়া, বাঁশের রেলিং বাঁধা খেলনা গাড়ির কোনো কোনো বগীতে তেমনি নাচও চলেছে। নাচুনীর সাজের অভাব হয় নি। কামানো গালে, পর্যাপ্ত পাউডার, চোখে কাজল, রঙীন শাড়ি, নানা অলঙ্কার, হাতে রেশমি রুমাল। মাজায় দোলা, বুকে মোচড়, কটাক্ষে ঝিলিক, হাস্যখানি খুনীবৎ, 'দেখবে চলহ নয়া দুলহা দুলহিন।'

এর মধ্যে যদি কোনো নর-নারীকে মত্তবৎ দেখা যায়, তার জন্য মনে করার কিছু নেই। বিবাহে চলিলা শ্রীরামচন্দ্র। খুশির কি শেষ আছে। বরযাত্রী আর যাত্রিণীদের আজ একটু ও-রকম হবে। আজ সবাই খুশি, সবাই মাতাল। তবে সবাই যে রেলগাড়ির মুখ চেয়ে বসে আছে, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। আঠারো মাইল পথ! তাতে কী হয়েছে? গতরে তো পোকা পড়ে নি, গোর শকত বা, পয়দল চল্। কাঁধের ওপরে বাঁকে দুদিকে হাঁড়ি কলসী মালপত্র, তার ওপরে কোলের শিশুকে চাপিয়ে, বরযাত্রী পদযাত্রী হয়ে চলেছে। কারা আগে গিয়ে পৌঁছবে, কিছুই বলা যায় না, রেলগাড়ি না পায়ে হাঁটার দল।

তা যেন হল, এ অধমের কী উপায়? গতরে তো পোকা বটেই পায়েও শক্তি নেই হেঁটে যাবার। কিন্তু রেলগাড়ির যা অবস্থা, তাতেও তিল ধারণের জায়গা নেই। যারা সাহায্য করতে এসেছিল, তাদেরও চোখে যেন একটু সংশয়ের ছায়া। তাই তো, আমার বরযাত্রাই শেষে বাতিল হয়ে যাবে। এত সাধ করে এসেছি।

তাই কখনো হয়! রামের বিয়ের বরযাত্রী, মাঝপথে এসে কখনো ঠেকে থাকতে পারি! সোজা একেবারে ইস্টিশন-মাস্টারের কাছে। ভেবেছিলাম, নেপালরাজের রেল কোম্পানি, নিশ্চয়ই ইস্টিশান-মাস্টার কেউ নেপালী হবেন। রামচন্দ্র, তাই নাকি হয়! শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়, একাধারে সব কিছু। বলতে গেলে, এই আঠারো মাইল রেলের, সর্বময় কর্তা। নেপাল সরকার, ভট্টাচার্য মশায়ের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। তাঁরা বংশ-পরম্পরায় নেপালরাজের কর্মচারী। ভট্টাচার্য বংশ, কাঠমাণ্ডু থেকে, এই তরাই পর্যন্ত নেপালরাজের নানা বিভাগে ছড়িয়ে আছেন। ভট্টাচার্যরাই, এই লাইনের ইস্টিশান-মাস্টার, টিকেট-বিক্রেতা, গাড়ির গার্ড।

পরিচয় হতে, বিগলিত হয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ গাড়িতে, গার্ডের কামরার সামনে গদি-মোড়া একটা ছোট কামরা দেখছিলাম, ওটা কি...'

কথা শেষ হবার আগেই, মাস্টারমশায় বললেন, 'আপার ক্লাস।'

যাক, বাঁচা গেল, ওখানটা ফাঁকা দেখছি। আমি বললাম, 'তাহলে একটা টিকেট—'

'টিকেট!'

'হ্যাঁ, একখানা টিকেট—'

'টিকেট কি মশাই, আপনি এখন আমার অতিথি। চলুন চলুন, বসবেন চলুন। এখুনি আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। এরপরে আর ওই গদীর কামরাও থাকবে না, সব বেদখল হয়ে যাবে।'

একেই বলে, একা রামে রক্ষা নেই...রামের বিয়ের বরযাত্রী চলেছি, আমার ভাবনা কিসের। ভট্টাচার্য মশায়ের, ধুতি কামিজের ওপর নেপাল রেলের কোট চাপানো। হাতে নিশান, মুখে বাঁশি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে কিছু সাঙ্গপাঙ্গ। কয়েকজনের ওপর ক্যাশ আর ইস্টিশনের দায়িত্ব দিয়ে, তিনি তাঁর কামরার দিকে এগিয়ে চললেন। আসলে গার্ড আর আপার ক্লাসের কামরা, একটাই। একটুখানি আলাদা করা আছে, কাঠের পার্টিশন দিয়ে।

ভট্টাচার্য মশায় বেরিয়ে আসতেই, যাত্রীদের মধ্যে, একটা হট্টগোল পড়ে গেল। অর্থাৎ, আর দেরি নেই। সবাই দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি আরম্ভ করল। সব থেকে ভয়াবহ, কেউ কেউ বাঁশের রেলিং ধরে যে ভাবে ঝুলে পড়েছে, ছিটকে পড়লেই গেল। ভট্টাচার্য মশায়ও চিৎকার কর বললেন, 'চড় যাও, সব চড় যাও।'

তিনি একেবারে সোজা গেলেন এঞ্জিনের কাছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ঠিক হ্যায়?'

'জী হাঁ।'

'সিটি মারো।'

গাড়ির বাঁশি বাজল। ভট্টাচার্য মশায় এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপরে প্ল্যাটফরমের একপাশে গিয়ে, নিজেই একটা হাতল ধরে জোরে টান দিলেন। সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেল। আমাকে বললেন, 'উঠুন।'

হায়, উঠব কোথায়। তখন আপার ক্লাসও ভর্তি। ভট্টাচার্য মশায় ধমক-ধামক দিয়ে, খানিকটা জায়গা করলেন। ভাবলাম, আমার ওপর সবাই বেজার হবে। কিন্তু সবাই কী ভাবল, কে জানে। দেখি নিজেরাই তাড়াতাড়ি জায়গা করে দিয়ে বলছে, 'বৈঠিয়ে বাবু, বৈঠিয়ে।'

ভট্টাচার্য মশায় বাঁশি মুখে নিয়ে, বাজিয়ে দিলেন, হাতে নিশান উড়িয়ে দিলেন। এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল, মনে হল রওনা হবার আগে সে একটা প্রকাণ্ড চিৎকার দিয়ে দিল। এর পরে একটা মস্ত ঝাঁকুনির আশায় রইলাম। কিন্তু আশা ফলল না, কোনো ঝাঁকুনি লাগল না। গাড়ি যেমন, তেমনি দাঁড়িয়ে। আমি ভট্টাচার্য মশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি তখনো প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে, মস্‌মস্‌ করে পান চিবোচ্ছেন, সামনের দিকে তাকিয়ে।

ব্যাপার কী, কে জানে। যেভাবে উনি সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাতে কী রকম একটা ধন্দ লাগছে, গাড়ি চলবে কি না। মোটরগাড়ি হলে না হয় একটা কথা ছিল। নিশ্চয়ই যাত্রীদের নেমে, এই রেলগাড়ি ঠেলতে বলবেন না। আর বেশি ভার হয়ে যাওয়ার জন্য কোনো যাত্রীকে নামতে বললে যে নামবে, এমনও মনে হচ্ছে না।

ভট্টাচার্য মশায়, পান মুখে আবার বাঁশি বাজালেন, নিশান দেখালেন। গাড়ির সিটিও আবার শোনা গেল। এঞ্জিনের একটা তীব্র শব্দ, তারপরেই গাড়িটা যেন একটু নড়ে উঠল। যেন ডাইনে বাঁয়ে একটু টাল খেল। সর্বনাশ! এক ফুট না দেড় ফুট ফাঁকের ওপর, দেড় দু ইঞ্চি লোহার রেল, তার ওপর দিয়ে এই চার পাঁচ ফুট চওড়া গাড়ি, কত হাজার লোক চেপেছে, কে জানে। লাখ খানেকও হতে পারে। একেবারে ভরাডুবি হবে না তো!

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে, গতি অনেকটা কেন্নোর মত। ভট্টাচার্য মশায় তখনো গাড়িতে ওঠেন নি, হেঁটে হেঁটে প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়েই চলেছেন। যাত্রীরা অনেকেই তখনা গাড়ির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে তাকিয়ে তাকিয়ে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্ল্যাটফরম ছাড়াবার আগেই, ভট্টাচার্য উঠলেন। গাড়ির গতি এখন ঘণ্টায় দু' মাইল।

রেললাইনের পাশ দিয়ে যারা পদযাত্রা করেছে, তারা হৈ হৈ করে হেসে উঠে গাড়ির যাত্রীদের সংবর্ধনা জানাল, সেই সঙ্গে কাঁচকলা দেখিয়ে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপও বটে। বিদ্রূপের কারণ, গাড়ির যাত্রীদের ঠাসাঠাসি অবস্থা দেখে। আর পদযাত্রীরা চলেছে, মাঘের রোদে হাত পা ছড়িয়ে।

ভট্টাচার্য মশায় উঠেই এক ধমক দিলেন, 'আরে, মেরা কুর্শি টেবিল কাঁহা গয়া?'

বোঝ ব্যাপার, এই রেল-কোম্পানির যিনি হর্তা-কর্তা, তাঁর টেবিল চেয়ারই বেদখল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কাধাক্কি পড়ে গেল। কে কার ঘাড়ে পড়ল, ঠিক নেই। ভট্টাচার্য মশায়ের আসন আর টেবিল মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে, হাস্য করলেন। বড় স্বস্তি আর শান্তি বোধ করলাম। তা সে তাঁর দাঁতের চেহারা যতই খয়েরি ছোপ ধরা হোক। তিনি তৎক্ষণাৎ ভুরু কুঁচকে তাঁর পাশের লোকটার দিকে তাকালেন, হুমকে উঠলেন, 'মেরা মেহ্‌মান ওঁহা বৈঠতে হায়, আর তুম্‌ মেরা পাস্‌, ক্যায়া বাত্‌?'

গ্রামীণ লোকটি অতিরিক্ত বিনয়ে তখুনি উঠে দাঁড়াল। ভট্টাচার্য আমাকে ডাকলেন, 'এদিকে আসুন, কাছে আসুন। আরে মশাই, আপনাদের দেখা পাওয়া হল ভাগ্যের কথা।'

উঠে এসে, ওঁর পাশে বসলাম। মিথিলা সীমান্তের এই মাঘের শীতে, গরম জামা গায়ে দিয়ে, তখন একটু একটু ঘাম হচ্ছে। কিন্তু ভট্টাচার্য মশায়ের এমন ভাগ্যের কারণ কী ঘটল, কিছুই জানি না। জিজ্ঞাসার থেকে, একটু বিনীত হাসলাম। উনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাতা টেনে বের করলেন। এই প্রথম চোখে পড়ল, ওঁর কানে পেন্সিল গোঁজা ছিল। সেটি টেনে নিয়ে, নানান্‌ ছক-টাকা ছাপানো খাতায়, কী সব লিখতে লাগলেন। এসব হল কাজের বিষয়। আমি বরযাত্রী মানুষ, আমার ওসব এখন মাথায় ঢুকবে না।

আমি জানালা দিয়ে, মাথা গলিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। গাড়ির গতি এখন ঘণ্টায় প্রায় চার মাইল। যারা লাইনের ধার দিয়ে একটু পা চালিয়ে চলেছে, তারা আমাদের সমান সমান, একটু বা এগিয়ে এগিয়েই। আমরা গাড়ির অনেকটা সামনে। পিছনটা দেখার কৌতূহল হচ্ছে। পিছন দিকে চেয়ে, গাড়ির গা দেখতে পাচ্ছি না। মানুষে মোড়া, লম্বা একটা সাপের মতো পিছনটা মাঝে মাঝে এঁকেবেঁকে উঠছে।

চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটা বাংলাদেশের মতোই। সমতল, সবুজ শস্যের ক্ষেত, মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। যেমন দেখা যায়, বাবলা নিশিন্দা আস-শ্যাওড়া, তেমনি। জংলা মাঠে, বিষকাটারির ঝাড়। হেথা হোথা, বট অশথ তেঁতুল, আম জাম কাঁঠাল, কিছু বা তাল গাছ। দেখতে পাবে না কেবল, নারকেল। আর সবই আছে।

কিন্তু নেপাল বলতে, আমাদের ধারণা পাহাড়-পর্বতের দেশ। তরাই জুড়ে তার চিহ্ন নেই। উত্তর-বাংলার তরাই অঞ্চলে, আকাশের কোলে পাহাড়ের দেখা মেলে। এখানে, আকাশের দূর সীমায়, চক্রবালের রেখা। কোথাও পাহাড়ের ইশারা নেই।

অতঃপর ভট্টাচার্য মশায় আমার দিকে ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'জনকপুরে গিয়ে, কোথায় উঠবেন ঠিক আছে কিছু?'

চোখে আমার প্রমাদ দেখা দিল, বললাম, 'আজ্ঞে না, সেরকম কিছু ভেবে তো আসি নি।'

ভট্টাচার্য মশায় ঘাড় দুলিয়ে হাসলেন, 'ভেবেছেন, আপনিও বুঝি এদের মতো রাম-সীতার মন্দিরেই থেকে যাবেন। সে কি মশাই সম্ভব! যাকগে, সে সব ভাবতে হবে না। আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন একটু সেবা না করে ছাড়ছি না।'

কেমন যেন ভয় লাগে। আমাকে আবার কিসের সেবা। জিজ্ঞেস করতেও বিরত

বোধ করি। তিনি আবার নানান্ কথা জিজ্ঞেস করে, আদি বাড়ি, বর্তমান নিবাস ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। তারপরে স্ব-বৃত্তান্ত। তাঁদের আদি নিবাস খুলনা, এখন পাকিস্তান। 'যদ্দিন পাকিস্তান হয়নি তদ্দিন, বাড়ি ঘর-দোর সবই ছিল। নেপালরাজের চাকরি হলেও নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শত হলেও, বংশের ভিটা, না গিয়ে কি থাকা যায়।'

সব থেকে অবাক লাগছিল, তিনপুরুষে নেপাল সরকারের চাকুরে। বলতে গেলে, সবই দেশছাড়া। তথাপি কথায়, খুল্লে'র টান যায় নাই। তবে, আর সবই গিয়েছে। এখন আর সেখানে কিছুই নেই। পিতৃদেব দেহ রেখেছেন এই রাজ্যেই। দাদা-খুড়োরা, নেপাল সরকারের বিভিন্ন বিভাগে। বললেন, 'আপনার মতো গুণী লোককে এখানে আর কী দেখাব। কাঠমান্ডুতে আমাদের বাড়িতে আসুন, তখন দেখবেন। আমাদের বাড়িতে, আপনার লেখা বই আছে।'

এখন আর নিজের দিকে ঠোঁট বাঁকিয়ে ত্যারছা চোখে তাকানো ছাড়া, কিছু করার নেই। ভট্টাচার্য মশায়ের ভাগ্য এবং আমি গুণী, কারণ বোঝা গেল। উনি গুণীজনের সন্ধান পেয়েছেন। বললাম, 'আপনার কথা শুনে, নেপাল বেড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন। কত লোক আসে; বিশেষ করে, শিবরাত্রির সময়ে, পশুপতিনাথ দর্শনে। তখন তো আমাদের বাড়িতেই মেলা।'

আরো নানান্ কথার মধ্যে জানা গেল, এখন তাঁদের ছেলেমেয়েরা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এখন আর ঠেকিয়ে রাখা দায়, তারা নেপালী হয়ে যাবে। তা টাকার মধ্যেও নাকি রক্ত থাকে। এত পুরুষ ধরে, নেপাল সরকারের চাকরি, ছেলেমেয়েরা নেপালী হয়ে গেলেই বা আপত্তি করার কী আছে। যেখানে অন্ন, সেখানে বসত। এই প্রতিবেশী রাজ্য থেকে, ভারতে ফিরে গিয়ে যে, নতুন করে আবার বসতি করে, অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে, তা মনে হয় না। তার ওপরে, বাংলাদেশের যা হাল হয়েছে, 'মশাই, কলকাতা গেলে, কখন পালিয়ে আসব, তাই ভাবি। আপনারা পারেন, আমরা পারি না। তবে হ্যাঁ, বাঙালীর জন্যে মনটা টনটন করে। কলকাতায় নেপালী বিহারীদের নিজেদের দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা আছে। এখানে সেটি হবে না। বাঙালী নেই।'

একটু দম নিয়ে নিলেন, 'নেই একেবারে বলব না। এই যে রেল দেখছেন, সবটাই কয়েক ঘর বাঙালী চালায়। আমরা আছি, আরো কয়েক ঘর আমরাই নিয়ে এসেছি। সারাদিনে, কুল্যে দুবার যাতায়াত। কাজের মধ্যে অকাজের যাত্রীই বেশি, কেবল গাঁজা।'

থতমত খেয়ে বললাম, 'গাঁজা?'

'হ্যাঁ, গাঁজাই তো। গাঁজার দেশেই তো এলেন, আর গাঁজার জন্যেই তো তবু এ গাড়ি চালু আছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'বুঝলাম না ঠিক।'

ভট্টাচার্য আবার হাস্য করলেন। ডিবে থেকে পান মুখে দিয়ে বললেন, 'এখানে তো অপর্যাপ্ত গাঁজা জন্মে, গাঁজার চাষ হয়। কিন্তু গাঁজার কোনো ডিউটি নেই, ফ্রি। আসবার সময় তো কিছুই দেখতে পান নি, দেখতে পাবেন যাবার সময়। এদিককার প্ল্যাটফরম পার হয়ে, ওদিকে ঢুকলেই, তল্লাসীর কী ঘটা।'

সুমহান দেশ, সন্দেহ নেই। যে গাঁজা নিয়ে, ভারতে রোজ এত কেলেঙ্কারী, এত ধরপাকড়, সাধুদের গূঢ় ভাষায়, যার নাম সপ্তমি, যার নাম বাবার প্রসাদ, এখানে তার জন্ম। আর তার জন্যে কোন মাশুল লাগে না, ঢালাও বিক্রির ব্যবস্থা। মহাদেবের তো এ দেশেই আস্তানা করা উচিত ছিল।

ভট্টাচার্য মশায় আবার বললেন, 'এই যে দেখছেন সব, রামের বিয়ের বরযাত্রী, সব রথ দেখতে আর কলা বেচতে চলেছে। ফেরবার সময়, সকলের কোঁচড়েই গাঁজা কিছু থাকবেই। কোনোরকমে পার হতে পারলেই, একেবারে হাতে হাতে ফল। এসব কারবারে

ধারে বিক্রী নেই, নগদ বিদায়।'

মনটা একটু দমে গেল। এতক্ষণ ধরে, রামের বিবাহের বরযাত্রার একটা খুশির কল্পনা গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে যে গাঁজা ঢুকে পড়বে, এটা একবারও মাথায় আসে নি। এতক্ষণে আমার নাকের পাটাও যেন কেমন কেঁপে কেঁপে উঠল। তাই তো, এ যাবত যাত্রীদের বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধটা কেমন যেন একটু রুক্ষু রুক্ষু লাগছিল। এখন হঠাৎ মনে হল, গাঁজা! এ তো গাঁজা! এখন যেন কী রকম সন্দেহ হল, এত ঠাসাঠাসি চাপাচাপির মধ্যেও, সকলেই বেশ বহাল তবিয়তে চলেছে, অতি বিনয়ে মাথা ঠাণ্ডা, এর মধ্যে দমের ব্যাপার আছে। আহা, কি দেশেই না এলাম!

তবে, এসব শুনলেই বঙ্গ প্রাণ কেমন যেন একটু হাঁকপাঁক করে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, এ গাড়ি জনকপুরে পেঁছিবে কখন?'

'তা প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসবে।'

বলেন কী মশায়! প্রায় সাড়ে বারোটায় গাড়ি ছেড়ে, সন্ধ্যেবেলা গাড়ি পেঁছিবে, আঠারো মাইল যেতে? ক্ষুন্নিবৃত্তি বলে একটা কথা আছে। স্নান করার কথা না হয় বাদই দিলাম। দ্বারভাঙ্গা থেকে বেরিয়েছি সকালবেলা। জয়নগরে কিছু যৎসামান্য জলযোগ করা গিয়েছে। তা বলে, একেবারে সেই সন্ধ্যায়, জনকপুরে গিয়ে খাব? এখন বরযাত্রার ব্যাপারটা তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না আর। ভেবেছিলাম, আঠারো মাইল রাস্তা, খুব দেরি হলে ঘণ্টা দুই লাগতে পারে। ঘণ্টায় ন' মাইল নিশ্চয় যাবে।

অবিশ্যি গাড়ির গতি দেখে, আর সে বিশ্বাস নেই। এখন গতি, ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের মতো। কুড়ি মাইল যেতে চার ঘণ্টা, আঠারো মাইল, নিদেন সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগা উচিত। তাও যদি হয়, চারটে নাগাত জনকপুরে পেঁছানো চলে।

তা চলে, কিন্তু বললেই তো আর হল না। গতির একটু এদিক-ওদিক আছে তো। মাঝে মাঝেই তো ঘণ্টায় দু' মাইল বেগও হচ্ছে। চালকদের সঙ্গে, যাত্রীদের কথাবার্তা, দরকারী কথাবার্তা বেশি। ইতিমধ্যেই চোখে পড়েছে, প্রাকৃতিক কর্মের জন্য, কেউ কেউ গাড়ি থেকে নেমে পড়ছে। কাজ মিটিয়ে, আবার দৌড়ে উঠছে। পথযাত্রীদের সঙ্গে, গাড়ির যাত্রীদের সঙ্গে, কথাবার্তা, হাসি-মস্করা, গান গাওয়া-গায়ি তো চলছেই। তার মধ্যে, 'হেই বিদিয়া, তোহার দাইয়া কঁহা গেইল্?'

গাড়ি থেকে রাস্তার সঙ্গে, এরকম খোঁজ-খবর বার্তাচিতও চলছে।

এ তো আর নগর পাওনি, ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ। বরযাত্রীর ব্যাপার, রামের বিবাহ বলে কথা। একটা খুশ মানাবার দিন। এখানে তাড়াহুড়ো যা কিছু, কোনোরকমে সবাই যাতে গিয়ে পেঁছতে পারে। সময় নিয়ে কোনো কথা নেই।

ভট্টাচার্য মশায়ও, এ ব্যাপারে নির্বিকার। মস্-মস্ পান চিবোচ্ছেন, নানান্ কথা বলে চলেছেন। গাড়ির মধ্যে তখন অনেকেরই পোঁটলা পুঁটলি খোলা হয়েছে। নাম-না-জানা নানান্ রকমের শুকনো খাবার খাচ্ছে সব। চেনা খাবারের মধ্যে, ছাতু ছোলা গুড় ভুট্টা। বাকীগুলোর রূপ কিছু কিছু চেনা। কিন্তু নাম জানি না। গুড়ের পাক দেওয়া, আটা বা ছাতু মেশানো নানান্ রকমের খাবার। কেউ কেউ হাতে লোটা নিয়ে, ধুপুস করে গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে। জানা আছে ঠিক, কোথায় জলের সন্ধান। লোটা ভরে জল নিয়ে আবার ছুটে এসে নীচে থেকে হাঁক দিচ্ছে, 'এ নওরঙ, লোটোয়া পাকড় হো।'

নবরঙ (কী সুন্দর নাম!) সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে, হাত বাড়িয়ে জল-ভরা লোটা নিচ্ছে। আর লোটন গাড়িতে উঠে আসছে। সত্যি বলতে কি, নিজের খাবারের কথাটা তেমন করে মনে হচ্ছে না, যাতে কষ্ট হতে পারে। এই অপরূপ যাত্রার মেজাজটাও আমার জমেছে। এমন একটা যাত্রা যে দেখব, যাত্রীদের দেখব, তাদের সঙ্গী হব, এমন

একটি গাড়িতে চড়ে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, এ কথা কোনোদিন ভাবি নি। এমন একটি দেশ দেখব, সে কথাও কোনোদিন ভেবেছিলাম নাকি।

তারপরেই মনে আসে, জনকরাজার দেশে চলেছি, জনকপুরে। সত্যি কি, এই সেই জনকরাজার রাজ্য? জানকী এই দেশের মেয়ে? যে সীতার নামে, সারা ভারতবর্ষ আভূমি প্রণত। কেমন দেখতে ছিলেন সেই কন্যাটি? আজকের নেপালী চেহারার সঙ্গে কি তার কোনো মিল্ ছিল? বাল্মীকি তো তা লেখেন নি। তাঁর যে বর্ণনা, সে রূপের তো কোনো তুলনা হয় না। এ যুগের নেপাল-দুহিতাদের নিন্দা করি না। তাদের এক রূপ, জানকীর আর-এক রূপ। সত্যি কি সেই কন্যা অযোনিজাতা, জনকরাজের হলকর্ষণের সময়ে, হলের অগ্রভাগে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল?

কে জানে, এই কাহিনীর মধ্যে কোন্ প্রতীক, কী ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু সবটাই রূপকথা বলে মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। কে জানে অযোধ্যা থেকে, এই পথেই হয়তো একদা রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করতে যাত্রা করেছিলেন। সীতাকে বিবাহ করে, এই পথেই হয় তো অযোধ্যায় ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামী রাজপুরুষ, বয়স্য আর জনতার চেহারা কেমন ছিল? কী বাদ্যধ্বনি করেছিল তারা, কী গান করেছিল? রামচন্দ্র নিশ্চয় আরো অনেকের সঙ্গে অশ্ব-সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। কতদিন লেগেছিল তাঁদের এই পথপরিক্রমা করতে?

পথের আর ট্রেনের যাত্রীদের কোলাহল, হাসি গান কথাবার্তা, সব কিছুর মধ্যে আমার চোখের সামনে, অতীতের একটা ছবি ভেসে উঠল। সুসজ্জিত হাতি ঘোড়া, সঙ্গে অগণিত লোক-লস্করের এক মিছিল চলেছে। ঘণ্টা বাদ্য আর শঙ্খধ্বনি করছে সবাই।...

হঠাৎ মনে হল, গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকজন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নামতে আরম্ভ করল। ভাবলাম জনকপুর এসে গিয়েছে বুঝি। ভট্টাচার্য মশায় ডাকলেন, 'চলুন আমার সঙ্গে।'

তাঁর সঙ্গে বাইরে এসে কোনো মন্দিরের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। একদিকে মাঠ ক্ষেত আর বন। আর একদিকে গুটিকয়েক বাড়ি, তার মধ্যে একটি বাড়ি সেই চিরদিনের চেনা রেল কোয়ার্টারের মতো লাল। বাড়িটিকে ঘিরে খানিকটা বাগান। গাঁদা আর অতসী ফুল ফুটে আছে অজস্র। ট্রেন থেকে নেমে, নরনারী নির্বিশেষে, সকল যাত্রীরা ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে চারদিকে। একদিকে একটা বড় কুয়া দেখা যাচ্ছে। লাইনের বাইরে, একটা রেলওয়ে ট্রলি।

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'আমরা দশ মাইল পথ এসেছি। পৌনে তিনটে বেজেছে। এখানে খানিকক্ষণ গাড়ি থাকবে, তারপরে একেবারে জনকপুর।'

বলতে বলতে ভট্টাচার্য মশায় সেই লাল বাড়িটার দিকেই এগোলেন। ইতিমধ্যে সেই বাড়ির সামনের দরজাটা খুলে ফ্রক পরা একটি কিশোরী এসে দাঁড়িয়েছিল। দৃষ্টি ওর আমাদের দিকেই। বিশেষ করে, এক অচেনা লোক আমার দিকেই। একটুখানি দেখে, দরজাটা খোলা রেখেই মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। ভট্টাচার্য মশায় আমাকে নিয়ে, সেই দরজাতেই ঢুকলেন। হাঁক দিলেন, 'কই গো, একবার এদিকে এস। তোমার বাড়িতে নতুন অতিথি এসেছেন।'

ভিতর-বাড়িতে যাবার খোলা দরজা দিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে কাঁচা মাটির উঠোন দেখতে পাচ্ছিলাম। একধারে তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যামালতী ফুলের ঝাড়, চল্তি নামে সবাই যাকে কৃষ্ণকলি বলে। তার পাশে লাউমাচার খানিকটা চোখে পড়ে। অন্যদিকে সম্ভবতঃ স্নানের ঘর। টিনের দরজার কোল ঘেঁষে, সীমের মাচা লতিয়ে উঠেছে ছাদের দিকে। সীম ফলেছে অনেক, গুচ্ছ নিয়ে ঝুলছে। একটা বাতাবী লেবুগাছের ডাল, কোনো এক

পাশ থেকে যেন উঠোনের দিকে নেমে এসে, ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে।

এই দেখার ফাঁকে, এক মহিলা এগিয়ে এলেন। শ্যামাঙ্গিনী, প্রায় প্রৌঢ়া, আটপৌরে শাড়ি তাঁর পরনে। মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। হাতে কয়েকটি সোনার সামান্য অলঙ্কারের সঙ্গে, জ্বলজ্বলে সাদা শাঁখা। খালি পায়ে আলতা। মুখে পান খাওয়ার দাগ। পিছনে পিছনে, বিনুনি দোলানো, সেই কিশোরীটি।

এমন একটা ছবি, চিনতে ভুল হয় না। বরং দেখে মনে হয়, অনেক দিনের চেনা। তবু যে একটু অবাক লাগে, সেটা নেপাল রাজ্যে, এমন একটি ছবি দেখে। দেওয়ালে ক্যালেন্ডারে কৃষ্ণ মহাদেবের ছবি, আলমারিতে বই পতুল থেকে রকমারি জিনিস সাজানো। কোনো কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ নেই। সারাদিনের সংসারের কাজের মাঝে, যতটুকু ঘরের শ্রী রক্ষা করা যায়, সেইটুকু ছাপই আছে।

ভট্টাচার্য মশাই আমার পরিচয় পাড়তে গিয়ে, যে-সব কথা বললেন, তার অনেক কিছুই আমার অজানা। কিন্তু তাঁকে বাধা দেব, সে সাহস হল না। অনেক সময় বাধা দেওয়াই বিপত্তি, তাতে গোলমাল বাড়ে বৈ কমে না। তাঁর বক্তব্য হল, 'বুঝলে তো, লোক তো অনেক পাওয়া যায়, লোকের মতো লোক কি পাওয়া যায়?'

তারপরে ভট্টাচার্য মশায় বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন, 'আমার পরিবার, বুঝতেই পারছেন।'

তা নিশ্চয়ই পেরেছি। নমস্কারটা কপালে হাত ঠেকিয়েই সারলাম। ভট্টাচার্য মশায় তাঁর পরিবারকে তাড়া দিলেন, 'তাড়াতাড়ি রান্না বসিয়ে দাও। যা হোক দুটো গরম ডাল ভাত, তার বেশি আর এখন কী হবে।'

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'রান্না? ডাল ভাত?'

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'একটু কষ্ট করে খাবেন, কী আর করা যাবে। দুধ আছে তো গো?'

পরিবার বললেন, 'আছে। ওনাকে জামা-কাপড় ছাড়তে বল। খুকি তেল দিচ্ছে, চান করে নাও তোমরা।'

যতই শুনছি, ততই যেন বিষম লাগছে। স্নান, রান্না-খাওয়া দাওয়া, তার মানে কী? রেলগাড়ি কী করবে? বললাম, 'কিন্তু এত সময়, গাড়ি কি দাঁড়িয়ে থাকবে?'

ভট্টাচার্য মশায় পাল্টা অবাক হয়ে বললেন, 'গাড়ি?'

বলে পরিবারের সঙ্গে চোখাচোখি করে, ঘাড় নাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছেন? আমিই তো গাড়ি। আমি না হলে আবার গাড়ি কিসের? আমাকে ছাড়া গাড়ি নড়বে নাকি। নিন নিন, জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন। খুকি, তেল-গামছা এনে দাও তাড়াতাড়ি।'

তা বটে, ভট্টাচার্য মশায়-ই তো গাড়ি। জয়নগর থেকে জনকপুর, নেপালরাজের রেলের দায়িত্ব তো সব তাঁরই, তিনিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। লাভ-লোকসানের সব দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, তাঁর কথাতেই সব। কিন্তু এমন আজব ব্যাপার কি আর কোনো রেল-কর্তার দ্বারা সম্ভব? অতিথির রান্না হবে গরম গরম, স্নান করে খাবেন, তারপরে গাড়ি গন্তব্যে যাবে। ভাবা যায় না। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, কোনো বিক্ষোভ নেই। যে যার খেতে বসে গিয়েছে মাঠের ওপর। কেউ এমনি জটলা করছে। কোথাও হাসি মস্করা গান চলছে। গাড়ি কখন ছাড়বে, সেজন্য কারোর মাথাব্যথা নেই।

বিস্মৃতি বড় খারাপ, এক এক সময়, নিজের ভিতরের অস্বস্তি, রীতিমত ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই মুহূর্তে, কিছুতেই মনে করতে পারছি না, দশ মাইল দূরের ওই ইস্টিশানের নাম কী। ভট্টাচার্য মশায়ের মুখে শুনলাম, ইস্টিশানের অফিসঘর একটা

আছে। তবে এ লাইনে কোনো টেলিগ্রাম বা ফোন নেই। এও নতুন বলে মনে হল আমার। নিয়মিত গাড়ি চলে, কোম্পানির কাজকর্ম সব চলছে, অথচ রেলের টরে-টক্কা নেই। থাকলে, ভট্টাচার্য মশায়, অতিথির ভোজনের নোটিস, পরিবারকে আগেই দিয়ে রাখতেন।

অবেলায় আর স্নান করতে সাহস পেলাম না। মাথায় একটু জল দিয়ে, হাত-পা ধুয়ে নিলাম। এখন মনে হল, শীতটা যেন কেমন গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। খেতে বসে, সামনে গরম ভাত-ব্যঞ্জন দেখে, নিজেকেই এবার করুণা করতে ইচ্ছা হল। আসবার পথে, কত কথাই ভেবেছিলাম। কে জানত, এই বরযাত্রায়, পথের মাঝখানে এমন অন্ন-ব্যঞ্জন জুটবে। তাও, পিঁড়েয় বসে, ঝকঝকে কাঁসার থালায়, একটি সযত্ন হাতের বেড়ে দেওয়া অন্ন। দাত্রী সামনে বসে অনুযোগ করেন, 'ও মা, ও কী, ও ক'টা ভাতে কী কখনো পেট ভরে! হাত সরান, ভাত দিতে দিন।'

জয় রামচন্দ্র! জয় জনক-দুহিতা! এ সময়ে ভাগ্যকে না মেনে পারি না। আরো শুনতে হল, 'এ লাউয়ের ঘণ্ট করেছি, আমাদের বাড়ির গাছের লাউ পেড়ে। সীম-সেদ্ধ একটু কাঁচালংকা দিয়ে খান, ভাল লাগবে। কী-ই বা আর করব। ডালটা আমার মনের মতো হয় নি। ভালো ফুটেছে তো?'

কোনোরকমে বলতে পারলাম, 'অমৃত।'

ভট্টাচার্য মশায় হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'কালকূট যে, তাই সবই অমৃত দেখছেন।'

সত্যি বলতে কি, তখন রসনার আর ক্ষুধা-তৃপ্তির অমৃতে, আমার সবটুকু ভরে উঠেছে। খেতে ভালোবাসি না, এমন কথা বলি না। এত যে ভালোবাসি, তা মনে করি নি। তত্বকথার ধান ভেনে, কত সময় কত রসের ভিয়েন করি। কিন্তু ওরে মানুষ, এই মহাতত্বের রসের ঘরে, আপনা বুঝে দ্যাখ্। এই রসের ঘরের তত্ব নিয়ে, জগৎ জুড়ে তর্কাতর্কি, সবাই মিলে কেমন করে, পাত পেড়ে, অন্ন ভাগ করে নেব! তর্কাতর্কি? বল রক্তারক্তি। এই মহাতত্বের রসিক যে-জন, সে কেবল অন্ন-ক্ষুধিত না, এমন একটি মানবিক পরিবেশ, রসের ঘরে ঢেউ তোলে।

ভট্টাচার্য পরিবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিরবেন কবে?'

জবাব দিলেন ভট্টাচার্য, 'তা দু-একটা দিন লাগবে। ভাঙা হরধনু যেখানে পড়ে আছে, সেখানেও একবার যেতে হবে তো।'

আবার সেই বিস্মৃতির যন্ত্রণা। কিছুতেই সেই স্থানের নাম, এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না, যেখানে আজও নাকি হরধনু ভেঙে পড়ে আছে। কিন্তু জনকপুর থেকে, সেখানে যাব বৈকি। কেবল তো বরযাত্রী নই আমি, বীরযাত্রীও তো বটে। ধনুক-ভাঙা পণ নিয়ে যে আমাদের যাত্রা, তারপরে বিবাহ।

ভট্টাচার্য-পরিবার বললেন, 'তা হলে ফেরবার পথে, আমাদের এখানে একটা দিন থেকে যেতে হবে। একেবারে নেহাত এমন করে খেয়ে যাওয়া চলবে না।'

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'তুমি বুঝি তাই ভেবেছ, আমি ওঁকে ছেড়ে দেব? কিছু তো খাওয়ানোই গেল না. তার ওপরে এ রকম হুড়োতাড়া।'

আমি মনে মনে রাজী। এমন জায়গায় একটা দিন থেকে খেয়ে বিশ্রাম করে ফিরব, সেটা সৌভাগ্যের কথা। একটু দেখতেও যে ইচ্ছা করে। নেপাল তরাইয়ের গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের জীবন-যাপনের ছবি। যেটুকু দেখা আছে, সেটুকু তো দার্জিলিংয়ের বস্তিতে। খোদ নেপালের কিছুই যে দেখি নি।

কিন্তু এর নাম তাড়াহুড়ো না। পাকা দেড় ঘণ্টা সময় নিয়ে স্নান খাওয়া হল। বেরোবার আগে এক সময়ে একটু কুণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের কি এই একটিই সন্তান?'

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'আরে সেই তো কথা, এখানে যে কেউই নেই। আমাদের দুই ছেলে, আর এক মেয়ে, তারা থাকে কাঠমাণ্ডুতে। এখানে থেকে যে লেখাপড়া হয় না। কেবল এই একটিকে ছাড়া থাকতে পারি না। না হলে বুড়োবুড়ি থাকব কেমন করে।'

বলতে বলতে, বারো-তেরো বছরের মেয়েটিকে, বাবা তাঁর বুকের কাছে টেনে নিলেন। মায়ের চোখ দুটি, মেয়ের দিকে চেয়ে, স্নেহাতুর স্নিগ্ধতায় চিকচিক করে উঠল। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে, এই আদরে, একটু যেন লজ্জা পেল। ডাগর চোখ নামিয়ে নিল। তারপরে বলল, 'হ্যাঁ, তোমরা বুঝি বুড়োবুড়ি?'

বাবা-মা দুজনেই হেসে উঠলেন। ভট্টাচার্য বললেন, 'মেয়ের সামনে আমাদের কেউ বুড়োবুড়ি বলতে পারবে না।'

এমন কিছু ব্যাপার না। ডাগর ছেলেমেয়েরা কাঠমাণ্ডু শহরে মানুষ হচ্ছে। বাবা মা তাঁদের কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে, দূর তরাইয়ের নির্জনে রয়েছেন। এই গৃহের নিরিবিলিতে, দিনের আলোয়, রাতের ছায়ায় সব সময়েই হয়তো তারা জেগে থাকে। না-দেখাদেখির একটা স্নেহ-কাতর ব্যথা কোনো একটা সুরে হয়তো বাজে।

ভট্টাচার্য মশায় হাত বাড়িয়ে পান নিলেন। ওটা আমার চলে না। ঘরের দরজা ছাড়বার আগে খুকি আমাকে বলল, 'আবার আসবেন কিন্তু।'

ফিরে বললাম, 'নিশ্চয়ই। তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

খুকির চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। তখন কি জানতাম, আমার এ-কথা দেওয়ার দায়িত্ব, প্রকৃতি তার আপন হাতে ঘুরিয়ে দেবে!

ভট্টাচার্য মশায়কে দেখেই, যাত্রীদের হুড়োতাড়া লেগে গেল। দৌড়ে সব গাড়িতে উঠতে লাগল। যে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই দৌড় দিল। ড্রাইভার ঘন ঘন সিটি বাজাল। ভট্টাচার্য এঞ্জিনের কাছে গিয়ে, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ঠিক হ্যায়?'

'জী হাঁ।'

'চালু কর।'

গাড়ি ছাড়বার সময় দেখলাম, ভট্টাচার্য-পত্নী খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে, আমাদের দেখছেন। খুকি আমাদের সামনে। গাড়ি ছেড়ে দেবার পরে, সে আবার বলল, 'আসবেন কিন্তু।'

আমি হাত নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম।

সন্ধ্যার একটু আগেই, জনকপুরে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু পৌঁছবার আগেই, কানের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার রাত্রিবাসের জন্য, রেল কোয়ার্টারের একটি কামরা খালি করে দেওয়া হল। চৌকির ওপর পরিষ্কার বিছানা পাতা হয়ে গেল। ব্যবহারের জন্য জল এসে গেল। ভট্টাচার্য মশায় নির্দেশ দিলেন, চা খেয়ে, আগেই রাম-সীতার মন্দির দর্শন করে আসা যাক। রাত্রের খাবার কী হবে, তাও তিনি তাঁর লোকদের জানিয়ে দিলেন।

তখনো দিনের আলো রয়েছে। ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গে রাম-সীতার মন্দিরে

চললাম। গ্রামের নাম জনকপুর। মেলা লেগেছে পথে পথে। ভট্টাচার্য মশায় মিথ্যা বলেন নি, দেখছি, কাপড়ের ওপর ভুর করে সব গাঁজা নিয়ে বসেছে। যার যতখানি ইচ্ছা কিনে নিয়ে যাও। যার যত দম, সে তত টেনে নাও। গাঁজার এমন বাজার আর কখনো দেখি নি। মফস্বলের হাটে বাজারে, রাস্তার ধারে, সবাই যেমন শাক-পাতা নিয়ে বসে, তেমনি বসেছে সবাই। দেখলেই বোঝা যায়, যার যা সংগ্রহ সবটুকু ঢেলে নিয়ে বিকোতে এসেছ।

বিশ্বর গঞ্জিকাসেবী, জনকপুর তোমাদের স্বর্গের দেশ।

রাম-সীতার মন্দিরে পেঁছিবার আগেই সানাইয়ের শব্দ পেলাম। আমাদের বোতাম টেপা বা পিন ফোটানো কলে বাজানো, মিঠে সুরের কালোয়াতি বাজনদারি না। এ সানাইয়ের সুর অন্যরকম, শব্দ আলাদা। যেন একটা আদিম স্বর বাজছে, আদিম সরল সুরের খেলায়। তার সঙ্গে, গম্ভীর ঢাকের আওয়াজ। প্রকান্ড মন্দিরের এক অংশ যখন চোখে পড়ল, দেখলাম, লাল ইঁটের মন্দির। গায়ে কোনো পলেস্তারা নেই।

মন্দিরের বিশাল চত্বরের সামনে গিয়ে যখন পেঁছিলাম, প্রকান্ড নাট-মন্দিরটা তখন আধো অন্ধকার। নাট-মন্দিরের চারপাশে, লোকজনের ভিড়। কেউ বসে, কেউ শুয়ে। হেঁটে যাবার রাস্তা নেই। নাট-মন্দিরের চারপাশে, খিলেন করা পাথরের থাম। তার পাশে, দালানের চত্বর। সেখানেও অনেক লোক।

সানাইওলাকে চোখে পড়ল। ময়লা একটা চাদর জড়ানো গায়ে। হাঁটুর ওপরে কাপড়, কালো একটি আধবয়সী লোক। মাথার সাদাকালো চুলগুলো ঘন কোঁকড়ানো। গাল ফুলিয়ে সানাই বাজাচ্ছে, চোখ দুটি লাল। তার পাশেই আর একজন, কাত-করা নাকাড়ার ওপরে কাঠি দিয়ে পিঠছে। মনে হচ্ছে, তাদের কোনো তাল নেই, মান লয় নেই। নাট-মন্দিরের সেই আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, জনকপুরের রাম-সীতার মন্দিরকেও আমার কেমন যেন আদিম বলে মনে হচ্ছে।

ভট্টাচার্য মশায়ের পরিচিতের শেষ নেই। শত লোকের সঙ্গে শতেক কথা। কিন্তু নেপালী যাদের দেখছি, দার্জিলিংয়ের নেপালীদের সঙ্গে বিশেষ মিল পাচ্ছি না। এখানে খাড়া নাক, আয়ত চক্ষু, দীর্ঘকায় নেপালীর সংখ্যাই বেশি। কেন জানি না, পরিচয়ের সময়ে, তাদের একটু নিরাসক্ত আর নির্বিকার মনে হচ্ছিল।

মন্দিরের দরজার সামনে ভীষণ ভিড় দেখে, ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'রাম-সীতা কাল দর্শন করবেন, আজ চলুন মেলাটা একটু দেখে ফিরে যাই।'

সেটা আমারও কথা। কানের ব্যথাটা ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। আর সেই সঙ্গে, শীতের প্রকোপটাও যেন বাড়ছিল। শরীরের নাম মহাশয় দিয়ে, সব কিছু সওয়াব, সেই তুক আমার জানা নেই। কানের ব্যথাটা ক্রমেই যেন মনের মধ্যেও ঢুকছিল। বিদেশ-বিভুঁই বলে কথা। একটু যেন ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল।

জনকপুরের মেলাও, আর সব মেলার মতই। মনোহারি নানা রঙের পশরা ঢেলে বসেছে দোকানি। সেখানে বিহারী আর নেপালী মেয়েদের ভিড়। চুড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, অনেক রঙের মাঝখানে, কারোর যেন আর চোখে রঙ-ই ধরে না। খাবারের দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, ভাত খাবার হোটেল থেকে, কী নেই। বরযাত্রীদের জন্য সবকিছু সাজানো আছে জনকপুরের মেলায়। আর সব মেলার মতো, সবই পাবে। যেটা আর কোথাও পাবে না, তার নাম গাঁজা।

এক জায়গায় গিয়ে দেখি, বেজায় ভিড়। চারদিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা। ভেতরে ঢোকবার জন্য একটু রাস্তা করা হয়েছে। দু-তিন জন নেপালী যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে এক আনা পয়সা দর্শনী নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। ভট্টাচার্য মশায় তাদের নেপালী ভাষাতেই কী যেন জিজ্ঞাসা করলেন। একজন তার উত্তর দিল। আমি

কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি পকেটে হাত দেবার আগেই, ভট্টাচার্য মশায় দু-আনা পয়সা বাড়িয়ে দিলেন, ডাকলেন, 'আসুন দেখি, কী আজব মানুষের বাচ্চা নাকি দেখানো হচ্ছে।'

অনেক মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে আসছে। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম, একটি মধ্যবয়স্কা নেপালী স্ত্রীলোককে ঘিরে সবাই দেখছে। মাঝখানে আলো। উঁকি দিয়ে যা দেখলাম, তাতে চমক লাগে বটে, কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেলা দেখে, একটা অসহায় প্রতিবাদ আর ব্যথা, একসঙ্গেই জেগে ওঠে। দেখলাম, মায়ের বুকে একজোড়া পুরুষ সন্তান, বুকের কাছ থেকে তলপেট পর্যন্ত, তাদের জোড়া লাগানো। মুখোমুখি, এভাবে জোড়া লাগানো অবস্থাতেই দুই ভাই মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে এসেছে। একজনের শরীর একটু পুষ্ট, আর-একজনের কিছু ক্ষীণ। একজনের চোখ ফুটেছে, আর একজনের ফোটেনি। অথচ মুখোমুখি দুজনের দুটি রক্তিম নরম ঠোঁট মুখ-গহ্বর। দুজনের একভাবেই ঠোঁট নড়ছে। বোধ হয় ক্ষুধায় কাতর। নিশ্বাসের তাল এক ভাবেই পড়ছে, পেটের কাছে উঠছে নামছে। দুজনের চার হাত, চার পা। একজনের একটু বেশি পুষ্ট, আর একজনের কম। শুনলাম পাঁচ মাস ধরে, এ অবস্থায় শিশু দুটি জীবিত আছে।

আমার কল্পনার চোখে ভেসে উঠল, এ অবস্থায় শিশু দুটি বড় হয়েছে। কী দুর্গতি আর কী বিষম প্রমাদ! দুটি মুখোমুখি জোড়া মানুষ, চলে ফিরে বেড়াবে কেমন করে? ওরা শোবে কেমন করে? কে জানে, প্রকৃতি বলে কোনো ঠাকরুণ আছেন কী না। তার খেয়ালের এই জীবন্ত রূপ, আমার চোখে করুণ আর নিষ্ঠুর ছাড়া কিছু না। আমি যেন দেখলাম, শিশু দুটির মুখে সুখ নেই, হাসি নেই। তাদের দুই জোড়া ভুরু কোঁচকানো, সারা মুখে অসহায় কষ্টের ছাপ।

গ্রাম্য মেয়ে-পুরুষেরা কৌতূহলিত বড় বড় চোখে দেখছে আর ভয় পাচ্ছে যেন। কেউ হাসছে। কাউকে কাউকে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করতেও দেখলাম। আর এই বিচিত্র সন্তানের মা, শীতের মধ্যে, তার বুক জোড়া হাট করে খুলে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকদের দিকে করুণ চোখে হাঁ করে দেখছে। এমন করে, এ-বস্তু প্রদর্শন না করলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'ছেলেরা যে পয়সা আদায় করছে, সবই মেয়েলোকটিকে দেওয়া হবে।'

দুঃখের সংসারে, এই নিষ্ঠুর অভিনবত্ব আর বৈচিত্র্য মায়ের হাতে কিছু পয়সা তুলে দিচ্ছে। রাম বিবাহের বরযাত্রায় এসে, এই প্রদর্শনীতে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সংসারে কারোকে কিছু দিতে পারি, সে যোগ্যতা নেই। তথাপি, আমার শ্রমের মূল্যে যেটুকু পারি, তা-ই দিলাম। মায়ের হাতে একটি টাকা গুঁজে দিলাম। না বলে পারলাম না, 'ওদের শীত করছে, একটু ঢাকা দিয়ে রাখুন।'

হিন্দীতেই বললাম। মা তা বুঝল বা শুনল কী না, জানি না। জোড়া সন্তানের দিকে তাকাল, নিজের খোলা বুকের কাছে, আরো নিবিড় করে নিল। বেরিয়ে আসবার আগে, একদল ছেলে-মেয়ে ঢুকল। দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। একজনের কথা শুনে ভালো লাগল। ইংরেজীতে বন্ধুদের বলছিল, 'কেসটা আর একটুও দেরি না করে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। দুর্বল শিশুটিকে, অপারেশন করে ফেলে দিলে, সবল শিশুটি এখনো বেঁচে উঠতে পারে। একজনকে মরতেই হবে। অবিশ্যি যদি, অপারেশনের অবস্থায় থাকে। হৃদ্‌যন্ত্র পাকস্থলী যদি আলাদা না হয়, তাহলে কোনো উপায় নেই।'

ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ওঁর মুখেও হতাশা আর বিরক্তি। বললেন,

'বুঝুন এখন ঠ্যালা, এর কোনো মানে হয়। জমজ দেবে তো দাও, সেটা বুঝি, এ আবার কেমন রসিকতা, যত্তো সব বাজে—'

কথাটা শেষ করলেন না। কাকে যে দায়ী করছেন, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ওঁর অস্বস্তির ভঙ্গিটা দেখে আমার হাসি পেল। বোধ হয়, আমি যাকে প্রকৃতি ঠাকরুণ ভেবেছি, উনি তাঁকে মা ষষ্ঠী ভেবে দায়ী করছেন।

আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে এলাম। কিন্তু হে আমার কর্ণ, এ কি কর্ণবিদারি যন্ত্রণা। এ যে ক্রমাগতই বাড়ছে, মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছে। কখন কী ভাবে এমন বিশ্রী ঠান্ডা লাগিয়ে ফেললাম, কে জানে।

যে-ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা, সেই ঘরেই আমি আর ভট্টাচার্য মশায়, রাত্রে খেতে বসলাম। দেখলাম, হাফ-প্যান্ট পরা এক নেপালী পুরুষ, আর বছর পনেরোর একটি মেয়ে, আমাদের খাবার নিয়ে এল কোথা থেকে। বেশ ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন পাত্র থেকে মাংসের গন্ধ বেরোচ্ছে। আশেপাশে কয়েকটি ছোটখাটো রেলের বাসা দেখেছি। বোধ হয় সে-রকমই কোনো ঘর থেকে, রান্না হয়ে এল। মেয়েটি সম্ভ্রমে ত্রস্ত, অথচ ওর ফর্সা মুখে লজ্জার একটা ছাপ ফুটে রয়েছে। কিন্তু শীতের বালাই বলে কি বাপ-বেটির (বাপ-বেটিই মনে হয়) কিছু নেই? বাপের তবু একটু মোটা রেলের কুর্তা আছে। মেয়ের শাড়ি আর পাতলা একটা জামা ছাড়া কিছু নেই। লাল টুকটুকে গাল, দার্জিলিংয়ের মতো রঙ না, ফর্সা মুখ মেয়েটির। নাকে নাকছাবি। গলায় একরাশ পুঁতির মালা। হাত ভরে, লাল-নীল কাঁচের চুড়ি ঝিকমিক করছে, ঠিনঠিনিয়ে বাজছে। বোধ হয় আজকের মেলা থেকেই, সদ্য হাতে উঠেছে।

তা মন্দ না, আমি বরযাত্রী, এরা কন্যার দেশের মানুষ। আমাদের একটু সেবা-টেবা করতে হবে বৈ কি! কিন্তু কান, এ অসহ্য ব্যথা তো আর, অবিকৃত মুখে, নিঃশব্দে চেপে রাখা যাচ্ছে না।

ঝকঝকে থালা পেতে, গরম রুটি তুলে দিল মেয়েটি। এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে মাংস বের করে দিল বাটিতে। মধ্যবয়স্ক লোকটি ভট্টাচার্য মশায় আর মেয়েটিকে কী একটা বলে, বেরিয়ে গেল।

ভট্টাচার্য মশায় ডাকলেন, 'এই ধীরুমায়া।'

মেয়েটি তার কালো ডাগর চোখে সম্ভ্রম ভরে তাকাল। তিনি নেপালী ভাষায় কী বললেন।

মেয়েটি লজ্জিত হেসে উচ্চারণ করল, 'মা।'

কথাগুলো যে একেবারেই বুঝতে পারছিলাম না, তা নয়। কে রান্না করেছে, সে কথাই তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন। এখন নিশ্চয়ই আমার কথা বলছেন, কেননা, মেয়েটি দু-তিনবার আমার দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকাল। ধীরুমায়া নামটি বেশ। মায়া বুঝতে পারি, ধীরু কী? ধীর? ধীরমায়া? এমন নাম হয় নাকি? ধীরমায়া স্থিরমায়া অথবা থিরমায়া। পর পর এরকম নামগুলো মনে পড়ে গেল। কিন্তু উহ্, অসম্ভব। খাবার চিবোতে পারছি না। এমন স্বাদু গরম মাংসও না। চিবোতে গিয়েই, আমার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'আহ্!'

ভট্টাচার্য মশায় চমকে উঠলেন, 'কী হল?'

ধীরুমায়া প্রথমেই শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'বহুত ঝাল?'

আমি ব্যথাটা সামলে নিয়ে বললাম, 'না, আমার কানে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। এমনিতেই খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, খেতে গিয়ে দেখছি চোয়াল আর মাথা শুদ্ধ ব্যথা করছে।'

ভট্টাচার্য মশায় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন থেকে হয়েছে?'

বললাম, 'খেয়াল হয়েছে বিকালের দিকে।'

'তাই তো মুশকিল, খেতেই পারবেন না? আস্তে আস্তে?'

আমি একটু গরম ঝোল চুমুক দিয়ে খেলাম। কিন্তু শক্ত কিছু চিবনো অসম্ভব। ভট্টাচার্য মশায় এবার পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তোর বাবা দুধ আনতে গেছে তো?'

ধীরুমায়ার চোখেও এখন উদ্বেগের ছায়া। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'জী হাঁ।'

ভট্টাচার্য বললেন, 'তা হলে গরম দুধই চুমুক দিয়ে খান। দুধে রুটি ভিজিয়ে যদি খেতে পারেন, তাহলেও পেটটা ভরবে। কিন্তু কানের মধ্যে ব্যথাটা তো ঠিক জিনিস না।'

আমি বললাম, 'মাথার অনেকখানিও ব্যথা করছে।'

ভট্টাচার্য মশায়ের উদ্বেগ দেখে, মিথ্যা স্তোক দিলাম, 'সেরে যাবে নিশ্চয়ই।'

'তা তো যাবে, কিন্তু এ জায়গাকে তো বিশ্বাস নেই। তেমন কোনো ডাক্তার-বদ্যি যে নেই, ভালো ওষুধের দোকান পর্যন্ত নেই যে এনে দেব।'

ধীরুমায়া নীচু স্বরে কী যেন বলল ভট্টাচার্য মশায়কে। উনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক বলেছিস। হ্যারিকেনের মাথায় কাপড় গরম করে, সেঁক দিলে, নিশ্চয়ই একটু আরাম হবে।'

কথাটা আমারও মনে ধরল। ব্যথা-বেদনায় একটু গরম সেঁক আরাম দেয়। হায়, রামের বিয়ের বরযাত্রীর কী দুর্দশা! জনকপুরে এসে কী না, কান নিয়ে বিপাক! সেই কোন্ এক অতীতে, সত্যি কোনো বরযাত্রীর এমন দুর্দশা হয়েছিল কী না, কে জানে।

ধীরুমায়ার বাবা দুধ নিয়ে এল। ভট্টাচার্য মশায় নেপালী ভাষায় আমার কথাই বললেন। ধীরুমায়াও কী যেন বলল। ওর বাবাও ঘাড় নেড়ে নেড়ে জবাব দিল। ধীরুমায়া একটা পাথরের বাটিতে আমাকে গরম দুধ ঢেলে দিল। রুটি ভিজিয়ে খাবার উপায় ছিল না। দুধ খেয়েই উঠলাম। আমার জন্য, ভট্টাচার্য মশায়ের খাওয়াটা তেমন সুবিধের হল না। বললাম, 'আপনি আস্তে আস্তে খান, আমি একটু শুয়ে শুয়ে সেঁক দিই।'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আপনি শোন, ধীরুমায়া আপনাকে সেঁক দিয়ে দেবে।'

আমি একটু ব্যস্ত হলাম, বললাম, 'থাক না, আমিই দিতে পারব।'

'আরে বাবা, নিজের হাতে দেওয়া এক কথা, অন্যে দিলে আর এক কথা। আপনি শোন তো।'

ধীরুমায়া ইতিমধ্যেই চৌকির কাছে উঠে এসেছে। ওর বাবা কী যেন বলে, বাইরে চলে গেল। টেবিলের ওপর থেকে, হ্যারিকেনটা নিয়ে আমার বালিশের কাছে রাখল। আর একটা হ্যারিকেন নীচের মেঝেয়, খাবারের সামনে। ধীরুমায়ার বাবা, মিনিট খানেকের মধ্যেই এল। মেয়ের হাতে বাড়িয়ে দিল, একটুকরো ফ্ল্যানেলের কাপড়। ধীরুমায়া আমার শিয়রের কাছে বসল। আমি কাত হয়ে শুয়েছিলাম। নিজেকে বড় অসহায় আর লজ্জিত বোধ করছিলাম। কী দুর্দৈব! যন্ত্রণাটা সত্যি বাড়াবাড়ি করছে।

গরম ফ্ল্যানেলের আলতো চাপ পড়তেই, শিউড়ে উঠলাম, যেন কানের পাশটা পুড়ে গেল। ভট্টাচার্য মশায়ের গলা শোনা গেল, 'একটু গরম গরমই দিক, সহ্য হয়ে গেলে, আরাম লাগবে। আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন। এখানে মশারি লাগে না। দরজা বন্ধ করার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।'

বড় নিশ্চিন্ত আর কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, ভট্টাচার্য মশায়ের কথায়। আমার মতো

একটি বাঙালী ছেলের কাছে, নেপাল রাজ্যের এই জনকপুর সুদূর বিদেশ তো বটেই। তবু, কোথা থেকে ভট্টাচার্য মশায় এসে গেলেন। তারপরে, এমন একটি পিতা-কন্যা। কৃতজ্ঞতা আমার তাদের কাছেও।

জীবনের কোনো কিছুই মানুষের মনের ইচ্ছায়, ছকের ঘরে বানানো না। অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না, তেমনি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, মানুষের বাস্তব বোধের। নিজের প্রয়োজনের ব্যাখ্যা। গল্পকার গল্প লেখে, জীবন চলে অন্য তালে। তার স্রোত, তার নিজের নিয়মে বাঁধা।

ধীরুমায়া ঠিক অনুমান মতো, চাপ দিয়ে সেঁক দিচ্ছে। ব্যথার ঝংকারের মধ্যেও, অনেকখানি আরাম লাগছে। আমি ওর গা থেকে হাল্কা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাচ্ছি। বোধ হয় ওর মায়ের সঙ্গে, রান্না করেছে, কাপড়ে মসলা লেগে গিয়েছে। ওর বাবা সব বাসন-কোসন নিয়ে চলে যাচ্ছে টের পাচ্ছি। পান আর দোক্তার গন্ধে, চোখ বুজেও টের পাচ্ছি, ভট্টাচার্য মশায় এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর একটি হাত আমার কপাল স্পর্শ করল। শুনলাম, বলছেন, 'না, জ্বর আসেনি।'

আমি তাকালাম। ধীরুমায়া আমার কানের দিকে তাকিয়ে। ভট্টাচার্য মশায়কে বললাম, 'অত দূর গড়াবে না, আশা করছি। এখন একটু আরাম হচ্ছে।'

ভট্টাচার্য মশায় আমার কানের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বললেন, 'গড়াবে না তো বুঝছি, কিন্তু কানটা যে এর মধ্যেই ফুলিয়ে ফেলেছেন।'

আমি হাত দিয়ে কান দেখতে গেলাম, ধীরুমায়ার হাতের ওপরে হাত পড়ল। ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'থাক, আপনাকে আর দেখতে হবে না, আমিই দেখতে পাচ্ছি। আপনি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

তারপরে নেপালী ভাষায় ধীরুমায়াকে উনি কিছু নির্দেশ দিয়ে, চলে গেলেন। ধীরুমায়া সেঁক দিতে লাগল। আমি চোখ বুজে রইলাম, আর হাল্কা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধের সঙ্গে, ওর চুড়ির রিনিঠিনি শুনতে লাগলাম। এই রিনিঠিনি শব্দটা আসছে যেন অনেক দূর থেকে, অনেক দূর কাল থেকে, রামের বিবাহের রাত্রির বুক থেকে। উৎসব-শেষের ভোর রাত্রে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনো কোনো এক অসুস্থ মানুষ যেন ব্যথার ঘোরে রয়েছে, কার নিরন্তর হাতের সেবায়, উৎসবের হাতের সাজে ঠিনঠিন করে বাজছে। নিদ্রিতরা কেউ তা শুনতে পাচ্ছে না।

মেলা হয়তো ভেঙে গিয়েছে। কোথায় যেন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। শঙ্খ বা শিঙ্গা বা হয়তো সেই সানাইওয়ালা, একবার যেন বাজিয়ে উঠল। মনে হল, আমার কানের ওপর ধীরুমায়ার হাত নেই। সে বোধ হয়, চলে গিয়েছে।

আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম, না, যায় নি। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে, চোখ বুজে, কার উদ্দেশে যেন সে নমস্কার করছে। মনে হল যেন, সারাদিনের শেষ নমস্কার এখন সারছে। যেখানে ঘণ্টা বেজে উঠেছে, সেখানকার উদ্দেশে। হ্যারিকেনের আলো ওর মুখের অর্ধেকে পড়েছে। বাকীটা, মাথার ঢাকনায় ঝাপসা। কপাল থেকে হাত নামিয়ে, ও তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনের মাথা থেকে ফ্লানেলের টুকরোটা নামাল, দু' হাতে রুটি সেঁকার মতো ঝাড়ল, যাতে ঠাণ্ডা হয়। তারপরে আমার দিকে নুয়ে তাকাতে, চোখাচোখি হল।

ধীরুমায়া মুহূর্তের জন্য লজ্জা পেলেও, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকটা মৈথিলী হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা কমছে না?'

গলায় ওর উদ্বেগ। বললাম, 'কমছে।'

বলে আমি চোখ বুজলাম। একটু পরে আবার তাকালাম। ধীরুমায়া নীচু হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি তাকাতেই, তাড়াতাড়ি মুখটা তুলে নিল,

দৃষ্টি ফেরাল। আমি বললাম, 'ধীরুমায়া, তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে, তুমি এখন খেতে যাও।'

ধীরুমায়া ওর আয়ত কালো চোখ তুলে, একটু যেন অবাক হয়ে বলল, 'এখনো তো আমি ক্ষুধার্ত নই।'

তার ভাষাটা এই রকম, এখনো সে ভুখী নয়। ভদ্রতার কোনো মূল্য যেখানে নেই, স্বভাবদোষে সেই ভদ্রতাটুকু না করে পারলাম না, বললাম, 'তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি।'

তার অবাক স্বরে, কথাটা এই রকম শোনাল, 'হায় রাম, কখনো না।'

বিশ্বাস না করে পারা যায় না। এই স্বর মিথ্যা বলতে পারে না। আমি ওর দিকে একবার দেখলাম। কিশোরী একটু লজ্জা পেল, স্বভাবের নিয়ম। দৃষ্টি অন্য দিকে রেখে বলল, 'তোমার চোখ লাল।'

অসম্ভব না, সারা দিনের রাস্তা চলা, ভিড়, ধুলা, তারপরে এই ব্যথা। আমি বললাম, 'তাই বুঝি?'

ধীরুমায়া বলল, 'আর ভেজা।'

ভেজা কেন জানি না। চোখ বুজে রইলাম। অল্প গরম ফ্ল্যানেলটা, আস্তে আস্তে আমার গালের ওপরে নিয়ে এল। তারপরে চোখের ওপর আস্তে আস্তে চেপে দিল। আমার অদ্ভুত আরাম লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার বুকের কোথায় যেন একটা ঢেউ লেগে যাচ্ছে। আমার দু'চোখ ভরে জল আসতে চাইছে। অথচ তার মধ্যে কোনো কষ্ট বেদনা বোধ নেই।

কেবল মনে হতে লাগল, শিশু বয়স থেকে যৌবন, সেই এক নারী, যে আমাকে মায়ের বেশে, আমাকে এমন করে শান্তি দিয়েছে। ভগ্নীর বেশে, প্রিয়া প্রেমিকার বেশে। সর্বরূপে সে সংস্থিতা। ধীরুমায়া, এই ধীরুমায়াতেও সে, সকলের সবখানি নিয়ে আমার সামনে বসে আছে।

কখন একসময়ে ঘুম এল, টের পেলাম না। ব্যথার থেকে নিদ্রা ভারি। ঘুম যতই ভারি হয়ে আসতে লাগল, ততই যেন মনে হল, ধীরুমায়ার নরম হাত আমার কপালে গালে বুলিয়ে যাচ্ছে। একবার যেন অন্য মেয়ে-গলা কানে এল। তারপরে আর কিছুই মনে করতে পারি না।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল, আর একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হল, ঘাড়ে মাথায় কানের কাছে। চোখ মেললাম, ঘর একেবারে অন্ধকার না। হ্যারিকেন বোধ হয় কমানো আছে। আমার মাথা বাদ দিয়ে, লেপ আর কম্বলে সারা শরীর ঢাকা। ব্যথার তীব্রতা থেকে বুঝতে পারছি, রাত পোহালেই ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন একটু জলের তৃষ্ণা।

আস্তে আস্তে কানের কাছে একবার হাত দিলাম। কেমন যেন খরখর করে উঠল। আঙুল বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, কোনো রকম প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ধীরুমায়াই হয়তো দিয়েছে। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে ব্যথা পাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ। বোধ হয়, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে উঠতে গেলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, 'ক্যা চাহি?'

ধীরুমায়ার গলা! আশ্চর্য, ও কি এ-ঘরে রয়েছে নাকি? আলো জেগে উঠল ঘরের মধ্যে। আমার সামনে ধীরুমায়া দাঁড়াল। ওর চোখ দুটো সদ্য ঘুম-ভাঙা। বললাম, 'জল।'

টেবিলের ওপরে জলের ঘটি গেলাস ছিল। ধীরুমায়া জল দিল গড়িয়ে। খেতে গিয়ে, এক ঢোঁক গিলেই থামতে হল। ঠান্ডা জল গিলতেও কষ্ট হচ্ছে।

ধীরুমায়া ওর ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'কী কষ্ট?'

সে কথা আর ওকে বলতে ইচ্ছা করল না, হয়তো জল গরম করতে বসবে। গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'কোনো কষ্ট না। আর খাব না।'

দেখলাম, চৌকির নীচে সামান্য একটি বিছানা। তার ওপরে ওয়াড় ছাড়া একটি কম্বল। সেখানে আর একজন পাশ ফিরে শুয়ে আছে, আর এক রমণী। মাথা আর মুখ একটুখানি দেখতে পাচ্ছি। বাকীটা কম্বলের অর্ধেকে জড়ানো। আমাকে দেখতে দেখে, ধীরুমায়া নিজেই বলল, 'মা।'

মা মেয়ে, আমার ঘরে এসে শুয়ে আছে। কোনো এক অচেনা বিদেশী আমি। যাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কিছু নেই, তার একলা ঘরে, মা মেয়ে শুয়ে আছে, অসুখের সেবার জন্য। হয়তো, সত্যি একজন অপরিচিতের জন্য মা মেয়ে এমন করে অনায়াসে এসে শোয় নি। ভট্টাচার্য মশায়ের নির্দেশই আসল, তিনি যেমন বলেছেন, তেমনি হয়েছে। তবু অবাক না হয়ে পারি না। একজনের নির্দেশে কাজ করা যায়, সেবাও করা যায়। কিন্তু আপন মনের নির্দেশ না থাকলে, ভিতর থেকে প্রীতির অনুভূতি না এলে, এমন করে কি একজনের সেবা করা যায়!

ব্যথা অসহ্য-ই, তবু মনটা তার মধ্যেই কেমন একটা আবেগে টনটন করে উঠল। রামের বিবাহ-যাত্রায়, কে মিলিয়ে দিল ভট্টাচার্য মশায়কে। কে মিলিয়ে দিল ধীরুমায়াকে। ভাবলে, মনে হয়, সংসারের সকলই বিস্ময়ের।

ধীরুমায়া আমার সামনে ঝুঁকে, কানের দিকে তাকাল। ওর কপালের ওপর রুক্ষ চুলের ছায়া, ওর মুখেই পড়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'এখনো ব্যথা করছে?'

'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। সারাটা দিন একটি মেয়ে কাজ করেছে, মেলায় ঘুরেছে। কোথা থেকে আমি এসে পড়লাম, বেচারির শাস্তি হয়ে। এমন বিপদে আর কখনো পড়েছি কী না, মনে করতে পারি না। শুতে শুতে বললাম, 'খুব সামান্য, সে কিছু না। তুমি আলো কমিয়ে শুয়ে পড় গে।'

ধীরুমায়া তার বদলে, আলোটা নিয়ে এল আমার কাছে। আমার পিছন দিকে আলোটা রেখে, মাথায় ফ্ল্যানেল চাপিয়ে দিল। বলল, 'আর একটু সেঁক দিয়ে দিই, তোমার ঘুম আসবে।'

বললাম, 'না ধীরুমায়া, তুমি শোও।'

ও যেন অনেকটা অনুরোধের সুরে বলল, 'আমার কোনো কষ্ট নেই, আমার ঘুম লাগছে না। তোমার মুখ দেখে, মনে হয়, ব্যথা করছে।'

এখন আমার মুখ দেখেও ধীরুমায়া আমার ব্যথা টের পাচ্ছে। এমন দৃষ্টি কি মেয়েদের সহজাত, নাকি এটা ধীরুমায়ার মতো একটি নেপাল তরাইয়ের কিশোরীর বৈশিষ্ট্য? বললাম, 'তাহলে একটুখানি দিয়ে, তুমি শুয়ে পড়। আমাকে একটু ঘড়িটা দেখাবে?'

আমার শিয়র থেকেই হাতঘড়িটা তুলে দিল। দেখলাম, সাড়ে তিনটে। নিশ্চয়ই ব্যথা অনেক কমেছিল, তা না হলে, এতক্ষণ ঘুমোতে পারতাম না। আমি কাত হয়ে শুয়ে চোখ বুজলাম। ধীরুমায়া সেঁক দিতে লাগল। ওর মাকে জেগে উঠতে দেখলাম না, একটা কথাও শুনলাম না। টের পেলাম, ও আমার গায়ের ওপর একটা হাত রেখেছে, আর এক হাত দিয়ে সেঁক দিচ্ছে। আমি যেন আমার গালে কপালে, ওর নিশ্বাস পাচ্ছি। কিন্তু কোনো গন্ধ এখন পাচ্ছি না। বোধ হয় আমার গন্ধের অনুভূতি এখন নেই।

আহ্, গরম সেঁকটা সত্যি আরামের। আপনা থেকেই আমার চোখ বুজে আসছে। ব্যথা কম লাগছে। কেবল আমার চোখের সামনে, দুই চোখ খোলা ধীরুমায়ার মুখটা যেন জেগে থাকতে দেখলাম।

ঘুম ভাঙল। ব্যথা একই রকম। ঘর অন্ধকার নয়। দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও ছোটখাটো ফোকর দিয়ে, দিনের আলো দেখতে পাচ্ছি। রোদ উঠেছে। বাইরে নানান্ কোলাহল। ইস্টিশানের কাছেই তো আছি। হয়তো এখনই গাড়ি ছাড়বে।

তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম, তাতে ব্যথায় আরো বিদ্যুচ্চমক বেজে গেল। বোঝা যাচ্ছে, তাড়াহুড়ো করবার উপায় নেই আমার। আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে গেলাম। পাঁচিল ঘেরা উঠোনে, কাঠের আলগা উনুনে, হাঁড়ি বসানো। আগুন জ্বলছে। বাইরে যাবার দরজাটা খোলা। সেখান দিয়ে, মেলায় যাবার পথটা দেখা গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই ভট্টাচার্য মশায় এসে ডাক দিলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, কেমন আছেন?'

লজ্জায় করুণ হেসে বললাম, 'গোলমেলে মনে হচ্ছে।'

ভট্টাচার্য মশায়ের মুখে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। বললেন, 'হুঁ, ব্যথাটা বাঁকা পথ নিচ্ছে। ঠান্ডা, ঠান্ডা, নেপাল তরাইয়ের ঠান্ডা এই রকম। ঠিক আছে, আপনার যাবার ব্যবস্থা আমি করছি। ট্রেনে আপনাকে পাঠাব না। আর ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে বেলা দশটার আগে না। জয়নগর থেকে আপনি সময় মত গাড়ি পাবেন না। দ্বারভাঙ্গাই যাবেন তো এখন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মুখ-চোখ ধোন। কই, মেয়েটা গেল কই?'

আমি না বলে পারলাম না, 'সত্যি, এমন সেবিকাই দিয়ে গেলেন, রাত সাড়ে তিনটের সময়েও সেঁক দিয়েছে।'

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'রাত্রে আপনার ঘরেই ছিল?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি জানেন না?'

'আমার সঙ্গে আর কাল ওদের দেখা হয় নি। গোবিন গিয়ে একবার বলে এসেছিল আপনি ঘুমোচ্ছেন।'

আমি বললাম, 'ওরা মা মেয়ে দুজনেই রাত্রে ছিল।'

ভট্টাচার্য মশায় ঘাড় নেড়ে বললেন, 'যাক, আমার আবার মনটা খুঁত খুঁত করছিল, রাত্রে যদি কষ্ট পান। ওরা সেটা বুঝতে পেরেছিল। গোবিনের বউ বেটি বড় ভালো। আমার রান্না-বান্না তো করেই, একটু শরীর খারাপ করলে আর দেখতে হবে না।'

'গোবিন কি আপনার রেলের লোক?'

'হ্যাঁ, পোর্টার বলুন, সিগন্যালার বলুন, একাধারে অনেক কিছু।'

ইতিমধ্যে ধীরুমায়া এল। কাপড়ও বদলায় নি, চুলও এক রকমই আছে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামিয়ে, আমাকে গরম জল দিল। মুখ ধোয়ার আগেই, কোথা থেকে কেটলিতে চা নিয়ে এল। আমাকে আর ভট্টাচার্য মশায়কে গেলাসে করে চা দিল। ভট্টাচার্য মশায় নেপালী ভাষায় ওকে কী বললেন। ও হঠাৎ লজ্জা পেয়ে হেসে মাথা নাড়ল।

কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিল, রাত্রে ওর ঘুম হয় নি, ওর আর ওর মায়ের কষ্ট হয়েছে, এবং বাবুজী (আমি) চিরদিন এসব কথা মনে রাখবে এসবই বলছিলেন। ধীরুমায়া আবার বেরিয়ে গেল। ভট্টাচার্য মশায়ের মুখে স্নেহ ফুটে উঠল, বললেন, 'বড় ভালো মেয়ে।'

আমি বললাম, 'একটা কথা বলব ভট্টাচার্য মশাই?'

'হ্যাঁ বলুন।'

'আমার যা অবস্থা, তাতে কিনে-কেটে কিছু দিতে পারব না, কিন্তু ধীরুমায়াকে কিছু দিতে ইচ্ছা করছে। টাকা-পয়সা দিলে কি রাগ করবে?'

'না না, রাগ করবে কেন। আর কিনে-কেটেই বা দেবেন কেন। যাবার সময় দু-একটা টাকা দেবেন, তা হলেই হবে। এরা খুবই গরীব।'

অথচ গরীবির কিছুই নেই। মানুষের বেশ-বাসে যদি সব পরিচয় থাকত, কথা ছিল না। জামা-কাপড়ে ধীরুমায়াকে গরীবই মনে হয়। কিন্তু ওর তুল্য ধন, ক'জনার থাকে।

ভট্টাচার্য মশায় বললেন, 'আপনি তৈরি হোন। আপনাকে আমি ট্রলিতে করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ট্রলিতে?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবেন। গায়ে মাথায় রোদ লাগবে, কারোর ধাক্কা-টাক্কাও খেতে হবে না, সেই ভালো হবে।'

মনটা খুশিতে আর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। এমন দৈব-দুর্বিপাক না হলে, পথ চলাতে এমন মানুষ ছেড়ে যেতাম না। হায় কানের ব্যথা, কোথা থেকে এলে! খোলা ট্রলিতে এতটা পথ দেখতে দেখতে যাব, কী আনন্দ! কিন্তু কর্ণ মহাশয় কি সেই সুখটুকু দেবে? ভট্টাচার্য মশায়কে বললাম, 'আপনাকে কিছু বলে ভদ্রতা দেখানো—'

'ভদ্রতা দেখাবেন কি মশাই। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখন আপনাকে যেমন করে হোক ঠিক করে তুলতে হবে। আপনি দ্বারভাঙ্গায় গিয়ে ডাক্তার দেখাবেন। আর কিন্তু একটা কথা, শীগগিরই আবার একবার আসা চাই। সব ব্যাপারটা আধখানা হয়ে রইল। আমার পরিবার আশা করে আছে, আপনাকে রেঁধে খাওয়াবে। মেয়েটা ভেবেছিল, তবু একটা নতুন লোকের মুখ দেখে বাঁচবে।'

এই মুহূর্তে, ভট্টাচার্য মশায়কে আমার সপরিবারে যেন দূর দেশে নির্বাসিত বলে মনে হল। কথাটা ঠিকই। কাঠমাণ্ডুতে থাকলে তবু ছেলেমেয়ে, দাদা ভাইদের সকলের মিলিয়ে বিরাট সংসার। এখানে কি আছে। তাঁর যদিও বা আঠারো মাইল রেলপথ নিয়ে দিন কেটে যায়, বাকী দুজনের যেতে চায় না। তাই বোধ হয়, দেড় ঘণ্টা গাড়ি থামিয়ে, নিঝুম সংসারকে, হাঁকে-ডাকে একটু জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অতিথি সেবার সঙ্গে, নেপাল তরাইয়ের একটি স্তব্ধ ঘরকে সচকিত করে তোলা।

বললাম, 'সুযোগ পেলেই এসে পড়ব।'

যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, 'দেখা যাবে।'

বলেই, উঠলেন। আবার বললেন, 'আমি আসছি, আপনি তৈরি হোন।'

আমার আর তৈরি হবার কী আছে। আমি তৈরিই। জামা প্যাণ্ট পরে, মাফলারটা কানশুদ্ধ মাথার সঙ্গে জড়ালাম। হয়তো দিনের আলো, কথাবার্তায় যন্ত্রণার তীব্রতা সামান্য কম অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু একটা অনিশ্চিত বিপদের ঝিলিক হানছে মুহুর্মুহু।

ধীরুমায়া এল। হাতে ওর ঝকঝকে থালায় গরম সিঙাড়া, সাদা মতো কিছু মিষ্টি হবে বোধ করি, আর একটি রুপোলি ঘটি। তার খোলা মুখ থেকে, একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। আমাকে বেরোবার পোশাকে প্রস্তুত দেখে, থমকে দাঁড়াল কিশোরী। বোধ হয় নিজের অজান্তেই ওর মুখ থেকে, নেপালী ভাষায় একটা প্রশ্নসূচক শব্দ উচ্চারিত হল। আমি না বুঝে, ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ধীরুমায়ার কালো চোখে একটা উদ্বিগ্ন হতাশা। টেবিলের ওপর খাবারের থালা, ঘটি রেখে এবার যা বলল, তার মানে, 'তুমি জুতো পরছ কেন?'

বললাম, 'আমি যে এবার যাব।'

'কোথায়?'

'দ্বারভাঙ্গা।'

যেন বিশ্বাস করতে পারে নি, এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'বড়াসাববাবা কি তোমাকে যেতে বলেছেন?'

বড়াসাববাবা সম্ভবতঃ ভট্টাচার্য মশায়। তাঁর অনুমতি না হলে যে আমি যেতে

পারি না, ধীরুমায়া তা জানে। বললাম, 'হ্যাঁ। তিনি আমাকে ট্রলিতে করে জয়নগর যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।'

'ওহঃ রাম!'

যেন একটা অভাবনীয় বিস্ময় আর হতাশা ফুটল ওর গলায়। ভাবতে পারে নি, বড়াসাববাবা এমন একটা অনুমতি দিতে পারেন। গতকালের শাড়ি-জামাতেই এখনো রয়েছে। মুখের ওপর, কপালে, গালে রুক্ষু চুল ছড়ানো। আমার দিক থেকে ফিরে, কাঁচের গেলাস ধুয়ে নিয়ে এসে, ঘটি থেকে গরম দুধ ঢেলে দিল। খাবারের থালা আমার সামনে এনে ধরল। আমি থালা হাতে নিলাম। আমার মুখের ওপর, ওর তরাই-কালো কিশোরী চোখের উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এই কষ্ট নিয়ে কেমন করে যাবে? তোমার কি আর কষ্ট নেই?'

বললাম, 'আছে।'

'তবে কেন যাচ্ছ?'

একে কী করে বোঝাব, আমার জীবন, আমার পরিবেশ, তাদের এই প্রাচীন গ্রামীন চিকিৎসার ওপর নির্ভর করতে ভুলে গিয়েছে। আধুনিক নগর হাকিমের চেহারা না দেখলে, আমাদের মনে স্বস্তি হয় না, তাদের দাওয়াই না হলে, আমাদের ব্যাধি সারে না। বললাম, 'তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে আমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

ধীরুমায়া ওর গলার পুঁতির মালা মুঠো করে ধরল, ছাড়ল। কাঁচের চুড়ি ঠিনঠিনিয়ে বাজল। তারপরে নীচু নিষ্প্রভ গলায় বলল, 'খেয়ে নাও।'

সেটাও আর এক বিপদ। চোয়াল নেড়ে কথা বলছি বটে। সন্দেহ গভীর, খেতে পারব কী না। তবু শীতের সকালে, একটা সিঙাড়ার লোভ সংবরণ করতে না পেরে, মুখে তুলে কামড় দিতেই, মনে হল, ডান কান থেকে মাথা পর্যন্ত, একটা তীক্ষ্ন শলা বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গে, সিঙাড়া মুখ থেকে নামিয়ে নিলাম। আমার মুখের অবস্থা দেখেই ধীরুমায়া আগে, আমার হাত থেকে থালাটা নিয়ে নিল। তারপরে, অসঙ্কোচে আমার গা ঘেঁষে, আলতো করে আমার চিবুকে হাত দিল। চোখে ওর উদ্বেগ আর জিজ্ঞাসা।

আমি ঘাড়ের কাছে আস্তে হাত রেখে বললাম, 'খেতে পারব না।'

ধীরুমায়া খাবারের থালা রেখে, দুধের গেলাস দিল। বলল, 'এটা পারবে?'

দুধের গেলাস হাতে নিয়ে, ব্যথার আচমকা ঝলকটা একটু সামলে নিলাম। তারপরে দুধে চুমুক দিলাম। ধীরুমায়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। মাফলার জড়ানো আমার কানের দিকে মাঝে মাঝে দেখছে। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ধীরুমায়ার চোখের কথা যেন পড়তে পারলাম, 'তবু তুমি, এ অবস্থায় যেতে চাইছ?'

মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণ হাসি জেগে উঠল। কতটুকু সময় আমাকে দেখেছে ধীরুমায়া। না কি, এও জীবনের এক খেলা! তরাইয়ের জনকরাজার দেশের মেয়েটি, ছিল ঘরকন্নায়। তারপরে ডাক এসেছিল সখীদের, মেলায় চল, গলা ভরে মালা পরব, হাত ভরে চুড়ি। তারপরে হঠাৎ আর এক খেলা। কোথা থেকে এসেছে এক ভিনদেশী লোক, শরীরে তার অসুখ। তাকে সেবা করতে হবে।

তারপরে, সেই খেলাটাও ভেঙে যাবার সময় এসেছে। এবার নতুন খেলা কী? নতুন খেলাটার আগে, এই পুরনো, মন দিয়ে খেলার রেশ বুঝি কাটতে চায় না কিশোরীর। সকলই তার খেলা, ঘরকন্না, চুড়ি পরা, সেবা করা, কিন্তু সকলই মনের খেলা। এখনো বোধ হয়, এক খেলাতে মন ভোর, আর খেলা সব বাহির বাহির, সে অবকাশ তার আসে নি। তাই সবকিছুতেই সে, ভিতরে আছে, বাহিরে না।

ধীরুমায়ার যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ল। ছুটে বাইরে গেল। মনে হল, উঠোনে

সে কিছু একটা করছে, ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ হচ্ছে। মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল। সবুজ পাতায় কী যেন নিয়ে এসেছে। পাতাটা সামনে রেখে, অনায়াসে, আমার মাফলারের বাঁধন খুলে দিল আস্তে আস্তে। ওর ঠান্ডা হাত দিয়ে, আমার ব্যথার গরম জায়গায়, আল্‌তো করে স্পর্শ করল। বলল, 'ফুলেছে, লাল হয়েছে কান। আগে একটু সেঁক দিয়ে দেব?'

বললাম, 'এখন সেঁক থাক, ওটা কী এনেছ?'

ওর ভাষায় যা বলল, তার মানে, বিষ কাটানো দাওয়াই। আস্তে আস্তে, এক আঙুল দিয়ে, গোটা কান, কানের পিঠে, গালে, সবুজ রঙের প্রলেপ দিয়ে দিল। আমি বসে, ও আমার পাশে দাঁড়িয়ে। কেমন অসঙ্কোচে, আমার কাঁধে একটা হাত রেখেছে, আমি ঘাড় নীচুও করতে পারি না, ইচ্ছে মত পাশ ফিরিয়ে তাকাতেও পারি না। কেবল, ওর গলা থেকে নেমে আসা, বুকের কাছে দোলানো পুঁতির মালা, আমার চোখের সামনে দুলছে। চোখ নামালে ওর ধুলো পা দেখতে পাচ্ছি, যে-পায়ে, গতকালের আলতার দাগ। পায়ের পাতায় ফুলের নক্সা। কাপড়টা ময়লা, তার থেকে এখন, ওর গায়ের আর তরাইয়ের গাছপালা ধুলোবালির গন্ধ বেরোচ্ছে। বুকের নীচে থেকে, পেটের খানিকটা অংশ খোলা, যেন হলুদ মাটিতে রোদ লেগেছে।

কেন জানি না, অনেক পাওয়ানা, পাবার সুখে, দরিদ্র মনটা ভরে উঠেছে। দ্বারভাঙ্গা না গেলে কি নয়! না-ই বা হল ডাক্তারি চিকিৎসা। হয়তো সেখানে আছে, নীরস আরোগ্য, কিন্তু এখানে আছে, ধীরুমায়ার প্রাণের ইচ্ছা, মন দিয়ে ভালো করে তোলার স্ব-ভাবের প্রতিজ্ঞা। এ আরোগ্যে, শান্তি, ব্যথার মধ্যেও একটি প্রাণের নিরন্তর ছোঁয়া।

তথাপি, যে মন আছে পিছে, সে মন মানে না। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। ধীরুমায়ার প্রলেপ দেওয়া হয়ে গেলে, মাফলারটা আস্তে আস্তে জড়িয়ে দিল। আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি কী বলব, ভেবে পেলাম না। কৃতজ্ঞতার কথা বলতে লজ্জা করছে। টাকার কথাটা ভাবতে যেন আরো খারাপ লাগছে। ডাক দিলাম, 'ধীরুমায়া।'

ও জবাব দিল, 'জী।'

তারপরেই যেন একটু লজ্জা পেল। বললাম, 'এখানে থাকতে পারলে আমার খুব ভালো লাগত।'

আমার হিন্দী কথা ও বুঝতে পারল কী না, জানি না। একটা অবুঝ সংশয়ের চোখে আমার দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। আমি আবার বললাম, 'আমি এখানে কিছু না দেখেই চলে যাচ্ছি। আবার আসব।'

তৎক্ষণাৎ ওর ব্যগ্র জিজ্ঞাসা, 'কবে?'

মুহূর্তেই মনে হল, কেমন একটা ফাঁকা মিথ্যা কথা বলছি। ওর প্রশ্নের সরল বিশ্বাসের সুরটাই অনেক গভীর। বললাম, 'তা এখন বলতে পারছি না।'

ধীরুমায়ার ঝিলিক দিয়ে ওঠা চোখে, ছায়া নামল। বলল, 'ওহ্‌। দ্বারভাঙ্গা থেকে অসুখ সারিয়ে, ফিরে আসবে না?'

সেটাই ও ধারণা করেছিল। বললাম, 'এখন আর সে সময় পাব না। আমি বাংলাদেশে ফিরে যাব। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আর একবার আসব।'

'ওহ্‌।'

এই শব্দ ছাড়া, এখন আর ধীরুমায়ার কিছু বলবার নেই। অত্যন্ত লজ্জায় আর সঙ্কোচে, পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করলাম। তা না হলে, একেবারেই যে স্বস্তি বোধ করব না। বললাম, 'তোমার সঙ্গে মেলায় বেড়াতে পারলে ভালো হত।

আমার নাম করে, তুমি কিছু কিনে নিও।'

ধীরুমায়া যেন চমকে উঠল, অবাক হয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'না না, কী করছ?'

একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'তোমাকে দিতে চাই।'

ধীরুমায়ার কালো চোখ দুটি উদ্বেগে বড় হল। খানিকটা অনুযোগের সুরে বলল, 'তা বলে এত টাকা দিচ্ছ কেন?'

ভিন্‌দেশী কৃতজ্ঞতা-বশতঃ তরাইয়ের মেয়েটিকে তুমি কিছু দিতে পারো, তা বলে এমন আশাতিরিক্ত কেন? এই অকপট বিস্ময়টা ওর চোখে, উদ্বেগের মত দেখাচ্ছে। আমার খুদকুঁড়োর সম্বল, হিসাবের অতিরিক্ত কোনোদিন হয় নি। তবু জানি, ধীরুমায়ার চোখে যা অতিরিক্ত, আপাততঃ আমার খুদকুঁড়োকে তার চেয়ে অনেক দরিদ্র মনে হচ্ছে। যোগ্যতা থাকলে আরো তুলে দিতে ইচ্ছা হয়। বললাম, 'এটা এত নয় ধীরুমায়া, তুমি হাত ভরে চুড়ি পর, গলা ভরে মালা, আর মিঠাই কিনে খেও। নাও, এটা রাখ।'

ধীরুমায়া আমার চোখের দিকে তাকাল। বিদায় দেবার চিন্তার থেকেও, এখন তার চোখে বাস্তবের চিন্তা। আমাকে প্রায় পরামর্শ দেবার মতো বলল, 'যা দাও, আরো কম দাও, এত টাকা দিও না।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর সামনে গেলাম। বললাম, 'এটা এত টাকা না। এটা বড় কথা না। তুমি এটা নিলে, আমি খুব খুশি হব।'

আমি ওর একটা হাত টেনে নিয়ে, নোটটা গুঁজে দিলাম। ও আমার মুখের দিকে তাকাল। তার পরে দু'হাতে নোটটা লম্বা করে ধরে দেখল। চোখে অস্বস্তির ছায়া।

এমন সময়ে ভট্টাচার্য মশায় এলেন। ডাকলেন, 'তৈরি হয়েছেন? চলুন।'

তারপরেই ধীরুমায়ার দিকে চোখ পড়তে, নেপালী ভাষায় কী বললেন। ধীরুমায়া নোটটা বাড়িয়ে দেখাল, কী যেন বলল। ভট্টাচার্য মশায় একবার আমার দিকে দেখে ধীরুমায়ার পিঠ চাপড়ে দিলেন। যা বললেন, তার মানে বোধ হয়, 'বাবুজি খুশি হয়ে দিয়েছেন, তাতে আর কী হয়েছে।'

তারপরে কী একটা বলে হাসলেন। ধীরুমায়া চোখে ঝিলিক হেনে হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে, নোটটা ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় রাখল। ভট্টাচার্য মশায় আমাকে বললেন, 'ওকে বললাম, ওই পয়সা দিয়ে, ও যেন আমাকেও মিঠাই খাওয়ায়।'

ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গে বাইরে এলাম। উঠোনে তখন ধীরুমায়ার মা এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরুমায়া আমাদের পিছনে পিছনে। ভট্টাচার্য মশায়, ওর মাকে কী যেন বললেন। আমিও, প্রায়-প্রৌঢ়া মায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কী বলব, ভেবে পেলাম না। সে আমার দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে দেখছিল। মাঝে মাঝে কান ঢাকা মাফলারের দিকে। আমি একটু ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'যাচ্ছি।'

তার মুখে অস্ফুটে উচ্চারিত হতে শুনলাম, 'শিউজীকে কৃপা মিলে।'

মেয়ের মুখে রাম, মায়ের মুখে শিব। যার যখন যে নামটি মনে আসে। বাইরে এসে দেখলাম, লোকজনের যাতায়াত সমানে চলেছে। ইস্টিশানের সামনে, মাঠের ওপরে, গুচ্ছ গুচ্ছ ভিড়। অনেকের অস্থায়ী ডেরা ডাণ্ডা বসেছে, রান্না খাওয়ার ব্যবস্থাও হচ্ছে। একদল আদিবাসীকে দেখলাম। বিস্মৃতির সেও এক জ্বালা। ব্যথা আর ব্যাধির প্রকোপ, অনেক কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছিল। আদিবাসীদের কী একটা নাম বলেছিলেন ভট্টাচার্য মশায়। মনে করতে পারছি না। শুধু তাদের চেহারাগুলোই মনে আছে। এমন দীর্ঘ ঋজু, আজানুলম্বিত বাহু, কুচকুচে কালো পুরুষ নারী,

কোন আদিবাসীর মধ্যে দেখি নি। তাদের আয়ত চক্ষু। উন্নত নাসিকা। পুরুষদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মেয়েদের আলগা খোঁপা বেঁকিয়ে বাঁধা। এই শীতে, পুরুষরা অধিকাংশই খালি গায়ে, রোদে ঘুরছে। মেয়েদের গায়ে, পাতার তৈরি ঢাকনা, বুকে থেকে কোমরের কিছুটা নীচ পর্যন্ত।

কোনোদিকে দৃষ্টি আর মন দেবার অবস্থা পুরোপুরি নেই। ভট্টাচার্য মশায় জানালেন, এই আদিবাসীরা কেবল নেপাল তরাইয়ের জঙ্গলের একটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ আছে। ভবিষ্যতে কোনোদিন, নেপাল তরাইয়ে তাদের দেখতে যাব, চিনতে পারব, সেই আশা নিয়ে ফিরে এলাম।

লাইনের ওপর খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি পার হয়ে, ট্রলি, যাবার জন্য প্রস্তুত। দুজন নেপালী কুলি অপেক্ষা করছিল। তারা হাত তুলে সেলাম জানাল। দেখলাম, ট্রলির চেয়ার আসনে, গরম কাপড়ে মোড়া জলের বোতল। ভট্টাচার্য মশায় ওদের কী বললেন। ওরাও যেন কী বলল। আমি ট্রলিতে ওঠবার আগে, একবার থমকে দাঁড়ালাম। ভিতরে একটা নাগরিক সংস্কারের সঙ্কোচ, মাথা নোয়াতে দিতে চায় না। কিন্তু, উপুড় হয়ে, পায়ের ধুলো না নিয়ে পারলাম না। ভট্টাচার্য মশায় একেবারে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে, হাঁক পেড়ে উঠলেন, 'আরে আরে! কী করে দ্যাখ দিকি, এসব কেন?'

বললাম, 'সেটা বলতে পারব না। আমাকে সব দিক দিয়েই ক্ষমা করবেন।'

'হ্যাঁ, কষ্ট নিয়ে যাচেছন, আমি আপনাকে ক্ষমা করব! কী যেন বলেন, এতে কষ্ট হয়!'

সোজা কথাটাই এমন করে বলেন, মন টনটনিয়ে যায়। আবার বললাম, 'আর আপনার বাড়িতে ওঁদের বলবেন, আবার আমি আসব।'

'হেঁ হেঁ, তবে বাবা শুনে রাখুন। বলব, কিন্তু আশা করে থাকবে।'

'আমি আসব।'

ওঠবার আগে দেখি, ধীরুমায়া ভট্টাচার্য মশায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে। ওর রোদ লাগা মুখে, ওই রুক্ষ চুলের ঝিলিমিলি ছায়া। ধীরুমায়ার মুখে হাসি নেই। আমার মুখের দিকে চেয়েও, ও যেন আমাকে দেখছে না। অন্য কোনো এক জগতের দিকে, দু-চোখ মেলে চেয়ে আছে। যেন বুঝতে চাইছে, সেই জগৎটা কোথায়, কোন্‌খানে।

ট্রলিতে ঠেলা পড়ল, চলতে আরম্ভ করল। আমি হাত তুললাম। ভট্টাচার্য মশায় হাত তুললেন। ধীরুমায়া তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। এই প্রথম আমার মনে হল, মেয়েটির মুখ থেকে রুক্ষ চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে, ওর মুখে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

রাম বিবাহের বরযাত্রী, ফিরে চললাম, সব কৌতূহল আর আকাঙ্খা পিছনে ফেলে। আমার চোখের সামনে, নেপাল তরাইয়ের সবুজ প্রকৃতি, দিগন্তবিসারি হয়ে ফুটে উঠল।

তাই বলছিলাম, এ আমার ফেরার কথা। রাম বিবাহের বরযাত্রী ফিরল দ্বারভাঙ্গায়, আর এক 'বরযাত্রী' লেখকের আলয়ে। সে বরযাত্রীর নাম গণ্‌শা। তার তোতলা মুখের উত্তেজনায়, বাঙালী মাত্রের প্রাণ হাস্যরোলে ঠাসা। আর চোখের জলে মাখামাখি করে রেখেছে যাঁর 'নীলাঙ্গুরীয়,' এলাম তাঁর গৃহের দুয়ারে। অনুজ তাঁর নগরের বিশিষ্ট চিকিৎসক। রোগীর হাল দেখে, সুঁই ফুঁড়ে দিলেন। বিধান দিলেন, বন্ধ ঘরে চুপচাপ বিশ্রাম। অসুখটা একটু বাঁকা।

হায় রে জনকপুরের যাত্রী, রাম বিবাহের বরযাত্রী! কী দুর্দশা তোমার! বাড়ির বড়দের স্নেহ, ছোটদের প্রীতিতে নিষিক্ত হয়েও, আঠারো মাইল ট্রলির পথটা বারে বারে চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আর একটি নতুন দিগন্ত যেন আমার চোখের

সামনে জেগে উঠতে লাগল। নেপাল তরাই—সেই নেপাল তরাই থেকে আর একজন রাজপুরী থেকে যাত্রা করেছিলেন, সব সুখ ঐশ্বর্য ছেড়ে। যাত্রা করেছিলেন বোধিলাভের আশায়। নেপাল তরাইয়ের কোথায় ছিল, আড়াই হাজার বছর আগের সেই শাক্য প্রাসাদ! কপিলাবস্তু কোন্ জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে রয়েছে আজও। কোথায় সেই নগর, রাজবর্ত্ম, হর্ম্যমালা, যার মাঝখান দিয়ে, গৌতমের পুত্র চলেছেন, অশ্বচালিত রথে। আর যেতে যেতে, শোক মৃত্যু জরা বার্ধক্য, যাঁর প্রাণে তোলপাড় করে তুলেছে, এ দুঃখের নিষ্কৃতি কিসে।

তারপরে, আরো পরে, পথে পথে, কোথায় সেই বৃজি লিচ্ছবি গণতান্ত্রিক রাজ্য, রাজ্যের নাম সেই বৈশালী, যেখানে গুরু আলাড় কালামের সাক্ষাৎ মিলেছিল। সেই অনুপ্রিয় বা কত দূরে, কোন্ রাজ্যে, যেখানে রাজপুত্র, নিরাসক্ত চিত্তে গা থেকে খুলে দেয় রাজবেশ, শিরোভূষণ, গায়ে তুলে নেয়, সন্ন্যাসীর চীরবস্ত্র। কারা ছিল তখন সেখানে। কারা দাঁড়িয়ে দেখেছিল সেই দুঃসহ দৃশ্য, চোখের জলে ভেসেছিল। কল্পনা করে, আমার মনের গভীরে শুধু, একটি বাংলা স্বর বেজে উঠেছিল, 'ওরে নিমাই, নিমাই রে...।' তেমন করে কি, অনুপ্রিয় নামক সেই কঠিন স্থানে, কোনো মায়ের কান্না বেজে উঠেছিল, 'ওরে গৌতম, আমার গৌতম রে...!'

বিবাহের বরযাত্রী ফিরে এলাম। নেপাল তরাইয়ের, আর এক পর্ব, আমার চোখের সামনে নিরন্তর জেগে রইল। একটি মূর্তিকে ঘিরে, বিবাহের বাদ্যধ্বনি আর উল্লাস থেকে, বৈরাগ্যের একটি অপরূপ ঝঙ্কার বাজতে লাগল আমার কানে। তাঁর পথ কোথায়, কোন্ পথে সেই পরিক্রমা। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি আছি কাছে কাছে, সেই সব সীমানার আশেপাশে, যেখানে আড়াই হাজার বছর আগের চিহ্ন সব, সঙ্কেতে ইশারায় বাজে। অথবা, তারো অনেক অনেক আগে, মহাভারতের যুগের নায়কদের পদচিহ্ন আঁকা পড়ে আছে।...

যাঁর পরিচয়ে, দ্বারভাঙ্গার গৃহে আশ্রয়, চিকিৎসা, আরাম, সেই স্রষ্টা তখন কলকাতায় আপন কাজে ব্যস্ত। অসুখ সারার পরে, এমন খালি হাতে কেউ আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। তাই তাঁদের ইচ্ছাকে, পাথেয় করে এক রাত্রে যাত্রা করি পাটনার দিকে। আমার চোখে সে পাটলিপুত্র। অবৈদিক, অনার্য শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত মগধ সাম্রাজ্য।

সেখানেও, স্রষ্টার আর এক অনুজের গৃহ। মস্তবড় সরকারী আমলা। অভিজাত সরকারী ভ্রূকুটি হানা এলাকা, বাসস্থান ততোধিক শাসনে নিয়মতান্ত্রিকতায় গম্ভীর। কিন্তু সেটা বাইরে। ভিতরে বাহু বাড়ানো সস্নেহ আহ্বান, প্রীতির নির্ঝরে টল-টলানো কুশল জিজ্ঞাসা।

যখন মগধ যুগের কথা উঠল, তখন রাজগৃহ নাম বেজে উঠল। আর বাণীধ্বনি বেণুবন সহসা আমার চোখে জেগে উঠল, অনুপ্রিয় থেকে সোজা যিনি সন্ন্যাস জীবন নিয়ে এসেছিলেন রাজগৃহের বেণুবনে। গুরুর আশ্রয় তো তারও পরে। বললাম, 'যেতে চাই।'

স্বয়ং অনুজ মহাশয় বললেন, 'নিয়ে যাব। আমিই পৌঁছে দেব সেখানে।'

দুদিন পরে, তিনি তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন। নতুন নতুন মানুষ, জায়গা, একেবারে পর করে ছেড়ে দেবেন কেমন করে।

যতই এগিয়ে চলি, কেবলই মনে হয়, এইখানে, এইখানে আছে সেই পায়ের ধুলো! এখান দিয়ে তিনি কি হেঁটে গিয়েছিলেন! তারপরে যত যাই, তাকাই, আকাশের

বুকে জেগে উঠতে থাকে পাহাড়ের রেখা। রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। প্রহরীর মতো, মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়শীর্ষ। মনে মনে বলি, 'ওই সেই শৈলগিরি। আমার কানে কি বাজে, নগর প্রাকার দরজায় সৈনিকের ডাক, ভেরীর নাদ। অথবা শ্রমণদের আত্মস্থ চোখের দৃষ্টিতে, পথ চলে যাওয়া, আপন মনে উচ্চারিত মন্ত্র শুনি। অথবা শুনি নাকি, জৈন সাধুর বিচিত্র স্বরের বাণী। অথবা ওই কি শুনি, বিম্বিসারের রথের চাকার ঘর্ঘর, কিংবা, স্বয়ং কৃষ্ণ এলেন, ভীম আর অর্জুনকে নিয়ে, জরাসন্ধ নিধনে।'...

রাজগীর। ইতিহাস আর ইতিহাসের আগের। সেই এক সঙ্গম। যেখানে হত্যা ষড়যন্ত্র হিংসা, অহিংসা আর জীবনের বাণী একই সঙ্গে একই কালে বেজেছে। অথচ আমার মনে নবজন্ম ঘটে, এক নতুন কালের সীমানায়। যন্ত্রের গাড়িতে যেতে যেতে, পথের ধারে হঠাৎ দেখি, বাহক বহে নিয়ে চলে ডুলি। কাপড় দিয়ে ঢাকা ঢাকনা একটু ফাঁক, সেই ফাঁকে এক লহমায় দেখি একখানি মুখ। ভেবেছিলাম, মুখোমুখি মাত্র, মুখের ওপর কাপড় ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু অত না। এ কি মুসলমানের বিবি পেয়েছ! এ দেশে এখনো মগধী বাতাস। এদেশে মাগধী রক্ত আছে। পান খাওয়া ঠোঁট, চোখে কাজল, কপালে মেটে সিঁদুরের টিপ, নাকে নোলক। ডুলিতে যায় দুলে দুলে, কৌতূহলভরে চেয়ে দেখে যন্ত্রযান।

মনে মনে ভাবি, রাজা বিম্বিসারের যুগেও কি এমনি ডুলি ছিল। এই যে রাস্তার পাশ দিয়ে চলেছে গোচক্রযান, এর সঙ্গে বহুদিনের চেনাশোনা। মনে হয়, সম্পন্ন গৃহপতির নারীকুলেরা এমনি করেই বোধ হয়, রাজগৃহের নগর দিয়ে চলে যেত।

ক্রমাগত ছোট ছোট টিলা ঘিরে এল, তার মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ চলেছে। এ কিসের টিলা, পাথরের কি? কেমন যেন সন্দেহ হয়। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, পাথরের পর পাথর বসানো ভিতরে ইশারা জেগে রয়েছে। এই কি তাহলে নগর প্রাকার! কত উঁচু ছিল? চওড়া দেখে, মনে হয় আট কি ছয় অশ্ব পাশাপাশি চলতে পারত তার ওপর দিয়ে।

অনুজ মহাশয় বললেন, 'রাজগীরের শুরু হল। ওই হল ছটাগিরি তারপরে বিপুলগিরি।'

বলে, উঁচুতে একদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। কোন্ পাহাড়টা দেখালেন, কিছুই ঠিক ধরতে পারলাম না। আমার চোখের সামনে, কয়েকটা পাহাড়। কোন্টা ছটাগিরি, কোন্টা বিপুলগিরি, বুঝতে পারি না। চোখে জেগে ওঠে, একটি নগর। যে-নগরকে সুরক্ষিত করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি পাহাড়। যে-নগরের পথ দিয়ে, অনুপ্রিয় থেকে এসে প্রবেশ করলেন গৌতম। রাজা বিম্বিসার তখন প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়িয়ে। অলস চোখে, আপন নগরকে দেখছিলেন। যে-পথে হাতীর হাওদায় চলেছে শ্রেষ্ঠি, প্রাসাদের দিকে তার সম্ভ্রমের দৃষ্টি। যদিও রাজাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তাঁরই গর্বিত সেনা অশ্বসওয়ার, কোমরের কাছে অসি ঝনঝনিয়ে চলেছে। ধনী গৃহপতি নগরবাসিনীরা চলেছে অশ্ববাহিনী রথে। তার মধ্যে হয়তো, একটু আগে দেখা সেইরকম ডুলিতেও চলেছে অনেকে বাহকের কাঁধে। আর দ্রুত ব্যস্ত পদচারীর তো কথাই নেই।

জনতার মধ্যে, নগরের পথে কত রকমের মানুষ চলেছে। কত রকমের নরনারী। অনেকে হয়তো বিদেশ থেকে রাজগৃহে এসেছে। কাশী কোশল বৈশালী অযোধ্যা, সুদূর ইন্দ্রপ্রস্থ বা দক্ষিণের সৌরাষ্ট্র থেকেও অনেক বণিকরা হয়তো বাণিজ্য করতে এসেছে। রাজগৃহে কেউ কিছু বিক্রী করতে আসে না। কিনতেই আসে। এখানকার কাপড় অলংকার, যা কিছু, সবই যে সুন্দর। কৈকেয়ীর মানভঞ্জনের জন্য, রাজা দশরথ

বলেছিলেন, 'রাজগৃহের শিল্পজাত দ্রব্য তোমাকে এনে দেব, অভিমান ত্যাগ কর তুমি।' রাজগৃহ শিল্পীর তৈরি জিনিসে, রাণীর মন গলে, সামান্য মানুষের তো কোন কথাই নেই।

বিম্বিসার প্রাসাদের উঁচু বাতায়নে দাঁড়িয়ে হয়তো আরো অনেক কিছু দেখছিলেন। দেখছিলেন, নানা বেশে নানা মানুষ, কে সাধু কে চোর, কিছুই বোঝা যায় না। রাজগৃহ নগরে, সকল ধর্মের মানুষদেরই দেখা যায়। তবে, দূরের গাছতলায়, কিছু ধনী যুবা যেভাবে বসে আছে, মনে হয়, ওরা মৌরীয় পান করে, কিঞ্চিৎ আমেজে আলস্যে কাটাচ্ছে। নিতান্ত প্রাসাদ কাছে বলেই, নগরের পথে নারীদের দেখে বিশেষ বাচালতা প্রকাশ করছে না। দিনের এ সময়ে কি, নগরের কোনো নটী পথে আসবে? বাধাই বা কী? রাজগৃহে নটীর যথেষ্ট সমাদর। এত ধনী শ্রেষ্ঠী, গৃহপতি আর বণিকেরা কোন্ নগরে ঘুরে বেড়ায়? অবিশ্যি রাত্রের বিশেষ প্রহর থেকে নগরের পথে সবাইকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া যায় না। নগরের সমস্ত দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হত। সন্ধ্যার সময়, নগরের দরজা একবার বন্ধ হয়ে গেলে, স্বয়ং রাজারও প্রবেশ নিষেধ, রাজার নিজের আদেশ। বিম্বিসার একদিন 'তপোদা' সরোবরে স্নান করে দেরিতে ফিরেছিলেন, তাঁকে বেণুবনে রাত কাটাতে হয়েছিল। নগর কি ছিল না? তাও ছিল। রাজগৃহের দুই রূপ, অন্তর্নগর আর বহির্নগর। প্রাসাদ নগর আর গিরি নগর। প্রাসাদ নগরের রাজ-অট্টালিকার বাতায়নে, বিম্বিসার আমার চোখে ভেসে উঠছেন। অলস চোখে জনতা দেখছিলেন, নানান্ যানবাহন, হস্তী, অশ্ব, নানা ধরনের নরনারী। আম্রপালীর যৌবনের লীলা কি তাঁর চোখে ছায়া ফেলে রেখেছে? কি ভাবছেন অমন অলস চোখে চেয়ে? কাশীরাজকন্যা কোশলা দেবীর সঙ্গে কি কোনো রকম মনোমালিন্য হয়েছে? হবার তো কথা না। তাঁর পুত্র, অজাতশত্রু তো, রাজপুত্রদের মধ্যে সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। মগধের রাজনীতিতে অজাতশত্রু এখন একটি অনিবার্য নাম।

তবে কি মদ্রদেশের রাজকন্যা, মহিষী ক্ষেমা কোনো কারণে অভিমান করেছেন? এ সব রত্নই তো, বিম্বিসার তাঁর বাহুবল আর রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য অর্জন করেছিলেন। একদা কোশলের রাজশক্তি একটু চিন্তিত করেছিল বটে। অত্যন্ত দুর্মর শক্তির সঙ্গেই, কোশলরাজ কাশী জয় করে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি কাশীর অঙ্গরাজ্যসমূহ সবই বিম্বিসারের করায়ত্ত ছিল। সেগুলো হাতছাড়া করার চেয়ে, শ্রীমতী কোশলাকে বিবাহ করাটাই অনেক ভালো মনে করেছিলেন।

মগধ অনার্য বটে। কিন্তু আর্যদের তুলনায়, পূর্বভারত ঘিরে যে সমৃদ্ধি আর শিল্প উন্নত হয়েছিলি, আর্যরা ঈর্ষা করত। ব্রাহ্মণরা 'পাপভূমি' বলে গালাগাল দিত বটে রাজগৃহের ক্ষত্রিয় দেশকে। কিন্তু লোভীর মতো রাজগৃহের সমৃদ্ধির দিকে চেয়ে থাকত। আসলে, আর্যরা কোনাদিনই রাজগৃহ জয়লাভ করতে পারে নি। তাদের যুদ্ধকৌশল আর শিল্পকলা ছিল, অনেক নিচুস্তরের। তাই ঈর্ষার জ্বালা ছিল। তবু, অনেক ব্রাহ্মণও আর্য দেশ ছেড়ে, রাজগৃহে এসে থাকতেন। বিশেষ যাদের মধ্যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পর্কে নানান্ রকমের সংশয় ছিল, আর্য ধর্মমতের চর্চা করতে চাইতেন। আর রাজশক্তিগুলো চাইত, রাজগৃহের সঙ্গে কোনো রকম একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে। এত শিল্প সমৃদ্ধি গান কথা আর কোন্ দেশে আছে?

তাই ঘোর আর্য রাজকন্যা মদ্রদেশের (পঃ পাঞ্জাব) ক্ষেমাও তাঁর মহিষী হিসাবে এসেছিলেন। কার সঙ্গে মন খুনসুটি হয়েছে রাজা বিম্বিসারের?

নাকি, তাঁর চোখে একটি দুশ্চিন্তার ছায়া রয়েছে। কেমন যেন একটু অবসাদের ছায়া চোখে, সেই সঙ্গে উদ্বেগের ছায়া। আসলে নগরের পথে চেয়েও, কিছুই দেখছেন

না। শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। জীবনে সকল রকমের ভোগে, তিনি ক্লিষ্ট হন নি, সুন্দরতর হয়েছেন। ষোল বছর বয়সে কাশীর অঙ্গরাজ্য যুদ্ধ করে জিতেছেন। রাষ্ট্র রাজনীতি ভালো জানেন, মন্ত্রী মহামাত্যদের ওপর নির্ভর করেও, সমস্ত দিকে দৃষ্টি তীক্ষ্ন। কোনো রকম অন্যায় দেখলেই, কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেন। সততার জন্য পুরস্কার, অসততার জন্য কঠিন শাস্তি, বিম্বিসারের নীতি।

তবে, কিসের চিন্তা? চোখের কোলে চিন্তার দাগ কিসের? অজাতশত্রু? পুত্র? অজাতশত্রুর ষড়যন্ত্র? কিন্তু ষড়যন্ত্র কি সে করছে? কাশীর অঙ্গরাজ্য নিয়ে, সে তো বেশ সুখে ভোগে ভালোই আছে। তবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী কেন মনে পড়ছে, অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হবে?

বিম্বিসারের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি, আধুনিক যুগের এক মানুষ, যন্ত্রযানে চলেছি। আমি যেন সেই নিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। সেই নিঃশ্বাসের মধ্যে, আরো শুনতে পেলাম, এ শূন্যতাবোধ, মৃত্যুভয় না। মৃত্যু, তা যেমন করেই আসুক, আড়াই হাজার বছর আগের রাজাও জানতেন মানুষ অমর না। কিন্তু এত পাওয়া গেল জীবনে, এত সুখ, এত জয়, তবু কোথায় এক শূন্যতা বাজে। কী এক অতৃপ্তি, পিপাসা যেন জীবনে রয়ে গেল। কী যেন পাওয়া গেল না। কী যেন জানা হল না।

তা কী, সেই বস্তু কী? মনের মধ্যে এত হাহাকার কিসের? এই রাজ্যের যে অধিপতি, তার মনের মধ্যে, এ কিসের অশান্তি?

বিম্বিসারের দৃষ্টি সহসা চকিত হল। দৃষ্টিতে আলো ফিরে এল। বুকের রক্তে একটা নতুন জোয়ারের ঢেউ লাগল একটা মানুষকে দেখে। এক সন্ন্যাসীকে দেখে। কে উনি, রাজগৃহের রাস্তায়? আর তো কোনোদিন এই সন্ন্যাসীকে দেখা যায় নি। দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বুক, গৌরবর্ণ, কোমল মুখে জ্যোতি। এই রূপ দেখে, এই মুখ দেখে, সমস্ত হতাশা যেন কোথায় দূর হয়ে গেল। বুকে আশা জাগল। বাতায়ন থেকে বাতায়নে, ঘুরে ঘুরে দেখলেন, সন্ন্যাসী কোন্ দিকে যান। পাছে আর কখনো দেখতে না পান, তাই তাড়াতাড়ি একজন অনুচরকে ডাকলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বললেন, 'উনি কোথায় যান, কোথায় থাকেন, দেখে এসে আমাকে বল।'

অনুচর চলে গেল। বিম্বিসার মনে মনে বললেন, 'কেন যেন মনে হচ্ছে, উনি আমার হাহাকার মেটাবেন, শূন্যতাকে পূর্ণ করবেন। উনি কে?'...

আমাদের যন্ত্রযান ডানদিকে বাঁক নিল। তারপরে দেখ, হুস্ হাস্ করে চলেছে কত গাড়ি। আধুনিক জীবনের ঝলক লাগল আমার চোখে। টাঙা চলেছে পথে। এবার দেখ, নতুন নাগরিক-নাগরিকাদের, যাদের পোশাকের চেহারা আলাদা। কেউ বা সাহেব মেম, কেউ বা বাবু বিবি। রাজগীরের পথে, নতুন মানুষের মেলা। নানা বেশে বিচিত্র রূপ। কেউ এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারে, কেউ চোখের তৃষ্ণা মেটাতে, নতুন দেশ দেখতে। চোখ দেখে ধরতে পারি না, রাজগৃহ দেখতে কে এসেছে। সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে, এক চড়ুইভাতির আয়োজনে, দলবাঁধা পাখির মতো, কিচিরমিচির করতে করতে, মহানন্দে ছুটে চলেছে।

রাজগীরে এখন ছুটির মানুষদের পালা ছড়ানো মেলা। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষের ভিড়। কিন্তু আমার ঠাঁই মিলবে কোথায়। রাজা বিম্বিসারকে দেখেছি এক কল্পনায়, আড়াই হাজার বছরের বেশি পুরনো রাজগৃহকে যেন ক্ষণেকের জন্য দেখলাম। এখন থাকবার ঠাঁই পাব তো!

অনুজ মহাশয় প্রথম গেলেন ইনস্পেকশন বাংলোতে। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। তা না হয় না-ই থাকল, এমন করুণা করে তাকিয়ে দেখার কী আছে। আপদ তো আসে নি। বাঁকা বাঁকা চাহনি, ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে ভাব। ঝকঝকে জানালায়,

চকচকে পর্দা সরিয়ে, আর এক ভ্রমণকারীকে দেখে এত করুণা করার কী আছে। চৌকিদার কেয়ার-টেকারদের ভাবভঙ্গি বড় নিরাসক্ত।

অনুজ মহাশয় চললেন রেস্ট হাউসে। উহুঁ উহুঁ, এ তরীও, এই মাসের রাজগীরে বড় ছোট, ঠাঁই নাই তিলেক। অনুজ মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আমার চোখেও হতাশা নামে। এত বড় এক আমলা, কিন্তু কিছু করবার নেই। দখলদারকে তো সরাতে পারেন না। সে-রকমভাবে নিজের পরিচয়ও দিতে চান না।

এখনো সরকারী ব্যবস্থায়, নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। সার্কিট হাউস হয়ে এল। ওদিকে ডরমিটরির তৈরির পথে। তা যেন হল, ঠাঁই তো একটু চাই। অনুজ মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভাববার কিছু নেই অবিশ্যি। থাকবার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। তবে শহরের মধ্যে ধর্মশালায় থাকতে আপনার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট কেন?'

'তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে না। খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। খাবার হোটেল বাইরে আছে অনেক, বাঙালী খাবার পাবেন বেণুবনে।'

'বেণুবনে?'

নাম শুনলেই যেন শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ লাগে। অনুজ মহাশয় বললেন, 'বাঙালী হোটেলের নাম। এখনো থাকবার ব্যবস্থা নেই, খাবার ব্যবস্থা আছে! এ সময়টা রাজগীরে বরাবরই ভিড়। উষ্ণ কুণ্ডে স্নানের জন্য, ভারতের যত চর্মরোগী, বাত রোগী, নানান্ রকমের লোকের ভিড়। কিন্তু থাকবার ব্যবস্থাটা একটু ভালো না হলে, চলে কেমন করে। বৌদ্ধ মন্দিরে থাকতে পারবেন?'

শুনেই যেন মনের ভিতরটা কেমন দুলে উঠল। রাজগৃহের বৌদ্ধ মন্দিরে! সেখানে আমি থাকতে পারব কেন! সেখানে কারা থাকে, কাদের সঙ্গে থাকব! জিজ্ঞেস করলাম, 'মন্দিরে কি থাকতে পারব?'

অনুজ মহাশয় বললেন, 'সরকারী বাংলোর পরেই, সব থেকে ভালো ব্যবস্থা সেখানেই। বার্মীজদের বৌদ্ধমন্দিরে থাকতে পারেন, জায়গা পরিবেশ মোটামুটি ভালো।'

'সেখানে থাকতে দেবে?'

'হ্যাঁ, ওঁদের মন্দির সীমার মধ্যে একটা আলাদা দোতলা বাড়ি আছে। অতিথিশালা বলুন, আর ধর্মশালাই বলুন, আমাদের থেকে অনেক পরিষ্কার, সুন্দর।'

মন্দিরে থাকা মানেই, অন্যরকম ভাবছিলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল, বিশাল একটা নাটমন্দিরের মত ঘরে, অনেক তীর্থযাত্রী সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বুঝি থাকতে হবে। কিন্তু আলাদা ঘর যদি পাওয়া যায়, আর কিসের প্রয়োজন। বললাম, 'চলুন যাই।'

গাড়ি এসে দাঁড়াল, ছোট একটি টিলার নিচে। ওপরে প্যাগোডা ধরনের মন্দির। জীবনে কখনো এমন একটা বিদেশী মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করি নি। মন্দিরের পিছনেই, সবুজ পাহাড়। পাক দিয়ে ওপরে উঠে, পাঁচিল ঘেরা মন্দিরের উঠোন। উঠোনের ওপরে পাথরের খানিকটা বিস্তীর্ণ ধাপ। সেখানে ফাঁকে ফাঁকে, মাটিতে ফুলগাছ। তারপরে মন্দিরের দালান। দুই দিকে বারান্দা। একদিকে, মূল মন্দিরের বারান্দা এবং মন্দিরের দরজা। আর একদিকে বর্মী শ্রমণদের, কাজের ঘর, ভিতর দিকে বসবাসের এবং রান্নাবাড়ি।

পরিবেশটা ভালো লাগল। লোকজন যারা চলাফেরা করছে, তারা সকলেই চুপচাপ। বর্মীরা যে কয়জন আছেন, সকলেই গেরুয়াধারী বৌদ্ধ। বুদ্ধের এক অতি প্রিয়তম, রাজগৃহে, তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে, জীবন যাপনও পরম ভাগ্যের। অনেক চীনা সাধক হাজার বছর আগে এসে, শুধু এই রাজগৃহের ধূলা নিয়ে গিয়েছেন। তাতেই আপন জন্মভূমিকে পুণ্যস্থান করে তুলেছিলেন।

মন্দির এবং সাধুদের মূল বাড়িটা ছাড়া, অন্য দিকে আর একটি দোতলা বাড়ি। নীচে থেকেই, সোজা একটানা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। দোতলার সামনে খানিকটা খোলা ছাদের বারান্দা। তার কোলে কয়েকখানি ঘর দেখা যাচ্ছে। শান্ত আর নিরিবিলি লাগছে খুব। সাদা দোতলা বাড়িটা যেন, পিছনের সবুজ পাহাড়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। এমন দুরন্ত শীতের দিনেও, সেখানে, ঝোপে-ঝাড়ে কোনো কোনো পাখির গলায় যেন শিস্ বাজছে।

উঠোনের এদিকে-ওদিকে মালতির ঝাড়, কুরচি ফুলের গাছ. গন্ধহীন পাঁচ পাপড়ি টগর ফুটে আছে অনেক। এমন জায়গায় ঠাঁই পেলে, মন গলে।

অনুজ মহাশয় বারান্দায় উঠলেন। মন্দিরের বারান্দায় না, অন্যদিকের। সেখানে একটি ঘরের মধ্যে, টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে এক বর্মী গেরুয়াধারী। মধ্যবয়স্ক, গোল মুখ, নরুণ চেরা চোখে চশমা। সারা মুখে একটি শান্ত গম্ভীর ভাব। অনুজ মহাশয় গিয়ে ঢুকতে, কথাবার্তা ইংরেজীতে হল। জানা গেল, দোতলায় একটি ঘর খালি আছে। একজনের থাকবার মতো সব থেকে ভালো ঘরটিই নাকি আছে।

মনে মনে বলি, 'জয় জয় বুদ্ধ, জয় জয় মহাবীর।'

শ্রমণ তখনই একজন ভৃত্যকে ডেকে, চাবি হাতে দিয়ে, আমাদের ঘর দেখতে পাঠালেন। অনুজ মহাশয় আর আমি গেলাম। দোতলার খোলা ছাদ বারান্দার এক পাশে, সারি সারি তিনখানি ঘর। এক পাশে আর একটি লাগোয়া, কোণ নিয়ে, সিঁড়ির দিকে দরজা। ভৃত্য তালা খুলল। ঘরে ঢুকলাম। অন্য কোনো আসবাবপত্র নেই, একটি তক্তপোষ, একটি টেবিল, একটি চেয়ার ছাড়া। ভৃত্যটি একটি জানালা খুলে দিল। সেদিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করল না।

দেখি, সেই জানালার পাশ দিয়ে উঠেছে এক বিশাল মহীরূহ। পাতায় ভরা ডালপালা তার, জানালার কাছে। নিচের দিকে চেয়ে দেখি, পিছনের পাহাড়ের কোল নেমে গিয়েছে নিচে। বড় বড় পাথরর টুকরো, সবুজ ঘাসের বুকে আটকে রয়েছে। বড় বড় গাছের ছায়ায়, সেখানে, হলুদ রোদের ঝিলিমিলি খেলা। শিস্ দিয়ে ডাকা সব পাখিগুলো সেখানেই। নেমে যাওয়া পাহাড়ের কোলের কাছেই, হঠাৎ দেখি, একটি জায়গা পড়ে আছে। গাছ-গাছালির ছায়া পড়েছে আয়নায়, কিছু রাজগৃহের নীল আকাশের। হঠাৎ বাতাসে কেঁপে উঠতে, বুঝতে পারি, ওখানে একটি ছোট জলাশয় আছে।

অনুজ মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন?'

বললাম, 'চমৎকার! আপনি না হলে, এখানে আমাকে কে-ই বা নিয়ে আসত?'

'সে আপনি ঠিক খুঁজে পেয়ে যেতেন। তবে, এখানকার কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু গোলমাল এক জায়গায়।'

'কোথায়?'

'বাথরুমের যা কিছু কাজ, সব এজমালি, আর নিচে।'

বললাম, 'ক্ষতি কী। তেমন লোকের ভিড় তো নেই।'

'সেটাই বাঁচোয়া। তা হলে ড্রাইভারকে আপনার বিছানা সুটকেস এনে দিতে বলি?'

'নিশ্চয়ই।'

মন্দিরের ভৃত্যকেই বললেন, সে আর ড্রাইভার যেন আমার সব জিনিসপত্র নিয়ে, এ ঘরে তুলে দিয়ে যায়। আমি আবার জানালা দিয়ে তাকালাম। দেখলাম, রাজগৃহ নালন্দার রেলপথ। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে, ছায়ায়-ছায়ায়, ছোট ছোট বাড়ি। সেখানে লোকজনের চলা-ফেরা আর রাজগীর বাজার শহরে যাবার বড় রাস্তায় গাড়ি চলেছে। বেণুবন হোটেল চোখে পড়ে। এর পরেও কি বলতে পারি, ভালো আশ্রয় পাই নি!

জিনিসপত্র ঘরে তোলার পরে, অনুজ মহাশয় বিদায় নিলেন। হাতজোড় করে, কোনো শুকনো কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানাতে ইচ্ছা করল না। জানি, মস্ত বড় আমলা, সরকারী কাজ ফেলে, সকালবেলাই আমাকে নিয়ে, পাটনা থেকে কী ভাবে বেরিয়ে এসেছিলেন। গাড়ি অবধি তাঁকে বিদায় দিয়ে এলাম। তাঁর গাড়ি যাবার পথ ধরে, আর একবার রাজগৃহের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মোটরগাড়ি, জনতা, রাস্তায় রাস্তায়, নতুন রাস্তা তৈরির জন্য শ্রমিকদের কাজ, নতুন নতুন ইমারত গড়ার ব্যবস্থা, সব মিলিয়েও, রাজগীরের কোথাও যেন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানো যাচ্ছে না। উঁচু টিলার মতো ভূমি, এক এক জায়গায় সুদীর্ঘ, অনেকটা পাহাড়ের মতোই যেন, একদিক থেকে, আর একদিকে বাঁক নিয়েছে। মনে হয়, রাজগৃহ নগরের প্রাচীরের সীমারেখা। প্রধান প্রধান নগর দরজার মাথার ওপরে নিশ্চয়ই খিলান করা ছিল। সে সব কবেই ধ্বসে গিয়েছে। কে জানে, এখনো খুঁজলে হয়তো তার দরজা প্রাকারের ভিত পাওয়া যাবে।

ঘরে ফিরে এলাম আমি। বিছানাপত্র খুলে, তক্তপোষে বিছিয়ে দিলাম। কিছু ইংরেজী কাগজপত্র বেরিয়ে পড়ল।, নিতান্তই নানা ছবি আর কাহিনী ছড়ানো, সময় কাটানোর পত্রিকা। কিন্তু সে-সব দেখতে ভালো লাগে না। ইচ্ছা হল, এখনই বেরিয়ে পড়ি। ছাদের সামনে দরজাটা খোলা। বাকী তিনটে ঘরের মধ্যে, একটা ঘর খোলা, দুটো বন্ধ। একটি ঘোমটা-টানা বৌকে দেখছি, মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকছে। টুকি-টাকি বাসনপত্র, ছোটখাট জামা, খোলা ছাদের নর্দমার মুখে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একমনে কাজ করছে, অন্যদিকে তার নজর নেই।

এমন সময়, একজন এসে দাঁড়াল আমার দরজার সামনে। হাত তুলে কপালে ঠেকাল, আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল। ধরে নিলাম, লোকটি আমার কাছেই এসেছে। রংটাই যে তার আবলুস কাঠের মতো, তা না। আবলুস কাঠ কেটে, বেশ নিপুণ হাতে গড়া তার বেঁটে পেটানো শরীর। গায়ে সামান্য একটি জামা, ময়লা একটা ধুতি পরনে, খালি পা।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে সে তার নিজের ভাষায় বলল, 'নাইতে যাবেন বাবু?'

'নাইতে?'

'হুঁ বাবু, কুণ্ডে যাবেন না? গরম জলে, সবাই ওখানে নাইতে যায়।'

সেটা তো, রাজগীরের আগন্তুকদের কাছে, বড় আকর্ষণ। ওর উষ্ণ প্রস্রবণের কথা শুনেছি অনেক দিন। অনুজ মহাশয়ও বলছিলেন, কত রকম রোগের নিরাময় হয় সেই জলে। বিশেষ করে নাকি, বাত আর চর্ম। লোকের মুখে, এমনও শুনেছি, সুখের ঘরে রাত পোহাতে গিয়ে, যারা সামাজিক লজ্জার ব্যাধিটা শরীরে পেয়েছে, তারাও নাকি রাজগীরের কুণ্ডের জলে স্নান করতে আসে। আশা আরোগ্য। সত্যি কি, এমন সর্বরোগহর নাকি রাজগীরের কুণ্ডের জল? নাম তার সাতধারা। সাত ধারাতে বহে।

অহঙ্কার করি না, তবে দেহে ব্যাধি নেই। কিন্তু এই শীতে, উষ্ণ প্রস্রবণের ধারায় স্নান করব, ভাবতেও যে গায়ে শিহরণ লাগে। বললাম, 'যাব, কিন্তু তুমি কী করবে?'

ছোট কালো মুখে, লোকটির গোঁফের বহর দেখবার মতো। চোখ দুটি ঝকঝকে, বলল, 'আপনার নাইবার সময়, আমি মালপত্র আগলাব। জামাকাপড় সংগে নিয়ে যেতে হবে তো আপনাকে। আর যদি আপনি চান তাহলে কুণ্ডের কাছে রোদে বসে, আপনাকে আমি তেল মালিশ করে দেব।'

বাঙালীর ছেলে, মাঘ মাসে রোদে বসে তেল মাখবে, মনে হলেই, রক্তে একটা উল্লাস জাগে। শীতের দিনে রোদে বসে তেল মাখা, অনেকের কাছে মেঠো ব্যাপার।

আমার কাছে সুখের বিলাসিতা। এমন বিলাসিতার সুযোগ যদি পাই তাকে কাজে না লাগিয়ে পারি না। তবে, এক জায়গাতে ঠেক। মালিশটা নিজের হাতে করতে হবে, অন্যের হাতে না। বললাম, 'কিন্তু আমার তো পাত্র নেই, তেল নেব কিসে?'

লোকটির জবাব তৈরি, 'আমাকে পয়সা দিন, ছোট একটা শিশিতে তেল নিয়ে আসি।'

তাও তো বটে। রাজগীর এখন ভ্রমণের জায়গা। দেশ-বিদেশের মানুষের আনাগোনা। এখানে এখন পয়সা দিলে, বাঘের দুধ মিললেও মিলতে পারে। লোকটিকে পয়সা দিয়ে বললাম, 'তাহলে নিয়ে এস, তারপরে চান করতে যাব। তোমার নাম কী?'

লোকটি তখন ঘরের মধ্যে এসেছে। বলল, 'বেচন। এখানে যারা আসে, আমি তাদের নোকরি করি।'

পয়সা নিয়েই সে দৌড় দিল। আমি খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। গাছের ফাঁকে ফাঁকে, আবার রাজগৃহের দিকে তাকালাম। চারদিকে পাহাড়ের মালা। নিচের সমতল, আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে, সেই রাজগৃহ নগর ছিল। রাজগৃহ, যার আর এক নাম গিরিব্রজ। এ ব্রজ সে ব্রজ না, রাখাল যেখানে গোচারণ করে। বৈষ্ণব কবিতার দৌলতে আমরা তাই জানি, ব্রজ মানে গোচারণভূমি। এখানে ব্রজ হল দুর্গ। রাজগৃহ গিরিব্রজ যার নাম। পাহাড়ের দুর্গ হল রাজগৃহ নগর।

কেন রাজগৃহ নাম। অনেক তার ব্যাখ্যা। বৌদ্ধরা তাঁদের কথায় বলে গিয়েছেন, বহুকাল ধরে, বহু রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন, তাই নাম রাজগৃহ। পুরাণ বলেছে, জরাসন্ধ সারা দেশ থেকে রাজাদের ধরে ধরে এনে, এখানে বন্দী করে রেখেছিলেন, তাই রাজগৃহ নাম। এত ইতিহাসের কুটকচাল ব্যাখ্যায় গিয়ে, কী লাভ আমার। কারণ যাদের খোঁজার, তারা খুঁজুক। আমি মনে করি, রাজা যেথায় বাস করেন, রাজধানী করেন, তারই নাম রাজগৃহ।

তবে জরাসন্ধ যে সেই আদ্যিকালের রাজা ছিলেন এদেশে, বুদ্ধি তা মেনে নিতে চায়। কেতাবি কথার বিচার ভালো লাগে না, কিন্তু পুরনো সেই আদিকালে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সেই যে, রামায়ণের যুগে, কেকেয় বলে এক জাতি ছিল, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যাদের রাজধানী, তার নামও ছিল, গিরিব্রজ রাজগৃহ। কেকেয়দের কথা আছে, শতপথ ব্রাহ্মণে আর ছান্দোগ্য উপনিষদে। সেই দেশের রাজা, অশ্বপতির মেয়ে কৈকেয়ী, দশরথের রাণী। বিপাশা নদী থেকে, গান্ধার পর্যন্ত কেকেয় দেশের বিস্তৃতি। ঝিলম নদীর ধারে জালালপুরের কাছে, গিরিয়াক বলে এক জায়গা আছে, কেকেয়দের গিরিব্রজ রাজগৃহের চিহ্ন। এই রাজগীরের সাত মাইল পুবেও নাকি এক গ্রাম আছে, তার নামও গিরিয়াক। ভারতবর্ষের দুই জায়গায়, এক নাম। কে জানে, এর মধ্যে যোগসূত্র কী। হয়তো কিছু আছে। ইংল্যান্ডের লোক আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে, নাম দেয় নিউ ইংল্যান্ড। বিহারের রোহতাসগড়ের শের শা, পাঞ্জাব জয় করে, সিন্ধুনদের তীরে দুর্গ করে, তার নাম দেয় রোহতাসগড়। উত্তর প্রদেশের মথুরা, দক্ষিণে গিয়ে মাদুরা।

কে জানে, কেকেয়রা মগধে এসেছিল, নাকি মগধীরা গিয়েছিল কেকেয়তে। মাগধী রাজগীরের, স্তব্ধ পাথরের বুকে অরণ্যের নিস্বনে, সে কথা শোনা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে, জীর্ণ ভগ্ন বৃদ্ধ মান্ধাতা, আধুনিকতার বেগ দেখছে।

তবে কেকেয়রাও অনার্য ছিল। উদ্ভব, অনু নামে জাতি থেকে। অনার্য অসভ্য না, আর্য থেকে ভিন্ন মাত্র। আর্য তো ভারতের বহিরাবরণ, ভিতরে সে অনার্য। আর্য প্রাগার্য মিলিয়ে ভারত। উত্তর-পশ্চিম থেকে, কেকেয়দের একটা দল কি পূর্বের দেশে এসেছিল? কোথাও কি তারা তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে আসে নি? একবার কি

ফিরে যাওয়া যায়, হিসাবের বাইরে সেই শতাব্দীতে? যাদের পায়ে, পা **মিলিয়ে,** আমিও চলব।

আর্যদের আক্রমণ তো পশ্চিমোত্তর থেকেই এসেছিল। মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পাও সেই কথাই তো বলে। সেই মার খাওয়া মানুষেরা, আর্যরা যাদের নাম দিয়েছিল, অসুর দানব দস্যু দাস, তারাই কি কেউ এই মগধ গিরিব্রজ-রাজগৃহের প্রতিষ্ঠাতা? আপনি জিজ্ঞাসো, আপনি ভাবো। ইতিহাস মুখ থুবড়ে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পড়ে আছে, এই আরণ্যক পাথরের ফাটলে, পুরনো শ্যাওলা ধরা ভাঙা ভিতের কোটরে কোটরে।

কিন্তু পুরনো দুই অসুর রাজার সন্ধান তখন ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগবদ্‌দত্ত, আর রাজগৃহ-গিরিব্রজের জরাসন্ধ। আর্যদের তুলনায় ক্ষমতা কম না। বরং বেশি। জরাসন্ধের নামে গগন কাঁপে। তার ঐশ্বর্যের ঝলকানি, ভারতের প্রান্তের চোখে চোখে। কিন্তু তারও আগে আছে। কুরুর পুত্র সুধন্বা। সুধন্বার পরে চতুর্থ রাজা বসু মগধ জয় করেছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বৃহদ্রথকে দিয়ে গিয়েছিলেন, গিরিব্রজ-রাজগৃহ। বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ।

কে জানে, মহাভারতের সেই গোরথগিরি কোথায়, যেখান থেকে মগধের পাহাড় ঘেরা সুরক্ষিত রাজধানী গিরিব্রজকে দেখা যেত। কে জানে, বৌদ্ধদের সেই মহাগোবিন্দ মানুষটি কে, যিনি নাকি এই সুরক্ষিত নগরের স্থপতি ছিলেন। কে জানে, বুদ্ধঘোষ কোথা থেকে জেনেছিলেন, স্বয়ং মান্ধাতা নিজের হাতে এই রাজগৃহ সৃষ্টি করেছিলেন। বহুদূর কালের, আলোছায়ায়, ঝিলিমিলি করছে রাজগৃহ। তার কিছু দেখা যায়, আবার দেখা যায় না। কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে গিয়ে, অস্পষ্টতার ঝাপসায় গিয়েছে হারিয়ে। তবে সেই কাহিনী আমাদের রক্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, জরাসন্ধ মহা-পরাক্রান্ত রাজা। কৃষ্ণদ্বেষী, পাণ্ডবদ্বেষী, কংসের সঙ্গে নিজের দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কংসের মৃত্যুর পরে, মথুরা অভিযান করেছিলেন বিপুল সৈন্য নিয়ে। কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এমনি ফিরে আসেন নি। কৃষ্ণ-অনুরাগী যত রাজাকে পেয়েছিলেন, ফেরার পথে রাজ্যে রাজ্যে, সবাইকে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন এই রাজগৃহে। এক বিশাল কারাগার করে, বন্দী করে রেখেছিলেন। বলরামের রথের ঘোড়া হত্যা করেছিলেন।

তবু সেই জরাসন্ধেরও, বীরের প্রতি সম্মান দেখানোর নজীর আছে। বীরের অসূয়া, বীরের নাম শুনলে সে অস্থির। কর্ণের বীরত্বের সংবাদ শুনে, জরাসন্ধ শক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন। কর্ণও প্রস্তুত। জরাসন্ধের পরাজয়। কর্ণকে তাই দিয়েছিলেন মালিনীনগরী, কর্ণ মালিনীনগরীর রাজা হয়েছিলেন। জরাসন্ধকে না হারিয়ে, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন নি।

আমার চোখে ভেসে ওঠে এক আশ্চর্য দৃশ্য। রাত গভীর, রাজগৃহ-গিরিব্রজ নিদ্রিত। নগর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বর্ণাভ কেশর ফোলানো দ্রুতগামী অশ্ব-টানা রথে, নগরের বাইরে তিনজন ব্যক্তি এলেন। এসে, নিঃশব্দে নামলেন। তিনজনেই, গুপ্ত পথে, রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করলেন। কোনো রকমে রাত্রিবাসের পরে, দিনের বেলা, তিনজনে প্রকাশ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন জরাসন্ধের কাছে। কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম। জরাসন্ধকে ভীম দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডাক দিলেন।

সেই মুহূর্তে কি জরাসন্ধের বুকের মধ্যে একবার, নিয়তির সংকেত ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল? কেমন করে তাকিয়েছিলেন তিনি ভীমের দিকে? কৃষ্ণ কোনো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসেন নি। তবু তো, জরাসন্ধের সৈনিকেরা তাঁদের আক্রমণ করে নি। জরাসন্ধ রণভূমি তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। ভীমের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। বীরকে মরতে হবে, বাঁচতে হবে বীরের মতই।

ক'দিন ধরে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছিল, কে জানে! শক্তির পরীক্ষা, না, জীবন হননের প্রতিজ্ঞা? কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে না, একটি বিশেষ ভাবে তৈরি রণভূমি। কারা দেখেছিল, সেই যুদ্ধ? কত লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল দুই যোদ্ধাকে? কী বলেছিল তারা, কী তাদের মনোভাব ছিল? দুই যুধ্যমানকে ঘিরে, দুটো দল যেমন চিৎকার করে হেঁকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করে, তেমনি করেছিল কী?

শেষ পর্যন্ত ভীম, জরাসন্ধের, দুই পা ধরে, মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। প্রবাদ এই রকম। কৃষ্ণ তাঁর অনুরাগী বশ্য রাজাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজগৃহ-গিরিব্রজ, এ কি কেবল পুরাণের গল্প-কথা? মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। রাজগৃহ আমার চোখে, অন্য চেহারায় জেগে ওঠে।...

বেচনের সঙ্গে সাতধারার উষ্ণ কুণ্ডে গেলাম। গিয়েই ঠেক, মনে হল চান করতে পারব না। মনে রাখি নি, এ রাজগৃহ কেবল, যুগযুগান্তের এক স্তব্ধ দিনের ছায়ায় নিঃশব্দ জায়গা না, তীর্থক্ষেত্রও বটে। কুণ্ডের কাছে এলে, সেটা ভালো করে টের পাওয়া যায়। জৈন বৌদ্ধ হিন্দু, সকলেরই তীর্থক্ষেত্র রাজগীর। সাতধারাতে স্নান যে কেবল ব্যাধি-মুক্তি, তা-ই না। পুণ্যিও বটে।

অতএব, কাছা নেই কি কোঁচা গেল, শরীরে শাড়ি নেই কিংবা চুল এলিয়ে গেল, সেদিকে কারোর খেয়াল নেই, স্নান করতে হবে, স্নান করতে হবে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে, এমন একটা চত্বরে ঢোকা যায় কী করে। ঢুকে, প্রস্রবণের একটা মুখে নিজেকে পেতেই বা দেওয়া যায় কেমন করে। পদে পদে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। এ ওর ঘাড়ে পড়ে তো, ও এর ঘাড়ে। পুরুষে পুরুষে ধাক্কাধাক্কি, মেয়েতে মেয়েতে ঠেলাঠেলি। এ কি কলকাতার পৌরসভার, গরীব-পাড়ার রাস্তার জল-কল নাকি!

বাইরে থেকেই দাঁড়িয়ে দেখলাম। ভিতরের চত্বরে ঢোকবার সাহস পেলাম না। অর্ধ-উলঙ্গ বা প্রায়-উলঙ্গ, মানুষ জলের নিচে বসে আছে তো বসেই আছে। তার ওপর দিয়েই ঘটি বাড়িয়ে দিয়েছে কেউ। পুরুষের কথা না হয় গেল, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা বিষয় চোখে পড়ার মতো, যুবতী মেয়েরাও, লজ্জাকে বাঁধা দিয়েছে, উষ্ণ প্রস্রবণের স্নানের কাছে। এ স্নানের কি এমনি মাহাত্ম্য! পীনবক্ষ খোলা থাকে, তবু প্রস্রবণের জল ঢালাঢালি। যে কটি কোমর নিয়ে এত সরম, তা যে কখন উদাস হয়ে রইল, সে খেয়ালও নেই।

বেচনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাহাতে তো নিয়ে এলে, এখানে নাহাব কেমন করে?'

বেচন আমাকে বোঝালে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে বাবুজী, আপনি জামা-কাপড় ছেড়ে তেল মাখুন।'

সেটাও এক সমিস্যে বটে। সাতধারার কোল থেকে, যে পাহাড় উঠে গিয়েছে, তার পাশ ঘেঁষে, কনকনে বাতাস আসছে, চোখে-মুখে বিঁধছে। ছুঁচ ফোটাচ্ছে যেন। সারা গা-টা খালি করলে না জানি কিসের কামড় লাগবে। কিন্তু একা তো নই। অনেকেই খালি গায়ে, বাঁধানো চত্বরের ওপর বসে গিয়েছে। সবাই তেল মালিশে ব্যস্ত।

তথাপি যেন কোথায় একটা ঠেক লাগছে। নিজেকে একেবারে অর্ধ-উলঙ্গ করে, তেল মাখতে বসতে যেন কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে। যদিও, এখানে সঙ্কোচ নামক জিনিসটি, সাতধারার জলে ধুয়ে যাচ্ছে। ওসব নিয়ে এখানে চলে না। অতএব, জামা-কাপড় ছেড়ে, তেল মাখবার কাপড় পরে, বসে গেলাম। পাহাড়ের দিকে মুখ করে বসলাম। এই পাহাড়ের কোথাও আছে সেই জরাসন্ধ-কী-বৈঠক। তার ওপরে আছে, সপ্তপর্ণী

গুহা।

কে জানে, জরাসন্ধ-কী-বৈঠকের মানে কী, ওখানে বসে কি, জরাসন্ধ বৈঠক করতেন? বয়স্যদের সঙ্গে নানা কথা, আলাপ-আলোচনা করতেন, তার জন্যই বৈঠক নাম হয়েছে কী না, কে জানে।

তেল মাখা হলে, প্রাচীর-ঘেরা সেই সাতধারার চত্বরে এলাম। সব প্রস্রবণের মুখেই লোক। কোথায় যাই, কোথায় ঢুকি।

এক বাঙালী ভদ্রলোক, আমাকে কী ভাবলেন জানি না। বাঙালী হিন্দিতে তিনি যা বললেন, 'ঢুকে যান ঢুকে যান, তা না হলে হবে না।'

'ঢুক যাইয়ে ঢুক যাইয়ে' শুনলেই কেমন যেন বাঙালী বাঙালী মনে হয়। তাই দ্বিধা করে বললাম, 'সুযোগ খুঁজছি।'

ভদ্রলোক চোখ বড় করলেন, খোঁচা ভুরু খুঁচিয়ে হাসলেন। বললেন, 'ভায়া বাঙালী দেখছি। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। জোর করে ঢুকতে হবে। আরে মশাই, এদের সঙ্গে কি আমাদের বনে।'

বলে, বাঙালী ভিন্ন, ভারতের আর যত স্নানার্থী, সবাইকেই বিরক্তির চোখে, ইশারায় দেখিয়ে দিলেন। বাঙালীর এমন বাঙালী প্রীতিতে, আমার মন আবার তেমন রসে না। দেখে-শুনে তো এ কথা একবারও মনে হচ্ছে না, প্রস্রবণের মুখে, বাঙালী তার দাপট কিছু কম দেখাচ্ছে।

বেচন আমার বেচারা অবস্থা দেখে এগিয়ে এল। বলল, 'কুণ্ডে চান করবেন, বাবুজী?'

'চল তো দেখি।'

চত্বর দিয়ে, খানিকটা এগিয়ে, ডানদিকের ঢাকা ঘরে ঢুকলাম। একটা পাক দিয়ে দেখি, সেখানে একটি কুণ্ড। তাতে এত লোক নেমেছে, দেখে বিশ্বাস হয় না, নিজের গা হাত পা শরীর, আলাদা করে কেউ চিনতে পারছে। ভক্তি হল না। বললাম, 'না থাক, চল ধারাতেই যাই।'

ফিরে এলাম। এতগুলো লোক একসঙ্গে নেমেছে কী করে! বেচন আমার সঙ্গে আসতে আসতে বলল, 'কুণ্ডে না নেমে ভালোই করেছেন বাবুজী।'

তার স্বরের মধ্যে, কেমন একটু গোপনীয়তার সুর। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সে বলল, 'অনেক সময় গরমী আর কুষ্ঠ রোগীরা কুণ্ডে নেমে স্নান করে। তারা ধারায় স্নান করে না, ব্যারামটা লোকে দেখে ফেলে যদি।'

চিরদিনের সংস্কার, গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠল। যে স্বপ্নেই থাকি, যত উদারতাই দেখাই, তত্ত্বকথার মার-প্যাঁচে, যতই জট পাকাই, নিজের বেলা আঁটিসুটি ভাবটা যেতে চায় না। কুণ্ডের মধ্যে গাদাগাদি করে স্নান করলে রোগীর রোগ আমাকেও ছোঁবে কি না, জানি না। মন মানে না। কিন্তু ব্যাধিকে গোপন করে, যে এসে নেমেছে, তার জ্বালা কি কম। সে এসেছে, আমার থেকে অনেক বেশি আশা নিয়ে। সে ভুক্তভোগী, তার আকাঙ্ক্ষা আরোগ্যের। আমার আরামের।

তবে এসেছি নাইতে। শরীরটাকে পবিত্র উষ্ণ জলে, ধুয়ে মুছে নিতে। মন যেখানে খুঁতখুঁত করবে, সেখানে না-ই বা গেলাম। এবার একটা ধারার কাছে, প্রায় ভিখিরির মতো দাঁড়ালাম। যদি দয়া হয়।

কিন্তু দীনকে এত সহজে কারোর দয়া হয় না। বেচন একজনকে ঝাঁঝিয়ে দিল হাঁক, 'আরে এই ওঠ, এ তোমার ঘরের জল না, বাবুজীকে একটু নাইতে দাও।'

যিনি চান করছিলেন, সেই বিশালবপু গৌরবর্ণ চোখটিও খুললেন না। গা থেকে তার ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শরীর লাল দেখাচ্ছে। কেবল এইটুকু শোনা গেল, 'তোমার বাবুজীরও

তো ঘরের কল না। তাড়া থাকলে বাবুজীকে ঘরে নিয়ে যাও।'

জবাবে যার হাসির অস্ফুট ধ্বনি শুনলাম, সে তখন শাড়ির বন্ধনী কষছে। ভেজা এলোচুল কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। সন্দেহ হল, এরা মদ্রদেশীয়, অর্থাৎ পাঞ্জাবের মানুষ।

বেচন একটু লজ্জিত হল। আমি তাকে বললাম, 'হবে হবে, দাঁড়াও।'

গৌরবর্ণ বিশালবপু, রক্তচক্ষু আধবোজা করে একবার আমার দিকে তাকালেন। কী দয়া হল, খানিকটা সরে গিয়ে বললেন, 'আ যা বেটা।'

যাক, তবু ব্যাটা বলে ডেকেছে, জায়গাও ছেড়ে দিয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে ধারায় গা পেতে দিয়েই, ছিটকে খানিকটা সরে এলাম। এ যে ভীষণ গরম! ফুটন্ত নাকি?

বিশালবপু সান্ত্বনা দিল, 'কিছু নয় ব্যাটা, এখুনি সয়ে যাবে, তারপরে আরাম লাগবে।'

বেচনও তাই বলল। কথাটা মিথ্যা না। একটু একটু সয়ে গেল বটে। তবে বিশাল-বপু যেভাবে একনাগাড়ে বসে ছিল এই উষ্ণ ধারার মুখে, আমার পক্ষে তা অসম্ভব। একটু বসি তো, আবার সরে আসতে হয়। তবে, শরীরের মধ্যে, রক্তে যেন একটা নতুন স্পর্শের স্বাদ পাচ্ছি। একটা আরামের রেশ যেন আমার চোখের কোলে এসে জমে। আর সেই সময়েই, মনে হল, গায়ের ওপর কী একটা পড়ল।

চোখ মেলে দেখি, শাড়ি। স্নানের পর, আমার গায়ের ওপরেই ধোয়া হচ্ছে। স্নানার্থিনীটি কে? তাকিয়ে দেখি, সেই তিনি, যিনি, শাড়ি পরতে পরতে হাসছিলেন। চোখে আর ঠোঁটের হাসিতে একটিই কথা, 'তোমার গায়ে কিছু লেগে থাকবে না, সবই ধুয়ে যাবে।'

অতএব ধুয়ে নিয়ে যাও।

স্নানের পরে, বেচনের কাছ থেকে জামা-কাপড় নিয়ে পরলাম। ঘড়ি মনিব্যাগ, সবই তার হাতে। ভেজা কাপড় তোয়ালে নিয়ে, সে আমাকে পরামর্শ দিল, নিজের ডেরায় যাবার আগে, আমি যেন, খাওয়াটা সেরেই যাই। কারণ, বাইরেই কোথাও আমাকে খেতে হবে। ঘরে গেলে, আবার আমাকে বেরোতে হবে। আকাশের রোদ, হাতের ঘড়ি, আর জঠরের অনুভূতি, সকলের এখন একটাই দাবি, কিছু খাদ্য প্রয়োজন। বেচনকে ছেড়ে দিলাম।

সাতধারা থেকে, আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসতে গিয়ে, কে যেন পাশ থেকে কোমরের কাছে, আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে দিল। চেয়ে দেখি, স্বয়ং পূর্বপুরুষের বংশধর, বানর। খোঁচা দিয়ে, হাত পাতার ভঙ্গি করে, দাঁত দেখাল। তা বটে। এর আগেই দেখেছি, অনেকেই তাদের বাদাম আর কলা দিচ্ছে। আমিই বা রেহাই পাই কেন। সামনেই এক কলাওয়ালাকে দেখে, কয়েকটা কলা কিনলাম। ভাবলাম, কয়েকজন রয়েছে, সকলের হাতে দেব।

তাই কখনো হয় নাকি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে, একজনই থাবা দিয়ে সবগুলো নিয়ে, ল্যাজ তুলে দৌড়। আমি চমকালাম। আশেপাশের অনেকে হেসে মজা পেল। আর আমার ছেলেবেলার বকুনি খাওয়াটা মনে পড়ে গেল, 'বান্দর!'

নিচে নেমে এলাম। সামনেই, রাস্তার ধারে, যাত্রীদের জন্য নতুন বিপণিঘর। বিহার কুটির শিল্প থেকে, খাবার। খাবার ঘরই বেশি। সরকারী ট্যুরিস্ট অফিসের একটা ঘরও আছে দেখছি। কিন্তু এসবে যেন তেমন মন টানে না। দক্ষিণ দিকে ফিরে তাকাই। গিরিপ্রাকারের মাঝখান দিয়ে, রাস্তা চলে গিয়েছে। একটুখানি গেলেই, রাজগৃহ নগরের অভ্যন্তর। আমার বাঁদিকে বিপুলগিরি। একটু সামনেই ডানদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বৈভারগিরি। এই দুই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে,

কোথায় যেন ছিল নগর-প্রাচীর। খ'ুজলে এখনো তার চিহ্ন পাওয়া যাবে।

দেখছি, ওদিক থেকে মেয়েরা আসছে, শুকনো কাঠ মাথায় নিয়ে। কখনো কখনো এক-আধজন পুরুষ। শহুরে ভিন্‌দেশীদের দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। এই শীতে, কোনো মেয়েরই গায়ে জামা নেই। কালো উদ্ধত শরীরে বেড় দিয়ে আছে, কোমর থেকে বুক অবধি, একটি মাত্র ছোট কাপড়। তাতে যত লজ্জা রক্ষা হয়েছে, একটা আদিম সৌন্দর্য ছলকে পড়ছে যেন তার বেশি।

কেবল যে কুড়িয়ে আনা কাঠকুটো তাদের মাথায়, তা না। এক ধরণের জংলী বংশের ঝাড়ও তার সঙ্গে আছে। দেখে মনে হয়, বাংলা দেশের মুলি বাঁশের বংশ বুঝি। আদপে তা না, এ কণ্ডির ঝাড় অনেক শক্ত। মেয়েদের হাতে পায়ে বালা। কারোর বা গলায় মোটা বড় বড় পুঁতির মালা। মেয়ে পুরুষ, সকলের চোখে যেন, আপাত একটা নিরাসক্তি।

এরা কারা? কিসের ঘোরে আছে? এরা কি সেই রাজগৃহ-গিরিব্রজ যুগের সময় থেকে বংশ-রক্ষা করে আসছে? নাকি, নতুন জনগোষ্ঠির ঢেউয়ে, পরিত্যক্ত রাজধানীর জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছে?

বুঝতে পারি না। দক্ষিণ থেকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তরে চলি। অভর পেট সেখানেই ভরবে। রাজগৃহে প্রবেশের উত্তর দ্বারের দিকে যাই। যেখানে নতুন রাজগৃহ একদা তৈরি হয়েছিল। চারদিকে ধুলো উড়ছে। বড় বড় গাড়িতে ইমারত তৈরির মালপত্র আসছে। কেবল ইমারত তৈরি না, রাস্তায় রাস্তায় কাজ হচ্ছে। নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে। আধুনিক মানুষদের উপযোগী করে গড়ে তোলার আয়োজন চলছে। শত শত মেয়ে পুরুষ, মজুর কামিন কাজ করছে। সরকার বড় ব্যস্ত।

দরজার মাথায় দেওয়ালে ফলক, লেখা আছে, 'বেণুবন'। বেণুবন! কোথায় সেই বেণুবন, যেখানে এসে বুদ্ধের মনে হয়েছিল, এই সেই স্থান, যেখানে আমার মন বসতে চায়। বিম্বিসারের 'বেণুবন আরাম' ঠিক কোন্ জায়গাটিতে ছিল? সেই বেণুবন আরামের দৃশ্য কেমন ছিল? কলনদক নিবাপ বলে, এক পুষ্করিণী ছিল সেখানে। যেখানে স্নান করতে গিয়ে, প্রাসাদে ফিরতে, বিম্বিসারের দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল বেণুবনে।

আমি আধুনিক বেণুবনের ঘরের দরজায় পা দিলাম। ঢুকেই, ডানদিকে কয়েক-জনের আহারপর্ব চলছে দেখলাম। বাঁয়ে যিনি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর দৃষ্টি ভিতরে যাবার দরজার দিকে। পান্থশালায় এসেছি, অনাহুত বটে, কিন্তু খাবার চাইব কার কাছে? এ ঘরে আর ভিতর ঘরে, চলা ফেরা ব্যস্ততা আর দ্রুততা দেখে মনে হচ্ছে, সব মিলিয়ে, ভোজন ছাড়া, এখানে আর কিছু নেই।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'খাবার পাওয়া যাবে?'

উনি তখন আর একজনের মুখ থেকে শুনতে শুনতে, নিজে লিখছেন, আর বলছেন, 'হ্যাঁ, দুটো ডাল, আলুভাজা, হ্যাঁ—তরকারি নিরিমিষ দুটো, হুঁ মাছ? মাছ দুটো, হ্যাঁ আচ্ছা, দৈ? দৈ আছে? নেই। আচ্ছা, জিজ্ঞেস কর দৈ দিতে হবে কী না। ওদিকে মাংস দিয়েছ? ক' প্লেট? চার? আচ্ছা, ঠিক আছে, ভাত ক'টা? একস্ট্রা ক'টা?'...

যাক, আমার আর পদ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হল না। এখন খেতে পাওয়া যাবে কী না, সেটা জানলেই, সব কথা মিটে যায়। বেণুবনে এখন শুধু রান্না ব্যঞ্জনের গন্ধ। তবে, বাঙালী বাড়ির গন্ধ যেন একটু মেশানো। অনুজ মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন,

উপযুক্ত খাবার জায়গা। শুঁকে শুঁকে ঠিকই এসেছি।

'হ্যাঁ, কী বলছিলেন?'

'খেতে পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই। ক'জন?'

'একজন।'

'বসে যান। দেখুন ভেতরে জায়গা আছে কী না।'

নিশ্চয়ই নিজের হাতে বেড়ে নিয়ে খেতে বলবে না। একে বলে মরসুম। মরসুম যখন আসে, তখন ঝাড়ের সব ফুলই ফোটে, কেউ বাকী থাকে না, বোঁটা খালি থাকে না। বেণুবনেও মরসুম। তার ওপরে, অন্ততঃ যতটুকু চোখে দেখেছি, মুখে শুনেছি, বেণুবন একমাত্র বাংলা খাদ্যের জায়গা। তবু আছে এই যথেষ্ট।

ভিতরের ঘরে গেলাম। সেখানেও জায়গা নেই, প্রায় ডজনখানেক নরনারীর ভোজন চলেছে। শুনতে পেলাম, 'ভেতরে যান।'

আরো ভেতর আছে নাকি! আছে। ভেতরে উঠোন, তার পাশে বারান্দায় খাবার জায়গা। তবু একটু নিরিবিলি। এঁটোকাঁটার ছড়াছড়ি আশেপাশে। তাহোক, তবু এই ভালো। বসবার কিছুক্ষণ পর, একজন এসে চাহিদা জেনে গেল। তারপরে খাবার।

রাস্তায় বেরিয়ে, সেই মুহূর্তেই ঘরে যেতে ইচ্ছা করল না। যার নাম, রাজগীর আধুনিক শহর, বেচাকেনার লেনদেন, বাজার দোকান পশরা, সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। নতুন কিছু না, ছকে বাঁধা চেহারা। টাঙা রিকশা লরী কিছু প্রাইভেট গাড়ির আনাগোনা। রাস্তায় অশ্ব-বিষ্ঠা, এবং খাবার দোকান সম্পর্কে উৎসাহী কিছু কুকুর। ভ্রমণকারীদের তো কথাই নেই। তাদের দেখলেই চেনা যায়। এ রকম কোনো জায়গায় বেড়াতে বেরোলেই, কাঁধে একটা ক্যামেরা, মাথায় একটা টুপি, চোখে কালো ঠুলি। যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ ঘরে কেউ যেতে চায় না।

দু'পাশে দোকান। খাবারের দোকান বোধ হয় বেশি। বাকী আর সবই, কলকাতা থেকে বম্বে, যে কোনো জায়গার একটা আধাখ্যাঁচড়া শহরের মতো, এই শহরেরও চেহারা। হেকিম ডাক্তার কবিরাজ থেকে, কিতাবমহল পর্যন্ত সবই আছে। আয়না লাগানো পান-সিগারেটের দোকান আর তারস্বরে রেডিওর চিৎকার, এখানে ওখানে স্থানীয় মানুষের জটলা। কাজের কথা বা বাদানুবাদ বা হাসাহাসি, সকলেই মোটামুটি মুখর।

তিন রাস্তার মোড়ে, বিহারী পুলিস হাত দেখাচ্ছে। বাঁদিকের রাস্তায়, বিহার কুটির শিল্প, খাদি আর সরকারী এম্পোরিয়াম-এর সাইনবোর্ড। সেদিকে না গিয়ে, সোজা গেলাম। বড় বড় দোকান চোখে পড়ল। লরী আর ট্রাক খালি করে মাল নামাচ্ছে কুলিরা। তারপর স্থানীয় অধিবাসীদের আস্তানা। ডানদিকের রাস্তাটা ডাক দিল। ওদিকে রেললাইন রয়েছে। শহর সেখানেই শেষ। দূরের আকাশে, পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি, রেললাইনের ধারে, এক মস্ত বস্তি। বস্তির ঘরগুলো সবই পাতা দিয়ে তৈরি। বোধ হয় এগুলোকে ঝোপড়ি বলে। এক পাশে, একটি কালো যুবতী এদেশী একটা বড় কলসী কোলে নিয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে আরো কিছু নর-নারী। বলিষ্ঠ তাদের চেহারা। মনে হয় কালো মাটি দিয়ে তাদের শরীর গড়া। তাদের হাত পা নড়ায় ধুলো উড়ছে, তাদের গা থেকে ধুলো ঝরছে। দুটি শিশু তাদের কোলের কাছে ধুলোয় পড়ে ঘুমোচ্ছে। তাদের সকলের হাতে বা হাতের কাছে একটি করে মৃৎপাত্র। কালো যুবতী তাতে কী ঢেলে দিচ্ছে। তারা

খাচ্ছে, আর নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে।

এমন কিছু অচেনা ছবি না। ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গাতেই বোধ হয়, এ দৃশ্য দেখা যায়। রসবতী শুণ্ডিনী। জনে জনে রস দেয়, মূল্য আদায় করে, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিঠে মুখের হাসি, কালো চোখের ঝিলিক। যাও, যা পেলে তা নিয়ে চলে যাও। দোকান দোকানীর ব্যাপার না। বস্তিতে, আজ কেউ রস তৈরি করেছে কী না, আগে তার খোঁজ। তারপরে সবাই পাত্র নিয়ে তার কাছে হাজির। ব্যাপার বেসরকারী, গ্রামীন, পুরনো কালের মতো।

রসখোরেরাই যে কেবল গুচ্ছ হয়ে বসে আছে, তা না। রস যারা খাচ্ছে না, তারাও অনেকে গুচ্ছ হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। কোথাও কাঠের উনুন জ্বলছে, হাঁড়িতে কিছু ফুটছে। কোথাও কেউ শুয়ে, কেউ বা ব্যস্ত হয়ে চলা-ফেরা করছে। নিচু নিচু ঘর, ছোট ছোট ফাঁক, দরজা যাকে বলে। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ভিতরে সংসার নিয়ে, কোনো কোনো মেয়ে-পুরুষ ব্যস্ত। কোনো মা বুকটা হাট করে খুলে, কোলের ছেলের মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে বসে আছে। কিংবা দেখ, অর্ধনগ্ন যুবক যুবতী, কিসের ধ্যানে যেন দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। কোলের কাছে আদরিণী মার্জারি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

এদেরই কাউকে বোধ হয় তখন, কাঠ-কুটা কুড়িয়ে আনতে দেখেছিলাম। এরা কারা, কবেকার মানুষ, কত কাল ধরে আছে এখানে? দেখলে মনে হয়, আদিমতা তাদের সর্বাঙ্গে ছাপ দিয়ে রেখেছে। নীল পাহাড়, সবুজ জঙ্গল আর রক্তিম পাথর মাটির সঙ্গে, যদি বা তাদের মেলানো যায়, রাজগীরের এই ছোট শহরের সঙ্গে, কোথাও তাদের মিল নেই। মনে হয়, এরা যেন সেই রাজগৃহের আমল থেকে, এমনি করে এখানে রয়েছে।

বস্তির মধ্যে, এক জায়গায় দেখি, দুই নরনারী ব্যস্ত। গুটিকয় কুকুর আর ল্যাংটা শিশু তাদের ঘিরে। সামনে গিয়ে দেখি, রামচন্দ্র! একরাশ গণেশের বাহনের ছাল ছাড়ানো। নাড়িভুঁড়িগুলো দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, কুকুরেরা তাই নিয়ে টানাটানি করছে। ছাল ছাড়ানো ইঁদুর তুলে, যুবতী বধূ টুকরো টুকরো করে কাটছে। না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'কী হবে এ দিয়ে?'

কেউ কোনো জবাবই করলে না। একবার তাকিয়ে দেখল, মুখের কোনো ভাবান্তর হল না। যেন অন্য যুগে, অন্য সময়ে তারা বেঁচে আছে, আমাদের দেখতে পায় না, কথা শুনতে পায় না। ভেবেছিলাম, জবাব সত্যি পাব না। একটু দুর্গন্ধ লাগছিল। নাকে রুমাল চাপতে লজ্জা করল। কার কোথায় লাগে, কিছুই বলা যায় না। প্রায় দু' মিনিট পরে, মেয়েটি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল, 'খায়েগা।'

ইঁদুর খাবে! সেটা অনুমানেই বুঝতে পারছিলাম, তা না হলে, এত তরিবৎ করে কেউ ইঁদুরের মাংস টুকরো টুকরো করে কাটে না। বেশ বড়, ধাড়ি ইঁদুর, ছালের রং মেটে। কোন্ স্বাদে যে কাদের নোলায় জল আসে, কেউ বলতে পারে না। এদের চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই উপাদেয় মাংসের জন্য সকলেই উন্মুখ হয়ে আছে। বনবিড়ালের মাংসের জন্য, শিকারীদের দেখেছি। একমাত্র কুকুর-ভুক দেখিনি। আর মোটামুটি সবই দেখেছি, এমন কি কাক-ভুক। আসলে মানুষে কী না খায়। লোকে যে বলে, পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়, সেটা নিতান্তই পাগল আর ছাগল সম্পর্কে, মানুষের নিষ্ঠুর উক্তি। বরং বলা উচিত, মানুষে কী না খায়। মানুষের থেকে বিচিত্র কিছু নেই।

বোধ হয় আমার মতো কেউ, এই ইঁদুর-ভুক বস্তিতে আসে না। তাই, আসা পর্যন্ত সবাই আমাকে দেখছিল। মুখের ভাব নিরাসক্ত থাকলেও, তাদের কালো

চোখে, কৌতূহলের জিজ্ঞাসা দেখেছি। জিজ্ঞাসা একটাই, এমন মানুষ এখানে কেন?

সেই জন্যেই আসা। যেখানে কেউ আসে না, অথচ সবকিছুর মধ্যে, একটা বিচ্ছিন্ন জায়গা, বিচ্ছিন্ন মানুষের দল রয়েছে, সেখানে হাতছানি পাই আগে। কেন না, কেবলই মনে হয়, এই রাজগৃহে, আমার ডাক যেখান থেকে, সেখানকার সঙ্গে যাদের যোগসূত্র, তাদের যেন খুঁজে পাই। বস্তিটা ঘুরে ফেরবার মুখে, একজনকে দেখলাম, কাঁধে ঝোলানো গো-সাপ। সাপটার চেরা জিভ থেকে থেকে লকলকিয়ে উঠছে। এটাও খাদ্য কী না কে জানে। রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগলাম।

'হেই!'

প্রায় চমকে উঠেছিলাম। কেউ যেন কানের কাছে মুখ এনে ডাকল। যেন কোনো নারী, কৌতুকের সুরে, কানের কাছে ডেকে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সাদা দাঁতে হাসির ঝিলিক। চোখের কালো তারায় কৌতুকের বিজলী হানা, দৃষ্টি নিবিড়। যেন আমাকে চমকে দিয়ে, একটু মজা দেখছে। মনে হচ্ছে, একটা উদ্গত হাসি, এখনো তার গলার কাছে ঠেক খেয়ে আছে। খিলখিল শব্দে ফেটে পড়বে।

বস্তি থেকে এলাম। তাই ভেবেছিলাম, ওখানকার কেউ হবে। কিন্তু তা না। রাজগীরের লাল মাটির মতো এর গায়ের রং। শরীরের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে, বুকের কাছে ঝনঝনায়। এ শরীর কী গেরুয়া রঙের পাথর কেটে তৈরি! সামান্য একটা লাল কাপড়ের জামা, কেবল কোনো রকমে বুকটা ঢেকেছে। পেটের সমস্ত অংশই খোলা। চওড়া কাঁধের কাছে, জামা খানিকটা ছেঁড়া। বিবর্ণ পুরনো একটা শাড়ি, যার আসল রঙ কী ছিল বোঝা যায় না, তার গায়ে জড়ানো। দেশ রীতির কোনো ভঙ্গি নেই। কোনো রকমে, কোমরে জড়িয়ে, বুকের ওপর দিয়ে তুলে দিয়েছে। তবে আঁচলটা রয়েছে, বাঁ কাঁধে। নাভির নিচে তার কাপড়ের বন্ধনী।

এ কে! কোথা থেকে এল, আর এমন করে আমাকে ডাকল। মাঝারি লম্বা, ক্ষীণ কটি, বিশাল নয়, কিন্তু সুনিতম্বিনী। ছোট সংক্ষিপ্ত কাপড়ের ওপরে জেগে উঠেছে তার বলিষ্ঠ ঊরু আর জংঘা। নাভিদেশ মসৃণ। তার রক্তিম পাথরের শরীরে যেন ধুলো লেগেছে। রুক্ষু চুলের রং পিঙ্গল, সিঁথি আছে কী না, বোঝা যায় না, পিছনে এলো করে গুটিয়ে বাঁধা। কিন্তু মুখে তার দাগ। কপালে, আর গালের কাছে, ছাপকা ছাপকা দাগ, যেন পাথরে শ্যাওলা লেগেছে। সেই দাগ, তার মুখে এনে দিয়েছে, কেমন একটা দূরকালের ছায়া। কৌতুক হানা চোখের দিকে চেয়ে মনে হয়, কোথায় একটা বহু দূরের দিগন্ত সেখানে জেগে আছে।

কে এই মেয়ে? হাতে পায়ে, কোথাও তার একফোঁটা অলঙ্কার নেই। কেবল নাকে একটা রুপোর নাকছাবি। হাতে কয়েকটা কাঁচের চুড়ি। আর কিছু নেই। যৌবন তার শরীরে, চকিতে চকিতে যেন, নানারূপে ঝিলিক দিচ্ছে। টলটলিয়ে উঠছে। ঢেউয়ের মতো উঠছে, ভাঙছে না, দুলছে ফণার মতো।

আমি আবার ভালো করে তার দিকে তাকালাম। আমার গায়ের মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। তার রক্তিম স্তনান্তরের মাঝখানে যেন কাঁপছে। কোমর সে একটু পিছনে টেনে রেখেছে, ঊরু সামনের দিকে। হঠাৎ মনে হল, হাজার হাজার বছরের, একটা দিনের বুক থেকে, সে উঠে এসেছে। হাজার হাজার বছর আগের ধুলো তার গায়ে, মুখে দাগ পড়ে গিয়েছে বহু বছরের সময়ের। আমি তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে, নিজের পথে হাঁটতে লাগলাম। নিশ্চয়ই আমাকে ডাকে নি। আমি একে চিনি না।

কয়েক পা যেতেই, আমি পিছনে পায়ের শব্দ পেলাম। কিছু দূরেই, রাস্তার

ওপর কুলি-কামিনরা কাজ করছে। লোকজন চলাফেরা করছে। বর্মী বৌদ্ধ মন্দিরের টিলার কাছাকাছি এসে পড়েছি আমি। শুনতে পেলাম, 'হেই!'

মনে হল, কোনো এক দূর থেকে যেন, এক রহস্য-জড়ানো সরু গলায় কে ডেকে উঠল। আমি ফিরে তাকালাম। দেখি, সে একেবারে আমার পিছনে, প্রায় আমার কাছে। তার দিকে তাকাতে গিয়ে, আবার আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। ভয়ে কেঁপে উঠল কি না জানি না। একটা শিহরণ লাগা ভয়ের মতো অনুভূতি। আমি দেখছি, তার বুক, গলার কাছে, আর নাভিদেশ যেন কাঁপছে। তার কালো চোখের তারা, আমার অবাক হতবুদ্ধি চোখের তারায় বেঁধা। সে হাসছে, আমি বুঝতে পারছি। কটিদেশে একটা বাঁক নিয়ে, কোনো এক প্রাচীন মূর্তির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রৌদ্র তার উরুর শাড়ির ভাঁজে, নিম্ন শরীরের বলিষ্ঠতা স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী চাই?'

সে ফিক্ করে হাসল, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল, বলল, তার নিজের ভাষায়, 'তুমি কি আমাকে পয়সা দেবে?'

আশ্চর্য ব্যাপার! এ কি ভিক্ষে চাওয়ার ধরন নাকি? ইতিমধ্যেই তো কয়েকজন ভিখারি দেখেছি এখানে, এদেশেরই লোক তারা। কিন্তু এ রকম ভিক্ষে চাওয়ার ধরন তো তাদের না। এমন ভিখারিণীও তো দেখি নি। এ কি ভিখারিণী? ওর কোনো কিছুতেই তো তা মনে হয় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'দাও না।'

যেন সে আমার পরিচিত। যেন নতুন কিছু ঘটছে না। একে ভিক্ষে চাওয়া বলে না। তার পয়সার দরকার হয়েছে, সে আমার কাছে পয়সা চাইতে এসেছে। কিন্তু তার গলার স্বরটা আমার কাছে এমন অলৌকিক লাগছে কেন? তার গলার স্বর বাজছে যেন, অন্য যুগ থেকে, বহুকালের ওপার থেকে। এমনি একটা সুর মাখানো, একটা নিশ্বাসের বাতাস ভরা, নিচু আর দূর থেকে ভেসে আসার মতো।

আমি তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবার দেখলাম, 'কেন, কী করবে পয়সা দিয়ে?'

সে খাওয়ার ভঙ্গি করে দেখিয়ে দিল, 'রুটি খাব।'

বলেই সে আবার ফিক্ করে হাসল। আমি যেন ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না। এ কি কোনো মায়াবিনী নাকি! এ রক্তমাংসের মানবী তো! ছায়ার জগতের কেউ না তো! যেন সেই ভয়েই আমি, পাথুরে মাটির দিকে চেয়ে দেখলাম, তার ছায়া পড়েছে কি না। ছায়া পড়েছে।

সে আমার দিকে আর এক পা এগিয়ে এল, হাত বাড়িয়ে দিল। হাত পাতল। আমি তার দিকে চাইতে গিয়ে, আমার বুকের মধ্যে, তেমনি ঝনঝনিয়ে উঠল। মনে হল, আমার মস্তিষ্কের সীমার মধ্যে, কেমন একটা ঝাপসা গোলকধাঁধায়, এই মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি আর ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছি না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। আমি জানি না, ও কে, ভালো না মন্দ, কী ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু একটা ভিখারিণী মাত্র, এ কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। ও পাগল কী না, তাও আমি বুঝতে পারছি না। কথাবার্তার মধ্যে কোনো পাগলামির লক্ষণ দেখছি না।

পকেট থেকে কিছু পয়সা নিয়ে, ওর প্রসারিত হাতের ওপর ফেলে দিলাম। এমন ভাবে দিলাম, যাতে স্পর্শ না করতে হয়। মেয়েটি কিন্তু পয়সার দিকে তাকিয়ে দেখল না। আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওর দাঁত এত শাদা কেন? ওর ঠোঁট নড়ছে, যেন কিছু বলবে।

আমি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরলাম। ভাবলাম, নিশ্চয়ই খিলখিল হাসিতে ফেটে

পড়বে। কিন্তু তার বদলে আমি শুনতে পেলাম, 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

আশ্চর্য, এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে কী। ও কে, কী-ই বা চায়। আমি কথার কোনো জবাব দিলাম না। ফিরে তাকালাম না। মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এখানটা ঠিক রাস্তা না, খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আমার ঘরের নিচেই, পাহাড়ের ঢালুতে গাছপালায় নিবিড় ছায়া আমি দেখতে পাচ্ছি।

আবার শুনতে পেলাম, 'হেই, মানুষ!'

এখন টিলার ওপরে উঠতে যাচ্ছি আমি। মনে হল, কানের কাছেই কেউ এভাবে ডেকে উঠল, 'হেই আদমি।' আমি তথাপি জবাব দিলাম না, টিলার ওপর উঠতে লাগলাম। আবার শুনতে পেলাম, 'এই লোক, শোন।'

পিছনে তার পায়ের শব্দ। মন্দিরের গেটটা আর বেশি দূরে না। আমি ওর দিকে আর ফিরে দেখতে চাই না। আমার যেন মনে হচ্ছে, মাটি আর দুপুরের রোদে ঘাস লতাপাতা থেকে যে রকম গন্ধ বেরোয়, সে রকম একটা গন্ধ পাচ্ছি। এ গন্ধ কি মেয়েটার গা থেকে বেরোচ্ছে? এ কি কোনো দুষ্ট রমণী, নাকি প্রকৃতই উন্মাদিনী? দুষ্ট বলতে আমি কূট সন্দেহে, ব্যভিচারের কথা ভাবছি।

আমি দরজার কাছে আসতেই, আমি যেন গায়ে স্পর্শ পেলাম। শুনতে পেলাম, 'মানুষটা, আমার কথা শোন।'

আমি চকিতে ফিরে তাকালাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই বেচন এসে পড়ল। মেয়েটি আমার চোখের দিকে তাকাল। ওর কালো চোখের তারায় সেই সকৌতুক হাসির ঝিলিক, অথচ যেন অনেক দূরের ছায়া দেখা যায়। বেচন এসেই ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'এই কা চাই?'

মেয়েটি একটু সরে দাঁড়াল, হাসল। বেচন আমার দিকে একবার তাকিয়ে, হঠাৎ মেয়েটাকে প্রায় তাড়া করে গেল, 'আবার হাসছে? ভাগ জল্দি।'

মেয়েটা দুরদুর করে টিলা থেকে নেমে, দৌড়ে চলে গেল। ডানদিকে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞস করলাম, 'ওকে চেন নাকি?'

বেচন অবাক হয়ে বলল, 'না তো। আপনার কাছে কী চাইছিল?'

'পয়সা।'

'আমি সেটাই ভেবেছি। ওকে একদম ঘেঁষতে দেবেন না।'

কথাটা অনেকটা নির্দেশের মতো শোনাল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কি ভিখিরি?'

বেচন বলল, 'ভিখিরি এ রকম হয় না।'

'তবে ও কে?'

'কী জানি। কোথা থেকে এসেছে কে জানে।'

বেচনের মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল। সে দূরের দিকে তাকাল। তারপরে যেন খানিকটা নিজের মনেই বলল, 'এরা কে, তা ভগবানও জানে না। এরা কোথা থেকে আসে, তাও কেউ বলতে পারে না। এদের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া উচিত না।'

আমি দেখছি, আমার থেকে বেচন বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আমার মনের মধ্যে কার জিজ্ঞাসা কৌতূহল আর রহস্যের অনুভূতি, তা তার গলায় বাজছে। বললাম, 'ওকে তো এ দেশী মেয়ে বলেই মনে হল।'

বেচন বলল, 'হ্যাঁ, এদিকেই কোথাও হয়তো থাকে। কোনো গ্রাম থেকে কাজ করতে এসেছে হয়তো।'

'কী কাজ করে এরা?'

'কামিনের কাজ, মোকান বা সড়ক বানাবার কাজে আসতে পারে।'

'তবে ভিক্ষে করছে কেন?'

'সেই জন্যই তো আপনাকে বলছি, এদের একদম বিশ্বাস করবেন না।'

'তোমার কি মনে হয়, এ খারাপ মেয়ে?'

বেচন হঠাৎ কোন জবাব দিল না। একটু পরে বলল, 'তা কি করে বলব বাবু। ওকে হাসতে দেখে আমার রাগ হয়েছিল। কিন্তু আমি এখন খারাপ বলব, পরে যদি আমার শাপ লাগে!'

'শাপ লাগবে?'

'লাগতে পারে। অনেক সময় এ রকম দেখা যায়, হয়তো মেয়েটাকে কোনো দেবতায় পেয়েছে। বা হয়তো অপদেবতাই। এখন হয়তো সেই ঝোঁকেই চলেছে, ওকে ভর করে আছে। কিন্তু খারাপ বলতে পারি না।'

আমি অবাক হয়ে বেচনের দিকে চেয়ে রইলাম। তার চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি, সে মিথ্যা কথা বলছে না। গভীর বিশ্বাস থেকেই বলছে। তার কথা যেন আমাকেও ভাবিয়ে দিল। দেবতা কী, অপদেবতা কী, জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করি নি। যদি কিছু দেখে থাকি তবে মানুষের মধ্যেই উভয় লীলা দেখেছি। কিন্তু আমাকে এ কি কথা শোনায়! এখন আমারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, মেয়েটার মধ্যে কিছু ভর করেছে। সেই ঝোঁকেই চলেছে। সেটা দেবতা বা অপদবতা, আমি বুঝি না।

তবে মেয়েটাকে দেখে, এ কথা কেন মনে হচ্ছিল, ও যেন হাজার হাজার বছর আগের কোনো এক যুগ থেকে উঠে এসেছে। আমার চোখের সামনে, রাজগৃহ-গিরিব্রজ নগরীর এক উৎসবমত্ত দিনের ছবি ভেসে উঠছে। 'সমাজ' হচ্ছে। সেই যুগে, রাজগৃহের মানুষেরা, উৎসবকে সমাজ বলত। সেই সমাজের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। শুণ্ডিনীরা মৌরীয় মাধ্বি পরিবেশন করছে। বড় বড় বিশাল ভোজনালয়ে সুপ্রচুর উপাদেয় মাংস। নগরের, নানা দিগন্তে নৃত্য-গীত চলেছে। কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার, সোহাগ আলিঙ্গন প্রেমকুহর। তার মধ্যে, একজন, এক যুবতী তার পুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'হেই আদমি, আদমি!' হাজার হাজার বছরের সেই উৎসবমত্ত দিন থেকে, আজ সহসা উঠে এসেছে। তার মুখের ওপর বহু কালের দাগ, শরীরে ধুলো, পোশাক বিবর্ণ হতে হতে, এখন রঙ রূপ কিছুই বোঝা যায় না। আমার গায়ের মধ্যে, শিরদাঁড়ার কাছে, আবার একটা অনুভূতি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। এ আন্ ভাবনা থাক। কাজের ভাবনা ভালো। এসেছি গিরিব্রজ রাজগৃহে। সেই একজনের পায়ের চিহ্ন খুঁজে খজে বেড়াব, যিনি মহানির্বাণের পথ ধরে রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে এসেছিলেন এখানে। সন্ন্যাসের পরে, প্রথম যেখানে ঠাঁই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এসে, ঘরের কড়ার তালায়, চাবি লাগাবার আগেই দেখি, আমার ডানদিকের ঘরে মানুষ এসেছে। এসেছে বা আগে থেকেই ছিল। ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে। লাল্চে ফর্সা রঙ, খালি গা বিশাল চেহারা, নরুণ-চেরা চোখ, মাথা মুড়নো, দুটি পুরুষ। দুজনের পরনে কেবল, ডোরাকাটা দুটো ছোট ছোট ইজেরের মতো। বড় বড় পাত্রে, কিছু চুমুক দিয়ে খাচ্ছে পাত্র থেকে ধোঁয়া উঠছে।

জানি না, কোন্ দেশের লোক। সন্দেহ হল তিব্বতী। নিশ্চয়ই বৌদ্ধ, কারণ তাদের গলায় ঝোলানো সোনার চেনের সঙ্গে, ছোট বুদ্ধমূর্তি ঝুলছে। দুজনের চওড়া মনিবন্ধে, সোনার ব্যাণ্ড লাগানো দামী ঘড়ি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, দুজনেই রক্তিম মাড়ি আর গুটিকয়েক করে সোনার দাঁত দেখিয়ে, অবলীলাক্রমে হাসল। কী যেন বলল।

অতএব আমাকেও হাসতে হল, ঘাড় নেড়ে ইংরেজিতে বলতে হল, 'হাউ ডু য়ু ডু।'

'ভেরি গুড। য়ু আর ইন দিস রুম?'

'ইয়েস। য়ু আর ফ্রম টিবেট?'

'ইয়েস ইয়েস।'

এমন ভাবে হেসে ঘাড় নাড়তে লাগল, যেন কী মজার ব্যাপার ঘটেছে। মনে হল এক ধরনের পাগলাটে ভালো মানুষ। এ ঘটনা অবিশ্যি, চীন আর তিব্বতের রাজনৈতিক গোলযোগের আগে। তখনো ভারতবর্ষে, বাস্তুত্যাগী তিব্বতীরা আসেনি।

কথা হতে হতেই, আর একটি মুখ উঁকি দিল। পুরো মেমসাহেব। উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। তিব্বতী পোশাকের বদলে, তার গায়ে রঙীন সিল্কের কলার ব্লাউজ আর জ্যাকেট। ঠোঁটে রঙ। ভুরু আর চোখও বোধ হয় কাজল-আঁকা। চোখ দুটি সুন্দর, নিতান্ত নরুণ-চেরা না। হাসিটি মিষ্টি, পুতুলের মতো। চুল ঘাড় অবধি, নরম আর ফোলানো। সব মিলিয়ে আধুনিকার লক্ষণ। সে-ও আমার দিকে চেয়ে অনায়াসে হাসল, বলল, 'হ্যালো।'

'হ্যালো।'

ঘাড় নেড়ে, হেসে তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। আর ভাবলাম, আমার গায়ে এখনো একটা উলেন সোয়েটার। এদের কি শীত বলে কিছু নেই হে! মাঘ মাসে, ছোট ছোট দুটো জাঙিয়ার মতো আন্ডার-অয়্যার পরে বসে আছে। তবে হ্যাঁ, বরফের দেশের লোক। ভারতবর্ষের মাঘের শীত বাঘের থাবা না, পায়রার পালক মাত্র।

দরজাটা খোলা। পোশাক ছাড়ব কী না বুঝতে পারছি না। কতক্ষণই বা বিশ্রাম করব। মন আমার ঘরে না, রাজগৃহ নগরে, হাজার বছর ওপারে। এমন কিছু ক্লান্তও মনে হচ্ছে না। এই সময়ে তিব্বতীবালা তাদের ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। পিছন ফিরে ঘরের লোকদের যেন কী বলল। এগিয়ে গিয়ে, খোলা ছাদের আল্‌সে থেকে, কাকে যেন ডাকল।

ডেকে, আবার ঘরে ঢোকবার আগে, আমার ঘরের দিকে তাকাল। থমকে দাঁড়িয়ে আমার টেবিলের দিকে দেখল· অনুমতির অপেক্ষা নেই, সোজা ঘরে এসে ঢুকল, আর টেবিলে ফিল্ম ফ্যাশন আর অন্যান্য নিউজ ম্যাগাজিনের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'তুমি এখন কোন্‌টা পড়বে?'

বললাম, 'কোনোটাই না।'

'কোনোটাই না?'

'না। তুমি পড়বে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সবগুলোই নিয়ে যেতে পারো।'

'সবগুলো?'

তার চোখ দুটো চকচক করছে। বললাম 'হ্যাঁ, ওগুলো আমার আর দরকার নেই। সব পড়া হয়ে গেছে।' তবু দ্বিধা করছে দেখে নিজের হাতে নিয়ে, সবগুলো ওর হাতে তুলে দিলাম। তিব্বতীরা সরল কি না জানি না। মেয়েটির সারল্য আর অনায়াস আচরণ আমার ভালো লাগছে।

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বইগুলো দেখল। খুশিতে ভরে উঠেছে ওর মুখ। ইংরেজি ভালো বলতে পারে না, মোটামুটি জানে, কথা শুনে বোঝা গেল, বলল, 'আমি সেওয়াং-সেওয়াং গোমো·'

আমি আমার নাম বললাম। খুশি হয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে চুল উড়িয়ে দু' হাত দিয়ে বুক ভরে কাগজগুলো নিয়ে চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

বিম্বিসার তাঁর কক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। অনুচর ফিরে এল। বলল, 'সেই সন্ন্যাসী নগরের বাইরে চলে গেলেন।'

'কোথায় গেলেন? নগরের কোন্ দ্বার দিয়ে তিনি গেলেন?'

'উত্তর দ্বার দিয়ে।'

বিম্বিসারের চোখে-মুখে আবার হতাশার ছায়া নেমে এল। সেই মুখ তাঁর বারে বারে মনে পড়তে লাগল।

ঘটনা মনে হতেই, আমার গায়ের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ বহে গেল। আমিও যেন দেখতে পাচ্ছি, ব্যস্ত নগরীর মধ্য দিয়ে একজন সন্ন্যাসী রাজগৃহের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। অনুপ্রিয় থেকে রাজগীর। রাজগীরে কয়েকদিন থেকে, সেখান থেকে বৈশালীতে আলাড় কালামের কাছে যান শিক্ষা নিতে। তারপরে আবার ফিরে এসেছিলেন রাজগৃহে। রাজগৃহে উদ্রক ছিলেন। তাঁর কাছেও শিক্ষা নেন। সেই সময়ে আবার বিম্বিসার তাঁকে দেখতে পান। আবার অনুচরেরা সেই সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করতে থাকে। ফিরে এসে তারা জানাল, 'সন্ন্যাসী পান্ডব পাহাড়ের গুহায় আছেন।' বিম্বিসার অপেক্ষা না করে, সেই অনুচর কয়েকজনকে নিয়েই পান্ডব পাহাড়ের গুহায় এসে উঠলেন। নত নমস্কারে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন।'

স্বয়ং রাজা বিম্বিসার। একটু চিন্তা করে, সন্ন্যাসী বললেন, 'বংশগত নাম ছাড়া আমার এখনো কোনো নাম নেই। আমি সন্ন্যাস নিয়েছি, এখনো সত্য লাভ হয়নি। বংশ-পরিচয় জেনেও আপনি এখন কাউকে কিছু বলবেন না।'

সন্ন্যাসী পরিচয় দিলেন, কপিলাবস্তু শাক্যবংশীয় প্রধানের সন্তান তিনি, নাম তাঁর গৌতম। বিম্বিসার বুঝলেন, এমন দীর্ঘদেহ শ্রীমণ্ডিত চেহারা সন্ন্যাসী কোথা থেকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে, বোধিলাভের আকাঙ্খা আর এক রূপ দান করেছে এই মুখে।

বিম্বিসার বললেন, 'আমাকে একটি অনুগ্রহ করতে হবে।'

'অনুগ্রহ করতে জানি না মহারাজ। কী করতে হবে বলুন'

'তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর, আপনি রাজগৃহে এসে থাকবেন।'

গৌতম বললেন, 'দুজনের ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়।'

সন্ন্যাসী সেখান থেকে গিয়েছিলেন উরুবেলে। কৃচ্ছ্রসাধন করতে গিয়ে, প্রায় মৃত্যুর কবলে চলে গিয়েছিলেন। তাই কৃচ্ছ্র ত্যাগ করেন। সত্য লাভ হয় নি, বোধি লাভ করেছিলেন। সেখান থেকে ধর্মপ্রচারে কাশীর ঋষিপত্তন মৃগোদ্যানে যান, নিজের ধর্মপ্রচারের জন্য। অবৈদিক, অব্রহ্মণ্য ধর্ম। একদিকে বিরূপ সমালোচনার ঝড়, ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষ আর বিদ্রূপ। অন্যদিকে, সমস্ত জাতির থেকেই, কেউ কেউ সেই বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের বাণীতে মুক্তির সন্ধান পাচ্ছিল। এমন কি উরুবেলের কাশ্যপ গোত্রীয়, জটিল আর জটাধারী সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময়ে রাজগৃহের কথা বুদ্ধের মনে পড়ল। বিম্বিসারের মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। তিনি জানেন, বৈভারগিরি পাহাড়ে, মহাবীরের কাছেও বিম্বিসার যাতায়াত করেন। বিম্বিসারের মনের মধ্যে, জানবার আকাঙ্ক্ষা। তিনি রাজগৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু নগরে না, নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, তিন ক্রোশ দূরে। লট্‌ঠিবনে, বিম্বিসারেরই একটি ছায়াশীতল তালবনে।

সংবাদ পাওয়া মাত্র বিম্বিসার লট্‌ঠিবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কয়েকদিন পরেই, রাজগৃহের বহু অধিবাসী পুরঃসর, তাঁকে অভ্যর্থনা করে রাজগৃহে নিয়ে আসেন। নগরে না, সেখানে সংঘের কার্যকলাপ, ধ্যানের এবং আলোচনার সুবিধা নেই। নগরের বাইরে, যেখানে নিবিড় নির্জনতা, অথচ নগরের খুব সামনে, সেই বেণুবন

আরামে। সেখানে কলন্দক নিবাপের মতো মিষ্টি পবিত্র জলের পুষ্করিণী। ছায়ানিবিড় বাতাসে, পাখির কূজন। স্বর্ণভৃংগার থেকে বুদ্ধের হাতে জল ঢেলে দিয়ে বেণুবনে দান করেন। বিম্বিসার গৌতম দুজনেই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। বিম্বিসারকে বুদ্ধ শ্রেণীদ বলে ডাকতেন। বুদ্ধ কেবল বেণুবনেই থাকতেন না। গৃধ্রকূট পাহাড়ও তাঁর প্রিয় জায়গা ছিল। সেখানে গিয়ে গুহাগৃহে থাকতেন তিনি। সেখান থেকে বহু দূরের প্রকৃতি দেখা যেত। আর নগরের ছবিও ভেসে উঠত। তা ছাড়া সপ্তপর্ণী গুহা, শীতবন, নানা জায়গাতে গিয়েই বুদ্ধ থাকতেন। কিন্তু রাজগৃহ সীমার মধ্যেই।

তারপর ঘটনা-প্রবাহ। বুদ্ধের শিষ্যত্ব লাভের জন্য, সৎ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা এগিয়ে এলেন। সারিপুত্র আর মৌদ্‌গল্যায়ন নালন্দা থেকে এসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের এই সাফল্য সকলের ভালো লাগে নি। শিষ্য ভাঙাভাঙির খেলা শুরু হয়েছিল। মৌদ্‌গল্যায়নকে ঋষিগিরি পাহাড়ের গুহার কাছে, গুন্ডারা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল।

অনাথপিন্ডদ তো রাজগৃহে এসেছিলেন, ব্যবসা করতে আর বৈবাহিকের বাড়িতে। কিন্তু বুদ্ধের কথা শুনে, তাঁর শিষ্য না হয়ে পারেন নি। জীবন গণিকার সন্তান, কিন্তু গুণী চিকিৎসক, বুদ্ধের শিষ্য হয়েছিলেন। লোকে তাঁকে কুমারভৃত্য বলত। কেননা, রাজপুত্র অভয়ের ভৃত্য ছিলেন তিনি। অবন্তীরাজের চিকিৎসা করে যে মহার্ঘ বস্ত্রখন্ড পেয়েছিলেন, তাও বুদ্ধকেই দিয়েছিলেন। এমন কি তাঁর যে আম্রবন, জীবকাম্রবন, তাও।

রাজমহিষীদের মধ্যে, বিম্বিসার-পত্নী মদ্রকন্যা ক্ষেমাই বোধ হয় প্রথম ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। ভিক্ষুণী মত্রিকা আর শুভা, রাজগৃহের ব্রাহ্মণকন্যা। সারিপুত্রের বোনেরা, চালা, উপচালা, শিশুচালা, আর ভদ্রা কুন্ডলকেশী থেরী, ভদ্রমহিলারা ভিক্ষুণী হয়েছিলেন।

কিন্তু গোলমাল শুরু করেছিলেন দেবদত্ত। বুদ্ধ কোনোদিনই কোনো 'অতি'কে প্রশ্রয় দেন নি। দেবদত্ত তাঁরই জ্ঞাতিভ্রাতা এবং শিষ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতি। ফলে মতভেদ। আসলে, হৃদযন্ত্রের আর মস্তিষ্কের অন্য শিরায়, বিষের জ্বালা। ঈর্ষা। বুদ্ধের নেতৃত্ব, ক্রমে তাঁকে হিংস্র করে তুলছিল। অতএব, বিম্বিসারের প্রতিও দেবদত্ত প্রসন্ন ছিলেন না। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, ভাবী রাজাকে তিনি ক্রমে পিতার বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করতে লাগলেন। আর একদিকে বুদ্ধের সর্বনাশের ছিদ্র খুঁজতে লাগলেন।

বুদ্ধ একবার ভিক্ষায় বের হয়ে, হঠাৎ দেখেছিলেন ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত হাতী তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে। বুদ্ধ দেখলেন, মাতাল হাতীকে ছুটিয়ে দিয়েছে স্বয়ং অজাতশত্রু। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি, মত্ত হাতী সদয় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর একবার, গৃধ্রকূটের গুহা-চত্বরে বুদ্ধ পায়চারি করছিলেন। দেবদত্ত পাহাড়ের পাথর গড়িয়ে ফেলে, হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। সে পাথর, অন্য আর একটি পাথরে আটকে গিয়েছিল। এই রকমই এক সময়ে, অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করেছিল। বিম্বিসারের তখন শুধু একটি প্রার্থনা, 'যেখানেই থাকি, দিনান্তে তাঁকে যেন একবার দেখতে পাই।'

মন্থর গতিতে আমার টাঙা চলেছে। বিকালের ছায়া পড়েছে, কিন্তু পাহাড় চূড়ায় রোদ ঝলকানো। টাঙাওয়ালা আপন মনে কী সব বলে চলেছে। তার কথায় আমার কান নেই। আমার মন অন্যখানে। আমি যেন অনুভব করছি, রাজগৃহ নগরের মধ্যে দিয়ে আমি চলেছি। বিকালের নগর কোলাহলমুখর।

অথচ, চোখে তাকিয়ে, এখন যেন চিন্তা করা যায় না। রাস্তায় বিপুলগিরি পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। তারপরে রত্নগিরির ছায়া। ডানদিকে বৈভারগিরির চূড়া থেকে নিচে পর্যন্ত রোদ চিকচিক করছে। বেড়াবার মানুষেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ হেঁটে, কেউ বা আমার মতোই টাঙায়। তবে আমার মতো একলা বোধ হয় কেউ-ই নেই। সকলেই সদলবলে, সকলেই যেন ছুটির আনন্দে ছুটছে। ওদের গলায় নানা কলরব, নানা হাসি।

বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পায়ে হেঁটেই বেশি। অধিকাংশেরই মাথা থেকে পা অবধি গরম কাপড়ে সুরক্ষিত। আলোচনার বিষয়বস্তু কী? উষ্ণ প্রস্রবণের জলে কতটা উপকার পাওয়া গেল, অদ্যকার হজমের হার কতখানি। সম্ভবতঃ এসব কথাই হচ্ছে।

আমার বাঁদিকে, পুরনো জলের খাতের চিহ্ন। সম্ভবতঃ একদা ওখানে খাল ছিল। আর তার পাশেই ছিল খালের প্রাচীর। দক্ষিণগামী এই রাস্তার চারপাশে জঙ্গলময় গভীর বিস্তৃতি দেখলেই বোঝা যায়, নগর গড়ে উঠেছিল এই সমতলেই। একদা মাগধী রাজধানী, গিরিব্রজ রাজগৃহ, এখন জঙ্গলময় পর্বত। বিহার সরকারের সংরক্ষিত অরণ্য।

জীবনের এই কি খেলা। এই মুহূর্তে, নিজেকে ঘিরে কত চিন্তা, ভাবনা, কত মানুষের ছবি, কত সম্পর্কের লীলা, যেন মনে হয়, সকলই অনিবার্য, অতি গভীরভাবে আবর্তিত। আমি নেই, এ কথা অচিন্ত্যনীয়। আমাকে বাদ দিয়ে, কিছু ঘটবে, এ চিন্তা নিরন্তর কাজ করছে। আমার ঘর, আমার সংসার, আমার কাজ, আমার খানা বিকাশ, সব কিছুকে ঘিরে, এই জগৎ, এই মানবগোষ্ঠি, সকলের মধ্যে প্রতিটি পল অনুভূত। তারপরে, বহু বছর পরে, অন্য কোনো গ্রহে যাত্রার ইস্টিশন হবে হয়তো এইখানেই। যেখানে, রাজগৃহ-গিরিব্রজের হাজার বছরের কল্পনায়, আমি স্বপ্নাবেশে আছি।

এই জীবনের খেলা। বহুকালের সমৃদ্ধ নগর এখন জঙ্গল। কিছুমাত্র চিহ্ন পড়ে আছে। কে জানে, এই সব আশেপাশে জঙ্গলের মধ্যে, কোথায় কী লুকিয়ে আছে। এখনো এ যুগের মানুষের চোখের আড়ালে হয়তো অনেক কিছু রয়ে গিয়েছে।

টাঙাওয়ালা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'সোনভাণ্ডার যাবেন বাবু?'

বললাম, 'না, সোজা চল, বাণগঙ্গা দেখব।'

রাজগৃহ নগরের দক্ষিণ দরজার সীমা। গয়া যাবার রাস্তা, সেই দিকে।

শালবন ছাড়াও বেঁটে ঝাড়ালো সরু সরু বাঁশঝাড়ের বন প্রচুর। এ সবই কুড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম ওবেলা।

একটা জায়গায় এসে, রাস্তা বাঁদিকে চলে গিয়েছে। বললাম, 'এদিকে চল।'

টাঙাওয়ালা বলল, 'এদিকে গিজকুট পাহাড়।'

রাস্তাটা নির্জন হয়ে গেল। এখন এই বিকেলের দিকে, এখানে কারোর আসতে ইচ্ছে নেই। অধিকাংশই চলেছে, সোনভাণ্ডার দেখতে। কার সোনার ভাণ্ডার কে জানে। খানিকটা আসতেই, অরণ্য চোখে পড়ল। রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা পাহাড়ের কোলে। ডানদিকে খানিকটা জায়গা ঘেরা। ছোট একটি বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, বিম্বিসারকে অজাতশত্রু এখানে বন্দী করে রেখেছিলেন। এখান থেকে তিনি গৃধ্রকূটে বুদ্ধকে দর্শন করতেন।

আমি দেখে চুপ করে রইলাম। পূর্বদিকে গৃধ্রকূট পাহাড়। বুদ্ধের গুহা, আর গুহা-চত্বর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, পাহাড়ের ওই চত্বরে আকাশের পটে এসে দাঁড়ালেন এক মূর্তি। আজানুলম্বিত বাহু, সৌম্য, বুকের গেরুয়াখণ্ড খানিকটা সরে গিয়েছে, মুণ্ডিত মস্তকে আবরণ নেই।

তাঁর পিছনের আকাশে, বেলা-শেষের ছায়া। এই মাত্র উদিত, দুটি নক্ষত্রের মতো, তাঁর দুই চোখ চিকচিক করছে।

আর একজন সেইদিকে তাকিয়ে আছেন, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে, বিশাল বড় বড় কালো পাথরের উঁচু প্রাচীর তাঁকে ঘিরে আছে। এই সেই বিম্বার বীরপুত্র বিম্বিসার। চোখের কোলে কালি। মাথার চুলে শুভ্রতা, ক্ষৌর-সম্পর্কহীন শ্মশ্রুগুম্ফ মুখ, মলিন বেশ। চোখে বিগলিত ধারা। পুত্রের দ্বারা বন্দী।

নগর বেশি দূরে না, কাছেই। সেখান থেকে নানা কোলাহল ভেসে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। বিলাসীরা নগরের পথে বেরিয়ে পড়েছে। নাগররা উৎসুক উজ্জ্বল চোখে, নটিদের হর্ম্যের বাতায়নে দেখছে। সময় এখনো হল কী না, বুঝতে পারছে না। দাসীরা সংবাদ না দিলে অন্তঃপুরে যাওয়া যায় কেমন করে।

সাধু আর সন্ন্যাসীরা, জৈন নগ্নরা, বৌদ্ধ শ্রমণরা সকলেই ভিক্ষার পরে, যে যার বিহার বা সংঘে বা পাহাড়ের গুহায় ফিরে চলেছে। আর প্রাসাদে, কোশলা এখন কী করছেন? এই বন্দী স্বামীর দশা ভেবে কি তিনি কাঁদছেন? তাঁরই গর্ভস্থ সন্তান, অজাতশত্রু স্বামীকে বন্দী করেছে। প্রাসাদে, ব্রজে (দুর্গে) সর্বত্র এখন অজাতশত্রুর অনুচর। সৈন্যবাহিনী তার শৌর্যের কাছে নত হয়েছে। প্রাসাদের যত যুবতী নারী, অজাতশত্রুর পায়ের শব্দেই তাদের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আমি যেন শুনতে পেলাম, 'ভাই বন্ধু শ্রেণীক, জীবনের এই লগ্নে তোমাকে বোধিলাভের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হচ্ছে। বন্দীত্বের থেকে, তুমি একে তপস্যার চোখে দেখ। সেই হবে শ্রেয়ঃ।'

বিম্বিসার করজোড় বুকের কাছে রেখে, পাহাড়ের ওপরে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে বারে বারে বলছেন, 'শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও, হে বুদ্ধ।'...

আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করলাম, 'শক্তি দাও, শক্তি দাও।' তারপরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের পথে এগিয়ে চললাম।

টাঙাওয়ালা বলে উঠল, 'বাবু, এখন পাহাড়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

বললাম, 'এখনো রোদ রয়েছে, একবার ঘুরে আসি।'

পাহাড়ের পথে উঠতে লাগলাম। দেখলাম, পাহাড়ের ঢালুতে, এখনো গাভীরা বিচরণ করছে।

তারা বেশ ওপরে উঠে এসেছে। মনে ভাবি, এই কি সেই আদি পথ, যে পথ গৃধ্রকূটে বুদ্ধের আরোহণের জন্য বিম্বিসার তৈরি করে দিয়েছিলেন? সেই পথের ওপরেই কি, নতুন করে মেরামত হয়েছে?

তাড়াতাড়ি ওঠবার জন্য, শীতের বিকালেও ঘেমে উঠলাম। গুহা চত্বরে এসে, আগেই তাকিয়ে দেখলাম, বিম্বিসারের কারাগারের দিকে। আমার গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠল। সরে এসে, চারিদিকে তাকালাম। ইঁটের ভিত জেগে আছে, চত্বরের এখানে ওখানে। প্রাচীন ঘরের মেঝের চিহ্ন জেগে আছে যেন। একপাশে, একটি প্রাচীর, তার কোলে ভূর হয়ে জমে আছে প্রচুর ক্ষয়ধরা ইঁট।

এ সবই কি সেই যুগের? সেই সময়ের চিহ্ন হিসাবেই কি, এগুলো এখানে এখনো পড়ে আছে? এসব কি তাঁর স্পর্শধন্য? এখানে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছিল। শরীরের মধ্যে কেমন কুণ্ঠার অনুভূতি। নিজের পাদুকার দিকে চাইতে লজ্জা করে। এখানে পা ফেলে চলেছি। এখানে যে তাঁর পায়ের ধুলো রয়েছে। একটা জায়গায় চুপ করে একটু বসে থাকি। কী গন্ধ ছিল এখানে? কী ফুল ফুটত? কোন্ পাখিরা আসত? এ পাহাড়ের চেহারা কি গৃধ্রের মতো, তাই কি গৃধ্রকূট? কোথা থেকে দেবদত্ত পাথর গড়িয়ে ফেলেছিলেন? এই যে দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের গায়ে, হাতীর মতো

একটা বিশাল পাথর রয়েছে, ওটাই কি?

কেন জানি না, মনের মধ্যে, একটা বিচিত্র অনুভূতি হতে লাগল। কোনো শোক আমার মধ্যে নেই। তথাপি, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত টনটনানি। মনে হল, চোখ গলে জল আসবে। অথচ একটা আনন্দও যেন, কেমন টলটল করছে।

আমি হাত দিয়ে মাটিতে বোলাতে লাগলাম। তারপরে পাহাড়ের দিকে ফিরলাম। রৌদ্র চলে যায়। পাহাড়ের মাথায় এখন, সোনার টোপরের মতো রোদ ঝিকমিক করছে। হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে, নেমে আসবার আগে একবার গুহা সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে পার হলাম। তারপরে নেমে এলাম।

টাঙাওয়ালা বলল, 'ভয় করে বাবু। রাতে এখানে জানোয়ার বেরোয়।'

কিন্তু এখনো রাত হয় নি। সবে সন্ধ্যা নামছে। বললাম, 'চল বানগঙ্গা যাই।'

টাঙাওয়ালা এবার তার পশুটিকে একটু জোর কদমে ছোটাল।

প্রায় অন্ধকার সময়। বানগঙ্গার সেতুর কাছে, একটি মাত্র আলো। পাহাড়ের কোলে বাঁক নিয়ে, গয়ার রাস্তা চলে গিয়েছে। বাঁদিকে বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চল। ওদিকেই কোথাও লট্‌ঠিবন, এখানকার লোকে বলে জাঠবন। সেখানে ছিল তালবাগান। বুদ্ধ সেখানে এসে উঠেছিলেন। আর এই প্রান্ত হল নগরের দক্ষিণ দেউড়ি সীমা। কিন্তু নগর না, শহরতলি। নগরের প্রাচীর আরো আগে, বৈভারগিরির পাদদেশ দিয়ে, তপোদা নদীর পাশ ঘেঁষে দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে এসেছিল। রত্নগিরির কোণা ঘেঁষে যে খাল ছিল, দক্ষিণের দরজা সেখানেই। সেটা অন্তর্নগরের দরজা। আর এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বহির্নগরের দরজার কাছে।

রাস্তার একদিকে অতি সাধারণ তাঁবু। নিতান্ত একটা বাঁশের ওপর ত্রিপল ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কিছু লোকজনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। হ্যারিকেন জ্বলছে। উনুন ধরিয়ে রাত্রির রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে। বোধ হয় রাস্তা তৈরির শ্রমিকেরা।

এই সময়ে, এখন বহির্নগরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারোর বাইরে যাবার উপায় নেই, ভিতরে আসবার জন্যও দরজা খোলা না। শত্রু যে কোনো মুহূর্তেই আক্রমণ করতে পারে। আমার চোখের সামনে ভাসছে, উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে দ্বাররক্ষী অতন্দ্র। হয়তো, এমন নিয়মও ছিল, বহির্নগরের দরজা থেকে, অন্তর্নগরের দরজা পর্যন্ত, প্রহরীরা সারা রাত্রি পালা করে যাতায়াত করত। নিজেদের কথা বলত।...

'হেই!'

আমার গা-টা শিউরে উঠল— আমি মুখ না ফিরিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক শুনেছি কি? সেই স্বর, সেই বাতাসের গায়ে ভাসা সুরের মতো, নিচু সরু গলা। নাকি সেই স্বর এখনো আমার মস্তিষ্কের সীমার মধ্যে ধরা রয়েছে।

'হেই আদমি!'

আমার কানের খুব কাছেই স্বর বেজে উঠল। যেন একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে স্বর শোনা গেল। কিছুতেই এই স্বরকে, এই মুহূর্তের, এই সময়ের বাস্তব বলে মনে করতে পারছি না। হাজার হাজার বছর আগের, সেই 'সমাজ' রাত্রের উত্তাল আনন্দের কথা আমার মনে পড়ছে। আমি কোথায় পড়ে আছি, যেন কোনো এক বিদেশী বণিকের বন্ধুত্ব স্বীকার করে, কোনো নটীর গৃহে মাধবী সেবনে আত্মহারা। আর আমাকে কেউ ডেকে ফিরছে। নগরের পথে পথে, অন্ধকার যেখানে, উৎসবের বাতি যেখানে জ্বলে নি, নগর প্রাকার পরিখার ধারে ধারে, আমাকে কেউ খুঁজে ফিরছে।

আমি আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আমার বুকের মধ্যে ঝনঝনিয়ে উঠল, ঘাড়ের কাছে রোমরাজি খাড়া হয়ে উঠল। অত্যন্ত স্বল্পালোকে দেখলাম, রক্তিম পাথরের নারীমূর্তি, আলো অন্ধকারে অমানুষিক একটা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে তার হাজার বছরের ধুলো, মুখে দাগ। তার ঠোঁট ফাঁক, কয়েকটি ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, তার শরীর নায়িকা লক্ষণাক্রান্তা, নির্লোম, হয়তো একদা সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। শ্রীময়ী দীপ্তিময়ী, তার সংক্ষিপ্তবাস পীন-বক্ষের দিকে তাকিয়ে, আমার রক্তধারা ক্ষণে মূর্ছিত, ক্ষণে উত্তাল হয়ে উঠছে। তার চোখের কৌতুকে, হাসির বিজলী, আমার ভিতরের অন্ধকারকে চমকে চমকে দিচ্ছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি নিচু রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস্ করলাম, 'কে তুমি?'

তার ঘাড় কাত হল, দৃষ্টিতে একটা নিবিড়তা এল। সেই স্বরে উচ্চারিত হল, 'সোন্‌পাতিয়া।'

সোন্‌পাতিয়া! সোনার পাতা। অতি সরল নাম। কোনো রাণী বা শ্রমণীর মতো বিচিত্র কঠিন তার নামের উচ্চারণ না। সে সোনার পাতা। সোনার পাতা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। ঠোঁটের ফাঁকে, সাদা দাঁতে তার, কী এক অর্থপূর্ণ হাসি। চোখে ঠোঁটে চিবুকে, সবখানেই যেন একটা অর্থময়তা, অস্পষ্ট ভাবে ঝিকিমিকি করছে। নাম্ শুনেও আমি তৃপ্ত হলাম না, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

সে আমার চোখে চোখ রেখে, তেমনি স্বরে বলল, 'আমি গিরিয়াকের সোন্‌পাতিয়া।'

আবার আমার গায়ের মধ্যে শিউরে উঠল। গিরিয়াক, গিরিয়াকের মেয়ে সোন্‌পাতিয়া! রাজগৃহের কাছেই গিরিয়াক। মলমাসের উৎসবে যারা নগরে নাচ-গানের আসর বসিয়ে দিত। উৎসব শুরু হয় গিরিয়াক থেকে। 'গিরগ্‌গ সমাজ' তার নাম। সম্পূর্ণ অবৈদিক, অব্রহ্মণ্য উৎসব।

গিরিয়াকের সোন্‌পাতিয়া, রাজগৃহে ঘুরে মরছে কেন! 'আদমি আদমি' বলে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! এই পরিচয়েও আমি তৃপ্ত হতে পারলাম না। সে কে, কোন্ যুগ থেকে উঠে এসেছে? সে কি এই মুহূর্তে, আমার মতোই রক্তমাংসে জীবিত! সে যক্ষী না রক্ষী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ আমার রক্তধারা নাচছে। ফুলের গন্ধ আমার নাকে। সেই সঙ্গে মৌরীয় আর মাধ্বীর গন্ধ মিশে আছে। নানা বাদ্য বাজছে যেন আমার চারপাশে। পায়ের নূপুরে নাচের তাল। স্খলিত হাসি আর কথা। একদল সৈনিকের হল্লা, একসঙ্গে তাদের কোমর থেকে অসি খুলে ফেলে দেবার শব্দ। এখানে ওখানে, নানা ভোজবাজী। উপাদেয় সুখাদ্যের গন্ধ।

তেমনি নিচু রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

সোন্‌পাতিয়া বলল, 'আমাকে তোমার টাঙায় শহরে নিয়ে যাবে?'

আমি বললাম, 'যাব।'

সোন্‌পাতিয়া আমার এত কাছে, মনে হল, তার বলিষ্ঠ উরু, ক্ষীণ বক্ষ আমাকে স্পর্শ করবে। সে বলল, 'পরদেশী, তুমি খুব ভালো।'

আমি তার দিকে চোখ রেখে, সরে এলাম। টাঙার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি শুনতে পেলাম, টাঙাওয়ালা আমার উদ্দেশেই বলছে, 'আন্ধার হয়ে গেল বাবুজী, এখন আর কী দেখবেন। আবার কাল অসবেন।'

আমি টাঙায় উঠলাম। সোন্‌পাতিয়া টাঙায় পা বাড়াতেই, টাঙাওয়ালার একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল, 'হেই, হেই, হটো, ভাগো।'

সে ক্ষেপে উঠে, চাবুক ঘোরালো মাথার ওপরে। তারপরেই ঠাস্ করে যেন সেই চাবুক সোন্‌পাতিয়ার গালে পড়ল। তাড়া খেয়ে সে দূরে চলে গেল। টাঙাওয়ালা আপন মনে গালি দিতে দিতে, টাঙায় উঠে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আমার চোখের

সামনে থেকে সোন্‌পাতিয়া হারিয়ে গেল।

দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দে ঘুম ভাঙল। জানালা খানিকটা খোলা ছিল। রৌদ্রস্নাত বাহির প্রকৃতি দেখা যায়। পাখিরা ডাকছে। নিশ্চয়ই বেচন এসেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। বেচনই বটে। নমস্কার করে বলল, 'সকালে চা খাবেন বলেছিলেন।'

'কোথা থেকে আনবে?'

'দোকান থেকে।'

এমন সময় সেওয়াং গোমো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুপ্রভাত জানাল। দেখি, তার হাতে গরম চায়ের গেলাস। বলল, 'তোমাকে একটু আমাদের চা দিতে পারি?'

সকালবেলাই শুভদিনের লক্ষণ, তরুণী তিব্বতী ললনা, এই সময়ই চা দিতে চাইছে। বড় মুখ করে বললাম, 'খুব খুশি হব।'

সেওয়াং ভেতরে গেল। বেচনকে পয়সা দিয়ে বললাম, 'সকালবেলার কিছু খাবার নিয়ে এস।'

সে চলে গেল। সেওয়াং এল একটি ঝকঝকে ধূমায়িত গেলাস নিয়ে। হাত বাড়িয়ে নিলাম। শীতের সকাল, তর সইল না, চুমুক দিলাম। দিয়েই ঠেক। উম্‌! বমি হয়ে যাবে। হে ভগবান, এ কি চা বাবা! নোন্‌তা আর কিট্‌কিটে পুরনো ঘিয়ের গন্ধ।

কিন্তু বমি করব কী করে। সেওয়াং যে আমার সামনে, মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওরে কালকূট, নাম তো কালকূট, বিষ খা, বিষ খা। নিমেষে ঢোঁক গিলে, খেয়ে নিলাম। তারপরে সেওয়াংয়ের দিকে চেয়ে হাসলাম। সেওয়াং জিজ্ঞেস করল, 'গুড?'

'গুড।'

'এটা আমাদের তিব্বতী চা। নুন, মাখন, দুধ এইসব দিয়ে তৈরি।'

'তাই বুঝি! কোনোদিন খাই নি।'

'আমিই তোমাকে প্রথম খাওয়ালাম।'

কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কালকূট যে। সেওয়াং-এর সামনে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে, সেই অমৃত খেয়ে নিলাম। কেবল নিঃশ্বাসটা বন্ধ না করে পারলাম না। যদিও সে গন্ধ দূর করা অতি দুরূহ।

এখন যে জায়গাটিকে বেণুবন বলে, সেই অঞ্চলটা ঘুরলাম। বেণুবন, বাঁশবনে ঘেরা বাগান। উত্তর-পশ্চিমে যে খাল কাটা হয়েছে, তার পশ্চিমে যে জলাশয়, সম্ভবতঃ সেটাই ছিল কলন্দক নিবাপ পুষ্করিণী। পালিতে কলন্দ বা কলন্দক মানে, কাঠবিড়ালী। নিবাপ মানে, পশুপক্ষীর বিচরণ আর জল খাবার জায়গা। সব মিলিয়ে, একটি কল্পনার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বেণুবনের ছবি, বুদ্ধের বাণী যেখানে উচ্চারিত হচ্ছে। যেখানে বিম্বিসার, সারিপুত্ত, অনাথপিন্ডদ, মৌদগল্যায়ন, ক্ষেমা, থেরী সবাই তাঁর সামনে বসে আছেন।

কোথায় ছিল সেই প্রাচীর, বেণুবনকে যা ঘিরে ছিল? সেই গোপুর অট্টালিকাই বা কোথায়? কতদূর বিস্তৃত ছিল? কিছুই বোঝার উপায় নেই। হয়তো দক্ষিণের দোকানঘরগুলো পর্যন্ত, উত্তরে ইনস্পেকশন বাংলো পর্যন্ত বেণুবন বিস্তৃত ছিল।

একটি মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। অজাতশত্রু। পিতৃহন্তার কপালে সর্পিল রেখা, চোখে গম্ভীর অনুশোচনা আর ব্যথা। পিতার মূর্তি বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নিজের পুত্রের দিকে চেয়ে, আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে আসে। বৃজি

আর লিচ্ছবিরা দু'চোখের বিষ। তাদের কিছুতেই অধীন করা যাচ্ছে না। গণতান্ত্রিক ঐক্যই তাদের শক্তি।

এই অশান্তির মধ্যে অজাতশত্রু বিভিন্ন ধর্মগুরুর কাছে যাতায়াত করছে। সব পেয়েও, কী যেন পাওয়া গেল না। কী এক হাহাকার বুকের মধ্যে, অপূর্ণতার বেদনা। জৈন ধর্মগুরুর কাছে গিয়ে শান্তি হল না। মন মানল না। নিয়তিবাদী মংখলী গোসাল, বস্তুবাদী অজিতকেশ কম্বলি, কারোর কথার মধ্যেই, হাহাকার মিটতে চায় না।

এই রাজগৃহে তো সকল ধর্মমতেরই প্রচার চলে। সকলের সাধনার জায়গা এখানে। সকল ধর্মের স্বাধীনতা এখানে।

তারপরে একদিন রক্তিম সায়াহ্নে, অজাতশত্রু তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের পাঁচশত হাতী নিয়ে এলেন এই বেণুবনে। বুদ্ধ সংবাদ পেলেন, সমহিষী অজাতশত্রু তাঁর দর্শনপ্রার্থী। বুদ্ধের করুণ মুখে সজল চোখে একটি স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিল। অজাতশত্রুকে আসতে বললেন। এই বেণুবনে সেই পিতৃহন্তা, বুদ্ধকেও যিনি মাতাল হাতী লেলিয়ে দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধের পায়ের কাছে নত হয়ে বসলেন। প্রণিপাত করে বললেন, 'যা জানি না, তাই জানান। যা পাই নি, তাই দিন। মুক্তির উপায় দিন।'

বুদ্ধ অজাতশত্রুকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর চোখে জল, বিম্বিসার-প্রিয় শ্রেণীকে। মুখখানি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। বললেন, 'শান্তি বোধ করার চেষ্টা কর, একে আয়ত্ত করতে হয়। পুত্রকে অন্য কোথাও রাখো। বৃজি লিচ্ছবিদের ঐক্য যতদিন আছে, ততদিন ধ্বংস করা যাবে না। আত্মস্থ হও, স্থিরচিন্তা কর।'

অজাতশত্রুর চোখ খুলে গেল। বুদ্ধের শিষ্যত্ব নিয়ে ফিরে এলেন। পাটলিপুত্রে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। পুত্রকে সেখানে স্থানান্তরিত করলেন। আর ভেদ বুদ্ধি পরিচালনা করে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান নেতাদের মধ্যে বিবাদ বাধালেন।...

সেই ইতিহাস থাক। বুদ্ধের উদাত্ত স্বরের বাণী ধ্বনিত হচ্ছে, আমি যেন তাই শুনতে পাচ্ছি।...

বিকাল গড়িয়ে এল। সপ্তপর্ণী গুহার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এখন অনেকেই নেমে যাচ্ছে। বেচন আমাকে বলল, অন্ধকারে যেন এখানে না থাকি। বন্যপশুরা বেরোতে পারে। সে আমার সঙ্গে রয়েছে। বৈভারগিরির কোনো গুহার কাছেই, মৌদ্‌গল্যায়নকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল গুণ্ডারা। সে কি এই সপ্তপর্ণীর কাছে? পর পর কতগুলো গুহা মুখ। ভিতরে অন্ধকার। ভ্রমণকারীদের কিছু কিছু চিহ্ন পড়ে আছে। বৌদ্ধ সংগীতির জন্য, অজাতশত্রু এখানে মণ্ডপ তৈরি করে দিয়েছিলেন। উঁচু গাঁথনি দেখে বোঝা যায়, সেই মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ। সিম্পলিগুহা থেকে সপ্তপর্ণী পর্যন্ত অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

নিচের দিকে তাকালাম। কর্ষিত ক্ষেত্র, দূরান্তরে বিস্তৃত। গ্রাম দেখা যায়। আকাশ রক্তিম। আমার কানে বেজে ওঠে, সমবেত গলার বৌদ্ধ সঙ্গীত। পুরুষ গলার সঙ্গে রমণীর বীণামন্দ্রিত স্বরও যেন শুনতে পেলাম। পদ্মের গন্ধে ভরে উঠল বাতাস।

গুহা-মুখের সামনে কে যেন এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি, সোন্‌পাতিয়া। সোনার পাতা। কিন্তু তার চোখে সেই কৌতুকের দীপ্তি নেই। ঠোঁটে হাসি নেই, দাঁত দেখা যায় না। তার চুল খোলা। মুখের দু'পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের কাছে এসে পড়েছে। তার পীন-বক্ষের সেই উত্তাল ঔদ্ধত্য নেই। উরুজংঘার বলিষ্ঠতা

যেন চাপা পড়ে গিয়েছে। কেবল দেখছি তার গালের পাশে নতুন একটা সরু রক্তাভ দাগ। যেন কোনো নতুন আঘাতের চিহ্ন।

এ কি সোনার পাতা, না কোনো বৌদ্ধ শ্রমণী! আমি রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

যেন নতুন স্বর শুনলাম। স্পষ্ট স্বচ্ছ, 'আমি সোন্‌পাতিয়া। তুমি গুহার মধ্যে আসবে?'

'কোথায়?'

'গুহার মধ্যে। এস আমার সঙ্গে।'

তথাপি আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। স্নায়ুসমূহ অবশ হয়ে আসছে। সোনার পাতা হঠাৎ একটি হাত বাড়িয়ে দিল, ডাকল, 'এস।'

আমি হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেল। আমি দেখলাম, গুহার মধ্যে আলো। প্রদীপের কর্পূরতেলের গন্ধ মিলেছে, পদ্মগন্ধের সঙ্গে। সঙ্গীত বাজছে আমার কানে। আমার সামনে এক শ্রমণী, তার চোখে গভীর এক ব্যথার ছায়া, অথচ স্নিগ্ধ কিরণ উপছে পড়ছে যেন। সে আমাকে আকর্ষণ করল। আমি তার সঙ্গে গুহার মধ্যে পা বাড়ালাম।

সেই মুহূর্তেই একটা চিৎকার শুনলাম, 'খবরদার, খবরদার!'

তারপরেই দেখি, বেচন আমাদের দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাকে দু'হাতে টেনে ধরেছে। সোন্‌পাতিয়া গুহার অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।...

টাঙাওয়ালা ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে এল সোনভাণ্ডারে। দেখলেই বোঝা যায় দোতলা ভেঙে পড়েছে। একতলার কিছু অবশিষ্ট আছে। ভিতরের দেওয়ালে নানা রকমের মূর্তির ছাপ। দেওয়ালে উৎকীর্ণ কিছু কথা লেখা আছে। এখানকার লোকেরা বলে, ওই লেখার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বর্ণভাণ্ডারের হদিস। যে পড়তে পারবে, সে-ই সোনার খোঁজ পাবে।

কথাটা গল্প কথা মাত্র। দেওয়ালের লিখন পড়া গিয়েছে। লেখা আছে, একজন সাধক, সাধুসন্তদের আশ্রমের জন্য এই ইমারত তৈরি করেছেন।

স্বর্ণভাণ্ডারও না, কোনো গূঢ় কথাও লেখা নেই। সেখান থেকে রণভূমি গেলাম। জরাসন্ধকে ভীম এখানে হত্যা করেছিলেন। সেইজন্য সারা দেশের কুস্তিগীরেরা এখানকার মাটি নিয়ে, তাদের কুস্তির আখড়ার মাটির সঙ্গে মেশায়। বোধহয় ভীম হয়ে ভীমগর্জন করবে বলে।

সেখান থেকে ফেরার পথে, এলাম মনিয়ার মঠে। চারপাশে অজস্র ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো তার মাঝখানে মনিয়ার মঠ এখনো সেই প্রাচীন পাথরের প্রাচীরের সীমার মধ্যেই। মনিয়ার মঠ খনন করে পাঁচটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ জৈন শৈব দেবালয় ছাড়াও, নাগনাগিনীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মহাভারতে আছে রাজগৃহে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মণিনাগ। যক্ষ-যক্ষিনীর পূজাও হত।

মনিয়ার মঠ যেন কেমন উপেক্ষিত। এখানে বিশেষ কেউ উঁকি মারতে চায় না। সন্ধ্যার এখনো দেরি, এর মধ্যেই মনিয়ার মঠ ফাঁকা। আমি ভিতরে ঢুকলাম। চারিদিক স্তব্ধ। অনেকটা গোলাকার ইঁটের গাঁথুনি-তোলা মন্দির, বিচিত্র গঠন। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। নিচে অন্ধকার একটি ঘর। সরু নিচু একটা ফাঁক, ভিতরে যাবার দরজা। স্যাঁতসেতে শ্যাওলার গন্ধ আর হিম বাতাসের একটা অনুভূতি।

আমি দোতলায় উঠলাম। ভিতরে যাবার পথ রুদ্ধ। সেখানকার অলিন্দ আর বন্ধ গবাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার জমে রয়েছে। কোথায় ছিলেন মণিনাগ? তাঁর বিগ্রহ কোথায় স্থাপিত ছিল? বন্ধ কেন? ভিতরে কি প্রবেশ করা যায় না? দেখলেই বোঝা যায়, এ যুগের মানুষ, কোনো কারণে, ভিতরে প্রবেশের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কোথায় যক্ষ-যক্ষিণীদের মূর্তি? কোথায় ছিল পশুদের হাঁড়িকাঠ?

আমার কানে ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। তার সঙ্গে কাড়া-নাকাড়া। মন্দিরে বাতি জ্বলছে। সোনার প্রদীপ। দেখলাম, রাজগৃহের বধূরা নানা পূজার উপাচার নিয়ে মন্দিরে আসছে। কলসী থেকে দুধ ঢেলে মন্দিরের সিঁড়ি ধৌত করছে। নিচু স্বরে গুনগুন করে গান করছে।

'পরদেশী!'

চমকে উঠে তাকালাম। বন্ধ গবাক্ষের দেওয়ালের ধারে সোন্‌পাতিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আমার মুখোমুখি। এখন তার চোখে আবার সেই কৌতুকের হাসি। কিন্তু দীপ্তি যেন বেশি। তার দাঁত দেখা যায় না, ঠোঁট টিপে হাসছে। যেন উদ্গত উচ্চহাসি থমকে রয়েছে গলার কাছে। দেখলাম তার বিবর্ণ শাড়ির আঁচল হাতে এলানো। সংক্ষিপ্ত একটুকরো জামার বন্ধনী অর্ধেক খোলা। রক্তিম পাথরের পীন-বক্ষ প্রায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। তা আমার বুক থেকে সোজা মস্তিষ্কে গিয়ে বিঁধছে, আমার বুকের মধ্যে থরথর করছে। তার মসৃণ নাভিস্থলে, বেলাশেষের আলো।

বাতাস লাগা সেই স্বর শুনলাম, 'পরদেশী, মণিনাগ দেখবে?'

আমি বললাম, 'দেখব। কোথায় আছে?'

সে নিচের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করল। ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকাল। তার কালো চোখের তারা নিবিড়তর হল। আমার গায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি একবার কেঁপে উঠলাম। তারপরে স্থির হয়ে গেলাম। সোন্‌পাতিয়া আমার হাত ধরল। আমি যেন হাজার হাজার বছর ওপারে চলে গেলাম। সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে, বুকের কাছ ঘেঁষে, আমার হাত ধরল। আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

বাদ্য সঙ্গীত ফুলের গন্ধ মন্ত্রোচ্চারণ সব আমাকে ঘিরে রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। কিন্তু কেউ কারোর দিক থেকে চোখ সরাতে পারলাম না। সোন্‌পাতিয়া আমাকে নিচের সেই অন্ধকার কুঠুরির প্রবেশ-মুখে নিয়ে এল। ভিতরের অন্ধকারে সে একবার তাকাল। ঘাড় নেড়ে আমাকে তার সঙ্গে ঢুকতে ইশারা করল। তার হাতের বাঁধন শক্ত হল। তার নিঃশ্বাস আমার গায়ে মুখে লাগছে। শরীরের স্পর্শ আর উত্তাপ অনুভব করছি।

সোন্‌পাতিয়া নিচু হয়ে ঢুকতে গেল। আমাকে তার সঙ্গে আকর্ষণ করল। ভিতরের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিবিড় অন্ধকার।

সেই মুহূর্তেই পিছনে চিৎকার শুনলাম, 'বাবুজী, বাবুজী, মত যানা!'

সোন্‌পাতিয়া আমাকে আরো জোরে টানল, আর তখুনি পিছনে অন্য হাতের কঠিন স্পর্শ আমাকে টেনে ধরল। আমার অর্ধেক শরীর তখন অন্ধকারের গভীরে। কিন্তু সহসা সোন্‌পাতিয়ার স্পর্শ আমাকে ছেড়ে গেল। আমি ডাকলাম, 'সোন্‌পাতিয়া!'...

একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ছাড়া, কিছু শুনতে পেলাম না। টাঙাওয়ালা আমাকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। বলল, 'কী করছিলেন আপনি? ওর ভিতরে কি কেউ যায়? বড় গর্ত আছে। কত কি থাকতে পারে। সবাই বলে, ওখানে নাগ আছে।'

'কিন্তু সোন্‌পাতিয়া যে গেল!'

'সোন্‌পাতিয়া ?'

'হ্যাঁ। সে ভিতরে চলে গেছে।'

'আমি তো কাউকে দেখতে পাই নি বাবুজী।'

'কিন্তু আমি জানি, সোন্‌পাতিয়া ভিতরে চলে গেছে।'

টাঙাওয়ালা আমার দিকে অবাক হতভম্ব চোখে কয়েক পলক চেয়ে রইল। তারপরে বলল, 'যেই হোক বাবুজী, আপনি চলুন। এখানে আর থাকবেন না।'

আমি জানি, সে আমাকে বিশ্বাস করছে না। কিন্তু সোন্‌পাতিয়া কোথায় গেল? সে কি চিরদিনের জন্য মণিনাগের গহ্বরে হারিয়ে গেল? এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে, এমন অসহায় ভাবে, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

আমি আবার অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকালাম।

---

www.boiRboi.blogspot.com

দেখছ এখানে। এ ইছামতী নদী নয়া নয়। এই যে জোয়ারে উজান যায়, এ নয়া নয়। যত পুরুষ পেছিয়ে যাবে, অনেক সাবেকী হিসাব পেয়ে যাবে। তোমার বারো নয়া তেরো নয়ায়, ইছামতীকে নয়া করতে পারনি। আগের ভাঁটায় যে-পলি এখনো ডোবেনি, তার রঙ সেই সাবেকী, কালো কুচকুচে, পাতায় মোড়া পাত-ক্ষীরের মতো। গাঙ শালিকেরা ঝাঁক বেঁধে, চঞ্চু খুঁচিয়ে, পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে সেখানে। সূর্যের ছটা-লাগা আকাশটা সেই রকম সাবেকী। প্রথম শীতের হাওয়ায়, মেঘের ছিটেফোঁটাও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ঝকঝকে নীল পাথরের মতো, এত চেকনাই যে, চোখ রাখা যায় না। ইছামতী জোয়ারে বাড়ন্ত, একটু ঢেউ নেই। ধোয়ামোছা একখানি আরশি, আকাশের ছায়ায় নীল। ওপারে দেখা যায় যে গ্রামখানি, তার আম জাম জারুল গাম্বিল কাঁঠাল নারকেলের গা ভরে রোদ। মস্ত মস্ত হিজল নেই, গেমোর ঝাড় ঝোপ জলে নেমে দাঁড়িয়েছে। কোমর ডুবিয়ে, ডাল বাড়িয়ে ইছামতীর জোয়ারে ছপ্‌ছপ্‌ খেলছে। মাঝে মধ্যে ক্যাওরার ঝোপ। বারো নয়া তেরো নয়ার মত নতুন কিছু নেই, সবই সাবেকী। নয়া তো তোমার মিলের ধুতির পাড়ে, মিলবাবুর জামায়, চোখের জার্মান কাঁচের কালো ঠুলিতে, শান্তিনিকেতনী ঝোলায়। কথার ভেজাল বাড়িয়ে লাভ কী। উঠে বসেছিলাম। দরাদরি করা যেত, কেননা, টিকেট যখন ছাপানো নেই। ছাপাছাপি না দেখলে, কোনো কিছুতেই এক দর বলে মানতে শিখিনি। কিন্তু এ যা মাঝি, তার এক মুখ খোলা, বাকী সব বন্ধ। কথার ভেজালে নেই, কথাই ছাপানো।

উঠে বসতেই জল সেঁচা বন্ধ করে পাটাতনে বসিয়ে দিয়েছিল। ছই নেই, খোলা, জেলে নৌকার মতো। জালের ভাঁজ ছিল না যে মাঝিকে মাছধরা ভাবব। এই মাল-বোঝাইয়ের ঘাটে যে সে বেগার দেবার জন্যে বসেছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। হতে পারে, মাছ মারে, মাল বহে, পারাপারও করে। নৌকা যখন একটা আছে। কিন্তু আমার তো মনে হয়েছিল, মাঝি তুমি কী করো, পারাপার করি। এ ছাড়া আর কিছু নয়। আর কী করো? পারাপার করি।

নৌকার খুঁটি তুলে ঠেলা মারতে যাবে, তখনি ইনি এলেন, দ্বিতীয় যাত্রী। চিৎকার শোনা গিয়েছিল, 'অদরদা অদরদা, দাঁড়িয়ে।'

অদর। অর্থাৎ অধর। তবে আমি অধর মাঝিকে ধরতে চেয়েছিলাম! ও ভোলার মন, সবাই কি আর অধর ধরার কল পাততে জানে। দেখ, বগলে কী একটা চেপে, রঙ ওঠা গেরুয়াই হবে—আলখাল্লার মতো জিনিসটা হাঁটুর ওপর অবধি তুলে কেমন ছুটে আসছিল লোকটা। কোথায় যাবে, যাবে কিনা, দর কত, কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নেই। 'অদরদা দাঁড়িয়ে,' তো অধর নৌকোর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে। অধর মাঝি একবার তাড়া দেবার হাঁক দেয়নি। কালো মুখখানিতে, কপালে বা ভুরুতে কোথাও একটু এদিক ওদিক হয়নি। ঢুলুঢুলু চোখ দুটো তুলে একবার লোকটিকে দেখেছিল মাত্র। সে এসে উঠতেই নৌকা ঠেলে দিয়েছিল। তারপরে শোনো কথা।

'জয় মুরশেদ। বেলা হয়ে গেল। এইটুকুন তাড়াতাড়ি আসতি পারলে জানি, পারের চিন্তা নাই। তবু যাগগা, তোমাকে মিলিয়ে দিলে গোরাসায়িবে। বেরুতি যাবো, হরেকেষ্ট আর তার বউয়েতে কী ঝগড়া। পাড়ায় কাক চিল থাকতি চায় না। বিত্তান্ত কি, না হরেকষ্ট গাই দোয়াবার আগে এক ফেত্তা হুঁকো টানতে বসেছিল। বেরুবার মুখেতেই, এসব বড় খারাপ, দিনটা না বেরথা যায়। দাঁড়িয়ে একটু জোড়াতালি দিলাম, তারপরে...।'

কিন্তু মুরশেদের জয় হয়েছে, গোরাসায়িবে মিলিয়ে দিয়েছে, ঝগড়া মেটানো হয়েছে, সব বৃত্তান্তই বলা হয়েছিল, অধর মাঝি অধর। সে তেমনি নির্বিকার। তার চার পাশে সব যেন নিরাকার। তার বৈঠা জলে পড়ছিল ছপ্‌ছপ্‌, সে পারাপার

করে। তার দৃষ্টি না জলে না থলে; কথা নেই, শোনে কি না কে জানে। লোকটি এমনি বসে কথা বলছিল না। ছুটে এসে, সে তার কাঁধের ঝোলা ঠিক করছিল। আলখাল্লা না জোব্বা, যা হোক, দেখে নিচ্ছিল। ছিঁড়ে যাবার ভয় ছিল বোধ হয়। দেখে ভাবছিলাম, ছিঁড়বে না বা কেন। ও আলখাল্লার আর আছে কী। শতখানে শতেক তালি, এখানে মচকানো, ওখানে মচকানো। ওটার নাম এখন তালিখাল্লা হলেই ভালো হয়। নয় তো কাঁথাখাল্লা। তালিতে তালিতে এমন মোটা হয়েছে, কাঁথার মতোই দেখাচ্ছে। তার ওপরে যত ঝাড়ে, তত ধুলো ওড়ে। কবে যে রঙে ছোপানো হয়েছিল, কে জানে। এখন গেরুয়া জলে ধোয়া। মাথার পাগড়িটা অন্তত আস্ত আছে, মনে হয়েছিল। সেটা খুলে যখন ঝাড়া দিয়েছিল, জয় মুরশেদ, সেটিতে অজস্র ছিদ্র আর গিঁটে ভরতি। অথচ বাইরে থেকে এমন নিপাট ভাঁজ জড়াবার কেরামতি, সব ছিদ্র বন্ধন। এক কলসীতে নয়টি ছিদ্র, নবম পদ্মদলে। মন, ছিদ্র বন্ধন করো। পাগড়ির খেলা সেই রকম দেখেছিলাম। ঘাড় অবধি বাবরি চুলে, ঝাপটা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে, আবার পাগড়ি বাঁধতে দেখেছিলাম। তারপরে ওই শোনো, ইছামতীর বুকের ওপরেই ডাক শুরু হয়ে গিয়েছেঃ

আমি এসে এই দুনে,
মন মুরশেদ না নিলেম চিনে।
আমি যাব কোথা কেউ বলে না
হয় নারে মনে,
আমি ছিলাম কোন্‌খানে
আমারে আনলে কোন্‌ জনে।

অধর মাঝি বৈঠা টানে। আর একজন মন মুরশেদকে ডাকে। তার আগে যে অত কথা, হরেকেষ্ট যুগলের গাই দোয়ানো বিভ্রাট, অধর মাঝির কাছ থেকে কি তার কোনো জবাবের প্রত্যাশা নেই। থাকলে শুনতে পেতে। গোরাসায়িবে মিলিয়ে দিয়েছে, তাই দুটো কথা। ও হলো কথার কথা। আর সব মনে মনে। যাবে তো পারে হে, নায়ের নাগাল পেয়েছ, আর তো কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার যত খুশি হাঁকো, 'মুরশেদ আমার কোন্‌ শিয়রে জাগে রে।'...

উনি সাঁইবাবা না দরবেশ, তা কে জানে। গোঁফ দাড়িতে পাক ধরেছে মাত্র, অথচ মুখ দেখ, ফাটাফুটি চৌচির, যেন আদ্যিকালের মুখটি। বালা পরা হাতের চেহারাও তেমনি। যত ফাটার দাগ, তত শির। তবে এই চৌচির মুখে, চোখ ইছামতী। এই রোদ-লাগা চলন্তা জলের মতো। ছোট ফাঁদে, কালো তারা, থেকে থেকেই নড়ে চড়ে, ঝিলিক মারে। কেবল দাঁতের কথা বলো না মুরশেদ, পান খেয়ে খেয়ে পাকা ছোপ ধরিয়ে ফেলেছে। দরবশের গলাটা কেবল ভরাট নয়। কম করে দুটো গ্রাম পেরিয়ে শোনা যাবে, এত জোর। শহরে হলে, কী হতো, বলতে পারি না। এখানে তো দেখি, পলিপাড়ের গাঙ শালিকেরা একবার মাত্র ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল। তারপরে আবার পেটের ধান্ধায়, চঞ্চু-পাঁকে লড়াই। মন-মুরশেদের ডাক তাদের শোনা আছে। ওপারের বনে বনে, আর এই আকাশের ছায়া পড়া নীল ইছামতীর আরশিতে, মন-মুরশেদের হাঁকে কোনো হকচকানি নেই। যেন পলিপাড় বলো, বন বলো, নদী বলো, মায় অধর মাঝি বলো, সব যেন কান পেতে ছিল। যেন পারাপারের কোথায় কিছু সুর ছিল আবাঁধা। এবার বাঁধা হলো।

নিজের কথাই বা বাদ দিই কেন। 'আমি ছিলাম কোন্‌খানে, আমারে আনলে কোন্‌ জনে' শুনব বলে, আমি কান পেতে ছিলাম না। তবু মনে হয়েছিল, কান পেতেছিলাম, আমার জানা ছিল না। প্রথম কয়েক কলি বেশ হাঁক পেড়েই হয়েছিল।

তারপরে ইছামতীর জলে হাত ছুঁইয়ে, আঙুল দিয়ে একটু দাড়ি আঁচড়ে নেওয়া হয়েছিল। নিতে নিতে গুনগুনানি শুনেছিলাম, 'মুরশেদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে রে, মুরশেদ আমার কোন্খানে বিরজে রে।'

বিরজে সম্ভবত বিরাজ। আর গুনগুনানি যে এমন বাঁশীর সুরের মতো ভাঁটির টানে সমুদ্রে যেতে চায়, আগে কখনো মনে হয়নি। তখনি দেখেছিলাম, কালো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে, পানের পাকা ছোপের দাঁতের হাসি। ছোট ফাঁদের চোখে ধরা কালো তারায় বারে বারে দেখা। দরবেশের চোখে ধন্দ বুঝতে পারি, তার সঙ্গে হাস্য কিসের। তারপরেই, সন্দেহ যা করেছিলাম, 'বাবুর যাওয়া হবে কোথায়!'

বললাম, 'ওপারে।'

'না, বোলে, চিনতি পারলাম না কিনা।'

চুপ করে থাকতে চাও, থাকতে পারো। তবে অধর মাঝিকে যা মানায়, তোমাকে কি তাই মানায়। তা ছাড়া দরবেশের গলা কি তোমাকে একটুও মাতায়নি। মুরশেদের ডাক! আমারে আনল কোন্ জনে। জবাব দিলাম, 'কেন, অচেনা লোক কি এ তল্লাটে দেখা যায় না?'

'জয় মুরশেদ!'

বাতাস লাগলে যেমন পারে পারে ঢেউ লাগে, দরবেশের চৌচির মুখে সেই রকম লাগল। বলল, 'তা আবার যায় না। অচেনা লাগল কিনা, তাই। বোলে, সাঁইয়ের ঠাঁই তো সবখানে, এ তল্লাটে বাবুকে দেখি নাই।'

অধর মাঝি কী বলে। কিছু না, কেবল বৈঠা ছপ্ছপ্। বললাম, 'কোথায় যাবো, তা জানি না। ওপারে যাবার ইচ্ছা হলো, তাই যাচ্ছি। নাম কী ওপারের?'

জিজ্ঞেস করলাম। দরবেশের ঝোলা থেকে তখন একখানি পুরনো ডুপ্কি বেরিয়েছে। ডুপ্কির চামড়ায় টোকা দিতে গিয়ে, সাঁইবাবা হেসে মরে গেল। বলল, 'বাবু বলে কিগো অদরদা। পারের নাম জানে না!'

অধর সেই রকমই অ-ধরা। সে কেবল পারাপার করে। নৌকা এখন মাঝদরিয়ায়। আরশির তলায় তলায় টান। উজান কি আর এমনি ওঠে। গোটা সাগর চাপ দিচ্ছে। বৈঠা হাতে নাও, বুঝতে পারবে উজানী টান কাকে বলে।

দরবেশ আবার জিজ্ঞেস করে, 'তবে যাচ্ছেন কোথায়?'

'ও পারে।'

'ওপারে!' সাঁইবাবার আবার হাসি। বলল, 'কোনো ঠিকানা নাই?'

লোকটার গলায় যেন হাসির বান আটকে রয়েছে। জবাব শুনলেই কলকলিয়ে ফেটে পড়বে। তবু বলতে হলো, 'না।'

একেবারে দাড়ি ওড়ানো হাসি হাসল দরবেশ। বলল, 'মজার ব্যাপার তো। বাবু যে মুরশেদ খুঁজতে বেরয়েছেন। আমারে আনলে কোন্ জনে, আমি ছিলেম কোন্খানে। তা আসছেন কোত্থিকে?'

আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বসল। মাঝি একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি। সাঁইবাবার কথা ফুরায় না। আমার বাসস্থানের আধা শহরটার নাম বললাম। সে অমনি ঘাড় নেড়ে বলল, 'গেছি গেছি, আপনার দেশ ঘুরে এসেছি। তা সেখেন থেকে সাত সকালে বেরয়ে পড়েছেন, ওপারে যাবেন বলে?'

'হ্যাঁ।'

'আর ওপারের নামও জানেন না?'

জানবার দরকার কী, তা নিজেই জানি না। নিজেকে যে কথা জিজ্ঞেস করিনি, তা এ লোককে বলি কেমন করে। আমি তো নামের খোঁজে আসিনি। আমি যেতে চাই,

ওই আম জাম নারকেলের ছায়ায় যে পথ গিয়েছে, সেই পথে। যে পথ আমার অদেখা, অচেনা। আমি ইছামতীর আয়নায় আকাশ দেখব, যতদূর চোখ যায়, তত দূরে। আর এমনি, মন-মুরশেদের ডাক যদি শুনি, তবে তাই শুনব। আমার অজানাকে নিয়ে এত হাসি কিসের। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম ওপারের?'

'ইটিন্ডা।'

নামটা শোনা শোনা লাগল। ম্যাপে দেখেছি কি বইয়ে পড়েছি, মনে করতে পারি না। দরবেশ বলল, 'তা বাবু, ঠিকানা যদি নাই, ওপারে গিয়ে কী করবেন। দু' পাক না দিতেই তো সেই বডার।'

বডার মানে বর্ডার, দুই বাঙলার সীমানা। বললাম, 'তাই নাকি। তবে কোথায় যাবো?'

তাই তো, মুরশেদের ভাবনা কেড়ে নিলে বাবু, দরবেশকে সে ভাবিয়ে তুললে। ওই বেরোবার মুখে, হরেকেষ্ট আর তার বউ-ই ফ্যাসাদ করেছে। বলল, 'কাছেপিঠে কোথাও মেলা-খেলাও নাই যে বলব, একটু ঘুর দিয়ে যান।'

মেলার কথা শুনে উৎসাহিত হলাম। কিন্তু দরবেশের ঠোঁট উল্টে গিয়েছে, ঘাড় নাড়তে আরম্ভ করেছে। বলল, 'উঁহু, এক আপনার গে সেই সাখোরের রাসের মেলা। তাও ভাঙা মেলা, দূর বেজায়।'

অতএব দু' পাকের ইটিন্ডাতেই ঘুরে আসা যাক। বাঙলাদেশের ওপারের রঙটা আলাদা হয়ে গিয়েছে কিনা, দেখে আসা যাবে। দরবেশ দেখি, ডুপ্‌কিতে আঙুলের টোকা মারছে, ডুপ্‌ ডুপ্‌ ডুপ্‌কি ডুপুক। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। দেখলাম, দরবেশের চোখ বোজা, নাকের পাটা ফোলানো। তারপর হুস্‌ করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'হুম, যা ভেবেছি, একেবারে তাই।'

কথার শেষে পাকা ছোপের দাঁত দেখা গেল। চোখের তারা সিগারেটের ডগায়। বোঝার উপায় নেই, কাকে বলছে, কী বলছে। আবার বলল, 'বুইলে অদরদা, এ সেই তোমার পচা কাট পুরনো ছিরেট নয়। বাবুর ছিরেটের গন্ধই আলাদা। এর অনেক দাম, না বাবু?'

মন গেল, মুরশেদ গেল, মেলা খেলাও গেল, এখন বাবুর ছিরেটের গন্ধ দেখ আর দাম হিসেব করো। হতে পারে, এসেছি ইছামতীর কূলে। তা বলে কি, অমন কথা শোনা নেই। এমন সকালটা না মাটি হয় মনের বিরক্তিতে। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম, দূর পলিচরের গাঙ শালিকগুলোর দিকে। শুনতে পেলাম, ডুপ্‌কিতে চাপা তাল, তার সঙ্গে গুনগুন, 'আসিবের কালো বান্দা দিল্লি মৌত লিখে। এখন কেন কান্দিস বান্দা পরের মৌত দেখে।'

দেখ, এখন বিরক্ত হবে, না হাসি চাপবে। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরবেশের চোখ ফেরানো দূরের নদীতে। তবে আর এত কঠিন হওয়া কেন, যদি এখন মন খচ খচ করে। যদি এমনি করে শহুরেবৃত্তি মাথা নিচু করে। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে বললাম, 'চলবে নাকি একটা?'

'জয় মুরশেদ। আপনার কম পড়বে না তো বাবু।'

দায় দোয়া জ্ঞান টনটনে। প্যাকেট খুলে সিগারেট দিয়ে বললাম, 'না।'

'তবে বাবু দিয়াশলাইখানিও দেন।'

ঘোড়াই যখন দিয়েছি, চাবুক রেখে আর কী করব। দেশলাই বের করে দিতে গিয়ে দেখি, সিগারেট দু খণ্ড করে ছেঁড়া হয়েছে। ভাবছি, অর্ধেকটুকু আপাতত ঝোলায় যাবে। তার আগেই হাত বাড়িয়ে বলল, 'খাও গো অদরদা, বাবু দিলে।'

মাঝি তখন স্রোতের টানে, বৈঠা ছাড়তে পারে না। কেবল শোনা গেল, 'রাখ।'

দরবেশ বাকী অর্ধেক ধরালো গোঁফদাড়ি বাঁচিয়ে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা বাবু, আপনি এলাত বেলাত গেছেন?'

বেলাত যদি বা বোঝা যায়, এলাত কোথায়, জানি না। কিন্তু হঠাৎ এলাত বেলাতের কথাই বা উঠছে কেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, 'না।'

সিগারেটে আর এক টান, একেবারে খতম। কোনোরকমে শেষের কাগজের চিল্‌তে ধরে জলে ফেলে দিয়ে বলল, 'না, আজকাল সবাই তো এলাত বেলাত যায় বাবুরা, তাই জিগেসাঁ করলাম।'

ঠোঁট চেটে, দাঁত দেখিয়ে একটু চোখ ঘোরানো হলো। অধর মাঝির নৌকা তখন ডাঙায় লেগেছে। মাঝি আগে নেমে, মাটিতে চেপে খুঁটি পুঁতে দিলো। ওপার থেকে যেমন নিরালা দেখেছিলাম, তেমনি নিরালা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে গুটিকয় বেড়ার ঘর দেখা যায়। কোথায় যেন ছাগলছানা ডাক দিয়ে উঠল। আর মোরগের তড়পানি তাড়া, মুরগীর কক্‌ককানি ছুট। ঘাটের জায়গাটা শক্ত, পাঁক নেই। দু' আনা পয়সা দিয়ে নেমে গেলাম।

দরবেশও নামল। নামবার আগে আধখানা সিগারেট বাড়িয়ে ধরল। অধর মাঝি সেইটি নিয়ে কানে গুঁজল। দেখি, পাটাতন সরিয়ে, জল সেঁচতে বসল আবার। কিন্তু দরবেশের পারানি কোথায়। তার বুঝি পারানি লাগে না।

এ আমার আন চিন্তা। মাঝি অধর। যাত্রী দরবেশ। এ ওকে ছিরেট ছিঁড়ে দেয়, ও এর জন্যে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এ নয়া জমানার কথা নয়, সাবেকী ঘরানার নিয়ম। এ নিয়মে পারানির কড়ি পার্টনি কী মূল্যে যাচাই করে, তুমি জানবে কেমন করে।

সামনের দিকে চেয়ে দেখি, পথ একটা গিয়েছে পুবে। হাঁটা যাক। হারাবার ভাবনা তো নেই।

তোমার না থাক, দরবেশের তো আছে। বলল, 'কোন্ দিকে যাবেন?'

'যাই একদিকে।'

হাঁটতে লাগলাম। দরবেশ পাশে পাশে। বলল, 'আবার ফিরবেন কখন?'

বলতে পারলাম না, পেটে জ্বালা ধরলে। বললাম, 'দেখি একটু ঘুরে-ঘেরে। ফেরার নৌকো পাবো তো?'

'তা পাবেন। সব সময়েই এক-আধখানা পারাপার হয়।'

দু' পা চলে, আবার বলল, 'বড় মজার ব্যাপার। বাবুরা যায় হিল্লি দিল্লী। আপনি এলেন গাঁয়ে জঙ্গলে।'

'এমনি বেরিয়ে পড়লাম।'

'জয় মুরশেদ, বড় মজার ব্যাপার।'

আবার সেই হাসি। তারপরে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সত্যি, কোনো কাজ নাই বাবু?'

আশ্চর্য, লোকটা আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবছে নাকি। বললাম, 'এখানে আবার কাজ কী থাকবে।'

দরবেশ বলল, 'তা বাবু, কত রকমের কাজ থাকতি পারে। জমি-জিরেত কেনা-কাটা, ধানচালের খোঁজ-খবর, পাটের আগাম দরাদরি। তারপরে গে আপনার, বডারের কাজকম্মো।'

'বর্ডারের কাজ?'

দরবেশ এবার একটু চোখ গোল করল। বলল, 'তা আর হয় না। আপনাদের মতন বাবুরা মাঝে মদ্দিই তো গাঁয়ে গেরামে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস-টুলিস নয় বাবু,

আপনাদের মতন সাফ-সুরত জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। মানে, বুঝিত পারছেন, খবর নেয়।'

গলা সে নিচু করলো আরো। বুঝতে পেরেছি। এতক্ষণ বেশ ছিলাম। এবারে যেন বাঙলা সীমানার দুর্গন্ধ পেলাম। এখন দুই বাঙলার একটা সীমানা আছে। বললাম, 'না, আমার কোনো কাজ নেই। একটু আসতে ইচ্ছে হলো চলে এলাম।'

'সে বড় মজার ব্যাপার।' হেসে বলল, 'তবে, দুনিয়ার তাবত লোকের একটা ধান্দা থাকে তো, তাই জিগেসাঁ করলাম।'

ধান্দার কথাটা শুনে বিরক্তি লাগল। এ দরবেশকে বোঝাবার কিছু নেই। রুষ্ট হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কেন বেরিয়েছ?'

'আমি?' দরবেশ ঝোলা ধরে ঝাঁকুনি দিলো। ডুপ্‌কিতে দু'বার তাল দিয়ে, মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'মহাপেরাণীর ধান্দায় বাবু, পেটের ধান্দায়। যদি বলেন, কিসের মজদুরি, মুরশেদের নামের মজদুরি।'

কথাটা শুনে, মনের কোথায় একটা চমক লেগে গেল। মুরশেদের মজদুর এমন সহজে পেটের ধান্দার কথা বলে। সকলের ধান্দা আছে, তোমারও কি ধান্দা নেই। কার নামের মজদুরি তোমার, কিসের খোঁজে ফেরো। সহসা দরবেশের কথার কোনো জবাব দিতে পারি না। সে তখন ডুপ্‌কিতে ডুপ্ ডুপ্ করছে। আর আমার চমকের আলোয়, মনের ভিতরে একটি ছেলেকে দেখতে পেলাম। যার চোখে পড়ন্ত বেলার উদ্বেগ, যাঁর ঠোঁটে সাবধানী চুপি চুপি শব্দ, 'যাবো, যাবো, যাবোই।'

দরবেশের পাশে পাশে, ইছামতীর ধারের গাঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে, আমার চমকের চিকুরে দেখলাম, ছোট ছেলে, পাঠশালার পড়ো, বছর দশ বয়স। ওপার বাঙলার ঢাকা শহরের একরামপুর দিয়ে হেঁটে চলেছে। জিয়সের গলিতে সে দৌড় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। মায়ের পায়ের কাছে বই সেলেট নামিয়ে দিয়ে দে ছুট। মায়ের মুখের দোষ দিও না, হাঁক দিয়ে বললে, 'ওরে মুখপোড়া, কোথা যাস্?'

ছেলের গলায় উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাস, 'খেলতে।'

'খেয়ে যা রে।'

ছেলে তখন আবার একরামপুরের বড় রাস্তায়। চোখে তার পড়ন্ত বেলার রোদ। ইস্, ছোট বেলা, চলে যায়। খালি পা, গায়ে একটা পাতলা জামা, ডুরি পরানো প্যান্ট। জামার পকেটে তার হাত ঢোকানো। সেখানে হাতের মুঠোয়, ষষ্ঠ জর্জের মাথা ছাপানো দুটি নতুন তাঁবার পয়সা। যার গন্ধ স্বাদ ওর জানা। হাতের ঘামে যা চটচটিয়ে উঠেছে পকেটের মধ্যে। এই পয়সা দিয়ে ও যাবে যাবে যাবেই। পাঠশালার জেলখানা থেকে পালাতে পারেনি, হেড পড়োটা, ইঁদুর ধরা বেড়ালের মতো তাকিয়েছিল। নইলে আগেই যেত। এই পয়সা দিয়ে দুটো জিভে গজা কেনা যেত। দুটো অমৃতি বা দুটো লুচি তার মোহনভোগ। জিভের সব লালা ও ঢোক গিলে খেয়েছে।

এ দু' পয়সা তো রোজের নয়। দুটো পয়সা, এ যে মেলে কালে-ভদ্রে। এই পয়সা দিয়ে কিছু কিনে খাওয়া যায় না। তার চেয়ে অনেক বিরাট স্বপ্ন সফল করতে হয়। ও যাবে, আজ যাবেই যাবে।

কদমতলা পার হয়ে ওর পাগলা ছোটা নারিন্দার পুলের দিকে। পিছন থেকে আসে ঘোড়ার গাড়ি, সামনে থেকে আসে ঘোড়ার গাড়ি। জোড়া ঘোড়ায় টানা, যাকে বলে পাল্‌কী গাড়ি, ঢাকা শহরের সেই আমলের সর্বকালের একমাত্র যানবাহন। তাদের চাবুকে বাজে শিস। ছোট ছেলেটার ডাইন-বাঁয় জ্ঞান নেই, দেখে হাঁক দেয়, 'আরে মাক্‌খন, স্‌সরকাইয়া যা।'

ওরে মাখন, সরে যা। ছেলেটার নাম মাখন নয়, গাড়োয়ানের আদরের ডাক। ননী মাখনের থেকে, আদর করে আর বেশী কী-ই বা বলা যায়। মাঝে মধ্যে বড় লোকের এক্কা গাড়ি, বড় ঘোড়া, দুলকি চাল, চোখে ঠুলি, মাথায় শিরস্ত্রাণ। গাড়ির মধ্যে দেখবে, মোটাসোটা গোলগাল মানুষ, নয়তো সুন্দর সুন্দর বউ। গা ভরতি তাঁদের গহনা, সুন্দর শাড়ি, আর মিঠে গন্ধ। ছেলেটার এই রকম ধারণা। ক্বচিৎ এক-আধটা মোটরগাড়ি। তাতে যে কারা চলে, ওর কোনো ধারণা নেই।

একবার ও চকিত হয়, ছোটার বেগ একটু কমে। বাঁ দিকে কালাচাঁদবাবুর মাঠ। সেখানে ওর বন্ধুরা তখন অনেকে খেলায় মত্ত। টেনিস বলের লোফালুফি, রিঙের ছোঁড়াছুড়ি। কে যেন ওর নাম ধরে ডাক দিয়েছে। তাই ও একবার চকিত হয়, একটু বেগ কমে। আবার পরমুহূর্তেই বেগ বেড়ে যায়। ওর সময় নেই। বেলা যতটা পড়ন্ত, ওর চোখে তার থেকে বেশী। ওর চোখে রোদ বাড়ন্ত। কম তো বলতে নেই। হাঁড়িতে চাল না থাকলেই বাড়ন্ত।

বাঁ দিকের সাজিয়ালনগরের রাস্তা ছাড়িয়ে ও তখন নারিন্দার পুলের ওপর। নিচে বহে যায় তরতরানো খাল। খালে কালো জল, তাতে রোদ চিকচিক খেলা। নৌকা দেখা যায় না। টানের দিনে, খাল একটু খালি খালি থাকে। খাল ওর বাঁয়ে গিয়েছে সোজা, ডাইনে দিকহারা। হঠাৎ এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে, কোন্ দিকে যে ঢল, তা টের পাওয়া যায় না, যাবে কেমন করে। ধু ধু মাঠের মতো. ওই যে সবুজ দেখা যায়, সব কচুরিপানা। তার মাঝখান দিয়ে, কোথায় যে আসল খাল তরতরিয়ে চলে গিয়েছে, হদিস পাওয়া যায় না পুলের ওপর থেকে।

না-ই পাওয়া যাক, নিচে নামলেই পাওয়া যাবে। ও তখন পুল পেরিয়ে, ডাইনের ঢালুতে নামে ছুটে। ইঁটের ভাটা পেরিয়ে ছোটে খালের ধার দিয়ে দিয়ে। ধারে ধারে পাড়া, গরীব মুসলমানদের। তাদের বাড়ির নিচে নিচে খানকয়েক ইঁট বা তক্তা বা কাঠের গুঁড়ি ফেলে ঘাটলা করা হয়েছে। এ তো পাছদুয়ার কি না। ঘাটের দখল বিবিদের। পাছদুয়ার হলো খিড়কি। ওদিকে গিয়ে দেখ আগ্‌দুয়ারে সদর। মিঞাদের আনা-যানা সেখানে। ঘাটে ঘাটে তখন বিবিদের সাফ-সুরতের ধোয়াধুয়ি। কেউ মাজে বাসন, কেউ ধোয় গা। মুখের সাবানের ফেনায় কারুর একটি ধানের মতো নাকের নোলক গায়েব। কোনো কোনো ঘাটে নৌকা বাঁধা।

ছেলেটির নজর একবার বাড়ির দিকে, একবার ঘাটের দিকে। ঘাটের দিকে নয়, ঘাটে বাঁধা নৌকার দিকে। আগে দেখে নৌকা, তারপরে দেখে বাড়ি। ঘন নিঃশ্বাসে বুক ওঠে নামে। কপালে নাকে ভুরুতে ঘাড়ে গলায় ঘাম ঝরঝর। ত্রস্ত উৎকণ্ঠা ওর চোখে। ও যা খোঁজে, তা কোথায়।

আছে। দু' কদম এগোতেই দেখতে পায়, আছে। নতুন গাবের আঠা মাখানো কোষা ডিঙিখানি। একটা বাঁশের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা। টানের দিনের খাল, স্রোত কোথায় কে জানে। ঢেউ নেই এক রত্তি। যেন আয়নার ওপরে বসানো কোষা ডিঙ্গা, উলটো করে নিজের মুখ দেখছে। ঘাটেতে নেই কেউ। ছেলেটি ওপরে তাকিয়ে দেখে, এক পাশে ঝিঙের মাচা, আর এক পাশে লাউ। মাঝখানে কোমর সমান কঞ্চির আগল। আগলের কাছে এসে ইতিউতি দেখে। এক মাচার নিচে নটে শাক, আর এক মাচার নিচে বেগুনের চারা। মাঝখানে নিকানো উঠোন, দু'পাশে দুই মাটির ঘর, মাথায় টিনের চাল। ছেলেটির চোখে ধিকিধিকি জ্বলে ওঠে আশা। ডাক দেয়, 'নানী, ও নানী।'

দুই ডাকেতেই ঘর থেকে সাড়া। এক বুড়ির গলা শোনা যায়, 'কে রে? অ সলিমা, দ্যাখ তো ক্যাটায় ডাকে।'

সলিমা বেরিয়ে আসার আগেই ছেলেটি জবাব দেয়, 'নানী, আমি।'

মুসলমান দিদিমাকে যে নানী বলে ডাকতে হয়, ও তা জানে। সলিমা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাড় কাত করে ওকে দেখছে। বেড়া বিনুনী বাঁধা, ছ' সাত বছরের মেয়েটা। লাল রঙের ফ্রক গায়ে। চোখে সুরমা, দুই হাতের তালু মেহেদীতে রাঙানো। ছেলেটির দিকে চোখ রেখেই, নানীকে জবাব দেয়, 'একটা ইন্দু পোলা।'

একটা হিন্দু ছেলে। দিদিমা তখন বেরিয়ে এসেছে। সাদা কাপড়, ছোট আর ময়লা, গায়ে একটা পুরনো ছিটের ঢলঢলে জামা। বুড়ির ফরসা মুখের চামড়ায় মেলাই হিজিবিজি দাগ। দাঁত নেই, চোপসানো ঠোঁট দুটি পানের পিচে টুকটুকে লাল। ঠিক বুলবুলি পাখির ইয়ের মতো, ছেলেটির মনে হলো। চোখে ছানি পড়েছে কি না কে জানে। লোম ওঠা ভুরু তুলে, টুকটুক করে দেখে বুড়ি। জিজ্ঞেস করে 'কী কস্ রে সোনা?'

ছেলেটির পকেটে তখনো হাত, দু পয়সায় ঠেকানো। বলে, 'ডিঙ্গা ভাড়া চাই।'

বুড়ি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আগলের কাছে। তার কাপড় ধরে আসে নাতনী সলিমা। বুড়ি ভুরু কাঁপিয়ে দেখতে দেখতে ফোকলা মুখে হাসে। বলে, 'এতটুকু পোলা, সাঁতার জানোনি?'

ছেলেটির চোখে চকিত হতাশার মেঘ দেখা দেয়। বলে, 'জানি।'

বুড়ি হাসতে হাসতেই ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না গো সোনা, মিছা কথা কও।'

ছেলেটির মুখের ঝলকে প্রতিবাদ। বলে, 'দেখামু?'

তাতেও বুড়ির সন্দেহ যায় না। বলে, 'দেখাও তো।'

ছেলেটি একটানে জামা খোলে। প্যান্টে হাত দিয়েই ঠেক খায়। সলিমা যে অবিশ্বাসী চোখে প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে! নানীর সামনে ল্যাংটা হওয়া যায়। তা বলে, ওই এক ফোঁটা মেয়ের সামনে! নানী বলে, 'ওদিক ফিরা খোল, কেউ দেখবো না।'

নাতনীর দিকে ফিরে বলে, 'যা তো সলিমা, গামছাখান লইয়া আয়।'

নানী বুড়ি এমনি ছাড়বার পাত্রী নয়। ছেলেটি দেখে, তবু সলিমা যায় না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। সাঁতার জানার পরীক্ষা দিতেই হবে। মনে মনে সলিমাকে গালাগাল দেয়, 'পেত্নীটা, গিদ্ধরীটা।' তারপরে নানীর কথানুযায়ী, পিছন ফিরে প্যান্ট খুলেই দৌড়ে একেবারে জলে। ঝাঁপ খেয়ে এক ডুবেতেই অগাধ জলে। এবার দেখ, পাকা হাতে, কাঁথায় যেমন ছুঁচের ফোঁড় পড়ে, ছোট ছেলেটির নগ্ন শরীর তেমনি করে জলে ফোঁড় কেটে কেটে এগিয়ে যায়। যেন জলের মাছ না পোকা। মাঝ খালে গিয়ে ফিরে তাকায় পাড়ের দিকে। বুড়ি তখন ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ছেলেটি ফিরে আসতে আসতেই, সলিমা ছুটে গিয়ে গামছা নিয়ে আসে। ইন্দুর পোলাটাকে দেখে তখন তার চোখে সমীহ। নাকের নোলকটি দুলিয়ে হাসবে কি হাসবে না, ভাবছে। তারপরেই নানীর কাপড় ধরে চিৎকার করে ওঠে, 'নানী, জোঁক জোঁক।'

হ্যাঁ, গুটি তিনেক ছোট ছোট কালো জোঁক ছেলেটির পায়ে, গায়ে কুচকির কাছে ধরেছে। নানী গামছা নিয়ে, আগল পেরিয়ে এগিয়ে আসে। ছেলেটির মাথায় গামছা ফেলে, টেনে টেনে জোঁক খুলে দেয়। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলে, 'আ আমার সোনার চাইন্ জোঁকে খাইয়া ফালাইছে।' তারপরে গামছা টেনে নিয়ে, নিজের হাতে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এমুন সোন্দর সাঁতার জানো ছাও, তোমারে শিখাইল ক্যাটায়?'

ছেলেটি বলে 'বাবায় আগে আগে, তারপরে আপনে আপনে।'

ইতিমধ্যে ও প্যাণ্ট গলিয়ে নিয়েছে। জামাটাও পরে নেয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখে, পয়সা দুটো আছে কি না। কিন্তু তখনো ওর চোখে সন্দেহের ঘোর। বলে, 'এইবার ডিঙ্গা দ্যান।'

বুড়ি ওর মাথার জল গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে শোষে। বলে, 'দিমু রে সোনা। কতক্ষণের লেইগা নিবি?'

'এক ঘণ্টা।'

বলেই পকেট থেকে চকচকে তামার পয়সা দুটো বুড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরে। কোষা ডিঙ্গা ঘণ্টায় দু' পয়সা ভাড়া। তামার ঝলক বুড়ির লাল টুকটুকে ফোকলা ঠোঁটে। বলে, 'সলিমা, বৈঠাখান আইন্যা দে।'

সলিমা তখন এক পায়ে খাড়া। নানীর কথামাত্র দিলো ছুট। নানী পয়সা দুটো নিয়ে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'তোমাগো বাড়ি কই?'

ছেলেটির ব্যাকুল চোখ তখন উঠোনের দিকে। রাক্ষুসীটা বৈঠা নিয়ে আসে না কেন। বেলা যে যায়। রোদের রঙ যেন লাল লাল দেখায়। নানীকে জবাব দেয়, 'এ্যাকরামপুরে।'

'আগে নি আইছ এইখানে? ডিঙ্গি নি বাইছ?'

'দুইবার বন্ধুগো লগে।'

'এইবার যে সোনা একলা? পারবা নি?'

ছেলেটি জোরে ঘাড় কাত্ করে। সলিমা দু-হাতে বৈঠা নিয়ে আসে। ছেলেটি ছোঁ মেরে তুলে নেয়। ছুট দিয়ে নামে ঢালুতে, লাফ দিয়ে কোষা ডিঙ্গায়। বুড়ি বলে চেঁচিয়ে, 'খুটার কঞ্চিখান লইয়া যাও, লগির কাম দিবো। যাইবা কোন্ দিকে?'

'গ্যান্ডাইরা।'

মনের কথা নয়, মিথ্যা কথা বলে। বুড়ি বলে, 'কিনারে যাও, ডাঙায় লগি মারতে পারবা।'

ছোট হাতের একটু টানাটানিতেই কঞ্চির লগি খুলে যায়। সেটা ডিঙায় রেখে, বৈঠা দিয়ে ডাঙায় ঠেলা দিয়ে, ভেসে যায় অনেকখানি। পুলের ওপর থেকে খালের যে বাঁধ দেখা যায়নি, ঢাকা ছিল কচুরিপানায়, তাই এখন দেখা যায়। কালো একটা গা চকচকে সাপের মতো, বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে পুবে। কচুরিপানার যত ভিড়, সব ডান দিকে, সীতানাথের আখড়ার মাঠে। মাঠে নানান খেলার ভিড়। ভলি, লাঠি, চু কিত্‌কিত্ আর রিঙ। ওখানেই বা ওর কত বন্ধুরা রয়েছে, কে জানে। তবে অনেক দূর, কচুরিপানার একটা কালো সবুজের লকলকে রাজ্য রয়েছে মাঝখানে। জলের দিকে ওদের কারুর দৃষ্টি নেই।

সবাই যখন তীরে, সবাই যখন মাঠে খেলছে তখন এই ছোট মাঝিটি কোথায় যায়। কোন্ দরিয়ায় সে পাড়ি দেবে। মা ডেকেছিল পিছু পিছু। বাড়া ভাত বুঝি এখনো পড়ে রইল। এই আসে এই আসে করে মা হেঁসেলে তুলে রাখতেও পারছে না। কিন্তু সে যে এখন মাঝি হয়ে বৈঠা টানে, তরতরিয়ে ভেসে যায় দোলাই খালে, মা তা জানে না। এ মাঝি শুধু জানে, সে খাল দিয়ে যাবে বুড়িগঙ্গায়। সেখানে কী আছে?

সেখানে আছে অথৈ জল বুড়িগঙ্গা। আর কী? ওপারে ইঁটের ভাটা, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ওঠে। এপার থেকে মনে হয়, ইঁটের ভাটা লালে লাল। আর কিছু না? হ্যাঁ, শশা ক্ষিরাইয়ের খেত, মটর কলাইয়ের মাঠ। আকাশের কোনো শেষ নেই। কেন, ওই সবে কী আছে। সবাই যখন শত খেলায় মেতে, একটু পরে সবার যখন বাতি জ্বালিয়ে পড়তে বসার সময়, বাড়া ভাত পড়ে থাকে পিছনে, তার ওপরে অনেক

রক্তচক্ষু শাসন পীড়ন, সব ভুলে তুই বুড়িগঙ্গায় কেন যাস্ ডিঙ্গা বেয়ে। খেলার আনন্দ না হয় নেই। ক্ষুধাও কি তোকে ছেড়েছে। ক্ষুধা যদি বা ছাড়ে, কোনো ভয়ও কি নেই। কী সুখ তোর খাল দিয়ে বুড়িগঙ্গায় যাবার। কিসের খোঁজে।

ও তা জানে না। ওর চোখে তখন দোলাই মোহনার অথৈ বুড়িগঙ্গা। বাঁক পেরিয়ে ও ততক্ষণে, সোজা পুবে নেমে চলেছে। ক্যাপটেন কুক, কলম্বাস ওর পড়া, কিন্তু তাঁরা ওর মাথায় নেই। সেখানে ওর আবিষ্কারের কিছু নেই। কী এক অচিন আনন্দ যেন বুড়িগঙ্গার বুকে রয়েছে। ডিঙ্গা বেয়ে সেই মোহনায় না গেলে, তা যেন জানা যাবে না। ওর চোখে কেবল বুড়িগঙ্গার ঢেউ।

কিন্তু ডিঙ্গার তলায় যেন কেউ থাবা দিয়ে আঁচড়ায়। উলটো টানে ঠেলে নিতে চায়। মনে পড়ে, বুড়িগঙ্গার স্রোত আসছে, তারই টান। বুড়ি ঠিক বলেছিল, 'কিনারে কিনারে যাও, ডাঙায় লগি মারতে পারবা।' মাঝি নয়া, বৈঠা তার কথা শোনে না। ডিঙ্গা তো মাতাল। মাথা একবার বাঁয়ে যায় তো বাঁয়েই ফেরে, ডাইনে তো ডাইনেই। কষ্টেসৃষ্টে পাড়ের কাছে নিয়ে, লগি তুলে খোঁচা মারে মাঝি। বুড়িকে বলেছিল, গ্যাণ্ডারিয়া যাবে। এখন দেখ, গ্যাণ্ডারিয়া বাঁয়ে, ডাইনে কলুটোলা। ঘাটে ঘাটে মেয়ে-বউয়েরা গা ধোয়, বাসন মাজে। কলুটোলর দিকেই অনেক শান-বাঁধানো ঘাট, পুরনো পুরনো মন্দির। মস্ত মস্ত বট গাছ। তার ওপারে গ্যাণ্ডারিয়া নতুন গজাচ্ছে। জলে ঘাট মন্দির আর গাছের ছায়া যেখানে পড়ে, সেখানেই যেন আচমকা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ছেলেটির চোখে তরাস ফোটে। ঝুঁকে পড়ে, শরীর বাঁকিয়ে লগিতে দেয় ঠেলা। পাখির দল বেশী ডেকে উঠলেই, মন আনচানিয়ে ওঠে। বেলা বুঝি যায়।

বিকেলের ঘাটে, পুরুষদের আনাগোনা কম। ঘাট এখন মেয়েদের এক্তিয়ারে। নয়া মাঝিটাকে তাদের লজ্জা নেই। তারা জল ছোঁড়াছুড়ি করে কলসী আড়াল দিয়ে। খিলখিল করে হাসে। পা দাপিয়ে দাপিয়ে সাঁতার কাটে। এমন কি নয়া মাঝিকে ডাক দিয়ে বলে, 'অই ছ্যাম্‌রা, কই যাস?'

ছ্যাম্‌রা বলে ছোঁড়াকে। ছোঁড়ার তখন মস্‌করা নেই মনে। ও ডিঙ্গার তাল সামলায়, চোখে বুড়িগঙ্গা ভাসে। তবু যখন শান-বাঁধানো পৈঠায় দাঁড়িয়ে, গাছকোমর বাঁধা শাড়িতে, খালি গা মেয়েটা এক পায়ে ধিন্ ধিন্ করে নাচে আর বলে, 'ওই ছ্যাম্‌রা বান্দর, তর মায় সোন্দর। কলাগাছে বল্লার চাক, ঘুইরা ঘুইরা বাপ ডাক।' তখন আর সে নিজেকে তেমন নির্বিকার রাখতে পারে না। একবার হাত তুলে থাপ্পড় দেখায়। বোঝে না, তাতে ধিনধিনাকি মেয়েটার নাচন বকন আরো বাড়ে। মেয়েটা একনাগাড়ে বলে যেতেই থাকে। ছোঁড়াটা বাঁদর, তার মা সুন্দর। কলাগাছে কি আবার বোল্‌তার চাক থাকে নাকি। আর তা না হয় হবে, শুধু শুধু ও ঘুরে ঘুরে বাপ ডাকতে যাবে কেন। আর ডাকবেই বা কাকে। নয়া মাঝি তাই মনে মনে বলে, 'পেত্‌নীটা যেন মরে।'

মনে মনে রাগ হলেও, তা মন জুড়ে বসতে পায় না। লগির খোঁচায় খোঁচায় ও টেনে এগোয়। দেখ, মুখে রক্তের বান, সারা গায়ে ঘাম ঝরে। কিন্তু লাল রোদটুকু যে কোথায় হারিয়ে যায়। লাল শুধু আকাশটাই থাকে। অথচ গ্যাণ্ডারিয়ার খেয়াঘাট পেরিয়ে, ডিঙ্গা তখনো সুত্রাপুরের বাজারের কাছে। সামনে লোহার পুল। চওড়া বড় ঝোলানো পুল, তার ওপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলে। পুল পেরিয়ে আবার একটা বাঁক। কিন্তু পুলের তলায়, টান পেরোতে পেরোতেই, আকাশের লালে কালিমা দেখা দেয়। ছোট ছেলেটির চোখেও কালিমা নেমে আসতে চায়। জলের তলায় কাদের যেন বড় বড় থাবা, ডিঙ্গার তলায় খামচাতে থাকে। টেনে ছিটকে নিয়ে যেতে চায় পিছনে। অথচ, ওই তো সামনে, বাঁয়ে ফৌজী ব্যারাক, ডাইনে মালাকারপাড়া। মালাকারপাড়ায়

বন্ধু বিলটু থাকে। ওদের পুরনো শ্যাওলা ধরা ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো, দূরের বুড়িগঙ্গাকে অনেকবার দেখেছে।

ডান দিকের ডাঙায় এখানে কয়েকটা জেলে নৌকা নোঙর করেছে। বুড়িগঙ্গায় মাছ ধরে, খালে ঢুকে, রাত্রিবাস করে। মাঝিরা হুঁকো টানছে, জাল বুনছে। ছোট মাঝিটিকে কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু তাদের কৌতূহল নেই, জিজ্ঞাসাবাদ নেই, ধমকধামক নেই। মাঝিটিকে বোধ হয় নয়া বলে চিনতে পারছে না। কে যেন আবার গেয়ে ওঠে, 'হায়, কী করিলি বিষ্ণুপিয়ে নিমাইচান্দকে বিদায় দিয়ে—এ-এ-এ-হে-হে-ই!'...

কানে আসে, তাই শোনা। ছোট মাঝিটি ঝোলানো পুল পেরিয়ে, ফৌজী ব্যারাকের ডাঙা ছুঁয়েছে। এবার ডান দিকে বাঁক, ছোট বাঁক। তারপরে বাঁক নিলেই, বুড়িগঙ্গা। কিন্তু তার আগেই দেখ, মালাকারপাড়ার গাছের ঝুপসিতে, ঘাটে ঘাটে অন্ধকার নামে। ব্যারাকের পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে। ছোট মাঝিটার এক ঘণ্টা কত মিনিটে। ঘণ্টা মিনিটে সেকেন্ডে পলের অঙ্ক কি কষা হয় না। বুড়ি নানী, ডিঙ্গার মালিকানীর মুখখানি বুঝি এখন আর মনে নেই। কেবল বুড়িগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা।

নয়া মাঝি থামে না, সে চলে লগি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। এই ডাঙাতে একটা ভয়, ব্যারাকে নাকি গোরা আর গাড়োয়ালীরা থাকে। বিলটু বলেছে, ওরা কাউকে এপারে দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু দেখতে পাবে কী? সে তো উঁচু পাড়ের অনেক নিচে। আর একটু, আর একটু। তখন একবার মনে পড়ে, একবার দেখা ঢাকেশ্বরীর প্রতিমার কথা। ধানমণ্ডাইয়ের মাঠ পেরিয়ে, সেই আশ্চর্য মন্দিরে যে প্রতিমা আছে। যাকে বললে, সব আশা পূরণ হয়।

ভাবতে ভাবতেই, সহসা যেন কী ঘটে। ডিঙ্গাটাকে কে যেন সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলে। হাতের লগি হাতে থেকে যায়। তলায় তলায় যেন কারা হাত দিয়ে ডিঙ্গা এগিয়ে নেয়। মুহূর্তে ছোট বাঁকটি ঘুরে যায়, আর একটু দূরেই, দিগন্ত খোলা। কলকল ছলছল শব্দ। কিন্তু বুড়িগঙ্গা কোথায়। ওপার কোথায়।

দেখা যায়, অস্পষ্ট ছায়ার মতো। অন্ধকার পলে পলে বাড়ে। দূরের ওপারে কেবল একটি আলোর বিন্দু। হয়তো ইঁটের ভাটায় জ্বলে। আর, আলো নেই, তবু বুড়িগঙ্গার বুকে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কোথাকার কোন্ আলো যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। সেখানেই যে সে যেতে চেয়েছিল। অথচ অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। আকাশে কখন কয়েকটি ঝিকিমিকি তারা জ্বলেছে।

কিন্তু ডিঙ্গা টেনে নিয়ে যায় কে। মোহনা ডাইনে, যেদিকে সদরঘাট গিয়েছে, সেখানে কয়েকটা মাস্তুলের ছায়া। দু' একটা মিটি মিটি বাতি। ডিঙ্গা টেনে নিয়ে যায় কে। নয়া মাঝি বৈঠা নিতে ভুলে যায়। বাইতে তার আর মনে থাকে না। তার ছোট মস্তিষ্কে কোনো কার্যকারণের বোধ নেই। ডিঙ্গা ভেসে যায় কুটার মতো।

তারপরে সহসা আকাশ কাঁপানো হাঁক, 'সামাল, সামাল!'

নয়া মাঝির বুক ধড়াসে যায়। সামনে তাকিয়ে দেখে, প্রকাণ্ড এক কালো ছায়া, এগিয়ে আসছে তার ছোট্ট কোষা ডিঙ্গার ওপর। কথায় বলে, কোষাকুষি, তার থেকে জল নিয়ে তর্পণ করা চলে। যখন সে ডিঙ্গা হয়, তখন সে হাঁ-দরিয়ায় মোচার খোলা। বুড়িগঙ্গার বুকে যাবে যে, তার মাথায় কিছুই ঢোকে না। সামনের প্রকাণ্ড কালো ছায়াটাই ওকে গিলতে আসে, না কি সে-ই তরতরিয়ে তার কালো হাঁ-এর মধ্যে চলে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

আবার চিৎকার। এবার কয়েকজনের একসঙ্গে। তারপরেই ঠক্ করে কী যেন একটা ডিঙ্গায় এসে পড়ে। পড়েই, ডিঙ্গা ঠেলতে থাকে একপাশে। ঠেলতে ঠেলতে,

কালো ছায়াটার কাছ থেকে সরিয়ে দেয় অনেক দূর! গলা শোনা যায়, 'কে হে তুমি ব্যাতরিবত্ লোক। নাও বাইতে জানো না?'

আর একজনের গলা শোনা যায়, 'একটা ছোট ছ্যাম্‌রা দেখি ডিঙ্গায়।'

আগের গলা, 'জিগাও তো, যায় কই।'

পরের গলা, 'কে হে তুমি, যাওন কোন্‌খানে?'

তখন নয়া মাঝি বুঝতে পারে, কালো ছায়াটি প্রকাণ্ড এক নৌকা। হাতীর মতো তার ছইয়ের পিঠ। তার কোষা ডিঙ্গা যে টানে চলেছিল, সেই টানে ধাক্কা লাগলে, এতক্ষণে মোচার খোলা ছত্রখান। তাই লম্বা লগি দিয়ে ঠেলে মাঝিরা সরিয়েছে। নয়া মাঝি এবার জবাব দেয়, 'ডিঙ্গাটা আপনেই যায় গা, আটকাইতে পারি না।'

'সব্বনাশ!' প্রথম গলাটাই আবার শোনা যায়, 'কাগো পোলা তুমি। নদীতে ডুববার চাও নাকি, আঁ? শীগ্‌গির লগিটা ধরো।'

নয়া মাঝি তখন বড় নৌকার লগিটা চেপে ধরে। মাঝিরা টেনে বড় নৌকার কাছে নেয়। জিজ্ঞেস করে, 'দড়ি আছে নি?'

নয়া মাঝি তার ডিঙ্গার দড়িটা বাড়িয়ে ধরে। একজন দড়ি নেয়। আর একজন হাত বাড়িয়ে বলে, 'আইয়ো।'

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দিতেই একজন তাকে বড় নৌকায় টেনে তোলে। তুলে একেবারে ছইয়ের ওপরে পাঠায়। সেখানে হাল মাঝির কাছে তাকে বসায়। ছেলেটি দেখে, মাঝিরা ডিঙ্গা বেঁধে নেয় বড় নৌকার গায়ে। তারপরে ছইয়ের ওপরে আসে বাতি। চার মাঝিতে বাতি তুলে তাকে দেখে। নয়া মাঝিটির নজর তখন পূবে। যেখানে বুড়িগঙ্গা হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। চোখে তার অন্ধকার। জল আসে কি না আসে। ভাবে, 'এ যাত্রা হলো না। আবার কবে হবে কে জানে। দু' পয়সা নয়, এবার চার পয়সা চাই। দু' ঘণ্টার কমে হয় না। আর—আর—আর—পাঠশালার ছুটির পরে নয়, আগে। পাঠশালা পালিয়ে।'...

ইতিমধ্যে মাঝিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। কাদের ছেলে সে, কোথায় যাবে। ভয় নেই, শীত নেই, মানিষ্যি কি না হে তুমি। একে একে সব কথার জবাব দেয় ছেলেটি। মাঝিরা বকা-ধমক করে, আবার খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসে, হুঁকা টানে। জানায়, তারা যাবে শহরের নবাবপুরের কাছে, মালপত্র বোঝাই করতে। বুড়িগঙ্গায় যেতে-চাওয়া মাঝিটির কপাল ভালো, এদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে।

এখন নৌকা চলেছে, বুড়িগঙ্গার স্রোতের টানে। তবু হাল মাঝি বুড়া বলে, 'জনা দুইয়ে দাড় মার হে, পোলাটারে আউগাইয়া দেও আগে।'

ছোট ছেলেটি চিনতে পারে না, এরা হিন্দু না মুসলমান। হাল মাঝিটির দাড়ি-ভরতি মুখ। হাসে কি না বোঝা যায় না। ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকা টানে, আর এক নজরে তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। চোখ দেখলে অনেক সময় হাসি বোঝা যায়। ছেলেটির মনে হয়, হাল মাঝি যেন হাসে। তারপরে এক সময়ে হাল মাঝি যেন রহস্য করে জিজ্ঞেস করে, 'কই যাইতে চাইছিলা বাসী?'

'বুড়িগঙ্গায়।'

'বুড়িগঙ্গার কোন্‌খানে?'

'বুড়িগঙ্গায়।'

এর বেশী সে বলতে পারে না। বলতে জানে না। মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যান্, কী আছে হেইখানে? কিসের খোঁজে?'

'জানি না।'

'জানো না?'

বুড়ো মাঝি খল্ খল্ করে হেসে ওঠে। অন্য মাঝিদের হেঁকে বলে, 'শোন, পোলায় কই যায়, কী চায় জানে না।'

সকলেই হাসে। কিন্তু কেউ খবর রাখে না, ছেলেটির বুকে তখন কত অন্ধকার। তেমন অন্ধকার তখন দোলাই খালে, বনে, গাছে, মন্দিরে, ঘাটেও নামেনি। বুড়িগঙ্গার ঢেউয়ের ওপরে তখন কেবল কতগুলো মুখ। বাবা, মা, দিদি, মাস্টারমশাই। আঃ, যেন বুকের মধ্যে বেত্রাঘাত। ধুকধুকিতে ঢেঁকির পাড়।

টানে টানে, অল্প সময়েই নানীর ঘাটে এসে ওঠে। নানী তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে, বাতি নিয়ে ঘাটের ওপরে বসে। বগলের কাছে সলিমার মুখে আলো পড়েছে। ছেলেটির শঙ্কা, বুড়ি এবার বাড়তি পয়সা দাবি করবে। এক ঘণ্টা তো কখন কাবার। পাড় থেকে বুড়ির গলা ভেসে আসে, 'অ মাঝিরা, কোষাডিঙ্গা লগে, এক পোলারে নি দ্যাখছ?'

বড় নৌকা তখন বুড়ির ঘাটের কাছে, লগি ঠেলে দাঁড়িয়েছে। হাল মাঝি জবাব দেয়, 'ধইরা লইয়া আইছি। পোলায় তো আইজ বুড়িগঙ্গায় যাইতো।'

ছেলেটি ততক্ষণে কোষাডিঙ্গার নেমে আসে। বুড়ি বাতি নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোয়। মুখে বলে, 'অয় আল্লা গো, এই পোলারে কি জিনে ধরছে।'

ছেলেটির গায়ে আলো পড়ে। সে ডিঙ্গা থেকে নেমে, কঞ্চির লগি কাদায় পোঁতে। ডিঙ্গার দড়ি বেঁধে দেয়। কিন্তু বুড়ির দিকে চায় না। বড় নৌকা লগি তুলে, পশ্চিমে চলে যেতে থাকে। মাঝিরা তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। বুড়ি এসে ছেলেটির হাত ধরে। নয়া মাঝির হাল তবিয়ত তখন খুবই খারাপ। সলিমার চোখের পাতা পড়ে না। ইন্দুর পোলাটারে সত্যি জিনে পেয়েছে কি না, তার সুরমা-টানা চোখে তখন সেই জিজ্ঞাসা। নয়া মাঝি বলে, 'নানী, আমার পয়সা নাই।'

নানী অবাক মানে। বলে, 'পয়সা? পয়সার কী কাম?'

'আপনের ভাড়ার পয়সা।'

বুড়ির গলায় তখন স্নেহ বিদ্রূপ হাসি, সকলে মিলে খেলা করে। বলে, 'আরে আমার হজরত রে, তর পয়সার লেইগা নি বইয়া রইছি? দুধের পোলারে ডিঙ্গা দিছি, জলে ডোবে না সাপে খায়, হেই চিন্তায় মরি। তর বাপ মায়ের কী জান রে, তারা না জানি কী করতে আছে। বাড়িত নি যাইতে পারবি?'

বাপ-মায়ের কথা উচ্চারণ মাত্রই, বুকে যেন শেল হেনে যায়। ও কোনো রকমে বলে, 'পারুম।'

বুড়ি তৎক্ষণাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, 'তবে যা গা।'

নয়া মাঝি যেমন ছুটে এসেছিল, তেমনি ছুটে যায়। পথে পথে দোকানে দোকানে বাতি। গাড়িতে বাড়িতে বাতি। ডিঙ্গার খোঁজে যাবার বেলায়, রোদ যত বাড়ন্ত মনে হয়েছিল, এখন ফেরার বেলায় সন্ধ্যারাত্রিকে যেন মাঝরাত্রি দেখছে। বড় রাস্তা থেকে গলির মুখে এসে, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ। স্বয়ং ঢাকেশ্বরীর ওপরেও যেন ভরসা রাখা যাচ্ছে না। গলিতে ঢুকতেই, এক জানালায় আলো। সেখানে তখন পড়া চলছে। সকলের খেলা কখন ভেঙেছে। ঘরে ঘরে সবাই বই খাতা নিয়ে পড়তে বসে গিয়েছে। আর ও এখন ফিরছে। গায়ে ওর এখনো দোলাইয়ের জলের গন্ধ।

আর একটু ঢুকতেই, সাড়া পড়ে যায়। প্রথমে চোখে পড়ে এক প্রতিবেশীর। তারপরে আর এক প্রতিবেশীর। ছেলেটির নাম ধরে সবাই বলে, 'আইছে, আইছে!' যার অর্থ, খোঁজাখুঁজি অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। তারপরেই, একটা দোতলা বাড়ির থেকে একটি আলো ছুটে আসে। দিদি! তার পিছনেই মা! গেল গেল, নয়া মাঝির প্রাণটা বুঝি ভয়েই যায়। মায়ের গলা শোনা যায়, 'কই, দেখি কই ও?'

তারপরেই ঠাস্ ঠাস্, 'আরে যম রে, আরে মরণ রে, তর মুণ্ডু রাখুম না।'

যেন মুণ্ডু বলি দেবার জন্যেই এত খোঁজাখুঁজি, হা-হুতাশ। মা আর দিদির কথাবার্তাতেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যে থানায় খবর দেবার কথা চিন্তা করা হয়েছে। দরজার কাছেই, ছোট আদালতের বিচার শুরু হয়। আসামীকে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে কি না। মায়ের অভিমত, না। সন্ধ্যা-আহ্নিক করে উনি এখন একটু মহাভারত নিয়ে বসেছেন। ওঁর কাছে কাল সকালে হাজির করলেই হবে। দিদির অভিমত, তা নয়। উচ্চ আদালতের সাজাটা এই রাত্রেই হোক, ওর ইচ্ছা। শেষ পর্যন্ত মায়ের কথাই থাকে। দিদি আসামীকে নিয়ে উপস্থিত করে পড়ার ঘরে, যেখানে মাস্টারমশাই রয়েছেন, আর মেজদা। মেজদার চোখে রাগ না ঘৃণা, বোঝা যায় না। সেই রকম একটা কিছু। ওর নাকের পাটা ফোলানো। ওর হাতে শাস্তির ভার থাকলে, ডগলাস ফেয়ার ব্যাংকস-এর তামেচা কাকে বলে, বুঝিয়ে ছাড়তো। তারপরে কবুলের পালা। কবুল করতেই হয়, কেবল বুড়িগঙ্গার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। কবুলের পর হাত-মুখ ধোয়া। তারপরে, মাস্টারমশাইয়ের সামনে ঠ্যাঙ ফাঁক করে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। হায় মাঝি, পাপের কী ভরাডুবি!

কিন্তু কেউ কি জানতো, কান ধরে যখন দাঁড়িয়ে, তখন ওর চোখে বুড়িগঙ্গার ঢেউ। রাত্রে খেয়ে যখন দিদির পাশে শোয়, বাতি নিবে যায়, ওর ঘুম-জড়িয়ে-আসা চোখে বুড়িগঙ্গা ভাসে। হাল মাঝির হুঁকার শব্দ আর জিজ্ঞাসা, 'কী আছে সেখানে, কিসের খোঁজে?'...

আজ, এখন **ইছামতী** পার হয়ে চলেছি, এক অচেনা গ্রামের পথে। সেই ছেলেটিকে দেখি, আমার রক্তে, আমার প্রাণে, আমার মন জুড়ে বসে। এই যে দরবেশ পুছ করে, 'আপনি কোথায় বেররেছেন, কিসের খোঁজে।' কী জবাব দেবো ওকে। সেই ছেলেটি বলতে পারেনি। আমিও পারি না। তখন সেই ছেলেটির চোখ জোড়া ছিল রূপের তৃষ্ণা। বুড়িগঙ্গার রূপ, ওপারের রূপ। আজও তাই দেখি, দু' চোখ ভরা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। কিন্তু কিসের খোঁজে, সেই অরূপের কী নাম, কে জানে। বেরিয়েছি অনেক কাল, চলেছি কালান্তরে। এখন ভাবি, এই মানুষ আর প্রকৃতির রূপের হাটে, অরূপের নাম যদি দিই, মনের মানুষ, তবে কেমন হয়।

কিছু হয় না। কেবল বলতে হয়, কোন্ মানুষে, সেই মানুষ আছে! থাকে কোথায়! চলে কোন্ আজবের কলে। দরবেশকে কিছু বলতে পারি না।

হঠাৎ হাঁক ওঠে, 'এই যে মামুদ গাজী একটু নাম হবি নাকি?'

দরবেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। আশেপাশে ঘর। বিরাট বটগাছের নিচে ছায়ায় মুদীর দোকান। দোকানী ডাক দিয়েছে। আরো দু-একজন গাছের নীচে উটকো হয়ে বসে। এতক্ষণ যাকে জানা ছিল দরবেশ বা সাঁইবাবা বলে। সেটা অবিশ্যি নিজের মনে মনে জানা। আসল পরিচয় জানা গেল, ইনি মামুদ গাজী।

গাজী ডুপ্‌কিতে ডুপ্ ডুপ্‌কি শব্দ তুলে বলল, 'তা হবি নে কেন। নাম নিয়ে তো বেরিয়েছি।'

আমাকে ডাক দিয়ে বলল, 'আসেন বাবু, আপনাকেও একটু শোনাই।'

বলে গাজী ঝোলা থেকে বের করল ঘুংগুরের গোছা। সেটা জড়াল বাঁ হাতের আঙুলে। ডান হাতে ঠোকা দিল ডুপ্‌কিতে। অনেকটা ছড়া কাটার মতো শুরু করল, 'আমি গুরু করব শত শত, মন্ত্র করব সার। যার সঙ্গে মন মিলবে দায় দিবো তার॥'...

দু' কলি আওড়াবার পর খানিকক্ষণ চললো ডুপ্‌কি ঘুংগুরের তাল মেলানো।

বোধ হয় একেই বলে আসর জমানো। ডুপ্‌কিতে যে এত রকমের বোল ফোটানো যায়, আগে জানা ছিল না। তাও ওই শ্রীহস্তে। আঙুল তো নয়, মরচে পড়া লোহার ডান্ডা। বোধ হয় ঘা দিলে পাথর ভাঙে। আর ডুপ্‌কির চামড়া তো সামান্য। কিন্তু সামান্য পল্‌কা মিহি চামড়াখানি দেখছি গোদা আঙুলের প্রেমে মজেছে। একবার ভাব দেখ।

তা হবে। কাঁটা গাছে ফুল ফোটে। তার রূপ দেখে মরি, গন্ধে ভোমরা হতে সাধ। এই বিকট কিম্ভূত পাথরের চাংড়া! দেখ গিয়ে, তার গায়ে কেমন হরেক রঙে সুন্দরী ফুল ফুটে আছে। কার রসের ধারা কোন্ বিজনে বহে, কে জানে। অধম মাঝি-মামুদগাজী, গাজীর হাত-পলকা ডুপ্‌কি, কাঁটা গাছ-রূপের ফুল, পাথর চাংড়া-সুন্দরী ফুল, এদের মিলজুলের রসের ধারা কোন্ বিজনে বহে, কে জানে। কিন্তু গাজী বাবুকে কেন বিপদে ফেললে। গ্রাম জুড়ে সে তার আসর বসাক। বাবু যাক তার আসরে। গাজী আছে মহাপ্রাণীর ধান্দায়, মুরশেদের নামের মজদুরি করবে সে। বাবুর তো কোনো খোঁজই জানা নেই। বাবুর বরং সেই জানাতেই যাওয়া ভালো ছিল। ভালো ছিল আরো এক কারণে। গাজী তো দু' হাত তুলে বাজাচ্ছে, মাথা নিচু, চোখ বোজা। মাঝে মাঝে পিছনের বাবরিতে ঝটকা লাগছে। এদিকে শ্রোতার দল বাবুর দিক থেকে চোখ সরাতে পারে না। বাবুর রূপ দেখে নয়। মানুষ কে, যায় কোথায়, গাজী কেন গান শোনাতে চায়, এখানে কেন। ঘুরে ফিরে, চোখে চোখে সেই এক কথা। নৌকাতে যেমন গাজীর ছিল।

কিন্তু তার আগ এদিকে শোনো, গাজী কেমন তাল ধরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে শিরদাঁড়ার কাছে কোথায় একটা তাল অনুভব করছিলাম। ওদিকে বটতলায় একজনের কোমরে দোলানি লেগে গিয়েছে। আমার কোমর দোলেনি। পায়ের আঙুলে তাল শুরু হয়েছে। ভিতরে জোড়া তাল লেগেছে। সর্ব অঙ্গ ফাঁকি দিলেও, পায়ের আঙুল মানেনি। তারপরেই আকাশের দিকে মুখ করে, গাজি সুর করে হাঁক দিলো, 'ওহে দেল আমারে বলে দ্যাও না...।'

ইতিমধ্যে আসরে অনেক শ্রোতা জুটে গিয়েছে। অধিকাংশই এল ছুটে। তারা কেউ দিগম্বর, কেউ দিগম্বরী। ভিড়ের মাঝে এসে পড়ে, তখন হাত চাপা দিয়ে লজ্জা ঢাকাঢাকি। বোধ হয়, ওদিকে খেলাঘরের ভাত ফুটে যায়। ছেলের বিয়ে আটকে থাকে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার মুখেই ডুপ্‌কি ঘুংগুরের ডাক পড়েছে। কচি কচি হাতে পায়ে মুখে রাজ্যের ধুলা কাদা, তবে সকলেরই শরীর একেবারে হাট করে খোলা নয়। কারুর কারুর ফ্রক ইজের জামা মায় পাঁচহাতী ডুরে শাড়ি জড়ানো পাকা গিন্নীটিও আছে। তাদের সংগে বড়রা এল হেঁটে হেঁটে। আঃ ছাওয়ালগুলোনে সবোত জানে না। বটতলায় গাজী মামুদের আসর। এই-ই সব নয়। আসর আছে আরো। একটু চোখ তুলে দেখতে হবে। হ্যাঁ, ওই যে, বেড়ার ফাঁকে, দাওয়ার নিচে, গাছগাছালির আড়ালে, ডাগরীদের চোখ যদি বা দেখে থাকো, ঘোমটা সরতে দেখা যায়নি। ওই রকম কেরামতি। নজর যদি বা চলে, আসল ভাঙতে পারবে না। তার মানে কেবল খেলাঘরের ঘরকন্নাতেই বেয়াজ পড়েনি। গেরস্থের ঘরকন্না এখন মামুদ গাজীর লুটের মাল। পড়শিনীদের ঘোমটার ফাঁকে চোখের ঝিলিক হাসির ছটা দেখেই বোঝা যায়, ঘরকন্নার দম ফাঁপরে, গাজী পেড়ে এনেছে নীল আকাশ। গায়ে দিয়েছে এই প্রথম শীতের বাতাস। গাজী বৃন্দাবনের কালা নাকি।

না, মুরশেদ নামের মজুরা। তার চড়া গলায় তখন একটু চাপ লেগেছে। তাল মিলিয়ে গাইছে,

'এখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই।
যার তরে মন খেদে প্রাণো কান্দে সব্বোদাই।।॥
ওহে দেল-ল্-ল্-ল্'

গান থামিয়ে তাল দিতে দিতেই, হাঁক দেয়, 'কেউ যদি জানেন, তয় বলি দ্যান।' দেল মুরশেদ নয়, বটগাছের তলায় যদি কেউ জানেন, গাজীর মনের মানুষ কোথায়, তা হলে বলে দিন। কিন্তু প্রস্তাবনায় ছিল, 'গুরু করবো শত শত মন্ত্র, করবো সার।' এ গান যে সে গান নয়, তা বোঝা যায়। বোধ হয়, সেটা ছিল তার গৌরচন্দ্রিকা। তাল দিতে দিতে গান ভেঁজেছে আলাদা। তার কথা শুনে কেউ কেউ হাসে। গাজী আমার দিকে চেয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসে। তাতে আবার একটু ধন্দ ভাবের ভুরুর কাঁপন। গাজী যেন মন-কাজী। যেন আমাকে পুছ করে, 'বাবু কি জানেন?'

জানি না কিছুই। কিন্তু ফাটা চৌচির মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে ভুলে যাই। কেন, ওই মুখ এই সকালের নীল আকাশ না ইছামতীর আরশী-জল। কিসের খোঁজে বেরুনো, সেই কথাটাও ভুলিয়ে দেয় যেন। ওর আরশিতে কি আমাকে দেখে।

ততক্ষণে আবার শুরু হয়ে যায়,

'যার তরেতে মন ভুলেছে
আমারে বলবে কে সে কোথা আছে
তারে না দেখে যে হিয়া ফাটে
সদা মন তাপে জ্বলে যাই।
মনের মানুষ কোথা পাই।
ওহে দেল্...'

গাজী আলখাল্লা উঁড়িয়ে, মারে তিন-চার পাক। গানের শেষে ডুপ্‌কি ঘুংগুর বেজে ওঠে জোরে। তারপরে দেখ, গাজীর নিজের কোমর দোলানি। কিন্তু মুরশেদ, কত জমানার, কত মুলুকের ধুলা যে জমিয়ে রেখেছে আলখাল্লায়, তার হিসাব কে রাখে। শহর হলে বলা যেত, ছ্যাকরা মোটর চলে গেল।

আবার গান,

'তারে দেখা পাবার আশে,
কত করি খুঁজি বেড়াই দেশে বিদেশে।
দেখি, কতখানে কত জনে,
(দেল্) তার দেখা না পাই।
যারে পুছি তার কথা রে,
ঘোলায় পড়ে সে জন ঘোরে, বলতে নারে।
বলে আমার প্রাণ জুড়াবে,
এমন ব্যথার ব্যথী কেহ নাই।
এখন, মনের মানুষ কোথা পাই।
ওহে দেল্...।'

এবার গানের শেষে আর পাক মারা নয়। গাজী যেন মাতাল হয়েছে। টলে টলে বাজায়, গান নতুন করে ধরে। গাজী তো তবু মাতাল, টলে চলে। কিন্তু শ্রোতার হাল তার বেহদ্দ। ইছামতী পেরিয়ে, ইটিন্ডার বটতলাতে সে বুঁদ। ভাবে, এমন গান কারা বাঁধে, কেন বাঁধে, কথাগুলো পায় কোথায়। তাদের প্রাণের ভিতর কী আছে। বারেক কি উঁকি দিয়ে দেখা যায় না। হেসে বাঁধে, না কেঁদে বাঁধে, একটু দেখতে ইচ্ছা করে। একটু দেখতে ইচ্ছা করে, কার জন্যে মন খেদে প্রাণো কান্দে হিয়া ফাটে। একটু

দেখতে ইচ্ছা করে, চিনি কি না-চিনি। রূপ কেমন।

রূপ তখন হাত বাড়ানো ডুপ্‌কিতে। গান শেষ। সে কোথায়, বলতে যখন পারলেন না, এবার যা পারেন, তা দিয়ে দিন। যে গদিতে বসেছে, তার মানই বড়। নয়া হিসাবে পুরো দশ পয়সা, নেমে এসে ডুপ্‌কিতে ফেলে। ইতিমধ্যে কচি-কাঁচাগুলো সব ছুটতে আরম্ভ করেছে। বাড়ি থেকে সাজানো সিধে এনে ঢেলে দিয়ে যায় ঝোলায়। গাজী তখন আমার পাশে। সাধ্যে যা কুলায়, পকেট থেকে তুলে দিলাম ডুপ্‌কিতে। বললাম, 'ভালো লাগল বেশ। কার গান?'

মামুদ গাজীর ফাটা চৌচির মুখে তখন ঘামের দরানি। হাত উল্টে বলল, 'তা জানি না বাবু। কার কখন আজান লেগেছিল, কে জানে। যার লেগেছিল, সে-ই ডাক ছেড়েছে।'

তা বটে। ভিতর যখন ডাক দিয়েছে, তখন নামের ভনিতা মনে থাকে না। সে ডেকে খালাস, যে শোনে সে শোনে। কিন্তু কেতাবী ধাঁচের একটা মন বোঝানি আছে, নাম পেলে সে খুশি হয়। বললাম, 'চলি।'

গাজীর চোখ ফেরাবার সময় হলো না। সে তখন নিচু হয়ে ঝোলা ভরতে ব্যস্ত। আবার সেই চোখে চোখে পরিচয় কার্যকারণের অনুসন্ধিৎসা। পুবে হাঁটা ধরি। বটের ছায়ায়, একটু যেন শীত-শীতই করছিল। ছায়ার বাইরে রোদ লাগতেই তাপের আমেজ লাগে। কিন্তু দেখ, গাছের পাতার বোঁটায় বোঁটায় শীতের হানা। রস নিয়ে যায়, পাতা ঝরিয়ে দেয়। অথচ মৌল মুকুলের পাখিটা কোথায় বসে এখনো ডেকে চলেছে, কুহু কুহু। ওর কি সময়ের বোধ নেই। ঋতুর হিসাবে ও পেছিয়ে পড়েছে, নাকি তাড়া লেগেছে আগেই। এই অসময়ে কাকে ডাকছে এখন। সাড়া পাবে তো। কিংবা ইটিন্ডায় ওর মৌরসীপাট্টা, সালতামামী ব্যবস্থা আছে।

যার সম্পর্কে এত চিন্তা, সে থেকে থেকে ডেকে চলেছে। যে চিন্তা করে, সে নিজের মনেই হাসে। তবে এটা ঠিক, ওর ডাকে তেমন ফুর্তি নেই। পুচ্ছ নাচানো ঝলক নেই। এও যেন সেই 'মন খেদে প্রাণো কান্দে' অবস্থা। আর বাদবাকীদের পিক্ পিক্ কিচির কিচির শুনে বোঝা যায়, তারা এখানকার গাছগাছালির ঝোপঝাড়ের আদি বাসিন্দা। লোকে বলে ওদের বুলবুলি আর টুনটুনি, শালিক চড়ুই, দোয়েল শ্যামা। ওরা নিজেদের কী বলে, কে জানে।

একটা বুড়ো মুচকুন্দ চাঁপার পাশ বেঁকতেই প্রলয় হাঁক, কক্ কক্ কক্। ধবধবে সাদা, মাথায় লাল তাজ, আর চিবুকে লাল নুর, সব কাঁপিয়ে মোরগ দিলো ছুট। মুচকুন্দ চাঁপার গোড়ায় তখনো নখ-আঁচড়ানোর দাগ। বাদশা মহাপ্রাণীর ধান্দায় ছিলেন। আর বেয়াদপ প্রাণীটার হঠাৎ সাড়ায় চমক লেগেছে, ভয়ও পেয়েছে। তার কক্‌ককানির সঙ্গে সঙ্গেই কাছেই ঝনাত্ করে শব্দ। অবাক হবার অবকাশ নেই। সামনে পুকুর। ও-পারের পিটুলির ছায়ায়, ঘাটলায়, কে যেন হকচকিয়ে ঘোমটা টানে। আর টানতে গিয়ে, মুখ ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু অচেনা পুরুষের চোখে, গোটা পিঠখানি উদাস। পায়ের কাছে বাসনের পাঁজা।

সহবতে চলো। চোখ ফেরাও, বউ বড় লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু খিড়কী দিয়ে যাচ্ছি, না সদর দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা তো একটাই। কোনো ঘোমটা খোলা নিরালা অবকাশে যে হানা দেবার পথ ধরেছি, তা বুঝতে পারিনি। হবে হয়তো, এ ঘাট সদরেই পড়েছে। এ রকম হয়।

পুকুর পেরিয়ে আবার একটা বাঁক। একটু দূরেই ঝাড়ালো তেঁতুল গাছটার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, যত দূরে জমিন, তত দূরে আশমান। জমির রঙ পাঁশুটে। আকাশ রোদে নীলে মাখামাখি। জনমুনিষও চোখে পড়ে কয়েকজন। মাঠে ধান কাটা শুরু

হয়েছে। আর এ সময়েই, কানের কাছে শোনা গেল, 'সবাই জিগেসাঁ করে, গাজী, বাবু আনলে কোত্থিকে।'

পাশ ফিরতেই মামুদ গাজী। বাঁ হাতে ডুপ্‌কি। ডান হাতে মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে মুখ মোছা হচ্ছে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আবার শোনা গেল হাসি। তারপরে কথা, 'আমি বলি, আমি আনব কোত্থিকে। বাবু আপনার মনে বেরয়ে পড়েছেন।'

বলতেই হয় 'তাই বুঝি।'

মাথায় আবার পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'লোকের যত কথা। তা বাবু, ইদিকে কোথায় যাবেন?'

বললাম, 'সোজা।'

'সোজা!' যেন এমন অর্বাচীন কথা আর শোনা যায়নি। গাজী খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে মরে গেল।

বলল, 'সোজা কোথায় যাবেন বাবু। সোজা কি যাবার যো আছে?'

গাজীর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি চকচকে চোখ দুটিতে রহস্যের আমেজ। বললাম, 'কেন, এই তো পথ রয়েছে, মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে।'

গাজী বলল, 'কত দূর। মাঠ পার হলিই তো বডার। গিয়ে দেখবেন, ডাকিনীর মাঠ, এপারে পুলিশ, ওপারে পুলিশ।'

আবার সেই বর্ডার। আকাশের রোদ আমার মুখে ছায়া হয়ে ওঠে। খাকী রঙ, শিরস্ত্রাণ আর ডাকিনীর মাঠ দেখবার ইচ্ছা নেই একটু। কিন্তু মাঝখানের মাঠের নাম ডাকিনীর মাঠ কে রাখল। এমন অব্যর্থ নাম তো হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাকিনীর মাঠ বলে নাকি ওটাকে?'

গাজী ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'ওই হলো আর কি. একটা কথার কথা। তা বাবু, কম করি মেয়েছেলে আর ব্যাটাছেলে মিলিয়ে, গুটিকয়েক ওই মাঠে মরেছে।'

'মরেছে?'

'মরবে না? গুড়ুম-গুড়ুম গুলি মারলে বাঁচে কে?'

'কারা মেরেছে?'

'ওদিক থেকে এলি, ওদিককার সেপাইরা, ইদিক থেকে হলি, ইদিককার। কী অধম্মের বেড়াজাল দ্যাখেন।'

তাই গাজী নিজেই মাঠকে বলে ডাকিনীর মাঠ। কেতাবীতে বোধ হয় বলতে হবে, নো ম্যানস্ ল্যান্ড। তেঁতুল গাছের নিচেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ডাকিনীর মাঠে যাবো না, দেখবও না। তার চেয়ে বটের তলায়, গাজীর গান শোনা ছিল ভালো। গাজীর গানের পর, যে রকম ছোটার তাল লেগেছিল, সে তাল দেখছি. বে-তালের ছুট। তার সংগে আকাশ জোড়া নীলিমা, আর ভূমিতে নুয়ে পড়া সোনালীতে দুঃস্বপ্নের চমক। এই বেরিয়ে পড়া সকালে অধর্মের বেড়াজাল দেখতে যাব না। ওখানে শুধু সীমানা নয়। ওখানে মনের কল অচেনা, তাই মানুষ মারার কল করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঁকা পথে কোথায় যাওয়া যায়?'

গাজী যেন লজ্জা পেয়ে হাসে। বলে, 'বাবুর কী কথা! গেরামেই যান।'

এই সংবাদ দিয়েই আবার বলে, 'আমি একটা মতলব দেবো বাবু?'

জয় মুরশেদ, এখন সেটাই বাকী আছে। কিন্তু ব্যাপারখানা বুঝি না। গাজী নামের মজদুরি নিয়ে কেন গ্রামান্তরে যায় না। বাবুর পিছনে দৌড়ায় কেন। তার মহাপ্রাণীর ধান্দা কি আজ এক আসরেই শেষ।

জিজ্ঞেস করেই বা লাভ কী। ইছামতীর তলার স্রোত কোন্ বায়ে বহে, তাই দেখা যাক। বললাম, 'কী বলো তো।'

'আপনার থল জলের ভাবনা নাই তো?'

সে আবার কী। তাই যদি থাকবে, তবে বাবু ইছামতী পাড়ি দিলো কেন। পথ খোঁজে কেন। কিন্তু যদি, থল জলের ভাবনা নেই বলে, গাজী সাগর দেখিয়ে দেয়, কিংবা দক্ষিণরায়ের ভিটায়। সেই সুন্দরবনে পাক দিয়ে আসতে বলে, তবেই তো দিক্কত্। বিপদ হয়তো আছে। আপাতত সে ভাবনা নয়। কিসের খোঁজে ফেরা, তার নাম জানি না বটে, পাঠশালার পাঠ আমার জীবনে মেটেনি। সে পাঠশালার কত রূপ, কত নিয়ম, তার ব্যাখ্যা মহাভারত। সেখানে সবাই কাজের মানুষ। সবাই ঘরের মানুষ। সেখানে জীবনযাপনের জানালায় বাতি জ্বালানো। সেখানে সবাই ঘাড় নিচু করে পাঠ মুখস্থে ব্যস্ত। সেখানটাকে ফাঁকি দিয়ে জীবনব্যাপী খুঁজে ফেরার ছোটা। তবু ফিরতে হয় সেখানে। ফাঁকির দেনা মেটাতে হয় কড়ায় গণ্ডায়। সে যাকে অকাজ বলছে, সেই অকাজের দিগন্তকে একেবারে হাট করে খুলে দেয়নি। অতএব, থল জলের ভাবনা নেই, এক কথাতে বলা যায় না। বলি, 'থাকলেও শুনি, না থাকলেও শুনি।'

গাজী আবার জিজ্ঞেস করে, 'গোটা দিনখানি বাবুর হাতে আছে তো?'

'তা আছে।'

'তয় বাবু এক কাজ করেন। বেরয়ে যখন পড়িছেন, হাসনাবাদে চলি যান।'

'হাসনাবাদে?'

'আজ্ঞাঁ। নদী পেরয়ে, বসিরহাট থেকে মটর ধরে হাসনাবাদে যান। হাসনাবাদ থিকে চলি যান মটর লঞ্চে করে।'

'কোথায়?'

'ফেরার গোত্তর রেখে, যদ্দুর খুশি। ফেরত লঞ্চ পাবেন। নয় তো, যেখানে হোক নেমে যাবেন। ন্যাজাট তক্ মটর পাবেন। কলকাতায় যাবার গাড়ি পেয়ে যাবেন।'

কথাটা মন্দ লাগল না। ফেরার সময় মেপে, লঞ্চে করে যত দূর খুশি, তাই বা মন্দ কী। চোখ ফেরালেই তো সব অচেনা। যত দূরেই চাই। দেখে আসি, যতটুকু দেখা যায়। দেখে আসি, কত ঘাট, কত মানুষ। দেখে আসি, আমার বাঁধা সময়ের সীমায়, প্রকৃতি কী সাজে সেজে আছে। তবু গাজীর প্রস্তাবে অবাক না হয়ে পারি না। তার মুরশেদ নামের মজদুরিতে, এমন মতলব দেবার জায়গা কোথায়। পাখি নাকি। সব ঘাটেই ঘোরা আছে বোধ হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদিকে গেছ কখনো?'

গাজী হাসে। বলে, 'না গেলি কি আর বলতি পারি বাবু। দক্ষিণের কিছু বাকী নাই। তা, মনটা বলে, বাবুর ওদিকটায় ভালো লাগবে। তয় বাবু, একটা কথা বলি, ফাসট্ কেলাসের টিকিট নেবেন। সারেঙের ঘরে পাশে বসে যাবেন, সব দেখতি দেখতি যাবেন।'

গাজীর চোখও দেখছি সজাগ। কিন্তু ফাসট্ কেলাসে বসার মজা সে জানে কেমন করে। ফেরার পথ ধরে, শেষ কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'ফাসট্ কেলাসে গেছ নাকি?'

গাজী হা হা করে হেসে বলে, 'তোবা তোবা মুরশেদ, বাবুর কথা শোনো! টিকিট কাটার মুরোদ নাই, ফাসট্ কেলাসে যাবো কি বাবু।'

'তবে কি বিনা টিকিটে?'

'তয়? সারেঙকে দু'খানি গান শোনাই, তারপরে তার পায়ের কাছে বসি চলে যাওয়া।'

যাক, নামের মজুরিটা আছে। কিন্তু গাজী এখনো সঙ্গে কেন। গ্রামান্তরে যাবার রাস্তাও ঘাটে ফেরার পথেই নাকি। জিজ্ঞেস করি, 'পারাপারের নৌকো পাবো?'

'চলেন দেখি, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

চলেন দেখির মানেটা কী! গাজী আমার ওপার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে চলেছে নাকি। তাকিয়ে দেখি, তার মাথা নিচু, নজর পথের দিকে। গোঁফদাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ভাবের স্রোত। দেখে কিছুই বোঝা যায় না। কেবল গুনগুনানি শোনা যায়, আর তারই তালে ঘাড় দোলানি, 'আসমান জোড়া ফকির রে ভাই, জমিন জোড়া ক্যাঁথা। এসব ফকির মলে পরে, তার কবর হবে কোথা।'...

হঠাৎ গাজীর এ চিন্তা কেন জানি না। কিন্তু তার তালের খেই ধরতে পারছি না। আসমান জোড়া ফকির রে, জমিন জোড়া কাঁথা কার, আর কোন্ ফকিরের কবরের ভুঁই নিয়ে তার ভাবনা, সকলই রহস্যময়। তার ভাব-সাব ব্যবহার কথাবার্তার মতোই রহস্যময়। এখন এর উদ্ধার কোন্ মঃ পোয়ারো বা ব্যোমকেশ গোয়েন্দা করতে পারবেন, কে জানে।

ইতিমধ্যে সেই ইছামতী আবার দেখা দিয়েছে। যে ঘাট দিয়ে এসেছিলাম, সেই ঘাটেই ফেরা। দেখি, অধর মাঝির নৌকা বাঁধা খুঁটিতে। মাঝি বেপাত্তা। গাজী বলে ওঠে, 'জয় মুরশেদ, অদরদা এ পারেতেই আছে দেখছি। গেল কোথায়?'

বলেই গলা ফাটিয়ে হাঁক, 'অদরদা—! গেলে কোথায়?'

সাড়া নেই শব্দ নেই, বাঁদিকের জলে ডোবানো গেমো গাছের ডাল ধরে নেমে এল অধর মাঝি। পরনের ছোট কাপড়টা সাব্যস্ত করতে করতে এল। গাজী বলল, 'বাবু হাসনাবাদে যাবেন, পার করে দ্যাও।'

এমন ভাববার কোনো কারণ নেই, অধর মাঝি তার ঢুলঢুলু চোখ দুটিতে অবাক হয়ে তাকাবে। অবাক হয়ে দুটো কথা জিজ্ঞেস করবে। সে গিয়ে তার খুঁটিতে হাত দিলো। উঠব কি উঠব না ভাবছি। মাঝির অনুমতি পাওয়া যায়নি তখনো। গাজীই তাড়া দিলো, 'ওঠেন বাবু।'

আমি উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গাজীও উঠে এল। আমার বলবার কিছু নেই। আসবার সময় যেমন বসেছিলাম, তেমনি বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমিও ওপার চললে?'

অধর নৌকা ঠেলে দিয়ে উঠল। গাজী বলল, 'হ্যাঁ। মুরশেদে যখন মিলয়ে দিছেন, আজ আপনার সঙ্গই ধরি।'

আমার সঙ্গ! গাজীর মুখের দিকে ফিরে তাকাই। কথাটার অর্থ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। গাজী দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'একা একা যাবেন, তাই চলেন একটু ঘুরে আসি। মটরের ভাড়াটা দিবেন বাবু, আর যদি হরিপদ সারেঙ না থাকে, তা হলি লঞ্চের ভাড়াটা—।'

কথা শেষ না করেই সান্ত্বনা দিল, 'বেশী লাগবে না বাবু, আমাকে নিচের ঘরের টিকিট কেটে দিবেন, তা হলিই হবে।'

তার মানে কী। এত দিন জানা ছিল, একমাত্র মাতুলালয়েই এ রকম আবদার করা যায়। মোটর ভাড়া, লঞ্চের ভাড়া দিয়ে কে তাকে আমার একলাকে দোকলা করতে বলেছে। বিরক্তিতে আমার মুখের বাক্যি সরে না। এদিকে দেখ, সঙ্গদাতা ইছামতীর জল দিয়ে দাড়ি সজুত করে, আর গুনগুনায়, "স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্ রে ক্ষ্যাপা, বেড়াস একা, চিনতে পারলি, ধরবি কী।"...

এ সবও আমাকেই বলা হচ্ছে কিনা কে জানে। আমি যদি স্বরূপের বাজার চিনব, তবে আর ছুটব কেন। কিন্তু গাজী আমাকে চেনাবে, ধরাবে, একাকিত্ব ঘোচাবে, তা আমি চাইনি। থাক, আমার সঙ্গ দরকার নেই। সে কথাটা বলব বলে মুখ খোলবার আগেই মুরশেদের শ্রীমুখ আবার খুলে গেল, 'কী রকম তাজ্জব কথা শোনেন বাবু, "কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে, কে পাবে নির্ণয়।" কী মজার কথা দ্যাখেন দিকি। গানটা শুনেছেন বাবু?'

'না।'

বিরক্তিতে প্রায় ধিক্কার দিতে চাই। চাইলেই তো হয় না, তারপরে শোনো, 'আবার বলে কি, "আর অন্ধ গিয়া রূপ নিহারে, তার মম্মো কথা বলব কী। মড়ার সংগে মড়া ভেসে যায়। জ্যান্তে ধরতে গেলে হাবুডুবু খায়। সে মড়া নয় কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি।"'

বলেই গাজী হে হে করে হেসে উঠল। কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে। যদিও নজর নদীতে নেই, মন নেই আকাশে, কেবল পিত্তি বলে বস্তুটা তখন মাথায় গিয়ে জ্বলছে। এরা কি মানুষের মন মেজাজও বোঝে না।

বোধ হয় বোঝে বলেই বাবুকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে গলুইয়ের দিকে ফিরে বলে, 'বিত্তান্তটা বুইলে অদরদা?'

জানি, সে গুড়ে বালি। অধরকে তুমি ধরতে পারবে না। মাঝি কেবল পারাপার করে। তার বৈঠা ইছামতীর জলে ছপ্‌ছপ্‌ পড়ে। ওখানে রা ফোটানো মামুদ গাজীর কর্ম নয়।

কিন্তু ভাবনা শেষ হলো না। তার আগেই অবাক হয়ে শুনি, অধর মাঝির মোটা গোঙানো গলা ইছামতীর বুক থেকে উঠছে, 'তা বলব কি স্বরূপ কী রূপ, হয় অপরূপ তোমার মনে। যেরূপ অটল হইয়ে অটলের নিরঞ্জনে।'

আরো অবাক হয়ে দেখি, আদুর গায়ে খড়ি ওঠা, ঢুলঢুলু-চোখ অধর মাঝি যেন গোলাপী নেশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু বৈঠা থামায় না। গাজীর তো আকাশ কাঁপিয়ে হাঁক, 'জয় মুরশেদ, জয় অদরদা। অই, কী শোনালে গো। তারপরেতে তবে শোন, "বিজলী মেঘের কোলে, যেরূপ ভাবেতে খ্যালে, সেও কিছু স্থায়ী বলে জ্ঞান হয় আমার মনে, আমি কোথায় খুঁজে ফিরি তিরিভুবনে।"

এ যে দেখি, বাঙলা ছড়ার মতো, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়।' নাকি, 'কথা পড়ল সভার মাঝে, সব কথা তার গায়ে বাজে।' বৃত্তান্ত সেই রকম। গূঢ় ভাষায় ভাবের কথা, বুঝহ যে জন। আমি শুনি এক, গাজী মাঝি আর এক রকমে চোখাচোখি করে। আমার চোখ ফেরে না মাঝির দিক থেকে। সে অধর, সে হিসাব করেছিলাম তার ভাব ভঙ্গি দেখে। এখন যে দেখি, এ আর এক মানুষ, গূঢ় মানুষ। চোরাকে চিনতে পারিনি।

কথা তাদের সেখানেই শেষ নয়, অধর মাঝি একবার গাজীর দিকে দেখে, আবার চোখ তোলে সেই দূরের আকাশে। তেমনি মোটা গোঙানো স্বরেই বলে, 'যখন চোক বুজে থাকি, তখন তার ঢুক দেখি। যেই খুলেছি চোক আর তারে দেখতে পাইনে। পরে আসমান জমিন খুঁজি—যদি কোনখানে।'

গাজী দু' হাত তুলে ডুপ্‌কি বাজিয়ে দিলো। জলে তরঙ্গ তুলে হাঁক দিলো, 'অই, মরে যাই গো অদরদা। বড় জবর শোনালে।'

কথা শেষ হবার আগেই, নৌকা এসে পাড়ে ঠেকল। অধর মাঝির কথাতেই কান পেতে ছিলাম। নৌকার ধাক্কা লাগতে সংবিৎ ফিরল। অধর আগে নেমে গিয়ে খুঁটি পুঁতল মাটিতে। সংবিৎ ফিরতেই প্রথম মনে হলো, ইছামতীতে কত জল ঠাহর পেলাম কী। দুটো পাগলের পাল্লায় পড়েছি কিনা বুঝতে পারি না। লোকটাকে দেখেছিলাম নির্বিকার। চোখে তার সবই নিরাকার যেন। এখন দেখছি, যমুনার মতো, নদীর তলায় বাঁকা স্রোত। মাঝির মুখের দিকে তাকিয়ে দু' আনা পারানি দিলাম। ভেবেছিলাম, একবার বুঝি তাকাবে। কিন্তু পয়সা গুনে নিয়ে নৌকায় গিয়ে জল সেঁচতে বসল।

অধর মাঝির কিছুই জানি না। তবু কালো ভাবলেশহীন মুখটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হলো, অধর মাঝি বোধ হয় একেবারে অধর নয়। জায়গাটা চিনতে না পারি, তবু কী একটা জায়গা যেন তার ভিতরে দেখা গেল। সেখানকার ঝলকটা চোখের জলের

না হাসির, বুঝতে পারলাম না।

গাজীর তখন হাঁক, 'বাবু, গাড়ি এসে গেছে।'

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম। জায়গা পাবার আশা নেই। কিন্তু উঠতে না উঠতেই গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। তার মধ্যেই গাজীর ত্রাহি চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে, 'মুরশেদের দোহাই, আমারে উঠতি দ্যান কনডরবাবু। ওই যে বাবু গাড়ির মধ্যি, উনি আমার পয়সা দিবেন।'

গাজীর চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি, বড় বেকায়দা। এখন মুখ দেখে কে বলবে, অরূপ অটল নিরঞ্জনের তত্ত্ব রসে টলমল—এই মানুষে সেই মানুষ আছে। কনডরবাবু অর্থাৎ কনডাক্‌টরের মুখের দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে, যেন কেউ হাতে পাওয়া মুরশেদ নিয়ে চলে যায়। ফাটা চৌচির মুখখানি যেন চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাবে। এদিকে মোটর বাস যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। তার এঞ্জিনের গর্জন, সহিসের হাঁক, আর থেকে থেকে দুলে ওঠা, কেঁপে ওঠা, সব মিলিয়ে এক এলাহি কান্ড। এই বুঝি ছাড়ে। চলে যায়, চলে যায়, তাড়াতাড়ি এসো। যাত্রীরা অসবুর হয়ে দৌড় দেয়। মফস্বলের যেখানেই যাবে, সেখানেই এ রকম হাঁকডাক। যেখানে যেমন। এখানে ঘণ্টা বাজে না, ভোঁ বাঁশী কিছু বাজে না। সহিসকেই হেঁকে জানাতে হয়, গেল, গেল, ছেড়ে গেল। নইলে যাত্রীদের হুঁশ হতে চায় না।

ওদিকে তখনো আর্ত গাজীর কাতর কাঁদন চলেছে, 'কিরা কেড়ে বলছি কনডরবাবু, বিনি পয়সায় যাবো না, আমারে উঠতি দ্যান্।'

কনডাক্‌টরটি দেখছি শুকনো চিঁড়ে। কাতরের কাতরানিতে সে ভেজে না। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে, হাত পেতে বলে, 'দাও, পয়সা ছাড়ো বাবা গাজী। তারপরে ওঠ। ওসব গাজী বাজী ছোড়।'

সবই দেখছি, চেনাচিনির ব্যাপার। গাজীর অমন অনেক কাকুতি-মিনতি বুঝি শোনা আছে কনডাক্‌টরের। তাই দরজা আগলানো, প্রবেশ নিষেধ। ততক্ষণে আমার জায়গা হয়েছে। জানালা নিয়ে বসে পড়েছি। কিন্তু স্বস্তি নেই। কান পড়ে আছে দরজার দিকে। নিজেই কিছু বলব কিনা ভাবছি। গাজী তখন জানালা দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলো, 'অই যে, অই বাবু আমার ভাড়া দিবেন, জিগেসাঁ করেন, মিছা বলব না।'

তারপরেই আমাকে ডাক, 'বাবু, দিবেন না বাবু, অ্যাঁ?'

মুরশেদের কাছে কসম কিছু খাইনি। কিন্তু কোথাও নিশ্চয় কবুল করেছি। নইলে ঘাড় ফেরাবো কেন। চেয়ে দেখি, দাড়ির ভাঁজে হাসিটি করুণ, চোখ ধন্দে ভরা। কনডাক্‌টরের দিকে ফিরে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই ভাড়া দেবো।'

কনডাক্‌টর সরে দাঁড়িয়ে গাজীর দিকে চেয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। বলল, 'আচ্ছা যাও, আজ তোমার মুরশেদের দিন।'

শোনা গেল, গাজী উঠতে উঠতে বলছে, 'মুরশেদের দিন বাবু রোজই। তা বলি মিছা বলব না।'

কনডাক্‌টরের আর সেদিকে তখন কান নেই। সহিসের সঙ্গে সেও হেঁকে চলেছে। গাড়ির মধ্যে কয়েকজনের গলা শোনা গেল, 'জয় মুরশেদ। তা, আজ গাজীর যাত্রা কোন্ দিকে?'

গাজী বলল, 'যাই তো আগে হাসনাবাদ, তারপরে দেখা যাবে, কী বলেন বাবু।'

কয়েকজন তাকিয়ে দেখল আমাকে, সেই একই দৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসা। কে, কোথাকার, যোগাযোগ কিসের। যাত্রীরা অধিকাংশই কাছেপিঠে গ্রামের। চেহারা দেখে তাই মনে হয়। যদিও গাড়ি আসছে সোজা কলকাতা থেকেই। কিন্তু কলকাতার মানুষ বলে চেনা যায় না কাউকেই। বসিরহাটে গাড়ি খালি হয়ে, আবার ভরে ওঠে। পোশাক দিয়ে যদি ভদ্র-

লোকের বিচার হয়, তবে আমার মতো দু' একজন যে না আছেন, তা বলা যাবে না। বাদবাকী অধিকাংশই মাঠের মানুষ। তার সংগে হাটুরে বাটুরে মেশামিশি। মহিলা যাত্রীও কম নয়। তারা যে এ গাড়ির অধিকাংশদের কন্যা ঘরনী, সে ছাপ আছে তাদের বেশবাসে, চেহারায়। যার হাতে সময় ছিল, যাত্রা হলো কুটুমবাড়ি, তার একটু তেলের চিকনচাকন। ভাঁজভাঙা কাপড়ে ন্যাপথলিনের গন্ধ। ড্রাইভারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা মেয়েটির গায়ে নয়া ফ্রক। যাদের কাজকর্মের ফিকির, তারা একটু রুক্ষসুক্ষু। তাদের তেমন ঢাকাঢুকির শালীনতা নেই। বাদবাকী বয়স্থাদের মুখ দেখতে পাবে, তা হবে না। সব কলাবউ। ইস্তক, ওই যে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি পরা কোলে একখানি শাঁখা পরা কালো রেখায় ভরা প্রৌঢ়ার হাত দেখা যায়, তার মুখেরও অর্ধেক ঢাকা। হতে পারে বয়স হয়েছে, নাতিনাতনী হয়ে গিয়েছে, তা বলে সধবা মেয়েমানুষের একটা সহবত তো আছে।

আরো খানিকক্ষণ তর্জনগর্জনের পর বাস ছাড়ল। গাজী ইতিমধ্যে এক জায়গায় বসে পড়েছে। কথাবার্তা চলেছে সমানে। চলবেই, তার অচেনা কে আছে। কথাবার্তার বিষয়বস্তুরই বা অভাব কী। ধানের অবস্থা কেমন, খন্দ কেমন হবে, অমুকে কবে মারা গেল, কার ছেলে হলো, এসবের মাঝে মাঝে মন খেদে প্রাণো কান্দে বুলিও চলেছে। আমাকে বিশেষ করে উৎকর্ণ হতে হলো, যখন শোনা গেল, 'বাবু পেলে কোথেকে?'

গাজীর জবাব শোনা গেল, 'পথ থিকে।'

আমি আড়ষ্ট হলাম, পাছে গাজীর মুখ খুলে যায়। রামায়ণ না গাইতে আরম্ভ করে। বাইরের দিকে তাকিয়েই শুনছিলাম। গাড়ি চলেছে বেগে। মাঝে মাঝে ওঠানামার দাঁড়ানো। কেউ নামে, ওঠে কেউ। কেবল শেষ নেই সবুজের। যেন ছক কাটা আছে, মাঠে ধান, ডাঙায় নারকেল সুপারির ভিড়। যেখানেই গ্রাম, সেখানেই নারকেল সুপারি। শেষ হেমন্তের রোদে চিকচিক করছে। মাঝে মধ্যে গরুর গাড়ি, গৃহস্থের ঘরের সামনে বাঁধা গরুছাগলের রাস্তা পারাপার। বাসের সহিস হাঁক দেয়, হেই হেই! শুধু তাই নয়। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় থেকে ও এসেছে। ছোকরা সহিসের থলেয় অনেক মজার মজার কথা। পথ চলতি কিষেণকে ডাক দিয়ে বলে, 'ও দাদা, পয়সা পড়ে গেল যে।'

কিষেণের ট্যাঁকে পয়সা থাক বা না থাক, চমকে তাকায় মাটির দিকে। সহিস ছোকরা হাসে খ্যালখ্যাল করে। কান পাতলে শোনা যাবে, ঠকে যাওয়া রেগে-ওঠা কিষেণ তখন চিৎকার করছে, 'হ্যাঁ, এই যে পেইছি। ন্যে যাও।'

নিয়ে যাবার জন্যে তখন কেউ দাঁড়িয়ে নেই ; গাড়ি অনেক দূরে। পুকুরঘাটের ধার দিয়ে, কলসী কাঁখে বউটিকে চমকে দিয়ে, গাড়ি তখন ছুটেছে। আর সহিসের ঝাঁকড়া চুলে ঝটকা লাগে, গলায় বাজে গান, 'ম্যায়নে দেখা তেরি সুরত্...।'

কার সুরত্ দেখে, কে জানে। মনে হয়, কোনো বোম্বাইওলীর সুরত্ তখন ওর চোখে নেই। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার জটিল প্রাণটা আসলে দুরন্ত গতি আর বাধাহীন দিগন্তের সামনে অথই হয়ে পড়েছে। ও তাকে ধরে রাখতে পারছে না।

কে পারে। আমি কি পারি। আমি সহিস নই, কিন্তু পুচ্ছনাচানো একটা পাখি যেন নিজের মধ্যেও দেখি। আপন বাসা ছেড়ে যে অসীমে যেতে চায়, প্রাণ অথই হয়ে পড়ে। এই দিগন্তজোড়া রূপের মাঝে তাকে ধরে রাখতে পারি না। নিজের গলার গুনগুনানি চেপে রাখতে পারি না। এ অনুভূতির নাম কি, কে জানে। এ সবুজের কাজলমাখা স্বপ্ন কিনা কে জানে। মনে হয়, কার সোহাগের দুটি হাত যেন জড়িয়ে নেয় বুকে। তার কোমল উত্তাপের সকল তৃপ্তি যেন সহসা আমার চোখের জলে গলে আসতে চায়। আর অবাক হয়ে শুনি, গাজীরই প্রতিধ্বনি আমার অস্ফুট গলায়, 'যার তরে মন খেদে প্রাণো কান্দে সর্বদাই...।'

এই জানাটা, জানি না, যদি তৃপ্তি, তবে কেন চোখের জল গলে। যদি দিগন্তের রূপে প্রসন্নতা, তবে 'মন খেদে প্রাণো কান্দে' কেন। যেন এপারেতে রোদ, ওপারেতে ছায়া। এ দুয়ের মাঝে দরিয়া। আমি এই দরিয়া চিনে উঠতে পারি না। এ দুয়ের মাঝে দরিয়াকে কী দিয়ে বন্ধন করতে হবে, তার সন্ধান আমার জানা নেই। কেবল রোদ ঝলকানো দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রাণে দুয়ের খেলা দেখি।

'এই যে বাবু, টাকি চলে গেল, হাসনাবাদ আসছে।'

গাজীর গলা। তাকিয়ে দেখি, আমাকেই বলছে। কিন্তু চারপাশে অনেক নয়া মুখ। যাদের দেখেছিলাম বসিরহাটে, তাদের কেউ প্রায় নেই। গাজীর আসর এখন অন্য লোকদের নিয়ে। তা হোক, তাতে চেনাচিনি আটকায়নি। কথাবার্তা বৃত্তান্তের অভাব নেই মোটেই। বরং গাজী এবং আরো দুজন রীতিমত আইন অমান্য করে বিড়ি ধরিয়ে বসেছে। চোখ তুলে দেখি, স্বয়ং 'কনডরবাবুও' 'ছিরেট' ধরিয়েছেন। মহাজন যদি পথ দেখান, সাধারণের দোষ নেই। আর এক দিকে ঈষৎ ধোঁয়ার চিহ্ন দেখে, চোখ ফেরাতেই দ্বিগুণ চমক লাগল। মহিলা যাত্রী এখন তিন, এবং বিলকুল নতুন। তাদেরই মধ্যে একজনের মুখে বিড়ি!

স্ত্রীলোকের মুখে বিড়ি দেখা নতুন নয়। কিন্তু ঘোমটা কেন। বয়সও আশ্বিনের ঢলে, ঋতুচক্রের মাঝামাঝি। হাতে রূপো বলো, কাঁচ বলো, শাঁখ বলো, সব রকমই আছে। এমন কি, যাত্রীদের দিকে ঘোমটার আড়াল থাকলেও, সীমন্তে সিঁদুরের চিহ্ন চোখে পড়ে। মিলের লাল শাড়ি, আটপৌরে বাঙলা ছাঁদে পরা। দেখে মনে হয়, বাঙালী গৃহিণী। এখন আমার চোখে ধন্দ লাগিয়ে উনি যদি ওড়িশী হন, বলতে পারি না। শ্রেণীবিচারেও অক্ষম। তবে চোখে কাজল, তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁট, সেই ঠোঁটে বিড়ি এবং তৎসত্ত্বেও নাকে নাকছাবি। তার ওপরে ঘোমটার আড়াল। সব মিলিয়ে কেমন একটা ধন্দ লেগে গেল। অপযশ করব না, মুখখানি একেবারে ফ্যাল্‌না নয়। গ্রামীণ ছাপটা পুরোপুরি আছে। তার সঙ্গে, একটু রোখাচোখা ভাব। দুটো কথা বলে যে কেউ পার পেয়ে যাবে, তেমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার চমক লাগল, ঘোমটা কেন। কাকে দেখে। নল্‌চে আড়াল বলে একটা কথা আছে শুনেছি। নল্‌চে আড়াল-বিচিত্রাও কম দেখিনি। বাপ দখিন ফিরে কথা বলে। ছেলে উত্তর দিকে ফিরে জবাব দেয়। মুখে তার হুঁকো। বাপ-ব্যাটা কিনা। মুখোমুখি খাওয়া যায় না। হাজার হলেও একটা সহবত বলে কথা আছে। সে তবু তো বাপ-ছেলে। একবার দ্বারভাঙ্গার পথে পেট ফুলে ওঠা কাকে বলে দেখেছিলাম। ছোট একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা, যাত্রী কুল্যে কয়েকজন। যে ভদ্রলোক সপরিবারে, তিনি একজন রেলওয়ে কর্মচারী। উত্তর বিহারের অধিবাসী, গন্তব্যও সেদিকেই। কামরাটিতে বাইরের লোক একমাত্র আমি। দু-এক কথার পর, দেখা গিয়েছিল ভদ্রলোক নিপাট ভালোমানুষ। ছেলেমেয়ে দুটির বয়স অল্প। গিন্নীটিও দেখতে শুনতে ভালো। বয়স তাঁর অল্পই। সাজগোজে কিছু কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি ছিল। সেটা বোধ হয় বাইরে বেরোবার জন্যেই। ঘোমটা তাঁর খসতে দেখিনি কখনো। হিন্দী যতটা বুঝি, তাতে এটুকু ধরা গিয়েছিল, তিনি স্বামীর সঙ্গে তৃতীয় পুরুষ বচনে সম্বোধনহীন সম্বোধনে কথা বলছিলেন। যেমন, 'ছেলেকে একটু জল দেওয়া হোক।' 'জানালাটা একটু বন্ধ করে দিক।' 'উনি কি এখন খাবেন?' বাঙালী মাত্রেই জানেন, ও বচন কর্তাগিন্নীর মান-অভিমানের। এ ক্ষেত্রে তা নয়। দেখা গিয়েছিল, ওটা সহবত। গিন্নীর হাতে একটি হিন্দী ম্যাগাজিন ছিল। মলাটে মুখোশ পরা যুবতী রমণীর হাতে পিস্তলওয়ালা ছবি। সে কি কোনো মেয়ে রবিনহুড, নাকি পাঁচকড়ি দে-র পাপীয়সী জুমেলিয়া জাতীয়া কেউ, কে জানতো। লক্ষ্য না করে পারা যায়নি, কোনো কোনো সময় মহিলাটি আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। কেন, নিষেধ আছে নাকি কিছু। না, নিষেধ ছিল না। কিন্তু, তাকানোর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, চোখের তারায় কী যেন এক কথা। ভিন্ পুরুষের দিকে রমণীর পলকহারা

চেখা, ভিন্ পুরুষের কথাটাও ভাববার। যেন চক্ষে হারানোর মতো, হেরিতে সাধ মেটে না। তারপর, হেরিতে হেরিতেই, সহসা ঠোঁটের কোণে একটু বিষণ্ণ হাসি। তাতে নাকছাবি ঝলকায়নি। কিন্তু তাঁর বুক দুলে ওঠা হুশ করা দীর্ঘশ্বাসে সেই শীতেও ভিন্ পুরুষের বিনবিনিয়ে ঘেমে ওঠার অবস্থা। রমণীর মন বুঝতে হাজার বছরের সাধনার দরকার, কাব্যে পড়া আছে। তত পরমায়ু কোনোকালেই পাওয়া যাবে না। অতএব সে চেষ্টা বাতুলতা। অথচ সেই পলকহারা চোখ, বিষণ্ণ হাসি এবং দীর্ঘশ্বাসের হাহুতাশ কেন। মানুষ তো, তার ওপরে রমণীর মন না বোঝা পুরুষমানুষ। প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়েছিল, তার নাম...ছি ছি। এখন ভাবলে প্রায় নিজের চোখেই না দরিয়া ভেসে যায়।

যাই হোক, ক্ষণে ক্ষণে সেই পলকহারা দৃষ্টি, বিষণ্ণ হাসি, দীর্ঘশ্বাসের কাঁটা বেঁধা নিঃশব্দ নাটক কত কথাই ভাবিয়েছিল। এমন কি, জুমেলিয়ার ডাকিনী রহস্যের কথাও একবার মনে হয়েছিল। রাত্রি ন'টা নাগাদ, ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। কর্তাকে দেখেছিলাম, কখনো ছেলেমেয়েদের সেবায়, কখনো বাইরের দিকে দৃষ্টিপাতে চিন্তান্বিত উদাস। উদাস কিনা জানি না, কেননা হাই উঠছিল খুব। কচিৎ কখনো গিন্নীর সঙ্গে দু'-একটা কথা। তারপরেই তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন। আমার বুকটা দুরুদুরু করছিল। করতে করতেই নিশ্বাস বন্ধ। শুনতে পেয়েছিলাম, 'আপ কা কৃপা...।'

ভিন্ পুরুষ চমকে চোখ তুলেছিল। 'আপ কা কৃপা' মানে 'দয়া করে আপনি...।' দেখেছিলাম রমণীর ঠোঁটে কুণ্ঠিত হাসি, দৃষ্টি সলজ্জ। তার মধ্যেই বার দুয়েক ভীরু চকিত চোখে বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে দৃষ্টিপাত। তিনি যা বলে উঠেছিলেন, তার বাঙলাটা ঠিক এই রকম, 'দয়া করে আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিন। আর আপনার দেশলাইটা। মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি দিন, উনি এসে পড়লে আর হবে না।'

কামরায় বজ্রাঘাত হয়েছিল কিনা, মনে পড়ে না। তবে নিজের কানকে বিশ্বাস করব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। আমি কি সত্যি ওই কথাগুলো শুনেছিলাম। নিজের মুখ তো দেখতে পাইনি, কেমন করে জানা যাবে, তার কী হাল হয়েছিল। কিছু একটা হয়েছিল। কারণ, কয়েক মুহূর্ত দেহমন অবশ হয়ে গিয়েছিল। আবার, প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে শোনা গিয়েছিল, 'জলদি...আপ কা কৃপা...।'

তাড়াতাড়ি সিগারেট বের করে দিয়াশলাই সুদ্ধ বাড়িয়ে ধরেছিলাম। তিনি ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিলেন। আর মুহূর্তেই তা তাঁর 'দেহবল্লরী আচ্ছাদিত' ঝলকানো শাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছিল। আঃ, আহা, জীবনে কোনোদিন কোনো রমণীর অমন খুশি-ঝলকানো তৃপ্ত মুখ দেখেছি কিনা, মনে করতে পারি না। শুনতে পেয়েছিলাম, আমার ভিতরে যেন কেউ অস্ফুটে ডেকে উঠেছিল, 'মা, মাগো!'

সেই মুহূর্তে তার বেশী কিছু নয়। একটু পরেই কর্তা বেরিয়ে এসেছিলেন। গিন্নী তৎক্ষণাৎ খাড়া। সটান বাথরুমে। কর্তাটি একেবারে নির্বিকার। তিনি ভালো করে বিছানা পাততে মনোযোগ দিয়েছিলেন। আর সেদিকে তাকিয়ে, মাতৃসম্বোধনে আর্তপ্রাণ কবিতার সেই কলিটি আওড়াচ্ছিল, 'রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন...।' ওরে পুরুষ, তোরে ধিক্। ধিক্ ধিক্ ধিক্! মনে করেছিলে, রমণীর সব কটাক্ষই এক। সব হাসি, সব দীর্ঘশ্বাস এক বায়ে বহে। মনে করেছিলে, সব অটল অরূপ নিরঞ্জনের খোঁজে এক দিকেতেই ছোটা। তারপরেই অবাক মানার পালা। আর যত অবাক, ততই রূপের মাঝে অরূপের আলো ভিন্ পুরুষের প্রাণে। সেই মুহূর্তে কার কাছে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, ভেবে পাইনি। দ্বারভাঙ্গাগামী রাত্রের ট্রেনে, জীবনের কোন্ রসিকে যে সেই নেশাবিচিত্রা দেখিয়েছিল, তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গ এখন থাক। তোলা থাক বারান্তরের পাতায়। কিন্তু আপাতত নলচে আড়ালের সহবতটা এই গাড়ির মধ্যে কোন্ পরম্পরে ঘটছে, তা ধরতে পারি না। ওই

সেই মানুষ নাকি, গাজীর পাশে বসে যিনি হুস্ হুস্ বিড়ি টেনে চলেন। হুম্, মনেতে টুকুস সন্দ লাগে। কারণ, মহাশয়ের কালো মুখে গোল দুটি লাল চোখের নিবিড় দৃষ্টি থেকে থেকেই ঘোমটার দিকে হানে। নিবিড়তাটুকু শাসন কষণের নয়। স্নেহেরও বলা যাবে না। তার থেকে বেশী, একটি গাঢ় গভীর প্রেমাবেগ বলা যায়। কেন। ওই তাম্বুল-রঞ্জিত ঠোঁটে বিড়ি খাওয়া দেখতে ভালো লাগে বুঝি। দুটিতে মুখোমুখি বসে নেশার আমেজ জমাতে পারলেই, নেশা জমতো নাকি। নল্‌চে আড়াল তা হলে লোক দেখানো সহবত। ঘরের লোকের মুখোমুখি, সে এক কথা। তা বলে বাইরের লোকের 'ছামুতে'।

ঘোমটা আড়াল দেওয়া এক চমক। দ্বিগুণ চমকের আর এক চমক, ধূম-উদ্‌গারিণীর পাশেই ছাপা সিল্‌ক-এর কোলের ওপরে কালো ভ্যানিটি ব্যাগ। ব্যাগ ধরা হাতে ছোট একটি সোনার বিন্দু ঘড়ি। দু' হাতে দুই সোনার বেড়ি, সাপ বাঁকানো চুড়। এসবের যিনি মালিকানী, তাঁর কেশে শাম্পু কিনা কে জানে। কুসুমের ভাঁজ নেই। পিছন দিকের বাঁধনটাকে অশ্ব-লাঙুল বলে কিনা জানি না। ঘাড়ের কাছে একটি শক্ত বাঁধনের মুঠি কষে ধরে আছে। এখন দেখ বাকী অংশের নাচ। টাকি না শাঁখচুড় পেরিয়ে যাওয়া দিগন্তের বাতাসের তালে, গালে চিবুকে গলায় বুকে ঘন ঘন ঝাপটা। কপালে নেই টিপ ছাপ। সিঁথিতে নেই মুচলেকার রক্তলেখা। কালো ডাগর চোখ দু'টি আরো কিছু কালোয় কালো করা। কৃষ্ণ সবুজ নারকেলের পাতায় যেমন রোদের ঝলক চিকচিকিয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে, বয়স বলার বেয়াদপি যেন না করি। আন্দাজে বলো, কুড়ির ঘরে।

তাঁর পাশে যিনি, বর্ষীয়সী সধবা। মুচলেকার কী গরব! কপালে সিঁথেয় রাঙা হাসির ঝলক। লালপাড় তাঁতের শাড়িতে আটপৌরে বেষ্টন। হাত ভরতি শাঁখা সোনায় জোড়া। মা-মেয়ে কিনা, তত খুঁটিয়ে দেখা দায়। সহবতের দায়। সঙ্গে যিনি আরো আছেন, তিনি কি অন্য দিকের গলাবন্ধ কোট প্রৌঢ় সজ্জনটি। মাথার মাঝখান থেকে কেশ গতায়ু। মোটা লেন্সের চশমা পরা মুখে, গোঁফ-দাড়ি নিশ্চিহ্ন। কেবল মোটা লেন্স যে চোখের মণি দুটিকে একেবারে বিন্দুসদৃশ করে তুলেছে, সেই মণি দুটি ঘন ক্ষেপণে চঞ্চল। একবার বাইরে, একবার ভিতরে। একবার এ মুখ, একবার সে মুখ। সেই ধাঁধার মতো, "তাকের 'পরে শিশিটা, নড়ে চড়ে, পড়ে না। যদি না বলতে পারো, তুমি জম্মো কানা।" শিশুর চোখ নয় যে বলবে, ওর অবাক চোখ দিকে দিকে দিশেহারা। যার অর্থ হলো, প্রৌঢ়ের চোখ বাইরে নেই, মনে মনে। কিন্তু এঁরা উঠলেন কোথা থেকে, লক্ষ্য পড়েনি।

হবে কোথাও থেকে। বসিরহাট থেকে এ পর্যন্ত যে-কোনো এক জায়গা থেকে। যখন আমার চোখ নিয়ে গিয়েছিল দিগন্ত, সেই ফাঁকে। চোখে পড়ার কারণ আর কিছু নয়। হাসনাবাদের যাত্রী হিসেবে একটু ভিন্ রঙের ছাপ দেখি। কে জানে, হাসনাবাদের চেহারা কেমন। শহর না গ্রাম, তাই বা কে জানে। তবে বহুশ্রুত নাম। শ্যামবাজারে দাঁড়িয়ে অনেকবারই সহিসের গলার হাঁকে শুনেছি। হবে হয়তো, এ ভিন্ রঙের ছাপ সেখানে বেমানান লাগবে না। তাও কি লাগে! এক রঙ তো রঙ নয়, রঙে রঙে রঙীন। দেখতে ভালো তাই।

কিন্তু ওই শোনো, যাবে কোথায়। গাজীর গলা শোনা যায়, 'বাবুকে তো চিনতি পারলাম না।' ঠিক অব্যর্থ জায়গাতেই কথা যায়। প্রৌঢ় ফিরে তাকান। এবার জবাব অধর মাঝির বাবুযাত্রীর নয়। সোজা কথায়, 'চিনবে কী করে। আমি এদিকের লোক নই।'

গাজীর চোখ ঘোরানো হাসি। বলে, 'সেই কথাই তো বলছি, বলে নতুন বাবু দেখি। টাকি থেকে উঠলেন দেখলাম কিনা। বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

এবার জবাব সংক্ষিপ্ত, 'হুম্।'

মোটা লেন্সের ফাঁকে, বিন্দু বিন্দু তারায় বিরক্তিও টের পাওয়া যায়। সেই বিরক্তির

রেশ গিয়ে পড়ে আর দু'জনের মুখে। সধবা কুমারীর চোখে চোখে চাওয়া, ঈষৎ হাস্য, গাড়ি চলে যাওয়া একটি ঝলকের মতো। কিন্তু প্রৌঢ় জানেন না, ওর নাম মামুদ গাজী। প্রসঙ্গ কিসের থেকে কোথায় যেতে পারে, তাঁর ধারণায় নেই। তাই, যখন মুখ ফিরিয়ে নিতে যাবেন, তখনই আবার, 'বাবুর যাওয়া হবি কোথায়?'

প্রৌঢ় দেখছি এদিক ওদিক পছন্দ করেন না। মুখ না ফিরিয়েই বলেন, 'গোসাবা।'

মামুদ গাজী ঘাড় নাড়িয়ে বলে, 'তাই তো বলি, বাবুকে তো হাসনাবাদেও কোনোদিন দেখি নাই। লঞ্চ ধরে যাবেন তো?'

প্রৌঢ়ের ভুরু জোড়া যেভাবে তীর হানা বাঁকে বেঁকে ওঠে, একটা ধমক নিশ্চিত আশা করা যায়। হতে পারে অচেনা অঞ্চল, তবু আমার নিজের ধারণাই বলে, গোসাবা ক্যানিং-এর কাছে। আর ততদূর যাবার জন্যে লঞ্চ ছাড়া আর কোনো বাহন আছে বলে মনে হয় না। যা আছে, তা নৌকা। গোসাবার যাত্রী নিশ্চয়ই এখান থেকে নৌকায় যাবেন না।

কিন্তু মানুষ আমার কবে চেনা হয়েছে। প্রৌঢ়ের চোখের তারার অস্থিরতা এবার শরীরে দেখা যায়। বলেন, 'তাই তো যেতে হবে। কিন্তু সময় তো হয়ে গেল, লঞ্চ পাওয়া যাবে কী।'

গাজীর ফাটা মুখে, হাবজা দাড়িতে হাসির তরঙ্গ। দৈববাণী শোনায়, 'তা পাওয়া যাবে বাবু।'

'যাবে?'

প্রৌঢ় যেন অকূলে কূল দেখছেন গাজীর বরাভয় মুখে। এতক্ষণে বোঝা যায়, তাঁর চোখ এত দিকে দিকে দিশাহারা কেন। আসলে দিকে দিকে নয়। মনে মনে দিশেহারা, লঞ্চ পাওয়া যাবে কিনা। গাজী বলে, 'তা আর যাবে না! এই মটরখানি না দেখে লঞ্চ ছাড়বি নে। আমরাও তো যাব।'

বলে সে হাসিটি তুলে ধরে আমার দিকে। আমরা বলতে এখন, সে আর আমি। তার চাহনির রকম দেখে, ভদ্রজনের সাব্যস্ত মন ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নজরটা তাই আগেই যায় সধবা কুমারীর দিকে। গাজী আমার সহযাত্রী, এই ঘোষণায় সহসা একটা অস্বস্তি ঘনায় মুখে। আর অস্বস্তিটা মিথ্যে নয়। সধবা কুমারী তখন গাজীর সহযাত্রীকে একটু দেখে নিচ্ছেন।

রাগ করবে, করো। কোথায় কবুল করেছ এখন তাই ভাব। মুরশেদের নামের মনজুরিতে তো আজ ইস্তফা। মনের খেদ গিয়েছে, প্রাণের কাঁদন গিয়েছে, এমন কি বোবাকালার রহস্যেও খেয়া পার হয়ে গিয়েছে। আজ দেখছি তার বাবু নামের মজদুরি। তাতে আপত্তি নেই। এতই যখন বাবু বাবু, তখন এক বাবুর শরণ নিলেই তো হয়। সব বাবুকে জড়ো করা কেন।

মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালাম। ভাবি বলি, 'আমরা আবার কে। আমি তোমার সঙ্গী নই।' কিন্তু ভাবা এক, বলা কঠিন। কাকেই বা বলবে। ওই তো শোনা যায় আবার, 'ওই যে দেখা যায় হাসনাবাদ এসে পড়া গেল।'

সামনে তাকিয়ে দেখি, দিগন্ত ঠেকেছে এক ঘন বসতির সীমায়। কাঁচা-পাকা বাড়ি, দূর থেকে লাগে যেন চাপাচাপি ঠাসাঠাসি। তবে আকাশে হাত বাড়ানো নারকেল সুপারি গাছ মাঝে মাঝে ফাঁক রেখেছে। গাড়ির ভিড়ও কম নয়। শুধু লরী নয়। লরীর ছাঁয়ের মতো শহরে যেগুলো দাপিয়ে বেড়ায়, সেই টেম্পোও আছে। আরো গুটিকয়েক বাস। তারপরেই নদীর কূলে, সারি সারি নৌকা। মাস্তুলগুলো ভিড় করে আছে পাশাপাশি। নৌকার ভিড়ের মধ্যেই একটা স্টীম লঞ্চ দাঁড়িয়ে। ডাঙার সাঁকোর খুঁটোয় কাছি দিয়ে বাঁধা। বাস দেখা মাত্রই, লঞ্চের ভেঁপু বাজে ঘন ঘন। ওদিকে যত ভেঁপু বাজে, এদিকে

তত হর্নের সাড়া। কারুর ব্যাখ্যা করতে হবে না, গাজীর গলাই শোনা গেল, 'ওই শোনেন, উনি বলেন, এইসো এইসো, ইনি বলেন, যাই যাই।'

হাসতে গিয়ে কাশি কাশে কে, বলে, 'থা বইল্ছ।'

তাকিয়ে দেখি, কালো মুখ, লাল চোখ, গাজীর বিড়ি পানের সঙ্গী। যাত্রী তখন মোট দশ হতে পারে। বাস ধুলো উড়িয়ে দাঁড়াল। গাজী হেঁকে বলল, 'বাবু, চলেন চলেন, সারেঙের বড় তাড়া।' যাওয়া যখন স্থির, তাড়াতাড়িই ভালো। আমার পিছন পিছনেই গাজী। সেখান থেকেই হাঁক দিলো, 'দাঁড়ান গো, আমরা অনেকে যাবো।'

মাথায় পাতার ছাউনি, ছোট এক মাটির ঘর। তার কঞ্চির গরাদ দেওয়া জানালার কাছে, অসমান ইংরেজীতে লেখা, 'বুকিং অফিস'। সম্ভবত আলকাতরা দিয়েই লেখা। অভ্যাস অনুযায়ী আগে সেদিকেই দৌড় দিই। দরাদরির বিষয় নয়, ছাপানো টিকিট। গাজী তাড়াতাড়ি ডেকে বলে, 'ওদিকে কই যান বাবু। অনেক দেরি হয়ে গেছে, টিকেট আর এখন ঘরে নাই। টিকেটবাবু লঞ্চে গিয়ে উঠেছেন। চলেন তাড়াতাড়ি যাই।'

কিন্তু গাজীকে দাঁড়াতে হয়। ডাক দিয়েছেন সেই প্রৌঢ়, 'ওহে, কী বলব, মোল্লা না সাধু, আমরাও কি এই লঞ্চেই যাবো?'

'তয়? তাড়াতাড়ি আসেন। মায়েরা পা চালিয়ে আসেন গো।'

বলে, হেসে হেসে হাত তুলে নিজেই ডাকে। যেন সে লঞ্চের লস্কর খালাসী। সে-ই সবাইকে ডাক দিয়ে নেয়। শুধু তাদেরই নয়, অন্য দিকেও তাল ঠিক আছে, 'কই গো, মাহ্তো চাচা, কোথা গেলে। চাচীর হাত ধরে সাবধানে এসো।'

মাহাতো চাচা আবার কে! তার লক্ষ্য দেখে, চোখ ফিরিয়ে দেখি, মাহাতো চাচা সেই বিড়ি খাওয়ার সঙ্গী। দেখছি, মানুষ না চিনি দেখতে ভুল করিনি। সেই রক্তাম্বরী, তাম্বুলরঞ্জিনী, ধূমপায়ী মধ্যবয়স্কা, ঘোমটা টেনে এখন মাহাতো খুড়োর পাশে। চাচা তখনো পান কিনতে ব্যস্ত। শুধু বিড়িতে হয় না। চাচা চাচীর পান না হলেও চলে না। ততক্ষণে আমাদের পিছনে প্রৌঢ় এসে পড়েন সধবা কুমারীকে নিয়ে। গাজী আমাকে নির্দেশ দেয়, 'বাবু উপরে যান গিয়া। ছোট ঘর আছে, সেই ঘরে গিয়া বসেন।'

কথা শেষ হলো না, হঠাৎ টিঙ্ টিঙ্ করে ঘণ্টা বেজে ওঠে। সারেঙের দিকে তাকিয়ে দেখি, মাথার ওপর সে দড়ি ধরে টানে। আর দিক-দিশারীর টান পড়তেই, যন্ত্রের শব্দ যেন ছিটকে বেরিয়ে এল, ছাদের ওপর নলের মুখ দিয়ে। তার সঙ্গে অল্প ধোঁয়া। ছাদের ঘরের প্রথম শ্রেণীর কাছে গিয়ে ভয় পেলাম, ভিড় বাঁচাতে গিয়ে কান দুটি না খোয়া যায়। ঘরের মধ্যে ঢুকে শুনি, তেমন ঝালাপালা নয়। যেদিকে নল, সেদিকে কাঠের দেয়াল। ডাইনে বাঁয়ে জানালা। সামনেও কাঠের দেয়াল। ওপরে কাঁচের ঢাকনা ঘেরা সারেঙের আসন।

প্রথম শ্রেণী বলতে যেমন গদীর চিন্তা আসে, তা নয়। নিতান্তই নীরস তরুবরের তক্তাসন। তবে ভিড় বাঁচানো নয় কেবল। আসনে বসতেই মনে হলো, এপার ওপার দুই দিগন্ত আমার জানালায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এপারের হাসনাবাদকে মনে হয় যেন বিশাল এক গঞ্জ। ওপার বাঙলায় এ রকম নদীকূলের গঞ্জকেই বলে বন্দর। যে ঘাটে দূর দেশান্তরের নদীনালা ডিঙিয়ে আসে নানান্ জলযান। এপারেও দেখছি সেই রকম। তাকিয়ে দেখি, ঘাটে ঘাটে অনেক নৌকা। পিছনের বাঁকের দিকে আরো কয়েকখানা লঞ্চ। ওপারে উঁচু পাড়ের বাঁধ। এপারের ভিড়-ব্যস্ততায় মনে হয়, ওপারটা গাছপালায় রৌদ্রছায়ায় মাখামাখি করে জমিয়ে আছে নিবিড় নিশ্চুপে। যেন তার ঝোপে ঝোপে ঝাড়ে ঝাড়ে পাখিদের কলকাকলিও শুনতে পাই।

কিন্তু এখানেও সেই টানাটানি। লঞ্চে টিকেটবাবুর প্রত্যয় নেই, গাজী পয়সা দিয়ে যাবে। যন্ত্রের ডাক ছাপিয়ে শোনা যায় 'বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে পারব না বাপু।'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, গাজী ওপরে আসতে গিয়ে থেমেছে। বলছে, 'না দিয়ে যাবো কেন। বলছি যখন, দেবো, পয়সা দেবো। তয়, আমাকে উপরে গিয়ে বসতে দিতে হবে দাদা, মুরশেদের দোহাই। ওইটি দোয়া।'

বলতে বলতেই সে উঠে আসে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দ্যাখেন তো বাবু, মিছা বলব কেন, বলেন তো।'

বলে সে ঘরের বাইরে জানালার নিচেই ছাদের ওপর বসে। ওদিকে কাছি খোলবার তোড়জোড়। শেষবারের হাঁকাহাঁকি। হঠাৎ শব্দে, এদিকে তাকিয়ে দেখি, মোটা লেন্সের চশমা সহ এক জোড়া চোখ ঢুকে এল প্রথম শ্রেণীর ঘরে। পিছনে ভ্যানিটি ব্যাগ, ছাপা সিল্ক-এর শাড়ি, অশ্বলাঙুল কেশ। তাঁর পিছনে বাঙলা তাঁতের লালপাড় শাড়ি। মুচলেকার রক্তগরব সিঁথিতে কপালে।

প্রথমেই প্রৌঢ় কণ্ঠে বিরক্ত বিদ্রূপ, 'হুঁ, এর নাম ফাস্টো কেলাস্। নাও বসো। তুমি ওদিকটায় বসো। ঝিনি, তুই এদিকটায় বস্।'

বলে নিজে আমার পাশে বসলেন। বাকী দু'জন, আজ্ঞা বলো, নির্দেশ বলো, পেয়ে অন্য দিকের আসনে বসলেন। লঞ্চ তখন মোড় বেঁকে কোনাকুনি ওপার মুখে চলেছে।

কিন্তু মন গুণেই না ধন! সেই মনটা গেল মুষড়ে। ভাবা গিয়েছিল, ফাস্টো কেলাসের রাজ্যখানি একলা ভোগে লাগবে। ধেয়ে আসা দুই দিগন্ত দুই জানালায়। তার সঙ্গে মুখোমুখি করে যদি হাসি আসত, তাকে ঠোঁটে তুলে নেওয়া যেতো। যদি ভিতরে গুনগুনিয়ে উঠত গান, তাকে ছেড়ে দেওয়া যেতো গলার আগল খুলে। সেই যে ভরা প্রাণের তৃপ্তিখানি অকারণে চোখের জলে গলে আসে, তা যদি আসত, তাকে দেওয়া যেতো ভাসিয়ে। আর ঘরের বাইরে, জানালার ধারে মামুদ গাজী? এখন দেখি, সে তো যেন এই দিগন্তে একাকার। চলতে গেলে, মাথার ওপর আকাশ থাকে কিনা। এই যে রোদ, ওই যে ছায়া, পাখিপাখালি গাছগাছালি, ভেদে ভেদে অভেদ, অখণ্ড। গাজী দেখি সেই অখণ্ডের শরিক। সে ফাস্টো কেলাসের যাত্রী নয়। তার সভ্যভব্য ভদ্রতার দাবি নেই। সহবত শালীনতা সে চায় না। তার অখণ্ড একাকারে যেমন খুশি ছড়িয়ে দেওয়া যেতো।

তা হলো না। এখন শুধু ভাগীদারের ভাগাভাগির কথা নয়, এখন এ ঘরে জনপদ আর সমাজের আবির্ভাব হয়েছে। মূর্তিমান সভ্যভব্য ভদ্রতা নিয়মকানুন ঢুকেছে। এখন দিগন্তে ডুব নয়। ভিন্ যাত্রীর সুখ সুবিধা, অস্তিত্বের সতর্কতা। এখন এ ঘর দিগন্তের হাতায় নয়। এবার পায়রার খোপ। নড়ে বসো, চড়তে যেও না। তা হলেই মুখোমুখি, গায়ে গায়ে লাগালাগি।

বলবে, এ যাত্রী ভারী একালষেঁড়ে। এমন সুজন নয় যে, ন'জনে যাবে তেঁতুল পাতায়। ভাগের ভোগ জানে না। গণে জনে নেই, একা ভোগী স্বার্থপর।

তা বলতে পারো, যদি ধর্মে কয়। তবে, এলাম যে তেঁতুল পাতা থেকেই। সুজন কিনা জানি না, সমাজে সংসারে সেখানে যে ন'জনের ভাগাভাগিতেই বাস। সেখানে সকলেরই অন্নে জলে ভাগাভাগি, লাগালাগি মুখোমুখি। কিন্তু যখন নিরালায় মন টানে মন, তখন! তখন মাঠ খুঁজে তার ধারে যাওয়া কেন। দীঘির কূলে গিয়ে বসা কেন। ছাদের নিরালা কোণটিতে কেন আশ্রয় নেওয়া।

ওটা স্বার্থপরের কথা নয়। অনেক পড়শী তো আছে, সময় বুঝে একবার নিজের ভিতরে যে পড়শীর বসত, তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ইচ্ছা। তারা তোমাকে অনেক বলেছে, তুমি তাদের অনেক বলেছ। এবার নিজেকে নিজে একটু বলা-কওয়া হোক। কোথায় যাও, কেন যাও, কি চাও, কিসের খোঁজে। এবার তবে মন বন্ধই হোক। মন, চলো যাই খোপ ছেড়ে। দেহ থাকুক পড়ে। তুমি যাও দিগন্তে। ঘ্রাণে গন্ধ আসে সুবাসিত

প্রসাধনের। চুল ফাঁপানো সাবানের, গায়ে মুখে মাখা বস্তুর, জামাকাপড়ের সুগন্ধির। আসুক। আরো আসে ফুলেল তেলের। আসুক। কী যেন নাম! ঝিনি। বাতাসে যার চুলের ঝটকা লাগে। ডান হাতের চুড়িতে তার রিনিঠিনি। যাক গে শোনা। শ্রবণ বন্ধন করো। আবার দেখ, টুকুস্ শব্দ, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে যায়। ভিন্ পুরুষে শরম, চোখ ফিরিয়ে নাও। দেখছ না, গালের পাশে চুলের আড়ালে, সোমত্থ মেয়ের হাতে ছোট আরশি। আপন মুখখানিই যে পলকে পলকে হারায়। ঠোঁটের রঙ এর মধ্যেই হালকা। তাই মুখ আড়াল করে একটু রাঙিয়ে নেওয়া। এই জল-ভডভডিয়াতে দেখবে কে? আর কেউ না দেখুক, নিজের মন দেখবে। নইলে বড় অস্বস্তি। তোমার যদি বেমানান লাগে, মানিয়ে নেবার দিব্যি নেই। দৃষ্টি বন্ধন করো। তবে কিনা, বাতাসের মর্জি বোঝা দার। ঠিক এ সময়েই সে রঙ-ঝলকের আঁচল দিলো উড়িয়ে। কাঁধের কাছ থেকে গোটা পৃষ্ট ডানাখানিতে ঢাকনা নেই। তার সঙ্গে নগরবাসিনীর কোমর কষির ওপরে এক ফালি রোদের মতো গোরা রঙের ঝিলিক দেয়। কী বেলাজ বাতাস দেখ, অব্যর্থ চমকে দিয়েছে। ঝটিতি ঠোঁট রাঙানো সামলে নিয়ে আঁচলে টান দিলো। সেই ফাঁকে টুক্ করে দেখে নেওয়া, আপন জন নয়, ভিন্ মানুষে। চোখ ফেরাবার সময় পেলাম না। যুবতীর মুখে রঙ ধরে গেল।

নিজের ভিতরে দেখি, কে যেন চুপি চুপি হাসি সামলায়। মনের পড়শীর মজা লাগে। যোগী সে নয় বটে, কিন্তু মনে হয়, এ সবই যেন এ দিগন্তে একাকার। গাজীর মতো এও যেন ভেদে ভেদে অভেদ অখণ্ড। বেশ তো, বাতাস আসুক বেগে। যুবতী সাজুক। এ দিগন্তে সবই সাজে।

সহসা প্রচণ্ড হাঁক, 'হুঁশিয়ার!'

লঞ্চ উলটো পাড়ের সীমায়। জোয়ারের জল থইথই। উঁচু বাঁধের কাছ ঘেঁষেই লঞ্চ দাঁড়ায়। তার যন্ত্র বন্ধ হয় না। খালাসী হুঁশিয়ার বলে মোটা তক্তা এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দেয় বাঁধের ওপরে। তারপরে বাঁধের মাটিতে বাঁশ ঠেকিয়ে উঁচু করে ধরে। যাত্রী দুজন। জোয়ানের হাতে টিনের স্যুটকেস। জামার ওপরে, কোমর বেড় দিয়ে চাদর বাঁধা। কাপড় ঠেকেছে গিয়ে হাঁটুর কাছে। আর এক হাতে ধরা বছর কয়েকের ছেলে। তার গায়ে জামা আছে, কিন্তু তলায় কেন কিছু নেই, কে জানে। ওদিকে নাকের ফুটো দিয়ে দরানি ভেসে যায়।

যাত্রীদের ওঠার পরেই আবার তক্তা টেনে নেয় খালাসী। লঞ্চ মাঝদরিয়া নিশানা করে দক্ষিণে ভেসে যায়। যত দূরে চোখ যায়, নদী আর উঁচু বাঁধ। পশ্চিমে তীরে তবু কিছু গ্রাম চোখে পড়ে। আম জামের মাথা ছাপিয়ে সুপারি, তাকে ছাপিয়ে নারকেলের মাথা দোলানো। তাও যেন মনে হয়, গ্রাম অনেক দূরে। নদীর ধারে তাকে বেঁধে রেখেছে উঁচু পাড়। পাড়ের আড়ালে আড়ালে, গ্রামের বাইরে বাইরে, পাকা কিংবা আধপাকা, সবুজ-পাংশু ধানের খেত। পুব দিকেতে, উঁচু পাড়ের আড়ালে, মনিষ্যি চোখে যত দূর দেখ, কেবলই ধান। জনপদে ঘরে ঘরে এত যে নাই নাই, এখানে সে খবর নেই। এখানে সে যেন দিক-জোড়া দাতা কর্ণ। আর দেখ, তার সবুজে পাংশু ছোপ অথই-এর বুক থেকে, মাঝে মাঝে একটা লম্বা তীর যেন সোজা আকাশে উঠছে। উঠতে উঠতে হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। পাখিগুলোর নাম কী, কে জানে। দূর থেকে দেখি যেন হাজার প্রজাপতি উড়ছে। উড়তে উড়তে আবার ঝাঁপ খেয়ে ধান ক্ষেতে ডুব দিচ্ছে। হয়তো বন-চড়াইয়ের দল। ঘরেতে ওদের মন নেই, বনভোজনে মত্ত।

তবু এ নদীর পাড় যেন কেমন খাঁ খাঁ করে। চাংড়া চাংড়া মাটির ঢিবি, নদী বন্ধন করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও তার তেমন সবুজের সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে, দু'-চারটে

ঝাড়ালো গেমো গাছ। কোথাও নাম-না-জানা জলজ জঙ্গল। যেখানে পাড়ের নীচে কিছু কিঞ্চিৎ জমি জলে ডোবেনি, সেখানে গাঙ-শালিকদের নিঃশব্দ ঠোঁট খোঁচানো। এত বড় একটা জলযান যে দু' পাড়ে শব্দ ছড়িয়ে যায়, একবার তাকিয়ে দেখে না। বোধ হয়, এই পাঁকের পোকাশালে বসে রোজ দেখাশোনার ব্যাপার। যত ভয় তো অচেনাকে। ওই জল-ভুড়ভুড়িয়াকে দেখা আছে, প্রথম ডিম ফেটে বেরিয়েই।

'বাবু।'

কানের কাছেই ডাক শুনে ফিরে দেখি, গাজীর বাবরি বাঁধা পাগড়ি আমার মুখে লাগে প্রায়। বলে, 'কেমন বোঝেন বাবু?'

তার চোখের ঝিলিকে যেন রহস্য। ভুরু নেচে নেচে ওঠে। কী বোঝার কথা বলে গাজী? কথা আসে কোন্ বায় থেকে? জিজ্ঞেস করি, 'কিসের?'

গাজী ঘাড় দুলিয়ে, দূরের দিকে দেখিয়ে বলে, 'এই ভেসে পড়া?'

ভুলে গিয়েছি, এই ভেসে পড়া গাজীর মতলবে। ভালো লাগা, মন্দ লাগার দায় এখন তার কাঁধে। হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারি না। মনে হয়, এই যে কোথাও কিছুর শেষ নেই, তার মধ্যে আমার ভালো-মন্দ সব কিছুর হদিস যেন হারিয়ে গিয়েছে। বরং জিজ্ঞেস করি, 'এই রকম উঁচু পাড় কতখানি?'

গাজী বলে, 'যত দূর যাবেন। এ তো বাবু ভেড়ির বাঁধ, নদী সামাল দিয়ে রেখেছে। এক ফোঁটা জল যেন জমিনে না যেতি পারে।'

'কেন?'

'লোনা। এ গাঙের জল যে তিতা লোনা। ফসল হতি দেয় না।'

বাঁধ দিয়ে তাই নদী বন্ধন। এ জল যে নোনা, তা জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করি, 'ইছামতীর যে জল দেখে এলাম, সেও কি নোনা নাকি?'

'আজ্ঞা। ঊনিশ বিশ হতি পারে, তয় বাবু, লোনা। সাগর যে এখেনে আসা-যাওয়া করেন। এখানে বার মাস লোনা। এই টানের দিন এল, এবার একটু কম পড়বে।' বলে সে দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে। গাজীর সবই রহস্যময়, হাসবার কী আছে বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দেয় গাজী নিজেই, 'বাবুর যে কথা। বলে, যে জল দেখে এলাম, তাও লোনা নাকি। বাবু, মানুষ দেখে কি সুমন কুমন বোঝা যায়। জল দেখে কি কেউ বলতি পারে, লোনা, না মিঠা।'

যথার্থ কথা। নিজের বাস মিঠা জলের কূলে। গঙ্গার ধারে বসত। টানের দিনে সে জলের যেমন রঙ, এ জলেরও সেই রকম। তার জোয়ার ভাঁটায় যেমন তরঙ্গ, সেই তরঙ্গে রোদ যেমন চলকায়, এখানেও সেই রকমই দেখি। লোনা মিঠার স্বাদ নদীর গায়ে লেখা নেই।

'হ্যাঁ, কথাটা ভেবে দেখতে গেলে ঠিক বলেছ তুমি।'

বলে একটু লম্বা টানের হাসি। কথা ধরেছেন গলাবন্ধ কোট, কেশ বিবাগী মাঝ-মাথা। তিনি যে আমার মুখোমুখি, সেই খেয়াল নেই। অবাক হয়ে লাভ নেই, বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, কেশ বিবাগী মাথা দুলছে। যেন গাজীর সঙ্গে তাঁরও রহস্য চলেছে। তারপরেই ডাক দিয়ে বলেন, 'শুনছো, এই যে! ওরে ঝিনি, জানিস তো, এ জল কিন্তু লবণাক্ত। মানে সী ওয়াটার যাকে বলে।'

ওপাশের বেঞ্চ থেকে দু' জোড়া চোখ ফিরল বটে। পর মুহূর্তেই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি। যুবতীর হাসির মধ্যেও, লতা যেমন বাতাসে কাঁপে, তেমনি ভুরু কেঁপে যায়। সেই কাঁপনে হাসির ছটা নেই। ক্ষোভের বক্রতা যেন। প্রৌঢ়াও যেন একটু নাক-ছাবিতে ঝিলিক হানেন। গলাবন্ধ কোটকে যেন বিদ্ধ করতে চান। তাতে এই ধারণা হয়, সী ওয়াটার লবণাক্ত কি না, সে ভাবনার থেকে অন্য কোনো লবণাক্ত ভাবনা সেখানে।

কিন্তু কেশ বিবাগী মাথাখানিতে দরিয়ার ঝলক হেনে তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করেছেন, 'ইয়েস, রাইট, সল্ট ওয়াটারে ক্রপ্ নষ্ট হয়ে যায়, হানড্রেড পার্সেণ্ট করেক্ট।'

বলার ধরনটা যেন গাজীর কথায় আমার প্রত্যয় হয়নি। তাই প্রত্যয়সিদ্ধ করার দায় ওঁর কাঁধে। ঘাড় নেড়ে জানাতে হয়, কথাটা উনি যথার্থ বলেছেন। এ জল সল্ট ওয়াটার, এতে ক্রপ্ নষ্ট হয়। আর চেয়ে দেখি, গাজী গলাবন্ধ বাবুকে হাঁ করে দেখছে। মুরশেদ হাপিস্, গোসাবা-যাত্রী বাবুর কথা বীজমন্ত্রের থেকে কঠিন।

তা হোক, প্রৌঢ়া আবার উলটো আসনের দিকে মুখ করেছেন। মনে হয়, ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছাড়বেন। কে জানত, এই মানুষে কোন্ মানুষ আছে। সু কু ছাড়ো, দরিয়ার জল দেখলেই তার স্বাদ বোঝা যায় না। বললেন, 'টাকিতে, হাঁদুও ঠিক এই কথাই বলেছিল, বুঝলে। এই যে দেখছ বাঁধ, উঁচু উঁচু ঘোড়ির বাঁধ—।'

গাজী বাইরের থেকে জানালা দিয়ে মুখখানি আর একটু তুলে তাড়াতাড়ি বলে, 'ঘোড়ি নয় বাবু, ভেড়ি—ভেড়ির বাঁধ।'

কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়। এখন বিষয়ে আসা গিয়েছে। গাজীর দিকে হাত তুলে, উলটো আসনের দিকে ফিরে বলেন, 'ওই হলো। ঘোড়ি আর ভেড়ি, তোমাদের কোনোটারই কোনো মানে হয় না। বাঁধের আবার ঘোড়ি আর ভেড়ি।...তা বুঝলি ঝিনি, এতেই প্রমাণ হয়, লবণের একটা ক্ষয় করবার ক্ষমতা আছে...।'

এই পর্যন্তই। সহসা প্রৌঢ়ার সিন্দুরবিন্দুতেই যেন ধমক বেজে ওঠে, 'কী তখন থেকে ঝিনি ঝিনি করছ! অলকা বলতে পারো না?'

বলেই একবার খোপের ভিন্ যাত্রীটিকে দেখে নেওয়া। আহ্, এবার শোনো গূঢ় কথা। লবণাক্ত জলের বিচার এক দিকে, আর এক দিকে লবণাক্ত ভাবনা কোন্ ঢলে বহে, তাই দেখ। প্রৌঢ়ের অবস্থা যেন ভাসন্ত নৌকা আচমকা ডাঙায় ঠেক খায়। প্রথম শব্দ হয়, 'অ্যাঁ?'

শব্দের পরেই অধীনের প্রতি একবার কটাক্ষ। এখন কে লজ্জায় পড়ে, ভেবে দেখ। চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। সত্যিই তো, তখন থেকে ঘর করতে অষ্টপ্রহরের নাম ধরে ডাকা কেন। বাইরে লোকজনের সামনে কি পোশাকী নামটা বলা যায় না? ভিন্ যাত্রী তুমি না হয় 'ঝিনি' নাম ধুয়ে জল খাবে না। ঘরের লোক হয়ে তুমি ঘরবারটা বজায় রাখবে তো। একটা সাব্যস্ত বলে কথা আছে। গাজীর চোখে মুরশেদ অকূল। তার গোঁফদাড়ির ফাঁকে, হাঁ মুখে জিভখানি দেখা যায়। যেন সে আমাকে চোখে জিভে দুয়েতেই দেখে। দেহতত্ত্বের রহস্য থেকেও বড় রহস্য কী যেন ঘটে গেল, ধরতে পারল না।

প্রৌঢ় ততক্ষণে আবার ধরতাই ধরার তাল করেন, 'ও, সেই কথা বলছ। মনে থাকে নাকি সব সময়। আচ্ছা, অলকাই বলা যাবে। তোদের আবার...।'

আবার ঠেক্। বোঝা যায়, ইশারা হয়েছে। ভিন্ যাত্রীকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে সীমন্তিনী চুপ ধমকে চুপ করান। বোধ হয় সেই জন্যেই প্রৌঢ়ের গলায় পুরনো কথার জের ; যেন সহজ গলাতেই বলছেন, 'হ্যাঁ, ওই আর কী, নুনের কথা হচ্ছিল। নুন দেখবে, লোহা পর্যন্ত ক্ষইয়ে দেয়। এই যে বাঁধ দেখছ, ওই নোনা জলের জন্যেই। তা নইলে তো ধান কিছুই হতো না।'...

মনের দোষ, চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, উলটো দিকের সাড়া কেমন। কিন্তু পারা গেল না। ভিতরে যেন কোথায় ভিন্ যাত্রীর আত্মসম্মান টনটনে হয়ে ওঠে। অথচ, তার মধ্যেই কোথায় একটা কুলু কুলু শব্দ বাজে। তবে সাবধান, হাসি নিষেধ। গাজীকে জিজ্ঞেস করি, 'এ নদীতে ঘাট নেই? কেউ চানও করে না?'

এখন এক চোখের পীড়া। মনেও সেই পীড়া লাগে। লোনা বলে কি সেই দরিয়ার কূলে মানুষের ছায়াও পড়তে নেই?

গাজী ভুরু তুলে চোখের ফাঁদ বড় করতে চায়। বলে, 'দোহাই মুরশেদের, অমন কথা কবেন না বাবু। এ জলে যে শমন আছে।'

'শমন? সে আবার কী? কুমীর নাকি?'

'না বাবু, কুমীর নয়, কামট?'

'সেটা কী রকম?'

'সে বাবু বেজায় রকম। কুমীরের মতন উনি ডাঙায় ওঠেন না। জলে ডুবে ডুবে ধারে কাছে ঘোরাফেরা করেন। একবার কেউ নামলি হয়। যেটুকুন পাবেন, এক গরাসেই সাবড়ে নিয়ে যাবেন।'

খোপের ঘরে ভয়ের ডুকর্যানি, 'মা গো!'

তাকিয়ে দেখি, ঝিনি বলো, অলকা বলো, ভয়ে শরীর হিলহিলানো। গাজীর দিকে কাজলকালো চোখে যেন আস্ত কামট ভাসে। প্রৌঢ়ারও সেই অবস্থা। গলাবন্ধ কোটের হাল দেখবার আগেই গলা বেজে ওঠে, 'ডেঞ্জারাস্! হাঁদু বলেছিল বটে—।'

ততক্ষণে গাজী আবার ধরে দিয়েছে, 'তা বাবু, যার যেখেনে বাস, না কী বলেন। ইদিককার গোটা গাঙ জুড়ে ওঁয়াদের রাজত্ব। কুমীর মশায়ের থেকে ওঁয়ারাও বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু কম ধরেন না। এই যে মোটর লঞ্চখানি চলেছে, জলে গিয়া দেখেন, ওঁয়ারাও সঙ্গ নিয়ে চলছেন।'

'কেন?'

'যদি আজ্ঞাঁ মানুষটা জানোয়ারটা পড়ে, ওর একটু ভোজ হয়।'

উলটো আসন থেকে আবার মেয়ের আর্ত রব, 'ও মা, শুনেছ?'

প্রৌঢ়া সীমন্তিনী গলাবন্ধ কোটের দিকে ফেরেন। তাঁরও যেন বুক ধড়াসে যায়। বলেন, 'হাঁদু তোমাকে কিছু বলেনি?'

প্রৌঢ়র সামনে যেন কামটের হাঁ। ঘাড় নেড়ে বলেন, 'নো। মানে, হাঁদু আমাকে কামটের কথা যেন কী বলেছিল, কিন্তু এ রকম কিছু বলেনি। বাট দিস্ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, তার বলা উচিত ছিল।'

কেন, জলে পড়ে নাকি সবাই। কামটেরা ঘিরেছে নাকি। জলযানে এত মানুষ, মেয়ে মদ্দ ছাঁ, যারা ঘর করে এই নদীর কূলে, তাদের প্রাণ কি সব হাতে নাকি। খবর কি তাদের অজানা? তাই যদি তো, যাত্রা কেন। গন্তব্যে পাড়ি কেন। তবে হ্যাঁ, বলতে পারো, সংবাদ নতুন। অচিনকে বড় ভয়। তা বলে তোমাকে কেউ কামটের মুখে নিয়ে চলেনি। যদি ধরে নেওয়া যায়, সম্পর্কে এই তিনে বাপ-মা-মেয়ে দেখ গিয়ে, আরো অমন বাপ-মা-মেয়ে যায় এই জলযানে। অন্য মানুষে কি ধেয়ান নেই। কিন্তু আমি দেখি মুরশেদ নামের মজদুরকে। তার কালো চোখের ঝিলিকে, দাড়ির ভাঁজে হাসিতে এখন যেন সে আর গাজী নয়। শমনের দোসর নাকি সে। যেন অকূলে ভাসিয়ে এখন প্রাণ নিয়ে খেলা করে। 'ইষ্টনাম জপ করো হে, কালের দেশে এবার কাল ঘনিয়েছে।'

না, শমনের দোসর নয়, খবর দিয়ে মজা দেখে। নিজেই তাড়াতাড়ি জানালায় হাত তুলে বলে, 'ডরাবেন না মা-ঠাকুরন! অ দিদি, কিচ্ছু ডর নাই। ওঁয়ারা তক্কে তক্কে থাকেন বটে, তয় জানবেন, মানুষকে ভয় পায় না এমন জীব খোদায় বানায় নাই। তয়, হ্যাঁ, এই সব গাঙে চলাফিরা করতি গেলে একটু হুঁশিয়ার। পড়লেন আর ধরলে, তা নয়, তয় বলা তো যায় না, এই আর কি। এ'য়ারা আবার মানুষজনের কাছাকাছি থাকেন কিনা।'

গাজীর এক হাতে বরাভয়, আর এক হাতে ভরাডুবি। এক বাক্যিতে নেই সে। ভয়ের কিছু নেই, তবে হ্যাঁ, অসাবধান হলে সেটা কপালের লিখন। এখন যেমন বোঝো। কাজের কথা জিজ্ঞেস করি, 'সে রকম দুর্ঘটনা ঘটে নাকি?'

গাজী বলে, 'তা বাবু, যা নিয়া আপনার ঘর করা, তা একেবারে রেয়াত না দিলি কি চলে। এই তো সিদিনের কথা বলছি। ডাঙায় কাজ সেরে জলের জন্যি গেলে তুমি গাঙে। তোমার জম্‌মো কম্‌মো এখেনে, সব তোমার জানা। অই, বলে কে, এজলাসের ফারমান এসেছিলেন। যেই গিয়া হাঁটুভর জলে নেমে বসা, অমনি জরিমানা। হাঁটুর কাছ থিকে কুটুস্‌ করে একখানি পা।'

কুটুস্‌ করে একখানি পা। বাহ্‌ গাজী, এজলাস ফারমান জরিমানা বলে টুকুস্‌ টুকুস্‌ দিচ্ছে বেশ।

ওদিকে গলাবন্ধ কোটের রুদ্ধ উত্তেজিত গলা, 'নেকস্‌ট? তারপর?'

'তারপর আর কী। হাঁকে ডাকে লোকজন গিয়া তুলি নিয়ে এল। পাঠিয়ে দিয়া হলো বসিরহাটের হাসপাতালে। ততক্ষণে পচন ধরেছে। ওই এক ব্যাজ, বিষ বড় খারাপ। দেখতি দেখতি পচে, আর—।'

গলাবন্ধ কোট ধমকে ওঠেন, 'আরে দুত্তোরি পচাপচি, লোকটা বাঁচল কিনা বলবে তো।'

গাজীকে চেনা ভার। তখনো দাড়ির ভাঁজে, ফাটা মুখে মিটিমিটি হেসে বলে, 'সে 'জব' তো আগেই দিলাম বাবু। বললাম না জরিমানা। নইলে তো ইস্‌তেমাল হতো। ফাঁসির হুকুম হয় নাই। তয়, উরুতের কাছ-খান অবধি বাদ দিতে হয়েছিল।'

প্রৌঢ়ার গলা, 'কী সর্বনাশ!'

প্রৌঢ় চোখ ঘুরিয়ে তাল দেন। 'অবকোর্স!'

ঝিনি না অলকা যার নাম, সে বুঝি সাজ-পোশাক ভুলে যায়। ভয়ে আর বিরক্তিতে ঠোঁট উলটে বলে, 'কী বিচ্ছিরি জায়গা। আগে জানলে কে আসত।'

গাজী আবার অভয় দেয়, 'ডরাবেন না দিদি, ও সবই নসীব। এই যে এত লোক আছে, কেউ যায় না, তুমি কেন গেলে? তোমার অজানা তো কিছু না। এই ধরেন না, আপনাদের কলকাতায় দেখেছি, এই পেকাণ্ড গাড়ি, মানুষ গুঁড়িয়ে দিয়ে দৌড়। সে রাস্তাও তো কামটের গাঙ দেখি।'

গলাবন্ধ ধমক দিলেন, 'আরে তুমি থামো। কোথায় কামটের নদী, আর কোথায় কলকাতা। সেখানে লোকে গাড়ি চাপা পড়ে অসাবধানে।'

গাজী হেসে সাক্ষী মানে স্বয়ং প্রৌঢ়াকে, 'অই শোনেন বাবুর কথা, আমি তো সেই কথাখানিই বলছি। বেহুঁশিয়ার হয়েছ কি গেছ। না, কী বলেন মা, অ্যাঁ? আবার দ্যাখেন গিয়া, যে গাড়ির তলে মানুষ, সেই গাড়ি চালায় মানুষে। এখেনে দ্যাখেন গিয়া, রোজ একটা-দুটা কামট জেলের জালে ধরা পড়তিছে, আর মুগুরের মার খেয়ে মরতিছে।'

প্রৌঢ়াঃ 'ধরা পড়ে?'

অলকাঃ 'দেখতে কেমন?'

গাজী দিদির কথারই 'জব' দেয়, 'সে আর বলতি হচ্ছে না দিদি, একেবারে শোরের মতন। দাঁত যদি দ্যাখেন তো ভিরমি। ছুতোরের করাতকে বলে ওদিক থাক। অইরকম দু' পাটি।'

অলকা নাম্নী গালের চুল সরাতে ভুলে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কত বড় হয়?'

'কুমীরের মতন অত বড়টা হয় না, একটু ছোট। ওর গায়ে চাকা নাই।'

দিদির মুখের অবস্থা দেখে গাজীর বুঝি আবার হাসি ফোটে। কামটের দুঃস্বপ্নে দিদির ঠোঁটের রঙে আর তেমন ঝলক লাগে না। গাজী বলে, 'কোনো ডর নাই দিদি, মনের সুখে যান।'

গলাবন্ধ কোট প্রায় কাঁচকলা দেখান। বলেন না, বলা ভালো, খেঁকোন; 'মনের

সুখ আর রাখলে কোথায় বাবা।'

অধীনে ভাবে, তা বটে, সব যে কামটেই খেল। আর সে দায় যেন সব গাজীর। এবার বোধ হয় গাজী তাই দায়-ভঞ্জনের বাণী বলবে। কিন্তু না, তাকিয়ে দেখি, গাজীর দাড়ি ওড়ে বাতাসে। সে আমার দিকে চেয়ে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে দেখে গলাবন্ধ বাবুকে। এমন কেউ নেই, ওর দাড়ি নেড়ে দিয়ে বলে, 'পাজী।' মুরশেদের নামে বেশ মজায় আছে। কিন্তু এই চোখের মজার সাক্ষী একমাত্র আমি কিনা তা বোঝবার জন্য চোখ ফেরাতে হয়।

না, অন্য সাক্ষীরা তখন নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত। এই অঞ্চল যে একদা সুন্দরবনের মধ্যেই ছিল, প্রৌঢ় মা-মেয়েকে তাই বোঝাচ্ছেন। যদিও মেয়ের চোখের নজরটা কোন্ দিকেতে খেলছে, তা বোঝা আমার কর্ম নয়। শুনেছি কিনা, চোখে অনেক সময় মন বসত করে। তখন আর নজর মেপে নজর বোঝা যায় না।

এদিকে গাজী গলা যতই নিচু করুক, তার মুখটা আমার শ্রবণ থেকে দূরে নয়। শুনি সে গুনগুনায়, 'অসুখ যেখেনে, সুখ সেখেনে, ক্ষ্যাপা, খুঁজে দ্যাখ না মনে মনে।'

বাইরে ফিরে তাকাই। যে গাঙ নিয়ে এত কথা, সেই গাঙের জল দেখি। আকাশের নীলের ঝলক রৌদ্রে চলকায়। যেন গলানো রূপায় নীলায় খেলে যায়। এত ছলক বলক কিসের। ছলক বলক ভাঁটার। উজানী গাঙ কখনো সাগরের ডাক শুনেছে। যেন মায়ের কাছ থেকে মেয়ে ছুট দিয়েছিল। ডাক শুনে ঢলে দৌড় দিয়েছে। ছলক বলক তাই, 'যা-ই, যা-ই।'...জোয়ারে পাবে নীরবতা। পাবে আশমান-ছায়া আরশি। এই নদী দেখে কে বলবে তার জল নোনা, তলায় অভর পেটের ক্ষুধা, হাঁ করে আছে। মানুষ দেখে যখন সু-কু মনের হদিস পাও না, জল দেখে পাবে কেমন করে। ঘর করো কূলে থাকো, জানবে।

এখন গ্রামের খোঁজ নেই। গ্রামগুলো সব কোথায় গিয়েছে, দিগন্তে তার কোনো ঠিকানা দেখা যায় না। ভেড়ির বাঁধের শেষ নেই, দু'পাড় ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। হুঁশিয়ার নোনা গাঙ, এখানে আমাদের সোনা মোহরের সিন্দুক। যা করো বাঁধের সীমায়, এদিকে নজর দিও না। বাঁধের গায়ে মাঝে মধ্যে গাছ চোখে পড়ে। অধিকাংশই গেমো, ঝাড়ালো খাটো খাটো। আর এক ধরনের গাছ, তার নাম জানা নেই। ইচ্ছে করে বলি, কৃষ্ণচূড়া। সায় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণচূড়া যেমন ছড়ায়, তেমনি উঁচুতে ওঠে। আর, এ যেন কেবলই ছড়ায়, আর ছড়ায়। ক্রমে ক্রমে পাখির ঝাঁকের মেলা লাগে। লাগবেই। নদী যায় ভাঁটায়, চর জাগে জগতে। নোনা পলিতে অনেক খাবার ছড়ানো। ঠোঁট ঠুকে তুলে নেওয়া। দিনান্তে তো দুই দফে খাওয়া, দুই ভাঁটিতে যা পাওয়া যায়। গাঙ-শালিকেরা দুয়ে চারে চলে না, ঝাঁকের ভিড়ে তারা অগণ্য। তার ওপরে, পলির রোদে ছায়া পড়ে দেখায় যেন অজস্র। ফাঁকায় ফাঁকায় আছেন ধার্মিক, কালো আর সাদা। বকধার্মিক। নজর একটু বড়র দিকে।

বাঁধের ওপারে মানুষের আহার। চরায় পাখির ভোজ। জলে যে ফেরে, হয়তো সে হিংস্র, জীব-নিয়মের বাইরে নয়। গাজীর বলা কলকাতার পথের কথাটাও ভুলতে পারি না। তবু সব মিলিয়ে এই দিক্‌হারা দিগন্তে কে উদাসী বিরাজে। মন বলে, চলো যাই এক অচিন স্বপ্নের খোঁজে।

তখন শুনি, মোটর-বাসের ভেঁপুর মতো প্রায় কানের কাছেই প্যাঁক প্যাঁক বাজে। তারপরেই টিঙ্ টিঙ্ ঘণ্টা। অমনি ছাদের চোঙায় ভড় ভড় শব্দ মন্থর হয়ে যায়। ভুলে যাই, আমার কাঠের দেয়ালের আর একপাশেই সারেঙ বসে আছে। তাকিয়ে দেখি, সামনেই বাঁধ। নদী কখন মোড় ফিরেছে, খেয়াল ছিল না। দেখছি, মাঝদরিয়া

ছাড়িয়ে কখন বাঁধ আমার হাতের কাছে। কী যেন কয়েকটা নাম-না-জানা গাছ বাঁধের বুকে। দূরে একটি কালচে রেখায় গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের যিনি মাথা, সেই স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃক্ষ নারকেল মাথা তুলে আছেন। গোটা দশ-পনের যাত্রীতে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে। এদিকে দেখ, এখনো লঞ্চ থামেনি। খালাসীর কাঠের সিঁড়ি নামেনি। টিকেট কাটার ঝামেলা নেই। সে-সব লঞ্চে উঠেই হবে। বাঁধের ওপর তো কয়েকটি গাছ ছাড়া একখানি পাতার ঘরও দেখি না। এ কেমন ঘাট, কে জানে।

যাত্রীদের মধ্যে কর্তা গিন্নি সাহেব বিবি ছাওয়াল পাওয়াল সব রকমই আছে। বোঁচকা-বুচকির মধ্যে একজনের হাতে যেটি চোখে পড়ে, সেটি একটি নধর ছাগলছানা! বেচরীর চোখে কী তরাস! গলায় কাতর ডাক। মাকে ছেড়ে হয়তো যেতে হচ্ছে। জন্মভূমিও বটে। কোথায় নিয়ে যায়, কে জানে।

সিঁড়ি পড়তে না পড়তেই যাত্রী পা দেয়। তবে এবার বাঁধের গায়ে নয়। জল নেমে গিয়েছে ভাঁটায়। সিঁড়ি গিয়ে লাগে চরায়। সবাই নেমে এসে ওঠে।

উঠুক, কিন্তু যেভাবে সব হাঁটুভর পাঁক ঠেলে উঠছে, পিছলে না পড়ে। অনেকেরই টলমল ভাব। তার থেকে বেশী ভয় লাগে কলাবউটিকে দেখে। তবে উনি বউ কি বিবি, কে জানে। লম্বায় হাত তিনেক, বহরে বড় দেখি। লালপাড় বাসন্তী রঙের জমিনে বেজায় লাল ফুলের ঝলক। তা বলে মুখ দেখতে পাবে, সে আশায় নিম্ন্যই। শাড়ির মধ্যে কোথায় যে আছেন, তা আর খুঁজি পেতি হস্‌সে না।

তা বেশ তো, হায়া বজায় থাক, কেউ কি একটু হাতটা ধরতে পারে না। পারতো, যদি মা শাশুড়ী থাকতো। স্বামীতে হাত ধরলে আর হায়া কোথায় থাকে। তিনি তো বোধ হয় ইতিমধ্যে লঞ্চে উঠে পড়েছেন।

আহ্‌, কী অশুভ ভাবনা দেখ। বউটি কাঠের সিঁড়ি থেকে হাঁটা দিলো একেবারে ডাইনে বেঁকে। গেল গেল শব্দ ওঠার আগেই বউ নিচে। একে বলে দক্ষিণের পলি পাঁক। একেবারে কোমর অবধি নিচে। অমনি ঘোমটা ফাঁক। এবার দেখ, ভোট-জড়ানো আট-দশ বছরের মেয়েটি। শ্যামা শ্যামা তেলতেলে মুখখানিতে দুলে নোলকে সাজ। কপালে সিঁথেয় ডগডগে সিঁদুর। চিলের মতো এক চিৎকার, 'আঁ আঁ বাবা গো।'...

বউয়ের কান্না, লোকের গেল গেল, তার মধ্যেই একজনকে দেখা গেল, এক লাফ।

মন্দর এদিক নেই, ওদিক আছে। হাতের বোঁচকাটি তিনি ছাড়েননি। কালোর ওপরে গতরখানিও বেশ দশাসই। গোঁফের রেখামাত্র পড়েছে। ব্রণ কিংবা ডাঁশ মশার কারবার কে জানে, মুখখানি বাঁধের মতোই এবড়োখেবড়ো। বোঝা গেল, কলাবউ, ওঁরই গিন্নী। টান দিয়ে তুলে একেবারে শিবের বুকে সতী। কে যেন আবার হেঁকে বলে, 'বউ তো?'

ভেবেছিলাম, রাগের জবাব আসবে। তাই কখনো হয়। ওই সংসার খাওয়া পাঁক ঠেলে উঠতে উঠতে মন্দ হাসি চাপতে পারে না। সলজ্জ হেসে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।' তারপরে শোনো হাসি। ছাদের খুপরিতেও হাসি। খিলখিলিয়ে উঠছে। মায়ে মেয়েতে গড়াগড়ি। কেবল কর্তার মুখ বিরস। ঘটনা দেখতে দেখতে বলেন, 'যাচ্ছেতাই। ননসেন্স!' গাজী ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাসতে হাসতে হাঁক দেয়, 'ভাগ্যি চোরাবালি নয়, তালে আর বউ পেতি হতো না হে।'

বেচারী ছাড়া কী বলবে। তখন হাত ধরেনি। এখন কাঁধে ফেলে তুলছে। নিজের গায়ে অমন পাট-ভাঙা নীল রঙের জামাটা কাদায় মাখামাখি। বধূটির মাথায় আবার খোঁপা। মুখখানি স্বামীর ঘাড়ে গোঁজা। লজ্জা করে না বুঝি। হতে পারে আট দশ বছর বয়স। বউ তো।

কর্তা গিন্নী উঠতে না উঠতেই সারেঙের ঘরে টিঙ্‌ টিঙ্‌। অমনি যন্ত্রের গর্জন

জোরে বেজে ওঠে। লঞ্চ মোড় ঘুরে সরে যায়। খালাসী সেই অবস্থায় সিঁড়ি টেনে তোলে। দিগন্ত আবার খুলে যায়।

মাঝ নদীতে এসে মনে হয়, একটু আগের সমস্ত ঘটনা যেন বহুদিন গত। এ যাত্রা নিরবধি কালের। কিন্তু ওদিকে মায়ে-ঝিয়ের হাসাহাসি থামেনি। বাইরের দিকে মুখ করে তাদের কথা চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে, কাজলকালো চোখের কোণে, খুপ্যিরিটাকে এক নজরের তদন্ত। কেন, সে কথা পুছ করো না। জীবন-মনের কি একটা ধর্ম নেই! কথাবার্তার টুকরো যেটুকু ছিটকে আসছে, তাতে পাঁকে পড়া কলাবউ এবং স্বামী সংবাদই আলোচ্য।

'ওরে, তোদের হাসি যে থামে না!'

প্রৌঢ়ের প্রাণে বোধ হয় সইল না। যদিও গলায় তাঁর রাগ বিরক্তি নেই। বরং, একটু ধন্দে পড়ি, টাকের থেকে ওঁর চোখমুখই যেন ঝলকাচ্ছে বেশী। কখন আসনের ওপর পা তুলে নিয়েছেন। জোড়াসন করে বসে বেশ একটু মেজাজেই যেন হাঁটুতে তবলার ঠেকা তাল মারছেন। ঘন ঘন খাঁকারি কয়েকবার। তারপরে, ওঁর পক্ষে গলা বেশ নামিয়েই বললেন, 'দেখ্‌ ঝিনি, তাই যদি বলিস্‌, বিয়ের সময় তোর মায়ের বয়স ছিল কত, জিজ্ঞেস কর। খুব বেশী তো এগারো, না কী বল।'

উলটো আসনে প্রথমে চমক। ঝিনির তো মুখের প্রলেপ ছাপিয়ে রক্তাভা ছলকায়। প্রৌঢ় ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও ভিন্‌ যাত্রীটার দিকে একবার দেখে থস্‌ করে ঘোমটা টানেন। তার পরের ঘাড় ফেরানোকে নীরব ঝামটা বলে কিনা জানি না। তবে যে কথাটা জানা ছিল, যুবতী বিহনে অনেক কিছু মানায় না, আর তা বলতে পারবে না। কাঁচা-পাকা চুলের মাঝে সিঁদুর পরা প্রৌঢ়াকে যেন যুবতীর থেকে মিষ্টি দেখি! কিন্তু সাক্ষী মানেন নিজের ডাগর মেয়েকেই, 'দেখছিস? ভীমরতি!'

এবার দেখ মজা। প্রৌঢ়ের মেজাজ এখন চলন্তা। ষাটের ঘর থেকে কুড়ির ঘরে ফিরে গিয়েছেন, না দশের ঘরেই, তা কে জানে। বলেন, 'আরে তাতে আর কী হয়েছে, একটা কথার কথা বই তো নয়। এ তো ছেলেমানুষ, না কী বলেন।'

কাকে বলেন। চোখ তুলে দেখি, নজর ভিন্‌ যাত্রীর দিকে। হতে পারে ভুরুতে সাদা রঙ লেগেছে, কেশ মাথা ছেড়ে গিয়েছে, চোখের চারপাশে রেখার ভাঁজ। তবু যেন দুটি তরুণ চোখে রঙের ঝিলিক। ছেলেমানুষ বললেও, 'আপনি' সম্বোধনের ভব্যতাটা আছে। কিন্তু শেষে সাক্ষী কিনা সকল লজ্জা যার তরে। মাথা নেড়ে সায় দেবার সাহস নেই। কথা বলা আরো কঠিন। তবু সাক্ষী একেবারে কানা কালা বোবা হয়ে থাকতে পারে না। কোনো রকমে একটু হাসো।

হাস্য পরে, তার আগেই ঝিনির গলায় চাপা ঝঙ্কার, 'আঃ বাবা, চুপ করো না!'

না, বাবা আর তা মানবেন না। বলেন, 'ওই তোদের এক দোষ ঝিনি। আমি কথা বললেই তুই আর তোর মা খালি চুপ করতে বলবি।'

মা এবার সরোষে বলেন, 'আবার ঝিনি ঝিনি কেন, বারণ করা হলো না?'

কিন্তু চলন্তার টান জানো না। সেই স্রোতে সব কুটোকাটি হয়ে ভেসে যায়। বলেন, 'আরে আগের কথা থেকে যখন বলেই ফেলেছি, এখন আর না বললে কী হবে। এর তো জানাই হয়ে গেছে।'

বলে হাত উলটে তুলে দেখান আমার দিকে। এখন কে ফাঁপরে পড়ে দেখ। ইচ্ছা করে হেঁকে বলি, 'আজ্ঞে না, জানা নেই' এখন না যায় বাইরে মুখ ফেরানো, না যায় মুখ নিচু করা। তার চেয়ে ভরাডুবি, দাঁত দেখিয়ে ঘাড় নাড়া।

ওদিকে মায়ে-ঝিয়ের নাড়ি বন্ধ। মুখে কথাটি ইস্তক নেই। চেয়ে দেখি, পরস্পরে মুখোমুখি, চোখাচোখি। তারপরে খোপ ফাটানো হাসি। সেই এক রকম আছে না, এ

লোকের কথা শুনে হাসব না কাঁদব। সেটা এক কথার কথা। কাঁদলে রসাতল। কিন্তু এ সে ঠাঁই নয়। তাই মায়ে-ঝিয়ের হাসিতেই খোপ ফাটে। হাসির মধ্যেই একজনের গলায় শোনা যায়, 'কী জ্বালাতন!' আর একজনের, 'বাবাকে নিয়ে আর পারা যায় না সত্যি।' বলতে বলতে দুজনেরই নজর একবার ছুঁয়ে যায় ভিন্ যাত্রীর মুখ। যদিও তাতে হাসি থামে না। এ মা-মেয়ে, না দুই সখী? ধূসরে আর কালো কেশে, মুখের রেখায় আর নিভাঁজ ললিত মুখ দেখে মন বিচারে যেও না। মনবুঝের ছন্দ আছে মনে মনে। পুছ করো গিয়ে প্রকৃতিকে। মায়ের কাছে ছাড়া কি মেয়ে হতে শেখা যায়। ছেলেরা যে সবাই ছেলে। বাবাও তো এক ছেলে। অবুঝ ছেলে। আর মেয়েতে মেয়েতে মা-মেয়ে। প্রকৃতি রহস্যের জানাজানি এই দুজনে। ভাবের দরিয়ায় খেল্ যদি ঠিক থাকে, তবে মা-মেয়েতেও সখী।

কিন্তু ভিন্ যাত্রীর মুর্দা হাল। ভিতরে কলকলায়, বাইরে আসতে পায় না। সহবত নেই নাকি। হতে পারো তুমি এক সাক্ষী।

তা বলে, মহিলারা হাসলে তুমিও কি হাসবে। দম রাখো, দমিয়ে রাখো। চোখে মুখে যদি ফুটে বেরোয়, তার কি উপায় আছে। আকাশে সূর্য থাকলে রোদ দেখা যাবেই।

তবু একবার গাজীর দিকে চোখ না পড়ে যায় না। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। অথচ চোখ দেখে মনে হয়, এ গাজী চোরা। যেন কোনো দূরের এক ফাঁক থেকে চুপি চুপি দেখে। দেখে, আর মিটিমিটি হাসে দাড়ির জটায়। ইস্, যেন অন্তর্যামী বসে আছেন, মজা দেখেন বসে বসে।

প্রৌঢ় কিন্তু বেহাল নন এক ফোঁটা। ওদিকে হাসির দগর, এদিকে উনি চোখ দু'টি উপচে বলেন, 'তা কি আর মিথ্যে বলেছি, কী বলেন? আপনি কি আর ওর ঝিনি নামটা শুনতে পান নি?'

পেয়েছি নাকি? কই, জানি না তো। কন্যে ঝিনি না অলকা, ভিন্ যাত্রীর তা জানতে নেই। কিন্তু, সে তো আপন বুঝ। এখন সোজা কথার জবাবটা যে চাই। তবে ওই শোনো, আমি মুখ খোলবার আগেই ঝিনি কেমন ঝঙ্কৃত হয়, 'আচ্ছা হয়েছে বাবা, উনি শুনতে পেয়েছেন।'

পরম উদ্ধার। কৃতজ্ঞতায় একবার চোখ তুলে না তাকালে মানায় না। উদ্ধারকর্ত্রীও দেখি, নজরে রেখেছেন। ভাবখানা, 'আমার বাবা এমনি মজার।' এ রকমটা হলে তবু একটু গলা খুলে কলকলানো যায়।

ওদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে নাকছাবির ওপেল্ পাথরে ঝিলিক। এই দিগন্ত যেন বিচার করে, ওঁর গলায় কপট রোষ কি না। বলে, 'তাতে হয়েছে কী।'

একে বলে মিঠে ফোঁসানি। কর্তা গলাবন্ধ কোট সহ বুকখানি সামনে চিতিয়ে আনেন। তর্জনী দিয়ে নিজের হাঁটুতে ঠুকে বলেন, 'হয়েছে তো তোমাদেরই। আমি বলছি, নাম কখনো খারাপ হয় না। আপনি কী বলেন, ঝিনি নামটা খারাপ?'

মুখ দিয়ে যেন তাড়াতাড়ি অপরাধ ভঞ্জন করি, 'না না।'...

বলেই শিরদাঁড়াতে কাঁটা। শরীর একেবারে আড়ষ্ট। ছি ছি, এ মুখ খুলে গেল কী করে! ভয়ে, নাকি সহবতে। উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে এবার হার মানার হাসি। এ মানুষ নিয়ে কী করা যায়!

কিছু না। চলন্তার জল ধরে রাখা যায় না। তিনি কল্ কল্ করে চলেছেন, 'জানিস্ তো, এ নামটা রেখেছিলেন তোর ঠাকুর্দা—।'

কথা শেষ হতে পায় না। তার আগেই গিন্নি ঝেঁজে কোপ দেন, 'তা সে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার দরকারটা কী।'

কর্তা কোপেও কাটেন না। বলেন, 'না দরকার কিছু নয়। বাবা তো খুব ভালোবাসতেন ঝিনিকে। শেষ দিকে তো খালি ওকেই কোলে নিয়ে বসে থাকতেন, আর বলতেন, "ঝিনি ঝিনি ঝিনিক ঝিনিক, ঝিন্কি জগো ঝম্পো ঝাঁ।" তোমার মনে আছে সেই কথা?'

পরিবারকেই জিজ্ঞাসা। মা-মেয়ের আবার হার মানা। মা বলেন মেয়েকে, 'দেখছিস্ তো।' দেখছে কিন্তু সামলায় কে। প্রৌঢ় বলেন, 'না, কথাটা উঠল, তাই আর কী। নাম কাকে বলে। নাম হলো একটা জিনিসকে বা কাউকে বিশেষভাবে বোঝাবার জন্যে, কী বলেন। তুমি একটা কালো পাখি দেখিয়ে বললে, এটা কাক, আর একটা সবুজ ফল দেখিয়ে বললে, এটা কাঁকুড়, এই রকম আর কী। মানুষের বেলায় তা হয় না, তখন তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখন তুমি যদি বলো, অমুক ইস্কুলের অমুক রিটায়ার্ড হেড মাস্টার এই লোকটা, তা বললে হবে না। তখন আমার নামটাও বলতে হবে ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী।'

খবরদার, বিষম লাগে না যেন। এমন নাম অতীতে শোনা না থাকতে পারে। কিন্তু সামনে মাস্টারমশাই। হেড মাস্টারমশাই। কথার থেকে সে রকম একটা ধন্দ মনে ছিল। শ্রীমুখে সেই জবানি আপনি ফোটে। তবু কোথায় যেন একটু রকমফেরের খেলা দেখি। এ যেন সেই কঠিন-দৃষ্টি কুটিল চোখ নয়। হাসতে মানা রামগরুড়ের ছানা, পান থেকে চুন খসার নীতিতে থমথমে নয়। ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী হাত ঝটকা দিয়ে বলেন, 'তা সে কথা যাক। যে কথা নিয়ে কথা উঠল, তোর মা'র কথা বলছি. এগারো বছর বয়সে সেই মুর্শিদাবাদের সিল্কের ভোট জড়িয়ে—।'

এবার একেবারে রসাতল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা এবার জোর কষুনি দিলেন, 'দেখ্ ঝিনি, এবার কিন্তু আমি সত্যি রাগ করব বলে দিচ্ছি। আদিখ্যেতা হচ্ছে।'

বলেই মুখ একেবারে দিগন্তের আকাশে। এবার দেখ হেডমাস্টারের হাল। বাঁধানো দাঁতে জিভের গুঁতো ঠুকে টেনে টেনে হাসেন। মন রে আমার, এ হাসির নাম কি ব্রহ্মনারায়ণী। গৃহিণীর পিছন ঘোমটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, বলছি না। ওই খুকীটিকে পড়ে যেতে দেখলাম কিনা, তাই দু'-একটা কথা মনে পড়ে গেল, এই আর কী!'

বলে হেডমাস্টার ব্রহ্মনারায়ণ তাঁর তরুণ চোখ দু'টি তুলে তাকান আমার দিকে। দেখি, বুড়োটা চ্যাংড়ার মতো মিটি মিটি হাসে, চোখ পিটপিট করে। ভিতরের কলকলানি যেন আর ধরে রাখতে পারি না। মুখ ফিরিয়ে দেখি, ঝিনি চোখ ফেরাবার সময় পেল না। কালো তারা দু'টি ছিটকে যাবার আগেই একটু লজ্জায় পড়ে যায়। তারপর মুখখানি টকটকিয়ে ওঠে।

আবার এদিকে শোনো, ডুপ্কিতে কেমন তাল লেগেছে। জোরে নয়, ডুপ্কি চুপ্কি চুপ্কি বাজে, ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্কি ডুপ্‌ডুক্ ডুপ্‌ডুক্। তাকিয়ে দেখি, সেই তালেতে মৃদু মৃদু দাড়ি নাচে, বাবরি নাচে। আর নাচে চোখের তারা। হাসি আছে ভাঁজে ভাঁজে। যেন জিজ্ঞেস করে, 'কেমন বোঝেন বাবু?'

কী বোঝো মন। বোঝাবুঝি ভিতরে বাজে। মুখেতে বোল বাজে না। রূপ অরূপের তরঙ্গ স্রোতে বহে যায়, আলোকের স্রোতে—অলক্ষ্যের টানে যাবে বলে। কথায় কী বোঝাবে। ব্যাখ্যার কথা কি জানা আছে। এত যে ভাগ-বাঁটোয়ারার চিন্তায় ছিলে, এবার দেখ, খোপ কেমন ঢাকনা খুলে দেয়। কেমন করে দিগন্তে একাকার। বাইরে দেখি ভাঁটার নদী, তীরে পাখির মেলা। মনে তো পড়ে না, এত পাখি কবে দেখেছি। ঝাপসা কালো পিঠের নিচে সাদা সাদা বুক পাখিগুলোর। তবে জল-ভডভডিয়ার সঙ্গে বোধ হয় এ এলাকার তেমন জান পহ্‌চান নেই। শব্দেতে সব একযোগে মুখ তোলে।

তারপরে দে ওড়া। একা দোকা নয়, শতাবধি। পাখার বিস্তারে যেন ছায়া ঘনিয়ে দিয়ে যায়। শরতের মেঘের মতো নদীর বুকের রোদে একখানি ছায়া চলে যায়। দলপতিকে চিনবে না, তবে নির্দেশ আছে জানবে। 'চল ভাগি, জল দোলানো সেই প্রকাণ্ডটা আসছে।'

বাঁধ যে নির্যস শূন্য, তা বলা যাবে না। মাঝে মধ্যে দু'-একজনকে দেখা যাবে, কোথায় যেন যায়। পিছনে তাদের আশমান জমিন, সেই কোথায় যেন গিয়েছে। কোথায় গিয়ে যেন ঠেকেছে। বউ-ঝিয়েদের দু-একজনও যে চলাফেরা করে না, এমন নয়। হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে না। বলা যায় না, কে যায় লঞ্চে। তারপরে উপশাস্ত্র নালিশ, 'বউটা বাঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখে। বলা তো যায় না। তবে হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ দু'-একজনকে দেখতে পাবে, সেই মেয়ের কাছে ঘোমটার আশা করো না। 'চোখ আছে তাই দেখি। কোন্ দেশের মানুষ যেন কোন্ দেশেতে যায়, তাই দেখি। গায়ে গতরে অত ঢাকাঢুকির সহবত পাবে না। তাতে যদি বলো, যেন ঝোটন পায়রা বুক ফুলিয়ে যায়, তা বলতে পারো।

সেই যে বলেছিলে, মন চলো যাই দিগন্তে, সব কিছুতেই সেই খেলা। এবার অবুঝ, কী চাও, কোথাও যাও, কিসের খোঁজে, জবাব না পেলে, পাড়ি পাড়িতেই ভাসো। আর হাসতে যদি চোখ ঝাপসা হয়, হোক। জানবে, দিগন্তের সেই হয়তো দান।

গাজীকে জিজ্ঞেস করি, 'নদীর নাম কী?'

গাজী বলে, 'নদীর নাম বাবু ডাংসা।'

ডাংসা! এদিককার অনেক নদীর নাম শুনেছি, এমন নাম কখনো শুনি নি। হয়তো হবে। আমার চেনা সীমানার নয়। নামের মজদুরিতে যার আনাগোনা, সে-ই জানবে ভালো।

তা বললে তো হয় না। ব্রহ্মনারায়ণ কাটান দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, 'কী বললে?'

গাজী ভুড়ুক থামিয়ে বলে, 'ডাংসা। তবে এইবার যে ডাইনে ঘুরবে, তাতেই গিয়ে বিদ্যেধরীতে পড়বেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'তুমি জানো কাঁচকলা।'

'কেন বাবু?'

তা বলতে হবে বইকি, গাজী কেন কাঁচকলা জানবে। জানতে হবে এই জন্যে যে, বাবুরা হাতে বোধ হয় পাকা কলা। তিনি বলেন, 'এটা কালিন্দী নদী।'

গাজী দাড়ি ঝাড়া দিয়ে খ্যাঁকখেকিয়ে হাসে। বলে, 'শোনেন, বাবু কী বলেন। সে তো বাবু পুবে, বডার ঘেঁষে কালিন্দী নেমেছেন।'

হেডমাস্টার মানতে রাজী নন। মাথা নেড়ে বলেন, 'তুমি কিছুই জানো না। তোমরা তো কেবল যাও আর আস, নদীর নাম-ধাম তোমরা জানবে কী করে।'

তা বটে। কোথায় তোমার বাস, তা তুমি জানো না। তুমি কেবল বাস করো। কেন। না, তবে শোনো, ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'হাঁদু আমাকে বলেছে, এটা কালিন্দী নদী।' গাজী একবার আমার দিকে চায়। হেসে হেসে যেন অবোধকে বুঝ দেয়, 'না বাবু, তা হতি পারে না। আপনার হাঁদু যা বলেছেন, সেটা অন্য জায়গা। তয় তো আমরা [illegible] দিয়া আসতাম। কালিন্দী হলো গিয়া আপনার বডারের নদী। ডাংসা ধরি আমরা উজানি এলাম। এবার বিদ্যা দিয়া নামা। আপনি ক্যানিং হয়ে, মাতলা দিয়া গোসাবায় যাবেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ এবার অন্যদিকে সাক্ষী ডাকেন, 'হ্যাঁ রে ঝিনি, হাঁদু তো তাই বলেছিল

না! দু' বছর আগে যখন গেছলাম, তখন তো তাই বলেছিল।'

ঝিনি এবার একটু সহজ। বাবার দিকে ফিরে বলে, 'হাঁদুদার কথা তো। না জেনেই বলেছে হয়তো।'

'না জেনে বলেছে? তা হলে তো হাঁদুটা একটা গাধা।'

অন্ততঃ ব্রহ্মনারায়ণ তাই বলেন। ঝিনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারে নি, তাই মায়ের দিকে ফেরে। জবাবে, সেখানে চোখাচোখি, হাসাহাসি। তবে কর্ত্রীর মুখ একটু বাইরে। রাগ করে আছেন যে! কর্তা হাসি দেখতে পান যদি।

কিন্তু গাজী আবার কী জিজ্ঞেস করে শোনো, 'কে হাঁদু বলেন তো। কোন্ বাড়ির?'

ব্রহ্মনারায়ণ ছাত্র ধমকান, 'কোন্ হাঁদু, কোথাকার হাঁদু, তা তুমি কী করে জানবে?'

গাজীর মুখে হাসিটি তুমি কাড়তে পারবে না। বলে, 'নাবোলে, শাঁখচূড় থিকে উঠলেন তো। বাড়ির কথা বললি চিনতি পারি।'

'পারলেই হলো। শাঁখচূড়ের সবাইকে তুমি চিনে বসে আছ? তোমার বাড়ি কোথায়?'

বোঝো এবার, কাকে ঘাঁটাতে গিয়েছ। কিন্তু গাজীর কি মাস্টারেও ভয় নেই। দাড়ির ভাঁজে তেমনি হেসে বলে, 'বাড়ি আর কবেন না বাবু, বলেন গুজরানের চালা। বসিরহাটের শহরের এক পাশেই থাকি।'

'তা বেশ তো। তুমি থাকো বসিরহাটে। শাঁখচূড়ের লোক তুমি চিনবে কী করে?'

গাজী এবারে গলার আওয়াজ চাপতে পারে না। হা হা করে হেসে বলে, 'নামের মজুরায় ফিরি কি না। যাওয়া-আসা সবখানে, তাই জিগেসাঁ করলাম।'

ব্রহ্মনারায়ণ কয়েক মুহূর্ত গাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ঘোর অবিশ্বাসে বলেন, 'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম শুনেছ? তাঁর বাড়ি।'

গাজীর মুঠোয় দাড়ি। হাসির মধ্যে নজর যেন কোন্ কূলে। একটু একটু ঘাড় নেড়ে বলে, 'ওই গিয়া আপনার যানাদের বাড়িতি দুইখান বেলাতি সাবুর গাছ আছে?'

বেলাতি সাবুর গাছ?

ব্রহ্মনারায়ণের ভুরু নয় কেবল, ব্রহ্ম সুদ্ধ কুঁচকে ওঠে। বলেন, 'কী বললে?'

'আজ্ঞা, বেলাতি সাবুর গাছ।'

গাজী এবার মাস্টারকেও ঘোল খাইয়েছে। ব্রহ্মনারায়ণ একবার আমার দিকে, তারপরে কন্যার দিকে ফেরেন। কন্যার ঠোঁটের কূলে কূলে হাসি। বলে, 'বোধ হয় পাম্ গাছ দুটোর কথা বলছে।'

গাজী বলে, 'তা হতি পারে। আমরা বাবু অতশত জানি না তো। কে যেন একদিন বললে, দেউড়িতেও দু'খান বেলাতি সাবুর গাছ, তাই জানি।'

ব্রহ্মনারায়ণ তবু ধমকান, 'তোমার মাথা। ওই যে কী সব নদীর নাম বললে, ধাম্সা না হাম্সা—।'

'ডাংসা, বাবু ডাংসা।'

'আরে, অই হলো। তোমাদের ডাংসাও যা, ধামসাও তাই।'

কিন্তু গাজীর প্রাণে কী সাহস দেখ। তেমনি হেসে হেসেই বলে, 'সব গিয়া তো সেই সাগরেই ঢলে। নাম যাই হউক গা। তয় বাবু, আপনার শাঁখচূড়ের ঠাকুরমশায়রে চিনতি পেরেছি। উঁয়ার বড় দুই ছেলে কলকাতায় বড় কাম করে। উনি মিনি মাগনায়, ওই গিয়া আপনার কী ওষুধ বলে, চিনির বড়ির মতন, সেই ওষুধ সবাইরে দ্যান্, তাই কিনা বলেন। আর ওই যে হাঁদুবাবুর কথা বলতিছেন, উঁয়ার একখানি দোকান আছে বসিরহাটে। অ্যাঁ, তাই কি না?'

ব্রহ্মনারায়ণ ভুরু কুঁচকে চোখ পিটপিট করেন। আর চোখাচোখি করেন ঝিনির সঙ্গে। ঝিনির রাঙানো ঠোঁটের কূল পাছে হাসিতে ভেসে যায়, তাই ভ্যানিটি ব্যাগ আড়াল করে। বলে, 'ঠিকই তো বলছে ব্বাবা। হাঁদুদার তো দোকান রয়েছে বসিরহাটে। গেদ্দা আর নেদ্দা তো কলকাতায় চাকরি করেন।'

তা বলেই বা মানবেন কেন। কন্যাকেই জিজ্ঞেস করেন, 'আর ওই যে কী সব বলছে, ওষুধ দেন চিনির বড়ির মতন।'

'বড় মামা হোমিওপ্যাথি ওযুধ দেন তো সবাইকে।'

'কিন্তু সেটা চিনির বড়ির মতন নয়।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'মুরখু মানুষ বাবু, নাম-টাম তো জানি না। তবে ওই দিদি যা বললেন, তাই। আমাকে একবার দিইছিলেন কি না।'

'তোমাকে?'

'হ্যাঁ। নামের মজুরায় গেছিলাম। তা শরীলটা বাবু ভালো ছিল না। গান শুনি খুশি হয়ে কাগজের মোড়ক করি চার পেস্থ ওযুধ দিয়া দিলেন। একদিনেই শরীল একেবারে ঝরঝরে।'

ব্রহ্মনারায়ণ গম্ভীর হলেন। গাজীর এতটা জানাশোনা যেন তাঁর ভালো লাগে না। এক তো, দেখ, ঠেক মারলে ব্যাটা ভেড়ির বাঁধ নিয়ে। তারপরে নদীর নাম নিয়ে। এখন আবার তাঁর নিজের আত্মীয় নিয়ে। গাজীটা সত্যি পাজী। এবার চুপ দিলে হয়।

তাই কি হয় নাকি। কবুল করিয়ে নিতে হবে তো। গাজী বলে, 'তয় বাবু, ঠিক হলি তো। আমি যানার কথা বললাম, তানার কথাই আপনি বলছেন তো?'

ব্রহ্মনারায়ণ নাক টানেন। বলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তুমি কী?'

এ আবার কেমন কথা, কোন্ বায়ে যায়? গাজী বলে, 'কিসের কথা জিগেসা করেন বাবু?'

মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি সাধু না ফকির?'

কৌতূহলের থেকে যেন বিরক্তিই বেশী। এবার বুঝুক গাজী, কাকে বারে বারে ঠেক দিতে যাওয়া। কিন্তু যে বলে, 'কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়, আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, মর্ম কথা বলব কি,' সে যে সোজা জবাব দেবে, তেমন আশা করো না।

হেসে বলে, 'বাবু, সাধু ফকিরে ভেদ নাই। আপনি যা বলেন, আমি তাই।'

ব্রহ্মনারায়ণ হাত উলটে ঘাড় নাড়েন। বলেন, 'তা বললে কি হয়। আমি জানতে চাইছি, তুমি হিন্দু, না মোচলমান?'

গাজী একবার সেই দূরের আকাশের দিকে চায়। যেন কার দিকে চেয়ে হাসে। সেদিকে চোখ রেখেই বলে, 'মুরশেদের নাম করি বাবু, তাঁর কাছে তো কোনো জাত নাই। তয় যদি জন্মের কথা বলেন তো বলি আমার বাপ মোচলমান।'

ব্রহ্মনারায়ণ যেন আবার ঠেক্ খেয়ে চমকে ওঠেন। তাকান আমার দিকে। বলেন, 'সে আবার কেমন কথা হে। বাপ মোচলমান, আর তুমি কী?'

'মুরশেদের দাস, ওখেনে আপনার হিন্দু মোচলমান নেই।'

বলে গাজী চোখ ঘুরিয়ে হাসে। ডুপ্‌কিতে শব্দ তুলে বলে, 'বাবু একটা গান করি শোনেন।'

বেশ গলা খুলেই আসমানে গলা তোলে গাজী—

'সব লোকে কয়, তুমি কী জাত সংসারে।
আমি কই, জেতের কী রূপ, দেখলাম না নজরে।

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীলোকের কী হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ, বামনী চিনি কী ধরে।'

আমার বুকে চল্‌কে ওঠে কী এক রহস্য। হঠাৎ যেন একটা ব্যথা ধরিয়ে দেয়। তবু হাসিতে ডগডগিয়ে ওঠে প্রাণ। চমকে ফিরি গাজীর দিকে। এমন কথা শুনি নি আগে। কে বেঁধেছে এমন কথা। কে গেয়েছে সুর করে। কোথা থেকে আসে গাজীর ভাণ্ডারে। মনে হয়, এক কথাতে জগতজোড়া জাতের বিচার দিলে মিটিয়ে।

এখন দেখ, গাজীর ভুরু নাচে, চক্ষু নাচে, আর নাচে দাড়ি। বসে বসেই কোমর নাচে, মাথার বাবরি নাচে, আর নাচে অঙুলি। আরশি-চোখে হাসির ঝলক, যেন চল্‌কে চল্‌কে পড়ে। বলতে হয়, লোকটার মুখ বিটলেমিতে ভরা। কী রহস্য যেন করে। ডুপ্‌কির তাল ঠিক চলে। আকাশের দিকে চেয়ে, সুর করে ডাক দেয়, 'ওহ্‌ ওহ্‌ ভোলা মন রে আমা-আ-আ-আর...!'

ওদিকে, ব্রহ্মনারায়ণ যেন এক জবর ধাঁধাঁ শুনেছেন। কপালে ঢেউ দিয়ে ভুরুতে কোঁচ বিঁধে। এক নজরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন গাজীর দিকে। গাজী ঘাড় নেড়ে, দাঁত দেখিয়ে, আবার তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, 'অ বাবু, বলতে পারেন নাকি!'

ব্রহ্মনারায়ণ যেন কোথায় ডুবে ছিলেন। চমকে উঠে জবাব দেন, 'অ্যাঁ?'

গাজী হা হা করে হেসে ধরে, 'সব লোকে কয় তুমি কী জাত সংসারে।'...

আবার সব কলি ক'টিই ফেরত আনে গাজী। দুলে দুলে গায়। আবার চোখের ছটায় ঝিলিক হানে উলটো আসনে, মায়ে-ঝিয়ের দিকে। মা বেশ মজা পেয়েছেন। মেয়ে তার থেকে বেশী, সে যেন মজেছে। নাগরিকা মুগ্ধ চোখে গাজীকে দেখে।

ব্রহ্মনারায়ণ ঘাড় ঝেঁকে বলেন, 'তা ঠিক, মানতে হবে। কিন্তু, ওই কথাটা শোনা শোনা, অথচ ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না।'

গাজী ডুপ্‌কিতে তাল রেখে বলে, 'কোন্‌ কথাটা বাবু?'

'ওই যে কী বললে, ছুন্নত।'

আহ্‌, ওহে ভিন্‌ যাত্রী ভদ্রলোক, কান লাল করো না। কী বেয়াজ, ঝিনির চোখ পড়বি তো পড় ভিন্‌ যাত্রীর দিকেই। যেন বজ্রাঘাতে লাল হলো তার মুখ। কিন্তু হেডমাস্টার ব্রহ্মনারায়ণ সরল মানুষ। আজে-বাজে কথায় নেই। যা জানেন না, তা জানতে চান। তবে তার আগেই যে মেয়ের গলায় সলজ্জ অস্ফুট ধমক ফোটে, 'আঃ বাবা।'

বাপ মেয়ের দিকে ফেরেন। মেয়ের ততক্ষণ আসমানে নজর। কিন্তু রঙঝালর সিল্ক শাড়িতে যে কাঁপন। শরীরের কাঁপুনি ধরে রাখা যায় না। হাসিতে সে অধরা। এ অধীনের অবস্থাও তথৈবচ। কোন্‌দিকে মুখ ফেরানো যায়, ভেবে পাই না। ব্রহ্মনারায়ণের দিকে তাকালে অট্টহাসি ফাটবে। উলটো দিকে আরোই অসম্ভব। ভাবলাম, খোপ ছেড়ে যাই।

কিন্তু গাজী বলে ওঠে, 'সুন্নত জানেন না বাবু। মুসলমানের ব্যাটাদের ছেলেবেলাতেই হয়—।' কথা শেষ হবার আগেই, ব্রহ্মনারায়ণ তর্জনী তুলে হাঁকেন, 'ও ইয়েস ইয়েস, মনে পড়েছে। তাই তো বলি, কথাটা শোনা শোনা লাগছে, অথচ...। ওই তোমার গিয়ে যাকে বলে—।'

সর্বনাশ, ব্যাখ্যা করবেন নাকি! উলটো আসন থেকে প্রায় আর্তনাদ ওঠে, 'বাবা!'

'অ্যাঁ?'

ব্রহ্মনারায়ণ আবার থমকান। মেয়ে ডাক দিয়েই মুখ ফেরায়। মাস্টারমশাই একবার আমার দিকে ফেরেন। তারপরে বলেন, 'না আমি বলছি, গানটি তোফা। বেশ ধরেছ হে। গাও গাও, তারপর?'

গাজী গেয়েই আছে,

'কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্‌বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।
ওহ্‌ ভোলা মন...।'

হ্যাঁ, ভোলা মন, মন দিয়ে শোন। মরমে তোমার কী এক নেশা ধরে যায়। সেই নেশায় মন দিয়ে দেখ, কত শ্মশানের ছাই, কবরের ধুলো একাকার হয়ে গিয়েছে। সেই একাকারে হাতড়ে দেখ, কী জাত লেখা আছে। কিন্তু ভাবি, এ গানের বাঁধনদার কোন্‌ বিদ্রোহী কবি। এ কবিতে সে চোটপাট নেই, সে ধিক্কার নেই, 'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া।'

এ বলে, 'সব লোকে কয় আমার কি জাত সংসারে।' সমুদ্রের জল বিচার করে কে। মানুষের জাত বিচার করে কে। ক্ষণের নয়, মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে যেন কোন্‌ দূরকালের কথা শুনি। তাও শোনায় কি না ধুলোর আলখাল্লা গায়ে কোনো এক পথের গাজী। বাহ্‌ বাহ্‌ বলে উঠি, গলায় তেমন ফাঁক নেই। সব যেন টাবুটুবু ভরা, ভর ভর জমাট।

অবাক একটু লাগে ঝিনির মুগ্ধ ঔৎসুক্যে। কুটুস্‌ যার ব্যাগ খোলে, আকাশ দেখিয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে, চুলেতে যার বেলাতি কষুনি। এমন নগর ছানিয়া ভাসে যে-নাগরিকা, গাজীর গানে সে কেন এত উৎসুক। কাজল-মাখা চোখে যে পলক পড়ে না।

তা হোক, কিন্তু ব্রহ্মনারায়ণের বেহ্মবাক্যি শোনো। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'করেকট্‌! গুড্‌, ভেরী গুড্‌!'

মাস্টারমশাইয়ের সার্টিফিকেট। তবে ছাত্রের সেদিকে খেয়াল নেই। সে আর চেপে বসে নেই, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে খাড়া বসেছে। দুলুনি হয়েছে দ্বিগুণ, বাবরিতে ঝটকা ত্রিগুণ। সে গায়,

'ও বাবু—গত্তে গেলি কূপজল কয়
গঙ্গায় গেলি গঙ্গাজল হয়
মুলে এক জল সে ভিন্ন নয়
ভিন্ন বলে পাত্তর অনুসারে।
ওহ্‌ ভোলা, জগতে বেড়ে জেতের কথা
লোকে গুমর করে যথাতথা
আমি সেই জেতের ফাতা
বিকিয়েছি সাতবাজারে।
সব লোকে কয়...।'

এখন আর গাজীর চোখ নাচে না, ভুরু নাচে না। দোলানি থাকে, কিন্তু চোখ বুজে আসে। গলার চড়া স্বর যেন ক্রমে নিবিড় হয়। যেন স্বপ্নে গায়। তারপরে হঠাৎ জেগে উঠে হাসি। মুরশেদের নামে, দোষ নেই, সেই লাল ছোপানো দাঁত দেখিয়ে হেসে বলে, 'তয় কন বাবু, জাতের কথা কী বলব। এই আমার জাতের কথা।'

বলবার আর কী থাকতে পারে। দেখলাম তো, চরাবু পলির ভোজ ফেলে পাখিরা চেয়ে চেয়ে গান শুনল। যারা উড়ে গেল আকাশ দিয়ে, তারাও। কী বুঝল কে জানে। কথা কিছু আসে না, মনে মনে বলি, চলো গাজী, কোন্‌ মতলবে কোথায় নিয়ে যাবে, যাই তোমার সঙ্গে। জেতের ফাতা বিকিয়ে আসি সাতবাজারের হাটে।

হেডমাস্টার রায় দেন, 'ইয়েস, আই এগ্রি, এর পরে আর জাতের কথা তোমাকে বলা চলে না। কী বলিস ঝিনি, গানটা বেশ ভালোই গেয়েছে।'

'চমৎকার। সুন্দর!'

শুধু ভালোতে ভালো বলা যায় না। নাগরিকার গলায় যেন স্বপ্নের আমেজ। কোথায় ডুবে আছে। ডুবো ঠাঁই থেকে কথা আসে। দেখ, আগের সেই চেতনে নেই। গোটা আদুর ডানাখানি বে-আবরু। কাঁধকাটা জামার কাপড়ে এক রঙা, যুবতী অচেতন, আপনাতে আপনি ফুটে গিয়েছে। কটির ওপরে রোদের মতো খোলা জায়গাটিতে শাড়ি চাপতে ভুলে যায়। বলে, 'আর একটা গাইবে?'

মায়ের মুখেও সেই ইচ্ছা। গাজী সমঝদারের খিদমদ্‌গার। কেবল কি তাই! আরশি চোখে গুণটানা দেয় যেন। বলে, 'তা দিদি, আপনি কইলি না গাইতে পারি। শোনেন তয় গাই।'

এ যেন ক্ষুধার্তকে খেতে বলা তৃষ্ণার্তকে জলভরা পাত্র দেওয়া। গান কি তার কাছে সেই রকম। অন্যথায় এক কথায় সায় কেন। ঝিনি খুশি। আবার যুবতী লজ্জাও পায়। বাবাকে দেখে, মাকে দেখে, তারপরে গাজীর দিকে। গাজী ডুপ্‌কিতে তাল দেয়, ঘাড় কাত করে তাকায় আমার দিকে। ঘাড় নাড়ে এমন ভাবে, যেন আমি জানি, তার ডুপ্‌কির বোল কী বলে। গান ধরে,

'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলি সে ধন দেখি চক্ষেতে।'

দু' কলি গেয়েই গাজী ঝিনির দিকে চেয়ে চোখ ঘোরায়। এবার সে বাঁয়া হাতে ঘুংগুর নিতে ভোলে নি। বলে, 'কেমন কি না দিদি, কেউ কি দেখে।' ঝিনি হেসে ওঠবার আগেই আবার ধরেঃ

'(কী বলব বলেন) আপন ঘরে বোঝাই সোনা
(হায় রে) পরে করে লেনাদেনা
(আর) আমি হলেম জম্মোকানা
না পাই দেখিতে।'

বলে, 'ওই যে দিদি বলে না, "প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলা" সেই মতন আর কি। শোনেন,

রাজী হলে দরোয়ানি
দরজা ছেড়ে দিবেন তিনি
(হায়রে) তারে বা কই চিনি শুনি বেড়াই কুপথে।'

এই পর্যন্ত গেয়ে গাজী যেন আর্ত রবে ডাকে,

'(ভোলা মন) এই মানুষে আছে রে মন—
যারে কয় মানুষ রতন
ক্ষ্যাপা কয় পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে।'

আবার সেই কথাটাই মনে আসে, এ গান কে বাঁধে, কেন বাঁধে। কী যেন বলে, কী এক অচিন কথা। মনে করি, ধরতে পারি, তবু অধরা। গলা খুলে, কথা বলে, সুরে গাওয়া হলো যেন সদর দরজা হাট। আর এক দরজা ভিতরে, বন্ধ দরজা। হাতড়ে ফিরি, খুঁজে পাই না। হয়তো আছে কোনো তত্ত্ব পর্দায় ঢাকা। থাকুক, তবু যেন, বেরিয়ে পড়া ঘরছাড়াকে, আর একবার ঘরছাড়া করালে গাজী। দিগন্ত চলে যায়, চরাচর হারায়। নিজের মধ্যে আর্তরব, কোথায় যাই, কেন যাই, কিসের সন্ধানে। ইচ্ছা করে, আমিও ধরি, 'পারলাম না রে চিনিতে।' অথচ দেখ, আমার ভিতরে যেন এক পাগলা

হাসি বাজে। আমার চোখ ঝাপসা করে দিতে চায়।

ঝিনির গলায় শুনি, 'অপূর্ব!'

তারপরেই কুটুস্ ব্যাগ খোলা। হাতড়ে তুলে আনা করকরে একখানি এক টাকার নোট। ব্রহ্মনারায়ণের পাশ দিয়ে, হাত বাড়িয়ে বলে, 'নাও।'

ঝিনির চোখ মুখ বলে, এ টাকা কিছু নয়, তুমি ঝিনিকেই লুটেছ গাজী। তবে কি না, সে লুট তো তোমার দেখা যায় না। একটি টাকা দিয়ে জানানো। আর গাজীকে দেখ, বিগলিত। হাসিখানি লম্বায় বাজে, হেঁ হেঁ হেঁ...। মুখে কথা নেই। মনের কথা পড়তে যদি পারো, তবে শোনো, 'দিদি আপনি দিলি কি না নিয়ে থাকতি পারি? হেঁ হেঁ হেঁ...।' মুরশেদের মজুরা আজ বেশ যুতের। টাকাটি চার ভাঁজ করে ঝোলায় পুরতে পুরতে একবার আমার দিকেও দেখে নেয়। এই দেখ, আমার মনটা কেমন খচখচিয়ে ওঠে। যেন আমার গুণের ধনকে আগে অন্যে রেয়াত দেয়।

কিন্তু ওদিকে যেন কেমন একটু চোখ টাটানি ভাব। ব্রহ্মনারায়ণের হাসিটি যেন তেমন খোল্‌তাই নয়। এমন কি তস্য গিন্নিরও। দুটি গান শুনে, আস্ত একটি টাকা! ব্রহ্মনারায়ণ বলেই ফ্যালেন, 'একেই বলে ফিলজফি পড়া মেয়ে। তোর সেই ছাত্রীর টুইশান ফী বুঝি নিয়ে এসেছিলি?'

ঝিনি হেসে ভুরু বাঁকায়, আবার ঠোঁট ফোলায়। বলে, 'আহা, বাবার যেমন কথা। কলকাতায় বসে যা দিনরাত্রি শুনতে হয়, তার চেয়ে এ অনেক ভালো।'

মা তৎক্ষণাৎ মেয়ের দলে। আওয়াজ দেন, 'সে কথা ঠিক।'

কিন্তু এবার ধাঁধা আমার মনে। এও যে রূপ অরূপের খেলা। একদিকে 'দর্শন' আর একদিকে পায়ের নখের রঙ থেকে অশ্বলাঙুল কেশ বাঁধুনি। এই যোগের ভিতর দুয়ার হাতড়ে পাওয়া দায়। এ দুয়ের আনাযানা কোন্ দরোজায়। সাবধান, মানুষ চেনার রসিক তুমি নও। নাগরিকা যদি বলেছ, তবে কবুল করো, এ মেয়ে বিদুষী। আবার সেই কথা, জল দেখে কি জল চেনা যায়। শুধু 'দর্শন' পড়া নয়, আপন শ্রমের টাকা। ঝিনির জীবিকাও আছে।

ভাবনা যাক, ওদিকে ব্রহ্মনারায়ণের ডাক পড়েছে, 'আপনি যে কোনো কথাই বলছেন না। কেমন শুনলেন?'

অতি মাত্রায় চকিত হয়ে উঠি, 'আমাকে বলছেন?'

ব্রহ্মনারায়ণ ঠোঁট উলটে বলেন, 'ওহ্ বাবা, আপনার তো দেখছি ধেয়ান নেই।'

মাস্টারমশাই বলে কথা। তাড়াতাড়ি বলি, 'খুব ভালো।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। যে রকম ভাব লেগে গেছে। আপনারও কি ফিলজফিটফি পড়া আছে নাকি?'

ঝিনির অমনি ভুরু কেঁপে যায়। ঘাড় বেঁকে যায়। আমি বলে উঠি, 'না না, ওসব পড়াশুনো কিছু নেই।'

ব্রহ্মনারায়ণ জিভ দিয়ে দাঁত ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'দেখবেন। ফিলজফি মানেই সেণ্টিমেণ্ট। আপনিও হয়তো পকেট উজাড় করে দিয়ে দিতেন।'

ঝিনি যেন আর পারে না, এবারে তার বেহদ্দ হার। ভিন্ যাত্রীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়েই হেসে ফেলে। বাবার দিকে ফিরে বলে, 'ওটা তোমার সত্যি কথা নয়। মেয়েদের ফিলজফি পড়াই তোমার কাছে বাজে বাজে।'

'তাই কি না, আপনিই বলুন।'

তাই কখনো বলতে পারি! একে যুবতী, তায় দার্শনিক। ধর্ম বলে একটা কথা নেই! কিন্তু মাস্টারমশাইকে ঘাঁটাব, তেমন সাহসও নেই। শাঁখের করাতের তলায় পড়ে, এদিক ওদিক করি!

ব্রহ্মনারায়ণ হেসে বলেন, 'ভদ্রলোক লজ্জা পাচ্ছেন। আপনি যাবেন কোথায়?'

এবার আর সাক্ষী মানা নয়, তার চেয়ে দুরূহ প্রশ্ন। আগের কথার জবাব যদি বা ছিল, এবার তাও নেই। কারণ আমার যাওয়া গাজীর মতলবে। গন্তব্য জানা নেই। কী বলব ভাবতে গিয়ে গাজীর দিকে ফিরি। গাজী তখন মিটি মিটি হাসে। ব্রহ্মনারায়ণের দিকে ফিরে বলে, 'বাবু জানেন না, বাবু কোথায় যাবেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ এতক্ষণে আর একটা কিছু পেলেন। তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে বসে বলেন, 'সে কি, কোথায় যাবেন তা জানেন না?'

বলে, ঘাড় নেড়ে নিজের বিস্ময় ছড়িয়ে দেন স্ত্রী-কন্যার দিকে। আবার বলেন, 'এ রকম তো কখনো শুনি নি। কোথায় যাচ্ছেন, তাই জানেন না?'

ন্যাকা তো নও হে বাপু। এমন কথা শুনে বাপ মা ঝি অবাক হয়ে না তাকাবে কেন। পথ চলার একটা বাত পুছ আছে। লোক মানানো জবাব চাই। বলি, 'ঠিক কোথাও যাবো বলে বেরুই নি। এমনি একটু চলেছি।'

আমার কথার থেকে ব্রহ্মনারায়ণের বিস্ময় আর হতাশাতেই যেন উলটো আসনের হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে। এবার একবার আমার আপাদমস্তক দেখেন। সহযাত্রীটিকে ঠাহর করার চেষ্টা। যদিও, এই খোপের দেয়ালে রেলগাড়ির সেই সাবধান করা নেই। 'চোর পকেটমার নিকটেই আছে।' নজরের খোঁচায় ততটা উঠেছেন কি না বুঝতে পারি না। তবে এমন বেআক্কেলে বোধ হয় আর দেখেন নি। বলেন, 'এমনি একটু চলেছেন বলে, একেবারে লঞ্চে চেপে পড়েছেন। আসছেন কোত্থেকে?'

ইচ্ছে করলে চুপ দিয়ে থাকতে পারো। সে যে আর এক বেয়াজ। তা পারা যায় না।

নিজের দেশের নাম করি। শুনে ব্রহ্মনারায়ণ আর একদফা নড়েন চড়েন। চশমাসুদ্ধ চোখ কপালে। বলেন, 'সেখান থেকে এখানে চলতে!'

বলি, 'এই আর কি, একটু ঘোরাঘুরি।'

ব্রহ্মনারায়ণ স্ত্রী-কন্যার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বোঝো!'

বোঝার থেকে ওখানে হাসির ছলকই বেশী। কী এক চোর দায়ে যেন ধরা পড়লাম। কওয়ায় বলায়, সামান্যকে কত অসামান্য করে তোলা যায়, ব্রহ্মনারায়ণ তাই দেখেন। এ কি বেয়াজ বিপদ বলো।

ঝিনি যেন বিপদগ্রস্তকে হেসে করুণা করে। বাবাকে বলে, 'তাতে কী হয়েছে। এদিকে কি বেড়াতে আসা যায় না?'

ব্রহ্মনারায়ণ হাত তুলে হাঁকেন, 'আরে সে তুমি এখন ধাপার মাঠে বেড়াতে যাও না, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। বেড়াবার একটা জায়গা আছে তো। এখানে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। লোক নেই, জন নেই, নোনা নদী, তার ওপরে কামট, আর এই তো টানা ঘেড়ির বাঁধ—।'

গাজী তাড়াতাড়ি সংশোধন করে, 'ঘেড়ি নয় বাবু, ভেড়ি।'

'তুমি থামো তো হে, মেলা ঘেড়িভেড়ি করো না। দুটোই এক কথা।'

গাজী যেন শিশুর খেলা দেখে হাসে। ঝিনি বলে, 'তা কি হয়েছে। এসব কি দেখতে ইচ্ছে করে না?'

বলুক, বিদুষী একটু বলুক। কিন্তু কথা টেনে নেই গাজী। বলে, 'তয় দিদি, আমি বলি শোনেন। সকালবেলা বাবুকে দেখি ইটিন্ডায় চলেছেন বেড়াতি। তা সেখানে আর যাবেন কোথায়। দেখলাম কি যে বাবুর কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। বলেন, "বেরিয়ে পড়েছেন।" তাই আমি বললাম, তবে আর এখেনে কেন, চলেন হাসনাবাদ দিয়া লঞ্চে করি ঘুরি আসবেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'ও, তোমার মতলবেই যাওয়া হচ্ছে। তা তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বাবুর সঙ্গে।'

ব্রহ্মনারায়ণ আবার হাত উলটে, স্ত্রী-কন্যার দিকে ফিরে বলেন, 'বোঝো।'

মা-মেয়েতে আবার সেই সখীর হাসি। কিন্তু এবার আর আমি নয়, এখন গাজী। ব্রহ্মনারায়ণ প্রায় ধমকে ওঠেন, 'বাবুর সঙ্গে তো বুঝলাম। তার মানে, বাবুই তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তা যাচ্ছটা কোথায়?'

গাজী টেনে টেনে বলে, 'ভাবতেছি, কালীনগরতক যাবো।'

'আপনি চেনেন কালীনগর?'

আবার আমাকে। বলি, 'না।'

'তবে, চলে তো যাচ্ছেন দিব্যি। ফিরবেন কী করে, সেটা ভেবেছেন?'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'কেন বাবু, কালীনগরের ওপারে ন্যাজাট যাব, ন্যাজাট থিকে মটর পাবো বসিরহাটে যাবার।'

'তারপরে?'

পথের হাল হদিস সব ব্রহ্মনারায়ণেরই দাবি। যেন গাজীকে এবার ঠিক প্যাঁচে ফেলবেন। গাজী হেসে বলে, 'বসিরহাট থেকে বাবুকে কলকাতার গাড়ি ধরায়ে দিবো।'

ব্রহ্মনারায়ণ হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারেন না। বোঝা যায়, গাজীর কাছে আবার ঠেক খেয়েছেন। গাজী হেসে বলে, 'পথ তো সব বাঁধা বাবু। যেতি মন করলেই হয়।'

কিন্তু ব্রহ্মনারায়ণের কান সেদিকে নেই। আমার দিকে ফিরে বলেন, 'কী জানি, বুঝি না।'

তাঁর কথায় আমার ভিতরের কলকলানি, গলার দরজা ঠেলে আসতে চায়। কে এক ভিন্ যাত্রী, সে কোথায় যায়, কার সঙ্গে, কী তার ফেরার সমস্যা, এসব ঠিক তাঁর মনের তারে মেলে না। তাই মন কিছুতেই বুঝ মানে না। চিরদিন ঠিক বুঝিয়ে। এসব বেঠিক দলকে কী বোঝাবেন, বুঝতে পারেন না।

কিন্তু আমি গলায় আগল দিলে কী হবে। ওদিকে মা-মেয়েতে আগল খোলা। সেই খোলাতে, আমার আগলও মড়মড়িয়ে যায়। ঝিনির সহজ গলা শোনা যায়, 'বাবা একটু ইয়ে।'

এ আবার সেই, কথা সভার মাঝেই পড়ে, যার কথা সে নিক। চোখের তারা লক্ষ্য করে বুঝতে অসুবিধে নেই, ভিন্ যাত্রীকে মেয়ে বলে, তার বাবাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। এমন সময়েই মোটা গলাটি শোনা যায়, 'আপনাদের টিকেটগুলো নিন তো।'

জানালা দিয়ে দেখি, টিকেটবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। খোপের ভিতরে আসবার দরকার নেই। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়েই হবে। বাবুর এক হাতে টিকেটের গোছা, আর হাতে পেন্সিল। খাওয়ার সময় পেয়েছেন কি না কে জানে, নাওয়ার সময় পাননি। রুক্ষু চুলে চোখ ঢাকা পড়েছে প্রায়। গলায় আছে খকর খকর কাশি। অথচ বুকখানি হাট করে খোলা।

গাজী বলে, 'দুইখান টিকেট দ্যান, কালীনগরের একখান ফাস্‌কেলাস, আর একখান আমার।'

টিকেটবাবু দাম বলেন টিকেট লিখতে লিখতে। আমি জানালা দিয়ে দাম বাড়িয়ে ধরি। সহসা ব্রহ্মনারায়ণের গলার খোঁচা এসে বেঁধে, 'ওর ভাড়াও কি আপনি দিচ্ছেন!'

গাজী নিজেই জবাব দেয়, 'তয় আর কে দিবে বাবু। বাবুর সঙ্গে যাচ্ছি—।'

কথা আর শেষ করে না সে। মুরশেদের নামে একটু হাসে, যদিও তা ব্রহ্মনারায়ণ-ভোলানো হাসি হয় না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আবার ফিরবে কখন?'

গাজী তেমনি হেসে বলেন, 'বাবুর সঙ্গেই ফিরব।'

এবার যা বোঝার তা বুঝে নাও। ব্রহ্মনারায়ণ ঘাড় নেড়ে বলে ওঠেন, 'বাহবা বাহবা

বাহব্বা! ও ঝিনি, এ যে তোর ফিলজফির ওপরে যায় রে। সারাদিনের ভরণপোষণ মায় রাহা খরচের দায়দায়িত্ব ইস্তক নিয়ে বসে আছে।'

ঝিনির সহজ হাসি সহজভাবেই মুখোমুখি ঝরে পড়ে। গাজী তখন নিজের হাতে টিকেট নিয়ে, নিজের মনেই টিকেট দেখে। আবার গুনগুন করে, 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা...।'

ইতিমধ্যে টিকেটবাবু গিয়ে দাঁড়ান ব্রহ্মনারায়ণের কাছে। এক মুখে তাঁর অনেক কথা। টাকা বের করে দিতে দিতে বলেন, 'তিনখানা গোসাবা।'

বলবার আগেই টিকেটবাবুর লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। যেন খবর তাঁর আগেই জানা। ব্রহ্মনারায়ণ ততক্ষণে আগের সুরেই তাল ধরেন, 'আমি ভাবছি এদিককার লোক কোথাও, ঘরে ফেরা হচ্ছে। তা নয়, একেবারে ফকিরের সঙ্গে! তাও আবার ফকিরের জন্যে নিজের ট্যাঁকের কড়ি দিয়ে একটু ঘোরাঘুরি। আপনাকে আবার আমি ফিলজফির কথা বলতে গেছি!'

এবার চোখাচোখি মেয়ের সঙ্গে। হাসিতে হাসিতে মজা লোটে বাপ-বেটিতে।

তবু তো গাজীর গলার গুনগুনানি শুনতে পান নি, 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।'

ভাবের অভিধানে দেখ, ও কথা কার উদ্দেশে। তা, একবার বলে দেখুক না, মাস্টার-মশাই প্রেমের ভাব জানেন না। সে সাহস নেই। দেখি, গাজী আমার দিকে চোরা চোখে চেয়ে চেয়ে হাসে। অপরাধ তো আমার। ব্রহ্মনারায়ণের বিদ্রূপে সেই রকম মনে হয়। বলি, 'তা নয়, ও বললে যাবে—।'

'তাই, আপনি নিয়ে নিলেন, এই আর কী।'

ব্রহ্মনারায়ণ ঘাড় নেড়ে আমার কথা পূরণ করেন। কন্যা আর গিন্নীর দিকে চেয়ে চোখ পিটপিটিয়ে হাসেন। দেখ, যেন বিটলে ছোঁড়াটা ইয়ারদের দিকে চেয়ে কী রহস্য করে। তবে, সব খেলারই উলটো চাল আছে। সেই চালটা মেয়ের দিক থেকেই আসে, 'তাতে কী হয়েছে বাবা। ওঁর ভালো লেগেছে, তাই এর সঙ্গে যাচ্ছেন। তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি।'

বলুক তো, কন্যা বলুক, আর বাপ তার আপন রক্তের কাছে একটু ঋণগ্রস্ত হোন। ফিলজফি কেবল সেণ্টিমেণ্ট, গাজী নিয়ে বেড়ালে সেটা কেবল বিফল ভাবের ঘোর, আর যত কিছু সঠিক পথের খবর শুধু মাস্টারমশাইয়ের ঝোলায়, এ ঘোর কাটুক। ঝিনি এখন অনেক সহজ। কথা বলে, হেসে তাকায় ভিন্ যাত্রীর দিকে। যাত্রী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বে, সে সাহস নেই।

কিন্তু এতই সহজ! তবে আর 'ও ভোলার মন' বলেছে কেন, 'ক্ষ্যাপা' বলেছে কেন। ব্রহ্মনারায়ণ আপন ভাবেই ভোলা, আপন পথের ক্ষ্যাপা। বলেন, 'ও বাড়াবাড়িটা আমার হলো। তবে আর কি, কেবল ওই গান শোনো আর টাকা দাও, আর এ গিয়ে পকেট উজাড় করে ঘুরুক। তোরাই সংসার করবি বটে।'

অমনি উজানী গাঙের ছলছলানি হাসির জোয়ার ঝিনির গলায়। যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে, তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপে। মাকে বলে, 'শুনেছ মা, বাবার কথা। যেন আমি তাই বলেছি।'

মা তাঁর দল ছাড়েননি। শোনা যায়, 'ওঁর কথা বাদ দে না।'

'বাদ দে না? বাঃ! টাকা কি ফুটকড়াই নাকি গো? আমার বেলায় তো তা দেখি নি?'

আবার হাসি, মা-মেয়ে দুই সখীতে। কিন্তু ব্রহ্মনারায়ণের সেদিকে তেমন নজর নেই। অধীনের দিকেই ফিরে একটু চোখ টেনে পুছ করেন, 'তা, মহাশয়ের কী করা

হয়, জানতে পারি?'

মহাশয়! স্বরে যে শুধু বিদ্রূপ, তা নয়, সুরে যেন অন্য একটু খোঁচা। পড়তে জানলে হয়, সে লিখনও লেখা আছে ব্রহ্মনারায়ণের চোখে। পড়ে দেখ লেখা আছে, 'তা সাধু ফকিরের পেছনে খরচ করতে তো ভালো লাগছে, এ রেস্তো আসছে কোত্থেকে?' চাহনির রকমটিও একটু তেরছা। একে আপাদমস্তক দেখা বলে না। একে বোধ হয় নজর খুঁচিয়ে দেখা বলে। ছেলেবেলায় পাঠশালার মাস্টারমশাইয়ের মুখখানি চোখের সামনে ভাসে। হাতে যাঁর কালনাগিনী ফণা তুলে লিকলিক করতো। কালনাগিনীর মতোই সেই বেতগাছা, মাস্টারমশাইয়ের চোখে একেবারে সেই ছোট্ট বুকে গুঁজে দেওয়া নজর, হয়তো ছাত্রটির দশ আনা ছ' আনা চুলের ছাঁটের দিকে। মিহি গলাও যে কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর শোনাতে পারে, সে জ্ঞানলাভ তখন থেকেই। তার সঙ্গে কেবল একটু দাঁতে দাঁত চিবুনো, শোনা যেতো, 'বাবু কি যাত্রার দলে নাম লেখাইছেন নাকি?'

আঃ, যেন শিকার নিয়ে দুলে দুলে সাপের খেলা, এমনি মর্মান্তিক। আসন্ন ছোবলের যন্ত্রণা ততক্ষণে ভয় হয়ে বুকে কাঁপতে আরম্ভ করত। শিকারের নজর সেই যে মাস্টার-মশাইয়ের চোখে আটকে যেতো, তাকে আর নড়ানো যেতো না।...তবে এ কথা ঠিক, পাঠশালার গুরুমশাইয়ের সেই বাঘা চোখের নজরে নির্যস ভুল ছিল না। সেই দিনের ছোট বুকের ত্রাস আজ ভরা বুকে হাসি হয়ে বাজে। এক্রামপুরের বামুনপাড়ার কেদার চক্রবর্তীর যাত্রার দল, সে তো ছিল তোমার চোখের আলেয়া হে। তোমার তখন নাক টিপলে দুধ গলে, তাতে আবার ভদ্রলোকের ছেলে। আর ঝাঁকড়া-চুলো কেদার চক্রবর্তী। তাকে তুই কোন্ নজরে দেখেছিলি। মনে করেছিলি, সে প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু, বেহুলার চাঁদসদাগর। সে রামায়ণের রাম, মহাভারতের অর্জুন। কম করে ষাট বছরের সেই লোকটার হালচাল হেলা-দোলা তোকে কী গুণ করেছিল। একদিন গাল টিপে আদর করে ডাক দিলো। সেই ডাক বাপ-মা ভাই-বোন ঘর ভুলিয়ে দিলো। ঘর পালিয়ে তুই গেলি নীল রঙ মাখতে। গায়ে পীত বসন, হাতে মকরমুখো ঝকঝকে টিনের বাঁশী, পায়েতে ঘুঙুর। আসরে দাঁড়িয়ে সেই রজকদের ছেলেটা প্রহ্লাদ সেজে তোকে মধুসূদন দাদা বলে ডাকত। তুই আসরে দাঁড়িয়ে মুখে বাঁশী তুলে ধরতিস, আর পটলা মেছো আসরের নিচে থেকে ফ্লুট বাজিয়ে দিতো। হালের দিনে হলে কী বলত হে নাগরিক। প্লে-ব্যাক? তা সেই রকমই ব্যাপার। বাঁশী শুনে প্রহ্লাদ পাগল। তুই খিলখিলিয়ে হাসতিস। মাথার ওপরে আধ ডজন হ্যাজাক জ্বলে, সকলে দেখতে পেতো কৃষ্ণকে, কিন্তু প্রহ্লাদ দেখতে পেতো না। তুই পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতিস, ডাক দিতিস, 'প্রহ্লাদ, আমি এখানে।' প্রহ্লাদের অমনি ছুট, 'কোথায়, কোথায় মধুসূদন দাদা!'...

তারপরে ঘরে ফিরে, কেষ্টঠাকুরের পিঠের চামড়া ক' স্তর উঠেছিল, সে হিসাবটি চেয়ো না। তাই বলি, পাঠশালার গুরুমশাইয়ের সেই নজরে নির্যস ভুল ছিল না। কিন্তু যে কারণে নজর বিচার, সেই ব্রহ্মনারায়ণের নজর ততটা মর্মান্তিক নয়। তখনকার দশ আনা ছ' আনার মর্ম ছিল আলাদা। আজকের মাথায় যে কত আনাতে কী আছে, তার হিসাব জানা নেই। তখন ছিল নরসুন্দরের সঙ্গে রাম-রাবণের লড়াই। নয় তো তোষামোদের হাতজোড়। এখন কেবল মাথাটি বাড়িয়ে দেওয়া।

তবু কেন ব্রহ্মনারায়ণের চোখে এমন বেস্মাদত্যির খোঁচা। ধুতি পাঞ্জাবি আর সঙ্গের ঝোলায় কিছু বেয়াদপি লেখা আছে নাকি। ভেবেছেন বুঝি, ভিন্ যাত্রীর খাওয়া আছে ঘরে। বনের মোষ তাড়িয়ে ফেরে বনে। বেকার ঘোরে পরের ধনে। রঙ্গে মজে ফকির নিয়ে অন্যের জীবিকায়।

কথা বলবার আগেই আবার ব্রহ্মনারায়ণ ত্রুটি শোধন করেন, 'অবিশ্যি, কে কী করে,

সেসব কথা নাকি আজকাল জিজ্ঞেস করলে লোকে অসন্তুষ্ট হয়।'

বলে বুড়া তাঁর চোখের চ্যাংড়া নজর ঘুরিয়ে আনেন মেয়েকে ছুঁয়ে। জবাব দেবার সুযোগ পাই না, তার আগেই শোনো, ঝিনির গলা, 'তা সত্যিই তো, ও কথা জিজ্ঞেস করছ কেন বাবা। ওঁর তো কোনো অসুবিধে থাকতে পারে।'

অব্যর্থ। নিশ্চয়ই। খুবই থাকতে পারে। বেঁচে থাকুক এ যুগের শালীনতা। বাঙলা দেশে এমন জীবিকা আছে, বলতে গেলেই কেন যেন ঠেক খেতে হয়। বরং একটু অসহায় হয়ে বলি, 'বেকার নই, বিশ্বাস করতে পারেন।'

প্রথমে ঝিনির হাসি উপচায়। তারপরে মাস্টারমশাইয়ের। সম্ভবত আমার গলার স্বরেই কথাটা তাঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। হাত তুলে বলেন, 'আহা-হা, অবিশ্বাস কেন করব। এমনি একটা কথার কথা জিজ্ঞেস করলাম আর কি।'

তা যে করেননি, সে প্রত্যয় আগাম পেয়েছি। তবে বিশ্বাসের লাভটুকুও পাওয়া গেল এবার। তাই কথার বাঁক ঘুরিয়ে নেন। কিন্তু সেই এক দরিয়ারই বাঁক। বলেন, 'তবে এই যে আজকাল সব হয়েছে, পেশা বা জীবিকার কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না, এর কোনো মানে বুঝতে পারি না। চুরিচামারি তো করি না রে বাপু যে, লোকের কাছে বলতে পারব না। আজকাল যে কী সব আদবকায়দা হয়েছে।'

ব্রহ্মনারায়ণ হাত উলটে দেখান। বোধ হয়, সবই উলটো হাওয়ার বহে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না। সেই কথাটা বোঝাতে চান। কিন্তু ওঁর চুরিচামারির কথায় শিরদাঁড়ার কোথায় একটা খোঁচা লেগে যায়। চুপ করে থাকা যেন দায় হয়ে ওঠে। যদিও, কী বা যায় আসে। আমি যাই কালীনগর, ব্রহ্মনারায়ণ যান গোসাবা। আমি নেবে যাবো আমার ঘাটে, পথের দেখা সেখানেই শেষ। আমার জীবিকায় যদি তাঁর মনে কোনো ধন্দ থেকে যায়, সে বিড়ম্বনা আমার নয়।

ঝিনি কিন্তু হাসে। বলে, 'চুরিচামারির কথা নয়, অনেকে পছন্দ করেন না। তোমার জানতে চাওয়াও উচিত নয়।'

ব্রহ্মনারায়ণ চোখ বুজে বলেন, 'জানতে চাই নি তো আর।'

বলেই চোখ তাকিয়ে ঘাড় নাড়েন। আবার বলেন, 'শুনেছি, পুলিশ গোয়েন্দা-টোয়েন্দা হলে তাদের অসুবিধা থাকতে পারে।'

ঝিনি প্রায় হতাশায় হাসে, চোখ তুলে চায় ভিন্ যাত্রীর দিকে। বলে, 'তবে আর বলছ কেন বারে বারে।'

তার মানে কী? ঝিনি কি বলতে চায়, আমি পুলিশ গোয়েন্দার লোক? কথা যে এখন নিজের দায় হয়ে ওঠে। পুলিশ গোয়েন্দাতে আমার অভক্তি নেই। কিন্তু জীবনে যা নিজেকে ভাবতে পারি নি, তাই বা মুখ বুজে মানি কেমন করে। তা ছাড়া, ব্রহ্মনারায়ণকে কেমন যেন হতাশ মনে হয়। ক্ষ্যাপাটা যখন জুড়িয়ে যায়, তখন তাকে করুণ লাগে। বেশ তো, পথের দেখা পথেই যখন শেষ, তখন না বলার দায় যতটুকু, বলার দায় তার চেয়ে আর কতখানি। মুখ তুলে বলি, 'না বলার কিছু নেই, আমি একটু লিখি-টিখি।'

'লেখেন-টেখেন?'

ঢলে-যাওয়া পালে যেন দমকা বাতাস লাগে। ব্রহ্মনারায়ণের ভঙ্গি হয়ে ওঠে যাত্রার দলের বিবেকের মতো। হাঁক দিয়ে বলেন, 'দেখ ঝিনি, তখন থেকেই আমার সেই সন্দেহ হয়েছিল। নিশ্চয় কবি?'

'না, তার মানে—'

বলার অবকাশ পাই না। ব্রহ্মনারায়ণ আমার কথার মাঝে চড়ে বসেন, 'ও, তা হলে গপ্‌পো। নিশ্চয় গপ্‌পো লেখা হয়? ওই একই কথা হলো। গপ্‌পোও যা, কবিতাও তাই। আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি।'

একেবারে 'গপ্পো!' 'গল্পের' সম্মানটুকুও নয়। এর পরে যদি ভুলেও 'সাহিত্য-সাধনা' ইত্যাদি বলতে যাও, আরো কী শুনতে হবে, জানো না। কিন্তু অধীনের চেহারায় তার কী উর্দি পরা আছে, বুঝতে পারি না। বোঝবার দরকার নেই, তার আগেই ব্রহ্মনারায়ণের গলায় রহস্য উদ্ঘাটনের হাসি। বলেন, 'তাই তো বলি, এ আবার কেন ফিলজফির ওপরে যায়। কবি লেখক না হলে কি আর ওসব হয়।'

অর্থাৎ ব্রহ্মনারায়ণের কাছে সেটা আরো হাস্যকর। যেটুকু বা কলকে পাওয়া গিয়েছিল, তাও বে-হাত। কথার সুরেই বোঝা গিয়েছে, এও যেন বনের মোষ চরানোর সামিল। নইলে, মাস্টারমশাইয়ের কাছে গপ্পো কবিতা সব একাকার হয়ে যেতো না।

জবাব দেবার কিছু ছিল না, অতএব মুখ ফেরাতে হয়। তার আগেই শোনা যায়, 'এতটা যখন হলো, তখন নামটা বাকী রাখবেন না।'

ফিরে দেখি, ঝিনির কাজল-পরা চোখে কৌতূহল। এবার আরো সহজ, এবার সোজাসুজি। বাপের মিটেছে, এবার মেয়ের শুরু। এ কি বেয়াজ বলো, মনের যেন সুর কেটে যায়। পাড়ি ছিল দিগন্তে, এই রোদে নীলের অধরা আকাশে। সবুজে আর সোনা মাঠের শেষে। যত দূরে যাও, তত দূরের বাঁধে বাঁধে। পাখির ঝাঁকের ঘর-ছাড়া বন-ভোজনের জটলায়, আর দরিয়ায় দরিয়ায়। এখানে কারুর নামধাম নেই, পরিচয় নেই। পরিচয়েই জগৎ ছোট। তখন সীমানা চৌহদ্দি আসে, তখন বেড়া এসে খাড়া। অপরিচয়ের কোনো সীমা নেই, কোনো দায় নেই। সে চলে যেমন খুশি, বলে যেমন খুশি। বাঁধা-ধরার ছক সীমানা সরহদ্দ সে আজ পিছনে ফেলে এসেছে।

কিন্তু পথ কোথায়। এখন, এই মুহূর্তে তুমি ছকের ঘরে দাঁড়িয়ে। জবাব না দিলে কি চলে। সহযাত্রারও একটা দাবি আছে। তায় আবার এ যুগের এক বিদুষী। কবুল যখন করেছ, নাম না বলে যাবে কোথায়। তুমি তো আপন তুচ্ছতায়, সংকোচে মরো। আর একদিকে শালীনতা যায়। ওজরে অহংকারের কালি। অন্তত সম্রাট দূরের কথা, দরবারের পারিষদের গদিটা ইস্তক পাও নি, সেইটি জানান দাও। নামটা বলতে হয়।

তৎক্ষণাৎ ঝিনির গলায় বাজে, 'কী আশ্চর্য! নাম তো জানা।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মনারায়ণ উলটো কোপ মারেন, 'তুই জানিস নাকি, আমি তো কই জানি না।'

একেবারে সোজাসুজি কোপ, একটু এদিক ওদিক নয়। হাত ঘুরিয়ে বলেন, 'তা হবে, আমি আবার ওসব পড়ি-টড়ি না তো।'

শোনো হে বাঙালী লেখক। আহা, মরমের ব্যথা না হয় পরে সামলিও, মাস্টার-মশাইয়ের পাওনাটা নিয়ে নাও।

ঝিনি তখন পিতৃদেবকে সামাল দেয়, 'তুমি তো কিছুই পড় না, জানবে কী করে। আমি ওঁর অনেক বই পড়েছি।'

ব্রহ্মনারায়ণ জিভ দিয়ে দাঁতে ঠেলা দেন। বলেন, 'অনেক! অনেক লেখার মতো বেশ ভার-ভারিক্কি লাগছে না তো!'

ঝিনি প্রতিবাদ করে, 'অনেক লিখতে হলে বুঝি ভার-ভারিক্কি হতে হয়। বাবার যেমন কথা।'

'না, একটা মানানসই আছে তো।'

ইতিমধ্যে গিন্নীর গলাও ভেসে উঠেছে। তিনি একটি বইয়ের নাম করে বলেন, 'সেই বইটা তো? আমিও তো পড়েছি, বেশ লেগেছে।'

মাস্টারমশাইয়ের চোখ কপালে। গৃহিণীর দিকে তাকান যেন, সেই বাগবাজারের বারো বছরের সিল্ক-এর ভোট জড়ানো মেয়েটির দিকে। বলেন, 'তুমিও পড়ে ফেলেছ, তবে তো আর কথাই নেই।'

বলে বুড়ো চ্যাংড়া গলায় হাসেন। কিন্তু অন্য পক্ষে, সেদিকে কান নেই। এখন মা-মেয়েতে কথা। এ যুগের বিদুষীর কাছে যেটুকু পাওয়ানা, সেটুকু দেখতে পাই তার চোখের আলোতে। সংকোচের পর্দাটা সরে না। তবু কিছু কথা, কিছু জিজ্ঞাসা তার চোখে ঝিকিমিকি করে। তাতে আমার আরো অরুচি। দেখি, দিগন্তে আমার ছায়া ঘনিয়ে আসে। যেমন খুশির অথই পারে বেড়া দাঁড়িয়ে ওঠে।

তার মধ্যেই মাস্টারমশাইয়ের গলা শোনা যায়, 'আপনি কী রকম লেখেন-টেখেন জানি না অবিশ্যি, তবে কিস্‌সু হস্‌স্যে না। যা-তা সব লেখা হচ্ছে আজকাল।'

আহা মান পরে হবে, আগে শুনে যাও। আপন পাওয়ানা মিটিয়ে নাও হে লেখক। কিন্তু জবাব আসে নিজের ঘর থেকেই, 'তুমি তো কিছু পড়ই না। ভালো-মন্দ তুমি জানবে কী করে।'

'আরে না পড়লেও, একটু-আধটু পাতা ওলটাই তো। পড়াই যায় না, যাচ্ছেতাই, অপাঠ্য।'

ঝিনির প্রতিবাদ আওয়াজ দেয়, যুক্তির জাল ছড়ায়। তুমি বাঘের ভয় করলে কী হবে, ঠিক জায়গাতেই সন্ধে হয়। তবে শ্রবণ আমার বন্ধন করি, কান দেবো না। ভালো-মন্দের ধন্দ, সারা জীবনের হাসন শাসন। আজ সেসব রেখে এসেছি। আজ কাজ নেই, আজ বিচার নেই। মন চলো যাই খোপের বাইরে। উকিলরা তর্ক করুন। কোন্ এজলাসে বিচারক বসে আছেন, তাঁর রায় যবে আসবে তবে। আসামী, আপন গরজে কাম করো গা।

মুখ ফেরাতেই সামনে দেখি গাজীর মুখ। খোপের কথার কী প্রত্যয় তার কে জানে। এ ফকিরটা সত্যি পাজী। দেখ, সেই মিটিমিটি হাসি, যেন চোরাই মালের খোঁজ পেয়েছে। শোনো, যাকে নিয়ে এত কথার আমদানি, সে তখনো সেই ধরতাই ভোলে নি। গুনগুনিয়ে খেই টেনে চলেছে, 'পদ্মপাতায় পানির ফোঁটা টলমল, পদ্ম ভিজে না। তার সাক্ষী দইয়ের হাঁড়ি, উপরে ভাসে ননী ছানা। প্রেমের সন্ধান যে জেনেছে, তার আবার লেনা-দেনার ভাবনা। যেজন প্রেমের ভাব জানে না তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।'...

গাজী গাইতে গাইতে হঠাৎ যেন চমক খায়। কপালে হাত দিয়ে রোদ ঢেকে দূরে তাকায়। বলে, 'বাবু, উই যে দেখা যায় কালীনগর, এসে পড়া গেল।'

তার নজরে নজর তুলে দেখি, দূরে পূবের বাঁকে মাস্তুলের ভিড়। বাঁধের কোলে এলোমেলো ঘর। এখান থেকে দেখি যেন, ঘরের ঘাড়ে ঘর, ঘরের মাথায় ঘর। যেন মস্ত বড় একটা চাকের মতো। দিগন্তের বুকটা একেবারে হাট করে খোলা নেই। কিছু গাছপালা সেখানে মাথা তুলে আছে। বোধ হয় হেটুরেদের ছায়া দেবার জন্যে তারা মাথা তুলেছে

সারেঙের খুপরি থেকে ভেঁপু বেজে ওঠে। এবার যেন একটু দূর থেকেই বাজে। এতক্ষণের পথে ঠিক ও রকম জায়গা চোখে পড়ে নি। হয়তো, এবার যাত্রী বেশী, তাই আগে থেকেই তাড়াহুড়া। যাত্রা আসন্ন, যাত্রী তৈরি হও। লঞ্চের নিচের তলায় হাঁকডাক লেগেছে। যন্ত্রের শব্দ ছাপিয়েও তা শোনা যায়। এবার নামা-ওঠা, সকলের ভিড়ই বোধ হয় সমান।

ভেঁপুর শব্দে খোপের তর্ক দমন হয়। ব্রহ্মনারায়ণের গলা শোনা যায়, 'কোথায় এল?'

গাজী বলে, 'আজ্ঞা, কালীনগর গঞ্জ।'

বিস্ময়টা যেন বিদুষীর গলাতেই চকিত হয় বেশী, 'এসে গেল আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'ইস্! এই বাবার জন্যে! ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলাম না। আপনি খুব বিরক্ত হয়েছেন তো?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'বিরক্ত হবো কেন?'

'হলেও কি তুমি আর তা বলবে?'

এবার শোনো গিন্নীর কথা। ওসব আপনি তুমি-এর সহবতে নেই যে, অনুমতি স্যাপেক্ষের অপেক্ষায় সহজের মুখে দরজা টেনে দেবেন। যা মুখে এসেছে, তা-ই। সহজেই সহজ আনে। আপন মন বুঝে দেখ, বিরক্ত কি সত্যি হয়েছি। একটু হয়তো বিব্রত। সেটা কথার গুণে নয়, প্রসঙ্গের জটিলতায়। তর্কে অরুচি, আজ তাকে দিয়েছি দূরের গারদে। স্বয়ং ব্রহ্মনারায়ণ, তার চেয়ে অনেক বেশী ঢেউ দিয়েছেন প্রাণের তরঙ্গে। বরং আঁত দেখিয়েছেন, দাঁত দেখান নি। একালের কলম যদি ওঁর প্রাণের দরজার কুলুপ না হয়ে ওঠে, সে কথাটা না-বলা থাকবে কেন। বলি, 'না না, বিশ্বাস করুন, বিরক্ত হই নি।'

বোধ হয় গৃহিণীর সহজে সহজ মানেন ব্রহ্মনারায়ণ। 'আপনি'টাকে গোল্লায় দিয়ে, তিনিও বলেন, 'দেখো বাবা, কিছু মনে-টনে করো না। যা মনে এসেছে, তাই বলেছি।'

হেসে বলি, 'ঠিক করেছেন।'

'কিন্তু ঝিনি তা মানবে না, ও ঠিক রেগে থাকবে।'

আমি ঝিনির দিকে তাকাই। ঝিনি যেন সে সব কথা শোনেই না। তার গলাতে একটু যেন অবুঝ বিষণ্ণ হাসি বেজে ওঠে।

বলে, 'আমার এখন খুব খারাপ লাগছে।'

আমি বলি, 'না, না, আমি মোটেই—।'

'সে কথা বলছি না। বাবার কথা ছেড়ে দিন, বাবা ওই রকমই। কিন্তু আপনি এখন নেমে যাবেন ভেবে খারাপ লাগছে।'

ব্রহ্মনারায়ণ বলে ওঠেন, 'তা বলে তুমি এখন ওকে গোসাবায় টেনে নিয়ে যেতে পারো না।'

কথা শুনে সকলেরই হাসি সামলানো দায় হলো। ইতিমধ্যে গাজীর ডাক পড়েছে, 'বাবু, লণ্ড কিন্তু ঘাটে লাগে।'

ততক্ষণে ঝিনির ব্যাগ খুলেছে, হাতে উঠেছে কাগজ-কলম। বলে, 'নাম ঠিকানা লিখে দিন, চিঠি দিলে জবাব দেবেন।'

এখন আর মন-দোমনার সময় নেই। লিখে দিই, যদিও জানি, কোনো প্রতিজ্ঞা নেই। তবু বিদুষীর কাজল-কালো চোখের ঔৎসুক্যে একবার মনে হয়, গোসাবা কত দূর। অকূলে নাকি। তবে, তাই বা ভাসি কেমন করে, অকূলের মাঝি আমি নই। হাত তুলে নমস্কার করি, বলি, 'চলি।'

ব্রহ্মনারায়ণ বলে ওঠেন, 'নামছ নামো, তবে আজ যদি ফিরতে না পারো, তবে কাল আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরতে হবে।' হেসে খোপের বাইরে যাই। ব্রহ্মনারায়ণপত্নীর দিকে তাকিয়ে আর একবার শিশু হতে ইচ্ছে করে। ঝিনি চোখ নামায় না। গাজী বাবরি উড়িয়ে, দাড়ি নাড়িয়ে, ডুপ্‌কি সুদ্ধ কপালে ছুঁইয়ে, জানালার কাছে ভেঙ্গে পড়ে। বলে, 'বাবু, চললাম, তবে যেন আবার দেখা হয়। চলি গো মা-ঠাকুরুণ। দিদিকে বলে রাখি, আবার যেন আপনাকে গান শোনাতে পাই।'

'ও হে, ফকির না গাজী, শোনো।'

ব্রহ্মনারায়ণ ডাকেন। পকেট থেকে একটি সিকি বের করে বলেন, 'আমারটাই বা আর বাকী থাকে কেন, গান যখন ভালোই লেগেছে।'

মুরশেদের নামে, গাজী একেবারে জানালায় কপাল ঠেকে। মুখে তার কথা সরে না আর। মায়ে-মেয়েতে হাসে। আর আমি যেন হঠাৎ এক সিকিতেই ব্রহ্মনারায়ণের ষোল আনা দেখতে পেলাম। নামতে নামতে ভাবি, মানুষ চেনার বড়াই যেন কখনো না করি।

পাড়ে উঠে তাকিয়ে দেখি, ঝিনি হাত তুলে আছে। ও যেন অবাক হয়েছে। তবু

মনের পালে তেমন বাতাস নেই। কী যেন বলে, ঠোঁট নড়ে।

গাজী ডুপ্‌কিটা তুলে হাঁক দেয়, 'দিদি, আবার যেন দেখা পাই।'

লক্ষ্য পড়ে, সারেঙ তার মাথার ওপরে সুতো টেনে, ঘণ্টা বাজিয়ে ইশারা দেয়। নিচের যন্ত্র আরো জোরে ঝেংজে ওঠে। এ ঘাটের যাত্রী খালাস শেষ। খালাসী কাছি ধরে—পাটাতন টেনে নেয় বাঁধের ওপর থেকে। জল-ভডভডিয়া ততক্ষণে পিছনে সরে বাঁক নিতে আরম্ভ করেছে। তারপরে যেন হাঁক দিয়ে ভেসে যেতে থাকে দূরে—দক্ষিণে মাঝ-দরিয়া ধরে। পিছনে তার ফুলে ওঠা জলের ঢেউয়ের রেশ রেখে যায়।

এখন আমরা ঠেকি দিগন্তের এক হাতায়। এবার খোপ চলে যায় দিগন্তে। সেখানে একটি ছাপা শাড়ির আঁচল ওড়ে বাতাসে। বলব না, দাঁড়িয়ে আছি সহবতে। জানি, পথের দেখা পথেই শেষ। তবু, সুজনকে দাঁড়িয়ে থেকে বিদায় দিতে হয়।

গাঙ চলে যায় স্রোতের টানে। মন, তুমি এক ঘাট। সেখানে অনেক যাত্রী ঠাঁই করে, চলে যায়। তুমি থাকো নিরন্তরে। তোমার আজকের হিসাব কালকে মেলে না। কালকের হিসাব তারপরেতে নেই। কাল ধুয়ে যায় কালান্তরের চলন্তায়। আজকের হিসাব আজকে। কেবল যে নীলে রোদে, নদীর অকূলে, পাখিত জটলায়, গাছগাছালির আর আকাশ বরাবর মাঠ তোমার সবটুকুকে টলটলিয়ে দিয়েছে, এমন ব'লো না। কোথায় যাও, কেন যাও, তোমার সেই নামহীন অচিনের খোঁজে। খোপের যাত্রীরা দিয়েছেন অনেক ঝলক। অতএব, প্রসন্নতার জন্যে কৃতজ্ঞ হও। বলো, সেই ভালো, ভালো মানি।

কিন্তু ব্যাদ্‌রা গাজীটার গুনগুনানি শোনো,

'ও সে না জানি কী কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
কুল মান সব গেল হে
তবু না পেলাম তারে
(আমার যে) প্রেমের ছিটা নাই অন্তরে।'...

এ গান গাজী কাকে শোনায়, কার উদ্দেশে। ফিরে তাকাই তার দিকে। দেখি, কালো চোখের আরশি-নজর দূর দরিয়ার বাঁকে, যেখানে জল-ভডভডিয়া বিন্দু হয়ে ভেসে যায়। শব্দটিও নেই আর। আমার কর্ণমূল যে লাজে লাজানো হয়, তা নয়। ইচ্ছে করে, মুরশেদের নামে লোকটাকে ধমক দিয়ে থামাই।

কিন্তু নামের মজদুর আমার দিকে ফিরে হাসে। হাতের মুঠিটা খুলে ধরে। দেখি, তার মাটির মতো কালো কর্কশ হাতের চেটোয় একটা সিকি ঝক্ ঝক্ করে। ব্রহ্মনারায়ণের দেওয়া সিকি, এখনো হাতে। ঝোলায় ওঠে নি। গাজী বলে, 'কোন্‌খান দিয়ে কী গলে, তা বলা-কওয়া যায় না। দেখেন দি'নি, বুড়াবাবু কেমন ঝকর মকর করে। আর আমি বলি কি না, "যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।" কি গুনাহ্ দেখেন দি'নি। মুরশেদের পাঁচ পয়জার পড়ুক আমার পিঠে।'

এবার তোমার লাজ। আসলে অলক্ষ্যে মন চুরি গিয়েছে গাজীর। চোর হলেন ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী। তুমি মনের শীল পরিশীল দেখ। অথচ তোমার মনের দেখা যে এক সিকিতে ষোল আনা, তা গাজীর প্রাণেতেও বেজেছে। শেষের দান সিকিটি তাই এখনো তার হাতে। তাই সে বলে, 'আমার যে প্রেমের ছিটা নাই অন্তরে।' থাকলে বোধ হয় রূপেতে অরূপ দেখতে ভুল হতো না। আবার শোনো, এবার গলা খুলেই গেয়ে ওঠে, 'ও তার বসত কোথায়, না জেনে তায়, মরি হায় হায় রে।'...

'তা মরগা না, এখন যেতি দেবে তো। সর দি'নি।'

পিছন থেকে কে যেন হাঁক দেয়। তাকিয়ে দেখি, চিনি চিনি মনে হয়। হ্যাঁ, এ আর কখনো ভুল হতে পারে! মহাশয়ের পাশে, মিলের লাল শাড়ি জড়ানো ঘোমটা টানা

মহাশয়াকে দেখলেই, গাজীর মাহাতো চাচা আর চাচীকে চিনতে পারা যায়। মাহাতো খুড়ার নিকষ কালো মুখে মাংসের কিছু বাড়াবাড়ি। তবে খস্‌খসে নয়, শক্তপোক্ত। কোকিলের চাহনির রকম জানা নেই। কিন্তু কোকিলের চোখ তুলে এনে যেন খুড়োর চোখে লাগানো হয়েছে, এত লাল। সেই অনুযায়ী মোটা ঠোঁট দুটির কথাও বলতে হবে। হতে পারে, দোকানীর সেজে দেওয়া পান খেয়েছে। পাশে পাশে খুড়ীর চোখের নজর ছিল যে! সেই চোখের অনুরাগেই খুড়োর মোটা ঠোঁট দু'খানি বেশ রাঙানো। সুতী কোটের ওপরে একখানি পশমী আলোয়ান কোমরে বেড় দিয়ে জড়ানো। তবে কি না, হাতে কোনো সুটকেস্ নেই, প্লাস্টিকের শহুরে ঝোলা। মাথার চুলের কথা আর বলো না। ক'দিন চিরুনি দেখে নি, কেউ জানে না। গলায় আছে হাঁক, কিন্তু লাল ছোপানো দাঁতে একেবারে বগ্‌বগে হাসি।

হাঁক দেবারই কথা। বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। একা মানুষ চলতে পারে। দুজনের পাশাপাশি যাওয়া চলে না। পথ দিতে হবে।

গাজী ফিরে বলে, 'কে, মাহাতো চাচা নাকি।'

বলতে বলতে সে বাঁধের ঢালুতে নেমে দাঁড়ায়। আমিও তার পাশে যাই। মাহাতো বলে, 'আর কে।' বলে পিছনে ফিরে ডাক দেয়, 'এইস।'

খুড়ীর মুখে এখন বিড়ি নেই। ঘোমটাখানিও তেমন মুখ জুড়ে ঝাঁপ ফেলে রাখে নি। অপযশ আগে করি নি, এখনো করব না। বিড়ি খাওয়া হোক, আর যা-ই হোক, মুখখানিতে এখনো ঢল ঢল ভাবের বেশ আত্মিসুয়তা রয়েছে। আটপৌরে ধরনের পরা শাড়িখানিতে আরো বোঝা যায়। মধ্যঋতু আশ্বিনের শরীরে, জলের টান যত, গহীনও তত। বরং বলি, মুখের চেয়ে যেন শরীরখানি আরো কাঁচা।

হাসলে বুঝি মাহাতো-বউয়ের মান যায় এই হাটবাজারের কাছে। তবু মামুদ গাজীর দিকে তাকিয়ে চাচীর কপালের টিপ কেঁপে যায়। চোখে হেনে যায় চোরা হাসির ঝিলিক, গাজীর পাশে ভিন্‌দেশীতে তেমন লজ্জা জাড়ানো ভাব নয়। তবে, দেখতে হলে, আড়চোখেই দেখতে হয়। মুখের কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই।

গাজী ডেকে বলে, 'চাচা কি এখন সেই ভোলাখালি চললে নাকি গো।'

মাহাতো বলে, 'না, লারানের ঘরে একটু বইসে যাবো।'

কথার ভাবে মনে হয়, খুড়ার চলা থামবে না। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলে, 'বাবুটা কে?'

গাজী আমার দিকে চেয়ে হাসে। বলে, 'পথে পেয়িছি, বাবু বেড়াতি এসেছেন।'

মাহাতোর লাল টকটকে চোখের মণি দুটোও লাল মনে হয়। বাবুর দিকে ক্ষণেক চেয়ে হাসতে গিয়ে কাশে। বলে, 'এই বাদার বাজারে বেড়াতি? কী বলে দেখ।'

হাসতে হাসতেই এগিয়ে যায় আবার। খুড়ী আর একবার পিছন ফিরে দেখে নেয়। হাতে পায়ে ভদ্দরলোক, আবার এমন জায়গাতেও বেড়াতে আসে।

বাঁধের নিচেই ঘর। ঘরের পর ঘর। তবে বাঁধের এদিক হলো হাটের পিছন দিক। বেচাকেনার দোকানদারি সব সামনের দিকে। তবে, জলপথে আসা-যাওয়ার রাস্তা এদিকেই। কালীনগর, নগর বটে। গাড়িঘোড়ার খোঁজ ক'রো না। নদী খাল বিল নয়ানজুলি, তার ওপর দিয়ে চলাফেরা। ঘাটে মেলাই নৌকা। এক থেকে দশ মাল্লাই, যেমন নৌকাই খোঁজো। যন্ত্র বিকল কিনা কে জানে, উত্তরের সীমায় গোটা দুই লঞ্চ নোঙর করে রয়েছে। তার থেকে একটু দূরে, নৌকা এপার ওপার যাওয়া-আসা করে। বোধ হয় খেয়াঘাট। ঘাট বরাবর ওপারেরও বাঁধের ধারে গায়ে গায়ে ঘর। একটা রাস্তার ইশারা পাওয়া যায় ঘরের সারির পিছনে। কিন্তু দেখা যায় না। ইশারা পাওয়া যায় লোক যাতায়াত দেখে।

ওদিকে আবার এক সোজা রাস্তা চোখে পড়ে। ঘাট থেকে উঠে পুবের মাঠ-মাথাতে

সিঁথি সোজায় চলে গিয়েছে। মনে হয়, এই তো বুঝি কাছে। কিন্তু দূর বোঝা যায়, একটা গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে যখন দূরান্তরের রাস্তাটা চোখে পড়ে। যেদিকে চাও, নজর কোথাও ঠেক খায় না। এখানে ভূমি সমুদ্র। মাঠের বুকে যে গ্রামখানি রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে, তার মাথার ওপরে ধোঁয়ার রেশ। সেই বুঝি সেই বনচড়াই. বনভোজনের মাঝে মাঝে মাঠ থেকে সোঁ করে উঠছে আকাশে। যেন মাঠ ছুঁয়ে থাকা বাঁকা তীরের মতো। তারপরে হঠাৎ ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশ ভরে শতে সহস্রে। ঝাঁপ দেয় গিয়ে আর এক সীমায়। মাঠে মাঠে মানুষের দেখা পাওয়া যায়। ধান কাটা শুরু হয়েছে। তবে পুরো মাত্রায় নয়। স্রষ্টারা এখনো শ্রমের ফল তুলতে দল বেঁধে মাঠে নামে নি।

ফুলের গন্ধে ভোমরা পাগল, ধানের গন্ধে মানুষ। ঘ্রাণে ঘ্রাণে গন্ধ রক্তে রক্তে চোঁয়ায়। প্রাণে যেন নেশা ধরে যায়। ভেঙেচুরে ব্যাখ্যা করি তেমন কথা খুঁজে পাই না। কিন্তু দিক দিকেতে দেখে মনে হয়. কী এক উৎসব যেন আসন্ন। হাটের ঘাটে, মাঝি-মাল্লাদের হাটের দিনের হাঁকডাক ছুটোছুটি ব্যস্ততা নেই বটে। আস্তে আস্তে ভিড় করছে সবাই। অল্পস্বল্প ব্যস্ততা, অল্পস্বল্প মাল বোঝাই-খালাস চলেছে। ভাঁটার পলি পাঁকে, হাঁটুর ওপর অবধি ডুবিয়ে ওঠানামা চলেছে। একে দধিকর্দম বলা যাবে না, ক্ষীরকর্দম মালুম দেয়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে পায়ের নিচে জলের ধারে গেমো জঙ্গলের ভিড়। এখনো অনেক গেমো কোমর ডুবিয়ে আছে জলে, অনেকের গা থেকে জল নেমে গিয়েছে। পলি পাঁকে পাখির দলটাও ছোট নয়। হাটের ঘাটে রোজের ভোজ, মানুষকে তাদের ভয় নেই। দেখ, কেমন নির্ভয়ে ভোজ নিয়ে ব্যস্ত। একটু ওদিকেই যে নৌকা যাতায়াত করে, মাঝিরা ওঠানামা করে, বাঁধের ওপর দিয়ে মানুষ চলাচল করে, সেদিকে যেন একটু রেয়াত নেই।

সব মিলিয়ে যত দেখি, মনে হয়, যেমন গুরু গুরু মেঘ ডাকে দূরের আকাশে, চিকুর হানে চিক চিক অলক্ষ্যের মেঘে, আসমান জমিন দেবে ভাসিয়ে, তেমনি এখানকার মাঠে জলে মানুষে সব কিছুতে এক মহোৎসব যেন আসন্ন। একটা পাগলা হাসি, খুশির ডাক যেন কোথায় এখনো ঠেক খেয়ে আছে। ফাটবে ধারায় ধারায়। কেন এমন মনে হয়, আমার মন বোঝে না। যখন সে আপনাতে আপনি দেখে, তার হাল হদিস পাই না। কেবল হাসতে গিয়ে কোথায় যেন একটা জলের ধারা ছলছলায়। ভাবি, সে উৎসবে আমার অংশ থাকবে না। আর যে উৎসবে আমি নেই. কেন সেই উৎসবেই আমার সকল খোঁজার পরম যাবে ফিরে। আমি যার নাম জানি না, রূপ চিনি না। যার কেন ও কিসের কোনো কারণ জানি না। অথচ তার ডাক শুনেছি সেই কোন্ ভোরে। যখন সংসারে পরম রতন বলে জানা ছিল মাকে. যখন তাঁর কোলের কাছে শুয়ে প্রথম চোখ খুলেছিলাম। সেই থেকেই ডাক শুনেছি, দৌড় দিয়েছি। কে ডাকে, কে ডেকে যায়। চোখ-জোড়া রূপের ঘরে, এই কালীনগরের বাঁধের বুকে দাঁড়িয়ে থাকার মতোই দাঁড়িয়েছি গিয়ে। মনে হয়েছে, কে যেন লুকোচুরির টুক দিয়ে যায় দূরে দূরান্তরে অন্য কোনোখানে। আর প্রাণটাকে যদি বলো খেলার বুড়ী, তবে তাকে আগলে রেখে কেবল ছুটেছি সেই টুক-এর পিছনে। যদিও তার হদিস দূর, ডাকের কথাটিও বুঝিনি।

মন গুণে কি ধন দেখ, সংসারেতে যত উৎসব, সবখানে যেন আমার 'খুঁজে ফেরা' ফেরে। একা পারি না শতেক হতে। অথচ যেন শতখানে 'সে' আমার থাকে অধরায়। ওই যে সেই বলে না, 'ও ভোলার মন, ত্রিবেণীতে বান ডেকেছে, ডুব দি গে যা ত্বরাতে' সেই গোত্র। ডাকার খবর আসে। গিয়ে দেখ, বানের কোটাল কেটে তখন ভাঁটার জল নামে।

গাজীর গলায় চুপিচুপি শোনা যায়, 'বাবু।'

ফিরে তাকাই। চোখ ফেরে, মন গিয়েছে কোথায়। দেখি, গাজীর দাড়ির ভাঁজে হাসি। আরশি-চোখে ধন্দের ঝিকিমিকি। বলে, 'কেমন বোঝেন বাবু?'

মতলব দিয়ে যে নিয়ে এল গাজী, এখন তা ভালো কি মন্দ বোঝ। গাজী তার চাল দিয়েছে। এবার তোমার দান দাও। আবার মনের উদয় কালীনগরে। আবার দেখি দিগন্তে। নতুন ভাবনা আসে। এই যে এক আসন্ন উৎসবের স্বপ্ন দেখছিলাম, এই প্রকৃতি আর মানুষ দেখে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা নতুন ধরন লাগে। এই যে প্রকৃতি, এ শুধুই যেন সুন্দরী নয়, আরো কিছু। এ যেন তেমন করে নিজেকে সাজায় নি। আপনাকে একেবারে উদাস করে ছড়িয়ে মেলে ধরে আছে। প্রকৃতি যে অরণ্যে সাজে, যেন লাজে ঢাকে, তা নয়। এ মেয়ে নিলাজ বড়। আকাশকে ডাক দিয়ে সব হাট করে খুলে বসে আছে। জিজ্ঞেস করি, 'এখানে গাছপালা নেই? চারদিক যেন কেমন খাঁ খাঁ করে।'

গাজী বলে হেসে, 'ইনি যে এখন সোনা ফলান বাবু। গাছের জায়গাই তো ছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এখানে যে এই সিদিনেও সুঁদুরির জঙ্গল ছিল, গড়ানের বন ছিল। দখিনরায়ের বাহন মশাইরা ঘোরাফেরা করতেন। বন কেটে আবাদ হয়েছে, এর নাম বাদা।'

সুন্দরবনের কথা বলে গাজী। যে বনেতে সুন্দরী গাছ ছিল, তার নাম সুন্দরবন। অনেক গাছের নাম শুনেছ—শাল পিয়াল সেগুন,. কিন্তু মুগ্ধ চিত্তে বলে ওঠা, এমন নাম শোন নি। নাম খুঁজতে হয় নি। চোখ ভরে যাওয়া, মন ভুলে যাওয়া মন বলেছিল, এ গাছ সুন্দরী। কিন্তু 'এই সিদিনেও' বলে কেন গাজী। ক'দিনের কথা। জিজ্ঞেস করি, 'এই সিদিনে মানে, কতদিন আগে?'

গাজী দাড়ি মুঠো করে ধরে বলে, 'তা ধরেন গিয়া শ' দেড়শ' বছর হবে।'

যেন এক দেড় বছর আগের কথা বলে। গাজীর বাবরিতে কালোর ঝলক, দাড়িতেও তাই। দু-চার গাছি যা একটু সাদা দেখা যায়, কালোর ভিড়ে নজর পড়ে না। না, চুল দেখে বয়স বলব না। এমন কি এই বাদাতে চৈত্র-মাঠের মতো মুখখানি যে এত ফুটফাট, তা দিয়েও হিসাব হয় না। এ সবই তো ঘাটে বাটের রোদ জল বাতাসের দান। একে দেড়শ' কেন, আধ শ' বছরের মানুষ বলেও মানতে পারি না। তবে সে ব্যাখ্যা চাইতে যেও না। মন বুঝে দেখ, গাজী হিসাবে ভুল করে নি। আজ না হয় তার পথে পথে মুরেশেদের নামের মজদুরি। তার বাপ পিতামহ ছিল। তাদের কাছে শোনা কথা শোনায় আমাকে।

এ ধরিত্রী নবীনা। এ ধরিত্রী আদিবাসিনী, এখনো আঁচল ঢাকতে শেখে নি। বিশাল মহীরুহের সভ্যতা এখনো তাকে সাজ পরাতে আসে নি। এমন কি, এই নিচের দেশে, এই যে দেখতে দেখতে এলে নারকেল সুপারির মাথা দোলানো, এখানে তার চিহ্নও কম।

এ আর এক রূপ। রূপেতে যাঁর নেশা, সে এই রূপেতেও মজে। নিরখিয়া তো এলে জনমভোর, চোখের কপাট বন্ধ তো হয় নি। সে বারে বারে নতুন নতুন দেখে, তবু তৃষ্ণা মেটে নি। দূরের মাঠে চোখ রেখে বলি, 'এমন কোথাও দেখি নি।'

গাজী ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'এমন যে আর কোথাও নাই বাবু। যেমন দেশের যেমনটা। তয় বাবু, দাঁড়িয়ে আছেন তো জগলের হাতায়। সুন্দরবন আর কত দূর। গাছ দেখতি চান, চলেন যাই কত দেখবেন। সে আবার দেখবেন, গাছ আর আসমান আছে, মাটি দেখা যায় না। দিনমানে ঘোর আন্ধার, গাছের ভিড়ে নজর চলে না।'

মনে মনে ছবি দেখি সেই নিবিড় বনস্পতির। যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ডাক আমার পিছনে, যে ডাক ঠিকানা নিয়ে পিছন ধাওয়া করে। আর গাজীর দিনমানের অন্ধকারে, নজর না যাওয়া বনে যে ডাক দিলেই যাবো, আমার বুকের পাটা তেমন বড় নয়। দখিনরায়ের বাহনদের সঙ্গে আমার কোনো দোস্তালি নেই। তার থেকে আজ এই দেখাটুকুই হোক, এই বন কেটে আবাদ। যে ছেউটি বন্য মেয়েটা তার কৌমার্য দিয়েছে মানুষকে। যে নিজেকে দলেছে চিরেছে মানুষের লাঙলের ফালে, আর মা হয়ে দিয়েছে

সোনার ফসল। যাকে ঘিরে জনপদ, হাট গঞ্জ বাজার জমেছে। গাজীকে বলি, 'বন দেখতে পরে যাবো। আজ এখানেই দেখি।'

গাজী হাসে। বলে, 'বললাম বলেই কি যাওয়া যায় বাবু। গাছ দেখতি পাচ্ছেন না, তাই বললাম। চলেন, একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন।'

বলে গাজী বাঁধের ওপর দিয়ে দক্ষিণ মুখে হাঁটে। বাঁ দিকে ঘরের সারি, মুখ তার অন্য দিকে। ডান দিকে নদী। গাজীর পিছন পিছন যাই। উলটো দিক থেকে লোক এলে সবাইকে কাত হয়ে চলতে হয়। কানে আসে নানান্ গলা, নানান্ কথা, হাঁক ডাক হাসি। সবই আসে ঘরের সারির উলটো থেকে। হাটের শহর সেটা। একটু দূরেই দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে বাঁধ। সেই বাঁকে দেখি, মসজিদের মিনার, পাকা দালান। যদি দেড়শ' বছরের আবাদ হয়, তা হলে তার থেকে পুরনো নয় পাকা মসজিদ। তার গায়ের লিখনের দাগও তেমন নয়। তবে মন্দিরের চিহ্ন না দেখে, প্রত্যয় হয়, যারা প্রথম এসেছিল এই কালীনগরে, তারা এসেছিল খোদার নাম করে।

গাজী বাঁধের ওপর থেকে দুই ঘরের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে নামতে নামতে ডাক দেয়, 'এদিক দিয়ে আসেন বাবু, একটা বাজার দেখে যান।'

নেমে গিয়ে দেখি সেখানে অন্য জগৎ। বাজারের এদিক ওদিক দেখা ভার। চার পাশে বাঁধানো ঘরে সারি সারি দোকানপাট, মাঝখানের উঠান জুড়ে এলোমেলো চালাঘর। তবে বাজারে বাজার নেই। চালাঘরের সবই ফাঁকা। ছেঁচাবেড়া, কাঠের খুঁটি, ফ্রেম আর টিনের চাল দেওয়া ঘরে দস্তুরমত মনোহারী মালের কারবার। শীতলপাটি পাতা তক্তপোশের গদিতে বসে আছেন মহাজন। আলমারিতে থরে থরে কাপড় সাজানো। যেমনটি চাও, শান্তিপুরী ফরাসডাঙা মিলের ঝলকানি। কলকাতা বলো, বোম্বাই বলো, নয়নহারা ছাপা পাবে। বায়স্কোপের মেয়েদের নামে নামে শাড়ি পাবে। তার ওপরে, বলো না কেন, শাল আলোয়ান রেশমী পশমী এই নগরে বস্ত্রালয়ে আছে। আর কী চাও। আলতা স্নো পাউডার, দেখ কেমন আলমারিতে থরে বিথরে সাজানো। রেশমী চুড়ি, পুঁতির মালা, ঝুটো সোনা-রুপোর হার, কানপাশা, যাবৎ যাবৎ। এমন কি, সেই যে বিদুষী চলে গেল, তার বিলাসের ঠোঁটরাঙানিয়াও পাবে, টিপছাপ কাজলের ভাণ্ডারও ভরা। আরো যদি বলো, লজেন্স, বিস্কুট, ছাপানো প্যাকেটে নেবে, নাও না। সব ধরে রেখেছে মনের মতো করে।

গাজী ইতিমধ্যেই সমাচার দেওয়া নেওয়া শুরু করেছে। 'এই যে দাশকত্তা, ভালো আছেন তো।...এই এলাম একটু...। জয় মুরশেদ, সাধনদাদা কবে এলে গো। একটা পান খাওয়াতি হবে কিন্তু। আসি একটা পাক দিয়ে।'...

তার মধ্যেই সঙ্গীকে বলে, 'হাটের দিন হলি, দেখতেন বাবু, লোক কাকে বলে। পা ফেলাবার জায়গা থাকে না।'

সে কথা ঠিক। এত বড় বাজার, সপ্তাহের কোনো কোনো দিন সে হাট হয়ে ওঠে। এখানে রোজের বেচাকেনায় সরগরম নয়। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় ঘোরা যাচ্ছে। তাই সব ঘরেই খদ্দের আজ কম, টিমটিমে ঝিমঝিমে। যখন সে গঞ্জ হয়ে ওঠে, তখন চেহারা আলাদা।

তবে পাবে সব। 'গড় করি কবরেজ মশাই, বাড়ি যান নাই এখনো। বেলা তো ঢসকে যায়।' গাজী সবার সঙ্গেই কথা বলে। কবিরাজ মশাই কী বলেন, শুনি না। দেখি, তাঁরও ঢসকে যাওয়া বয়স, চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে হাসেন। ঔষধালয়ের ছাপটি ঠিক আছে। তার সঙ্গে মোদক মকরধ্বজ আর সারিবাদি সালসার বিজ্ঞাপন দরজায় টাঙানো। ডাক্তারখানাও না পাবে তা নয়, তবে ডিগ্রিমিগ্রির কথা তুলো না। বুক দেখার নল আছে, আলমারিতে শিশি বোতল আছে। দেখ, রুগীরা এখনো ধর্না দিয়ে বসে।

সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। নিজের হাতে 'ডাক্তারখানা' লিখতে গেলে, টিনের বুকে আলকাতরায় ওই রকমই দাঁড়ায়। একটু ছোট বড় আঁকা-বাঁকা, এই যা। তা বলে এক নয়, একাধিক। গাজীর কথায়, সেই যে 'চিনির বড়ির মতো ওষুধ' সে ডাক্তারখানাও আছে। দু-একটা বেশী আছে। গাজীর সঙ্গে সকলের আলাপ।

আর যদি অন্য রকম সাজগোজ দেখতে চাও চেয়ে দেখ নরসুন্দরের ঘরের দিকে। মনে হবে, কলকাতার দেয়ালে যত বায়স্কোপের ছবি, সব বুঝি নরসুন্দরের ছিটেবেড়ার গায়ে সাঁটা হয়েছে। এইসব কুশীলবদের নাম না জানতে পারো, কিন্তু যাকে খুঁজবে, তাকেই পাবে। তা সে কলকাতা বোম্বাই যেখানকারই হোক। তবে হ্যাঁ, যেগুলো ক্যালেন্ডার, তার সন তারিখ খুঁজতে যেও না। তোমার নিজের জন্মের হিসাব না মিলতেও পারে। দেখবে, ত্রিরিশ বছর আগের নটী হালের হিরোইনের পাশে কেমন চোখে চাকু হেনে রয়েছে। নটসূর্যের পাশে পাবে চুল ফাঁপানো নায়ক। ছিটেবেড়ার দরমার খোঁজ একটুও পাওয়া যাবে না। এর ওপরে পিজবোর্ডের ওপরে কালি দিয়ে লেখা, চুল ছাঁটাইয়ের ঢঙঢাঙ নোটিস করা আছে।

এতেও যদি না হয়, তা হলে পান বিড়ির দোকানে যাও। বিড়ির জগতে নাকি অদ্বিতীয়, এমন লেখা আছে, যার নাম 'মকুন্দলাল বিড়ি' কিংবা 'হানিফ সাহেবের বিড়ি।' যার পানেই দেখবে, মোটা দাগে ছাপা সুন্দরী, চুল এলিয়ে তোমার দিকে আড় চোখে চেয়ে হাসছে। এবার বলো, অমন করে চাইলে এমন বিড়ি না খেয়ে, পোড়াকপালে কী সুখ! তবে আর এক কথা কি, মহাদেব আর মহম্মদ বলো, কাশী আর মক্কা বলো, মায় দেশের নেতা মন্ত্রী, সকলের ছবিই পাবে এই ভিড়ে। আর পানবিড়ির দোকানেই দু'-চারজনের গুচ্ছে গুচ্ছ গুলতানি। গল্প গান তাশ পাশা, এই বে-দিনে, সেখানেই জমেছে। গাজীর বাতপুছ সকলের সঙ্গেই।

খুঁত কাড়া যার কাজ, তার কাজ। সব মিলিয়ে যেন এক ভিন্ জগতে ফিরি। নতুন ছবি, নতুন সমাচার। কৌতুকের টানা বহে যায়, মনটা টলটলিয়ে ওঠে। শহরের ঝলক নিয়ে কোনো অহংকার নেই যে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসি। মনে হয়, অপরিচয়ের বেড়াটা ডিঙিয়ে এলাম। এ সাজসজ্জা অনেক দিনের চেনা বলে মনে হয়। ওপারের পুবে, বাঙলায় দেখে এসেছি বলে নয়, এই ছবিতে যেন শত শতাব্দীর অতীত কথা কয়। এই হাটে যেন নিজেকে দেখা যায়। আধুনিকতার মধ্যে দূর কালের এক চেনাচেনি, নতুনের স্বাদে চাখাচাখি।

আরো যদি চাও, দেখ, ফাঁকা চালায় কালো মেয়েটি বসে আছে কুচো চিংড়ি নিয়ে। মুখে উপোসের ছাপ, চোখের কোলে কালি। ঘোমটার হায়া নেই। রুক্ষু চুলের গোছাটা পর্যন্ত মাছিতে ছেঁকে ধরেছে। যে কচু পাতায় মাছগুলো ভুর করা, তার পাশেই ন্যাংটা শিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে। কবে যে মায়ের মাছ বিক্রি হবে, কে জানে। আর ওই যে গামছা পেতে সের দুই লাল চাল নিয়ে বসে আছে লোকটি। যেন নগদের তাগাদায় মুখের চাল ক'টি নিয়ে এসে বসেছে। চালের ব্যবসায়ী ও রকম বসে না। এমনি কয়েকজন বাজার বিক্রেতা, যারা এসেছে বে-দিনের মুখ চেয়ে। এত বড় গঞ্জে এ যেন দারিদ্র্যের পসরা।

গাজীর বচন সেখানেও মানে না। বলে, 'সোরেনের বউ না?'

ক্লিষ্ট মুখে হাসি দেখ। বউটি হেসে বলে, 'হ্যাঁ। কবে এলে?'

'আজ। ফিরবও আজ। সোরেন ভালো আছে?'

'সে আবার খারাপ কবে। দেখ গে, হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে আছে।'

দুজনেই হাসে। বউটি বারেক গাজীর সঙ্গীকে দেখে। গাজী বলে, 'আর কবে বেচবে এ মাছ। এবার ঘরে নিয়ে গে কত্তাগিন্নিতে ভেজে খাও।'

আবার দুজনেই হাসে। বউটি কোনো কথা বলে না। দু'টি কথা, একটু হাসি। তবু যেন একটা পরিবারের গোটা ছবি চোখে ভেসে ওঠে। এগিয়ে এসে গাজী বলে, 'কাণ্ড দেখেন বাবু, সাঁওতাল বউটা বাজারে বসে, মদ্দ ঘরে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে।'

অবাক হয়ে বলি, 'সাঁওতাল নাকি?'

'ওই নামেই। জম্মো তো এখেনেই।'

তাও না হয় মানি। কিন্তু গলায় অমন ঠিনঠিনে হাসিটি বজায় আছে কেমন করে। কেবল যে ঘরের ভাতে হাঁড়িয়া হয়েছে, তা নয়। পুরুষ মাতাল হয়ে পড়ে। কাঁখের ছেলে হাটের ভুঁয়ে ; কচু পাতায় কুচো চিংড়ির পসরা, তবু হাসি যে অমর।

তারপরেই দেখি, সামনে ধানের পাহাড়। শহরের একতলা বাড়ির সমান উঁচু হবে, এত বড় ডাঁই। এক-আধটা নয়, অনেক ক'টা।

গাজী বলে, 'এদিকটা হলো ধান-চালের আড়ত। তয় বাবু, এ কিছু নয়। দেখতি হয় হাটের দিনে।'

খবর দিয়েই সে অন্য দিকে বাতপুছ করে। সোরেনের বউ তার সঙ্গে হাসে। আবার দেখি, আড়তদারও পান চিবিয়ে হেসে বলে, 'গাজী যে! অনেক দিন বাদে।'

কিন্তু তখন আমি শুনি হারমোনিয়ামের বাজনা। যত জোরে বাজনা, তত জোরে কাঁস বাজানো মেয়ে-গলায় গান, 'প্রেম করে ভাই, সঙ্গে নিলে না—আ—আ—আ...।' এ যে নয়া ধন্দ লাগায়।

এ যেন, 'কে না বাঁশী বায়ে বড়ায়ি, কালিনী নই কূলে।' বড়ায়ি, কে যেন বাঁশী বাজায় কালিন্দী নদীর ধারে। সুন্দরবনের হাতায়, এই হাটের মধ্যে, এ যেন সেই রকম। দোকানপসার বুঝতে পারি, ধানচালের আড়ত তো থাকবেই। তার মধ্যে এমন সরু সুরের চড়া শব্দে হারমোনিয়াম কে বাজায়। শুধু বাজায় না, আবার গান করে। তাই বা যদি হলো, তাও আবার ইস্তিরিলোকের গলায়। গলাখানিও সেই রকম। চন্দ্রবিন্দু প্রতি অক্ষরেই আছে, সেই সঙ্গেই ধারণা হয়, গলাখানি কাঁসা দিয়ে বাঁধানো। তারপরে যদি বাণীর বিচারে যাও, তবে তো মুচ্ছো যেতে হয়। তখন থেকে এক কলিই দু'তিনবার শোনা যাচ্ছে, 'প্রেম করে ভাই, সঙ্গে নিলে না...।' এখন এ কোন্‌ ভাই, সেটাই বিচার্য। এ ভাইয়ের অনেক অর্থ। ক্ষেত্রে আর পরিবেশে, কে কাকে না ভাই বলে। প্রেমিক-প্রেমিকাও পরস্পরের ডাকাডাকিতে ভাই হয়ে ওঠে। এ গায়িকার ভাইটি কে, কার প্রতি এমন নালিশ, কে জানে।

গাজী পাশে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলে। আড়তদার মশাইদের কারুরই সে রকম কাজের তাড়া নেই। আড়তের সামনেই ধানের পাহাড়। মজুরেরা কাজ করছে। পাল্লায় ওজন হচ্ছে। বাইরের ধান ঘরে উঠছে। খাতা-কলম নিয়ে হিসাব করছে কেউ কেউ। এই বে-দিনে সম্ভবত, কেবল সংগ্রহ। এখন কেনারাম, পরে বেচারাম। লাভরাম তারও পরে। বলা যায় না, লোকসানরাম হতেই বা কতক্ষণ। কেনাবেচার মাঝখানে, লাভ-লোকসানের জোয়ার-ভাঁটা বাইরে দেখতে পাবে না। তবে যদি আড়তদারদের মুখের দিকে নজর করে দেখ, জোয়ারের ঝলক দেখতে পাবে। দিগন্তের মাঠ তার সাক্ষী। বসুমতী পরিপূর্ণ। সেখানে ভরা ভরতি থাকলেই হলো। জোয়ারের কোটালের তিথি-নক্ষত্র সেখানেই।

'ও গাজী, তোমার সঙ্গে কে?'

আড়তের মহাজন মশাইরা সবাই, মাত্র চোখে দেখে নির্বিকার থাকতে পারে না। হাটের দিন হলেও একটা কথা ছিল। ভিড়ের মধ্যে কত লোকের আনা-যানা। তার আবার চেনা-অচেনা। কিন্তু এই ফাঁকায় ফাঁকায়, বে-দিনে অচেনা লোক দেখলে একেবারে নির্বস চুপ করে থাকা যায় না। তাই জিজ্ঞাসাবাদ। গাজীর জবাব সেই এক, 'বাবু

বেড়াতি এসেছেন।'

আড়তদার মশাইদের কারুর কারুর ভুরু কুঁচকে যায়। চোখ দিয়ে গাজীর বাবুকে একটু মাপজোক করা হয়। অবাক না হয়ে করে কী। এ তোমার ভারি শহর বন্দর নয়। এই নোনা গাঙের কূলে, বাদার গঞ্জে কেউ আবার বেড়াতে আসে নাকি। বুড়া আড়তদার মশাই ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকা টানেন, হেসে বলেন, 'এখানে আর কী দেখবেন। খালি ধান আর চাল।'

পথে বেরুনোর কারণ যদি শুধু তাই হয়, তবে বলি, এ পাপচক্ষে তাই বা দেখতে পাই কোথায়। ধান চাল তো নিজের সীমায় আর তেমন নজরে পড়ে না। তবু, সোজা-সুজি কথার একটা জবাব দিতে হয়, 'এই একটু নতুন জায়গা দেখা আর কী।'

'অই সেই।' আড়তদার বৃদ্ধ হুঁকার চুমো থামিয়ে বলেন, 'যেখানে যাবেন, সেখানেই এক। এদিকে গেলে মাঠ, ওদিকে গেলে জল। মধ্যখানে এই বাজার। বসেন না, বসেন এসে।'

বসব না, বসতে চাই না। তবু বুড়ো মানুষের ডাকটি বেশ। সেই 'এস জন বস জন' বলে বাঙলায় একটা কথা শোনা ছিল, সেই রকম মনে হলো। কাজকর্ম আছে, তার মধ্যে লোকজনের আসা-যাওয়া। চেনা-অচেনা কথা নেই। থাকতে আসনি, রাখতেও চাই না। একটু বসে যাও। এসেছ আমাদের দেশে। একে বলে সাবেকী শালীনতা। যার মধ্যে একটু প্রাণের সুরের রেশ পাওয়া যায়। তাও বোধ হয়, এই বয়স বলেই এখনো এটুকু শোনা যায়। আগামীকালের কালীনগর গঞ্জের কোনো বৃদ্ধ আড়তদার এ কথাও আর বলবে না। তার চালচলন হবে আলাদা। শহরের আধুনিকতা দিয়েছে পাশাপাশি মানুষের বিচ্ছিন্নতা। মানুষে তা নিক বা না নিক, সময়ের ফের বুঝে, স্রোত ধরে, বিচ্ছিন্নতা টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাচ্ছে। সে কেবল আপনা বোঝে। তাইতেই সে হাসল। দুসরাকে সে দেখবে কখন।

সেই ধারা কি এখানেও চোঁয়াচ্ছে না। চোঁয়াচ্ছে, আসছে। সময় তার সব কিছুই সবখানে দিয়ে যাবে। আগে পরে, দেরিতে আর ধীরে। যোগের সুতো এখনো কিছু এইসব মানুষদের হাতে। যাদের মুখ হয়তো সামনের দিকে এখনো ফেরানো। কিন্তু হাঁটা শুরু হয়েছে পিছনে, যেদিকে সূর্য পাটে নামে, পড়ন্ত রোদ যাদের মুখে শেষবার আলো দেয়।

ধন্যবাদ দিতে পারি না কেতাবী রকমে, বলি, 'বসব না, একটু ঘুরে ঘুরে দেখি।'

আড়তদার ফোকলা দাঁতে হাসেন। বলেন, 'দেখেন, তবে অই দেখবার কিছু নেই। হাটের দিন এলেও হতো, দেখতেন কত তরিতরকারি ধান চাল বোঝাই হয়ে যায়। তার সঙ্গে গরু ভেড়া ছাগল, ইস্তক মানুষও।'

'মানুষও?' অবাক না হয়ে পারি না।

আড়তদার ফোকলা দাঁতে হাসেন। বলেন, 'তা বাবা, অত চমকান কেন। খালি কি ধান চাল তরিতরকারি পশু পাখি বিকোয়! মানুষ বিকোয় না? কত মানুষ আপনার কতখানে চালান হয়ে চলে যাচ্ছে। বসে থাকবার যো কই। হাটের দিনে দেখবেন, মানুষ নৌকা ভরে চলে যাচ্ছে। এখন, বাবা, বেচা বলেন, যা-ই বলেন, পেটের ধান্দায় কমনেকার মানুষ কমনে চলে যাচ্ছে। একটু তামাক খাবেন?'

অন্য কোথাও হলে সব কথাগুলোকে ঠাট্টা মনে করতাম। অন্তত তামাক খাবার ডাকে তো বটেই। কিন্তু ভুলে যাই, বয়স দিয়ে ভব্যতার বিচার হয় না। পথ-চলতি লোক, একেবারে কাঁচকাঁচাটি নয়। নিজে খাচ্ছেন, আর একজনকে না বললে কি ভালো দেখায়। তায় আবার ভিন্‌দেশী। বলি, 'না, না, তামাক খাবো না।'

গাজী হেসে বলে, 'বলি অ বিশ্বাস মশাই, এনারা তামাক খান না, ছিরগেট খান,

ছিরগেট।'

বিশ্বাসমশাই ঘাড় নেড়ে বলেন, 'তবু বলা দরকার তো।'

এগিয়ে যাই আস্তে আস্তে। কিন্তু বুদ্ধের মানুষ বিকোবার কথাটা হঠাৎ ভুলতে পারি না। আমি যে চমকে ভেবেছিলাম, ধান চাল গরু ভেড়ার মতো মানুষও বুঝি বিকিয়ে যায়, তা নয়। মানুষে শ্রমে বিকোয়। সেও এক রকমের বিকনো। দূরের এই ভেড়ি বাঁধের নোনা কূলের হাটে, রোজের শোনা কথার মধ্যে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠে। হয়তো সে নিষ্ঠুরতা একেবারে মিথ্যে নয়।

গাজীর সঙ্গে এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিতেই দেখি, সামনে এক মস্ত পুকুর। তবে, তার বুক-জোড়া কচুরিপানা। পুকুরের প্রায় চার পাশেই ঘর। গাছের গুঁড়ি আর পাটাতন ফেলে ঘাটলা করা আছে। যার যেমন দরকার, সে ততখানি কচুরিপানা সরিয়ে দিয়েছে। সেখানে জল দেখা যায়। বাকী সবই দেখ, শত সহস্র নাগের ফণা তোলার মতো কালো সবুজের ডগা মাথা তুলে আছে। একদা হয়তো এই পুকুরই ছিল এই নোনা কূলে মিঠে জলের ভান্ডার। এখন হয়েছে টিউবওয়েল। চাপা কল যাকে বলে। ডান্ডা ধরে চাপ দাও, ভলকে ভলকে জল পড়বে। তাই এ মিঠা জলের ভান্ডারের আর কদর নেই। কেবল একজনকে দেখি, কোমর-জলে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে গা ডলছে। তারপরের ঘাটে, খোলা পিঠে চুল এলো করা, পাশ ফেরানো এক মেয়ে বাসন মাজে। বউ বলতে পারি না, কারণ তার ঘোমটা দেখি না। হাটের পিছনে, এমন খোলা জায়গায় বউমানুষের মতো তার ভাবও দেখি না।

কিন্তু সেই গান গেল কোথায়। হারমোনিয়ামের সেই সরু সুতো কাটার শব্দ আর তার সঙ্গে, 'প্রেম করে ভাই সঙ্গে নিলে না।'...গাজীকে জিজ্ঞেস করতে যাবো। তার আগেই দেখি, প্রলয় কান্ড। কোন্ দিক থেকে এল, ধরতে পারি না। এক মাঝবয়সী মোটাসোটা শক্ত গড়নের খালি গা মানুষ ক্ষ্যাপার মতো ছুটে আসছে আমাদের পিছনেই। তাকে কয়েকজন ধরে রাখবার চেষ্টায় টানাটানি করছে। কিন্তু তার যো কী। সে আকাশ কাঁপিয়ে হাঁকে, 'না, ছেড়ে দাও, ছাড়ো, আজ ওর রক্তদশ্শন না করি ছাড়ব না।'

কার রক্ত দর্শন করতে চায়! গাজীর দিকে তাকাই। গাজী তাকায় ক্ষ্যাপার দিকে। এই অচেনা তল্লাটে গাজী ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু আমার দিকে তার খেয়াল নেই। সে আপন মনে বলে, 'এই দেখ, পালমশাই যে ক্ষেপে উঠেছে একেবারে। হলটা কী।'

ততক্ষণে পালমশাই আরো এগিয়ে এসেছেন। যারা ধরে রাখবার চেষ্টায় আছে, তাদের মধ্যে একজন বলে, 'আরে অ অনাদি, একটু ঠান্ডা হও দি'নি। তুমি যাও, আমরা দেখি কী করা যায়।'

যাকে বলা, সেই অনাদির কাছে থেমে থাকা অনন্তকালের মতো। সে এমন ভাবে এগিয়ে আসে, আমাকে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াতে হয়। সেও এগোয়, তাকে যারা সামলায়, তারাও এগোয়। পুকুর ধারে সরু রাস্তা, রাস্তার ধারে ঘর। ঘরে ঢুকতে পারি না, অতএব আমি, গাজী দুজনেই অনাদি আর সামলানো দলের ধাক্কা খাই। গাজীকে জিজ্ঞেস করি, 'ব্যাপার কী, কার রক্ত দর্শন করতে চায়?'

আমার থেকে সে সমস্যা গাজীর অনেক বেশী। সে অনাদির দিকে চোখ রেখে বলে, 'সেইটাই তো বুঝতি পাচ্ছি না বাবু। তয়, কেমন যেন একটা সন্দ লাগে। চলেন দেখি, আগায়ে যাই। লোকটাকে তো ভালো বলিই জানি।'

গাজীর তো আজ মুরশেদের নামে ভরাডুবি, বাবুর সঙ্গেই দিন কেটে গেল। কিন্তু আমি না জানি মুরশেদ, না গুরু। কোথায় যাই, কেন যাই, কিসের সন্ধানে, তার হদিস জানি না। এটুকু জানি, এই দূরের বাদার গঞ্জে রক্তারক্তি দেখার ইচ্ছা এক ফোঁটাও নেই। তাই বিরক্ত হয়ে বলি, 'তুমি যাও, মারামারি দেখতে চাই না।'

গাজী ভরসা দিয়ে বলে, 'আ হা হা বাবু, ভয় পাবেন না। আসেন না দেখি, বিষয়টা কী।'

ভয় নেই, ভাবনা আছে। যেসব ভাবনা রেখে এলাম পিছনে, এইসব হাঁকডাক উত্তেজনায় সেই ভাবনাগুলোই বিরাজ করে। কে জানে, কার সঙ্গে তার কিসের সংঘাত। যাতে আমার হাত নেই, তাতে আমার কাম নেই। ওই যে অনাদি পাল, এখন সে যদি কারুর রক্ত দর্শন করে, এমন প্রত্যয় নেই যে, ঠেকাতে পারি। তবে যাই কেন। কৌতূহল? সে কৌতূহল আমার আজ নেই। তাও আজ রেখে এসেছি আমার জনপদের সীমায়, সমাজে। সেখানে আমার করবার আছে, বলবার আছে। সেখানে আমার কৌতূহলের কার্যকারণ থাকে। আজ আমার শরিকানা অন্য রূপের সীমায়। কে এক অনাদি পালের ক্ষ্যাপামি আজ আমি দেখব না।

দেখবে না! সব কি তোমার মর্জিতে চলে। দেখ, নামের মজুরের কালো ফাটা হাতখানি তখন বাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। তুমি যাকেই ছাড়ো, ছাড়ো; তোমাকে কে ছাড়ে। 'যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না হে।' কিন্তু লোকটা এত সাহস পায় কোথায়। আলখাল্লা তো বলব না, তালিতে তালিতে তালি-খাল্লার ধুলো আমার গায়ে লাগিয়ে অবলীলায় হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। কোনো মানামানি নেই নাকি। বাবু কি তার হাতের লোক নাকি, যেমন খুশি টেনে নিয়ে যাবে। বিরক্ত হয়ে হাত ছাড়িয়ে ধমক দিতে যাই। তার আগেই নতুন দৃশ্যে চোখ পড়ে যায়। ভুলে যাই হাত ছাড়াবার কথা। ধমক আটকে থাকে গলায়। দেখি, এক ঘরের সামনে নিচু দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে এক মেয়ে। অনাদি পাল আর তার সামলানো দল সেখানে এসে ঠেক খেয়েছে।

কবুল আমার আগেই করা, মেয়েদের বয়স বিচারে যাবো না। তবে নজর বলে, এ মেয়ে যুবতী। কিন্তু সরে দাঁড়াও ভিনদেশী, নজর হুঁশিয়ার। এ তো মেয়ে নয়, যেন নাগিনী ফণা তুলে ঘাড় কাত করে আছে। ছায়াটিও যদি নড়ে, জানবে তা হলেই ছোবল। সেই রকমই দেখি যেন। নয়া কাজলের কালি নয়, বাসি কাজলের কালি তার চোখে। তার সঙ্গেই দেখ, রাত-জাগা ছায়া চোখের কোলে। তাইতে যেন বড় ফাঁদি চোখের চাহনিকে খরতা দিয়েছে বেশী। চোখ নয়, শান দেওয়া ছুরি। তাতে আবার আগুন দপদপায়। বাসী পানের ছোপ ঠোঁটে। সেও যেন আর এক বাঁকা ছুরি। ঠোঁট টেপা, বুকের আগুন বাঁকানো। এর থেকে নতুন খাওয়া পানের রঙে রাঙানো ঠোঁটের ঝলক আলাদা। তাতে রঙ থাকে, আগুন থাকে না। কালো কালো মুখখানির ছাঁদ এদিকে মন্দ নয়। নাক একটু বোঁচা বোঁচা, তবে তোলো কম নয়। নাকের পাটা থরো থরো, তাইতে নাকছাবির পাথর ঝিলিক হানে। মাথায় ঘোমটা নেই। বাসী খোঁপা এলো। সিঁথের বাসী সিঁদুর কিঞ্চিৎ মলিন। কপালের ফোঁটা, কপাল জুড়ে মাখামাখি করা। জামা নয়, জামার চিল্‌তে গায়ে, অন্তর্বাস বলি। তার ওপরে শাড়িটি ফিনফিনে পাতলা, ফুল ফুল ছাপ। সব ছাপিয়ে সায়ার ফুলছাপ ইস্তক দেখা যায়। পায়েতেও বাসী আলতার দাগ। সাজেগোজে বসনে একটু যেন বিলাপের ছাপ। গলার হারে হাতের চুড়িতেও তাই বলে। তবে ভাবভঙ্গি বিপরীত। যুবতীর নজর যে কার ওপর, বুঝতে পারি না। ঠিক কারুর দিকেই নয়। সাপিনীর চোখ যেন ছায়ার দিকে নিবিষ্ট।

যে দাওয়াতে বসে আছে সে, তার ওপরে ঘরের দরজা বন্ধ। অনাদি পালের লক্ষ্য সেদিকে। তিনজনে তাকে ধরে রাখতে পারে না, সে জোর করে দাওয়ায় উঠতে চায়। আর মুখে বুলি, 'ও দরজা আমি লাথি মেরে ভাঙব। আজ আমি ওর রক্ত দশ্‌শন করব। বের হয়ে আয় বলছি, যদি মানুষ হস্‌ ত, আমার সামনে বের হয়ে আয়, তোর পীরিতের দৌড় দেখি আমি।'

সামলানো দলের একজন বলে, 'আহা ছি ছি, কী করো অনাদি। হাটে বাজারে লোক হাসিয়ে লাভ কী বলো দি'নি। তুমি চলো, আমরা যা করবার তা করছি।'

অনাদি পালের ভৈরব কণ্ঠ তার ওপরে যায়, 'আর লোক হাসাতে বাকী কী আছে। এ বাজারে কি কারুর কিছু অজানা। ও আমার মাথা হেঁট করেছে, বংশের মাথা হেঁট করেছে। ওকে আমি ছাড়ব না, না না না। অনেক দিন বলেছি, আর না। যে কুত্তায় একবার গু খেয়েছে, সে কুত্তায় আর তা ছাড়তে পারে না। ওকে আজ আমি শেষ করব।'

বলেই সে সকলের হাত ছাড়িয়ে, ঠেলে দাওয়ায় উঠতে যায়। যদিও পারে না, এবং হাঁক দেয়, 'বের হয়ে আয়, ওরে হারামজাদা, দেখি তোর পীরিত কুড়কুড়ায়, না জান কুড়কুড়ায়।'

ব্যাপার বুঝি না। বন্ধ ঘরে কে, কার উদ্দেশে এমন গুরুতর অভিযোগ যে কুকুরের মতো তার নোংরায় নেশা। তবে, এই যে মেয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, ওদিকে ঘরের দরজা বন্ধ, এদিকে পীরিতি বিষয়ক ধিক্কার, তাতে যেন কেমন একটা চেনা চেনা গন্ধ লাগে। কিন্তু ঘরেই বা কে। মেয়েটি বা কে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এসে জুটেছে। যোটবার জন্যে আসছে এদিক ওদিক থেকে। কেবল এক ব্যাপারে ধন্দ লাগে। যুবতীর ভাবভঙ্গিটা একটু যেন কেমন। তার খর চোখে আগুন বটে, ফণা তোলা ভাবখানিও ঠিক আছে। ঠোঁটের বাঁকানিতে এমন একটা তুমুল ব্যাপার যেন ভারী তুচ্ছতায় খান খান। আর নজর যদি ঠিক থেকে থাকে, তবে একটা জিনিস ঠিক দেখেছি। অনাদি পাল যতই ঠেলাঠেলি করুক, দাওয়ায় উঠে দরজায় লাথি মারা যেন তার ক্ষমতায় অকুল। কোথায় কিসে বন্ধন করেছে, এমনি ধরা যায় না। মনে হয়, পা ঝুলিয়ে বসা মেয়ে সেই বন্ধন। অথচ দেখ, এ মেয়ে একবারও চোখ তোলে না অনাদি পালের দিকে। অনাদি পালও তার ক্ষ্যাপা ঘোরে যেন বড় সজাগ। মেয়েটির দিকে তার নজর পড়ে না।

আমি গাজীর দিকে চাই। গাজীর নজর সকলের মুখে মুখে ঘোরে। সে এখন অন্য ঘোরে আছে।

সামলানো দলের একজন আবার বলে, 'শোনো অনাদি, পাগলামি করে না। তুমি যাও, আমরা ওকে বের করে আনছি। তারপরে মার কাট, পরে হবে। যাও, তুমি যাও দি'নি।'

এত সহজ নয়। আজ রক্ত সব মাথায়, সেই রক্তে আজ আগুন লেগেছে। ভাবে কথায় বোঝা যায়, অনাদির ধৈর্য আজ অধরা। সে চিৎকার করে, 'না, ওকে না নিয়ে আজ যাবো না। আজ ওর একদিন, নয় আমার একদিন। লম্পট, ইল্লুতে! এই সেদিনে হারামজাদাকে কিরা কাড়িয়েছি, নাকে খত দিয়েছে। গত হপ্তায় সে নিজে মেয়ে দেখে এসেছি, বে' দেবো বলে, আর সেই আবার এখেনে, অ্যাঁ?'

অনাদি পাল দু' হাত তুলে ঘোষণা করে, 'বলি দেবো, পাঁটাকে আজ আমি বলি দেবো। বের হয়ে আয়।'

কী বিড়ম্বনা! সত্যি সত্যি একটা রক্তারক্তি দেখতে হবে নাকি। গালাগালির তোড় যে রকম, তাতে কানে জ্বালা ধরে যায়। যারা এসে জুটেছে, তাদের মধ্যে থেকেই একজন হঠাৎ বলে, 'অরে, অ দুলি, একটা কাণ্ডমাণ্ড হবে. তার চে' বের করে দে না ছোঁড়াকে।'

যুবতী ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় বক্তার দিকে। ছিলায় যেন টান পড়ে। ঠোঁটের ধনুক আরো বেঁকে ওঠে। এইবার শোনো, গলায়ও কেমন ছুরি ঝলকায়, 'কেন, দুলি কি ঘরে ঢুকে কোলে করে বসে আছে নাকি। তোমরা যেখেনে, দুলিও তো সেখেনেই।'

তা বটে, কথায় খুঁত পাবে না। জলজ্যান্ত তোমাদের সামনে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার নাম জানা গেল দুলি, কিন্তু এ মেয়ে কে। এ ঘরের সঙ্গে তার সম্পর্ক

কী, ভিতরের প্রাণীটিই বা কে! এক ব্যাপার বোঝা গিয়েছে, ভিতরের প্রাণীটি একটি ছোঁড়া। সে নাকে খত দিয়ে কিরা কেটেছে, আর এখানে আসবে না। তার বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখা হয়েছে। তবু সে এখানে এসেছে। তাতে একটু 'সন্দ' লাগে, এ ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দুলি নামে এই যুবতী। এবং এই যুবতীর সঙ্গে ঘরে বন্ধ প্রাণীটির কী যেন কী আছে। বোধ হয় সেই পীরিত না কী, অনাদি পালের ভাষায় যা কুড়কুড়ায়।

বক্তা আবার পথ দেখায়; 'না, সে কথা হচ্ছে না। ছোঁড়াকে বের হয়ে আসতে বল্। না হলে একটা কী বিপদ আপদ ঘটবে।'

দুলি শরীরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। যেন বিপদ আপদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে। তেমনি ঠোঁট বাঁকিয়েই বলে, 'ডেকে তো আনি নি। নিজের মনে এসে ঢুকেছে, ইচ্ছে হলে নিজের মনেই বেরুবে।' এই তার বক্তব্য। এ বক্তব্যেও কোনো ত্রুটি নেই। দুলি যদি না ডেকে থাকে, আর সে যদি নিজের মনে এসে থাকে, তবে তাকে নিজের ইচ্ছেতেই বেরুতে দাও। হ্যাঁ, কথার ত্রুটি নেই বটে, কিন্তু এ যেন তলায় তলায় স্রোত বয়ে যায়। যে ডুব দিতে জানো, সে দেখে নাও। তলে তলে একটা যেন লড়াই চলেছে।

বক্তার এবার রুষ্ট স্বর; 'ঘর তো তোর, তুই না বললে বলবে কে?'

হঠাৎ যেন সাপিনী ঘাড় হেলিয়ে তাকায়। চোখের ছুরিতে খান খান করে কাটে। ঘৃণা যেন উপ্‌চে পড়ে। রোষে রোষে ফোঁসে। বলে, 'ঘর আমার হতে পারে, যাত্যা'ত্ তো সকলের। চলে যাবার কথা নিজের মুখে বলি কোন্ মুখে বলো। গেরস্তের ঘর তো নয়, এখেনে সবাই আসে।'

বলে যেন বিতৃষ্ণায় আর ধিক্কারে ঘাড় ফেরায় সজোরে। বাসী খোঁপায় ঝাপটা লেগে, আর এক প্রস্থ ভাঙে। একটা ঝকঝকে রুপোর কাঁটা শিথিল হয়ে ঝোলে ঘাড়ের কাছে।

পথিক, আপন বুঝে চলো। বাজারের কোন্ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবার তার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। এও এক বেচাকেনার হাট। মনের কোণে একটু যে এই ধারণার উঁকিঝুঁকি না ছিল, তা বলতে পারি না। একটু ধন্দ ছিল। এ বেচাকেনার ইতিহাস জানা নেই, কবে থেকে শুরু। কিন্তু যবে চোখ মেলে তাকিয়েছি এই পৃথিবীর দিকে, তখন থেকে এই হাটের দেখা পেয়েছি সমাজের পাশে, জনপদের ধারে। এ সভ্যতার দান কি না, কে জানে। তার হদিসে যাবো না। নাগরী। যেখানে যত ঝলক, সেখানেই নগর-নাগরী। যেখানে যত ঝলক সেখানেই নগর-বিলাসিনী বাররামা নায়িকা। দুলির স্পষ্ট কথায়, এলাকা আপন চিহ্নে ফোটে। এখন যেন খেই ধরিয়ে দেয়, সেই সরু তীক্ষ্ম সুরের হারমোনিয়ামের বেসুরো বাজনা, আর কাঁসা বাজানো গলায়, 'প্রেম করে ভাই সঙ্গে নিলে না...।' এবার বোঝ সে কোন্ নিকুঞ্জ থেকে শোনা গিয়েছিল।

কিন্তু এমন বেচাকেনার হাটের দেখা যে এই সুন্দরবনের হাতায়, নোনা গাঙের কূলে, দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝে, হাটের ধারে পাবো, ভাবতে পারিনি। এই বেচাকেনার হাট যবে প্রথম দেখেছি, তখন তার মর্ম বুঝি নি। সংসার কবে কাকে চিরকাল কল্পলোকের আলোয় মিনারে বসিয়ে রেখেছে? আলোতে অন্ধকারে, ধুলাতে কুলাতে সে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবন ভরে কেবল আমি সু দেখেছি, কু দেখিনি; এমন 'অংকার' নেই। বলার কথা কইতে গেলে, তুমি কেবল সু-ভাষ করেছ, কু-কথা বল নি, এমন নিপাট, পবিত্র প্রকাশের চোখ বোজানো ঠ্যাকার নেই। তাই, যবে মর্ম বুঝেছি, তখন সংসার আমার রক্তে দিয়েছে কাঁটা। ঘৃণা দিয়েছে শিহরণ। ভয় দিয়েছে দূরে পালাবার তাড়া।

তারপরে এই সংসারের পথে, আপন জীবনে জীবিকায়, চলার চড়াইয়ে উৎরাইয়ে, নিজের গায়ে পায়ের ধূলায়, কান্না হাসিতে চেতন পেয়েছি, এ হাটের প্রমোদকুঞ্জে বিলাপ বাজে, অন্ন অন্ন করে। এর বাতির ঝলকের তেল আসলে গ্লানি, যে গ্লানি চোখের

আলোর নিচের কালোয়। সল্‌তের বুনোট নিষ্ঠুর পাকে বোনা। পানের পিকে গলক্ষতের রক্ত ঢেকে রাখার মতো হাসিটা মর্মান্তিক করুণ। অতএব, ওহে মানুষ, নিজের হাতে গড়া বিষপাত্রের গড়নখানি দেখ। আপন চড়াই দেখ, দুরন্ত চড়াই। সেই কলিটি ভাবো, 'আপনারে চিনলে পরে, চেনা যায় পরওয়ারদিগরে।'

এখানে দাঁড়িয়ে আমার চমক লাগে না, শিরদাঁড়াতে কাঁপন ধরে না। লাজে লাজানো সংকোচে অপমানিত হই না। এইসব সারি সারি ঘরে কাদের বাস, এখন আর তা অস্পষ্ট নয়। তবে, দুলি নামক যুবতীর কথায় অনাদি পালের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। গলার শির ছেঁড়ে কি মাথার রগ ফাটে, সে ঝাঁকুনি দেয় প্রচন্ড, হাঁক দেয় প্রবল, 'ওরে লোচ্চা, শুয়োর, এখনো যদি না আসিস, তবে কিন্তু আমি দরজা ভাঙব। এই তোমরা সবাই সাক্ষী।'

দুলি তৎক্ষণাৎ দুলে ওঠে, যেন নাগিণী। আগুনের মতো চোখে রক্তের ছিটা লেগে যায়। অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঘরের দরজা মাগনা নয়। এই ঘরে যখন বাস করি, তখন তা'লে ভাঙচুর আমাকে আগলাতে হবে। তারো সবাই সাক্ষী।'

এইবার বুঝি সত্যি সত্যি রক্তারক্তি হয়। এতক্ষণ স্রোত ছিল তলে তলে। এখন ঢেউ জাগে ওপরে। সোজাসুজি ঢেউ তোলে দুলি বিলাসিনী। কেন, ঘর যখন গৃহস্থের নয়, এ মেয়ে বিবাদে কেন যায়। এ যে বাদার হাটে এসে দেখা পেলাম হালের বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির। এই রূপের হাটে অরূপের আলো কোথাও ধিকি ধিকি জ্বলে নাকি। তবে কি এ পীরিতি সেই পীরিতি নাকি। ধরায় ফেরে অধরা চিন্তামণি, ফাঁদ পেতেছে বিল্বমঙ্গল। দুলির কথায়, ঘুর ঠিকানায়, সেই কথাটাই বাজে যেন। আসতে বলি নি, যেতে বলব না। এতে কী বোঝ হে। ভিতর ভরে যে আছে সে থাক।

এবার গাজীকে না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'কে আছে ভেতরে?'

গাজীটা নেহাত পাজী, এখনো চোখ ঝিকিমিকি করে। চুপি চুপি বলে, 'পুরনো কিস্যা বাবু। ঘরের মধ্যি পাল মশাইয়ের ছোট ভাই, অনন্ত পাল। সব বলব আপনাকে পরে।'

ওহ্, ব্যাপার অনাদি-অনন্ত। কবে শুরু, শেষ কবে, কেউ বলতে পারে না। তার চেয়ে, এ পালা চলতে থাকুক, অন্য দিকে যাই। যতটুকু কৌতূহল, সেটুকু মিটে যায়। বাকী যেটুকু, সেটুকুর মধ্যে কোনো টান পাই না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেই অনন্তর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছে। অনাদি পাল হেঁকে চলেছে, 'আমার বাপের ব্যাটা যদি হোস্, তবে বের হয়ে আয়।'...

ভেবেছিলাম, কোনো কিছুতেই এই কাঁঠালকাঠের দরজাটি খুলবে না। দুলির ঠোঁটের মতোই তা শক্ত করে টেপা। কিন্তু সকল বাঁধন ঝরো ঝরো, খুট্ করে হুড়কো খুলে গেল। অনন্ত পাল দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। দাদা-ভাইয়ের চেহারায় অব্যর্থ মিল, বয়সের একটু ফারাক যা আছে। অনন্তর মাথা নিচু, দৃষ্টি আপন পায়ে। যেন চুরি করে খাওয়া অপরাধী সারমেয়টি। সত্যি অনাদি বাপেরই ব্যাটা, এইটি প্রমাণ হাতেনাতে দিয়েছে।

সকলেরই মুখে যখন স্বস্তি, একটা বিপদ-আপদের ভয় যখন ভঙ্গ, তখন দেখ, দুলির দপদপে চোখে কেমন চমক। সে অবাক হয়ে ঘাড় ফেরায়। তার ঠোঁট খুলে যায়। তবু নাকছাবির পাথরটা বারেক ঝিকমিকিয়ে ওঠে। যেন স্বপ্ন দেখা বিশ্রাম, খর চোখে ছায়া ঘনায়।

ইতিমধ্যে অনাদি পালকে তার লোকজন ঠেলাঠেলি করে নিয়ে চলেছে। 'চলো চলো, বিচার যা তা পরে হবে। বের হয়ে এসেছে যখন, তখন আর এখেনে ল্যাটা বাড়িয়ে কাজ নেই।'

অনাদি পাল জয়ী। ফিরে যাবার পথেও সে নিজের বাপের ব্যাটার দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে বীরবিক্রমে যায়। অনন্ত নেমে আসতে থাকে পায়ে পায়ে।

দুলি আবার ফণা তোলে। এবার সে ঘা খাওয়া সাপিনী, আরো ভয়ংকরী। এবার চোখের সবটুকুই আগুনে আগুন। পণ্যাঙ্গনার গোটা শরীরটাই আগুনের শিখা। যেন শিস দিয়ে বলে, 'দাঁড়াও।'

অনন্ত দাঁড়ায়। দুলি বিদ্যুতের মতো ঘরে ঢোকে। আর ঘরের ভিতর থেকে এসে দাওয়ায় পড়তে থাকে নতুন একটি ছাপা শাড়ি, মনোহারি জিনিস কিছু, হিমানী, পাউডার, আলতা, একটা রুমাল, যেন তাতে কিছু টাকা বাঁধা। এক ঠোঙা খাবার। তারপরে দরজার পাশে একবার তার মুখ ঝলকে ওঠে। গলা শোনা যায়, 'ওগুলন নিয়ে যাও, লজ্জা থাকে তো আর এ মুখো হয়ো না।'

পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড শব্দে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমার যেন মনে হলো, দুলির চোখ দুটো চল্‌কানো গাঙের মতো দেখাল।

ভেবেছিলাম, বিল্বমঙ্গল অনন্ত পাল দরজা খুলে তার দাদার বাপের ব্যাটা প্রমাণ করেই চলে যাবে। কিন্তু উপহারের ডালি যখন দাওয়ায় এসে পড়ল, অনন্ত থমকে দাঁড়াল। দেখ, অনাদির এত করে দরজা খোলানো কেঁচে যায় বুঝি। অনন্ত আবার বন্ধ দরজায় ঝাঁপ দিয়ে না পড়ে। সে-পালা শুরুর আগে এবার সরে পড়াই উচিত। ভিড় করে যারা এসেছিল, থমকানো ভাব তাদের চোখে-মুখেও। একবার নজর অনন্তর দিকে, আবার উপহারের ডালির দিকে।

সেই মুহূর্তে অনাদির দলের একজন ফোড়ন দেয়, 'দেখ্ অনন্ত, হাটের মেয়েমানুষের ফরকানি দেখ্। মুখের উপর বে-ইজ্জত করে।'

ফিরে যেতে গিয়ে কথাটা কানে বেসুরো লাগে। তার থেকে বেসুরো ভঙ্গি দেখি বিল্বমঙ্গলের ভাবে। দেখি, তার বুক চিতিয়ে ওঠে, আগুন চোখে মুখে। এ যে সত্যি সত্যি মানীর মানে লেগেছে! তারপরেই শোনো প্রেমিকের দাওয়া কাঁপানো হাঁক, 'কী, এত বড় আস্পদ্দা, মুখের উপর জিনিস ফেলে দিলে। আবার তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? তবে আমিও এই পিতিগ্গে করে যাচ্ছি, শালার এ মুখো আর কোনোদিন হবো না।'

বলেই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—দরজায় নয়, উপহারের সামগ্রীর ওপর। দু' হাতে সাবড়ে তুলে নেয়।

আপন জনপদে হলে এমন সহজে দাঁড়িয়ে অপার কৌতূহলে এ দৃশ্য দেখা হতো না। ওই যে সেই কথা, অপরিচয় কোনো সীমারেখার দাগ টানে না, তার কোনো দাবি-দাওয়া নেই। চেনাচিনিতেই গোলমাল, সে তখন পরিচয়ের নানান্ বেড়া তুলে দেয়। সেখানে ভদ্রলোকের সহবত ঘাড়ে আমার পাল্লার কাঁটায় এদিক-ওদিক করে। এখানে অচেনার ভিড়ে আমার সে দায় নেই।

সে দায় নেই, কিন্তু বাদার এই বিল্বমঙ্গলের ব্যাপার দেখে কোথায় যেন নিজের লজ্জা লেগে যায়। মাথা নত হয়ে পড়ে, আর একটা ধিক্কারের ধ্বনি বাজে, 'ছি ছি ছি।' কী করব, যখন আমি দর্শক, তখন আমিও যোগে যোগ হয়ে যাই। ঘর থেকে প্রেমিকের বেরিয়ে আসা তবু একরকম ছিল। তাতে চলতি স্রোতের টান দেখেছিলাম। এ যে কাদায় পাঁকে ঘুলিয়ে গেল হে।

ঘোলানোর ঘূর্ণি আরো দেখি। দড়াম্ করে দরজা খুলে যায় আবার। দুলি ফুঁসে ওঠে, 'হ্যাঁ, এ পিতিগ্গেখানিই মনে রেখো, আর এ মুখো হয়ো না, হয়ো না, হয়ো না।'

কথা শেষের আগেই দ্বিগুণ শব্দে আবার দরজা বন্ধ। কিন্তু এবার আর সন্দেহ সংশয় নেই, দুলির খর চোখে গাঙের ধারা, বাসী কাজল ধুয়ে যায়।

'হবো না, হবো না, হবো না।'

বার বার, তিন বার, এই 'পিতিগ্‌গে' আবার ঢোল-শহরত করে প্রেমিক। বুকের ওপর যাবৎ উপহার তুলে নিয়ে, দাওয়া থেকে হাঁটা ধরে। তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন। কে যেন ছুঁড়ে দেয়, 'হ্যাঁ, ঘরের দাব্যি ঘরে নে' যাও, কাজ দেবে।'

এমন পল্লীতে দাঁড়িয়ে এমন 'মজা' আর দেখি নি। কিন্তু মজার তালে তাল লাগে না যেন। দোল লাগে না তেমন। মনের যেখানে লজ্জা লেগেছিল, ধিক্কার হেনেছিল, সেখানটা সহসা উদাস হয়ে যায়। বুকের কাছে নিশ্বাস দীর্ঘতর, ভারী লাগে, আলোর বৃত্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঝমক ঝমক তালে যেমন আচমকা তারের যন্ত্রে ছড়ের লম্বা টান পড়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে থাকে কেবল বাসী কাজল-ধোয়া দুটো গাঙ-চল্‌কানো চোখ।

গাজী বলে ওঠে, 'একে বলে মরণ।'

চোখ ফিরিয়ে দেখি, গাজীর লাল ছোপানো দাঁত দেখা যায়। কিন্তু তার ইছামতী-আরশি চোখে ছায়া। সেই যে পাজী পাজী ঝিকিমিকি, তা নেই। আমার দিকে ফিরে বলে, 'বোঝলেন না বাবু, একে বলে মরণ। সেই যে মুরশেদ বলে না "কল্লি কল্লি সবই কল্লি, আ মরণ, মল্লি কবে জানলি না", এ সেই রকম।'

আশেপাশে সবাই তখন দুলি-অনন্ত কাহিনীতে আপন বয়ান জুড়তে ব্যস্ত। কেউ তার কথা শোনে না। জিজ্ঞেস করি, 'কার মরণ?'

'যে মরেছে, তার।'

বলতে বলতে আবার গাজীর চোখের আরশি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। দেখ, ছায়ার ছ-ও নেই। বলে, 'মরণ বোঝেন তো বাবু। তমালের ডালে ঝুলে থাকবার জন্যে যেমন একজন মরতে চেয়েছিল, সেই রকম। জ্যান্ত মরা যাকে বলে।'

ভানুসিংহের পদাবলীতে পড়েছিলাম, 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' সে মরণে সুখ আছে না দুঃখ আছে, সে চেতন আমার নেই। তবে, গাজীর কথায়, মরণ যদি ঘটে থাকে, তবে হাটের মেয়ে দুলির ঘটেছে। নইলে হাটের মাঝে যে মেয়ে আপনাকে হাট করে খুলে বসেছে, সে তো নগদ বিদায়ের আশায়। মজুরি বলো, উপহার বলো, সব কেন সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে যে নিয়মে অনিয়মের তাল বাজে। বুকে যে ডঙ্কা মেরে ফণা তুলে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে দাওয়ায়, দরজা খুলতেই তার কেন বুকের খিল খুলে যায়। তার কেন ফণা নেমে যায়, মুখে ছায়া নামে, বুকের মেঘ গলে গলে পড়ে চোখের দরিয়ায়। কোন্ জ্বালাতে সে গিয়ে মুখ ঢাকে অন্ধকারে। একে কি বারোবাসরের চাল বলে!

সমাজ আছে, অনাদি-অনন্তে। মনকে বলি, আমাকে তুমি এই ক্ষণে সামাজিক হতে ব'লো না। দুলির পরাজয়ের মাঝখানে যে মন বিরাজ করে, চোখের জল পড়ে, তার শরিক করো। আজ আমার সেই মনেতে বসত, সেই মনেতে ভাসি। নিরুদ্দেশের অবুঝ ফেরায় আজ আমার এইটুকু পাওয়ানা।

যে পথে চলেছিলাম, সেই পথেই চলতে চলতে বলি, 'মরণ যদি হয়ে থাকে, তবে তো মেয়েটারই।'

গাজী ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বলে, 'কেন বাবু। অনন্ত পাল জ্যান্ত নাকি।'

রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলি, 'তাই তো মনে করি। কোন্ মুখে সে ঝগড়া করে। তাতেই তো সব ঘোলা করলে।'

একটু চেতন মেনে নিজের কথা নিজে শুনলে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না। মানী ভদ্রলোক, সে কিনা দুলি-অনন্ত নিয়ে কথা বলে। তাও একটা পথের ফকিরের সঙ্গে।

গাজীর আমার সে-সব ভাবনা নেই, যেন রহস্য করে চুপি চুপি বলে, 'বাবু, ঘোলায়

বলেই থিতোয়, তাই কি না বলেন।'

কথার স্রোত যেন বাঁকা। তাতে ডুব দিতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাই। গাজী হেসে বলে, 'অই যে তখন বললাম আপনাকে, পরে সব বলব। বাবু, এই দাওয়াতে কত ফেলাফেলি ছোঁড়াছুঁড়ি কসম খাওয়াখাওয়ি দেখলাম। সব বিড়ালের আড়াই পা, বোঝলেন না। পুরনো কিস্যা বাবু, পুরনো কিস্যা। গঞ্জের তাবৎ লোকে জানে।'

'তার মানে, তুমি বলছ—।'

কথা শেষের আগেই গাজী বলে ওঠে, 'আমি বলব কেন বাবু। আজই রাতের বেলায় আবার যার জিনিস তার ঘরে আসবে, তখন মানভঞ্জের পালা। তারপরেতে একেবারে ভাব সম্মিলন।'

বলে গাজী হেঁ হেঁ করে হাসে। আবার বলে, 'তয় যদি বলেন, অনন্ত ঘর থেকে বের হয়ে এল কেন, তা হলি বলতি হয়, দশজনের মধ্যি দাদার একটা মান রাখতি হয়। তেমনি আবার দুলি ছুঁড়িরও মান যায় যে দশজনের সামনে। অই বাবু ঘরের বলেন, হাটের বলেন, সব মেয়েমানুষের এক কথা, "হেঁই, জগতে তোমার কাছে আমি বড়, না বাপ-দাদা বড়?" দুলিরও সেই কথা। মেয়েমানুষকে বলতে লাগবে, "রাই, তুমি ছাড়া কী ছাই জগৎ আছে।" তাইতেই বাবু অনন্তের গোলমাল হয়েছে।'

শুনতে শুনতে এবার আমার চোখের ফাঁদ বড় হয়! ছেঁড়া তালির আলখাল্লা, ধুলায় মাখানো, কাঁধে-ঝোলা ফকির এমন মেয়েমানুষ বোঝে কেমন করে। এ তো মুরশেদের নামের মজুরের কথা নয়। সুরের সঙ্গে সঙ্গত যে করে না, সে কেমন করে বোল দেবে। এ মানুষ তবে মুরশেদের নামের মজুর নয় কেবল। ডুপ্‌কি বাজিয়ে ফেরা, পথে ঘোরা উদাসীন নয় শুধু। অন্য মজুরিও আছে। প্রকৃতি নামের মজুরানা না থাকলে, এ বোল কেন বাজবে। অথচ চেয়ে দেখ, প্রকৃতি নাম এর কোথায় আছে।

গাজী তখনো অব্যর্থ চালের বোল দিয়ে চলেছে, 'আর মান যায় বলেই, মন খেদে মরে, তখন ঝগড়া। অই আপনি যা বলেন, ঘোলা করা। তাই বলি বাবু, না ঘোলালে কি থিতোয়। তয় হ্যাঁ, যদি দেখতেন, দাওয়ার মাল দাওয়ায় পড়ি রইল, হাঁকোড় পাকোড় নেই, অনন্ত চলি গেল, তা হলি জানতেন, ও আলগা রশি, ছাড়াছাড়ি। তলায় তলায় বগবগায়, তাই জল ঘোলায়।'

আবার সেই পাজীর চোখে গাজীর হাসি। আর যা কিছু বাতপুছ, সব আমার জিভেতেই ঠেক খেয়ে যায়। যা বলার শোনার, এখানেই শেষ। তবু, ভুরু কুঁচকে লোকটার চোখের দিকে না তাকিয়ে পারি না। এ দেখছি রস-দরিয়ার পাকা মাঝি। এমনি চেয়ে দেখ দরিয়ায়, কোথায় আছে ঘূর্ণি, তোমার চোখে পড়বে না। চিনিয়ে দেবে পাকা মাঝি, দেখিয়ে দেবে উত্‌রে যাওয়া। এ যেন সে গোত্র। আমার মনের যেখানে ছিল লজ্জা, ধিক্কারের ছি ছি ধ্বনি, সেই নির্লজ্জতাতেও পীরিত মন্থিত। যখন তুমি সহজ বোঝ, তখন সে উলটা। প্রেম নামে নদী, সে চলে অদেখায়। তাকে দেখে তরী বাইবে, সে কান্ডারী নেই। যে আছে অদেখায়, তাই দেখে চলাই এ মাঝির দায়। কিন্তু, অবাক লাগে, এ গাজীতে সেই মাঝি কোথায়! এ আলখাল্লার ভাঁজে ভাঁজে চাপা আছে নাকি।

আমার দৃষ্টি দেখে তার একটু মন কুঁকড়ে যায় বুঝি। হাত জোড় করে বলে, 'রাগ করবেন না বাবু, এসব অচাল কুচাল দেখতি হলো আপনাকে।'

রাগ করিনি, এ কথাটা জানাবার আগেই আবার সেই, হারমোনিয়ামের সরু সুরের বেসুরো চিৎকার। তার সঙ্গে কাঁসর গলা। এবার একেবারে সামনেই। গাজী নিজের পায়ে বেগ দিয়ে বলে, 'আসেন, আসেন।'

বহুরূপী বটে, এতক্ষণে গাজী বাবুর কাছে লজ্জা পাবার অবকাশ পায়। তাই

তাড়াতাড়ি এ হাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। একটু এগিয়েই আবার বাঁয়ে বাঁক ফেরে সে। ফিরতেই নতুন দিগন্ত, সারি সারি খাবারের দোকান। যাকে বলে, মণ্ডা মেঠাই, খাজা গজা, এ তাই। এই দূরের হাট বলে অছেদ্দা করা চলবে না। রীতিমত কাঁচ লাগানো আলমারিতে থরে থরে সাজানো। রসগোল্লা রাজভোগ পানতোয়া, সব আছে গামলায় গামলায়। হতে পারে অ্যালুমিনিয়ামের গামলা। কাঠের বারকোশে আছে গাল-ফুলানো গজা, প্যাঁচানো অমৃতি, পেতলের বাটায় সন্দেশ। আরো দেখ, লেখা আছে, 'মিষ্টি দধি।' আড়ালে আবডালে নয়, দোকানের ভিয়েন বসেছে সামনেই। সিঙাড়া নিমকির তো কথাই নেই। তবে, ছবির কথা আর বলব না। এখানেও তার রাজত্ব বেড়ায় বেড়ায়। তার সঙ্গেই ঠাকুরদের নানান্ বাণী।

এক নয়, কয়েকটি সারি সারি দোকান। ভিতরে বসবার জায়গা অনেক, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া হয়। তার আশেপাশেই রয়েছে চিঁড়া মুড়ি মুড়কি বাতাসা। চিনি মিছরি কদমার দোকান। চারদিকে মাছি পাবে পর্যাপ্ত। তার সঙ্গে বোলতা মৌমাছি। ভয়ে ভয়ে অমন করে হাত পা ছোঁড়বার দরকার নেই। তুমি যদি হুল না ফোটাও, সে তোমাকে ফোটাবে না। সকলেরই উদ্দেশ্য এক, খাবার সংগ্রহ।

এ দিগন্তে আসা মাত্র হঠাৎ গাজী ভুলে যাই। দুলি-অনন্ত ভুলে যাই। এত যে আমার বেরিয়ে পড়া অচিন পথে পথে, কেন, কিসের খোঁজে তাও না জেনে, সেই রসিকের সব রস এখন দেখি জিভের রসের ধারায়। তাত্ত্বিকেরা কাকে বলেন 'মহাপ্রাণী', কে জানে। এখন দেখি, মহাপ্রাণী আমার সারা দিনের শূন্য জঠরে উপবাসে কাঁদে। হায়, এত কথা এক নিমেষে হারায়। হঠাৎ মনে হয়, সূর্য অনেক দূরে ঢল খেয়েছে, দুপুর কেটে গিয়েছে কখন। যে দিগন্তেই যাই, দানা বিনে কোনো পাখিতে নাম গায়! দেখ, কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষ, কেবল মানুষ কেন, একেবারে টায়ে-টিকে জীব, এই কথাটা কোনো রকমেই ভুলতে পারা যায় না। সারাদিনের এত ক্ষুধা, কোথায় কখন এমন করে ঝিমিয়েছিল, কে জানে। এখন যেন ডাকাতের মতো হাঁক দিয়ে উঠল।

কেবল যে এইসব দেখেই মহাপ্রাণী চমক খেলেন, তা নয়। রক্তে আর এক নেশা আছে, তার গন্ধও পাই। কোথায় যেন ভাতের গন্ধ ভাসে। তার সঙ্গে তরকারি ব্যঞ্জনের। এত দূরের হাটে সে আশা নিশ্চয় বৃথা। এখানে যাদের বসত, তাদেরই রান্নাবান্না হচ্ছে। তবু মুড়ি-মুড়কি মিষ্টির থেকে ভাত-ব্যঞ্জনের গন্ধেই এই বাঙালী মাছি পাগল।

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আগেই। দু' পা এগিয়ে গাজীও ফিরে তাকায়। কাছে এসে বলে, 'খাবার কিনবেন বাবু!'

তা নইলে আর এ হাটে দাঁড়ানো কেন। বললাম, 'খিদে পেয়েছে, একটু খাওয়া দরকার।'

গাজীর যেন নিজের প্রাণে লাগে। বলে, 'আহ্ মুরশেদ, দোয়া করো হে। এতখানি বেলা হলো, আমার ইস্তক মনে নাই। কী খাবেন, বাবু!'

অভাবে যা জোটে। বললাম, 'কী আর খাবো। অন্য কিছু তো পাবো না, দই মিষ্টি দিয়েই মিটিয়ে নিই।'

ইতিমধ্যে এক দোকান থেকে ডাক পড়েছে, 'আসেন বাবু, ভালো রাজভোগ আছে, সন্দেশ আছে...।'

ফিরিস্তি শুনতে শুনতে পা বাড়াব ভাবছি, তার আগেই গাজী বলে ওঠে, 'কইতি তো সাহস পাই না বাবু, দুই তিনখানা ভাতের হোটেলও আছে।'

'ভাতের হোটেল?'

'এ'জ্ঞে বাবু। তার মধ্যি, লারাণদার হোটেলখানি বেশ সাফসুরত্ আছে। অই যে শোনলেন না, মাহাতো চাচা বললে, একবার লারাণের ঘর ঘুরি যাবে। তার মানে,

চাচা চাচী ওখেন থেকে ভাত খেয়ে হাঁটা দেবে।'

ভাতের হোটেল শুনে শরীরে ক্রিয়া হয়, কিন্তু মন খুঁতখুঁত করে। হঠাৎ কোনো দিকেই এগোতে পারি না। গাজী উৎসাহ দেয় 'লারাণদার ঘরে আপনি চ্যার টেবুলও পাবেন, কাঁচের গিলাস পাবেন, চিনামাটির সান্কি পাবেন।'

একটু যেন মন টানে। সামান্য কথা নয়, এ দূরের হাটে চেয়ার টেবিলে বসে, ডিশে বেড়ে ভাত খাওয়া। দেখতে দোষ কী। বললাম, 'চলো দেখি।'

চলো বলে চলা নয়, সামনের দুটো ঘরের মাঝখানের সরু ফালি দিয়ে ঢুকেই দেখি, সামনে দরমার বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা, 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হিন্দু হোটেল।' আর কিছু লেখা নেই। মাটির দাওয়া পেরিয়ে ঘর। ঘরের ভিতর কোনো জনপ্রাণীর কায়া তো দূর, ছায়াও দেখি না। চ্যার টেবুলের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। তবে কোথায় যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয়, তার সঙ্গে মানুষের গলা। গাজীর দিকে ফিরে তাকাই। তার নজর অন্য দিকে, সে কদম কদম এগিয়ে যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হিন্দু হোটেল পেরিয়ে। এবার দেখ, দরমার বেড়ার গায়ে নয়, যথার্থ কাঠের তক্তা গোলপাতার চালার মাথায় ঝোলানো। তাতে লাল রঙ দিয়ে লেখা আছে, 'মহামায়া হিন্দু হোটেল।' নীচে স্থানের নাম। তবে, দরমার বেড়া এখানেও, এবং তা একেবারে ফাঁকা নয়। রীতিমত ডাক দিয়ে বলা হয়েছে, 'আসুন, সর্বপ্রকার আহার পাইবেন।' আরো যেন কী সব লেখা ছিল। তার দাগ আছে, অক্ষরের অবয়বগুলো আর অটুট নেই। কালের থাবায় খুঁটে নিয়েছে, নাকি দরমা বেড়া আলকাতরা ধরে রাখতে পারেনি, তা বোঝার উপায় নেই।

সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ডাক শোনা গেল, 'গাজী যে। খেতি এলে নাকি?'

তাকিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে বেড়া ঘেঁষে মাহাতো খুড়ো কাঁচা মাটির মেঝেয় বসে। সামনে তার কলাই করা থালায় গরম ভাতে ধোঁয়া উঠছে। তার সামনে মুখোমুখি আর একজন উট্কো হয়ে বসে কথা বলছে। খালি গা, রোগা রোগা লোকটা, গলায় এক গাছা পৈতা, দুই আঙুলের ফাঁকে বিড়ি। পৈতাগাছার রঙ দেখে একখানি কেঁচো ভাববার কোনো কারণ নেই। চান করার সময় মাজাঘষা না হয়, তা নয়। তবে নিত্যকার তেলে জলে একটা রঙ ধরেছে। মাহাতোর কথায় সেও ফিরে তাকায়।

গাজী বলে, 'বাবুকে একটু খাওয়াতি নে এলাম।'

খুড়ার নজর তখন বাবুর দিকে। নিজেই ডাকে, 'আসেন না, ঘরে আসেন। ডাল ভাত ট্যাংরা মাছের ঝোল পাবেন। আর-আর যেন কী আছে বললে নারায়ণ?'

সামনের ব্যক্তিটি, আদুর গায়ে পৈতাতে যার পরিচয়, বিড়িতে দু'টি টান দিয়ে, মোটা গলায় জবাব দেয়, 'কুচো চিংড়ির অম্বল।'

তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মুরশেদের নামে, চ্যার টেবুল তো দেখি না। কাঁচের গেলাসের বদলে দেখি, মাহাতোর সামনে ছোটখাটো একখানি ঘটি। চিনেমাটির সান্কির জায়গায় কলাই করা থালা। এ পোড়া চোখে যদি ছানি না পড়ে থাকে, তবে খানে খানে কলাই উঠে যাওয়া কারুকার্য অব্যর্থ দেখেছি।

তুমি দেখ চোখে চোখে, গাজী দেখে মনে মনে। সে বলে, 'ঘরে চলেন বাবু, চ্যার টেবুল সব আছে ওপাশে। মস্ত বড় ঘর কি না।'

ভাবি, আগে যাবে গাজী, পিছে আমি। কিন্তু গাজী এগোয় না। এসেছি যখন, দেখে যাই। মহাপ্রাণীকে চোখ ঠারবো না, গরম ভাত, ট্যাংরা মাছের ঝাল শুনে, তার আটপৌরে বাঙলা স্বাদে রস কাটে। তবে কোথায় যেন পিছটান ফিরিয়ে নিতে চায়। গাজীকে বলি, 'চলো।'

গাজী হেসে বলে, 'আমি তো যেতি পারব না বাবু, হিঁদুর হোটেল। আপনি যান, আমি ওই দরজার সামনে গে দাঁড়াই।'

বলে সে আরো কয়েক পা এগিয়ে যায়। লক্ষ্য পড়ে, আর একটা দরজা আছে ঢোকবার। কিন্তু গাজীর কথায় মনের অন্য চমক ভাঙে। গাজী যে মুসলমান, তা মনে ছিল না। তোমাদের নগরে বন্দরে, ঘরে পান্থশালায় যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা। সেখানে বাবুর্চিতে জাত যায় না। তোমার জিভের রস-খসানো খানা বানায় খান সাহেব। জাত দূরের কথা, তুমি খেয়ে কৃতার্থ। আর এখানে গাজী তোমার দাওয়ায় পা দিলেই ধর্ম রসাতল।

এবার নারাণঠাকুর স্বয়ং দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করে, 'আসেন বাবু, ভিতরে আসেন।'

দাওয়া পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াই। কী সর্বনাশ, আমার বুক ধড়াসে যায়। পায়ের কাছে, কালো চকচকে এটা কী এঁকেবেঁকে যায়! সাপ মনে করে পেছুতে যাই। নারাণঠাকুর হেসে ভরসা দেয়, 'ভয় পাবেন না বাবু, ওগুলোন পিঁপড়ে।'

'পিঁপড়ে?'

'আজ্ঞে। ডেয়ো পিঁপড়ে। আপনাকে কিছু বলবে না, যান, ওখেনে চেয়ারে যেয়ে যুত করে বসেন।'

এমন কিছু উম্‌দা বাঙালীর অহংকার নেই যে, ডেয়ো পিঁপড়ে চিনি না। তা বলে, এইরকম! কোথায় কোন্ অন্ধকার কোণ থেকে যে এমন পুষ্ট কালো পিঁপড়ের সারি বেরিয়ে আসছে, ঠাহর করতে পারি না। কেবল দেখছি, কাঁচা মেঝের ওপর দিয়ে গুটি কয় বাঁকা লম্বা দাগে, উনি এক গর্তের মধ্যে নিরন্তর চলেছেন। চওড়া কম করে পৌনে এক ইঞ্চি। পাশাপাশি তিন চারজন করে লাইন দিয়েছে।

নারাণ ঠাকুর আবার ডাকে, 'আসেন, এই যে ইদিকে।'

পিঁপড়ের গণ্ডী পার হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, যথার্থই চেয়ার টেবিল। তবে রূপের ব্যাখ্যা চেয়ো না। কিন্তু চেয়ার টেবিলের ওপাশে ভুঁয়ে কে বসে? চিনি চিনি যেন। ভাবতে ভাবতেই মাহাতো খুড়ী তাড়াতাড়ি ঘোমটার আড়াল দেয়। আ ছি ছি, বিড়িতে লাজ নেই, তা বলে ভাতের গরাস পরপুরুষের সামনে তোলা যায়!

কিন্তু মাহাতো গিন্নীর পাত পড়েছে এমন জায়গায়, চোখ না পড়ে উপায় নেই। তার দিকে পিছন ফিরে বসব, তাতেও বিঘ্ন। চ্যার টেব্‌লের ব্যবস্থা সেরকম নয়। অথচ, ঘোমটা টানা লজ্জাবতী বউ বলে কথা। আন্-পুরুষের সামনে বসে খায়-ই বা কী করে! ভেবে একটু ঠেক্ খাই। সেই মুহূর্তেই আবার একটু লাল ঘোমটার ফাঁক। মধ্যঋতু আশ্বিনের ঢলঢল মুখখানি চকিতে দেখা যায়। শরতের দীঘি চোখের দৃষ্টি কোন্ দিকে, বুঝে ওঠবার আগেই দেখি, বারেক ঝিলিক হেনে ওঠে। আবার ঘোমটা আড়াল পড়ে যায়।

দেখতে হবে না, নিশ্চয়ই নারাণঠাকুরকে দৃষ্টি হেনে ধমকাচ্ছে, 'আ মরণ, মিনসেকে এখানে বসতে দিচ্ছ কেন।'

সরে যাবো ভাবতেই নারাণঠাকুর বলে, 'বসেন বাবু বসেন।'

ওদিক থেকে মাহাতোর গলাও শোনা যায়, 'বসি পড়েন মশাই, অনেক বেলা হলো।'

'হ্যাঁ, আর দিক্ দিক্‌কত নয়, বসি পড়েন বাবু।'

সামনের দরজায় দেখি, গাজী বাইরের বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। একেবারে মুখোমুখি। সেও এক কথাই বলে। তবে মাহাতো গিন্নীর মোটা-দাগের দেশী কাজলমাখা চোখ দু'টিতে যে ঝিলিক হানা দেখলাম, তার কারণ কী!

যাই হোক। পথের মানুষ এসেছ ভোজনাগারে, খাবার পছন্দ হলে খাবে, চলে

যাবে। তোমার অত কার্যকারণের খোঁজ কেন। সবাই যখন বলছে, আসন নিয়ে নাও। তবে দাঁড়াও, অমন নগর চালে চেয়ার টেনে বসতে গেলেই বসা যায় না। আর একটু হলেই টাল খেয়ে একেবারে ভুঁয়ে আসন নিতে হতো।

এ তো আর পালিশ করা ঘরের মেঝে নয়। লেপামোছা আছে বটে। তা বলে একটু এবড়ো-খেবড়ো থাকবে না, বা দু'একটা ছোটখাটো গর্ত-গার্তা থাকবে না, এমন হলফ কেউ করেনি। চেয়ার টান দিয়ে যেই বসতে গিয়েছি, দেখি সেটা কাত হয়ে টলে যায়। চার পায়ার এক পায়া একটা গর্তে বসে গিয়েছে। নারাণঠাকুর হাত বাড়ায় ধরতে। তার আগেই সামলে নিয়ে বলি, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

নিজেই টেনে তুলি চেয়ারের পায়া। তার মধ্যেই নারাণঠাকুরের ডিগডিগে রোগা শরীর থেকে গম্বুজ ফাটানো বাজখাঁই হাঁক বেজে ওঠে, 'ফোঁচা, অ্যাই শালা ফোঁচা।'

একে ফোঁচা, তায় শালা। দুটো শব্দই গালাগাল কি না বুঝতে পারি না। কারণ, অমন নাম আগে শুনিনি। যেন গালাগালের মতোই শোনায়। ছোঁচা যদি গালি হয়, ফোঁচাই বা নয় কেন। ডাকা মাত্রই এ ঘরের পিছন থেকে জবাব আসে, 'এই যে, যাই ঠাকুরমশায়।'

গলা শুনে মনে হয়, হাঁড়ির ভিতর থেকে শব্দ আসছে। এবং স্বর আর্ত। দুপ্ দুপ্ শব্দে, মাটি কাঁপিয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে সে ঢুকল, সে একেবারে নারাণঠাকুরের বিপরীত। দানবতুল্য বললে দোষ হয় না। কিন্তু রঙের নিন্দে করতে পারবে না। হতে পারে তেলহীন রুক্ষু, গোটা গায়ে খড়ির দাগ। তাই বা দেখতে পাচ্ছি কোথায়, লোমেই তো অনেকখানি ঢাকা। তবু রঙটি বেশ ফরসাই বলতে হবে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, কিংবা মহামায়া হিন্দু হোটেলের ধোঁয়ায় আগুনে পুরনো তামার পয়সার মতো হয়ে গিয়েছে। গায়ের লোম আর মাথার চুল, কালোর ভাঁজ কোথাও নেই। ইস্তক ভুরুর চুল পর্যন্ত পাটালি বর্ণ। একটু বেঁটে, তবে যেমন মাংস, তেমনি পেশী। ডিগডিগে নারাণঠাকুরকে এক হাতে ডিগবাজি খাওয়াতে পারে। অথচ ছোট ছোট চোখ দু'টি পিটপিটিয়ে এল এমনভাবে, যেন হাতীর সামনে ব্যাঙ এসেছে। পরনের ময়লা কাপড়টা হাঁটুর ওপরেও দেড় বিঘত তোলা।

তাকে দেখা মাত্র নারাণঠাকুর আবার সেই পাঁজরা কাঁপিয়ে বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে, 'শালা, কদ্দিন না তোকে বলেছি, মাটি এনে এ গত্তটা বুজোবি।'

এখন শোনো, হাতী করে চিঁ চিঁ, ব্যাঙে দেয় হাঁক। এ কি আজব দেশ নাকি যেন সব কিছুতেই আজব খেলা, আজব মেলা। না কী জগৎ-জোড়া এমনি আজব ছড়ানো। নজর করলেই চোখে পড়ে। বেঠিকেতেই ঠিক, অমিলেতেই রঙ খোলে। ফোঁচা যেন অজগরের সামনে ছাগলছানা। নারাণের দৃষ্টি-ধরা হয়ে ভাঙা গলায় সরু সুতো কাটে, 'বুজিয়েছিলাম তো।'

'চোপ! চোপরাও শালা।'

ঘর কাঁপানো ধমকে আমাকেই আবার চেয়ার ধরে টাল সামলাতে হয় প্রায়। যেন দোদমা বোমা ফাটে। কী রেয়াজ দেখ, ওহে পান্থ, যদি চেয়ার ধরে টানতে গেলে তবে তা গর্তে কেন পড়ে। তা হলে তো চেয়ারের পায়া বলবে, গর্ত কেন আছে। গর্ত বলবে, ফোঁচা কেন বোজায়নি। ফোঁচা তো জবাব দিয়েই আছে, 'বুজিয়েছিলাম তো।' সব আপদের গোড়া দেখছি, খিদে কেন পায়।

নারাণঠাকুরের গলা তখনো থামেনি, 'আবার মিছে কথা বলা হচ্ছে।'

তার রোগা রোগা হাত-পা নাড়ার বহর দেখে সন্দেহ হয়, চড়চাপড় বা পদাঘাত না পড়ে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ফোঁচার ভাব দেখলে সেই রকমই মনে হয়। ইতিমধ্যে আর এক মূর্তি ভিতরের দরজায় উদয় হয়েছে। ময়লা ময়লা ডুরে শাড়ি, কালো-কুলো

বউটি। নজর তার নারাণঠাকুরের দিকে, মনও নিশ্চয় ঘটনায় নিবিষ্ট। হাতে ধরা কোলের ওপর ছেলে। মায়ের বুক সে ঢেকে রাখতে দেয়নি। একটিতে কাঁচি থাবা রেখে আর একটিতে মুখ ডুবিয়ে শোষণ চলেছে। যাকে বলে, গাই-বাছুরের খেলা।

মাহাতো এবার সামাল দেয়, 'যাক, যেতি দাও ঠাকুর, ওসব পরে হবে।'

ঠাকুরের গোঁসা অত সহজে শান্ত হবার নয়। বলে, 'না দ্যাখ মা'তোন্দা, শালা আবার মুখের ওপর মিছে কথা বলে। এই কি গত্ত বুজোবার লক্ষণ, অ্যাঁ! শালা খাবে কাঁড়ি কাঁড়ি, কাজের বেলায় নাই। ওদিকে দ্যাখ, বাবুর আমার বউটি বছর বছর বিইয়ে চলেছেন। এত ভার সইবে কে!'

মর্মান্তিক অভিযোগ, অপরাধ অশেষ। ফোঁচার সব দিকেতেই বেশী বেশী। শুধু নারাণঠাকুর কেন, সরকার বাহাদুরের পর্যন্ত ফোঁচাকে কোতল করা উচিত। এ যুগে যে দুটোতে আঁটন শাসন, সে দুটোতে এত বাহাদুরি দেখালে চলবে কেন।

ভাববার অবকাশ মেলে না, হঠাৎ বন্ধ মুখের পাক-খাওয়া অবাধ হাসির খিল খুলে যায়। প্রথমে মাহাতো গিন্নীর। বোধ হয় নাক-মুখ দিয়ে ভাত ছিটকে যায়। আঁচল খসে যায় ঘোমটার। খিলখিল হাসিতে এমন একটা রাগী আর ভারী আসর কোথায় ভেসে যায়। তারপরে মাহাতো খুড়ো। সেই এক অবস্থা, তবে হাসির গলায় অজস্র কাশি। যাকে বলে দম-ফাটানো। মাহাতোর সঙ্গে সঙ্গেই, বাইরে দাওয়া থেকে গাজীর হাসিও বেসামাল হয়ে উঠল। তিনের হাসি আর থামতে চায় না।

কেন। কেমন যেন একটু ধন্দ-লাগানো হাসি। যেন তলায় তলায় কী রহস্যের স্রোত বয়ে যায়। আবার ওদিকে দেখ, এ যেন সেই কথাটাই, পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। হাসির লহরা বেজে উঠতেই দরজায় দাঁড়ানো বউটি হঠাৎ অদৃশ্য। আর নারাণঠাকুরের অমন যে ব্রহ্মতেজের দপদপানি, তা যেন হঠাৎ কেমন হাসির ঝাপটায় নিবু নিবু। ঝিমিয়ে-পড়া মুখ একটু বিব্রত। তবু ধমকে দেয়, যদিও গলাতে আর সে জোর নেই। একটি নিটোল খেউড় করে বলে, 'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ দেখাতে হবে না। তাড়াতাড়ি ডিশ গেলাস বের কর গে যা, টেবিলটা মুছে দিয়ে যা, বাবুকে খেতে দিতে হবে।'

বলে সে এক লহমা দাঁড়ায় না। কারুর দিকে তাকায় না। যেন দৌড় দিয়ে ভিতরের দরজায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ফোঁচাও। আর তিনের হাসি আর একবার উচ্চ রোলে ঘর ভাসায়।

কেন, ব্যাপার কী। কেমন যেন একটা ভোজবাজির হাওয়া মনে হয়। ভাবতে ভাবতে চেয়ার টেনে সাবধানে বসি। তিনজনের দিকেই ঘুরে ফিরে তাকাই। মাহাতো গিন্নীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে জিভ কেটে ঘোমটা টানে। পরপুরুষ না! বিড়ি খাওয়ার কথা এখন ভুলে যাও।

গাজী হাসতে হাসতে বলে, 'জয় মুরশেদ, কী ব্যাজ দ্যাখো দি'নি। কে দেয় সিঁদ, কারে কই চোর।'

মাহাতোর হাসি আরো জোরে বাজে। বলে, 'ঘাস খেয়ি যায় ঘোড়ায়, মার খায় গাধায়, সেই গোত্তর হলি।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নী আর একবার খিলখিলিয়ে ছলকায়। গাজী বলে, 'যা বলেছ, চাচা। ওই সেই কথা হলি, ভোলার মন, আমি কার গলাতে ঝুলাবো এখন, সখী গো মদন যে তশিলদার ভারী।'

হাসিতে কাশিতে মিলিয়ে জবাব দেয় মাহাতো, 'কেন, গলায় ঝুলোবার জন্যে ফোঁচাই তো আছে। এই যে বলি গেল, বউ বছর বছর বিয়োয়। তা ফোঁচাকেই তো বাপ বলি ডাকে। ঠাকুরকে তো ডাকে না।'

আবার ঘর-ভাসানো হাসি। রহস্যের বন্ধ মুখ যেন খুলি খুলি করে। ধন্দের ঘোর যেন কাটে। কিন্তু ধন্দের ঘোরে এতক্ষণ যদি বা মাহাতো আর গাজীর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলাম, তা আর পারি না। কোথা থেকে লজ্জা আসে, রুচিতে বাধে। কোথায় যেন একটা দুর্নীতির কাঁটা উঁকিঝুঁকি দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো নিঃসন্দেহে। তবে মাহাতো আর গাজীর সঙ্গে এই আলাপের শরিক হতে চাই না।

চেয়ো না, কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। তা বলে তুমি কারুর মুখে খিল দিতে পারো না। গাজী বলে, 'তার জো নেই। ছেলেগুলোনও কত্তা বলে ডাকে। বাপ বলি ডাকলে, ওঁয়ার আবার মান যাবে যে।'

'কী মরণ গ!'

কথা আসে ঘোমটার ভিতর থেকে, তারপরে হাসি। মাহাতো বলে, 'তা মন্দ কী বলো। ফোঁচাই ভালো আছে, মিনি মাগনায় একপাল ছেলের বাপ হয়ে ঘুরি বেড়াচ্ছে।'

ঘোমটার ভিতর থেকে হাসির সঙ্গে আবার কথা আসে, 'আহ্, ছি, কী মুখ গ!'

গাজী হা-হা করে হাসে। মাহাতো আবার বলে, 'কেন, আমার মুখের কী দোষ হলো। অই হে গাজী, বলো না কেন। বউ তোমার ঘর করবি, আর তার পেটের ছাওয়াল এসে বাপ বলবি আমাকে—।'

'আহ্ দুর অ!'

মাহাতো গিন্নী শুধু ঝামটা দেয় না, কাজল-কালো চোখ দেখিয়ে বিরক্তি হানে। যা বলবে তা বলো, আবার নিজেকে নিয়ে টানাটানি কেন। তাতে গিন্নীর গায়ে লাগে। হ্যাঁ, আমিও মনে মনে বলি, এবার মাহাতো ক্ষান্ত দিক। এ প্রসঙ্গের মধুতে গাদ বড় বেশী। যত ঘষবে তত আঠা। জমলে আবার মাছিকে টেনে তোলা দায়। কিন্তু আমি ভাবি, খেতে এসে এ কি রঙ্গ দেখি। হাটের মানুষ আসে, চলে যায়। গোলপাতার এই ছাউনির তলায় সবাই দেখে, এ এক ভোজনাগার। মহামায়া হিন্দু হোটেল। কিন্তু এক রূপেতে কত রূপ। এ যেন এক মঞ্চ। এখন এক পালা, অন্য সময় আর-এক পালা। এখন এই পালাতে পাঠ আলাদা, সাজগোজ ভূমিকা বেবাক ভিন্ন। নতুন পালায় নতুন সাজ। তখন নতুন ধড়াচূড়া, ভিন্ন চরিত্র। হাস্যে রহস্যে জানা গিয়েছে, ওসব মহাজন পাচক ঠাকুর প্রেমিক নাগর, দাসী প্রেমিকা। আর ফোঁচা আয়ান তখন কী করে।

ভাবতে গিয়ে বুকের কাছে হঠাৎ কেমন ফিক লেগে যায়। চোখ পিটপিটানো, তামা-রঙ সেই প্রকাণ্ড মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্যথা কিছু ছিল কি না দেখিনি, একটা অ-মানবিক অসহায়তা মুখ ভরে ছিল। সে কি তখন ঘুমায়, নাকি এই নোনা গাঙের কূলে কূলে, বাঁধে বাঁধে কোনো নিশির ডাকে ফেরে। কোন্ কূলেতে জন্ম তার, কোন্ দেশেতে বিয়ে। কোন্ ঘরের বালা তার ঘরণী হয়েছে। সেই ঘরণীর প্রাণের ঘরে কোথায় আছে তার ঠাঁই। এই জীবনের দরিয়া তার কোন্ প্রবাহে চলে।

বৃথা জিজ্ঞাসা। কোন্ কাব্য পুরাণ কবে জবাব দিয়েছে, আয়ান-মন-কথা। কে জানে, ফোঁচার প্রাণের বউ-সায়রে, বউ কতখানি খেলে। সেখানে অনুভূতির বোধ কত গভীরে, কতটুকু তরঙ্গ ওঠে, নাচে, কে জানে। কিছুই জানি না। সব প্রাণের কুলুপ টুক টুক করে খুলি, তেমন চাবি আমার হাতে নেই। দেখি মাত্র, রূপ দেখি। যে দেখাকে অরূপ বলে, সেই চেনাচিনি কোথায় আমার। চিনি বলে হাঁক দেবো না। তাই, কে জানে, ফোঁচা নামক লোকটির প্রাণে ফুল কোথায় ফোটে, কোথায় ঝরে যায়।

সেই যে লোকটি, কালো কেঁচোর মতো পইতে গলায়, ডিগডিগে শরীর, হাসির মুখে যার তেজ নিবে যায়, বিব্রত হয়, অন্তর্ধান করে সহসা, এখন তার রহস্য বুঝতে পারি। তাকে দোষ দিতে পারলে, মনের সব গোল মিটে যায়। কিংবা সেই কালো-কুলো বউটি, যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল একটু আগে, কোলেতে যার ছেলে, সসাগরা ক্ষুধার

ভাণ্ড খুলে দিয়ে ক্ষুধা মেটাচ্ছিল, যার চলে যাওয়া দেখে এখন বুঝতে পারি, সে-ই ফোঁচার বউ। মনের গোল মিটিয়ে দুষতে পারি তাকেও। কিন্তু মন বলো, তাইতে কি মন সব সওয়াল জবাব শেষ। এ তো তোমার রূপের বিচার। অরূপ তুমি দেখলে না। না চিনে কার দোষ গাও। অরূপ থাকে সেই বিচিত্রে, যার মুখোমুখি তুমি চিরদিন দাঁড়িয়ে। তোমার অপার বিস্ময়ের চোখে সুখ দুঃখের অকূলের ঢল নেমে যায়। কোনো জবাব কোথাও উচ্চারিত হয়নি। চির-জিজ্ঞাসা, চির-নীরবতায় কেবল ঝিকিমিকি করেছে।

আমি পথের মানুষ, একটু মাত্র ঠেকখাওয়া এই পথের ধারে। আমি নামহীনের মজুর, অচিনের খোঁজে ফেরা মানুষ। আমি কেন এসব ভাবি। বিচিত্র থাক তার বাহারে। আমি চলে যাবো, নিরন্তর ঝিকিমিকি দেখে।

তবে মাহাতো ক্ষান্ত কেন হবে। শুনি, সে তখনো বলছে, 'একবার কী হলো, জানো। ফোঁচাকে বললাম, তোর ছেলে তো তিনটে। একটাকে আমাকে দে, আমি মানুষ করব। ব্যাটা বলে কি জানো? বলে, আচ্ছা, কত্তাকে জিগ্যেস করব। সত্যি যে জিগ্যেস করবে, তা কে জানে। এই গত সনের কথাই বলছি। আড়তদারদের কাছে টাকা আদায়ে এসেছিলাম। একটু পরেই দেখি, ঠাকুর একেবারে মারমূর্তি হয়ে এসি হাজির, হেই তুমি কোন্ সুবাদে ফোঁচার ছেলে চাও? হতি পারো তুমি বড় জোদ্দার, টাকার মঠ থাকতি পারে তোমার ঘরে। তা বলি কি ফোঁচার ছেলেরা জলে ভেসে এসেছে। তারা কি রাস্তার কুকুর বিড়াল। বোঝো দি'নি ঠ্যালাটা। মশকরা করি একটা কথা বললাম—।'

তার কথা শেষ হয় না। ঘোমটার ভিতর থেকে হাসির সঙ্গে খুশির গলা বাজে, 'বেশ করেছিল, ঠিক বলেছিল।'

গাজী বলে ওঠে, 'অই, এবার যা বোঝবার তা মনে মনে বোঝো, কোথায় কার টান। যা বলো তা বলো, রক্তের টান বলে একটা কথা আছে তো।'

কান পেতে আছি, মাহাতোর কথা শুনতে পাবো বলে। কোনো কথাই আসে না সেখান থেকে। কিন্তু আমার চোখে তখন সহসা ডিগডিগে ঠাকুরটার মুখ ভেসে ওঠে। না, দোষগুণের বিচারে যাবো না। তবে কবুল করি, কেবল যে প্রেমিক নাগর মনে করেছিলাম সে বড় মিথ্যে। শুধু প্রেমিক নাগর নয়, জীবের মধ্যে মহৎ যে, সেই পিতৃদেবকে দেখি। রূপেতে নয়, অরূপে ধরা পড়েছে। নাম যাদের ফোঁচার ছেলে, তাদের বাঘের মতো আগলে থাকে নারাণঠাকুর। আসলকে চেনা হলে আর রূপের ধন্দ থাকে না। মন কী যন্ত্র দেখ, ঠাকুরটাকে ভালো লেগে যায়।

কিন্তু ওদিকের নীরবতায় একটু অবাক লাগে। ফিরতে দেখি, সেই কালো-কুলো বউটি এসে ঢুকেছে। এক হাতে ছেলে ধরা, অন্য হাতে বালতি। স্বাস্থ্যটি বেশ আঁটো-সাঁটো, মানুষটিও খাটোখুটো। সাজগোজ কিছু নেই তেমন। দেখলে বুঝবে, বসে খাওয়া শরীর নয়। মাহাতো গিন্নীর মুখ আমি দেখতে পাই না। কিন্তু ফোঁচার বউয়ের সঙ্গে নিশ্চয় নজর চালাচালি হয়। তাই একটু হাসি দেখা যায় তার মুখে। বালতি সুদ্ধ এসে দাঁড়ায় টেবিলের সামনে। বালতি রেখে তার ভিতর থেকে টেনে তোলে জল-ন্যাকড়া। একে আমরা ন্যাকড়া বলি না, ন্যাতা বলি। হাত তুলে তাড়াতাড়ি সামাল দিই, 'থাক, থাক, কি করবে?'

বউ একটু চমক খায়, থমকে গিয়ে বলে, 'মুছব।'

সে আন্দাজ আগেই করেছি, তাই সামলালো। ন্যাতার রঙ দেখে আর মোছা টেবিলে খাবার ইচ্ছা নেই। তার চেয়ে অ-মোছা এই শুকনো টেবিল ভালো। যদিও অনেক দিনের তেলে-জলের ন্যাতা মোছার যত্নে এই টেবিলের রঙও এখন ন্যাতার মতোই হয়েছে। তক্তার মাঝে মাঝে পোয়া ইঞ্চির ফাঁক। ন্যাতার এত আদর যত্নে এখনো কেন ঘুন ধরেনি, কে

জানে। বললাম, 'মুছতে হবে না, এমনি থাক।'

বউটি যেন কথা ধরতে পারে না। তাই কী করবে বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক চায়। গাজী বলে ওঠে, 'বাবু যা বলে তাই করো, আর মোছামুছির দরকার নাই।'

বউ কী বোঝে না-বোঝে জানি না। ন্যাতা বস্তুটি বালতিতে ফেলে তাড়াতাড়ি নিজের শুকনো আঁচল দিয়ে টেবিলটা ঝেড়ে দেয়। একেবারে এমনি কি খেতে দেওয়া যায়। একটা নিয়ম আছে তো। তাকিয়েছিলাম বউটির মুখের দিকেই, হয়তো সে তাকাবে। চোখের দিকে দেখে তার মনটা হয়তো বুঝব। কিন্তু সে তাকায় না। যেমন করে মাহাতো গিন্নীর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, তেমনি একটু হাসে আপন মনে। সেটা লজ্জা কিংবা আর কিছু বুঝতে পারি না। বরং বলি, সংকোচের একটা মাধুর্য যেন আছে। কোলের ছেলেটা আঁচল টেনে খুলতে যায়। বাঁ হাত দিয়েই তাকে একটু থামিয়ে দিয়ে বালতি নিয়ে সরে যায়। মাহাতো গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ন্যাতার রঙটাই অমনি।'

বলে চলে যায়। বুঝতে পারি, আমার মন তখন এক দুর্নীতির কালি খোঁজে বউটির সর্বাঙ্গে। কিন্তু কোথায় যে সেই পরকীয়ার কালো কালি, দেখতে পেলাম না।

ইতিমধ্যে ফোঁচার আবির্ভাব। সে আমার সামনে রাখে চিনামাটির সানকি, যার নাম প্লেট। আর কাঁচের গেলাসে জল। আবার দেখ, কী রেয়াজ। নিজেকে নিয়েই মরো তুমি, এ কি ঝামেলা। ফাটাফুটি মাকড়সার জালের দাগ দেখি প্লেটে, এদিক ওদিক ভাঙা। কী করব, মন পরিষ্কার হয় না যে। লজ্জা আর অস্বস্তিতে এবার করুণ স্বরেই বলি, 'কলাপাতা আছে?'

ফোঁচা একেবারে গোল হয়ে বেঁকে পড়ে। ঘাড় নেড়ে ভাঙা গলায় বলে, 'হ্যাঁ, আছে। কলাপাতায় খাবেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু যেন অবাক হয় ফোঁচা। বলে, 'বাবুরা তো এতেই খান কি না। আচ্ছা, নিয়ে আসি।'

বলে সে প্লেট তুলে নিয়ে যায়। আমি বলি, 'পাতাটা একটু জল দিয়ে ধুয়ে এনো।'

'আজ্ঞে।'

আবার তাড়াতাড়ি বলি, 'পাতাটা যেন ন্যাতা দিয়ে মুছো না।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা বাবু।'

জবাবটা প্রায় ভিতর-ঘর থেকেই আসে। মাহাতো হেসে উঠে বলে, 'দ্যাখ কেমন মজা। আর আমাদের এদিকি কাউকে কলাপাতায় খেতি দাও, অমনি বাবুর মেজাজ খারাপ, হেঁই, থালায় দিতে পারো না!'

গাজী বলে, 'আমি আবার ভাবি, বাবুর বুঝি চিনামাটির সানকিতেই ভালো হবে। তা—এই ভালো।'

ওদিকে মাহাতো গিন্নীর ঘোমটা একটু সরে। বুঝতে পারি, চোখাচোখি গাজীর সঙ্গে। একটু পরেই পাতা এসে যায়। ধোয়া কচি সবুজ পাতায় তখনো জলের কণা। এবার চোখে ও মনে একটু ঝলক লাগে। তারপরে পিছনে পিছনেই নারাণঠাকুর। হাতা দিয়ে গরম ভাত দেয় পাতে। দু'টি বেগুন ভাজা পাশে দিয়ে ডাল তোলে হাতায়। রূপে গন্ধে ঠিক চিনতে পারার উপায় নেই, কী ডাল। তা ছাড়া, এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা, কোন্ পাত্র থেকে, কী পাত্র দিয়ে ঢেলে দেয় চেয়ে দেখব না। যে ডালই হোক, ধোঁয়া দেখে বুঝেছি গরম। ডাল দিয়ে মেখে ভাত মুখে দিতে যাবো, হঠাৎ গাজীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। হতেই, গাজী একটু হাসে। বলে, 'অনেক বেলা হয়ি গেছে,

দেরি হয়ি গেল।'

কিন্তু আমার হাতের গরাস হাতেই থেকে যায়, মুখে তোলা হয় না। আমি নামহীনের মজুর, অচিনের সন্ধানী, তবু মনের রসের ধারা কি এই প্রাণে পাক খায় না। কেবল যে একটা মোচড় লাগে বুকে, তা নয়। শুনি, কে যেন আমার মধ্যে ধিক্কার হেনে ভর্ৎসনা করে। এক মুহূর্ত চোখ ফেরাতে পারি না গাজীর মুখ থেকে। ফাটা ফাটা মুখখানি, তবু যেন হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঁজ লেগেছে। কোথাও একটু মালিন্য নেই। কিন্তু বেলা যায়, তোমার পেট জ্বলে। মুরশেদের নামের মজুর কি মানুষ নয়। সঙ্গীকে ভুলে যাও, এ তোমার কেমন ক্ষুধা হে। হাতের গরাস পাতে নামিয়ে বলি, 'ওহে, তুমি কী খাবে। ভাত না অন্য কিছু?'

এবার দেখ, গাজীর আরশি-চোখে কেমন শিশু লজ্জা ফোটে। তাড়াতাড়ি বলে, 'সে হবি'খনে বাবু, আগে আপনি দুটো সেবা করে নেন।'

কিন্তু যদি ঠিক দেখে থাকি, তার মুখের আলোয় হঠাৎ নয়া ঝলক ফাঁকি যায়নি আমার চোখে। কেবল নিজের মহাপ্রাণীটিকেই দেখেছিলাম। এখন দেখি, আর-এক মহাপ্রাণীও আমার সামনে। এখন তার চোখ দু'টি যেন অনুরাগে তরতরানো। বলি, 'তা হয় না, যা হবার তা একসঙ্গেই হোক। কী খাবে তা বলো।'

গাজী হা-হা করে হাসে। বলে, 'বাবুর যে কথা! যা হবার তা একসঙ্গেই হোক।'

হাসি শুনে তার প্রাণের খুশি বুঝতে পারি। তার নজর ধরে, নজর করি মাহাতো গিন্নীর দিকে। ঘোমটা কিছু সরানো। আবার চোখাচোখি হয়। কাজল-কালো চোখের নজর, এবার যেন একটু রকম বদলেছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে একটু দেরি হয়। ভুল দেখি, না ঠিক দেখি, কে জানে। মাহাতো গিন্নীর চোখেও যেন আমার গাজীর দৃষ্টি খেলে। তারপরে গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'এখন আবার কী খাবে, চাড্ডি গরম গরম ভাতই খাও।'

ঘোমটা-সোমটা যাই থাক, আওয়াজ ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে। ওদিক থেকে মাহাতো বলে, 'হ্যাঁ, এত বেলায় এখন কি আর মিষ্টি-মাস্টায় পেট বোঝে!'

বলে নিজেই ডাকে, 'কই হে ঠাকুর, গাজীকেও ভাত দাও।'

গাজী বলে আমাকে, 'আপনি শুরু করেন বাবু।'

ঠাকুর ঘরে ঢুকে একবার অবাক হয়ে চায়। নতুন খদ্দের পেয়ে তেমন খুশি নয় মনে হচ্ছে। গাজীর দিকেই ফিরে বলে, 'তোমাকে ভাত দেবো নাকি?'

গাজী হেসে বলে, 'তা আজ যখন মুরশেদে দিন দিইছেন—।'

কথা শেষ করতে পারে না সে। তার আগেই নারাণঠাকুর বলে, 'কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, দাওয়ায় বসে খাওয়া হবে না বাপু। দশজনের খাওয়ার জায়গা, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয় আছে।'

যাই বলো, মুখের হাসিটি নিতে পারবে না। গাজী বলে, 'নিচি বসিই খাবো। একখান কলাপাতা দিতি বলেন। জল খাবার পাত্তর আমার ঝোলায় আছে।'

বলে ঝোলা থেকে বের করে এক অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস। নারাণঠাকুর সেসব দেখে না, 'কী কী খাবে বলো?'

'অই আপনার যা আছে, সবই দেন। তবে মাছ-টাছ দেবেন না।'

ঠাকুর ভিতরে যেতে যেতে বলে, 'এদিক নেই, ওদিক আছে।'

চমক একটু আমার মনেও লাগে। গাজীর ধর্মে আটকায় কি না জানি না, কিন্তু মুসলমানের সন্তান নিরামিষাশী, এরকমটা দেখিনি। খেতে খেতে চোখ তুলি। গাজী হেসে বলে, 'সাঁই গাজী দরবেশদের কোনো মানামানি নাই বাবু। মাছ মাংসে রুচি লাগে না।'

বলে সে হঠাৎ গলা তুলেই সুর করে গেয়ে ওঠে,

'কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান
মিল্ জুল্‌কে কর সাঁইজী কা কাম।'

মাহাতো গিন্নী আওয়াজ দেয়, 'এ গান নয়, ভালো গান শোনাতে হবে।'

গাজী বলে, 'তা শুনোব চাচী। তয়, কবীরের কিস্যা আগে বলি, শোনো, বড় মজার। বাবু, শোনবেন নাকি?'

কবীরের কী কিস্যা শোনাতে চায়, কে জানে। বলি, 'বলো।'

গাজী কবীরের কিস্যা শুরু করে।

'এক ছিল জোলা, বাবু, তার ছিল এক জোলানী। কোন্ দেশে, তা আমি বলতি পারব না। হবি হয়তো কাশী-গয়ার কাছে কোনো এক জায়গায়।'...

কোথায় গয়া, কোথায় কাশী, সে বিচারে যেও না। কথার ভাবে মনে হবে, যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। নিদেন এ-গ্রাম ও-গ্রাম। দুই প্রদেশে, দু' জায়গার ফারাক কত দূর, কথায় তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নারাণঠাকুর ততক্ষণে তার কলাপাতায় ভাত বেড়ে দিয়ে হাঁকে, 'গল্পসল্প পরে ব'লো, আগে ভাত ভাঙ দি'নি, ডাল ঢেলে দিয়ে যাই।'

গাজী ভাত ভেঙে বলে, 'দ্যান, দ্যান। গপ্পখানি তো আপনাকেও শুনোবার জন্যি বলছি ঠাকুরমশাই।'

'হ্যাঁ, আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই, তোমার ভড়কিবাজি শুনব।'

ঠাকুর খেতে দেয় না, যেন আপদ বিদায় করে। আবার ধমক দিয়ে বলে, 'আস্তে হাত চালাও, ছিটামিটা লাগবে। দশজনের খাবার জাগয়া এটা। দেখি, চচ্চড়িটা নিয়ে নাও।'

গাজীর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। না, এততেও হার মানবার নয়, আরশি-চোখের ঝলক ঠিক আছে। বলে, 'আমি তো আপনার এগার জন, ছিটা কখনো লাগাতি পারি!'

গাজী বলে, আবার চোখের পাতা নাচায়। সেই নাচন দেখে, চোখ নাচে মাহাতো গিন্নীরও। মাহাতো চাচীর সঙ্গে দেখছি, গাজীর একটু ভাবের খেলা আছে। হয়তো অনেক দিনের চেনা, অনেক গান গাওয়া আর শোনা। গৃহস্থের বউ আর পথের গাজীর ভাবের খেলা তার ভিতর দিয়ে খেলে। ওদিকে মাহাতোর গলা শোনা যায়, 'তারপরে, বলতে বলতে থেমে গেলে যে। জোলা জোলানীর কী হলো, বলো।'

ঠাকুর এতক্ষণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সরে এসেছে। গাজী বলে, 'হ্যাঁ, তো এক জোলা আর জোলানী, রওনা দিয়েছে, যাবে এক বিয়াবাড়ির নেমন্তন্নে। জোলার নাম নুরি, জোলানীর নাম নিমা। তো, যেতি যেতি জোলানী দ্যাখে, সামনে এক সরোবর, সরোবরে বিস্তর পদ্মফুল আর পদ্মপাতা। ড্যাঙার কাছে সেই পাতাতে এক সোন্দর ছাওয়াল ভাসছে। দেখে জোলানীর মন মানে না, মায়ের পেরাণ তো, বুইলে চাচী। জোলানী সে ছাওয়াল পদ্মপাতা থেকে নিজির বুকে তুলি নিলে।...আচ্ছা বাবু, বলেন দি'নি এখন, এই যে ছাওয়াল, মানুষের সন্তান, এ'য়ার কী জাত আছে?'

দুরূহ প্রশ্ন। বাবুর কান ছিল গাজীর দিকেই, কিন্তু পাতে তখন ধূমায়িত ট্যাঙরা মাছ। ঝোলের রঙের বাহার দেখলে মেজাজ মোগলাই না হয়ে যায় না। লাল রঙ যদি মিশিয়ে না থাকে, তবে শুকনো লঙ্কা, বিনে এমন ঝলক দেয় না। সে কথা ভাবতেই পেটের নাড়িতে জ্বালা ধরে যায়। তবে একেবারে অপযশ করব না। রূপ দেখে যত ভয়ই লাগুক, ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে আদিম রিপুর একটা রিপু উথলে ওঠে। সেটা টের পাওয়া যায় জিভের জলের ধারায়। বরং এতক্ষণে সব মিলিয়ে 'মহাপ্রাণী'টির কোথায় যেন একটা বিঘ্নি বেসুর গাইছিল, সেখানটা জলের ধারায় সাফ হয়ে যায়। ওদিকে মাহাতো

কর্তা-গিন্নীকে দই পরিবেশন করা হয়েছে। তাতে কারুর বিশেষ মন আছে, মনে হয় না। এদিকে প্রশ্ন, সরোবরের পদ্মপাতায় যে ছাওয়াল ভাসে, তার জাত কী বলো।

তবে বাবুর আগেই মাহাতো বলে, 'ছাওয়ালের বাপ কে মা কে, তাই জানা গেল না, জাত বলবে কেমন করে।'

গাজী হেসে ঘাড় দোলায়। বলে, 'তয় বলো, যে ছাওয়াল জলে ভাসছে, তার বাপ-মা খুঁজতি যাবে কোথায়। এখন, এ ছাওয়াল যে মানুষির, তা মানতে লাগবে। সেই জন্যি বলি কি, মানুষির কি জাত আছে! এ সেই গানের কথা হচ্ছে, ছুন্নত আর পৈতা না দিলি, জাত বানানো যায় না।'...

হঠাৎ কথা থামিয়ে একেবারে সুর করে সেই গানের কলি গেয়ে ওঠে, 'ছুন্নত দিলি হয় মোচলমান, নারী লোকের কী হয় বিধান। বামুন চিনি পৈতা ধরে, বামনী চিনি কী করে।'...

পুরো গাওয়া শেষ হয় না, নারাণঠাকুরের হাঁক শোনা যায়, 'আরে খাও দি'নি আগে। পাতে রইল ভাত পড়ে, উনি এখন বামনা বামনী বোঝাচ্ছেন।'

মাহাতো গিন্নীর হাসি বেজে ওঠে খিলখিল। তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে গলায় হাসি সংগত করে দরজার পাশ থেকে। এ সেই বউটি, যাকে ফোঁচানী বলব না নারায়ণী, বুঝতে পারি না।

ভাতে একবার হাত ঘুরিয়ে গাজী বলে, 'না, তাই বলি কী যে, মানুষের তুমি একখান নাম দিতি পার, জাতের নাম বলো মানুষ, না কি বলেন বাবু। নামে তোমাকে ডাকি, কামে তোমাকে বুঝি। আচ্ছা বলেন তো বাবু, ফুলের কি কোনো জাত আছে?'

দুরূহ থেকে দুরূহতর প্রশ্ন। শুধু মানুষের হয় না, এবার ফুল ধরে টানাটানি। গাজীর মতো এত ব্যাখ্যা বয়ান বাবুর জানা নেই। তবে জবাবের মুখ চেয়ে গাজী কথা বলেনি। তার কথকতার ধুয়া এখন 'বাবু'। একজনকে না ডেকে কথা বলা যায় না। বলে, 'ফুলের কোনো জাত নাই। ফুল হলি ফুল, এখন কেষ্টকালি বলেন আর জুঁই টগর বলেন, সে তোমার নাম। কামে তোমার মিঠে বাস, রূপে ঝলমল করো, তুমি ঠাকুর-দেবতার পুজোয় লাগো, তাই কি না বলেন, অ্যাঁ?'

বলতে ইচ্ছা করে, আর যখন মালা হয়ে গলায় দোলে, খোঁপার শোভা হয়, তখন? তবে, তখনো সেই কামের কথাই আসে। কামের অর্থ 'কামে'র নয়, কাজের, যাকে বলে গুণের বিচার। গলায় দোলা, খোঁপার শোভা, তাও গুণের মধ্যেই পড়ে।

নারাণঠাকুর অমনি বাণ কয়ে, 'তবে আর কি। যে ফুলের শোভা নাই, বদ গন্ধ ছাড়ে, তার বিষয়ে কী বলবে?'

গাজী জবাব দেয় ঝটিতি, যেন যোগানো ছিল মুখে। বলে, 'নিগ্গুণ বলব, বুইলেন ঠাকুরমশায়, নিগ্গুণ বলব। জাত দিয়ে গুণ বিচার হয় না। অই সেইজন্যি বলি কি, মানুষ হলো ফুলির মতন, কেমন কি না বলেন বাবু। তুমি রাম হও কি রহিম হও, তাতে পেয়োজন নাই। এখন তুমি পুজোয় লাগো কি না লাগো, সেই কথাখানি ভাবো, না কি বলেন বাবু।'

বলে চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় দোলায়, দাড়িতে নাড়া খেয়ে যায়। যেন গানের মতো সুর করে বলে, 'পুজোয় লাগতি হবে, লাগতি হবে, তাইতে তোমার জাত মান।'

কথাগুলোর গায়ে তেমন ঝলক নেই। মনে তরঙ্গ ঝাঁপ খায় না। কিন্তু কোথায় যেন চমক লেগে যায়। রাম রহিমে যায় আসে না, পুজোয় লাগো কি না লাগো, তাই ভাবো। এ আবার সেই, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা যোল ধারায় বয়।' কানে শোনো এক, ভিতরের ধরতাই দুসরা। এবার ভাবো, গাজী কোন্ বায়ে যায়।

সেই এক কথা, জাতের নাম ছাড়ো, জীবনকে পুজোয় লাগাও।

চেয়ে দেখি, গাজীর চোখে ঝিকিমিকি। যেন ধাঁধা বলে, রহস্যে হাস্যে ধাঁধা বানানেওয়ালা। এখন কোন্ পুজোতে লাগবে তুমি, কী তার মর্ম, তা বোঝো গে মনে মনে। কিন্তু আমি ভাবি, কাঁধে ঝোলা, গায়ে আলখাল্লা, যে নামেরই মজুর হোক, এই তালিতে ধুলোতে রুক্ষুসুক্ষু মানুষটা এক প্রকার ভিখারি ছাড়া আর কী। জীবন কাটে যার দরজায় দরজায়, পথে পথে, নামের গান করে, হাত পেতে যার ভরণপোষণ, সে এসব কথা পায় কোথায়। ভাবে কেমন করে। বিদেশের কথা জানি না। জানি না, সেখানে পথে পথে ফেরা, দোরে দোরে ঘোরা মানুষেরা এমন হাসি হেসে, এমন কথা বলতে পারে কি না। কিন্তু ভারতবর্ষের দরজা খুলে উঁকি দাও, দেখবে হাটের মাঝে, চালচুলোহীন মানুষ তত্ত্বকথা বলে। গাছতলাতে নগ্ন মানুষ জীবন ব্যাখ্যা করে। এই দেশেতেই আছে কেবল, সোনার মুকুট ছার, রাজার ছেলে বটতলাতে রাজার রাজা সাজে। আলখাল্লা গায়ে তুলে ঊর্ধ্ববাহু নাচে। আধুনিকতার সুখের বেড়া ডিঙিয়ে চলে যায়, রাঢ়ের ছাতিম গাছের তলায়। যাকে ঘর থেকে দিয়েছি সরিয়ে, একেবারে দাওয়ার নিচে, সেও ধুলোয় বসে হেসে হেসে এমন কথা বলে। কেতাব পুঁথি রাখো, এমন জায়গায় এমন জিনিস পৃথিবীর আর কে আমাকে দেবে!

কেউ না। তাই দেখ, এই দেশেতে ধুলোর কথা আগে। এই দেশের গানে ধুলো, প্রাণে ধুলোর দাগ। এই দেশেতে তাই ধুলোয় লুটোনো দেখবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। এই দেশ জেনেছে, সোনার চেয়ে দামী যত সব মহৎ প্রাণের জন্ম এই ধুলোয়, এই ধুলোতেই লয়। এই দেশ তাই গায়ে ধুলো মেখে মিষ্টি হাসে, তত্ত্ব ভাষে। হর্ম্যতল ছেড়ে গাছতলাতে এসে সে পরম কথা শুনিয়েছে। রূপকে অরূপ করেছে।

প্রাণের কথা প্রাণেই লাগে। নারাণঠাকুরের মুখে ঠিক উল্টা কথা যোগায়নি। বিরস বিরক্তিতে বলে, 'যত বাজে প্যাচাল পাড়ে।'

ওদিকে মাহাতো খুড়োর হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হয়। হুস্ করে এক নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ঠিক, কথাখানি ঠিক বলেছ। তা সে আর পুজোয় লাগতি পারলাম কই।'...

দেখ, ঘরের হাওয়া কেমন বদল হয়ে যায়। হাসিখুশির দোলদোলানি হঠাৎ যেন দীর্ঘশ্বাসে ভার হয়ে ওঠে। যদিও তাতে অন্ধকারের কালি নেই। দশাসই কালো লোকটা, কোকিলের মতো লাল চোখ। যার শ্রী দেখলে নজরে অরুচি। তার ওপরে মোটা মোটা কালো আঙুলগুলো পাতের দইয়ের মধ্যে ডোবানো। তবু হঠাৎ লোকটাকে কেমন করুণ লাগে। যেন এই মানুষ পৃথিবীর আদিম যুগের গুহার মুখে বাস। তার অস্ত্র খাদ্য সবই মজুত, তবু যেন কী এক পরম অসহায়তা তাকে আতুর করে তুলেছে। এখন কে জানে তার প্রাণের কথা। গাজী তার প্রাণের কোন্ তারেতে ঝঙ্কার দিয়েছে।

ওদিকে মাহাতো গিন্নীর ডাগর চোখ দু'টিও যেন সন্ধ্যা নামা শান্ত আর গম্ভীর হয়ে ওঠে। আধখোলা ঘোমটার পাশ দিয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় দূরে। বাইরের শূন্যতায়, হয়তো ভিতরের কোনো উথালি পাথালি তরঙ্গে। আর গাজী তখন মাথা নিচু করে। মুঠা মুঠা ভাত মুখে তোলে। তার শব্দ শোনা যায়, সপ্ সপ্ সপ্।

এবার তাই আমাকেই আওয়াজ দিতে হয়, 'কিন্তু সেই গল্পটার কী হলো, পদ্মপাতার ছেলে?'

গাজী মুখে ভাত নিয়ে ঘাড় দোলায়। তাড়াতাড়ি গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, 'অই হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বুইলে কি না মাহাতো চাচা...।'

মাহাতো বলে, 'হ্যাঁ বলো, তারপরে।'

'তো জোলানী তো সেই ছাওয়াল বুকে করি তুলি নিয়েছে। নিয়ে জোলাকে বলে, "দেখ এক ছাওয়াল পেইচি।" তা, সেই ছাওয়াল হলো একটুখানি, মাত্তর পেট থেকে পড়া। আহ্ মুরশেদ, সে ছাওয়াল হঠাৎ টকটকিয়ে বলি ওঠে, "আমাকে কাশীতে নিয়ে

চলো।" এই যাঁহাতক বলা, জোলার জান খাঁচা-ছাড়া। ভাবে কী যে, এতটুকুন ছাওয়ালে এমন করি কথা বলে, এ না জানি কোন্ জিন্ পেরেত হবি। সে জোলানীকে ফেলি দিলো দৌড়। তা বললি কী হয়, তোমার আজ মরশেদের দিন। এক মাইল ছুটেও দ্যাখে, সামনে সেই ছাওয়ালের মুখ। ছাওয়াল বলে, "আমি জিন্ পেরেত নই, তোমার কোনো অনিষ্ট হবি না। তুমি বিবির কাছে ফিরি চল।" ছাওয়ালের সুন্দর মুখখান দেখে জোলার কেমন পেত্যয় হয়। সে ফিরে আসে। তখন ছাওয়াল বলে, "তোমরা আমাকে পালন করো, ভয়ের কিছু নাই।" সেই থেকে সেই ছাওয়াল জোলা-জোলানীর ঘরে মানুষ। আর এই ছাওয়াল হলেন গে কবীর। তয়, যে কারণে বলা—'

গাজীর কথা শেষ হয় না। নারাণঠাকুর বলে ওঠে, 'ওসব গালগল্প রাখো, কবীরের বিত্তান্ত তুমি আমাকে শোনাতে এসে না। ঘরে এখনো আমার বই আছে, তাতে ছাপার অক্ষরে যাবৎ লেখা আছে। চাও তো, পড়ে শুনিয়ে দিতে পারি।'

এ যে ইতিহাসের বিতণ্ডা। তাও কি না, দূর বাদার এক হাটের ভোজনালয়ে। তার্কিক হলেন পাচকঠাকুর। আর এক রাস্তার দরবেশ।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ঐতিহাসিক কবীরের ঐতিহাসিকতা এই অধীনের তেমন জানা নেই। নিজের ঝোলো ঝেড়ে এইটুকু বলতে পারি সম্বত শকের ষোড়শ থেকে সপ্তদশের কোনো এক সময়ে তাঁর উদয় এবং অস্ত। পাঠান সেকেন্দর শা তখন বোধ হয় বাদশা। কাশীতে তখন হিন্দু রাজার রাজত্ব। কিন্তু জন্মবৃত্তান্তের হদিস আমার জানা নেই।

গাজী বলে, 'কেতাবের দরকার কী, আপনি বলেন, আমরা শুনি।'

নারাণঠাকুর তেমন সোজা পাত্র নয়। বলে, 'কবীরের গুরু ছিলেন কে বলো তো?'

গাজী হেসে বলে, 'রামানন্দ ঠাকুর।'

একটু যেন ঠেক খেয়ে যায় নারাণঠাকুর। তবু বলে, 'হ্যাঁ, ওই রামানন্দের কিরপাতেই কবীর তরে গেছিল।'

গাজী মাথা দুলিয়ে হাসে। বলে, 'সে কথা ছাড়েন, তার জবাব আছে। তারপর কী বলবেন, বলেন।'

ঠাকুর বলে, 'বলছি। ওই রামানন্দ ঠাকুরের এক বামুন শিষ্যি ছিল। সেই শিষ্যির ছিল এক বিধবা মেয়ে। সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে রামানন্দ ঠাকুর বলে ফেলেছিলেন, "তুমি ছেলের মা হও।" উনি বিধবা বিবেচনা করেন নাই। অথচ গুরু-দেবের আশীর্বাদ, তা না ফলে যায় না। তারপরে দেখা গেল, সেই বিধবা মেয়েরই ছেলে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, বিধবার ছেলে, লোকে নিন্দা-মন্দ করবে, তাই লুকিয়ে ছেলের জন্ম দিয়ে অন্য জায়গায় রেখে এসেছিল। সেই ছেলে কুড়িয়ে পায় এক জোলা আর জোলানী। তারা তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে।'

গাজী বলে, 'তা হতি পারে, তবে কথা সেই একই।'

'কেন এক হবে। কবীর হিন্দুর ছেলে...।'

গাজী ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করে, 'বাপের নামখানিও জানেন নাকি। আজ পর্যন্ত তো শুনি নাই, কবীরের বাপ কে।'

কোথায় গেল খাওয়াদাওয়া, কোথায় কিসের পরিবেশন। এখন এখানে কবীর নিয়ে লাগ্ ঝমাঝম্। নারাণঠাকুর কেবল বিরক্ত নয়, এবার ক্রুদ্ধ। গাজীর দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'দেখ তো, এই ঢেঁকিকে কী বোঝাব। শুনছ গুরুর আশীর্বাদ, তার আবার বাপ কিসের। গুরু আশীর্বাদ করেছিলেন বলেই তো ছেলে হলো। ত' হলেই বোঝো, হিন্দু গুরুর আশীর্বাদ, হিন্দু বিধবার পেটে জন্ম। এখন তুমি জাত না মানো, তা হলে কী হবে।'

গাজী তবু হাসে। যদিও গুরুর আশীর্বাদে মানুষের জন্ম, কিংবা পদ্মপাতায় আপনা থেকে ভেসে আসা ছেলে, আমার কাছে দুই বৃত্তান্তই সমান। তবে কোথায় একটা বাস্তবের ইশারা এই গল্পে উঁকি দেয়। কিন্তু গাজী কেন হাসে। হেসে হেসে সে বলে, 'আপনি বলতি চান, কবীর হিন্দু, না কি ঠাকুর মশায়!'

নারাণঠাকুর বিড়ি ধরিয়ে বলে, 'নিশ্চয়।'

গাজী বলে, 'তবে শোনেন, "জাতি পাঁতি কুল কাপড়া, এহ শোভা দিন চারি। কহে কবীর শুনি হো রামানন্দ! এও রহে ঝকমারি॥ জাতি হাম্যারি বাণীকুল করতা ঔর মাহি। কুটুম্ব হামারে সন্ত্, হ্যায় কোই মুরখ সমঝতে নহী।" হতি পারে রামানন্দ ঠকুর ওঁয়ার গুরু, তয়, কবীর জাতি পাঁতি ছাড়া। ওঁয়ার কথাই ওঁয়ার জাত, মনের মানুষ কুল, সাধুরা হলো কুটুম। ওঁয়ার কোনো জাত নাই। হিঁদুও না, মোচলমানও না।'

নারাণঠাকুর আবার ঠেক খায়। চমক খাই আমি। এ যে ধুকড়ির মধ্যে খাসা চাল। গাজীর দৌড় দেখছি অনেকখানি। মিছে মামলার কারবারী নয়, প্রমাণ দিয়ে সওয়াল করে। কেবল যে মুরশেদের নামের মজদুরি নিয়ে ফেরে, তা বলতে পারবে না। এক পাল্লায় কথা, আর এক পাল্লায় বাটখারা। ওজন ছাড়া কেবল কথার কথা নয়। কে জানে, নারাণঠাকুর আবার ছাপার অক্ষর দেখাবে কি না। কিন্তু তার ভাব-সাব একটু অন্যরকম। বলে, 'সে কথা আলাদা।'

গাজী হেসে আবার ভাত খায় সপাসপ্, তারপরে গলায় মধু ঢেলে বলে, 'আর চাট্টি ভাত দেন ঠাকুরমশায়।'

মুখ দেখলেই বোঝা যায়, নারাণঠাকুরের পিত্তি জ্বলে গিয়েছে। নিজে না গিয়ে সে ঘর থেকেই হাঁক দেয়, 'ফোঁচা, বকনোতে যে ভাতগুলোন আছে, সেগুলোন এনে দিয়ে যা।'

কিন্তু মাহাতো গিন্নী না হেসে পারে না। এখন তার সন্ধ্যা নামা চোখে আবার দুপুরের ঝলক। ঠাকুর আর গাজীতে তলে তলে লড়ে কোথায়, বোধ হয় ধরা পড়ে তার কাছে। গাজীর দিকে চেয়ে যেভাবে হাসে, বোঝা যায়, মান্য তার সেখানেই। বলে, 'ওই নাকি তোমার গল্প!'

গাজী বলে, 'না, আরো আছে। আসল গল্প তো বলাই হয় নাই! জাতের মজা সেখানেই।'

বলে সে ফোঁচার কাছ থেকে ভাত নিয়ে মাখতে মাখতে বলে, 'তারপরেতে কবীর তো মারা গেলেন। যেমনি মরা, অমনি মোচলমান শিষ্যরা বলে, তারা কবর দেবে। হিঁদুরা বলে পোড়াবো। দু' দলেতে ঘোর বিবাদ। এও লাঠি তোলে, সেও লাঠি তোলে। বেঁচে থেকে মানুষটা যে এত বলি গিলেন, সব পয়মাল। দুই দলে যখন মারামারি লাগে লাগে, তখন কবীর এসে দেখা দিলেন, বললেন, "বিবাদ ক'রো না, আমার মরার ঢাকা খুলে দেখ।" অমনি দুই দল গে ঝাঁপ খেয়ে প'লো। দ্যাখে, কবীর নাই। ঢাকার নিচে এক রাশ ফুল পড়ি রয়েছে। তখন নাও, কাকে পোড়াবে, কাকে কবর দেবে! তবে বিহিত তো একটা করতে লাগে। তাই, আদ্দেকখানি ফুল নিয়ি গেল কাশীর মহারাজা। সেই ফুল দাহ করি, তার ছাই রেখি দিলো এক জায়গায়। আর বাকী আদ্দেক নিয়ি গেল দিল্লীর বাদশা। কবর দিই রাখলে গোরখ্পুরের এক গাঁয়ে। নাও, এবার তুমি কী জাতের বিচার করবে, করো।'

বলে মাথা নামিয়ে আবার খাওয়া আরম্ভ করে। একবারও মনে হয় না, গাজী তত্ত্বকথা বলে। যেন দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ, কেবল নারাণঠাকুরকে রাগিয়ে মনে মনে নৃত্য করে। আবার হাঁক দিয়ে বলে, 'এবার হরি হরি বলো মন। ঠাকুরমশায়, ফোঁচাকে

বলেন একটু দই দিতি।'

একে পাজী ছাড়া আর কী বলে। নারাণঠাকুর ততক্ষণে ভিতরে অন্তর্ধান করেছে। ইতিমধ্যে আমার পাতে দই পড়েছে। মাহাতো উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যেন এতক্ষণ গল্পের মর্ম ঠাহরের ধ্যানে ছিল।

আপন মনেই ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'দ্যাখ, দেখা দিয়ে নিজির ব্যবস্থা নিজিই করি গেলেন। তা নইলি তো শরীরটাকে কোটিই দুখান করত সবাই।'

মাহাতো গিন্নী পাত ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে, 'গান কিন্তু শোনাতে হবে।'

একটা বিষয় লক্ষণীয়। মাহাতোর কথায় যেমন এই নোনা কূলের টান, গিন্নীর কথায় তা নেই। হবে হয়তো দুজনা দুই অঞ্চল থেকে এসেছে।

গাজী বলে, 'সময় কোথায়। ভোলাখালি যেতি হবে না!'

মাহাতো বউ শরীরে একটু মোচড় দেয়, হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। বলে, 'একটু বসে যেতে হবে। ভরা পেটে হাঁটতে পারব না।'

বলে, একবার চোখের কোণে তাকায় কর্তার দিকে। কর্তা তখন দাওয়ায় পা দিয়েছে। সেখানে আঁচাবার ব্যবস্থা রয়েছে। গিন্নীও সেদিকে যায়।

গাজী আর একবার ডাক দেয়, 'ঠাকুরমশায়, একটু দই দেন গো।'

ভিতর থেকে উচ্চ রবে রুষ্ট স্বর আসে, 'দই-টই নাই, এখন ওঠ দিকিনি।'

'আচ্ছা গো মশায়, আচ্ছা আচ্ছা।'

বলে গাজী একবার আমার দিকে চেয়ে হাসে। পাতাখানি গুটিয়ে তুলে কোথায় যেন চলে যায়। বোধ হয় তার এঁটো পাতা যাতে ছোঁয়াছুয়ির এলাকা বাঁচিয়ে ফেলা হয়, সেই রকম দূরত্বে চলে গেল।

কিন্তু তার হাসি মুখখানি হঠাৎ কেমন করুণ মনে হয়। মহামায়া হিন্দু হোটেলের দই কিছু অমৃত নয়, আমি সবটুকু মুখে দিতেও পারিনি। আর গাজী একটু চেয়েও পায় না। এ যে শুধু পয়সার জন্যে তা নয়। এর মধ্যে আছে অন্য গ্লানি, অসহায় অপমান। ওর আরশি-চোখে হাসির ঝলকই কেবল দেখি, তার তলায় কি অন্য কোনো স্রোত নেই। নারাণঠাকুরের ওপর মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে।

কিন্তু তাই বা কেন ওঠে। তার চেয়ে গাজীর হাসন হাসি। তোমার বিরূপ হওয়ার কুরূপ অনেক পথ জুড়ে। তাকে দেখতে গেলে ঠেক খেতে। মানতে গেলে মুখ কালো। হেসে চলে যাও।

সাবধানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। একে খাওয়া পর্বের শেষ বলব না। বরং কবীর পর্ব বলা ভালো। অবেলায় শরীরে বেশ ভার লাগে। বাইরে বেলার গায়েও ভার পড়েছে বেশ। রোদের রঙ গিয়েছে ঝিমিয়ে, দিনের শেষের নিরুত্তাপ রক্তিম আর শান্ত।

হাতমুখ ধোবার পরে এবার দাম চোকাবার পালা। কিন্তু নারাণঠাকুর কোথায়! নিশ্চয় অনুমানে ভুল করিনি, ঠাকুর স্বয়ং পাচক ও মালিক। আদায়-উশুল হিসাব-নিকাশ তারই কাজ। এদিকে গাজীরও খবর নেই। অন্য দিকে কর্তা-গিন্নী অন্য কথা বলে। মাহাতো বলে, 'যা পাবো, তাই আনব, তুই বস্ গে যা।'

এমন সময় আসে ফোঁচা। গলার স্বর সেই চিঁচিঁ, চেহারার সঙ্গে একবারে বেমানান। আমাকে বলে, 'বাবু কি বসবেন, না যাবেন?'

বসার কোনো প্রশ্ন নেই। খাওয়া হলো, এবার খদ্দের বিদায়। মাহাতো বলে ওঠে, 'কেন, বাবু কি জলে পড়ি গেছে, না এজলাসে হাজিরা দিতি যাবে যে, খেয়েই বিদেয় নিতি হবে।'

ফোঁচা বলে, 'তা বলি না। ঠাকুর মশায় জিগেস করতে বললেন, তাই।'

মাহাতো তো মাহাতো। বলে, 'জিগেস করাকরির কী আছে। খাওয়া হয়েছে,

একটু বসে বিড়িটিড়ি টেনে যাওয়া হবে। তুমি দাওয়ায় আসন পেতি দাও দেখি একখান। তোমার ঠাকুরমশায় বুঝি খেতি বসবে এখন?'

'হ্যাঁ।'

'বসতি বলো গে। খেয়ি এসে দাম নেবে।'

কার কথা, কে বলে। ফোঁচাকে আমি কিছু বলবার আগেই দেখি, যেন হুকুম-বরদার হুকুম নিয়ে চলে গেল। কিন্তু খাওয়ার পরে হোটেলের দাওয়ায় বসার রীতি আমার জানা নেই। সেই কথাটিই মাহাতো বলে, 'বসেন না একটু মশায়, বসেন, পান বিড়ি খান। এ তো আপনাদের শহরের হোটেল নয় যে, খাওয়া হতি না হতি দাম মিটিয়ে চলি যেতি হবে।'

বলে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গিন্নীর দিকে ফেরে। জিগেস করে, 'হ্যাঁ কী বলছিলি বল্'

বউয়ের মুখ ফেরানো অন্য দিকে। জবাব আসে, 'বলছি, গাজীর জন্যে দুটো পান এনো।'

মাহাতোর হ্যাঁ-না কোনো শব্দ নেই। দাওয়া থেকে নেমে সে হাঁটা দেয়। ফোঁচা এসে একটা শীতলপাটির আসন পেতে দিয়ে চলে যায়। এখন যা করতে হয় করো।

করার কিছু নেই। খেয়েছি, পয়সা না দিয়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া গাজী যে আমাকে খাড়া করে রেখে গেল। সে না এলে যেতেও পারি না। অতএব, শীতলপাটির আসনে অধিষ্ঠান। মাহাতো-বউ দাওয়া থেকে সরে দরজার কাছে দাঁড়ায়। আধখানা শরীর ঢাকা পড়ে ঘরের মধ্যে, আধখানা বাইরে। ঘোমটার আড়ালে থাকলেও বুঝতে পারি, মুখ ফেরানো তার অন্যদিকে।

খাওয়ার পরে নেশা। গাজীর ভাষায় যার নাম ছিরগেট, যার গন্ধ নাকি খুবই মিষ্টি তাই বের করে ধরাই। মুখোমুখি কোনো ঘর নেই। কাঠা দুয়েক জমি ছাড়িয়ে যে-ঘর আছে, তার দরজা অন্য দিকে। সামনে একটা বড় গর্ত, তাতে উনুনের ছাই ছড়ানো, পাঁশ আবর্জনাও কম নেই। গর্তের সামনেই বড় একখানি নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে বড় একটা গাছ। হাটের বুকে যে কয়টি গাছ আছে, এই বনস্পতি তার অন্যতম। হয়তো যবে এ জায়গা ছিল সুন্দরবনের আওতায়, তখন এই নাম-না-জানা ঝাড়ালো বর্ষীয়ান বনস্পতি ছিল কিশোর। যার নাম সভ্যতা, তার বড় মাটির লোভ। বন কেটে সে চাষ করেছে। তার মধ্যে কোনো রকমে এই গাছের গর্দান বেঁচে গিয়েছে। বয়সের হিসাবে এখন তার ঋতুরাজের কাল, না কি মধ্যঋতুর হাল, বুঝতে পারি না। পুষ্টতা আর সবলতা দেখে অনুমান হয়, বুড়ো সে হয়নি এখনো। পাতায় পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে, গাঢ় সবুজের রঙে রঙে বাড়বাড়ন্ত দেখি। প্রথম শীতের ছোঁয়াতে এখনো একটি পাতা ঝরার লক্ষণ নেই। বেলা শেষের আলোয় পাতাগুলো চিকচিক করে। চোখে দেখি না, কানে শুনি, তার ছায়া ঝোপে কোন্ সব পাখিরা যেন ডাকে। চড়া গলায় নয়, নিচু স্বরে, সেইসব পাখিরা যেন আলস্যে বিলাসে কী সব বলাবলি করে।

হঠাৎ হারাই, হারিয়ে যাই কোথায় যেন। আপন বলে চিনি যাকে, অস্তিত্ব যার নাম, যে আছে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে, সে যেন নিমেষে যায় কোথায়। তার সঙ্গে চলে যায় স্থান কাল পাত্র। কোথা থেকে কোথায়, কেন এসেছি, সে কথা আমার মনে পড়ে না আর। যেন আমার কোনো গুরু ছিল না। শেষ কোথায়, জানা নেই। ওই যে ছায়া, ওই যে গাছ, ওই যে পাখি আলাপ করে নিবিড় নিভৃতে, কোথায় যেন, কোন্ লোকে মানুষের অস্পষ্ট দু'-একটা কথা ভেসে আসে, আর এই দরজায় দাঁড়িয়ে লাল শাড়ি জড়ানো আধখানা মূর্তি দেখা যায়, এইসব যেন এক অরূপ সায়র। আমি তাতে

ডুবে যাই। কেন, তা জানি না। সংসারের মুগ্ধ বা অবাক হবার কিছু ছিল না এখানে। তবু সব মিলিয়ে এ যেন এক ঘোর। যেন কী এক সুর বাজে কোথায়, অদেখা অচিন লোকে, মানুষের অধরা সীমায়। বাজে এক নামহীন সুর। আর যেমন করে স্তব্ধ প্রহরের ঘোরে ঘণ্টা বেজে যায়, তেমনি করে আমার হৃৎপিণ্ডে ধুকধুক ধ্বনিত হতে থাকে।...

কখন যেন একটা রোগা কুকুর আসে। কালো-ধলো রঙ। ছাইগাদায় নেমে বারেক সন্দেহে দেখে দাওয়ার দিকে। তারপর কাছে এসে কান কাঁপিয়ে, ল্যাজ নেড়ে আশা-নিরাশার ধন্দ লাগা চোখে তাকায়। দরজার কাছে বাজে চুড়ির রিনিঠিনি। দেখি, ও গাজীর থেকে সাহসী। লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে ছুটে যায় শব্দের দিকে। শুধু তাই নয়, লাফ দিয়ে হাত বাড়ায় লাল শাড়ির দিকে। হঠাৎ শুনি মাহাতো-বউ হাসে খিলখিল করে। বলে, 'অই মুখপোড়া, গায়ে উঠিস না। কী আছে যে দেবো তোকে।'

তা যদি ও জানত! তাই নড়বার নাম করে না। তবু নড়তে হয়, হঠাৎ মাহাতো আর গাজীকে দেখে। দেখি, দুজনেরই মুখ চলছে। চিবুনো আর কথা বলা, এক সঙ্গেই। চিবুনোর বস্তু পান, দুজনের ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়। কথার খেই মাহাতোর গলায়, 'আরে সে তুমি আমাকে কী বলবে। অন্তাকেও চিনি, অন্যদিকে চিন্‌তিও আমার বাকী নাই। রাগ হয় অই দুলি ছুঁড়িটার ওপর...হ্যাঁ, এই নাও।'...

দাওয়ায় উঠতে উঠতে এক কথা থেকে আর এক কথায় আসে মাহাতো। বউয়ের দিকে পান বাড়িয়ে দেয়। আবার বলে, 'কী এক রাঙ্‌তা দেওয়া জর্দার কথা যেন বলিছিলে, তা পেলাম না। অই দিয়ে কাম চালাও।'

তারপরে দেখি, মাহাতো পানের খিলি বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। বলে, 'নেন, একটু পান খান।'

গাজীও লাল ছোপের দাঁত দেখিয়ে তাল দেয়, 'হ্যাঁ বাবু, পান খান।'

কিন্তু গোবিন্দদাস ও রসে বঞ্চিত। তাই বলতে হয়, 'পান খাই না।'

তা বললে কি মাহাতো শোনে। বলে, 'আপনার নাম করি এনিচি, খেয়ে ফ্যালেন মশায়।'

গাজী হেসে ঘাড় নাড়ে। কিন্তু ফোঁচার আনা আসনে না বসে উপায় ছিল না। পানের বিষয়ে তা চলবে না। যা বুকে আটকায়, গলা বন্ধ হয়ে যায়, এমন বস্তুর নিমন্ত্রণে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই। মাহাতো মশায়কে তাই হাত জোড় করে বলতে হয়, 'খেতি পারি না, কষ্ট হয়।'

যেন মাহাতো এমন মজার কথা শোনেনি কখনো। বলে, 'বলেন কী মশায়!'

বলেই সেই কাশি জড়ানো গলায় হাসি। লাল কোকিল চোখে তাকায় বউয়ের দিকে। বউও হাসে, হাসির শব্দ চাপা দেবার চেষ্টা করে। গাজী হাসতে হাসতে বলে, 'বাবুর আমার এমনি মজার কথা। তয়, বাবুর যখন ইচ্ছা নাই, পানটা তুমি খেয়ে ফ্যালো।'

মাহাতোর তখনো হাসি থামেনি। আমার পাশেই বসে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বলে, 'পান খেতে কষ্ট হয়, কোনোদিন শুনি নাই। আমরা তো পেট থেকে পড়ি ইস্তক যাবৎ নেশা ধরিচি। মদ ভাঙ্‌ যা বলেন, কোনোটাতে অরুচি নাই।'

সোজা কথা, সোজাই বেরোয়। দাগের ছিটা লাগাবে, তার জায়গা কোথায়। কিন্তু পান চিবুতে না পারার সঙ্গে এই তুলনা কোথায় খাটে, সে বিতর্কে যেও না। অতএব দেখন-হাসি হেসে মাথা নাড়ি। বলি, 'ভালো লাগে না।'

গাজী বলে, 'অ্যাই গে হলি কথা, যার জুড়ি নাই। ভালো লাগে না। এর পরে আর কথা হয় না।'

যেন এতক্ষণ আমার কথার ভুলেই কথার সৃষ্টি হচ্ছিল। মাহাতো বলে, 'সে ঠিক কথা। আঙুরি খাবি নাকি গো?'

ইতিমধ্যে দরজা ঘেঁষে মাহাতো গিন্নীও ভুঁয়ে বসেছে। জবাব আসে, 'না। আমার মজা পান, আর মুখে দেবো না।'

এতক্ষণে মাহাতো-গিন্নীর একটা নাম শোনা গেল, আঙুরি। কী থেকে এই নামের উৎপত্তি হতে পারে, ধারণায় আসে না। কিন্তু সে না হয় নামের কথা। মজা পান আবার কাকে বলে। ঐ মজা, কোন্ মজা। এ বোধ হয় মজা লাগার মজা নয়, মজে যাওয়ার মজা।

মাহাতো বলে, 'আমারও তাই।'

তৎক্ষণাৎ গাজী আওয়াজ দেয়, 'তয়, আমাকেই দাও চাচা।'

'হ্যাঁ, তোমার বাবুর পান, তুমিই খাও।'

হাত বাড়িয়ে গাজীকে পান দেয় সে। পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতে বলে, 'একটুখানি ধোঁয়াও হবি নাকি?'

গাজী দাওয়ার ধারে বসতে বসতে বলে, 'তা আর না হবি কেন। তুমি খাওয়ালিই হয়।'

মাহাতো এক হাতে তিনটি বিড়ির মুখ এক করে ধরে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আগুন জ্বালায় তিন বিড়ির মুখে। জ্বালিয়ে একটা দেয় গাজীকে, আর একটা বাড়িয়ে ধরে ডান দিকে। একটি শাঁখা চুড়ি পরা হাত সেটি নেয়। জ্বলন্ত বিড়ি অদৃশ্য হয়ে যায় ঘোমটার আড়ালে। তিনজনের ধোঁয়ায় মাখামাখি করে। আহারের পর একটি নিটোল বিশ্রামের ছবি। বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে জরদার গন্ধটা মিশে আবহাওয়াটাকে যেন আরো নিবিড় করে তোলে।

আমার সিগারেট তখন প্রায় শেষ।

মাহাতো-গিন্নীর গলা শোনা যায়, 'গান কিন্তু শোনাতে হবে।'

মাহাতো-গিন্নী নয়, আঙুরি। অনেকটা যেন আঙটির মতো শোনায়। গাজী বলে, 'শুনোব গো চাচী। পান বিড়িটা মজিয়ি নেই আগি।'

মাহাতোর দিকে ফিরে বলে, 'অই, জিগেস করতি ভুলি গেলাম, কলকাতায় গিছিলে নাকি চাচা?'

মাহাতো একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'না, কলকাতায় যাবো কী করতি।'

'না, বলে, আলিপুরির কাচারিতি গিছিলে কি না। মামলা-মকদ্দমা থাকতি পারে!'

কথাটা ঠিক যেন মাহাতোর মনঃপুত হয়নি। গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'কেন, খেয়ি-দেয়ি কি আমার আর কাম নাই, খালি মামলা ঠুকে বেড়াচ্ছি।'

দেখ, আবার কথার পৃষ্ঠে কথা কোথায় নিয়ে যায়। মাহাতোর মেজাজ বুঝি না। গাজী একটু ঠেক খেয়ে বলে, 'না, বলে কি, যাও তো পেরায়ই। মাসান্তর তো লেগিই আছে।'

ভাবি, হাঁক দিয়ে বুঝি চিৎকার ওঠে। কিন্তু না, দেখি মাহাতো আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে। তার ছোট ছোট লাল চোখের দৃষ্টি যেন অনেক দূরে চলে যায়। কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড মুখখানি হঠাৎ যেন পাঁকের মতো নরম তলতলে দেখায়। দু'চারখানি খানা খন্দ দেখা দেয়। অনেকটা কাদার ডেলার মতো। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তারকেশ্বর গিছিলাম একটু।'

'অ! পুজোপাট দিতি নাকি?'

মাহাতো মুখ ফেরায় না, চোখ ফেরায় না। বিড়িও টানে না। ওদিকে যেন কেমন করে আঙুরির ঘোমটা খুলে যায়। বউদের ঘোমটা যে কেন বারে বারে খুলে যায়, আর

বারে বারে টানতে হয়, সেকথা কেউ বলতে পারে না। হয়তো, বউদের শাশুড়ী ননদিনীরা সে কথা বলতে পারে। কিন্তু আঙুরি ঘোমটা টেনে দেয় না। তার মুখের এক পাশ দেখা যায়। তার মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় না। বিড়ি বোধ হয় হাতে কোথাও আছে। কিন্তু দেখ, আঙুরির কালো মুখখানি মূর্তির মতো নিরেট। কাজল-মাখা চোখের দৃষ্টি স্বামীর মতোই কোথায় কোন্ দূরে যেন নিবদ্ধ।

মাহাতো বলে, 'না, পূজাপাট আর কী দেবো।'

গাজী তবু ছাড়ে না। জিজ্ঞেস করে, 'তয় কি, মানত-টানত ছিল?'

এবার মাহাতো একবার আঙুরির দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু আঙুরি তাকায় না। সে তেমনি স্থির হয়ে বসে থাকে। পান চিবুতে চিবুতে সে যে গান শুনতে চেয়েছিল, সে কথা আর মনে হয় না। খোঁপায় গোঁজা রূপোর ঝুমকো কাঁটার ঝুমকো পর্যন্ত একটু নড়ে না, ঝিলিক দেয় না।

মাহাতোর সেই যে ভার-ভারিক্কি আত্মপ্রত্যয়ের একটা ভাব ছিল, তাতে যেন চল খেয়ে যায়। এখন এ মানুষ যেন কেমন অসহায়। কোথায় একটা দুর্ভাগ্যের ছায়া তাকে ঘিরে ধরে। বলে, 'অই আর কি। মানত তো করিই যাচ্ছি, ফল তো পাই না।'

কথার সঙ্গে নিশ্বাসে মনের ঢাকনা খুলে আসে। কী একটা দাগ যেন দেখা যায় সেখানে। আঙুরি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আহ, কি কথা দ্যাখ দিকি। ফল পাও কি না পাও, সে তুমি বলো কেন। মানত করেছ, সে কথা বলো।'

আঙুরির স্বরে একটু উদ্বেগের সুর। সংস্কার বলো, আর যাই বলো, শোনায় যেন, 'তোমার কাজ তুমি করো। ফলের বিচার অন্যত্র।'

মাহাতো বলে, 'তা ঠিক, তবে দ্যাখ্ আঙুর, মানুষের মন তো।'

তার গলায় নিরাশা, সুরে আক্ষেপ বাজে। এবার জানা যায়, আঙুরি আঙুর। হয়তো আঙুর শুনতে সুন্দর, তবু আঙুরি যেন আরো মিষ্টি। আঙুরি বলে, 'তা হোক। ফল পাও না, সে কথা বলতে নাই।'

মাহাতো ঘাড় নাড়ে আস্তে আস্তে। আবার একটা নিশ্বাস পড়ে। আর তার কালো মোটা ঠোঁটে হাসি দেখা যায়। বলে, 'কিন্তু, ওদিকে বেলা যে যায়।'...

কথাটা সঠিক ঠাহর হবার আগে প্রায় বাইরের রোদের দিকে চোখ ফেরাতে যাই। দেখি, গাজীর আরশি-চোখ মাটির দিকে। তার ফাটা ফাটা মুখখানিও যেন ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মাহাতোর গলায় আবার শোনা যায়, 'সময়ের বস্তু সময়ে না এলি কি আর তাকে ধরা যায়? না কী বলো হে গাজী।'

গাজী মুখ না তুলেই গানের কলি বলে, 'তা বটে চাচা। ওই সেই আছে না, "সোঁতে বাঁধাল বাঁধ গা জলে, এই কোটালে। পড়েছে মীন, ধরগা ত্বরা, পাবি না রে জল শুকালে।"'

মাহাতো ঘন ঘন মাথা দোলায়, বারে বারে বলে, 'এই এই এই, এই কথাখানি বলো। পাবি না রে জল শুকোলি। তো আঙুরিকে সেই কথাই বলি। মন যে মানিতি চায় না।'

তিনজনেই চুপ করে থাকে। দেখি, তিনজনেরই ধূমপান বন্ধ, বিড়ি নিবে গিয়েছে। এবার নিজেকেই নিজের কথা বলতে ইচ্ছা করে, 'ওরে জন্মকানা, দেখলি না রে, আলোতে ঝলক খেলে যায়।' এ যেন সেই, 'কথা কয় রে, দেখা দেয় না। নড়েচড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।' এই তিনে মিলে কী যেন এক কথা বলে যায়, আমি যার মর্ম বুঝি না। অথচ, তাদের মাঝে বসে আমি অন্য স্রোতে চলি। কী এক রহস্যধারা যেন তলে তলে চলে। আর দেখ, আমি যে ভিন্‌দেশী লোক, আমি যে বাইরের, তা ফুটে ওঠে এই তিনজনের ভাবে। এখন ওরা এক, আমি ভিন্ন। আমি

বিস্মৃত, অস্তিত্বহীন।

আঙুরির গলা শোনা যায়, 'মন না মানলে কী করবে বলো, মন না মানিয়ে আমাদের উপায় কী। তবে অই বেলা যায় বেলা যায় প্যাচাল পেড়ো না। ও তোমার মনে ধন্দ।'

বলে সে ঘোমটাটা টেনে দেয়। মাহাতো তেমনি শব্দ না করে হাসে। সে হাসিটা যেন আঙুরি টের পায়। তাই একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে। যদি ঠিক দেখে থাকি, তবে দেখেছি, কাজল-মাখা ডাগর চোখ দু'টিতে জল নেই। জলের থেকে বেশী, কী একটা কষ্ট যেন অথই হয়ে পড়বার জন্যে থমকে আছে। তবু অথই হয়ে পড়ে না।

গাজীও দেখি এবার তার আরশি-চোখের পাতা একটু নাচায়। মাহাতোর দিকে চেয়ে বলে, 'তাও হতি পারে। মনের ভরমে করম নাশে, মন বাঁধ মন রসে কষে। বেলা যাবার মতন বয়স তো তোমার হয় নাই চাচা।'

মাহাতোর সে কথায় কান নেই। যেন নিজের সঙ্গে নিজে বলে, 'ডাক্তার বদ্যিও তো কম করলাম না। ধরো গে, আলিপুর কোর্টের যত চেনা উকিল মোক্তার, যে যেমন ডাক্তারির কথা বলেছে, সবারি দেখিয়িচি। তারা সব কলকাতার ডাক্তার। কালীঘাট তারকেশ্বরও তো কম হলি না। এখন কী আছে কপালে, দেখি।'

কথা শেষ হবার আগেই মাহাতোর নিশ্বাস পড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সে পোড়া বিড়ি ধরায়। গাজীও তার কাছ থেকে ধরিয়ে নেয়। এবার যেন আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যায়। একটা সন্দেহ নড়েচড়ে ওঠে, একটা ধারণার মূর্তি ফুটে ওঠে। মাহাতো কি অপুত্রক পিতা। কোনো একদিন ফোঁচার কাছে ঠাট্টা করে ছেলে চাওয়া, কেবলমাত্র ঠাট্টা নয় তা হলে।

তারপরেই দেখি, মাহাতো জামা সরিয়ে ট্যাঁকের ভিতর থেকে কোমরের সঙ্গে সুতোয় বাঁধা একটা পকেট ঘড়ি বের করে। কখনো আশা করিনি, বিদেশী এক বিখ্যাত কোম্পানির, বহুকালের পুরনো এক সোনার ঘড়ি এমন একটা মানুষের ময়লা কাপড়ের কষি থেকে বেরুবে। তাও এই দূরের বাজার হাটে। মনে মনে অবাক হই, প্রকাশ করতে পারি না। অথচ এই লোকটিকে আমি আমার ছকের ভাবনায় সামান্য দরিদ্র এক চাষী ছাড়া ভাবিনি। আর, কোনো দরিদ্র চাষীর কাছে এমন ঘড়ি দেখলে আমার মতো কোন্ মানুষের চোখে ধন্দ না লাগে! এই আমাদের মন। হঠাৎ মাহাতোর সম্পর্কে আমার মন অন্য বায়ে বইতে শুরু করে।

গাজী বলে ওঠে, 'দ্যাখেন তো বাবু, নক্‌কীঠাকরুন যার ঘরে বাঁধা, তার ভোগের মানুষ নাই।'

মাহাতো হেসে তাকায় আমার দিকে। তারপরে গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'তাই বা আর কমনে বলো। গত সনে ট্যাক্‌সো দিইচি চল্লিশ হাজার টাকা। এ বছরি আবার কত দিতি হয় দ্যাখ। সব দিকিই আমার ফরসা। কিছুই আর রেখি যেতি হবে না।'

এই কথা শেষ হতেই হঠাৎ দেখি আঙুরির মাথাটা নিচু হয়ে পড়ে। ঘোমটা খসে যায়। এবার তার ঝুমকো কাঁটার ঝুমকো ফুল ঝিকিমিকি করে। সেই সঙ্গে শরীরখানিও কাঁপে। গাজী একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নেয়। মাহাতো আঙুরির কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'কাঁদিস না, আমি তো মন্দ কিছু বলি নাই।'

সব কিছুই এমন চকিত আর আঁকাবাঁকা, খেই ধরতে পারি না। অন্তঃস্রোতের সব প্রবাহে নজর করি, তেমন শক্তি নেই। তবু সব মিলিয়ে কোথায় একটা ব্যথার ভারের সঙ্গে ধন্দে থমকে থাকি। ধন্দ লাগে এই কারণে, মাহাতোর শ্রেণী বুঝতে ভুল করেছি। গাজীর ভাষায়, নক্‌কীঠাকরুন যে তার ঘরে বাঁধা, তাতে ভুল নেই।

অথচ এমন একজন ধনী, সেকালের সোনার ঘড়ি যার ময়লা কাপড়ের বন্ধনীতে, সে কী না এমন বেশে এমন করে এই ভোজনাগারের দাওয়ায় বসে। শুধু কি তাই। ট্যাকসো বলতে, সম্ভবত কৃষি আয়কর বুঝিয়েছে সে, তার অঙ্ক চল্লিশ হাজার টাকা। সেই লোক কি না সস্ত্রীক বিড়ি টানতে টানতে এল মোটর বাসে করে তারকেশ্বর থেকে। এখন গাজীর কাছে বসে কাঁদে বংশধরের ক্ষুধায়। আঙুরি কাঁদে মুখ নিচু করে। তার চোখে জল। স্বামী তার পিঠে হাত দিয়ে কাঁদতে বারণ করে। লাল চোখ দু'টি তার জলে ভাসে না। কিন্তু দেখি, চোখের জলের থেকে তার কান্না যেন গভীর। জলেতে যে ক্ষণেক ধোয়া, যাতনা থেকে একটু মুক্তি, সেটুকুও তার নেই।

এখন ব্যথার ভারে, সেই তো অবাক মানি, এই লোককে তুমি কেবল কৃপণ ভাববে নাকি। না কী, ভারতের এ আর এক রূপ। হয়তো সাবেকী রূপ। লক্ষ টাকা কষিতে বাঁধা, তবু আপন সমাজ পরিবার বেশবাস আচরণবিধির এদিক-ওদিক নেই। ধুলায় চলে, ধুলায় বসে, রাস্তায় কাঁদে। দূরের এই বাজার গঞ্জে, না জেনে পথ, অচিন খোঁজে, এইটুকুও দেখাজানা পাওনা ছিল আমার।

ওদিকে গাজীর গলায় গুনগুনানি বেজে ওঠে। সে মুখ তোলে না, ফিরে তাকায় না। যেন নিজেকে নিজেই মাথা নেড়ে কী বলে, গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজে। তারপরে নিচু স্বরে টানা সুরে গায়, নাকি কেবল সুর করে কথা বলে, বুঝতে পারি না। গান করে 'মন না হলে সোজা, ফকির সাজা কেবল রে তার বিড়ম্বনা।'

এই একটা কলি বার দুয়েক গেয়ে মাহাতোর দিকে চায় সে। মাহাতো তাকায় তার দিকে। গাজী হাত ঘুরিয়ে গায়,

'ফকিরের সজ্জা ধরে, নেত্য করে,
করছ ধম্মের আলাপনা
(আরে দূর হ বান্দা) তুমি যে আপন কাজে,
বেঠিক নিজে,
পরকে কী বোঝাও বল না।'

বলে মাহাতোর দিকে চেয়ে হাত দু'টি জোড় করে হাসে। বলে, 'চাচীকেও সেই কথাখানিই বলি। কী দিয়ে যে মন বাঁধতে বলব, তা জানি না। তয়, চাচী, মন বশ না করি উপায় কী!'

বলে সে আঙুরির দিকে চায়। আঙুরি তবু মুখ তোলে না। তবে তার শরীরে আর কাঁপন খেলে না। গাজী আবার গায়,

'(গাজী বোঝে না) তুমি যে এত গান গাও, পরকে বুঝাও
নিজে কেন তা বুঝ না
নিজে না বুঝলে পরে অন্য পরে বুঝবে কেন
তা ভাব না।
পরকে কী বোঝাও বল না।'...

বলে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকে আঙুরির দিকে। ফাটা মুখের ভাঁজে ভাঁজে একটু হাসি খেলে যায়। গাজীটা করে কী। গুণ, না বশ। অবাক হয়ে দেখি, পাজীটা যেন আর এক খেলা খেলে। ওদিকে আঙুরিও দেখি মুখ তোলে। চোখের জল মোছে। গাজীর দিকে তাকাতে চায় যেন, পারে না। কেবল বলে, 'গাও।'

গাজী তৎক্ষণাৎ ধরে দেয়,

'(গাই) মনের মানুষ পেলাম না, মনে মনে ভাবছি যে তাই
মনের দুখ্‌খু মনেই রইল, মনে মনে ভাবছি তাই।
বন পোড়া যায় সবাই দ্যাখে

' (বুইলে চাচী) মনের আগুন কেউ না দ্যাখে
এখন কোন্ ছায়াতে তাপ জুড়াই।'

গেয়ে ঝোলা থেকে টান দিয়ে বের করে ডুপ্‌কিটা। ডুপ্ ডুপ্ তাল দেয়, ঘাড় দোলায়। আঙুরির পান খাওয়া ঠোঁটে একটু হাসি ঝিলিক দেয়। ডাগর চোখ তুলে গাজীকে দেখে একবার।

গাজী ডুপ্‌কি থামিয়ে গায়,

'কোন্ সাধনে পাই গো তারে
যে আমার জীবনধন রে
সেই আশাতে ঘুরে বেড়াই।
মন্দির মসজিদ সব ঘুরেছি
মোল্লা মুন্সী সব পুঁছিছি
আমি তারে কোথায় পাই।'

তারপরেই সে আকাশ ফাটানো হাঁক দেয়,

'(জয় মুরশেদ!) মিয়াজান ফাঁপরে কয়
ঘরের কোণে বান্ধা রয়
ওরে দিনের কানা
রাত দেওয়ানা
দেখলি না রে তাই।'...

সে গান থামায়। আর মাহাতো বলে, 'অই হলি কথা।'

গাজী বলে, 'তয় অবুঝ কেন। আমি বলি, ছুটাছুটির দরকার কী। ভুঁয়েতে গাছ দুই খান, ফল ফলবে একখান, মনের বুঝ কর।'...

মাহাতো আর আঙুরি দুজনেই যেন দৈববাণী শোনে গাজীর দিকে চেয়ে। আমার হালও তাই। লোকটার তাল ধরতে গিয়ে আমার চেয়ে থাকা সার। অথচ দেখ, মনের কোথায় তরঙ্গিয়া যায়।

ইতিমধ্যে কখন নারাণঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছে। ভোজনের পরে বিড়িটি সদ্য ধরানো। গাজীকে বলে, 'ওই গলাখানির গুণেই তরে গেলে।'

গাজী জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'আপনার যেমন হাতের গুণে, ডাল-চচ্চড়ি একেবারে অমর্ত স্বাদ হয়েছে।'

নারাণঠাকুর সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে একবার গাজীর মুখ দেখে। তারপরে বলে, 'যত বাজে প্যাচাল পাড়ে।'

নারাণঠাকুরের কথা শুনে আর মুখের ভাব দেখে আঙুরি হাসে খিলখিলিয়ে। এখনো বুঝি চোখের জল শুকোয়নি। অথচ দেখ, প্রাণের যত বন্ধ দরজা যেন হঠাৎ হাওয়ায় খুলে যায় ঠাস্‌ঠাসিয়ে। অন্ধকার যায়, আলো বিরাজ করে। যত জলে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতানি, সব শুকু শুকু, ঝরঝরিয়ে ওঠে। কিন্তু আমি কেবল গাজীর দিকেই দেখি। লোকটা গুণ জানে, না তুক জানে, কে জানে। এই দাওয়ার হাওয়ায় যে রকম মেঘ ছেয়ে এসেছিল, গুমোট ঘনিয়েছিল, সব সাফ-সুরতের কারিগরী যে লোকটার ঝোলা ভরে ছিল, এতটা বুঝতে পারিনি। কেবল যে গানে গানেই এই ডুবুরি মুক্তা তোলে, তা নয়। আবার বলে, 'ভুঁয়েতে গাছ দুইখান, ফল ফলবে একখান, মনের বুঝ করো।' অর্থাৎ, কোথায় করো ছুটোছুটি, কার কাছে বা মানত মানসিক। তোমার সব যে ঘরের কোণে বাঁধা। তুমি দিনকানা, রাতদেওয়ানা, চেয়ে দেখ না। এবার বলো, বিজ্ঞানের কী যুক্তি দেবে তোমরা। কেন, এর কি ভগবান নেই। তা সে আল্লা, খোদাতাল্লা, যে নামেই হোক। মানত মানসিক দোর-ধরা সব তো সেখানেই হয়। এ যে

অন্যরকম গায়। শুধু গায় না, এই ভিয়েনে জ্বাল দেয় রহস্যের রস দিয়ে। তাইতে বন্ধ্যা নারীর কান্না যায়, অপুত্রকের সান্ত্বনা হয়। তবু, এই যে মাহাতো, যাকে বলি বাদার এক লক্ষপতি, তার কাছে ওর কোনো চাটুকারের চাওয়া নেই। যা বলে, যা করে, সবই স্ব-ভাবের বশে। তার ধন-মানের প্রার্থনা নেই। একটি বিড়ি পেয়েই ধন্য।

কেন, এই যুগের বাতাস কি ওর প্রাণে তুফান তোলে না! আমরা যখন পদে পদে মরি, বাঁচি, তখন এই আলখাল্লা উড়িয়ে এমন নিটুট হেসে ঝলকায় কেমন করে। ওর কি যুগোত্তরের প্রাণ নাকি? ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যদিও, তবু যেন কিসের এক স্পর্ধা-অহংকারে একেবারে ডগমগিয়ে আছে। কিসের নেশা করেছে গাজী? আমাদের জীবনস্রোতের আঁকাবাঁকায় যেন কিছুই যায় আসে না ওর। আবার এখন দেখ, কথা একেবারে ঠোঁটের ডগায়। হাত জোড় করে এমন কথা বলে নারাণঠাকুরকে, ঠাকুর সন্দেহে ভুরু কুঁচকে থাকে। আর গাজী নিজে মিটিমিটি হাসে। কেবল আঙুরি খিলখিলিয়ে ঝরে। এবার মাহাতোও তাল দেয়। ঘাড় দুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'তা সে কথাখানি মিছে নয়, ঠাকুর, তোমার হাতখানি ভালো। অনেক মেয়েমানুষের অমন পাকের হাত হয় না।'

এ আর গাজীর প্রশংসা নয়, স্বয়ং মাহাতোর। নারাণও এবার আসর নিয়ে মাটিতে বসে বলে, 'তা তোমাদের দশজনে খেয়ে যেমন বলবে, সেইরকমই হবে।'

ঠাকুর যেন একটু থতিয়েই পড়ে। মাহাতো ততক্ষণ গিন্নীর দিকে চোখ ফিরিয়েছে। নজরে ভুল করিনি, আঙুরির চোখের কোণও যেন একবার স্বামীকে ছুঁয়ে যায়। মাহাতো তাড়াতাড়ি বলে, 'অই গ, দেখিস্ বাপু, তা বলি আমি তোর কথা বলি নাই। তোর হাতের খ্যাটন না হলি আমার দিন চলে না, সব্বাই জানে।'

আঙুরি অমনি ঝামটা দেয়, 'আহ্ ছি, কী কথার ছিরি, দ্যাখ দিকি। আমি কি তা বলেছি নাকি!'

গাজীর হাসি বাজে চড়া সুরে। মাহাতো বলে, 'না, অই বললাম আর কী।'

বলে সে পোড়া বিড়ি আবার ধরায়। ঝুঁকে পড়ে আগুন দেয় গিন্নীকে। গিন্নী যতটা সম্ভব আমাকে আড়াল করে ধরিয়ে নেয়। গাজীও তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মাহাতোর দিকে। মাহাতোর হাতের কাঠির শেষ আগুনটুকু কাজে লেগে যায়। কিন্তু দু' পা পিছিয়ে বসে নারাণঠাকুর। আর একটু হলেই গাজীর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতো। গাজী চেয়ে দেখে না, আপন মনে বিড়ি টেনে চলে।

তখনই আবার এসে দেখা দেয় ফোঁচা। কিন্তু বলে না কিছু, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। তৎক্ষণাৎ নারাণের মুখে বিরক্তি দেখা দেয়। ডিগডিগে শরীরটাকে টান করে কোমরের কোথা থেকে বের করে একটা বিড়ি। সেটা ছুঁড়ে দেয় ফোঁচার দিকে। ফোঁচা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। কোনো দিকেই তাকায় না। এবার যা বোঝবার তা বুঝে নাও। বলতে গেলে অনেক কথা। মোদ্দা কথা, ফোঁচার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। মনিবের কাছ থেকে পাওনা নিয়ে সে চলে গেল।

কোথায় গেল। সেই কালো-কুলো আঁটো-খাটো বউটির কাছে নাকি। তা সে যেখানেই যাক, এখানে এই দেশেতে, এই মানুষদের কী যেন একটা ছন্দ আছে। আমার চোখে যা ছন্দোহীন বাজে, এখানে তা নয়। তাই ফোঁচার আসা ও চলে যাওয়ায় কেউ কিছু বলে না। সবাই আপন মনে বিড়ি টানে। তবু, কেন জানি না, আঙুরির চোখে একটু ঝিলিক খেলে যায়।

মাহাতো হাই তুলে বলে, 'বেলা গেল, এবার ওঠা দরকার।'

তার কথাতেই নিজের কথা মনে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি নারাণকে জিজ্ঞেস করি, 'আমার কত হলো?'

নারাণঠাকুর প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আপনার হয়েছে দু' টাকা দু' আনা।'

বলে কী লোকটা! সেই যে কী বলে এক দল মানুষকে, যাদের নাম ড্যান্‌চিবাবু, আমি তা নই। এ যুগের বাঙলায় বাস করে ড্যাম্‌ চীপ্‌ উচ্চারণ আমার সাজে না। ড্যাম চীপ্‌ওয়ালা হতেও পারিনি। তবু দুটো মানুষের পেট ভরা খাওয়া যদি দু' টাকা দু' আনায় হয়, তবে তো না বলে পারি না, এ বঙ্গে যে আসে কপাল তার সঙ্গেই থাকে।

ওদিকে নারাণঠাকুর তখন হিসাব দিতে শুরু করেছে, 'আপনার হলো গে ভাত ডাল তরকারি আট আনা, মাছ চার আনা, দই চার আনা—এক টাকা।'

হাতের কর গুনে সে হিসাব দেয়। তার কোনো দরকার ছিল না। বোধ হয় আমার অবাক হওয়া দেখে সে কড়া ক্রান্তির হিসাব বলে। কিন্তু মাছ দই খেলাম আমি, আমার হলো এক টাকা। গাজীর কেন এক টাকা দু' আনা।

সে হিসাবের রহস্যও নারাণ ফরসা করে দেয়, 'আর এর হলো গে আপনার আট আনার ডাল ভাত তরকারি, তার সঙ্গে আরো দশ আনার ভাত।'

'বুঝেছি।' বলে আমি টাকা বাড়িয়ে দিই।

গাজী বলে ওঠে, 'অত হিসাব বাবু চায় না। আপনি কি আর ঠকাবেন?'

ঠাকুর বলে, 'তুমি থাম তো। সেই বলে না, কী করে চলে? না, বামুনের ভাতে আছি। তোমার আর কী। হিসাব দেওয়া আমার কাজ, লোক ভোলানো না।'

বলতে বলতে ঠাকুর পয়সা গোঁজে কষিতে। মাহাতো পয়সা বের করে জামার ভিতরে জামার পকেট থেকে। তার মধ্যেই গাজী বলে, 'তা যদি বলেন ঠাকুরমশায়, অমন একখানি হাত থাকলি, লোককে আমি গাছের পাতা খাওয়াতাম। হাতের গুণে তাইতিই লোকে ভুলি যেত।'

বলে হেঁ হেঁ করে টেনে টেনে হাসে। আবার বলে, 'তয় বলেন, লোক ভুলনো সবার কাম কিনা। তয় হ্যাঁ, কাম দিয়ি ভোলাতি হয়, আমার মতন খালি ফক্কিকারি নয়।'

দেখ, কোথায় লাগি মারে। কথা বহে কোন্‌ স্রোতে। নারায়ণঠাকুর যেন খোঁচা খেয়ে ফুঁসে ওঠে, 'কেন, আমি কি বলেছি তুমি ফক্কিকারি করছ? ভারী খচ্চর তো লোকটা।'

ঠাকুরের মুখখানি বেশ পালিশ দেওয়া। শ্রীমুখের বচনে কোনো রাখ-ঢাক নেই। গাজীটা নিতান্তই পাজী। এমন একটা রুষ্ট গলার গালাগাল শুনে আমার হাসি সামলানো দায় হলো। কিন্তু আঙুরির সে দায় নেই। সে গাজীর দিকে চেয়ে গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। এ সময়ে কেমন যেন রঙ্গিনী রঙ্গিনী লাগে এই আঙুরকে। মধ্যঋতু আশ্বিনেও শরীরের বাঁধুনিটি কোথাও টাল খায়নি। এখনো যত টান, তত অধরা অকূল। লাল শাড়ির বাঁধনে তাকে ধরে রাখা যায় না যেন। অনাবাদী জমি কিনা, এ দেহ এখনো বন। দেখলে ঠাহর হয়, এ মৃত্তিকা ভেদ করে ফসল ফলেনি, ছাঁদ-ছন্দ গড়েনি, তাই সে বন্য। একটু বাতাস লাগলেই এমন দুলে ওঠে, না জানি কত প্রাণে তুফান লেগে যায়। তখন টের পাওয়া যায় না, এ শরীরে এক মেয়ে কাঁদে মা হবার জন্যে। তার ওপরে, ধূমপানের নেশা থাকলেও গলাখানি মেরেলী মিষ্টতা হারায়নি। বরং আঙুরির খিলখিল হাসি যেন কেমন এক মোহ ছড়িয়ে দেয়।

সন্দেহ হয়, গাজীও গলা খুলে হাসতে চায়। ঠাকুরের রোষ দেখে থমকে যায়। বলে, 'আহা, আপনি বলবেন কেন, আমিই তো বলছি। তয় চুপ দিয়ি থাকি, আর কিছু বলব না।'

বলে গাজী অন্য দিকে তাকায়। মাহাতো বলে, 'তুমিও যেমন হয়িছ ঠাকুর। ওর কথায় এত রাগ করলি হয়। নাও, আমাদের হয়েছে আড়াই টাকা না কী?'

নারাণের রাগ তখনো যায়নি। বলে, 'না, দেখ তো মাহাতোদা, এমন এক একটা কথা বলে, আমার পিত্তি জ্বলে যায়। যত সব বাজে প্যাচাল পাড়ে।'

গাজীর গলায় তখন সেই গাওয়া গানের গুনগুনানি, 'যেজন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা...।'

মাহাতোর হাত থেকে ঠাকুর তখন পয়সা নিতে নিতে বলছিল, 'তোমার কি আর হিসাবে ভুল হবে মাহাতোদা। আড়াই টাকাই হয়েছে।'

কিন্তু সে কথা শেষ হবার আগেই গাজীকে সে আবার খেঁকিয়ে ওঠে, 'আরে রাখো তোমার লেনাদেনা। তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে আমি একেবারে মরে যাচ্ছি কি না।'

গাজী বলে, 'এইটা আবার কী বলেন ঠাকুরমশায়। আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যি আপনি মরবেন কেন। তা বলি না। তয়, "প্রেম আছে কোন্‌খানে? প্রেম তোমার মনে মনে।" প্রেম আপনার আমার সকলের মধ্যি আছে। আপনি প্রেমের ভাব জানেন না, তাই কি আমি বলতি পারি। ছি মুরশেদ! ছি!'

মাহাতোর দেওয়া টাকাও কষিতে গুঁজতে গুঁজতে ঠাকুর রুষ্ট চোখে ঠোঁট উলটায়। কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু আঙুরির হাসি যে অধরা। সে হাসতে হাসতে বলে, 'গানটা শোনাও না।'

গাজী গান ধরবার আগেই আসে ফোঁচার বউ। কোলে সেই ছেলেটি আছে। তবে ধৎসরে জন্যে বুকখানি মাঠের মতো খোলা নয়। ডুরে শাড়ির ঢাকা আছে সেখানে। সে দু' খিলি পান বাড়িয়ে ধরে নারাণঠাকুরের দিকে। ঠাকুর পান নিয়ে বলে, 'দোক্তা আনলি?'

ফোঁচাকে বলে তুই, তার বউকে বলে তুমি। বলতেই হয়, স্ত্রীলোক তো। বউ বাঁ হাত থেকে, ডান হাতে দোক্তা নিয়ে ঢেলে দেয় ঠাকুরের বাড়ানো হাতে। বউটির মুখেও পান, পিকের ধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঠোঁটে তার রক্তাভা লেগেছে। এ সময়ে আঙুরি তার দিকে তাকায়। বউটি পান সামলে, ঠোঁট টিপে একটু হাসে। মাহাতো চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'বাঃ, খালি ঠাকুরই পান খাবে, আমরা খাবো না?'

বউ তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঁচল তুলে বলে, 'খাবেন, সেজে নিয়ে আসব?'

মাহাতো হেসে বলে, 'এমনি বললাম, এই তো খেলাম।'

গাজী তখন গান ধরেছে,

> 'কানা চোরে চুরি করে
> ঘর থাকতে সিঁদ কাটে পগারে
> শুধু বেগার খেটে মরে
> কানার ভাগ্যে ধন মিলে না।
> তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।'

গান থামিয়ে গাজী ডুপ্‌কিতে আস্তে আস্তে তাল দেয়। আঙুরির দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসে। আঙুরি তো হেসেই আছে। আমি দেখি, নারাণঠাকুরের মুখ। সে মাথা নামিয়ে, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে, পান চিবুতে থাকে। সন্দেহ লাগে, গাজীটা আবার দুষ্টামি করে। এবার ডুপ্‌কি না থামিয়ে, তাল দিতে দিতেই গায়,

> 'নিমগাছ করিয়ে রোপণ
> শত ভার দুগ্ধ সিঞ্চন—
> তবু কী তার স্বভাব যায় দূরে
> ভিতরে মিঠা ঢুকতে পায় না
> যেজন প্রেমের ভাব জানে না।...

ওরে, উল্লুকের হয় উদ্‌ধ্ব নয়ান
সে দ্যাখে না সুয্যিকিরণ
(অথচ) দ্যাখ, পিঁপড়েতে পায় চিনির মর্ম
রসিক হলে যাবে জানা।
যেজন প্রেমের ভাব জানে না...।'

গান তখনো শেষ হয়নি, নারাণঠাকুর উঠে দাঁড়ায় খাড়া। ডিগডিগে শরীরে, পেটটি এখন একটু আগে বেড়ে এসেছে। তার ওপরে পইতাগাছি। নইলে বলা যেত, তলোয়ার খাড়া হলো। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, 'তোমার ওই ছাতার গানের মর্মও কেউ বুঝবে না। গান না শালা বাচ্‌লামি।'

বলে সে দরজা দিয়ে ভিতরে চলে যায়। আর একটু হলে ধাক্কা লেগে যেতো ফোঁচার বউয়ের সংগে। বউ একটু অবাক হয়ে সকলের দিকে তাকায়। তারপর সেও ঠাকুরের পিছু পিছু চলে যায়। ইতিমধ্যে আঙুরি হাসিতে ঢলে পড়ে।

গাজীর চোখে দেখি ঝলক, অথচ যেন বড় মনোকষ্টে বলে, 'ঠাকুরমশায় আমাকে দু' চোখি দেখতে পারেন না।'

মাহাতোও হাসে। হেসে বলে, 'তুইও বড় ব্যাদ্‌ড়া গাজী। ঠাকুর চটেই বা কেন।'

মাহাতোর গলায় যেন কেমন স্নেহ ঝরে পড়ে। গাজী বলে, 'ওই যে দ্যাখ, উনি ভাবেন কি যে, আমি বুঝি ওঁয়ারে শুনিয়ে গাচ্ছি।'

মাহাতো বলে, 'তাই তো গাস্‌।'

গাজী হাত জোড় করে, 'মুরশেদের নাম করি বলছি চাচা, তা গাই না। একটা কথা জানবে চাচা, যা গাই তা নিজির জন্যি, নিজিকে শুনিয়ে গাই। তয় হ্যাঁ, বলতি পার কি যে, ঠাকুরমশায়কে দেখলি অনেক গান মনে পড়ি যায়।'

আঙুরি তৎক্ষণাৎ হেসে ওঠে। সংগে সংগে বলে, 'আর একখানা গাও।'

মাহাতো তৎক্ষণাৎ হাত তুলে বলে, 'না, আর না। উদিকি দ্যাখ, রোদ কখন চলি গেছে, এবার হাঁটা দেবো।'

বলতে বলতে সে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে ঘরের ভিতরেই তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর চাদর ছিল। এগিয়ে গিয়ে চাদরটাকে আগের মতোই কোমরে বাঁধে। ব্যাগ হাতে তুলে নেয়। বলে, 'নেহাত জ্যোছ্‌না ফুটবি, সেই আশা। নইলি অন্ধকারে চলা দায় হতো।'

গাজী বলে, 'তা চাচা, হাঁটা ধরবে কেন। গাড়ি আসতি বলো নাই?'

'না, তা আর বলতি পেরিচি কই। আসবার দিনক্ষণ ঠিক ছিল না। তারকেশ্বরে তিন দিন কেটি গেছে। তারপরে ভেবিছিলাম, কালীঘাটে যাবো। এ যাত্রা আর তা হলি না। কাজ কম্‌মো অগাধ পড়ি রয়িছে।'

যত ভাবনা, সব যেন গাজীর। বলে, 'যেতি পারবে জানি, তা হলিও ভোলাখালি তক যাওয়া, দু' কোশ রাস্তা।'

মাহাতো বলে, 'চলি যাবো ঠিক। তবে মাজাটা আজকাল একটু একটু ব্যথা করে।'

এ গাড়ির প্রসংগ নিশ্চয় গরুর গাড়িই বোঝায়। কিন্তু এই প্রথম যেন টের পাওয়া গেল, মাহাতোর বয়স হয়েছে। চুলে তেমন পাক ধরেনি। মস্ত কালো মুখখানি, লাল চোখ, শরীরের বাঁধুনি দেখলে এমনি হঠাৎ টের পাওয়া যায় না। তবে এ রোদ এখন পশ্চিমে ঢলে গিয়েছে। মাহাতোর কথাটাই আবার মনে পড়ে, 'এদিকে বেলা যে যায়।'

ইতিমধ্যে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। অজানা গাছের ছায়া কখন চারদিকেই দিন-শেষের ছায়ায় নিবিড় হয়ে এসেছে, খেয়াল করিনি। যদিও সন্ধ্যা বলা যাবে না, তবে আসন্ন সন্ধ্যা। রোদের চিহ্ন নেই। এই দাওয়াতেও ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। হাত তুলে

ঘড়ি দেখি, পাঁচটা বাজতে দেরি নেই।

মাহাতো আমার দিকে ফিরে বলে, 'আপনিও উঠলেন? যাক, আপনার সঙ্গেও দেখা হয়ি গেল। তা, আজ আপনার থাকা হবি কমনে?'

থাকব কেন। নিজের কাপড়ের ঝুলি সামলাতে সামলাতে বলি, 'থাকব না, এবার ফিরব।'

মাহাতো তার কোকিল চোখে একটু যেন অবাক হয়ে তাকায়। বলে, 'কোথায় কমনে ফিরবেন।'

জবাব দেয় গাজী, 'বসিরহাট। বসিরহাট থেকি বাবুকে কলকাতার মোটর ধরিয়ি দেবো।'

মাহাতো বিস্ময়ের ঝোঁকে তার কাঁধের শহুরে ঝোলাটাই নামিয়ে ফেলে। আঙ্‌রির দিকে চেয়ে বলে, 'অই দ্যাখ্‌ আঙ্‌রি শোন্‌, মাকড়াটা বলে কী। বসিরহাট যাবি কেমন করি তুই?'

আমার বুকটা ধক করে ওঠে। গাজী নির্বিকারে বলে, 'কেন, ওপারে নাজাটের মোটরে করি যাবো।'

মাহাতো শরীর দুলিয়ে, মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ন্যাজাটের মোটর তোমার মুরশেদের গাড়ি কি না, সে এখনো বসি আছে। তার তো চারটেয় চলি যাবার কথা। তাও—।'

কথা শেষ হয় না তার। গাজীর আরশি-চোখে এই প্রথম দেখি ঝলক খেলে না। গোঁফদাড়ি সহ গোটা মুখখানি চুপসে যায়। কেবল মুখ দিয়ে আওয়াজ আসে, 'অ্যাঁ?'

কিন্তু আমার শুধু বুক ধড়াসে যায় না। হঠাৎ যেন অগাধ জলে পড়ে যাই। দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে যায়। সহসা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। ভুলে যাই কোথায় এসেছিলাম, কেন এসেছিলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই অচেনা দিগন্ত। আর মনে হয়, কেউ যেন আমাকে স্বজনহারা করে নির্বাসনে ফেলে দিয়ে যায়। আমি গাজীর দিকে তাকাই।

মাহাতো আরো বলে, 'তাও কি, ন্যাজাট থেকি বসিরহাটের রাস্তা তোমার জন্যি একেবারে পাতা হয়ি পড়ি আছে নাকি? তবে আমি মরতি হাসনাবাদ থেকি লঞ্চে এলাম কেন?'

গাজী চোপসানো গলায় বলে, 'কেন?'

মাহাতোর সাক্ষী সেই আবার আঙ্‌রি। বলে, 'অই শোন্‌ আঙ্‌রি। গাজী গুয়োটার কথা শোন্‌। রাস্তা ভাঙাভাঙি হচ্ছে আজ দু' হপ্তা ধরি। সারা দিনি দু'তিনবার যাতাত্‌ হয় কিনা ঠিক নাই, উনি এখন বাবুরে নিয়ি বসিরহাট রওনা দিচ্ছেন।'

মাহাতো যত বলে, তত আমার বুক শুকোয়। বিদেশ বলে ভয় নেই। কিন্তু এই ভেড়ি বাঁধের সীমানায়, মানুষখেকো কামটের আবাস নোনা গাঙের কূলে, বাদার গঞ্জে, কোথায় বা আশ্রয়, কোথায় রাত্রিবাসের ঠাঁই। দূরে চেয়ে অচেনাকেই ভয় বেশী। আমি দিশেহারা চোখে একবার গাজীর দিকে চাই, আর একবার মাহাতোর দিকে।

গাজীর আরশি-চোখ যেন কাঁচের মতো ধোয়া, তাতে ছায়া খেলে না। বলে, 'তা হলি?'

হঠাৎ দেখি, আঙ্‌রি হেসে ওঠে। একবার চোখ তুলে তাকায় আমার মুখের দিকে। তারপর গাজীকে বলে, 'তা হলি আবার কী গো, এ দেশে কি মানুষ থাকে না?'

এ হাসির একটা গুণ আছে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে, কেমন যেন ভরসা হয়ে বাজে। কথার মধ্যেও তাই। মন না মানুক, তবু ভুলে যাই কেন, এ দেশেও মানুষ বাস করে।

ঘোমটার ফাঁক থেকে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আঙুরি বলে, 'তোমার বাবুকে নিয়ে না হয় ভোলাখালি চলো।'

ভোলাখালি! দুই কোশ দূরে! তার চেয়ে তবু জানি, গাঙের কূলে আছি, যখনই হোক লঞ্চ পেয়ে যাবো। কিংবা, খেয়া পার হলে ন্যাজাট। মোটর না যাক, রাস্তা তো আছে। আমি বলে উঠি, 'তার চেয়ে বরং ওপারে যাই, গিয়ে দেখি যদি বাস থেকে থাকে।'

যেন অসহায়ের তৃণকুটার আশ্রয়, বাস্তবের খেয়াল থাকে না। মাহাতো আর তার বউ, দু'জনেই হেসে ওঠে। মাহাতো বলে, 'পাগল হলেন নাকি মশায়। বাস চললিও চারটের সময় বেরিয়ে গিয়েছে। তবে যদি গরীবির বাড়ি যেতি চান, চলেন। গোলপাতার ঘরে দুটো ডাল ভাত খেয়ি থাকবেন।'

শুনে আমার উদ্বেগ আরো বাড়ে। আমি যেন দেখি, আমার ডিঙা চলে যায় বুড়ীগঙ্গার দিকে, আমি তাকে ধরে রাখতে পারি না। আমি যাত্রা করেছি, যে যাত্রা আমার অচিন কূলে আছে। ফেরা আমার হাতে নেই। সেই ছেলেবেলার বুড়ীগঙ্গা আমাকে সারা জীবনে কখনো ছেড়ে যায়নি।

যখন আশা যায়, তখন আচ্ছন্নতা আসে। ভুলে যাই পাত্র পরিবেশ। কয়েক মুহূর্ত যেন কোনো এক অচৈতন্যের অন্ধকারে ডুবে যাই। আমার যাত্রা নিরুদ্দেশের পথে নয়। তবু যেন নিরুদ্দেশের পথ আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

গায়ে হাতের স্পর্শে সংবিৎ ফিরে পাই। মাহাতো আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ফিরে তাকাতেই সে বলে, 'অ মশায়, আপনি যে সত্যি সত্যি জলে পড়ি গেছেন বলি মনে হচ্ছে গো। এত উতলা কেন। ফিরতি না পারলি কি অনেক ক্ষতি হয়ি যাবে!'

ক্ষতি? কই, তেমন কোনো ক্ষতির দায় তো রেখে আসিনি পিছনে। সময়ের হিসাবে একটা রাত্রি, কত আর ক্ষতি করতে পারে। তবে, সেই যে কথা, মন গুণেই ধন, তাকে নিয়ে বিড়ম্বনা। মনে মনে গড়ছি এক, ঘটনা ঘটে অন্যরকম। তাতেই ঠেক খেতে হয়। কিন্তু, তিনজনেরই মুখের ভাব এমন হয়েছে, যেন সবাই আমার কাছে কী ধার ঠেরে বসে আছে। গাজীর দাড়ির গোছা মুঠি পাকিয়ে ধরা, মুখখানি নত। মাহাতো-বউ আঙুরি আমার দিকে তাকিয়ে। নজর করে দেখ, সেই হাসিটুকু নেই এখন মুখে। বরং কাজল-কালো ডাগর চোখ দু'টিতে একটু যেন উদ্বেগের ছায়া। তার সঙ্গে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। মাহাতোর লাল চোখেরও সেই ভাব। তাড়াতাড়ি বলি, 'না, ক্ষতি আর কী। ফিরে যেতে পারব বলেই ভেবেছিলাম কিনা। যাই হোক...।'

কথা শেষ করতে পারি না। মাহাতো বলে ওঠে, 'না, আপনার অবস্থা দেখি আমরা চিন্তায় পড়ি গেছি। ভাবি, কী বলে, কী জানি, ফিরতি না পারলি ভদ্দর-লোকের আবার ক্ষতি-টতি হয়ি যাবে কিনা।'

আঙুরি আওয়াজ দেয়, 'আহা, ফিরে যাবার উপায় নেই, ও কথা ভেবে কী হবে।'

'সে কথা ঠিক।' মাহাতো বলে, 'তা হলি, শোনেন বলি, আমার বউও বলছে আপনি ভোলাখালিতিই চলেন।'

আমার জবাবের আগেই আঙুরি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তবে, শহুরে মানুষ, হাঁটা অভ্যাস নেই। কষ্ট হবে কিন্তু।'

এর থেকে কী বোঝা যায়, বুঝি না। আঙুরি যেতে বলে, আবার কষ্টের কথাও স্মরণ করায়। যদিও দূর বলে হাঁটার ভয় পাই না। কিন্তু কূল ছেড়ে যেতে আমি নারাজ। সময়ের হিসাবে যখন এক রাত্রিকে আমি অকূলে ছেড়ে দিতে পেরেছি, তখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধান আর আমার নেই। এই হাটে যে ভোঁড় বাঁধে, কোথাও এক রাত্রি কেটে যাবে। জানি, আসন্ন এ রাত্রি চিররাত্রি নয়। সে আঁধার নিয়ে নামে আবার দিনের আলোয় হারাবে বলেই। সূর্য কেবল ছায়াকে আলিঙ্গন করে থাকে না। ঊষায়

তাদের ছাড়াছাড়ি। ছায়া তখন বিরহিণী। মন একবার পিছন ফিরে দেখুক, এমন কত রাত্রি কত অকূলে ভেসে গিয়েছে। জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এবার আমি সোজাসুজি আঙুরির দিকে তাকাই। বলি, 'দু' ক্রোশ হাঁটতে পারি, তাতে ভয় পাই না। কিন্তু রাত পোহালে আবার তো ফিরতে হবে এখানেই।'

জবাব দেয় মাহাতো, 'হ্যাঁ, তা ফিরতি হবে। তবে যদি আপনি সন্দেশখালির ওদিক দিয়ি ফিরতি চান, তা হলি আর...।'

মনে মনে বলি, 'না, ভোলা বা সন্দেশ, আর কোনো "খালি"-ই দরকার নেই। তার চেয়ে এই কালীনগর থেকে ফেরাই ভালো। এ যাত্রায় আর কোনো অজানাতে নয়। বলি, 'না, থাক মাহাতো মশাই, এখানেই রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেবো।'

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি, মাহাতোর ঘোমটা-টানা বউটির মুখে একটু ছায়া, তবু হাসতে চায়। বলে, 'রাত তো ভোলাখালিতেও কাটানো যায়।'

মনেতে যে অবাক মানি না, তা বলব না। আলাপ-পরিচয়ের চৌহদ্দি বাদ দাও, সোজাসুজি কথা যার সঙ্গে নেই, সেই এক মাহাতো-গিন্নী এমন অবলীলায় ডাকে কেমন করে। মাহাতোর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর্থিক অবস্থা জানতে বাকী নেই। এমন কর্তার কর্ত্রীকে যে স্বাধীন জেনানা ভাবব, তা পারি না। স্বৈরিণী বলার সাহস ক'রো না। এই মাত্র জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী মানত করে ফিরছে তারকেশ্বর থেকে। অথচ ঝিলিক ঝলক যা-ই থাক, আঙুরের চোখে কোথাও ছলনার 'ছ' নেই, চাতুরির 'চ নেই। যেন এক ছোট অবুঝ মেয়ে আবদার করে, যার সমাজ-সংসারে দায়-দায়িত্বের বোধ নেই।

মাহাতো হেসে উঠে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'অই এক ওর দোষ, বুইলেন, লোকজনের হাল-হদিস বোঝে না সবাইকি নিয়ি টানাটানি। বাড়ি যেয়ি দ্যাখেন, আজ এই, কাল সেই, লেগিই আছে। তা হলিই কি তোমার সব ফাঁক ঘুচি যায়?'

বলেই মাহাতো টেনে টেনে হাসে। কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকায় না। আর সহসা আমার মনে পড়ে যায়, এ অনাবাদী জমি, এ দেহ বন, একটু বাতাসেই বড় দোলা লেগে যায়। পিছনে আছে এক শূন্যতা, সেখানে আছে কান্না। তোমাকে যে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেই ডাক আসে শূন্যতা থেকে। তা বলে কি অজানা অচেনা ভালো-মন্দ নেই। হেসে বলি মাহাতোকে, 'কিন্তু আমাকে আর কতটুকু চেনেন যে, বাড়ি নিয়ে যেতে চান।'

মাহাতো মুখ খোলবার আগেই দেখি, আঙুরি তার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়ে হাসে। বলে, 'কেন, আমরা কি মানুষ চিনি না। আমাদের আবার ভয় কি! গাজীর বাবুর যেমন ভয় দেখলাম, তাতে বাবুকে আর ভয় পাই না। আমরাও মানুষ চিনি।'

বলে আঙুরি একবার ফেরে গাজীর দিকে, আবার দেখে আমার দিকে। সারল্যেও যে কেমন রঙের ঝিলিক হানে, তা এই আঙুরিকে না দেখলে সবটুকু জানা যায় না। তোমার মনে আঁধার যত থাকুক, তার দায় তোমার। যে বহে যায় অনাবিল স্রোতে, সে যায় আপন প্রাণের টানে। তাতে তুমি যা-ই ছুঁড়ে দাও, সে থামে না। তার ঝলক হারায় না। তাই, ওই চোখ দু'টির দিকে চেয়ে যে কেবল কৃতজ্ঞতা মানি, তা নয়। প্রাণের সাহস দেখে এই বিড়ি-খাওয়া মাহাতো-বউটিকে কেমন যেন শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। শুধু, তা-ই বা কেন, অকূলে হারানো আমার প্রাণে কী এক সুর যেন বাজে। সুরের উৎস যেখানে, সেই চোখ দু'টিতে দেখি, বন্ধুত্ব বাজে কালো তারায় তারায়। তার নিরালা মনে অজস্র বন্ধুর ডাক। সে কেবল আপনাকে ভরে না। যেন বলে, 'যদি কিছু থাকে, এস, তা দিয়ে তোমাকেও ভরিয়ে দিই।' সে কেবলই ফাঁক ভরাতে চায়। সে

নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে চায়, অকূলের মানুষকে কূল দিতে চায়। যদি তার ঘরে গিয়ে দেখ, ঘর ভেঙে যাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখিকে সে কোলে বসিয়ে দানা খাওয়ায়, কোথাকার হারিয়ে যাওয়া ছাগল-ছানা তার ঘরে বৃদ্ধি পায়, স্বজন-ছাড়া কূল-হারানো ছেলেমেয়ে যত্নে মানুষ হয়, তবে অবাক হয়ো না।

আঙুরির চোখের দিকে চেয়ে, হেসে অপরাধ ভঞ্জন করি। বলি, 'বুঝেছি। কিন্তু সে কথা থাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে ভোলাখালির পথে হেঁটে সঙ্গে যাই, একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

এবার আঙুরি ঘোমটা টানে। তার চেয়ে বেয়াজ দেখ, তার মুখ ভার হয়ে আসে। বলে, 'ঘরের লোকেরা ঘরে যাবে, তাদের আবার এগিয়ে দেবার কী দরকার। পথ আমাদের চেনা।'

গাজী এতক্ষণ হাসতে ভরসা পায়নি। তবু না হেসে যে পারে না। বলে, 'না চাচী, বাবু সে কথা বলেন নাই।'

'তুমি আর বাবুর কথা বুঝিও না গো।'

কথাটা বলে ভারী মুখে। তারপরে হঠাৎ হেসে বলে, 'নিয়ে যেতে পারতে বাবুকে, তা হলে সারা রাত বসে বসে তোমার গান শুনতাম। তোমার বাবুকে বলো, কাল সকালবেলা জোয়ান মোষের গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেবো, ভয় নেই।'

যে অবস্থায় ঠেকেছি, ভয় বলো, দ্বিধা বলো, সেই অবস্থাকে। মন যেন অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছে মাহাতো দম্পতির সঙ্গে। মনের এই গতিতে কোথায় যেন নিজেকেই অপরাধী বোধ হয়। আঙুরির চোখে এখনো আশা ঝিলিক দেয়। এতই দুর্ভাগ্য, পথের ধারে পড়ে পাওয়া এমন নিমন্ত্রণ মাথা পেতে নিতে পারি না। সহজ হওয়া এত সহজ নয়। প্রাণে কত শক্তি থাকলে এমন সহজ হওয়া যায়, অল্পক্ষণের দু'-চার কথার আলাপেও, রাগের দাবি করে। আঙুরি যেন সত্যি আঙুর। তেমনি করেই সে সহজ। এখন তার প্রাণে যে সুধা আছে, তার মধুর গন্ধ, তা চাও কি না, পাও কি না, সে খবর সে চায় না। সে তার আপন রূপে, আপন ধর্মে, দোলদোলায়, টস্‌টসায়। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারি না।

মাহাতো বলে ওঠে, 'নে, তুই আর মানুষকে ত্যক্ত করিস না। কিন্তু, যাবার আগে তা হলি একটা ব্যবস্থা করি যেতি হয়।'

এবার গাজী উৎসুক চোখে তাকায় মাহাতোর দিকে। মাহাতো আমার দিকে চেয়ে বলে, 'আমি বলি কি, আপনি এখেনেই থাকেন। কাজে কম্মে আটকি গেলে অনেকদিন নারাণঠাকুরের এ ঘরে থেকিচি। বিছানাপত্তর, দড়ির খাট, সবই আছে, মশারিও পাবেন। কোনো ভয় নাই, মেলাই টাকা-পয়সা নিয়ি এখেনে থেকিচি আমি। রাত্তির দুটো গরম ভাতও জুটবি খনে। একটা রাত্তির তো মামলা।'

আমাকে গাজীর দিকে ফিরে তাকাতেই হয়। মিথ্যে বলব না, লোকটার ওপর কখন থেকে যেন বিরক্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছিলাম। না জেনে সে কেন এমন জায়গায় এনে ঠেকালে। কিন্তু, ইচ্ছে করে নয়। সে তার জানামতই মতলব দিয়েছিল। তবে মুরশেদ যদি গোলমাল করে তার কী উপায় আছে। তার অপরাধের ভাব দেখে বুঝেছি, এতক্ষণ ধরে সে তার মুরশেদের কাছে মনে মনে কপাল কুটে মরেছে।

গাজী মাহাতোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এর চেয়ে আর ভালো কিছু হয় না।'

না, নারাণঠাকুরের ঘরের দিকে চেয়ে দেখব না। গর্ত দিয়ে ইঁদুর ওঠে কিংবা ডেয়ো পিঁপড়ে রাতভোর গায়ের মাংস চিবিয়ে খাবে, সে ভাবনা ভেবে লাভ নেই। তবু লোকটাকে একটু-আধটু বোঝা গিয়েছে। ক্ষণেকের হলেও তার ঘরে খেয়েছি, তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক বুঝতে পারি। নতুনের থেকে এই পুরনোই ভালো। আর কোথাও নয়।

মাহাতো একটু হেসে আবার বলে, 'তবে এই হাটে-গঞ্জে রাত কাটাবার জায়গার অভাব হবি না। সে জায়গাতি হাটুরে বাটুরে জন মহাজনরা আপনা থেকিই চলি যায়। তা বলি আপনাকে তো সে পথ দেখাতে পারি না।'

বলেই হাঁক দিয়ে ডাকে, 'কই হে ঠাকুর, গেলে কম্‌নে?'

মাহাতোর কথার মধ্যে যে কথা, হঠাৎ তা ধরতে পারি না। কেবল গাজী বলে ওঠে, 'তোবা তোবা।'

এদিকে দেখি, আঙুরি যেন চোখ পাকিয়ে তাকায় মাহাতোর দিকে। অনেকটা নিঃশব্দে মুখ ঝামটা দেবার মতো মুখ ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে চোখ ফেরায় গাজীর দিকে। গাজী যেন বড় লজ্জা পায়, বলে, 'চাচার কী কথা বলো দিকিনি।'

আঙুরির পান খাওয়া লাল ঠোঁট দু'টি একবার বেঁকে যায়। নিচের ঠোঁটটি তারপরেই উলটে যায়। দৃষ্টি উদাস। যেন এসবে তার কিছুই যায় আসে না। তাই সে চুপচাপ।

'দেখি, ঠাকুরটা আবার গেল কম্‌নে।' বলতে বলতে মাহাতো যায় ঘরের ভিতর। কিন্তু তার প্রকাণ্ড কালো মুখে, মোটা মোটা ঠোঁটে হাসি একটু লেগেই থাকে। ততক্ষণে আমি যেন মাহাতোর কথার মধ্যে কথাটির ইশারা পেয়ে গিয়েছি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুকুরধারে দুলিদের ঘরগুলো। হাটুরে বাটুরে জন মহাজনেরা যে কোথায় রাত কাটাতে যায়, তারপরে আর স্পষ্ট করে না বললেও চলে। অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাহাতোর হাসিতে, গাজীর তোবা তোবা আওয়াজে, আঙুরির ভ্রূকুটি বিরক্তিতে। মাহাতো রসিকতা করে বলেছে বটে, তাতে চেনাজানার বাস্তব অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। বিশ্ব-সংসারের এই কালের এই নিয়ম। তাকে নির্দয় বলো, রুচিহীন বলো, মানুষের নিজের হাতে গড়া নিয়ম। ভোজনাগার পান্থশালার সঙ্গে সঙ্গে সে বারোবাসর ছড়িয়ে রেখেছে। তাতে আপনাকে সুখী করতে চেয়ে আমরা কোথায় কালি মেখেছি, তা দেখা যাবে নিজের মধ্যে এক অচিন আয়নাতে। মাহাতোর কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করি। আর যা-ই করুক, সে আমাকে সে পথ দেখাতে পারে না। এইটুকু তার বিশ্বাস।

কিন্তু মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে আঙুরির দিকে চেয়ে। হয়তো তার মতো একটি আত্মীয়া থাকা অসমীচীন ছিল না আমার। বউদি কিংবা অন্য কোনোরকম। সেরকম কিছুই নয় সে। অথচ দেখ, মানুষের প্রাণের টান তাকে কোথায় নিয়ে যায়। কেবল সম্পর্কের কথা মেনেছি। কিন্তু সম্পর্ক গড়ে ওঠার কত যে বিচিত্র বিস্ময় রহস্য, সময়ের আশ্চর্য মাপজোক, তা যেন এমন করে জানা ছিল না। এখন মনে হয়, আঙুরির সঙ্গে আমার কোথায় একটা চেনাচিনি হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে তার যেন কী এক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সে সম্পর্কের কোনো নাম নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। যে সম্পর্কের খোঁজ পাবে না এই সমাজের শাস্ত্রে বিধানে। এতে তুমি যে রঙই মাখাতে চাও, রঙ ধরবে না। এই পরিচয় আছে অচিনে বিচিত্রে।

কিন্তু আঙুরি এমন মুখ ভার করে থাকলে ভালো লাগে না। তার চোখের ঝিলিক আর খিলখিলে হাসি এতক্ষণ সব কিছুকে সজীব করে রেখেছিল। তার পিছন ফেরানো মুখের দিকে চেয়ে বলি, 'যেতে পারলে সত্যি বেশ ভালো লাগত।'

আঙুরি আমার দিকে তাকায় না। তাকায় গাজীর দিকে। যেন সে তাকে কিছু বলেছে। গাজীর দিকে চেয়ে সে গাজীকেই বলে, 'পথের মানুষকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া তো আমার কাজ নয়। তবে এই কেমন যেন মনে হলো, তাই।'

গাজী যেন কেমন অসহায় হয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার চোরা চোখে দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, সেই তো কথা।'

কথা যে কোন্‌দিকে মোড় নেয় ধরতে পারি না। তবে এটা বুঝতে পারি, আর

মুখোমুখি কথা নেই। যা বলা-কওয়া আছে, এখন তার সাক্ষীগোপাল গাজী। সে হচ্ছে মধ্যবর্তী মানুষ। কিন্তু পথের মানুষ ঘরে ডেকে নেওয়া যে মাহাতো বউয়ের কাজ নয়, সে কথা এমন করে শোনায় কেন। এতক্ষণ তাকে কি সেটুকুও বুঝতে পারিনি? বলে উঠি, 'আমি সে সব কিছু ভাবিনি।'

কিন্তু আঙুরি যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। সে গাজীর দিকে চেয়ে আগের মতোই বলে, 'তোমার বাবুরে, তখন থেকে দেখছি কি না, কেমন যেন মনে হলো। তাই ভাবলাম, এখানে কোথায় কী ভাবে থাকবে, সেইজন্যে বলা। তা বলে তোমার বাবু যা ভাবছে, তা নয়।'

বলে, এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় আঙুরি, যেন আমার বুকে বিঁধিয়ে যায়। আমাকে খাটো করে দেয়। তার কথার ইঙ্গিতটা আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অথচ অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না, সে ভুল ভেবেছে। আমি কিছু বলবার আগেই গাজী বলে ওঠে, 'না চাচী, আমার বাবু তা কিছু ভাবে নাই, সেটা হলফ করি বলতি পারি।'

আঙুরি মুখ ফিরিয়ে বলে, 'মিছা কথা ব'লো না।'

হয়তো বিশ্ব-সংসারের এটাই নিয়ম। মন যখন অবুঝ হয়, তখন সে আর অপরকে বুঝতে চায় না। আঙুরির নিমন্ত্রণে সৌভাগ্য মেনেছি। এখন সে আমাকে অভিযুক্ত করে, কাঠগড়াতে দাঁড় করায়। যে অভিযোগে আছে একটা অসম্মানের ছোঁয়া। আমার রুচি নিয়ে টানাটানি। কিন্তু সব কিছুই আমার মনের মতন হবে, তাই বা কেন ভাবি। সব কিছুই হাসি কথায় টলটলিয়ে যাবে, এমন আশা কেন। তবে একটুখানি বেঁধে। বেঁধে বিঁধুক। মন যে সবার সমান নয়, মানবজীবনের সেই তো এক সৌন্দর্য। কাল সকালের জোয়ারে অনেক কিছুই ভেসে যায়। হয়তো পলির নিচে থেকে যাবে কিছু। তবু পথের দেখা পথেই শেষ হবে। যেটুকু আমার, সেটুকু আর কেউ নেবে না। আঙুরি আমার কাছে যা, তাই থাকবে। কিন্তু না বলে পারি না, 'গাজী কিন্তু মিথ্যে বলেনি। তবে জোর করে তো কাউকে কিছু বিশ্বাস করানো যায় না। আমিও একটু-আধটু মানুষ চিনি।'

গাজী অমনি বলে ওঠে, 'শোনো, চাচী শোনো, বাবুকে আমার চিনতি পারো নাই। একবার চোক তুলি দ্যাখ দি'নি।'

আঙুরি চোখ তুলে দেখে না। সে আশা আমি করি না। বরং ফিরে তাকাই ঘরের দিকে, নারাণঠাকুরের আশায়।

গাজী কিন্তু বলে যায়, 'আর তুমি হলি মা দুগ্‌গো, তোমাকে কি আন্ ভাবা যায়!'

বলে আমাকে ডেকে বলে, 'জানেন বাবু, চাচী আমার ডাকাত হত্যে করিছে।'

হত্যা করেছে! ফিরে তাকাই গাজীর দিকে। গাজীর আরশি-চোখে আলোর ঝলক, ফাঁদ বড় হয়ে ওঠে। বলে, 'তিন বছর মামলা চলিছিল বাবু, জানেন। তা হবি পেরায় আট ন' বছর আগের কথা। মাহাতো চাচার ঘরে ডাকাত পড়িছিল। তা, খালি যে টাকা লোটার মতলবে তারা এসেছিল, তা নয়। চাচীকেও ধরি নিয়ি যেতি চেয়িছিল। চাচীর হাতে তখন কাটারি। একেবারে এক কোপেতে বলো হরি হরি বোল্। একটার মুন্ডু গিয়িছিল আধখানা, আর একটার গোটা হাত। চাচীর সেই মূর্তি দেখি, বাছাধনদের আর কুক্ পাড়তি হয় নাই। টাকা-পয়সাসুদ্ধ মরা আর আধমরাগুলোরে ফেলি দে দৌড়।'...

গাজীকে বাধা দিয়ে মুখ না ফিরিয়েই যেন লজ্জা পেয়ে আঙুরি বলে ওঠে, 'আহ্, চুপ করো দিকিনি।'

গাজীর কথা শুনতে শুনতে চোখ পড়ে গিয়েছিল রক্তাম্বরীর দিকে। এ কালো

মেয়ে যে সত্যিই শ্যামা সর্বনাশ্য, তা একবারও ভাবিনি। দেবীকাহিনী শুনেছি, কালী দুর্গার প্রতিমা দেখেছি। তাতে আমার কাজ-অকাজের জীবনে তেমন ঢেউ লাগেনি। কিন্তু আমি যেন চর্মচক্ষে সেই কাহিনীর নায়িকাকে দেখি। রূপান্তরে সেই প্রতিমা আমার সামনে। মনে থাকে না, বন্ধ্যা নারী মানসিক করে ফেরে তারকেশ্বর থেকে, একে দেখেছিলাম হাসনাবাদের পথে, বাসের মধ্যে ঘোমটার আড়ালে বিড়ি খেতে। এ যে সত্যি রক্তাম্বরী! সহজ প্রাণের পিছনে যে পথ, এবার যেন তার সঠিক হদিস পাই। অথচ দেখ, নিচু মুখ ফিরিয়ে কেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার লজ্জা পেয়ে লজ্জাবতী গাজীকে চুপ করতে বলে। যেন এ মেয়ে সে মেয়ে নয়, রক্তে ধোয়া প্রাণ যার নারীত্বে জ্বলজ্বলানো। রক্তে যার গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা।

গাজী বলে, 'না, তাই বলি আর কী, চাচী তোমাকে কি আন্ ভাবা যায়।'

অবাক হয়ে ভাবি, শক্তি কোথায় বসত করে, এই আঙুরকে দেখে যেন তার ঠিকানা পাই না। অথচ সে এমন ভুল করে। করে বলেই বোধ হয় এ নায়িকা মানবী। এইটুকু প্রবোধ মেনে চোখ ফেরাতে যাই। হঠাৎ আঙুরি আমার দিকে ফিরে তাকায়। তাকিয়ে ফিক্ করে একটু হাসে। দেখি, তার কাজলকালো চোখে আবার সেই হাসির ঝিকিমিকি। গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'আর সেই মামলাতে যদি খুনী বলে আমাকে চালান দিতো তা হলে তো রাক্কুসী বলতে।'

গাজী দাড়ি দুলিয়ে বলে, 'না চাচী, হাজার চালান দিলিও তুমি আমাদের মা দুগ্গা থাকতে।'

বলে ঘাড় কাত করে চোখ নাচিয়ে হঠাৎ সুর করে বলে ওঠে, 'আমি কি আটাশে ছেলে? ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে।'

সুর করে গেয়ে গাজী হাত নেড়ে দেয়। আঙুরি হাসে খিলখিল করে। বলে, 'কী বলে দ্যাখ, দূর অ।'

আঙুরি চকিতে একবার আমার দিকে তাকায়। একটু আগের গুম্সোনি গুমোটে আবার হাওয়া লেগে যায়। হায়, কে বা করে মনের বিচার। কোথা দিয়ে হাওয়া আসে, কে জানে!

গাজী আঙুরির দিকে চেয়ে ততক্ষণে অন্য সুরে গুনগুন করে ওঠে, 'দুগ্গা নাম তরী, মস্তকেতে ধরি, যতন করিয়ে রাখব। আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরোলে, দুগ্গা দুগ্গা বলে ডাকব।'...

এবার আর সাঁই দরবেশের দেহতত্ত্ব নয়, দাড়িওয়ালা গাজী শাক্ত পদাবলী গায়। এতও জানা আছে লোকটার! কিন্তু আঙুরি হাসতে হাসতে ভুরু কোঁচকায়। বলে, 'আহ্ না, ছি। আমাকে নিয়ে ও রকম ঠাকুর-দেবতার গান করো না। কী এক পাপ এসেছিল কোন্‌কালে। ভাবলে এখনো রাতে ঘুমোতে পারি না। ওসব আর ব'লো না।'

গাজী হেসে কী বলতে যায়। মাহাতো ফিরে আসে নারাণঠাকুরকে নিয়ে। আসতে আসতেই ঠাকুর বলে, 'এর আর বলাবলির কী আছে। কোনো অসুবিধা হবে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর অভয় হাসি হাসে। বলে, 'আমিও তো তখন থেকে ভাবছি। শুনতে পাচ্ছি, বেড়াতে এসেছেন, ভাবলাম, কোনো ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে এসেছেন।'

বলেই গাজীর দিকে ফিরে মুখ বিকৃত করে সে। প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'কেন, বড় যে ফড়ফড়ানি। বিদেশী ভদ্দরলোককে মিঠে মিঠে কথা বলে নিয়ে তো এসেছ, এখন যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আবার বলে, বসিরহাটে নিয়ে যাবে। কত ওস্তাদি!'

গাজী একেবারে জোড় হাত। বলে, 'আর বলবেন না ঠাকুরমশায়, মুরশেদের পয়জার আমার মুখে।'

একেই বোধ হয় 'খোসামুদে রামপেসাদে' বলে। কোনো রকমেই ঠেক খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু ঠাকুর সে কথা শুনলে তো! বলেই চলে, 'তাই তো বলি, এমন হুজ্জোত কে বাঁধাবে। দুটো গান গাইতে পারে বলে উনি একেবারে সব জেনে বসে আছেন।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'না ঠাকুরমশায়, কিরা কেটি বলতি পারি, আমি দিনকানা, রাত দেওয়ানা। তয়, একটা কথা বলি রাখি, আজ রাত্তির কিন্তু আপনার এই দাওয়াতি আমাকে শুতি দিতি হবে।'

ঠাকুরের জবাবের আগেই আঙুরির গলায় হাসি ঝরে পড়ে। ঠাকুর রেগে কিছু বলতে যায়। মাহাতো বলে ওঠে, 'তা শোবে, তাতি আর কী। ঘরে গিয়ি তো শুচ্ছ না। এবার আমরা যাই। চল্ গো আঙুরি, যাই।'

নারাণঠাকুরের যে কথাটা মুখে আটকে গিয়েছিল, সে কথাটাই রূপান্তরে শোনায়, 'খালি বাজে—।'

আঙুরি বলে ওঠে, 'প্যাচাল পাড়ে।'

বলেই, হাসির ঝড়ে ঝরে পড়ে। গাজী মুখ ফিরিয়ে আওয়াজ দেয়, 'জয় মুরশেদ!'

তারপর নিজেই আগে দাওয়া থেকে নেমে হাঁটা ধরে। আমি মাহাতোর সঙ্গ ধরে বলি, 'চলুন, আপনাদের সঙ্গে একটু যাই।'

কথাটা কেবল মাহাতোকে বলিনি। আর যার উদ্দেশে, সেই আঙুরি একবার চোখ তুলে চায়। এখন তার ঠোঁটে একটি প্রীতির হাসি ঝলকায়।

আঙুরির ঠোঁটে যে কেবল প্রীতির হাসি ঝলকায়, তা নয়। আবার পিছন ফিরে নারাণঠাকুরের দিকে দেখে। ঠাকুরের মুখের বুলি কেড়ে নিয়ে, সে যে বুলি পূরণ করে দিয়েছে, সেই থেকে ঠাকুরের বাত গায়েব। মুখের হাঁ বন্ধ হয়নি। জরদা গুন্ডি বিড়ির ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া জিভটা পর্যন্ত দেখা যায়, নড়েচড়ে না। ভুরু গিয়েছে কুঁচকে, দৃষ্টিতে ভাব নেই। আমার সঙ্গ নেওয়া দেখে আঙুরি আসলে শালীন হেসে অনুমতি করে। কিন্তু পিছন ফিরে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আবার খিলখিলিয়ে ঝরে।

কেবল যে ঝরে, তা নয়। দেখ, কেমন ঝোঁকতা লাগে শরীরে। ঘোমটা রয় না মাথায়, রক্তাম্বরীর আঁচল খসে পড়ে। এবার বলো, এ শরীর কি কেবল মধ্যঋতু আশ্বিনে টইটুম্বুর। তার চেয়ে বেশী দেখ, অধরা উদ্ধত। জামার ছাঁটেকাটে, সাজেগোজে, খাঁজে-খাঁজে ঠেকা দিয়ে সাজানো বানানো নয়। এ বনে বন্যতা, প্রকৃতি নিজের হাতে সাজিয়েছে। এ আর এখন মাহাতো-গিন্নী নয়, যেন এক ডাগরী যুবতী, তাহে রঙ্গিনী। যে-ডাকাতের মুন্ডু ঘুরেছিল, আর মুন্ডু বলি গিয়েছিল, সে বেচারীর দোষ কতটুকু। মরণ কী আর এমনি ধরে! তবে অসুর বেশে এলে বলি যাওয়া ছাড়া উপায় কী!

এতক্ষণে নারাণঠাকুরের মুখের হাঁ বন্ধ হয়, দাঁত দেখা যায়। তারপর দাওয়া থেকেই বলে, 'আচ্ছা গো মাহাতো-বোঠান, খুব একখানা দিয়ে গেলে।'

আঙুরি দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় নাচিয়ে বলে, 'কেন, কী দিয়ে গেলাম।'

ঠাকুরও ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'বুঝতে পেরেছি গো, বুঝতে পেরেছি।'

আঙুরি ভুরু কাঁপিয়ে খানিকটা ধমকের সুরে বলে, 'কী যে খালি বাজে প্যাচাল পাড়ে।'

বলেই আবার খিলখিলিয়ে হাসি। হাসির তালে শরীরে যেন নাচের ছন্দ লাগে। এবার দাওয়া থেকে ঠাকুরের হাসিও ভেসে আসে। তার ডিগডিগে শরীরে পাঁজরাগুলো পর্যন্ত তালে তালে নাচে। বলতে থাকে, 'বুঝেছি গো বোঠান, বুঝেছি।'

মাহাতো রঙ্গ বোঝে। তবে জীবনযাপনের একটা ভার আছে। বয়সেরও আছে বোধ হয়। বউয়ের সঙ্গে তেমন তাল দিতে পারে না। কিন্তু মুখ টিপে হাসে। ডাক

দেয়, 'আয় গো বউ, তাড়াতাড়ি আয়। বেলা একেবারে চলি গেল।'

আঙুরি ফিরে আবার সঙ্গ ধরে। মাহাতো আমার দিকে চেয়ে বলে, 'নারাণঠাকুর বড় মজার লোক।'

আমি বলি, 'গাজীর ওপরে একটু রাগ আছে।'

আমার কথার জবাব দেয় আঙুরি, 'তা নয়, ঠাকুরের ওইটাই ভাব।'

মাহাতো বলে, 'ঠিক বলিছ। লোকটাই ওরকম।'

আঙুরি বলে, 'এঁড়ে লাগা ছাওয়ালের মতন। ও যা বলবে, তাই শুনতে হবে। না শুনলেই হম্বিতম্বি। দেখ না, ফোঁচার বউয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা বলে।'

বলে আঙুরি হাসে। আমার দিকে চায়। বলতে চায়, মানুষ চিনি। এ আর কথা সাজিয়ে চরিত্র ব্যাখ্যা নয়, যেমন কেতাবে হয়। যেমন দেখা বোঝা, তেমনি বলা। আমার কানে লেগে থাকে, 'এঁড়ে লাগা ছেলের মতন' ব্যাখ্যাখানি। যার কোনো কিছু, মনের মতন নয়। যে হাত-পা ছুঁড়েই আছে। আর এঁড়ে লাগা ছেলের যত বায়নাক্কা, সবই আপন ভাইয়ের সঙ্গে। আর কারুর সঙ্গে নয়। তাতে বোঝা গেল, নারাণঠাকুর আর গাজী আসলে পরস্পরে অনেক বেশী কাছাকাছি। কিন্তু মা হওয়া যার ভাগ্যে ঘটেনি, সেই আঙুরি তুলনা দিতে গিয়ে কেমন করে এঁড়ে লাগা ছেলের কথা বলে! মনটা বুঝি কেবল মাতৃভাবের স্রোতে আনাগোনা করে।

আঙুরি আবার বলে, 'তাই দেখ না, গাজী যেমন করে, ফোঁচার বউও সে রকম করে। ঝগড়া বিবাদ করে না, মুখ ফিরিয়ে হাসে। ও লোকের সঙ্গে আবার কেউ ঝগড়া করে নাকি।'

মাহাতো তার লাল চোখ বড় করে বলে, 'উ বাবা, ন' মাসে ছ' মাসে তো আসিস। তোর নজর দেখি সব দিকি যায়।'

আঙুরি বলে, 'যাবে না কেন। কানা নাকি আমি?'

'না, তা বলি না। তা হলি, আমি যখন বকিঝকি, তুইও মুখ ফিরিয়ে হাসিস।'

'আহ্ দূর অ, তুমি কি ঠাকুরের মতো করো নাকি যে, আমি ও রকম করব। দেখ দিকিনি।'

বলে আঙুরি আমার দিকে চেয়ে হাসে। এই প্রথম সোজাসুজি সম্বোধনে সোজা-সুজি কথা। মাহাতোও আমার দিকে চেয়ে হাসে। বলে, 'তা কী জানি। বলা তো যায় না। ফোঁচার বউয়ির কথা যে রকম বললি।'

আঙুরি তার ডাগর চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে পরিষ্কার জিভ ভেংচে দেয়, শব্দ করে, 'অ্যা হ্যা হ্যা।'

মাহাতো যেন নেশা করে হাসে হ্যা হ্যা শব্দে।

ইতিমধ্যে পেরিয়ে যাই হাটের সীমানা। সামনে খানিকটা ধানকাটা মাঠ। মাঠ পেরিয়ে রাস্তা। এতক্ষণে গাজীর দেখা মেলে। দেখি, ধানকাটা মাঠের একটা সবুজ উঁচু আলপথের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফেরানো তার আমাদের দিকে। গাছপালা নেই। আকাশের তলায় পাগড়ি বাঁধা আলখাল্লা পরা গাজীকে দেখায় যেন আদ্যিকালের পথ-চলা মানুষটা আকাশের ধ্যান করে। একটু একটু বাতাসে, তার বাবরি আর দাড়ি কাঁপে। তার সঙ্গে কাঁপে পাগড়ির ল্যাজ।

এতক্ষণ ধরে পাখির ডাক চাপা পড়েছিল আঙুরির হাসির আড়ালে। কিংবা পাখিগুলোই কান পেতে ভোলাখালির বউয়ের হাসি শুনছিল। এখন হঠাৎ পিছন থেকে হাটের গাছে তাদের ডাক শোনা যায়। ওপারে ন্যাজাটের আকাশের এক কোণে বুঝি সূর্য অস্ত গিয়েছে। প্রথম শীতের নীলা আকাশে পশ্চিমের কোণটা রাঙিয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে দু-চারটি হালকা মেঘের টুকরো এসেছে। যেন তাদের সকল টান টকটকিয়ে

যাওয়া পশ্চিমের রাঙা থানে। তাতে লালের ঝলক দেখায় যেন লম্বা লম্বা পোঁচড়ার মতো। আর সেই লালেরই ঝলক দেখ সবার গায়ে মুখে। কেবল মানুষের নয়, ধানকাটা মাঠের ধুলায়, না-কাটা পাকা ধানের মাঠে, আর ওই যে দূরান্তে পথ চলে যায়, সে তো যেন এয়োস্ত্রীর সিঁথির মতো টকটকিয়ে উঠেছে।

গাজীর কাছাকাছি হতেই সে বলে, 'আমি ভাবি কী যে, আবার কী হলি। ঠাকুর আবার কিছু বলে নাকি।'

আঙুরি বলে ওঠে, 'বলছিল তো। তুমি চলে এলে, তোমাকেই তো ডাকছিল।'

ফিরতে গিয়ে দাঁড়ায় গাজী। বলে, 'আমাকে?'

আলের পথে, পাশাপাশি কেউ নয়। আমি সকলের পিছনে। আঙুরি আমার আগে। আমি তার মুখ দেখতে পাই না। তার গলা শুনতে পাই, 'তবে কি আমাকে? তুমি ফিরে যাও না, তারপর তোমাকে দেখাবে বলেছে।'

গাজী যেন সত্যি দুশ্চিন্তায় পড়ে। বলে, 'কেন চাচী, আমি তো কিছু বলি নাই।'

আঙুরির গলা শোনা যায়, 'বলনি তো কী, খালি বাজে প্যাচাল পাড়ো।'

গাজী তখনো তাকিয়েছিল আঙুরির দিকে। দেখি, দেখতে দেখতে তার চোখের ছায়া সরে। তারপরে তার আর আঙুরির মিলিত গলার হাসি বেজে ওঠে মাঠের মাঝখানে। কোন্‌খানে যেন তখনো কয়েকটা পাখি, কৃষকের ফাঁকি পড়া চোখের দানা খুঁটছিল মাঠে। তারা তরাসে ডাক দিয়ে উড়ে যায় কয়েক হাত দূর থেকে। আর সেই হাসির ঢল সামলাতে আঙুরির পা হয়ে যায় বেসামাল। সে ঢল খেয়ে নেমে যায় মাঠে।

মাহাতো হেঁকে ওঠে, 'দেখ, দেখ, করে কী, আছাড়-পিছাড় খাবি নাকি।'

বলে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। আঙুরি হাসতে হাসতে বলে, 'না, পড়ব না।'

কথা শেষ না করেই আবার দৌড়ে ওঠে আলের ওপর। তাতে কেবল যে ঠিনঠিনিয়ে চুড়ি বেজে যায়, তা নয়। ঘোমটা-খসা খোঁপার গোঁজা ঝুমকো কাঁটাগুলোও ঝুনঝুনিয়ে বাজে।

মাহাতোর গলায় বিরক্তিতে স্নেহ ঝরে। বলে, 'পড়বি যখন, তখন বুঝবি। লোকি বল্‌বি, মাহাতোর দজ্জাল বউটা মাঠ দিয়ি দৌড়য়।'

আঙুরির শাড়ি তখন মাহাতোর আগে, গাজীর কাছে। বলে, 'বলুক গে, তোমাদের লোকগুলোকে চিনি।'

বলে সে একবার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চায়। দেখে নিতে চায় আমিও সেই লোক কি না, যে লোকগুলোকে সে চেনে।

কিন্তু আমি তখন দেখছিলাম মাহাতো-গিন্নীকে নয়, কোনো দজ্জাল বউকেও নয়। আমি দেখছিলাম, খুশিতে ডগমগ একটি কিশোরীকে। যাকে দেখে মধ্যঋতুর কথা আর মনে থাকে না। সামনে যার হেমন্তের শুকু শুকু টানের দিন। আলতা পরা তেলতেলে কালো পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, যাত্রা তো শুরু কেবল। কঠিনের চড়াই উৎরাই ভেঙে এ পায়ে শেষ দাগ পড়তে দেরি আছে।

আমার দিকে তাকিয়ে বিচার কী হলো, বুঝতে পারি না। বোঝা গেল, মুখ ফিরিয়ে কী যেন বলে গাজীকে। গাজী হা হা করে হেসে তাকায় আমার দিকে। তারপরে মুখ ফিরিয়ে চলতে চলতে বলে, 'নইলি কি আর অমন বাবুর সঙ্গ ধরি চাচী। অই চোক দেখিই ধরিছি, কালা এখন গোকুল ছেড়ি, নদের ধুলোয় ধুলোট খেলে।'

কথা কোন্‌ বায়ে বহে, ধরতে পারি না। প্রসঙ্গ আমাকে নিয়ে, সেটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু চোখ দেখে কী ধরা গেল, তাতে কালা ছাড়ে গোকুল কিংবা নদীয়ায় ধুলোট খেলে, সে হাস্যের অর্থ কী, বুঝতে পারি না।

আঙুরি আবার একবার ফিরে চায়। তারপরে আবার যেন কী বলে, কানে শুনতে

পাই না। যে বলে, সে শোনাতেও চায় না। অমনি গাজী গান ধরে দেয়ঃ

'ওগো, যে কালা সে কালাই আছে, তারে কি চিনতি পেলে।
কালা এখন গোকুল ছেড়ি, নদের ধুলায় ধুলোট খেলে।'...

গান থামিয়ে বলে, 'জানলে চাচী, বাবুকে পেথম যখন জিগেস করলাম কী যে, "বাবু আপনাকে তো চিনতি পারলাম না। ইদিকে দেখি-টেখি নাই। তা যাবেন কম্‌নে?" বাবু বললেন, "তা তো জানি না।" কথা শুনি ভারী মজা লাগে, ভাবি, এ তো বড় মজার বাবু। কম্‌নে কোথায় যাবেন, তাই জানেন না। তারপরে বললেন, "এই একটু বের হয়ে পড়েছি।" তা হলিই বোঝো, এ মানুষ কেমনতর। অই তুমি যা-বললে, আমারো তাই মনে হয়েছিল।'

কী মনে হয়েছিল গাজীর। কথা বলে আমাকে নিয়ে, অথচ আমি জানতে পারি না। বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে কেতাবী সভ্যতা যে এদের বোঝাবো, সে উপায় নেই। এ মানুষেরা সব আপন বায়ে চলে। মনে যেমন জাগে, তেমনি ভাবে। তা চলুক, ভাবুক, আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে নিয়ে কেন। এমনি করে বললে কৌতূহল সূচ্যগ্র হয়। দেবতা তো নই। অথচ জিজ্ঞেস করতে পারি না কোনো মতেই।

আঙুরি আবার ফিরে চায়। মাহাতো বলে ওঠে, 'দেখ্, আবার পড়ে যাবি।'

যেন সে এক পাল ছেলেমানুষ নিয়ে চলেছে। সে সব কথা শোনে না, শোনবার কৌতূহলও নেই। বাচ্চাগুলো কী নিয়ে ক্যালোর-ব্যালোর করে, ধাড়িটা যেন শুনেও শোনে না, কেবল হুঁশিয়ার করে নিয়ে যায়।

গাজী তখনো কথার জের টেনে চলেছে, 'চোক দেখি মনে হলো, এই সবে সোম্‌সারে পা পড়িছে। কোলের ছাওয়ালের মতন যা দেখে, তাই মন টেনি নিয়ে যায়। যেন জগৎ আর দেখা হয় নাই। আমি ভাবি, বাহ্‌ মুরশেদ, এ মানুষটা তো ভারী মজার। আবার বলেন, কোথায় কম্‌নে যাবো জানি না।'

বলে আকাশ ফাটিয়ে হাসে। মুখ নিচু করে আমাকে চলতে হচ্ছিল। একবার মুখ তুলে দেখি গাজীর দিকে। না, সে পিছন ফিরে তাকায় না। মাহাতো বলে ওঠে, 'কী খালি তোরা বলিস আর মাকড়ার মতন হাসিস।'

গাজী বলে, 'না, বলি, চাচী বলে কি না, বাবু নাকি ছোট ছাওয়ালের মতো চায়। যেন হাঁ করে খেলা দেখে আর মনে মনে হাসে। তাই বলি, হাসে এক, দেখে আর এক। বাবুকে পেয়ি বড় মজার লেগেছে। তয় মনে মনে ভাবি কি যে, বাবু কি খেলতি বের হয়িছেন, ছোট ছাওয়াল যেমন ঘর থেকি পলায়। না কি পথে বের হয়ি হারিয়ে গেছেন।'

এই বলে সে পিছন ফিরে তাকায়। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু গাজীর শেষের কথাগুলো আমার ভিতরে কোথায় বাজতে থাকে। এই যে মুহূর্তে, এই রাঙা সন্ধ্যা, ধানকাটা মাঠ, দূর দিগন্তে ঠেকে থাকা আকাশ, আর এইসব নরনারী, যাদের মাঝখানে, আমার মনে পড়ে না, কোথা থেকে এলাম, কে আমি! কোথায় যাই, কিসের সন্ধানে। সেই ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে যায়। যখন আমার আমিত্বে আজকের কোনো পরিচয় লেখা হয়নি। অথচ বারে বারে মনে হয়, সেই আমিকে কোনোদিনের তরে ছাড়িয়ে যেতে পারিনি। যে আমি ঘর থেকে পালিয়েছি খেলতে, খেলতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছি কোন্ এক অচিনে। যেখানে সকলই বিস্ময়, অথচ চোখের জল মুছতে হয়েছে।

আমাকে নিয়ে কথা বলুক, তা চাই না। কিন্তু গাজীটা কে। ও যেন সবই ভিতর থেকে দেখে। ও কি আমার জন্মলগ্নের সাক্ষী। ও কি চিরদিন ধরে চেনে আমাকে। ও কি সেই মাঝি নাকি, যে আমাকে নিয়ে এসেছিল বুড়ীগঙ্গার মোহানা থেকে। ও কি ধলেশ্বরী তীরের চর লতব্দী গ্রামের সেই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু, যিনি একবার আমার চিবুক তুলে ধরে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। গায়ের গেরুয়া দিয়ে চোখ মুছিয়ে

দিয়েছিলেন, পারেননি কেবল চোখের কূলের বিস্ময় আর কৌতূহল মুছিয়ে দিতে। তারপর হাত ধরে দাড়ির ভাঁজে হেসে বলেছিলেন, 'চলো, তোমারে দিয়া আসি তোমার আত্মীয়ের কাছে।'...

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পূব দেশের ধলেশ্বরীর তীর থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রাম। নাম তার চারগ্রাম। দেখি, এক ছেলে তার দিদিমার আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে। বলে, 'ইন্দিরের লগে আইজ যাইতে দাও বেজেরহাট।'

দিদিমা ধমক দিয়ে বলে, 'না, বেজেরহাটের ভিড়ে তুই হারাইয়া যাবি। সেইখানে পোলা চুরি যায়।'

সেখানে পোলা চুরি হয় এই ভয় দেখায় দিদিমা। কিন্তু নাতি না শোনে বুড়ী দিদিমার কথা। তাঁর থানের আঁচল নিয়ে টানাটানি করে। এদিকে বাড়ির চাকর, নমঃশূদ্র ইন্দির ধামা মাথায় পা বাড়ায় বাড়ির বাইরে। তখন সেই ছেলে ডাক ছেড়ে চিৎকার করে, দিদিমার কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁদে। দিদিমার প্রাণ তাতে না গলে পারে না, ডাক দেন, 'ইন্দির, শোন্। অরে লইয়া যা, দেখিস্ না হারায়। যখন হাট করবি, কুতুর চাউলের গদিতে পোলারে বসাইয়া রাখিস। দুপুরের আগে ফিরিস, নাতি কিন্তু না খাইয়া যায়।'

ছেলেটি ভাবে, ইন্দির আর একটু হলেই বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে যাচ্ছিল। কারণ, বেজেরহাট, ব্রজের হাট যার নাম, সেই পৃথিবীর পরম বিস্ময় বাজারের গল্প ইন্দির তাকে শুনিয়েছিল। বলেছিল, দিদিমাকে বলে সে-ই তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপার ঘটছিল আলাদা। এখন ইন্দির হাত বাড়ায় ছেলের হাত ধরবার জন্যে, ছেলে শোনে না। সে এসেছে ঢাকা শহর থেকে চারগ্রামে, দিদিমার কাছে বেড়াতে। প্রাণে তার এই সাধ, একদিন যাবে সে পশ্চিম দিকে দু' মাইল দূরে ব্রজেরহাটের হাট দেখতে। ইন্দির হাত ধরবার আগেই ছেলে দৌড় দেয়। যেন বাঁধা বাছুর ছাড়া পেয়ে ছোটে গাভীর স্তনের তৃষ্ণায়। যে স্তন ছড়ানো সবুজ রবিশস্যের মাঠে মাঠে, আর আল পথে। যে স্তন ছড়ানো সকালের রোদে, মাথা তুলে রোদ পোহানো বিশাল হিজলের বনে, বেত-ঝোপের মাথা দোলানো ডগায় ডগায়। এক দৌড়ে সে মাঠ পেরিয়ে বাঁক নেয় কুলইচণ্ডীতলা থেকে। বুড়ো হিজলের জটায়, আঁধার আঁধার ছায়ায়। ছেলেটি এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। গাটা একটু ছম্ ছম্ করে, মনে একটা ভয়ের দুরুদুরু। কিম্ভূতাকৃতি এক সিঁদুর মাখানো হিজলের গুঁড়ির দিকে চেয়ে দেখে। সবাই বলে, ওইখানে প্রথম দেবী কুলইচণ্ডীর বাস। এখান দিয়ে যে যায়, সে-ই নমস্কার করে। কুলইচণ্ডীর মূর্তি কেমন, তা সে জানে না। হয়তো কোনো প্রতিমা আছে। কিন্তু ছেলেটির চোখে কুলইচণ্ডী চিরদিনই দলামোচড়া পাকানো সাপের মতো, যেমন সেই হিজলের সিঁদুর মাখানো গুঁড়িটা। ছেলেটিও হাত তুলে নমস্কার করে। তারপরে আবার দৌড় দেয়। ইতিমধ্যে ইন্দিরও তার বড় বড় পায়ে দৌড়ে এসে গৃহকর্ত্রীর নাতিকে ধরে ফেলে। ধমক দিয়ে বলে, 'শহরের পোলা তুমি, গেরামের রাস্তা যদি হারাইয়া ফালাও, তারপরে? তখন কী হইবো?'

তারপরে কী হবে, শহরের ছেলেটির জানা ছিল না। সে কেবল ইন্দিরের মুখের দিকে তাকায়। তখন ইন্দির তাকে শোনাতে থাকে, এইসব মাঠের পথে, বড় বড় গাছে, খালের ধারে কত সব ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়। তারপরে সেই গল্পটা বলে, যে গল্পের নায়কের পরিচয় আর নেই। স্থান কাল পাত্র, সকলই ইতিহাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গ্রামের উত্তর পাড়ার স্বয়ং গোরাই দত্তের নাম দিয়ে কাহিনী বলে। বলে, 'গোরাই দত্ত সিরাজদিঘির থেইক্যা বাড়ি ফিরতে আছিল, রাইত তখন নয়টা। বড় জবর আন্ধাইরা রাইত। গোরাই দত্তের, হাতে প্রকাণ্ড এক রুইমাছ। আসার রাস্তায় পড়ে কাদিশালের খাল।'...

...তারপরে, গোরাই দত্ত যখন কাদিশালের খালের ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেন, তখন তাঁর মনে হয়, পিছনে শুকনো পাতায় পা ফেলে ফেলে আর একজন যেন কে আসে। তখন গোরাই দত্ত কী করেন, শহরের পোলাটি বলতে পারেনি। গোরাই দত্ত পিছন ফিরে তাকাবেন? সর্বনাশ, তাই কখনো হয় নাকি! তা হলেই তো মট্ করে ঘাড় মটকে ধরবে। অতএব শহরের ছেলেটি জেনে রাখুক, এমনি অন্ধকার রাত্রে একলা খালের ধার দিয়ে চলতে চলতে বা যে-কোনোখানেই হোক, পিছনে যদি কারুর শব্দ পাওয়া যায়, খবরদার, যেন ফিরে না তাকায়। তাই গোরাই দত্তও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, কে তাঁর পিছন আসে। তাই তিনি ফিরে তাকাননি।

কিন্তু যে পিছনে পিছনে আসছিল, সে যখন দেখে যে, গোরাই দত্ত ফিরেও চান না, তখন হঠাৎ শোনা গেল, কে যেন তাঁর আগে আগে যায়। পায়ের শব্দ শোনা যায়। অথচ তাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু গোরাই দত্ত থামেন না, সমানে চলতে থাকেন। কেন? না, তখন থামলেই ঘাড়টি মট্ করে ভেঙে পড়বে। তখন হঠাৎ গোরাই দত্ত দেখেন, খালের জল থেকে একটা লম্বা হাত উঠে আসে। হাতে এক চিমটি মাংসের বালাই নেই। কেবল সাদা ধবধবে হাড়। অথচ সেই হাতে মেলাই সোনা-রুপোর চুড়ি। হাড়ের সঙ্গে চুড়িগুলো ঠকঠকিয়ে বাজে। আর শোনা গেল মেয়েমানুষের নাকি-নাকি গলা, 'এ'ত ব'ড় রুঁই মাঁছ দে'ইখ্যাঁ নোঁলা দিয়াঁ জ'ল' প'ড়ে'। অ' দ'ত্ত'ম'শাঁই, মাঁছখান খাঁইতে' দি'য়াঁ যাঁন।'

তখন দত্তমশাই কী করেন। কিছুই না, আরো শক্ত হাতে মাছখানি ধরে জোরে জোরে হাঁটেন। না তাকান ডাইনে, না বাঁয়ে, না পিছনে। তাঁর নজর সামনের দিকে, যে পথে যেতে হবে। এদিকে সেই এক কথা জল থেকে বারে বারে ডেকে বলে। আর অন্ধকারের মধ্যে সেই হাড়ের হাতখানি, সোনা-রুপোর চুড়ি যে হাতে ঠকঠকিয়ে বাজে।

তারপর খালপারের রাস্তা শেষ হয়ে যখন ডাইনে মোড় নিয়ে গ্রামের দিকে চলেন, তখন শুনতে পান, খালের জলে যেন হাতী দাপাতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি একটা প্রকাণ্ড দৈত্য জল থেকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। অথচ কিছুই পড়ে না। গোরাই দত্ত বেশ খানিকটা চলে যাবার পর হঠাৎ সব শব্দ থেমে যায়। আর মেয়েমানুষের সরু চড়া নাকি গলা শোনা যায়, 'আঁইচ্ছা, আঁইজ ত'র ডাঁইনে'র দি'নু, তাঁই বাঁইচা গে'লি, আঁর এ'কদি'ন ত'র ঘাঁড় ম'টকাঁমু।'

কাদিশালের খালের ধারে পশ্চিমপাড়ার গোরাই দত্তের এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়ে ইন্দির জানতে চায়, শহরের পোলা কি বলতে পারে, কে গোরাই দত্তর পিছু নিয়েছিল? শহরের ছেলেটি তখন সকালবেলার শীতের রোদে ইন্দিরের মোটা বড় হাতটি কষে ধরে আছে। জানাল, না, সে জানে না।

ইন্দির জানাল, 'ওইটা হল মাউচ্ছা পেত্নী।'

অর্থাৎ মেছো পেত্নী। তার পরেই ইন্দিরের প্রশ্ন হলো, 'আইচ্ছা, কও তো, গোরাই দত্ত তখন মনে মনে কী কইছিল?'

ছেলেটি বলে, 'জানি না।'

ইন্দির বলে, 'ক্যান্, এইটা তো সবাই জানে।'

বলে ছড়া কাটে,

> 'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
> রাম লক্ষ্মণ লগে আছে, করবি আমার কী।'

ইন্দিরের হাত ধরে-থাকা ছেলেটি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে মুখস্থ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে একবার ভেবে দেখেনি, তার ছুট খাওয়া অবাধ্যতা কখন পোষ মেনে গিয়েছে। ইন্দির কখন যে কেমন করে কী বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছে, সে টের পায়নি। বাঁশীর গুণে

ছেলে কখন মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো ইন্দিরের সুরে আর তালে তালে চলে। সেদিন টের পাওয়া যায়নি। টের পাওয়া গিয়েছে পরে, চারগ্রামের ইন্দির এক মস্ত বড় শিল্পী।'

ইন্দির নামে সেই শিল্পী যেন জাদুকর। সকালবেলায় শীতের রোদে যখন দিগ-দিগন্তের কলাই-মটরের ক্ষেত শিশিরে ঝিকিমিকি করে, ঝোপে ঝোপে বেতগাছের কালো সবুজের পাতা চিকচিক করে, বিশাল হিজল-জিয়লের ঝুপ্সিতে পাখিরা ডাকে, খেজুরগাছের চাঁছা কপালে কঞ্চির ঠিলির কাছে মৌমাছিরা গুনগুনায়, তখন ইন্দির তাকে তৈরি করে তোলে এক মস্ত ব্রহ্মদৈত্যের রাজ্য, প্রেতিনীর তেপান্তর, যত অশরীরী আত্মাদের ঘাড় মটকানো তান্ডবের প্রকান্ড কারখানা। ছেলেটি অনুভব করে, চারদিকে ভূত-পেত্নীতে গিজগিজ করছে। কেননা, ইন্দিরই তাকে জানিয়েছে, 'অই যে দ্যাখ খুঁটায় বান্দা গুরুটা ঘাস খাইতে আছে, অইটাই হয়তো পেত্নী। যেই তুমি কাছে যাইবা, দ্যাখবা, গরু-টরু কিছু নাই, ভুঁইয়াগো বাড়ির এক সোন্দর বউ খাড়াইয়া রইছে।'

শহরের ছেলেটি ইন্দিরের লম্বা লম্বা শক্ত হাত আরো জোরে কষে ধরে। আর বুক ধুকুধুকু আশা ও কৌতূহলে খুঁটোয় বাঁধা গরুটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, এই বুঝি গরুটা সত্যি সত্যি ভুঁইয়াদের বাড়ির সুন্দর বউ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। রোদে পিঠ দিয়ে, ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে সে যেমন ঘাস খাচ্ছিল, তেমনি খেতে থাকে। তবু সে জিজ্ঞেস করে যায়, 'তারপর?'

'তারপর?...তারপর যত তুমি কাছে যাইবা, দ্যাখবা, সোন্দর বউটা কান্দে। কান্দে, আর কান্দে। দেইখ্যা তোমার মন গইলা যাইব। তুমি গিয়া কইবা, "কোন্ বাড়ির বউ তুমি, কোন্ গেরামে বাড়ি, তুমি কান্দো ক্যান?" তখন সেই বউ কইব, অমুক গেরামে বাড়ি তার, অমুক বাড়ির বউ। ডাকাইতে তারে চুরি করছে, এইখানে ফালাইয়া গেছে। অখন তারে পেঁৗছাইয়া দিতে হইব।'

'তারপর?'

তারপর... তারপর... তারপর? এই 'তারপরের' আর শেষ নেই। জাদুকরের গল্পও আর তাই ফুরোয় না। ইন্দির জানায়, যে মানুষ সে বউকে দেখে ভুলবে, তারই মরণ। কারণ আসলে তো সে বউ না, পেত্নী। সে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাবে কোন্ শ্যাওড়ার জঙ্গলে, নিশিন্দার বনে, বেতের ঝোপে, হিজলের জটায়। তারপর ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে। তবুও 'তারপরে' থাকে। আর জাদুকরের বাঁশী ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাজতে থাকে। যে সুরে কাল-মহাকাল সবই হারিয়ে যায়, তাল মান তো কোন্ ছার।

ছেলেটি যে শুধু শোনে, তা নয়। ইন্দিরের মুখের দিকেও হাঁ করে দেখে। হতে পারে, ইন্দিরের সবে তখন গোঁফ উঠেছে। তবু সেই ইন্দির যেন ছেলেটির চোখে তখন হাজার বছরের সবকিছু দেখা-শোনা-জানা এক আদ্যিকালের লোক। যদিও ইন্দিরের ঘাড়-কামানো লম্বা লম্বা কালো চুল, বড় বড় চোখ দেখেও সে মুগ্ধ। ইন্দির আর তার কাছে ইহজগতের লোক থাকে না। সে যেন অন্য এক জগতের আগন্তুক। অন্য জগতের কথা শুনিয়ে নিয়ে যায়।

চুম্বক যেমন লোহা টানে, তেমনি করে ছেলেটিকে নিয়ে ইন্দির পেঁৗছে যায় ব্রজের-হাটে। সে জায়গার নাম কেন ব্রজেরহাট, ছেলেটি তার খবর জানত না। আজও জানে না। ব্রজেরহাট নয়, বেজেরহাট। দূরে দূরান্তে গ্রাম, চারদিকে মাঠ। মাঠের মাঝখানে হঠাৎ গুটিকয় বড় বড় বট আর হিজলগাছ। তাকে ঘিরে অনেকগুলো ঘর। ছেঁচা বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। হাটের দিনে এত লোক, যেন ঠাঁই নেই কোথাও।

ইন্দিরের সঙ্গে গোটা হাটে চক্র দেবার পর গৃহকর্ত্রীর হুকুম অনুযায়ী ছেলেটিকে গিয়ে বসতে হয় কুতুদাসের চালের গদিতে। স্বয়ং কুতুদাস নিচু চৌকির ওপরে শীতল-

পাটির ওপর বসে। কাছে তার কাঠের বাক্স। সামনে লম্বা খতিয়ান, খতিয়ে লেখা হিসাবের অজস্র অঙ্কে ভরা। আর চন্দন-শুরকির মতো ভুর করা চাল। ওজন-দাঁড়িতে চাল মাপা আর বিক্রি চলছে। রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন। যতই হোক, রাম ছাড়া কথা নেই। ইন্দির দাস মশাইকে দণ্ডবৎ করে জানিয়ে যায়, ভুঁইয়াদের নাতি রইল, ঠাকরুন বলে দিয়েছেন। সে বাজার করে আবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

দাস মশাইয়ের টাকে যত ঝলক, দাঁতেও তেমনি ঝলক। গদির ওপর জায়গা নির্দেশ করে ভুঁইয়াদের নাতিকে বলেন, 'বইয়ো, বইয়ো বাসী। কী খাইবা কও...অ্যাঁ, হু' কও, বরিশাইল্যা চিকন বালাম, এক নম্বইরা দুই মণ সাঁইতিরিশ সের...।'

এক কথা বলতে গিয়ে, অন্য দিকেও তাল সামলান। হিসাব লেখেন, টাকা গোনেন, আবার ভুঁইয়াদের নাতিকে আপ্যায়নও করেন। তার সঙ্গে নানান্ বাতেপুছে—শহর, ইস্কুল, পড়াশুনো...। তার মধ্যেই, কে যেন ঠোঙায় করে এনে দেয় জিলিপি আর জিভেগজা। ছেলেটির লজ্জা করে, সঙ্কোচ হয়, জানায়, তার খিদে পায়নি। কুতুদাস ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে বলেন, 'খাইতে খাইতে খিদা লাগবো, খাইয়া দ্যাখ কেমুন বেজের-হাটির জিলাপি।'

বলতে বলতেই আবার অন্যমনস্ক, হিসাব লেখা আর টাকা গোনা চলে। আর ছেলেটি দেখে, খেতে খেতে সত্যি খিদে পায়। খেতে খেতে ঠোঙাও শূন্য হয়ে যায়। গদির এক কর্মচারী তাড়াতাড়ি কাঁসার গেলাসে জল দেয়। ছেলেটি জল খেতে খেতে সিরাজ-দিঘার কথা শোনে। দোকানে ক্রেতাদের ভিড়ে দু'জন বলাবলি করে, তারা এখান থেকে বেরিয়ে সিরাজদিঘা যাবে। সিরাজদিঘা! ধলেশ্বরী নদীর ধারে মস্ত এক গঞ্জ, নাম তার সিরাজদিঘা। ছেলেটি সিরাজদিঘার লঞ্চঘাট দেখেছে, আর দূর থেকে দেখেছে সেই গঞ্জ, যার কোনো শেষ নেই। ঘরের শেষ নেই, নৌকার শেষ নেই, মানুষের শেষ নেই। আর ধলেশ্বরী, তার যেন পার নেই, কূল নেই। তার অনেক দিনের সাধ, একদিন সে সিরাজদিঘায় যাবে।

লোক দুটোর কথা শুনে ছেলেটির বুকের রক্ত চলকে ওঠে। মনেতে ঝড় ওঠে, যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। প্রাণে প্রাণে বলে, 'আমি সিরাজদিঘায় যাবো।'... তারপরে সে আরো শোনে, লোক দু'টি বলাবলি করে, বিকেল হতে না হতে আবার তারা বজের-হাটে ফিরবে। তৎক্ষণাৎ ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়। কুতুদাসের কালো মুখে সাদা দাঁতের ঝিলিক হানে। জিজ্ঞেস করেন, 'কই যাও গো বাসী?'

ধরা পড়ার ভয়ে ছেলেটির বুক ধড়াসে যায়। মুখ দিয়ে রা সরে না। কেবল ঘাড় নেড়ে জানায়, সে কোথাও যায় না। কুতুদাসের মনে ভেজাল নেই। কী ভেবে যেন সে হেসে বলে, 'বাজার দেখতে ইচ্ছা করে? বাজারের ভিতরে গেলে তো তুমি হারাইয়া যাইবা। বারিন্দায় গিয়া বইসা দেখ।'

বারিন্দায় অর্থাৎ গদিঘরের বাইরে দাওয়ায় বসে দেখতে বলেন। কুতুদাসের মনে কোনো অবিশ্বাস নেই, সন্দেহ নেই। আহা, এমন মানুষকে ঠকায় ছেলেটা।

ছেলেটা কি ঠকায়! ধলেশ্বরীর স্রোত যে তাকে টেনে নিয়ে যায়। সিরাজদিঘার তুফান যে তার প্রাণে। সেই তুফানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় দাঁড়ায়। সবাই কাজে ব্যস্ত, ছেলেটির দিকে কেউ তেমন নজর করে না। ছেলেটি ভাবে, লোক দুটো বেরিয়ে আসবে কখন।

ভাবতে হয় না, লোক দুটো বেরিয়ে আসে তখনই। সিরাজদিঘার পথ জানা নেই। দাওয়া থেকে নেমে ছেলেটি তাদের পিছু পিছু যায়। ...ওরে ভোলা, আত্মহারা, ধলেশ্বরীর নিশিপাওয়া, সিরাজদিঘার হাতছানি দেখা, বুড়ী দিদিমার কথা কি তোর মনে নেই? আহা, ভুঁইয়াদের নাতি হারিয়ে ইন্দির যে চারগ্রামে গিয়ে আর মুখ দেখাতে পারবে

না, সে কথা কি তোর মনে নেই? সে যে ব্রজেরহাটের মাটিতে মাথা কুটে দাপাবে, তা কি একটু ভাবিস না! এই অচেনা গ্রামের রাজ্যে, বিদেশের ছেলে তুই, আত্মীয়রা যে বুক চাপড়ে মরবে।

না, সে খেয়াল আর তখন ছেলেটির নেই।

সে খেয়াল না থাকুক, গোরাই দত্তর কথা কি তার মনে নেই? তার কি মনে নেই, পথের ধারে খুঁটোয় বাঁধা গরুটাও ছদ্মবেশী পেত্নী হতে পারে? এই তামাম দেশ জুড়ে যে ঘাড় মটকাবার জন্যে কারা অদেখায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কথা কি সে ভুলে গিয়েছে?

ভুলে গিয়েছে। অশরীরী আত্মাদের থেকেও ধলেশ্বরী সিরাজদিঘার মায়াডাক যে আরো তীব্র। তাকে সব ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু ওরে অস্নাত, অভুক্ত, সিরাজদিঘার পথ কত দূর, তাও তোর জানা নেই। কোন্ সাহসে যাস্।

যে টানে ভেসে যায়, তার ভয়-ডর থাকে না। ছেলেটি তখন ব্রজেরহাট ছাড়িয়ে অনেক দূর। গ্রাম্য লোক দুটো ফিরেও চায় না, কে একটা ছেলে আসে তাদের পিছু পিছু। তারা এক হাটে সওদা করে, আর এক হাটে বেচে দেয়। তারা বেচাকেনার কথায় মশগুল হয়ে চলে। ছেলেটি ধরা পড়ার ভয়ে তাদের কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারে না। কেবল পিছু পিছু চলে, আর চোখ তুলে ব্যগ্র হয়ে দেখে, কোথায় ধলেশ্বরী, কোথায় সিরাজদিঘা।...

কতক্ষণ চলে ছেলেটি, তার হিসাব করতে পারে না। সূর্য যখন মাথার ওপরে, তখন সে দেখতে পায়, ধলেশ্বরী রূপোর মতো ধারায় বয়ে যায়। ধলেশ্বরী, ধলেশ্বরী! দুই ওপারে দেখা যায় এক কালো রেখা। একটুখানি বাঁক নিয়ে, কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। কেবল ধলেশ্বরী ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলকায়। রোদে ঝলক দেয়। এত ঝলক দেয়, মাঝ নদীতে চোখ রাখাই দায়। নদীতে কত ডিঙ্গা, কত নৌকা যায়। দেখতে দেখতে ব্রজেরহাটের লোক দুটো কখন হারিয়ে যায়, তার খেয়াল থাকে না। সে সিরাজদিঘার বন্দরের দিকে চায়। কত ঘর, কত বাড়ি, তার শেষ নেই। উঁচু পাড় ধরে সেই যেন দূরের আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। কত নৌকো মাল তোলে, কত নৌকো খালাস করে, তার যেন লেখাজোখা নেই। এখানে আবার আকাশের গায়ে এখানে-ওখানে চোঙা, তাতে ধোঁয়া ওড়ে। মানুষের পায়ে পায়ে ওড়ে ধুলো। হাট নয়, গঞ্জ নয়, ছেলেটির মনে পড়ে, এ সিরাজদিঘার বন্দর। বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। এত দোকান, এত পসার। কেবল যে বেচাকেনাই হয়, তা নয়। কত কি তৈরি হয়। বিস্কুট রুটি বাতাসা মিষ্টি, পাটি মাদুর হোগলা, যা বলবে।

ছেলেটি এক দিক দিয়ে যায়, আর এক দিক হারায়। হারিয়ে আবার আর একদিকে যায়। না মেটে কৌতূহল, না সাধ। ঘুরতে ঘুরতে আবার আসে ধলেশ্বরীর ধারে। শোনে, সেখানে খেয়াঘাটের মাঝি হাঁকে, 'নাও যায় লতব্দীর চর, যাওনের লোক আছেন!'

লতব্দীর চর। ছেলেটির মনে পড়ে যায়। লতব্দী গ্রামে পিসীমার বাড়ি। তাড়াতাড়ি জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখে, দেড়খানি পয়সা, পঞ্চম জর্জের ছাপ মারা। চেয়ে দেখে, যাত্রীরা অনেকেই ছইবিহীন খেয়া নৌকায় জায়গা নিয়েছে। সে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'পার করতে কয় পয়সা!'

মাঝি একবার চেয়ে দেখে। বলে, 'পোলাপানের আধ পয়সা।'

ছেলেমানুষের আধ পয়সা, বড় মানুষের এক পয়সা। ছেলেটি আর কিছু ভাবে না। নৌকায় গিয়ে উঠে বসে। কেবল নাম শুনেছে, সিরাজদিঘার ওপারে লতব্দীর চরগ্রাম, সেই গ্রামে পিসীমার বাড়ি। চোখের সামনে ভাসে শুধু পিসীমার ঝাপসা মুখখানি। ফরসা মুখ, ঝকঝকে চোখ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। কিন্তু মুখখানি বড় গম্ভীর।

মাঝি নৌকা ভাসিয়ে দেয়।

কেন, এ ছেলে কি নোঙর ছেঁড়া নৌকা? কে তাকে টেনে নিয়ে যায়, কিসের টানে? পিছনে যারা রয়ে গিয়েছে, তাদের কথা কি তার একবারও মনে পড়ে না। সে যে এমন করে অচিন দেশে হারিয়ে যায়, তার কি একটুও বুক কাঁপে না।

কাঁপে। যখন ঢল খেয়ে যায় রোদ, তবুও লতব্‌দীর কালো রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, ধলেশ্বরীর পাড়ি শেষ হয় না, আর ক্ষুধা তার স্বভাববশে হাঁক দিয়ে ওঠে, তখন বুক কেঁপে যায়। যদি অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তবে সে পিসীমার বাড়ি খুঁজে পাবে কেমন করে। এ পাড়ি শেষ হবে কখন।

যাত্রীরা যারা বেচাকেনা সেরে ফেরে, তারা নিজেদের মধ্যে নানান কথা বলাবলি করে। ছেলেটির দিকে কেউ ফিরে চায় না। জিজ্ঞেস করে না কিছু। তারা কেমন করে জানবে, এ ছেলে অকূলে ভাসছে। কেউ-ই জানে না, এতক্ষণে ব্রজেরহাটে কী ধুম লেগে গিয়েছে।

সূর্য যখন পশ্চিমের কোলে গিয়ে ঠেকে, তখন খেয়া নৌকা নোঙর করে লতব্‌দীর চরে। ছেলেটি চেয়ে দেখে, ধারে কাছে কোনো গ্রাম নেই। সামনে ধু ধু মাঠ, মাঠের ওপারে গ্রাম, তখন ছেলেটির চোখে ভয় আর হতাশা। চোখে ভাসে জল। কোথায় পিসীমার বাড়ি, সে জানে না। যাত্রীদের এবার নজর পড়ে তার ওপর। একজন জিজ্ঞেস করে, সে কোথায় যাবে, কাদের বাড়ি। ছেলেটি তার পিসেমশায়ের নাম করে।

লোকটি হাত ধরে বলে, 'কান্দ ক্যান্, চলো আমার লগে। মহারাজের কাছে দিয়া আসি তোমারে।'

ছেলেটি ভয় পেয়ে বলে, সে মহারাজের কাছে যেতে চায় না। সে পিসেমশায়ের কাছে যেতে চায়। তার কথা শুনে হাট থেকে ফেরা যাত্রীরা হাসাহাসি করে। যে-জন নিয়ে যাবে বলে, সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার পিসেমশায়রে চিন না?

ছেলেটিকে স্বীকার করতে হয়, সে পিসীমাকে দু'-একবার দেখেছে, কিন্তু পিসে-মশায়কে না। তখন সবাই আরো হাসাহাসি করে। লোকটি বলে, 'আইচ্ছা চলো, তোমার পিসার কাছে লইয়া যাই।'

ছেলেটির হাত ধরে লোকটি হাঁটা দেয়। দু' পাশে রবিশস্য, মাঝে মাঝে কুমড়োর হলুদ ফুলে ভরা কাঠা কাঠা জমি। তার মাঝখান দিয়ে সরু পথ। সূর্য যখন ডুবুডুবু, তার ছটায় যখন সারা আকাশ লাল, তখন ছেলেটি এসে পৌঁছোয় গ্রামের এক প্রান্তে। বড় এক বটের জটায় ঝাড়ে অজস্র পাখি ডাকাডাকি করে। তার পাশেই আগল খোলা এক গোবর নিকানো উঠোন। উঠোনের তিন দিকে তিন ঘর। ঘরের ধারে ধারে অজস্র গাঁদা ফুল। সামনের ঘরটির দরজার দু' পাশে মাধবীলতা। লতা দিয়ে মাথার ওপরে গোল করে তোরণের মতো করা হয়েছে। তাতে মাধবী ফুল ফুটে আছে। সেই ঘরের মাথার ওপরে টিনের চালে একটি নিশান উড়ছে। সবই যেন নিশ্চুপ, শান্ত, গম্ভীর। কী এক গভীরতা যেন সেখানে বিরাজ করছিল। খোলা আগলের সামনে, দুটি বাঁশের মাঝখানে, টিনের ওপরে পরিচ্ছন্ন করে লেখা রয়েছে, 'রামকৃষ্ণ আশ্রম।'

অভুক্ত অস্নাত ছেলেটির ধুলো-মুখে চোখের জলের দাগ আঁকা। সে টিনের ওপর লেখা পড়ে, লোকটির দিকে অবাক হয়ে চায়। লোকটি তখন তার ফিতে বাঁধা, তালি মারা জুতো জোড়া খুলতে খুলতে বলে, 'চলো, ভিতরে যাই।' কেন? ছেলেটি ভাবে, সে তো কোনো আশ্রমে আশ্রয় চায়নি। লোকটা কি তাকে আশ্রমে দিয়ে যেতে চায় নাকি।

লোকটি ছেলেটির হাত ধরে উঠোনে ঢোকে। ঢুকতে ঢুকতেই ডাকে, 'সাধু মহারাজ আছেন নাকি?'

ডাকতে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। শ্যামলা রঙ, শান্ত

গভীর দু'টি চোখ। বয়স পঞ্চাশ হবে। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথার কাঁচা-পাকা চুল বড় বড় ঘাড়ের কাছে যেন জট পাকিয়ে গিয়েছে। পরনে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়া কাপড়, গায়ে একটু মেদ নেই। দীর্ঘ শরীর, হাত দু'টি যেন একটু বেশী লম্বা। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। একবার লোকটির দিকে, আর একবার ছেলেটির দিকে। কোনো কথা না বলে আরো কাছে এলেন।

লোকটি নিচু হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। বলে, 'এই পোলা আপনার নাম কয়—কয় যে, আপনি নাকি তার পিসামশয়।'

ছেলেটি মনে মনে মাথা নাড়ে। ভাবে, একজন সাধু তার পিসেমশায় হতে পারেন না। কিন্তু গেরুয়াধারী যেন অবাক হন। আরো কাছে এসে ছেলেটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করেন। ছেলেটি নাম বলে। কিন্তু তার চোখে তখন আবার জল এসে পড়ে।

সাধু তখন ছেলেটির বাবার নাম জিজ্ঞেস করেন। বাবার নাম শুনেই বাড়ি কোথায় জানতে চান। জবাবের আগেই তিনি ছেলেটির হাত ধরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কার সঙ্গে আইলা তুমি, কোই থেইকা আইলা?'

ছেলেটি তখন চারগ্রামের নাম বলে। সাধু বলে ওঠেন, 'হ হ, সে তো তোমার মামার বাড়ির গ্রাম।'

তারপরেই তিনি ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে ঘরে ডেকে নিয়ে যান। লোকটিকে বলেন, 'এই পোলা এইখানে কেমনে আইল জানি না। তবে আমার কাছে দিয়া খুবই ভালো কাজ করলেন। ভগবান আপনারে সুখী করবেন।'

লোকটি নমস্কার করে চলে যায়। সাধু ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আবার তার মুখের দিকে তাকান। তারপরে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের এক পাশ থেকে একটি পেতলের রেকাবিতে কয়েকটি নারকেলের নাড়ু আর দু'টি লাড্ডু খেতে দেন। নিজের হাতে গেলাসে জল গড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এইবার খাইতে খাইতে কও তো বাবা, লতব্দীতে কেমনে আইছ?'

উদ্বেগে তখন ছেলেটির গলায় খাবার যেতে চায় না। তবু খাবার পেয়ে জিভে জল এসে পড়ে। সেই সঙ্গে চোখেও। একটু একটু খায়। আর ব্রজেরহাট থেকে কেমন করে চলে এসেছে, সেই বার্তা বলে। যদিও বার্তা বলতে তার ঠেক খেতে হয় বারে বারে। লজ্জা করে, সঙ্কোচ হয়। তবু সিরাজদিঘার বন্দর আর ধলেশ্বরী নদী দেখার কথা না বলে পারে না।

সাধু শোনেন, আর একটু একটু ঘাড় নাড়েন। ছেলেটির মনে হয়, তাঁর বড় বড় চোখ দু'টিতে যেন হাসি। দাড়ির জটায়ও যেন হাসি চিকচিক করে। ছেলেটির যে চোখে জল, গলা ডুবে যায় কান্নায়, তা যেন দেখেন না, শোনেন না। খালি একবার বলেন, 'খাইয়া লও।'

ছেলেটির উদ্বেগে মন অস্থির, কিন্তু খাবার শেষ হয়ে যায় নিমেষেই। ঢকঢক করে জল খায়। এত তৃষ্ণা, কষ বেয়ে জল পড়ে যায়। ছেলেটি হাতের চেটোয় তা মুছে নেয়। কিন্তু চোখের জল সমান ধারায় বহে। চোখ তার লাল হয়ে ওঠে।

সাধু শুধু শোনেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করেন না। চুপচাপ খানিকক্ষণ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। থাকতে থাকতে তাঁর চোখ দু'টি যেন আরো ঝলক দিয়ে ওঠে। হাসিতে তাঁর দাঁত দেখা যায়। তেমনি ভাবেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। একটা কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে দেশলাই জেলে প্রদীপ ধরান। মাথা নামিয়ে ছোট একটি নমস্কার করেন। তারপরে ছেলেটির সামনে এসে গায়ের গেরুয়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেন। চিবুক ধরে বলেন, 'চলো, তোমারে দিয়া আসি তোমার আত্মীয়ের কাছে।'

ছেলেটির হাত ধরে বাইরে এসে ঘরের শিকল তুলে দেন। একবার মাধবীলতায় ঘেরা সামনের ঘরটির দিকে তাকান। তারপরে আগল ঠেলে গ্রামের পথে এগিয়ে যান।

ইতিমধ্যে অন্ত্যছটায় সারা আকাশের রক্তিমায় কালির ছোপ লেগেছে। ঈষৎ রক্তাভ পশ্চিমের আকাশ গাছের আড়ালে-আবডালে চোখে পড়ে। সন্ধ্যা নেমেছে। পাখিদের ডাকাডাকি শেষ হয়েছে। চারদিকেই একটা স্তব্ধতা। কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। তার মধ্যেই দু'-একটা পাখির চকিত ডাক যেন ভীরু জিজ্ঞাসার মতো বেজে ওঠে।

সাধু এঁকেবেঁকে গ্রামের নানান পথ ধরে প্রায় আর এক প্রান্তে আসেন। এসে একবার দাঁড়ান একটি বড় পাকা কোঠার সামনে। বড় কোঠা একতলা। উঁচু বারান্দা, কয়েক ধাপ লম্বা সিঁড়ি। সেইখানে দাঁড়িয়ে সাধু একবার কপালে হাত ঠেকান। তারপর সেই কোঠার শেষে টিনের চাল দেওয়া কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো টিনের বেড়া এক ঘরের সামনেই দাঁড়ান। ঘরের দরজা এদিকে নয়। সামনেই একটা উঠোন দেখা যায়। উঠোনে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বলছে। একটু আগেই সন্ধ্যা দেখানো হয়েছে। উঠোনের এক পাশে একটা লাউমাচা দেখা যায়। সাধু আর অগ্রসর না হয়ে সেখানেই দাঁড়ান। ডাক দেন, 'সুরবালা! সুরবালা!'...

ছেলেটির মনে পড়ে যায়, এই তার পিসীমার নাম। বাবার মুখে সে অনেকবার শুনেছে। কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু পরেই পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। আলোর রেশ চোখে পড়ে। হ্যারিকেন হাতে কপাল অবধি ঘোমটা ঢাকা এক বউ এসে দাঁড়ায়। বউটির কপালে সিঁদুর, সিঁথেয় সিঁদুরের রক্তাভা, পরনে লালপাড় শাড়ি, হাতে শাঁখা ও নোয়া। ফরসা রঙ, ঝকঝকে চোখ। ছেলেটির বুকের ভিতর নিঃশব্দে বেজে ওঠে, 'পিসীমা, পিসীমা!'...

কিন্তু এ পিসীমা যেন সে রকম নন, যেমন তাঁকে অন্য সময় দেখা গিয়েছিল। এ মুখ যেন অন্যরকম। গম্ভীর নয়, অথচ গম্ভীর। সন্ধ্যাবেলার মতোই ছায়া-ছায়া, নিশ্চুপ, স্তব্ধ। তিনি এসে একবারও ছেলেটির দিকে তাকান না। সাধুর দিকে চোখ তুলে দেখেন।

সাধু বলেন, 'এই তোমার দাদার পোলা, একজন দিয়া গেল, চারগ্রাম থেইকা আইছে। এর মুখেই সব শোনবা।'

পিসীমা যেন চকিত হয়ে ছেলেটির দিকে তাকান। তার নাম ধরে ডেকে ওঠেন, 'এ কি, তুই?'

ছেলেটির চোখে তখন আবার জল এসে পড়েছে। সে সাধুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে পিসীমাকে জড়িয়ে ধরে। পিসীমা তাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সাধুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার, কিছুই তো বুঝি না?'

গলায় তাঁর উদ্বেগ। সাধু কিন্তু হাসেন। বলেন, 'পোলাপানের মন, স্বপ্নের মধ্যে ডাক শুইনা দৌড় দেয়। সব কথাই ওর মুখে শোনবা। আইজ রাত্রে আর হইব না, কাইল সকালেই আমি লোক পাঠাইয়া চারগ্রামে খবর দিয়া দিমু।'

বলেও তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। পিসীমাও নীরব। ছেলেটি পিসীমার কোলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে একবার সাধুর দিকে দেখে। দেখে, সাধু তাকিয়ে আছেন পিসীমার দিকে। তাঁর চোখে যেন সেইরকমই একটু হাসি। হ্যারিকেনের আলোয় তাঁর চোখের মণি দুটো আকাশের তারার মতো দেখায়। পিসীমা মাথা নামিয়ে মাটির দিকে চেয়েছিলেন। সাধু বললেন, 'সুরবালা, আমি তা হইলে যাই?'

পিসীমা কোনো কথা বলেন না। হাত থেকে হ্যারিকেনটা নামিয়ে রাখেন। ছেলেটিকে হাত ধরে কোলের কাছে সরিয়ে আঁচল টেনে গলবস্ত্র হন। সাধু বলে ওঠেন, 'না, তোমারে তো কতদিন কইছি, এইরকম কইরো না। আমি যাই।'

তারপরেই প্রসঙ্গ বদলান। জিজ্ঞেস করেন, 'পোলা-মাইয়ারা সব ভালো আছে তো?'

পিসীমা বলেন, 'আছে।'

শুধু এই একটি কথা। তারপরে মাটিতে জানু পেতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। কিন্তু সাধু তখন পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছেন। পিসীমা মাথা তুলে দেখেন না। সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ থাকেন।

ইতিমধ্যে ছেলেটির লক্ষ্য পড়ে, ঘরের কোণে তিনটি ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। একটি বছর তেরোর মেয়ে। বেড়া-বেনুনি বাঁধা, একটা শাড়ি জড়ানো তার রোগা গায়ে। তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে। আর একজন মেয়েটির থেকে বড়। তারা সবাই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি ফিস্‌ফিস্‌ করে ছেলেটির নাম ধরে ডেকে বলে, 'তুই অমুক না?'

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার পিসতুতো দাদা এবং ভাইবোনদের চিনতে পারে। সে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা সবাই তাকে জড়িয়ে ধরে। ছেলেটি প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, 'ওই সাধুটা কে?'

ছোট পিসতুতো ভাইটি বলে ওঠে, 'আমাগো বাবা।'

ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবে, কেন, তার পিসেমশাই সাধু কেন? তিনি কেন গ্রামের এক প্রান্তে আশ্রমে সাধু হয়ে থাকেন।...কিন্তু ছেলেটি তার সারা জীবনেও কখনো জানতে পারেনি কেন তার পিসেমশাই সাধু হয়েছিলেন—সংসার ছেড়ে আশ্রমে বাস করতেন। সারা জীবনে সে পিসেমশাইকে দু'-একবারই দেখেছে। পিসীমাকে অনেকবার। পিসীমার শান্ত স্বল্পবাক্‌ উজ্জ্বল গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার চিরদিনই মনে হয়েছে, বিশ্বসংসারের সব কিছুকে হয়তো চেনা যায় না, দেখা যায় না। কিন্তু কী একটা যেন অনুভব করা যায়, যে অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কোনো নাম দেওয়া যায় না। সেই নামহীন ব্যাখ্যাহীন অনুভূতি দিয়ে শুধু এইটুকু সে বুঝেছে, লতব্‌দীর সেই দম্পতির মাঝখানে যে বিচ্ছিন্নতা, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা সেতু আছে। যে সেতুতে, মনে হয়, চোখের জল এবং হাসি দুই-ই আছে, আর আছে এক অনাবিষ্কৃত রহস্যের সম্পর্ক।

এই ঘটনার সাত দিন পরে পিসীমার বাড়িতে একদিন ঠিক দুপুরে এল একদল লোক। যে দলের মধ্যে ছিল ছেলেটির বাবা মা দিদি মেজদা আর দিদিমা, সঙ্গে ইন্দির। তারা এল যেন একদল ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ব্যাধের মতো। যে পাখিটা খাঁচায় বাঁধা পড়েছে তাকে ধরবার জন্যে। চোখে তাদের ব্যগ্র জিজ্ঞাসা, অথচ শিকার পাবার কঠিন উল্লাস। ছেলেটির এইরকমই মনে হয়েছিল। তাই সে তখন দৌড়ে গিয়ে পিসীমার খাটের তলায় অন্ধকার কোণে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কেবল মেজদার তীব্র গলা শোনা যায়, 'ওই যে, খাটের তলায় গেছে।'...

ছেলেটিকে খাটের তলা থেকে গাদাখানেক ঝুল-কালি-ধুলো মেখে শেষ পর্যন্ত বেরোতেই হয়েছিল। আর বেরিয়েই, সামনে সারবন্দী দাঁড়িয়ে বাবা, মা, দিদিমা, দিদি, মেজদা। তার সঙ্গে আর এক পাশে পিসীমা, তাঁর ছেলেমেয়েরা। ইন্দির নিশ্চয়ই বাইরের উঠোনে ছিল, কারণ ঘরে ঢোকবার অধিকার ওর ছিল না। ছেলেটি চোখ তুলে তাকায়নি। কেবল তার গাল দুটো আর পিঠটা সুড়সুড় করছিল। কখন শাস্তি নেমে আসবে।

কিন্তু তার বদলে প্রথমেই বাবার হুঙ্কার শোনা গিয়েছিল, 'দেখ, গরু-চোরটাকে দেখ!'

গরু-চোর! ছেলেটি একবার চকিতে সকলের দিকে না তাকিয়ে পারে না। তার মধ্যেই সে দেখতে পায় পিসীমার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখেও একটু হাসির ঝিলিক খেলে যায়। তিনি আঁচল চেপে দেন মুখে। তাঁর ছেলেমেয়েদের মুখও হাসি হাসি। এমন কি, মায়ের চোখে জল থাকা সত্ত্বেও ঠোঁটের কোণ দুটো টিপে ধরেন। যেন তাঁর হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। তার চেয়ে অবাক, দিদির ঝলসানো চোখ পাকানো থাকলেও মুখে হাসি ফুটে

ওঠে। কিন্তু শব্দ পাওয়া যায় না। শরীরটা কাঁপতে থাকে। কেবল মেজদার ডগলাস ফেয়ার-ব্যাংকস্-এর ক্ষ্যাপাচণ্ডী মুখে হঠাৎ একটা অবাক জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। সেও বাবার দিকেই তাকায়। কারণ, ছোট ভাইয়ের জিজ্ঞাসাটা তার মনেও ঝলক দেয়, বাবার গরুচোর বলার অর্থ কী। ছেলেটি ভাবে, সে আবার গরু চুরি করল কবে। কখন, কাদের গরু। আর গরু চুরি করে সে করবেই বা কী। কিন্তু দশ বছরের ছেলেটি প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। আবহাওয়া মোটেই সুবিধার নয়। এমনিতেই কী শাস্তি তার কপালে আছে, সে আন্দাজ করতে পারছিল না। তার ওপরে গরু চুরি করেনি, এ কথা বলতে গিয়ে বাবাকে ক্ষ্যাপাতে সাহস পায় না। তবে পিসীমা, সাধু পিসেমশাই, সবাই জানেন, গরু সে চুরি করেনি।

তারপরে শুরু হয় জেরা। কিন্তু আশ্চর্য, বাবার দিক থেকে নয়। জেরা শুরু করে দিদি। বাকীরা সব শোনেন। কেবল মেজদারই হাত নিসপিস, একটা 'ফাইট' না ঝাড়তে পারলে ওর শান্তি হচ্ছিল না। তবে বড়দের সামনে সে স্বাধীনতা ওর ছিল না। কিন্তু জেরার জবাবে ছেলেটি যা বলছিল, তার কার্যকারণ মাথামুণ্ডু কেউই বুঝতে পারছিল না। 'কেন সে ওরকম করে চলে এসেছিল' এর জবাবে ছেলেটির সেই এক কথা, 'এমনি ইচ্ছা হয়েছিল। কেন, তা সে জানে না।'

মায়ের আর ধৈর্য থাকেনি। তিনি ঠাস্ করে এক চড় কষিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'জানবি কেমনে, তরে যে ভূতে ধরছিল।'

বলে আর একটি চপেটাঘাত, আর তার সঙ্গে শপথ, 'তর ঘাড়ের থেইক্যা আমি ভূত ঝাড়াইয়া দিমু।'

আর একটি চপেটাঘাতের আগেই, পিসীমা মায়ের হাত ধরে ফেলেন। আর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেন, 'না ঠাকুরঝি, হুতাশে আইজ চার দিন আমার গলা দিয়া ভাত নামে নাই, চক্ষের পাতা বুজি নাই।'

পিসীমা মাকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করেন। দিদিমা ছেলেটির গায়ের ঝুল-কালি পরিষ্কার করেন, আবার তার মধ্যে দু'-চার ঠোনাও লাগান। দাঁতহীন মাড়িতে মাড়ি ঘষে গালাগাল দেন, 'শহইরা বান্দর!'

অর্থাৎ 'শহুরে বাঁদর'। আবার থান কাপড়ের ঘোমটা খসে যায় বলে সেটাও তাড়াতাড়ি টেনে দেন। জামাই যে কাছেই দাঁড়িয়ে! আশ্চর্য এই, বাবা তখন একেবারেই নিস্পৃহ, জামা ছাড়তে ব্যস্ত হন। ওদিকে পিসীমা তাঁর কন্যাকে নির্দেশ দেন মামার জন্য একটু তামাক সাজতে। তারপরেই এক হ্যাঁচকায় দিদি টেনে নিয়ে যায় ছেলেটিকে। উদ্দেশ্য নাকি, ছেলেটিকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করবে। যার অর্থ, আরো কয়েক প্রস্থ ঠোনা ও চুল টানা। মেজদা ওত পেতেই ছিল। কিন্তু সুযোগ পেতে পেতে সেই বিকেলে, দল বেঁধে খেলতে বেরিয়ে একখানি মোক্ষম 'ফাইট' না দিয়ে ও ছাড়েনি। অথচ, মা বাবা দিদিমা, সবাইকে পিসীমা বলেছিলেন, 'যাউক, তবু হ্যামড়াটা পলাইয়া আইছিল, তাই সকলের লগে একটু দেখা হইল।'...কেবল গরুচুরির অভিযোগটা আর ওঠেনি।

গাজীর কথায় আমি সেই ছেলেটিকেই দেখতে পাই। যাকে আমি কোনোদিন ছাড়িয়ে যেতে পারিনি। সেই যে অবুঝ অচিনের টানে কোথায় চলে যায় জানে না। যে ঘর পালিয়ে খেলতে যায়, খেলতে গিয়ে হারায় অকূলে। জানে না, কার টানে, কিসের সন্ধানে। কেবল অবাক লাগে গাজীর কথা শুনে। চোখে ওর দুষ্টামি, ও গাজী না পাজী। কিন্তু ও কি অন্তর্যামীও? ও কি আমার পিছু পিছু আসে সেই জন্মলগ্ন থেকেই? আর এই আঙুরি-আঙুর মাহাতোবউটি; তার কাজলকালো হাসি চলকানো ডাগর চোখেও কি সেই ছেলেটিকে দেখতে পায়? যার চোখে সকলই খেলা, সকলই

বিস্ময়। কেন, কে আমাকে এমন অবাক কাজল পরিয়েছে। যা দেখি, সবই বিচিত্র, সবই অসামান্য।

'অ গাজী, তোমার বাবুর ভর হলো নাকি?'

কথার সঙ্গে হাসির ঝঙ্কার। পাশে তাকিয়ে দেখি, আঙুরির মুখ। ধানকাটা মাঠের আল পথ পেরিয়ে কখন উঠে এসেছি বড় সড়কে। এখন আমার এক পাশে আঙুরি, আর এক পাশে গাজী। মাহাতো চলে আগে আগে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ন্যাজাটের আকাশের পশ্চিম কোণে রক্তাভায় কালি পড়তে আরম্ভ করেছে। যে দূরগামী পথকে দেখেছিলাম অস্তচ্ছটায় সধবার সিঁথির মতো লাল, সেই নাক বরাবর পথকে এখন ছায়ামাখা ধূসর দেখি। বনচড়াইয়ের ঝাঁক চোখে পড়ে না আর। পাখিগুলোর ডাক থেমে এসেছে। আঙুরির কথায় সংবিৎ ফিরে পাই। তার দিকে ফিরে চাই। সে চোখের এক কোণে চেয়ে কালো তারা সরিয়ে নিয়ে যায় অন্য কোণে। গাজী বলে, 'ভর তো বাবুর হয়িই আছে, চাচী। এ যে ঘোরের মানুষ।'

আঙুরি কথা চালায় গাজীর সঙ্গে, নজর চালে অন্য দিকে। ঘাড় বাঁকিয়ে একবার আমার দিকে দেখে বলে, 'কেন, মানুষ তো কাঁচা, তার এত ভর ঘোর কিসের?'

'তা বললি কি হয়, চাচী। ভর যাঁনাদের হয়, তাঁদের কাঁচা-পাকা নাই।'

আঙুরি ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'তা নয় বুঝলাম, কাঁচা-পাকা নাই। তোমার বাবুর হয় কেন?'

মাহাতো ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, 'দ্যাও, এখন 'জব' দ্যাও, হয় কেন, নইলি ছাড়ান নাই।'

গাজী হাসে, আমি হাসি। স্বামীর ঠাট্টায় আঙুরি জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটে। 'অ্যা হ্যা হ্যা, তোমাকে বলেছে ছাড়ান নাই। তুমি চুপ করো দিকিনি।'

মাহাতো মুখ ফেরায় না। চলতে চলতে সামনের দিকে মুখ রেখেই বলে, 'অই দেখ, আমি তোর হয়িই তো বলি। কথার জব চাই না? এমনি এমনিই কথা নাকি?'

বুঝতে পারি। মাহাতো মশাইয়ের উলটো দিকে ফেরানো কালো প্রকাণ্ড মুখে বিটলে হাসি ঝলকায়। সাহস করে ফিরে তাকাতে পারে না। পাছে গিন্নীর চোখে হাসি ধরা পড়ে যায়।

আঙুরি বলে, 'এমনি হোক অমনি হোক, তোমাকে কথা বলতে বলেছে কে?'

মাহাতোর সেই এক ভাব। মুখ ফেরাবার নাম নেই। ঘাড়ের কাছে মাংসের চাপে ঘাড় গর্দান প্রায় এক। যেন জাম্বুবান চলেছে। আওয়াজ আসে, 'তা কেউ বলে নাই। তা অই কথা শুনলি কথা কইতি ইচ্ছা করে কি না, তাই। আচ্ছা চুপ করলাম।'

ভেবেছিলাম, আঙুরি বুঝি আবার ঝামটে উঠবে। মাহাতোর কথার মধ্যে হাসি রহস্যের সুরটুকু তো ছিল। কিন্তু আঙুরি নিশ্চুপে হাসে গাজীর দিকে চেয়ে। আবার কর্তার দিকেও তাকায়। তাকিয়ে ইশারা দেয় গাজীকে। যেন বলতে চায়, 'তোমার মাহাতো চাচাটি ভারি পাজী, খুব চিনি।' তারপরে একবার নজর চালিয়ে দেখে নেয় আমাকে।

গাজী বলে, 'বাবুকে তুমি নিজিই পুছ্ করো তয়, ভর ঘোর কেন হয়।'

কিসের ভর, কিসের ঘোর, তাই বুঝি না। কী মনে হয় আঙুরির, কী বলতে চায় সে। কী কথা বা বলাবলি করে তারা, কে জানে। দেখি, আঙুরি হাসে। হাসে আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসি চাপে। আর ঘন ঘন দৃষ্টি চালে। তারপরে হঠাৎ শুনি, 'কই গো বাবু, বলো না কেন?'

এবার সরাসরি, সোজাসুজি। ঘাড় কাত করে কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি কথা। অবাক লাগে, চমক খাই। হেসে বলি, 'কী বলব, তাই তো বুঝি না। কিসের ভর, কিসের ঘোর।'

আঙুরির বিশ্বাস হয় না, ধন্দ লাগে। তাই অবিশ্বাসে ঘাড় বাঁকায়। ঝিলিক হানা চোখ দুটো কেমন করে যেন পাকায়। পান রাঙানো ঠোঁট ফুলিয়ে গাজীকে বলে, 'শুনলে তো কথা? তোমার বাবু ঘোর ভর বোঝে না।'

গাজীর ফাটা ঠোঁট হাসিতে এ গাল ও গাল ছড়িয়ে যায়। লাল দাঁত দেখিয়ে বলে, 'বুইতি পারলেন না বাবু! চাচী জিগেস করে, বাবু আমার এমন কাঁচা, তয় কেন দেওয়ানা হয়ি ঘোরেন।'

'দেওয়ানা কোথায় দেখলে? আমি ঘুরতে বেরিয়েছি।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'তাই দেখি কি কথা বাবু। ভাব দেখি কথা হয়, কথা শুনি কথা হয়।'

আঙুরিও তার সঙ্গে জোড়ে, 'দেখে বিবাগী লাগে।'

গাজী আরো যোগান দেয়, 'চোখ-মুখগুলোন তো আর রেখি আসতে পারেন নাই।'

আঙুরি বলে, 'যেন ঠাঁইনাড়া মানুষ, ঠাঁই কোথায় জানে না। কেন?'

এত কথা তো ভেবে দেখিনি। এমন জিজ্ঞাসাবাদের জবাবও তাই জানা নেই। কী এক টানে যেন চলি, যে টানের নাম জানা নেই। সেই চলার নির্দেশ কী, তার খবরও পাইনি। তবে দেওয়ানা এই, এইটুকু জানি। বিবাগী নই, তাও জানি। ঠাঁইনাড়া হয়ে ঠাঁই খুঁজে ফেরার মানুষও আমি নই। সংসারেতে দানা খুঁটে অন্ন পাই। জীবন-যাপনের ভাবনা আমার পাকে পাকে জড়ানো। নিরাপত্তার চিন্তা আমাকে কখনো ছেড়ে যায় না। জগৎজনের সকলের সঙ্গে আমি একাকার, সকলের সঙ্গে আমার পা পড়ে। দেওয়ানী বিবাগী আমি নই। তবু, সেই যে এক নাম-না-জানা টান, যার নাম হদিস কিছুই জানা নেই, তার ব্যাখ্যা করি, সে ভাষা আমার অজানা। অতএব, এদের কথার কী জবাব দেবো, বুঝতে পারি না।

আঙুরি তখনো বলে, 'লোকে বলে, "জানাও মনে মনে জানা"। তা, তোমার তো দেখি, চোখ দু'খানি ঠিক আছে, মনের যেন ঠিক-ঠিকানা নাই। কেন, ঘর গিরস্তি বসত সংগত নাই নাকি?'

বলে আঙুরি একটু চোখ ঘুরিয়ে ভুরু নাচায়। আমি যেন দেখি, সব মিলিয়ে আঙুরির শরীর ঘিরে অপরূপ এক নাচের ছন্দ। কিন্তু কথা বলবার আগেই ওদিক থেকে মাহাতোর আওয়াজ আসে, 'হ্যাঁ জব দিতি হবে, জব চাই।'

শুনে আমার হাসি সামলানো দায় হলো। দেখি, মাহাতোর কাঁধের ব্যাগটা পর্যন্ত কাঁপে। হাসিতে সেও ফুলছে। এদিকে ভুরু কুঁচকে আঙুরি চায় গাজীর দিকে। গাজীও হাসি চাপতে পারে না। বলে, 'চাচার যে কথা।'

আঙুরি বলে, 'অ, সবাই মিলে আমাকে ঠাট্টা করছ?'

মাহাতো এবার ফেরে। যদিও হাসিতে তার কালো মস্ত মুখখানি ঝকমকিয়ে রয়েছে। হাসি চাপতে চাপতে বলে, 'কেন, মন্দ কী বলিছি। অ মশাই, জব দেন না!'

আঙুরি অমনি ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'ফের তুমি কথা বলছ?'

মাহাতো তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না।'

মাহাতোর মধ্যে যে এমন একটি দুষ্টু রসিক রগুড়ে আছে, এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, বংশধরের ক্ষুধায় একটা লোক, দশে মিলে চলে। আসলে কোথায় যেন একটা ক্লান্তিতে সে নত, বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু সে যে এমন রসের ধারায় টগবগানো, ধরতে পারিনি। আঙুরির সামনে গলা খুলে হাসতে পারি না। নিঃশব্দে ফুলে ফুলে উঠি। গাজীর অবস্থাও সেই প্রকার। হাসি চাপতে গিয়ে সে দাড়ি ঝাড়া দিয়ে ডাক দিয়ে ওঠে, 'জয় মুরশেদ!'

আঙুরি যেন রেগে বলে, 'দু' চোখে দেখতে পারি না।'

অথচ দেখতে না পেরেও ব্যাগ কাঁধে, কোমরে চাদর বাঁধা, আগে আগে চলা, ঘাড়ে গর্দানে মাংসল কালো লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। তারপরে আমার দিকে ফিরে ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ছিটিয়ে দেয়। কপট রাগ, বিষ নেই, এই কথাটা জানতে পারি। এবার আমার জবাবটা তার পাওয়া উচিত। তাই বলি, 'সে সব কিছু নয়, আমার সবই আছে।'

আঙুরি অমনি বলে ওঠে, 'তাই কি মানি নাকি! মিছে কথা।'

'না, সত্যি বলছি।'

'তবে কি আমরা চোখের মাথা খেয়েছি নাকি?'

অবাক হয়ে বলি, 'কেন?'

আঙুরি বলে, 'সব থাকলে কাউকে এরকম দেখায় নাকি। যেন দিশ-দিশা নাই, ঘরছাড়া, মানুষের ঠিক নাই।'

এতটা মেনে নেবো না। কিন্তু এই যে আঙুরি, এর চোখ আর মন আমার নয়। ওর দেখা বোঝাটাকে আমি সহসা বদলাতে পারি না। তাই যুক্তি তর্কে যাবো না। হেসে বলি, 'সেটা তা হলে আমার কপালের দোষ।'

অমনি গাজী আওয়াজ দেয়, 'অই শোনো, কথা কাকে বলে।'

আঙুরি ঘাড় ফিরিয়ে চায়, হঠাৎ কিছু বলতে পারে না। বলতে পারে না, কিন্তু চোখ সরিয়ে নেয় না। তার কালো ডাগর চোখে যেন কুলুপকাঠি। আমার মুখের দরজায় তালা খুঁজে ফেরে। দৃষ্টি দিয়ে, বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে খোঁজে। খুলবে, ধন্দ ঘুচিয়ে দেখবে।

ওদিকে মাহাতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। দূরত্ব কমিয়ে সকলের সঙ্গ ধরে আমাকে বলে, 'উইটি মশাই আপনার ঠিক কথা নয়। তখন থেকি আমারও মন বলছে, এ লোকের ছাঁদন বাঁধন নাই।'

ভেবেছিলাম, আর একবার হাসির জোয়ার লাগবে। কিন্তু মাহাতো মশাইয়ের ভাবভঙ্গিতে তার হদিস নেই। আমার থেকে সেটা আঙুরি বেশী বোঝে। তাই সে স্বামীর সঙ্গে তাল দিয়ে বলে ওঠে, 'আমি তো সে কথাই বলছি গো। বয়সের বেলা দেখলে বোঝা যায় না। তা, এই বেলাতে কেউ ঠিকেনা ছাড়া ঘোরে!'

বলে আঙুরি হাসে। নিছক হাসি নয়, তাতে সপ্রশ্ন গাম্ভীর্যেরও ছোঁয়া আছে। কী বলবে বলো। বলার কিছু নেই। সকলেরই নিজের নিজের মন আর স্বভাব বলে কথা আছে।

মাহাতো বলে, 'তবে অই যে শুনলি, সব নাকি ওনার কপাল দোষ।'

আঙুরি বলে, 'সে দোষ তা হলে কাটিয়ে দিই আমরা।'

সে ওষুধ জানা আছে নাকি আঙুরলতার? অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, তার ডাগর চোখের কালো তারায় কী এক গুপ্ত কথা চিকচিক করে।

মাহাতো বলে, 'কী করি?'

'ঘরে নিয়ি ধরে রাখব।'

সর্বনাশ! ভেড়ি-বাঁধের নোনা কূলে এইটুকু কি বাকী নাকি আমার! মাহাতোর লাল চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে। বলে, 'অই বাবা, ঘরে নিয়ি ছোঁড়া ধরি রাখবার মন তোর?'

কথা শুনে আঙুরি হঠাৎ লজ্জা পায়। হাসতে গিয়ে ভুরু কোঁচকায়। ঘাড়ে দোলা দিয়ে ঘোমটা টেনে ধমক দেয়, 'আহ্ ছি, কী মুখ গ! আমি ধরে রাখব বলেছি নাকি?'

মাহাতো যেন অসহায় হয়ে একবার গাজীর দিকে চায়। বলে, 'তয়?'

'কেন, আমার মেয়ে নাই? আমার চাঁপা নাই ঘরে?'

শুনে মাহাতো আর গাজী একযোগে অট্ট হেসে মাঠ কাঁপায়। আমি ভাবি, ছোঁড়া ধরবার ফাঁদ যে মেয়ে, সে বিষয়ে আঙুরির নিজস্ব মতে ভুল নেই। কিন্তু সন্তানের মানত করে যে ফেরে সেই রাঢ়ের তারকেশ্বর থেকে, তার আবার চাঁপা নামের মেয়ে কোথায় থাকে।

হাসি শুনে আঙুরি বলে, 'তা অত হাসবার কী আছে। মেয়ে কি আমার ফ্যাল্না নাকি। এমন একটা ছেলে কি পাওয়া যাবে না?'

যাক্, সে মেয়ে যেই হোক, এটা জানা গেল, আঙুরি শাশুড়ী হয়ে আমাকে ধরে রাখতে চায়। এমন নির্যস ঠাট্টা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখব, ভাবতে পারি না। মাহাতোও সেই কথাই বলে, 'তাই বল্, তোর চম্পাবতীকে দিয়ি ছেলে ধরবি। তা, মেয়েকে আমাদের কেউ ফ্যাল্না বলতি পারবে না।'

আঙুরি আবার বলে, 'আর আজকাল জাতের কথা অত কেউ ভাবে না।'

এতখানিও আঙুরির জানা আছে। সে আরো বলে, 'ঘর দেবো, জমি দেবো, মেয়ে দেবো, কোনো কিছুতে ফাঁক রাখব না। দেখ, রাজী আছ?'

আমাকেই জিজ্ঞস করে। এমন দুর্দিনে এরকম ঘর-জামাই ব্যবস্থা মন্দ কী। হাসতে হাসতে বলি, 'আর আমি চোর না ডাকাত, সে ভাবনা নেই?'

আঙুরি বলে, 'তা আমরা বুঝব।'

তাও তো বটে। আঙুরির তাতে থোড়াই ডর। ডাকাতের রক্ত আছে তার হাতে। বেশী এদিক ওদিক করলে তার ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পারবে। জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু মেয়ে এল কোত্থেকে?'

আঙুরি জবাব দেয়, 'যেখান থেকে আসে। বাপ-মায়ের মেয়ে। দু' বছরের মেয়ে যখন, বাপ-মা দুটোই গেল ওলাওঠায়, সেই থেকে আমার কাছে। এখন বয়স তের বছর।'

তা কম নয়, উপযুক্ত বয়স বটে। আজ ও বেলাতেই তার নমুনা দেখেছি। লঞ্চে উঠতে গিয়ে সাঁকো থেকে পাঁকে পড়ে-যাওয়া সেই ভোট জড়ানো বউ। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যার ছায়া কখন অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ চলেছি, তার হিসাব নেই। খেয়াল হলো, মাটিতে ছায়ার নড়াচড়া দেখে। দেখি, মাথার ওপর প্রায় আধখানা চাঁদ, অন্ধকারের সঙ্গে লড়ে। তাতে আলোও আছে, অন্ধকারও দূর হয় না। দুয়ের এ ভাগাভাগিতে সকলই স্পষ্ট-অস্পষ্টের মাঝামাঝি খেলা করে। দূরে গাছের অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যায়। চেনা যায় কেবল মাঠের মধ্যে দু'-একটি নারকেল-সুপারি গাছ। ঝিঁঝির ডাক সহসা যেন চড়া সুরে বেজে ওঠে।

আঙুরি কখনো বলে, 'মেয়েও আমাদের দেখতে সুন্দর, তাই না? কি বলো গো?'

মাহাতোর জবাবে আবার একটা হাসির জোয়ার লাগবে, সেই আশাতে থাকি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে শুনি, মাহাতোর গলায় কেবল শব্দ বাজে, 'হুম্।'

এতক্ষণে সহসা আমার সন্দেহ হয়, আঙুরি ঠাট্টা করে না। একে সারল্য বলে না অজ্ঞানতা বলে, বলতে পারি না। কিন্তু নিজের ভাগ্যের দিকে চেয়ে মনে মনে না হেসে পারি না। কোন্ এক মাহাতো-বউয়ের কল্পনাকে যে আমি এতখানি উস্কে দিতে পারি, ধারণা ছিল না। আঙুরি কথা বলে না, প্রস্তাব করে। বলে চলে, 'ফরসা রঙ, একপিঠ চুল, এত বড় চোখের ফাঁদ...।'

আঙুরি কথা শেষ করতে পারে না। মাহাতো বলে ওঠে, 'এই দেখ্ আঙুরি, এবার থাম। পাগল হলি নাকি।'

অস্পষ্ট আলোয় দেখি, আঙুরি আমার দিকে একবার চায়, আবার স্বামীর দিকে। মাহাতো তখন তার স্ত্রীর পাশে। আবার বলে, 'সোম্সারটা ভগবান তোর মতন গড়ে

নাই। যাকে তোর ভালো লাগবে, তাকেই তুই ধরি রাখতি চাইবি, তাই কি হয় নাকি। উনি এলেন কোত্থেকি, যাবেন কম্‌নে, তুই চাঁপা দিয়ি ধরবি ওনাকে।'

বলে একটু থামে। তারপরে আবার বলে, 'অনেক দূর আসা হয়িছে, আর না। এবার এরা ফিরে যাক। ফিরতি হবি তো আবার।'

বলে সে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা সবাই দাঁড়াই। আমাদের পাশেই একটা নাম-না-জানা ঝাড়ালো বেঁটে গাছ। এমন ঝাড়ালো, একেবারে নিশ্ছিদ্র। তাকে ঘিরে ঝিকিমিকি জোনাকি জ্বলে। আকাশে জ্বলে মিটি মিটি তারা। অস্পষ্ট আলোয় তাকাই আঙুরির দিকে। আঙুরি আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে। যদি ঠিক দেখে থাকি, তবে তার চেয়ে থাকার মধ্যে তখনো জিজ্ঞাসা। আমি বলি, 'এবার তবে ফেরা যাক।'

তবু একবার আমার বলতে ইচ্ছা করে যে, আমি তার ফরসা রঙ, একপিঠ চুল, বড় চোখের ফাঁদ চম্পাবতীকে নিয়ে ধরা দিয়ে থাকতে পারব না তার জন্যে দুঃখিত। বলতে গেলে পাছে এই নিরর্থক প্রসঙ্গ আরো দীর্ঘতর হয়, তাই বলতে পারি না। কিন্তু আঙুরিও আর তা বলে না। আসলে ভর আর ঘোর, আমার নয়, আঙুরির। তার মধ্যে কোনো বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন নেই। স্বামীর কথায় তার সংবিৎ ফেরে। কেবল বলে, 'তবে বাপু, এ বেলাতে এমন ঠিক-ঠিকানা ছাড়া ভালো নয়, এই বলে দিলাম। আমাদের ভোলাখালিতে আসবে কবে?'

বলি, 'সময়ের কথা ঠিক করে বলতে পারি না। এক সময়ে ঠিক এসে পড়ব।'

আঙুরি বলে, 'যার নিজের কোনো ঠিকানা নাই, সে কি ঠিক করে কিছু বলতে পারে?' এ কথার কোনো জবাব দিতে পারি না। কেন না, জানি, এ কথা দেওয়াও অবাস্তব। আজ, এই মুহূর্তে যে আমি এখানে, তাও যেমন হিসাবের বাইরে, কথা দেওয়াটাও তেমনি হবে। কিন্তু মনে মনে বলি, ভোলাখালিতে একদিন আমি আসব। যেন আসতে পারি।

এই সময়ে মাহাতো ফস্‌ করে একটা বিড়ি ধরায়। আঙুরি সেদিকে তাকিয়ে বলে, 'অ মা, একটা বিড়ি ধরালে? আমাকে একটা দিলে না?'

মাহাতো প্রায় ধমক দিয়ে বলে, 'না। বিড়ি খাওয়া না তোর বারণ! ডাক্তার ইস্তক বলিছে, তবু নিশা ছাড়তি পারে না।'

বলেই আমার দিকে ফিরে বলে, 'অ মশাই, আপনাকে তো জামাই করতি চায়। আপনি একটু বারণ করেন তো।'

অমনি আঙুরি ঝামটা দেয়, 'দেখ, মিছা কথা বলো না। এখন কি দু'-তিনটার বেশী খাই নাকি। তাই বা বলো আমাকে নিশা ধরালে কে? রোজ একটু একটু করে খাইয়ে তুমিই তো ধরিয়েছ।'

গাঙ চলছিল ডাইনে। একবার মোড় ফিরে বাঁকা স্রোতে বাঁয়ে। কথা ছিল কোথায়, আসে কোথায়! ভাবলাম বুঝি, এই নিয়ে লাগে। কিন্তু মাহাতো তাড়াতাড়ি সুর নরম করে বলে, 'আচ্ছা, এটাই খাস। চল, আর দেরি করিস না।'

আঙুরির রোষটা তখনই যায় না। বলে, 'দেখ না, অমনি দুষতে আরম্ভ করেছে।'

মাহাতো আমাদের উদ্দেশে একবার হাত তোলে। বলে, 'চলি। সময় করতি পারলি ভোলাখালি আসবেন।'

খোলা প্রাণের নিমন্ত্রণ। জবাবের প্রত্যাশা নেই। সে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করে। আঙুরি আর একবার তাকায়। বলে, 'কথাটা মনে রেখো গো, গাজীর বাবু। একবার এসো।'

গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'তুমি তাড়াতাড়ি একদিন এসো।'

বলে সে চলে যায়। গাজী বলে, 'আসব, চাচী।'

আমি আর গাজীও ফিরি। কয়েক পা গিয়ে দু'জনেই ফিরে চাই। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায়, মনে হয়, আঙুরিও যেন ফিরে দাঁড়িয়েছে। তার হাত ওঠে, না আঁচল ওড়ে, বুঝতে পারি না। একটা অস্পষ্ট গলার ডাকও যেন শুনতে পাই, 'আয় গো বউ, দেরি করিস না।' তারপর দু'টি ছায়া ক্রমে মিলিয়ে যায়। আমরা আবার ফিরতে থাকি। গাজীর গলায় একবার শোনা যায়, 'চাচী বড় ভালো লোক।'

সে কথার কোনো জবাব দিই না। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কেবল আঙুরির মুখখানিই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সে ভালো না মন্দ, সে ভাবনা আসে না মনে। ভাবি, সাহিত্যের থেকে জীবন কতো বড়। তুমি যখন কলম নিয়ে ভাবো, কলম নিয়ে রচো, তখন তোমার বিধিবিধান সামঞ্জস্য যুক্তি কলমের চালে চলে। জীবন তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর, বিচিত্রতর। সে এমনি অমানিত, যুক্তিতে অথই। সে কোনো কিছুর অধীন নয়।' এই অধর অথইকে সাধনা করো কলমের হিজিবিজি কেটে। হিজিবিজির নানান ছক, নানান ছাঁদন বাঁধন। আঙুরি সেখানে নেই। সে তোমার মন ভুলানো নিটোল গল্পে বাঁধা নয়। কিছুতে সে বাস্তব নয়। কিসেই বা তার যুক্তি। কেবল তার সেই মুখখানির সঙ্গে মাহাতোর কথাগুলো কানে বাজে, 'ভগবান তোর মনের মতন করি সোম্‌সার গড়ে নাই। যাকে তোর ভালো লাগে, তাকেই তুই ধরি রাখতি চাস...।' যেন, 'কেন রে তুই যেথা সেথা পারিস্‌ প্রেমের ফাঁদ।' এ কী রেয়াজ, বলো। যুক্তি কী দেবে হে!

যুক্তি কেবল সেখানে, যেখানে আঙুরি এখনো শুধুই মেয়ে। আপন রক্ত সঞ্চারে আজিও যার ফল ফলেনি। তবু দেখ, কতো না ফুল যেন তাকে ঘিরে ফুটেছে। যেন গন্ধ পাই। দেখ, কতো না ফলে যেন সে ফলবতী। ক্ষুধা যেন মিটে যায়। অতএব, বুঝে দেখ মন, সংসার যার নিজের মতো গড়া নয়, তবু হাত বাড়িয়ে ফেরে, কতো আঘাত তাকে সইতে হয়। তাই সে মানুষ দেখে চিনতে পারে।

আর একবার পিছন ফিরি। কিছুই দেখা যায় না। নোনা গাঙের কূলে, অস্পষ্ট কুহেলী জ্যোৎস্নায় অবাধ নিঝুম প্রকৃতি। মনে মনে বলি, যা খুঁজে ফিরি নিরুদ্দেশে, সেই চলাতে, একবার আসব। এমন 'নেমন্তন্ন' কি কখনো ভুলি।...

গাজীটা এতক্ষণ ধরে কী ভেবেছে, কে জানে। শুনি, গুনগুনিয়ে টেনে টেনে গান গায় ;

'সুখে-দুঃখে যে ভাবে হে,
থাকি যেথা সেথা।
যেন তোমার নামের মালা
আমার প্রাণে থাকে গাঁথা।
ওহে, আমি তোরে ভুললে
তোর যায় না মমতা।
তবে কি না, তুমি আমারে ভুললে,
আমার সকলি বেরথা।'...

আমি যেমন করে শুনি, তেমনি করে গায় না গাজী। এই পূব-দক্ষিণা নোনা-কূলের উচ্চারণে গায়। কিন্তু প্রতিটি কথা এমন স্পষ্ট যেন আর একবারও তার গলায় শুনিনি। অথচ গলা তার চড়া নয় মোটে। সে আমার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে দিয়ে চলে। অস্পষ্ট আলোয় দেখি, ঝোলা কাঁধে, পাগড়ি মাথায়, পেছনে বাবরি। এই আলোতে তার আলখাল্লার রঙ বোঝা যায় না। তার আর আমার দু'জনেরই অস্পষ্ট ছায়া আমাদের পায়ে পায়ে চলে। তার মুখ নদীর দিকে ফেরানো, যেদিকে আমাদের গতি। যেখানে বাঁয়ের কোণে কয়েকটি মিটমিটে আলো দেখা যায়। নদীর

ওপারে ন্যাজাটের দু'-একটি আলোও চোখে পড়ে। কুয়াশা নয়, অথচ দেখা-না-দেখার কী এক হালকা আবরণে যেন সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। হয়তো আধখানা চাঁদের এই মায়া। ডাইনে বাঁয়ে সব যেন শূন্য, অশেষে হারানো। কেবল গঞ্জের যে কয়টি মিটমিটে আলো দেখা যায়, তার এক পাশে কোথায় যেন আগুন জ্বলে। যে আগুনের হাত যেন থেকে থেকে আকাশে হাত বাড়ায়। মাঝে মাঝে তার শিখা দেখতে পাই। যার আলোর খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্তিম আভা কাঁপে। যে আভাতে একটি গাছ ভেসে ওঠে। সব মিলিয়ে যেন এক আদিম ছবি। তার সঙ্গে গাজীর এই গান।

কেন, গাজী এখন এ গান গায় কেন। কার মনের কথা বলে সে! কাকে সে ভোলে, তবু যার মমতা যায় না। অথচ সে ভুললে তার সকলই বৃথা। আমি তো কেবল কাজল মাখানো ডাগর চোখ, পান খাওয়া লাল ঠোঁট, এমন কি বিড়ি টানা সেই আঙুর-লতার মুখখানিই দেখি।...

গাজী যখন গান থামায়, তখন জিজ্ঞেস করি, 'এ গান কার?'

গাজী ফিরে চায়, কাছে এগিয়ে আসে। বলে, 'তা তো জানি না বাবু। মনে পড়ি গেল, তাই।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, 'কেন মনে পড়ি গেল?' কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি না। আমি তখন তথ্যসন্ধানী হই। জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, মাহাতো দেখলাম তোমার মতো কথা বলে। কিন্তু মাহাতোরা তো এ-দেশের লোক নয়।'

গাজী বলে, 'সে কথা তো ঠিক বাবু, মাহাতো চাচারা এ-দেশীয় লোক না। তয় শুনিচি, তিন-চার পুরুষ আগে এরা এসিছিল। তখন তো এসিছিল, বাবু, আবাদের চাষের মজুর হয়ি। আর এখন দ্যাখেন, কতো জমির মালিক। এখন নামে মাহাতো। ঘরে গেলি দ্যাখবেন, সব এ-দেশির মতোন। পুজো-পারণ ঘর গেরস্থালি, যা বলেন।'

তা বটে। চার পুরুষ আগে যারা এই নোনা গাঙের কূলে এসেছে, মাটিকে মিষ্টি করেছে, তারা এই মৃত্তিকারই মানুষ। মাহাতো কুরমি ওরাওঁ মুণ্ডা সাঁওতাল, এসব বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ভারতবর্ষের অন্য সীমান্ত। যেখানে মাটির রঙ ভিন্ন, বনের রূপ আলাদা। প্রকৃতি যেখানে উঁচু নিচু, পাথর মাটিতে মেশানো।

তবু না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'তোমার চাচীর কথা তো আলাদা। সে কোন্ দেশের?'

অস্পষ্ট আলোয় দেখি, গাজীর মুখে হাসি চিকচিক করে। বলে, 'বাহ্ রে, বাবু দেখি বড় কান খড়খড়ি মানুষ। কোনো কিছু ফাঁক যায় না।'

বলি, 'না, তোমাদের কথার সঙ্গে মিল পেলাম না কিনা, তাই।'

গাজী বলে, 'পাবেন কেমন করি বাবু, চাচী তো এ-দেশির মেয়ে না।'

তবে কোন্ দেশের! নিশ্চয়ই সেই, 'উঁচা উঁচা পাবত' দেশের 'শবরীবালা' সে নয়। কারণ, তার কথার মধ্যে সে উচ্চারণও ছিল না।

গাজীই তার জবাব দেয়, 'সেও এক বিত্তান্ত বাবু। অই যি দ্যাখলেন মাহাতো চাচাকে, ওঁয়ার তিন বিয়া।'

'তিন বিয়া? মানে তিন বউ?'

'হ্যাঁ, ওর তিন বিবি কি আর আছে। পেথম বিবি ব্যামোয় মরে। দোস্‌রা বিবি হারায়ি গেছে।'

'হারিয়ে গেছে? কেমন করে?'

'সে কথা বাবু কেউ বলতি পারে না। তয়—'

গাজী সুর টানে, কথা শেষ করে না। তাকিয়ে তার মুখ ভালো দেখতে পাই না। মুখটা তার নিচু, মাটিতে নিজের ছায়ার দিকে। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তয়

শুনিচি, আমাদের সে চাচীর চরণ দু'খানি নাকি বড় চঞ্চল ছিল। পথের মানামানি ছিল না।'

গাজীর নিচু অন্ধকার মুখের দিকে তাকাই। কথাটা ঠিক ধরতে পারি না। তবু মনে হয়, কিসের এক ইঙ্গিত যেন, আঁধারে চিকচিক করে।

গাজী নিজেই আবার সেটুকু স্পষ্ট করে তোলে, 'কথাখানি ধরতি পারলেন তো, বাবু। পথের মানামানি না থাকলি কি চলে। তা সে মেয়েলোক বলেন, আর পুরুষলোক বলেন, একদিন তুমি আঘাটায় যেয়ি পড়বে। তা, আমাদের সে চাচীও কোন্ আঘাটায় যেয়ি পড়েছি, কেউ জানে না। সে নিজিই হারায়ি গেছে।'

কথা আর অস্পষ্ট থাকে না। মাহাতোর দ্বিতীয় বউ স্বামীত্যাগিনী। আমার অবাক লাগে গাজীর বচনে। কুলত্যাগিনীর নামে সে কতো বিশেষণ জুড়তে পারত। বউয়ের নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে যেটুকু পাপের কথা আছে, 'চরণ দু'খানি নাকি বড় চঞ্চল ছিল,' এইটুকুতেই তার ধরতাই। এবার যা বোঝার তা বুঝে নাও। আর কোনো কটুকাটব্য নেই। ক্ষোভে রোষে কোনো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ নেই। বরং দেখ, গাজী মুখ তোলে না। মাথার পাগড়ির ছায়ায় তার মুখ সেই অন্ধকারেই ঢাকা। কুল ছেড়েছে মাহাতোর বউ, যেন তাতে গাজীর বড় লজ্জা। সে দুঃখিত। এই কি গাজীর মন, না কি শালীনতা, বুঝতে পারি না। যেটাই হোক, এমন মেলা দায়। তাও কিনা ঝুলি কাঁধে করে ফেরা এক গাজী দরবেশের কাছে।

এবার আমার চোখে ভাসে মাহাতোর মুখখানি। গাজীর মন তো তার নয়। তার যে মূর্তিখানি দেখলাম, তাতে যে সে সবকিছু ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে, মনে তো হয় না। তার ওই লাল চোখে কি আগুন জ্বলেনি! না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'মাহাতো কিছু করেনি? বউয়ের খোঁজ খবর করেনি?'

গাজী মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'খোঁজখবর আর কী করবে, বাবু। অজানা তো কিছু না। তয়, মাহাতোর রক্ত তো চাচার শরীলি। খবর পেয়িছিল, বউ নসরতের সঙ্গি মোল্লাখালির দিকি গেছে। চাচা মোল্লাখালি দৌড়িছিল। বউ ফিরিয়ি আনবার জন্যি না, দুইখানি মুণ্ডুর জন্যি। সেখানে যেয়ি শুনলে, নসরত বউ নিয়ি জঙ্গলে চলি গেছে। চাচাও নাকি জঙ্গলে গেছিল, এক মাস ঘরে ফিরে নাই। চখে দেখি নাই, শুনিছি, হাতে একখান ভল্লা নিয়ি চাচাকে নাকি সেই পাখিরালা থেকি রাইমঙ্গল তক সবাই ঘুরতি দেখিছে।'

আমার চোখের সামনে আবার মাহাতো ভাসে। কিছু না হোক, বারো বছর আগের মাহাতো হবে, যে ভল্লা নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে জঙ্গলে বউ আর তার সঙ্গীকে খুঁজে ফিরেছিল। সেই মূর্তিকে দেখতে পাই যেন। কুচকুচে কালো এক ভয়ংকর মূর্তি। যার আহার নিদ্রা তল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে চোখে। হাতে ভল্লা, পরনে একখানি লজ্জা নিবারণের কানি।

জিজ্ঞেস করি, 'তারপর?'

গাজী বলে, 'তারপরে আর কী, বাবু। চাচা ঘরে ফিরি এল, তাদের দেখা পায় নাই। তয়, মজা কী জানেন বাবু, বছর না ঘুরতি নসরত বান্দর ফিরি এল। তখন লড়াইয়ির সময়, আকাল। নসরতের যা এক-আধটুকু জমি, সবই তো ভোলাখালিতে। এসি পড়ল একেবারে মাহাতো চাচার গোড়ে।'

জিজ্ঞেস করি, 'সেই বউ?'

'আসে নাই। চাচাও তো সে কথাই পুছ্ করিছিল, "সে কই।" নসরত বলিছিল, বউ তাকে ছেড়ি গেছে।'

আমিই অবাক হয়ে পুছ্ করি, 'ছেড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ বাবু, সেটা মিছা না। নসরত তো তার সব ছিল না। নসরত ধরা তার স্বভাব ছিল যে। আবার এক নসরত ধরি সে চলি গেছে। আর এই বান্দর ফিরি এসিছে। যাবে কম্‌নে! নিজির চাষবাস বিবি ছাওয়াল সব ফেলি গেছে না? আর ভোলাখালিতে থাকতি হলি, মাহাতো চাচার গোড়ে না পড়লি কী থাকা যায়?'

'মাহাতো কী করলে?'

এইবার গাজী মুখ তোলে। বলে, 'খুন করে নাই, বাবু। নিজির বউকে তো সে জানত। সব কথা শুনি-টুনি খালি বলিছিল, 'যা নিজির চাষবাস দ্যাখ্‌ গা।' তা সেই বান্দরের হাল আজ দ্যাখেন।'

সেই বান্দর মানে নসরত। এই বান্দর বিশেষণের মধ্যে একটা সুর ছিল। যে সুরের মধ্যে রাগ বিদ্বেষ ছিল না, করুণা ছিল। জিজ্ঞেস করি, 'কী হল?'

গাজী বলে, 'কর্ম বলি একটা কথা আছে, বাবু। ভালো মন্দ জানি না, যেমন কাম, তেমন ফল তোমাকে পাতি হবে। সেই যে এক বছর, নসরত সব ছেড়ি গেল, তার ফল হলো, হাওলাত করজায় জেরবার, জমিজমা বেবাক বেহাত। এখন দ্যাখেন গে, মাহাতো চাচার মুনিষের কাম করে সে। বিবিটাকেও মাঠি নামতি হয়িছে, তাও সেই চাচার জমিনেই।'

এ তো গেল দুস্‌রি চাচীর বৃত্তান্ত। তার সঙ্গে নসরত-কিস্যা তিস্‌রি চাচীর ব্যাপার কী। জিজ্ঞেস করি, 'তারপর, এই চাচী এল কোত্থেকে?'

এবার গাজী হাসে। বলে, 'ভাসতি ভাসতি।'

অর্থাৎ ভাসতে ভাসতে। সে আবার কেমন আগমন। জলে ভাসতে ভাসতে নাকি। তা হলে তো, এই নোনা গাঙের কামট কুমীরের পেটে যেতে হতো। জিজ্ঞেস করি, 'সে কী রকম?'

গাজী বলে, 'বললাম না বাবু, তখন আকালের সময়। পেটের জ্বালায় গাঁ ঘর ছেড়ি চলি যেতি লাগল একদল। আর একদল আসতি লাগল, সবাই তো আর শহরে যায় নাই। ধান চাল যতো কেন গায়েব হোক, চাষ আবাদ চাই তো। খেতি পাবার আশায় এই বাদায়ও অনেক মানুষ খাটতি এসিছিল। সেইরকম এক মজুরানী দলের সঙ্গে আমাদের এই চাচী এসিছিল। আর বাবু, কী বলব বলেন, মন বড় ব্যাজ্‌। চাচার তখন সেই ব্যামো।'

কথার খেই ধরতে পারি না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী ব্যামো?'

'মনের, বাবু। অই যে সেই বলে না, "অ তোর ঝুলকালিতে মাখামাখি মনের আয়না। মন, একবার ঘষে মেজে দ্যাখ্‌ রে মন মনা।" চাচার তখন সেই গোত্তর। আয়নায় ঝুলকালি, নিজিরে দেখতি পায় নাই। বউ চলি যাবার পর থেকিই ব্যামো। না, জোরজবরদস্তি করে নাই, তয় সেও ভালো বলি। কিন্তু দানা তোমার ঘরে, চিড়িয়া যাবে কুম্‌নে। তুমি দানা ছড়ালিই চিড়িয়া আসবে।'

বলে, গাজী যেন কেমন করে হাসে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় যেমন কুহেলী, তার থেকে বেশী রহস্য দেখি তার দাড়ি-চাঁচা মুখে। চাহনির রকম বুঝি না। কথার হদিস ধরতে পারি না। গাজী তেমনি হাসতে হাসতে আবার আমাকেই সাক্ষী মানে, 'না কী বলেন বাবু।'

বলি, 'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

গাজী এবার আওয়াজ দিয়ে হাসে। বলে, 'না বাবু, আপনি তো দেখি বড় সোজা, কুটকচালি বোঝেন না। চাচার ব্যামো ধরতি পারলেন না?'

'না তো।'

গাজী এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেই উচ্চারণ করে,

'না তো! কী বলব বলো দিকি আমার বাবুকে।'

বলে হঠাৎ ঝুঁকে আসে আমার দিকে। এই তেপান্তরের ফিকে জ্যোৎস্নায়, যেখানে কাকপক্ষীটি নেই, সেখানে সে আমার কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিসিয়ে বলে, 'চিঁড়িয়া বুইলেন না, বাবু। মেয়েমানুষ, বুইলেন। চাচার গোলায় তখন ধান, সবাই তার কাছে হাত পেতি আছে। মরদ আর ক'টা তখন গাঁয়ে, সব আপন প্রাণ বাঁচা, পেটের জ্বালায় ঘরদোর ছেড়ি দৌড়। মেয়েমানুষগুলো সব যেতি পারে নাই। ভুখ তো বাবু খালি মরদের না, মেয়েমানুষেরও সমান, না কী বলেন, অ্যাঁ? তো চাচার তখন সেই দশা, যার মুরশেদ হাফিজ হয়িছে। মুরশেদ হলো বাবু বিশ্বাস, দেল, আমার দেলবাস। তা সে যদি চায়, চক্ষি আন্ধার, আর কী থাকে বলেন। সে তখন নষ্ট হয়ি যায়। চাচাও নষ্ট হয়ি গেছিল। মেয়েমানুষ এলি ধান দিত...। এইবার বুইলেন তো। তা ওইতি কি আর প্রাণের ঘা শুকায়?'

এবার ধরতে পারি চাচার ব্যামোর ধরন। ক্ষুধার্ত ঝি-বউদের ধান দিতো মাহাতো। শোধ নেবার পদ্ধতি ছিল আলাদা। সে নিজে নষ্ট হয়েছিল, তাই অপরকে নষ্ট করত। অথচ যে মাহাতোকে দেখেছি, তাতে একবারও মনে হয়নি, আঙুরের সেই স্বামীটি ধান দিয়ে, মেয়েদের ইজ্জত নিয়েছে। এ মানুষে সেই মানুষ আর নেই। গাজীর কথায় আরো বুঝেছি, তখন মাহাতোর প্রাণে ঘা। বিষাক্ত ঘা। দুস্রি চাচীর আঘাটায় যাওয়ার ঘা। সেই তার ব্যামো। শোধ নিতে চেয়েছিল নিরপরাধ মেরে।

জিজ্ঞেস করি, 'সে ঘা শুকোল কেমন করে?'

গাজী বলে, 'এই নয়া চাচীকে পেয়ি। এই নয়া চাচীর বয়স তখন কাঁচা। সবাই হাত বাড়ায়ি, এই খায় তো, সেই খায়। দু'-চার থাবা এদিক-ওদিক থেকি পড়ে নাই, তা বলা যাবে না। মাহাতো চাচাও তো থাবা দিতিই গেছিল। ব্যামো তো জবর।'

'তারপর?'

'তারপর থাবা দিতি যেয়িই চাচার হাত ভেঙি গেল।'

'হাত ভেঙে গেল?'

গাজী হা হা করে হেসে ওঠে। বলে, 'অই আর কী। সত্যি কী আর হাত ভাঙে। চাচা নিজিরে চিনতি পারে। এবার মনের দায়। চাচা যে কাঁচাখেকো দেবতা হয়ি উঠিছিল, সেই কাঁচাখেকো দেবতার নজর গেল আটকে। কাঁচা মেয়েটিকে দেখি বাতাসে লাগল উজান। ব্যামো ছিল বটে, নজরটা হারায় নাই। পেথমে দিলো থাকবার জায়গা, কাজ দিলো ঘরের। তখন দ্যাখে, মেয়েটি ঘরের ছিরি ফিরায়ি দিয়েছে। সেই থেকি আর ছাড়াছাড়ি হয় নাই।'

সমাজে বাস করি, সমাজের মন কথা বলে, 'বিয়ে-থা হয়ে গেল?'

গাজী আরো হাসে। বলে, 'আর কতো বে' করবে, বাবু। দু'-দু'বার তো করিছিল। এবার বে' না করি ঘর। তো' দ্যাখেন, বে' করি যা হয় নাই, এবার তা হয়িছে। দুটিরে দ্যাখলেন তো। বে' করলি কী আর এর থেকি বেশী কিছু হয়।'

সে কথা মানতে হবে। আর একবার আমার চোখের সামনে মাহাতো আর আঙুরি ভেসে ওঠে। বিবাহের চেয়ে মানুষ বড়। মানুষের জীবনধর্ম বড়। মানুষকে কি কেবল সাত পাকেই বাঁধা যায়? পুরোহিত আর মোল্লার মন্ত্রেই কি মানুষ মানুষের কাছে ধরা পড়ে? মরা কি আর মন্ত্রে জাগে? প্রাণের ধিকিধিকি চাই। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে সব আছে। তার চেয়ে বড় বল, আঙুরি হলো আরোগ্যের ওষুধ। শাঁখের শব্দে, বাজনা বাজিয়ে, কপালে কুলোর ছোঁয়ায় আঙুরি স্বামী-ঘর করতে আসেনি। প্রাণের দায়ে দিশেহারা হয়ে এসেছিল। একে বলে আগমন। আসলে তার অসহায় চোখের জলে ছিল মাহাতোর আধিব্যাধি মন্ত্রৌষধি। এ কথা বলব না, আঙুরিকে

আশ্রয় দিয়ে মাহাতো মহৎ কাজ করেছিল। বরং উজান চালে বলি, সে মরা থেকে বাঁচায় ফিরেছে। তার কিসের অহংকার। সে কৃতজ্ঞ হোক আঙুরলতার কাছে। আমরা সকলে কৃতজ্ঞ থাকি আঙুরলতার কাছে। যে মরতে যায়, সে প্রাণ সঞ্চার করে না, যে বাঁচতে ছোটে, জীয়নকাঠি তার হাতে। সে-ই তো রব তোলে, প্রাণ দাও, প্রাণ দাও!

মনে মনে না বলে পারি না, 'বাহ্ আঙুরি, জীবনে তোমার জয়। তোমার আবার পরিচয় কী। কিসের বা বিবাহ! তুমি চির আয়ুষ্মতী, চির সধবা।'...ঘরছাড়া ক্ষুধার্ত মেয়েটার চোখে ছিল ঘরের শ্রীর স্বপ্ন। হাত দিতেই সেই শ্রী ফুটে উঠেছিল। রুগ্নটা সঙ্গে সঙ্গে ওর বিস্বাদে স্বাদ পেয়ে সুস্থ হতে আরম্ভ করেছিল। এখন মনে হয়, একবার ভোলাখালি না এলে পাপ হবে। চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাকে। কালো মুখে হাসির ঝলক। যেন তাকেই বলি, 'একবার আসব, আসবই।'...

ইতিমধ্যে কখন যেন, কোন্ পথে বাঁক নিয়েছি, খেয়াল ছিল না। মনে মনে আনমনা, গাজীর ছায়ায় ছায়ায় চলি। কিন্তু পথ বদল হয়েছে কখন, খেয়াল ছিল না। দেখি, গায়ে আগুনের রক্তাভা কাঁপে। সামনে লেলিহান শিখা মস্ত বড় কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। আগুন জ্বলে উঠোনের মাঝখানে, তার চারপাশে ছোট ছোট চালাঘর। সেই আগুনের চারপাশে নানান বয়সের নরনারী। মানুষ নয়, ছায়া যেন। দলে দলে, গুচ্ছ গুচ্ছ আগুন ঘিরে নানান জটলা। কার কথা কে শোনে, ঠাহর পাবে না। ঝগড়া করে, না বিবাদ করে; বিচার বৈঠক করে না মজলিস করে, বোঝবার উপায় নেই। তার মধ্যেই শোনো, কে যেন আবার বেসুরো গলায় গান করে। যে গানের ভাষা বোঝা দায়।

কে একজন মোটা আর জড়ানো গলায় হাঁক দেয়, 'কে যায় হে?'

গাজী দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়াই। গাজী হেসে বলে, 'কে যায় না যায়, তা কি এখন চিনতি পারবে হে?'

'ক্যানে, চিনতে ক্যানে পারব না হে।'

বলতে বলতে আধ-ন্যাংটা খালি গা এক বুড়ো টলতে টলতে উঠে আসে উঁচু রাস্তার ওপর। গেঁজে-ওঠা রসের গন্ধ তার নিশ্বাসে। বোধ হয় সারা গায়ে। রক্তবর্ণ চোখের নজর ঢুলুঢুলু। না কামানো খাবলা খাবলা গোঁফদাড়ি সারা মুখে। তাতে একটি আমেজের হাসি। বলে, 'চিনতে পারব না ক্যানে, তুই তো গাজী।'

বলতে বলতে নজর পড়ে আমার দিকে। কী মনে হয়, কে জানে। হঠাৎ দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে কোমর ভেঙে নিচু হয়। বলে, 'ই দ্যাখ, বাবুকে চিনতে পারি নাই। কবে এলি বাবু?'

গাজী আমার দিকে চেয়ে হাসে। বুঝতে পারি, দ্রব্যগুণে এখন সকলেই তার চেনা। অবাক হবার কিছু নেই। গাজী বলে ওঠে, 'বাবুকে চিন নাকি?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে লোকটার গোটা শরীরে এমন টাল খেয়ে যায়, ভাবি বুঝি গড়িয়ে পড়ে ঢালুতে। কিন্তু পড়ে না। বলে, 'ক্যানে, চিনতে লারব ক্যানে? ই তো আমাদিগের বাজারের মাহাজন ঠাকুর মশাইয়ের বিটা।'

এখন কী বলবে বলো। কোথা থেকে কোথায় এলাম। এখন বলে, মহাজন ঠাকুর মশাইয়ের ব্যাটা।

গাজী হাসতে হাসতে বলে, 'খুব বুঝতি পেরিছি যাও, এখন যা করছিলে, তাই করগা।'

আবার সেই মাথা ঝাঁকানি। যেন ক্ষ্যাপা মোষে ঢুঁ মারতে আসে। বলে, 'ক্যানে, এই সিদিনে বাবুর বিয়া হলো, আমরা খেতে পেলাম নাই। ইবারে কিন্তুক খাওয়াতে হবে।'

যাক, নববিবাহিত পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছি। এখন সদ্য সদ্য খাওয়াবার দায়

থেকে নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচি। ইতিমধ্যে উঠোনের ভিড় থেকে কে যেন কী বলে ওঠে। সে ভাষাটা হয়তো সাঁওতালী কিংবা অন্য কোনো আদিবাসী। এখন বুঝতে অসুবিধা নেই, এরা বাদা অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষি-মজুর আদিবাসী। হয়তো মাহাতোর মতো বংশপরম্পরা বাস নয়, তাই ভাষা বদলায়নি। বাঙলা বুলির চালটা তাদের সবখানেই একরকম।

উঠোনের কথা শুনে বুড়ো তার নিজের ভাষায় ধমকে ওঠে। কী যেন বলে, বুঝতে পারি না। গাজীও যে পারে না, তা বুঝতে পারি। তবে সে তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা, তা একদিন খাওয়ানো যাবে, এখন আমরা চলি।'

তা বললে তো হয় না। এখন পেটে আমার রস, মুখে আমার বুড়বুড়ি। আবার হাত জোড় করে বলে, 'বেশ, তবে বাবুটা আজ আমাদের সাথে খেয়ে যাক।'

উঠোনে তখন কেবল জটলা নয়, কিসের একটা বাদানুবাদে যেন ঝগড়া লাগবার উপক্রম। গাজীও এবার ধমক দিয়ে বলে, 'অই গো, টংকো, তোমারও কি মাথা খারাপ হলো। ঠাকুরমশাইয়ের ছেলে কি ওসব খায়?'

বলে সে আমাকে ইশারা দেয় তাকে অনুসরণ করতে। টংকোর তখন টনক নড়েছে। তাড়াতাড়ি জিভ বের করে কান মলে। বলে, 'ই দ্যাখ গ, ছি ছি ছি...।'

তার কথা শেষ হয় না, আমরা চলতে আরম্ভ করি। বিবাদের মধ্যেই আবার যেন কে হাঁক দেয়, 'অই গাজী, একটা গান গেয়ে যা।'

কথা শেষ হয় না, তার আগেই এই কুহেলী জ্যোৎস্না নিশ্চুপ তেপান্তর এক তীব্র আর্ত চিৎকারে যেন ফালা ফালা হয়ে যায়। গাজী বলে ওঠে, 'আহা মুরশেদ! চলি আসেন বাবু।'

বলে সে কানে আঙুল দিয়ে এগিয়ে যায়। চকিতে একবার উঠোনের এক পাশে আধমরা বরাহটা আমার নজরে পড়ে। এতক্ষণ একটুও টের পাওয়া যায়নি, উঠোনের এক পাশে চার পা বাঁধা শেল-হানা জীব একটা পড়ে আছে। সম্ভবত পশুটা ওর মরণের ঘোরে আর একবার জীবনের ডাক ডাকে।

আমাকেও যেন একটা আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে। আমার বাস্তব থেকে হারিয়ে যাই। স্মরণ থাকে না, কোথায় চলেছি, এলাম কোথা থেকে। নিশি-পাওয়া ঘোরে যেন গাজীর পিছু পিছু চলতে থাকি। আর মনে হতে থাকে, প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কতো বিচিত্রের খেলা। জীবনের কোনো কিছুই একটার পর একটা সামঞ্জস্য করে কেউ সাজিয়ে রাখেনি। সকলই অসমঞ্জস। যখন তুমি হাসি-ঝলকানো ডাগর-চোখ সেই মুখখানি দেখ, তখনই তোমার চার পাশে ভিন্ন উৎসব, অন্য মানুষ। তোমার তৈরি বাস্তবের সঙ্গে, আসলের কোনো মিল নেই। বাস্তব বড় স্বাধীন লীলা করে।

চলতে চলতে একসময়ে কানে আসে, 'বাবু!'

চেয়ে দেখি, গাজী আর আমার আগে আগে নেই। সে আমার পাশে পাশে চলে। ভাবি, সে হয়তো আধমরা পশুটার কথা বলবে। বলি, 'বলো।'

কিন্তু গাজী সেদিক দিয়ে যায় না। আমার দিকে চেয়ে বলে, 'বাবু রাগ করেন নাই তো?'

হঠাৎ এ আবার কোন্ বাঁকে ফেরে। এখন আবার রাগের প্রসঙ্গ আসে কোথা থেকে। বলি, 'রাগ করবো কেন?'

গাজীর মুখে দেখি বিকালের সেই অপরাধীর হাসি। বলে, 'না বাবু, আমার ভুলির জন্যি আপনাকে আটকি পড়তি হলো।'

ধন্য গাজী, এতক্ষণে এই অপরাধ ভঞ্জনের পালা। এতক্ষণ ধরে একবারও বুঝতে পারিনি, ভুলের অপরাধ এখনো সে বয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কী জবাব দেবো, বুঝতে

পারি না। তার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করি। সেখানে তো রাগ বেজারের চিহ্ন দেখি না।

গাজী ততক্ষণে আবার ধরেছে, 'আগে যদি জানতাম বাবু, তা হলি আপনাকে কষ্ট দিতাম না। তয়, বাবু জানবেন, ভয়ের কিছু নাই। আমি সারা রাত আপনার দোরে বসি থাকব।'

ফিকে জ্যোৎস্নায় গাজীর মুখের দিকে তাকাই। কেন যেন তার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা টনটনিয়ে ওঠে, কথা বলতে পারি না। কেন এমন হয়, আমি জানি না। কেবল এইটুকুই মনে হয়, আমার বুকে যেন কিসের এক মিলনের জোয়ার বইছে। সেই জোয়ারে আমার গলা বন্ধ হয়ে যায়।

গাজী আবার ডাকে, 'বাবু!'

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলি, 'গাজী, রাগ করিনি। সবই আমার ভালো লাগছে।'

'সত্যি বাবু!'

পারলে যেন ছোট ছেলেটার মতো কোমর দুলিয়ে নেচে দিতো। তা না করে কেবল গুনগুনিয়ে দেয়, 'মন বুঝে দ্যাখ, মনে তোমার কার উদয়। নিদ্দয় নিদ্দয় এতো বলো, এবারে সদয়।'

এতোটা আমার প্রার্থনা নয়। গাজী যেমন করে বলে, তেমন করে শুনতে চাই না। তার আনন্দ বুঝি। আর ভাবি, আজ এখানে এখন না-হয় গাজীকে দায়ী করবো ; কিন্তু সে না থেকেও যদি এমনি বিপাকে পড়তে হতো, তা হলে কোথায় পেতাম গাজী। তার ভুল হয়েছে, সে কথা মেনেছি। এবার মানি, আমি তাকেও পেয়েছি।

দেখতে দেখতে হাটের মধ্যে এসে পড়ি। রাতের ধন্দ আমার চোখে। বুঝতে পারি না, কোথা দিয়ে কোথায় আসি। দু'-একটা ঘর পেরিয়েই হাতের কাছে দেখি সেই গাছ। কালো ছায়া তার নিচে। সেখান থেকে সামনে নারায়ণ ঠাকুরের মহামায়া হিন্দু হোটেল। দাওয়া শূন্য। ঘরেও কেউ আছে বলে মনে হয় না। ঘরের মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

আমরা দু'জনেই দাওয়ায় উঠে যাই। সেই সময়ে ঘরের দেয়ালের কাছে একটা ছায়া নড়ে উঠতে দেখি। ছায়া উঠে দাঁড়ায়। কায়ার গায়ে আলো ; কায়ার মুখেও আলো পড়ে। কায়ার শিথিলবাস শাড়ি। তাড়াতাড়ি সাব্যস্ত করে। খোলা চুল দু' হাতে টেনে ধরে, তাড়াতাড়ি পিছনে আঁটে। মনে হয়, এ মুখ যেন চিনি-চিনি। মুখখানি গম্ভীর। চোখ দু'টি একটু খর বটে। এখন যেন একটা স্বপ্ন-ভাঙা চমকের মতো অচেনা দৃষ্টিতে চোখাচোখি করে। আমি যে অচেনা ভিন্‌দেশী, নজরে তার সেই খবর। আপাদমস্তক দেখে সে মুখ ফেরাতে যায়।

তখনই গাজীর গলা শোনা যায়, 'দুলি ঠাকরুন না!'

গাজী তার মুখ বাড়িয়ে আনে। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে যেন একটু অবাক হয়, চমক খায়। তারপরে বলে, 'অ, তুমি!'

ততক্ষণে আমার মনে পড়ে যায়, এ সেই পুকুরধারের দুলি। এ সেই অনন্তর দুলি। কিন্তু সে তার ঘর ছেড়ে এই সময়ে নারায়ণ ঠাকুরের ভোজনালয়ে কেন। গাজীও সেই কথাই বলে, 'তুমি যে এখন এখানে?'

দুলি চকিতে একবার ভিন্‌দেশীকে দেখে নেয়। বারেক যেন নাকের পাটার নাকছাবি কেঁপে যায়। অনেকটা নির্বিকার গলাতেই বলে, 'অই এসেছিলাম নারাণদাকে একটা কথা বলতে। রাত্রে মাংস আর ভাত রান্না করে পাঠাবার কথা ছিল। বলতে এসেছিলাম, পাঠাবার আর দরকার নেই।'

গাজী বলে, 'কেন গো ঠাকরুন, আজ কি খাওয়া-দাওয়া নাই?'

দুলি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'নাঃ, শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ আর কিছু খাবো না। তা ভাবলাম, বলে শুয়ে পড়ব গিয়ে। এসে দেখি, কেউ নেই।'

'কেউ নাই? ফোঁচা, ফোঁচার বউ?'

'কই, কারুক্কেই তো দেখি না। খালি দেখি, ফোঁচাদার একটা ছেলে বসে রয়েছে ভেতরে। জিজ্ঞেস করলাম, বলে, "কী জানি, জানি না।" তাই বসে আছি। না বলে গেলে ফোঁচাদাকে দিয়ে আবার কাঁড়ি খানেক ভাত মাংস পাঠিয়ে দেবে, সব ফেলে দিতে হবে।'

বলে দুলি আবার একবার ভিন্‌দেশীর দিকে চায়। এবার শুধু নজরে তার অচেনার খবর নয়। এবার কৌতূহল, এবার জিজ্ঞাসা। সোজা নজরে নয়, একটু বাঁকা চালের নজর। তারপরে দেখ, মুখ ফেরাতে গিয়ে আলগা চুলের বাঁধন আবার খুলে যায়। আবার হাত তুলে টেনে চুল বাঁধে। তাতে শরীরে কেন দোলা লেগে যায়, পায়রার মতো কেন ঊর্ধ্বাঙ্গে বাঁক লেগে ঢেউ খেলে যায়, তা জিজ্ঞেস ক'রো না। জীবনযাপনের একটা চাল আছে তো। পেশা বলো, জীবিকা বলো, তার একটা ছাপ ফোটেই। তা সে যখন যেখানে যেমন ভাবেই হোক। চোগা-চাপকান না থাকলেও, দেখলে উকিলের বাত বোঝা যায়। বুক দেখার নল না থাকলেও ডাক্তারের ধরতাই ধরতে পারবে। দারোগার চাল বুঝবে, পণ্ডিতের বুলি ধরতে পারবে। দুলিকে তার থেকে বাদ দেওয়া যায় না। গঞ্জে নয়া মানুষ, তায় ভোজনালয়ে। জীবিকার ভাবভঙ্গি উঁকি না দিয়ে যায় কেমন করে। তা সে ঘণ্টা কয়েক আগে প্রাণের ঘরে জ্বালানি পোড়ানি যতই হোক।

তবে যদি নজর করে দেখ, দেখবে খর চোখের কোল যেন কেমন উথলানো, ফোলা-ফোলা। চোখের অনেক জল গলেছে বুঝি। এখন যে একটু নজর করে, নজর কাড়ার ছল, তার ওপারে দেখ, পাখিটার চোখের সামনে যেন সন্ধ্যা। রাতের অন্ধকার নামে, তাই সুখ নেই, ডাক নেই, গান নেই। আছে শুধু বিষণ্ণতা।

তবু ভিন্‌দেশীটার চোখ ফিরে আসে। দুলির চোখের নিঃশব্দ জিজ্ঞাসাবাদ বড় স্পষ্ট কিনা। যেন প্রায় গলার স্বরে শোনা যায়। 'অচেনা লাগে। ফিকির কী?'

গাজী তখন হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু মাংস আজ পাবে কম্‌নে গো ঠাকরুন? হাটের দিন তো না, বসির কি খাসী-পাঠা কিছু কেটেছে নাকি?'

দুলি হাসে না, ঠোঁট উলটায়। তাতে যেন মেয়েকে কেমন ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে লাগে। বলে, 'না, খাসী-পাটা নয়, রামপাখির মাংস রাঁধতে বলা হয়েছিল।'

গাজী অমনি আওয়াজ দেয়, 'অই বাবা! তয় তো বেশ ভালো খ্যাটনের বাওস্থা ছিল আজ। তা অমন খ্যাটন ছেড়ি একেবারি উপোস কেন?'

দুলি ভুরু কোঁচকায়। নাকছাবি কাঁপে। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'অই যে বললাম, শরীর খারাপ। কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।'

বলে সে এগিয়ে গিয়ে ভিতর-দরজার দিকে যায়। গাজী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'অই গো ঠাকরুন, আমার তো ঘরের মধ্যে যাওয়া নিষেধ। একখান চ্যার দ্যাও দিনি, বাবুকে বসতি দেই।'

এবার আমার টনক নড়ে। বলে উঠি, 'না না, থাক না, আমিই নিয়ে আসছি।' বলে ঘরে পা বাড়াতে যাই। দুলি ততক্ষণে একটা চেয়ার তুলে নিয়েছে। দরজার কাছে আসতে আসতে আবার চোখ তুলে চাওয়া। চোখে সেই অনুসন্ধিৎসা। চেয়ার-খানি আনতে আনতে হাতে হ্যারিকেনটা তুলে নিতে ভোলে না। সে দরজার কাছে আসতেই তার হাত থেকে চেয়ার তুলে নেয় গাজী। দেওয়াল ঘেঁষে পেতে দিতে দিতে বলে, 'বসেন, বাবু। ঠাকুরমশাই বা ফোঁচা এলি হাতমুখ ধোবার জল দিতি বলি।'

দুলি তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতের বাতি দিয়ে দাওয়ায় আলো ফেলে।

গাজীর দিকে একবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। তারপর হ্যারিকেনটা দরজার কাছে রেখে ঠোঁট টেপে, ভুরু টান করে। ঘরের মধ্যে চলে যায়।

এমন সময় ভিতরের দরজার কাছে সেই ডিগডিগে শরীরের ভিতর থেকে মোটা গলা শোনা যায়, 'ওখেনে কে?'

আগে সাড়া দেয় দুলি, 'আমি গো, নারাণদা।'

নারায়ণ ঠাকুরের স্বর এগিয়ে আসে ঘরের মধ্যে। শোনা যায়, 'কে, দুলি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এই দেখ, আমি আবার তোমার ঘর থেকে ঘুরে এলাম।'

'ও মা, কেন?'

'একটু মোচলমানপাড়ায় গেছলাম কিনা। টংকোদের বস্তিতে তো আজ শুয়োর মেরেছে, পচুই-টচুই খেয়ে, সব যে-যার তালে আছে। ভাবলাম, ও ব্যাটারা তো আজ আর মুরগি দিতে পারবে না। এদিকে সুস্থ না হলে মুরগি খোঁয়াড়ে ঢুকবে না। তাই বেলা পড়তে মোচলমানপাড়ায় গেলাম। ভালো জিনিসই পেয়েছি। আসবার পথে তোমাকে দেখিয়ে আনবো বলে গেলাম। তা দেখি ঘর বন্ধ, আবার যা শুনলাম—।' নারায়ণ ঠাকুর কথা শেষ করতে পারে না। দুলি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমিও তোমাকে সেই কথাই বলতে এসেছি। মাংস-ভাতের আর দরকার নাই, নারাণদা।'

একটু চুপচাপ। তারপর নারায়ণ ঠাকুরের গলা শোনা যায়, 'তা বেশ তো, তোমার আর অনন্তর, দু'জনের জন্যে বলেছিলে। সে না খায়, তুমি খাবে তো? এখন আবার ঘরে গিয়ে আথায় আগুন দেবার দরকার কী?'

দুলির গলায় এমনিতে যেন টানা তারের ঝংকার। সুর চড়া নয়, তীক্ষ্ণতা বাজে। এখন যেন কেমন একটু শিথিল হয়ে পড়ে সেই টানা তার। বলে, 'না নারাণদা, নিজের জন্যে রাঁধবো না। খিদে-টিদে নাই। আমি আজ রাতে আর কিছু খাবো না কো। পাখিটা কেটেকুটে আনো নাই তো?'

নারায়ণ ঠাকুরের মোটা গলার সুরটাও যেন কেমন বেসুরো বাজে। ঠেক খেয়ে খেয়ে বলে, 'না, তা মারা হয় নাই। পাখি তো ফোঁচাই মারে।'

দুলির গলা শোনা যায়, 'তবে আর মেরো না। তুমি যদি না রাখো, অন্য কারুকে বেচে দিও, না তো আমিই কাউকে বেচে দিতে পারি।'

নারায়ণ বলে, 'আহা না, সে কথা হচ্ছে না—।'

কথাটা যেন তার শেষ হয় না। তবু চুপ করে যায়। খানিকক্ষণ আর কোনো কথা শোনা যায় না।

বিষয়টা এবার অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়। বায়না ছিল দুলির, আজ রাত্রে তার আর অনন্তর জন্যে মাংস-ভাতের। আজ ছিল তার নিজের ঘরে অরন্ধন। খাবার আসতো বাইরে থেকে। ঘরে তাদের, কথা ছিল দুহুঁ দোঁহার রঙ্গে যাবে। কিন্তু অনন্ত প্রেমের থেকে দাদার মান দিয়েছে বেশী। যেজন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা। গাজীর সেই গানের কথা মনে পড়ে যায়। তা না-হয় হলো। নিজের পেটের সঙ্গে লেনাদেনা বন্ধ কেন? আজ রাতে দুলির কেন খিদেটিদে নেই?

সব কেন-র জবাব চেয়ো না। জবাব পাবে না। সেই হিসাবে মিলিয়ে নাও না, যে হিসাবে উপহারের দ্রব্য দাওয়ায় ফেলে দিয়েছিল। দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। যে উপহার দেয়, তার চেয়ে কি উপহার বড়? যার সঙ্গে খাবার কথা, সেই খাওয়া থেকে কি নিজের ক্ষুধা বড়?

বলতে পারো, পেট ছাড়া বারোবাসরের মেয়েটার আছে কী। নেই বলেই তো ও মেয়ে বারো স্বামীর ঘরে। কিন্তু বলো গিয়ে, সমাজ তোমাকে টাটে বসাবে। মনের

বুঝ হবে তো?

আমার পাশে চুপচাপ গাজী বসে আছে। একটা দমকা নিশ্বাসের শব্দ পাই পাশে। সামনে গাছ আর গাছের ছায়ায় নিবিড় কালো। তার আশেপাশে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। কাছাকাছি ঘরগুলোতে মানুষের গলার শব্দ শোনা যায়। মনে হয়, নদীর বুক থেকেই যেন কার ডাকের দূর চিৎকার ভেসে আসে।

ঘরের মধ্যে আবার নারায়ণ ঠাকুরের গলা শোনো, 'অনাদি পালও হয়েছে যেমন! ঝাল ব্যঞ্জনকে এখন শুক্তো করার জন্যে হাতা খুন্তি নাড়াচ্ছে।'

একেবারে পাকা পাচকঠাকুরের মতো কথা। যে তরকারি আর মসলাতে ব্যঞ্জন বানানো হয়ে গিয়েছে, তাকে এখন আর শুক্তো করতে চাইলে কী হবে। অনন্ত ব্যঞ্জনকে কি আর শুক্তো করা যায়?

দুলি বলে, 'সে কথা থাক, নারাণদা। যে কথা—।'

নারায়ণের গলায় বিতৃষ্ণা। তার সঙ্গে ঝাঁজ। বলে ওঠে, 'না, থাকবে কেন, বলো। অনন্তটার কথাও বলি, বারে বারে তোর ন্যাকামো করবার কী দরকার।'

এ সান্ত্বনা ভালো লাগে না দুলির। যে স্রোত চলে মনে মনে, তার ওপরে তুমি বইঠা চালালে কি চলে! এখানে সান্ত্বনা যার যার নিজের। অপরের হাতের ছোঁয়া কেবল জ্বালা। বলে, 'কে কী ন্যাকামো করেছে, সে খোঁজ আমি করি না, নারাণদা।'

তা বললে কি নারায়ণ ঠাকুরই থামে! তবে সে তার স্বভাব অনুযায়ী খেঁকিয়ে ওঠে না। বলে, 'না ভাই দুলি, খোঁজ করো না, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। অনন্ত এলেই তুমি আবার সব ভুলে যাও। এটা ভালো কথা নয়। তোমার হলো এসো জন বসো জন, দশজন নিয়ে কারবার। এসব তোমার বেশী পেশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।'

শুধু হোটেল চালানোর ফন্দি-ফিকিরই জানে না নারায়ণ ঠাকুর, দেহজীবিনীকেও উপদেশ দেয়। তবে, উপদেশ দেয় কিনা, জানি না। একটু যেন স্নেহের জোর শোনা যায় তার কথার সুরে।

দুলি বুঝি অস্বস্তিতে হাসে। বলে, 'আহা, শুনবে তো। আমি তো সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি।'

'তাই নাকি। কী কথা?'

দুলির গলা একটু নিচু হয়। কিন্তু শোনা যায় সবই। বলে, 'আমার ঘরে তালা দিয়ে এসেছি। জানি তো, মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করবে। তাই বলছিলাম কি, আজ আর এখান থেকে যাবো না। ফোঁচাদার বউয়ের কাছেই রাতটা শুয়ে কাটিয়ে দেবো।'

শুধু মাংস-ভাতের বায়না কারণ নয়, পাছে রাত্রে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায়, সে পথ বন্ধ করার মতলব করেই দুলি এসেছে।

নারায়ণ ঠাকুর বলে, 'অ, সেই কথা! তা বেশ তো, ফোঁচার বউয়ের কাছেই থাকবে। তাতে আর কী হয়েছে।'

দুলি বলে, 'তোমার আবার অসুবিধা হবে না তো?'

কথাটা শুনে আমার দুলির মুখখানি দেখতে ইচ্ছা করে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের গলা, 'না, না, আমার আবার অসুবিধা কী?'

সামনের কুহেলী আলো আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়েও, বুঝতে পারি, দুলির সামনে নারায়ণ ভারী অস্বস্তি বোধ করে। তাই সামনে থেকে চলে যেতে যেতে কথা বলে। আর তখনই গাজীটা গুনগুনিয়ে ওঠেঃ

'আরে, ঘরের খিলে আঁটিসাঁটি
ওদিকে, গন্ত কাটে সিঁদকাটি
এ চোরা কালো বিড়াল মিশে থাকে আন্ধারে।'...

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের গলা শোনা যায়, 'কে রে ওখেনে?'

'আপনাদের গাজী, ঠাকুরমশায়।'

যেন বড় গলগলানো গলায় বলে গাজী। আর সেই পরিমাণেই নারাণের পিত্তি-জ্বালানো কথা ভেসে আসে, 'আমাদের, না একেবারে তাবৎ সোন্‌সারের। ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়। কথা নাই বাত্তা নাই, উনি একেবারে গান ধরে দিলেন।'

গাজী বলে, 'গান একটা মনে এল কিনা।'

'আসুক গে, অত শোনাবার দরকার কী।'

বলতে বলতে তার স্বর আবার এগিয়ে আসতে থাকে। আসতে আসতেই জিজ্ঞেস করে, 'তা নিজে তো এসে বসে আছ, বাবুটিকে রেখে এলে কোথায়? ভোলাখালিতেই—'

দরজা পর্যন্ত এসেই নারায়ণের স্বরে ধাক্কা লাগে। দরজার কাছে রাখা বাতির একটু আলো আমার গায়েও পড়েছিল। তাতেই তার নজরে পড়ে যাই। তাড়াতাড়ি সুর ফিরিয়ে বলে, 'অ, এসে পড়েছেন! ভাবলাম, কী জানি, মাহাতোদের ব্যাপার তো! ভোলাখালিতেই টেনে নিয়ে গেল কিনা।'

আমি কোনো, জবাব দিই না। গাজী বলে, 'সে মতলবও হয়িছিল। চাচীটিকে জানেন তো। ছাড়বে না কিছুতেই। নেহাত বাবুর ভয়, রাত পোহালি যেতি দেরি হয়ি যাবে, নইলি।...।'

ওসব শোনবার অবসর নেই নারায়ণের। সে আমাকে বলে, 'ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে, বাইরে বসবার দরকার কী। ঘরের মধ্যে এসে বসেন।'

আবার গাজীই বলে, 'যাবেন। একটু জল দিতি বলেন, হাত-পা ধুয়ি যাবেন একেবারে।'

ঠাকুর বলে, 'ফোঁচাকে পাঠিয়েছি চাপাকলে। জল তুলছে সে। হয়ে গেলেই এনে দেবে। ততক্ষণ ঘরে এসে বসেন আপনি।'

আমি বলি, 'থাক এখন, এমন কিছু শীত লাগছে না। একটু বাইরেই বসি।'

ঠাকুর আর কথা না বাড়িয়ে ভিতরে চলে যায়। আমি ভাবি, বাইরে ঠাণ্ডা তাই ঠাকুর আমাকে ভিতরে যেতে বলে। বারোবাসরের মেয়ে দুলিরও ভিতরে যাবার হক আছে। গাজীর নেই। আমার জন্যে দরজা আগলে সে সারা রাত বাইরের দাওয়ায় পড়ে থাকবে। কেন, তা জিজ্ঞেস ক'রো না। মানুষের নিজের হাতে গড়া বিধান, যতদিন তারা নিজেরা না ভাঙে, ততদিন কেউ পারে না। একা ভাঙলে বিধর্মী, সকলে ভাঙলে ধর্ম। তাই না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'এই গঞ্জে মুসলমানের কোনো দোকান-পাট নেই!'

গাজীর গলায় বিস্ময়। বলে, 'মেলাই। কেন, বাবু?'

'তুমি সেখানে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে আসতে পারো না?'

গাজী হেসে বলে, 'সেজন্যি ভাববেন না, বাবু। এমন কত রাত কত জাগায় কেটিছে।'

'শীতে কষ্ট হবে তোমার।'

'ঝোলাতে একখানা ক্যাঁতা আছে, বাবু। গায়ে যেটি আছে, সেটিও কম না। পেরায় আট-দশখানা ছিঁড়া কাপড় আছে।'

আট-দশখানা ছেঁড়া কাপড়! ধন্যি আলখাল্লা! এর পরে তো কথা চলে না। তার ওপরে ঝোলায় আছে একটি কাঁথা। না জানি, ও ঝোলাতে আরো কত বস্তু

আছে। গাজীর ঝোলা কিনা!

গাজী তারপরেও হাসে। বলে, 'তা ছাড়া, একটা কথা কি বাবু, হিঁদু বলেন আর মোচলমান বলেন, এমন লোককে কি কেউ ডরে থাকতি দেয়?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'বিশ্বাস কি বাবু, যদি চুরি-চামারি করে?'

গাজীর দিকে ফিরে তাকাই। সে আমার চেয়ারের পাশে মাটিতে বসা। হ্যারিকেনের আলো তার মুখের যে পাশে পড়েছে, সে পাশটা দেখতে পাই না। যেদিকটা পাই, সেদিকটা অন্ধকার। গাজীও আমার দিকে ফেরে। তাতে তার গোটা মুখটাই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। তবু যেন আমি তার চোখে মিটিমিটি হাসি দেখতে পাই। আর কেবলই মনে হয়, সত্যি কথাটা তো ভেবে দেখিনি। এমন একটা পথে পথে হাত পেতে গান গেয়ে ফেরা চেনা লোকই যদি আমার দরজায় এসে রাত্রিবাসের ফরমান চাইত, দিতাম নাকি?

পুছ করার দরকার কী? দিতাম না। তাই গাজীর কথায় কোথায় যেন নিজের ভিতরেও ঠেক লেগে যায়। আরো লাগে এই কারণে, সে যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলে, আমাদের গৃহস্থের মনে সেই কথাটাই আগে জাগে। তবে গৃহস্থের অবস্থাও যে ঘর-পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখার মতো। কিন্তু গাজী যখন তার নিজেকে দেখিয়ে এ রকম বলে, তখন কোথায় যেন বাধে। তখন যেন নিজের মুখে থাবাড়ি লেগে যায়। অবিশ্বাসের অবিচারে মন টাটিয়ে যায়। বলি, 'সে যে করে, সে করে। তোমাকে তো এখানে সবাই চেনে।'

গাজী তেমনি হেসে বলে, 'তা চিনে, বাবু। তয় কি জানেন, যার যেমন অবস্থা, তার তেমন বাওস্থা। যা সয়, তা রয়। গাজী দরবেশ মানুষ, গাছতলাতি তার দিন কেটি যায়। মাথার উপর যদি একখান আস্তরণের দরকার হয়, তবে এই হাটে তার কম নাই। দ্যাখেন যেয়ি, কত চালা পড়ি রয়িছে। ঘরের মধ্যি আমার থাকতি ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করলি লোকে ব্যাজ দেখে।'

লোকে বিপরীত দেখে এই গাজীর বচন। আমি তার অন্ধকারে ঢাকা মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। বুঝতে পারি, সেই হাসিটুকু লেগেই আছে মুখে। এর ওপরে কথা বলার কিছু নেই। সে সার বুঝিয়ে দিয়েছে। অবস্থা গুণে ব্যবস্থা। গাছতলাতে যার বাস, সে কেন ঘরের আশ্রয় চাইবে। চাইলে লোকে বিপরীত ভাবে। তোমার মন বিমর্ষ হলে কী হবে। বাস্তবে চলো মন, তাতে স্বস্তি।

গাজী নিজেই আবার বলে, 'সে-সব চিন্তা করবেন না, বাবু। দাওয়ার মাথার উপর চাল আছে, তাতিই আমার হয়ি যাবে। তা ছাড়া...।'

কথাটা সে শেষ করে না। মুখটা যেন আমার দিকে আরো বেশী করে ফেরায়। বলে, 'গাজীকে আজ বেহেস্তে থাকতি দিলিও বাবুকে ছেড়ি সে যাবে না।'

এ যেন খোশামুদে, রামপেসাদে। কিন্তু বুঝতে পারি, তার কথার মধ্যে কপটতা নেই কোথাও। প্রাণের কথা বলে না কেবল। এ যেন তার শপথ, কসম খেয়ে বলা।

এ সময়ে আর একবার নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। তার আগে মনে হয় ঘরের মধ্যে দুলি আর সে কী যেন বলাবলি করে। তারপরে নারায়ণ এসে দাঁড়ায়। দরজার কাছে দুলির ছায়াও দেখা যায়।

ঠাকুর বলে, 'বাবুর কি মুরগি চলে?'

জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'তা হলে মুরগি রান্না করতাম। রামপাখি একটা রয়েছে কিনা।'

ঠাকুরের মুখ খোলাতেই বয়ান ধরেছি। এ রামপাখি যে কোন্ রামপাখি, তা

জানি। যদি খাই, তা হলে কারুর মুখেরটা কেড়ে খাওয়া হবে না। তবু, কোথায় যেন আটকায়, প্রাণ বিমুখ হয়। যাদের জন্যে আয়োজন, তাদের একজন কাছেই দাঁড়িয়ে। ঠাকুর যে তার অনুমতি নিয়েই প্রস্তাব দিয়েছে, সন্দেহ নেই। কেন যে তার রামপাখি বিরাগ, ক্ষুধা মন্দ, তা-ও জানি। আমি না খেলেও সে রামপাখির জান খতম ধরে নিতে হবে। কিন্তু সদ্য সদ্য যা ঘটেছে, তারপরে আর খেতে পারি না। তা ছাড়া, আমার গাজী রয়েছে। জানি, সে নিরামিষাশী। সে যে আমার জবাবের জন্যে কান পেতে আছে, বুঝতে পারি। ঘাড় নেড়ে বলি, 'না, মুরগি খাবো না।'

দুলি আঙুরি নয়। বোধ করি, সে জানে না, এ ভিন্‌দেশী তার পরিচয় জানে। সে বলে ওঠে, 'মুরগি খান না?'

একটু অবাক হয়ে ফিরে চাই তার দিকে। দরজার কাছে হ্যারিকেনের আলো তার শরীরের একপাশে পড়েছে। ঘোমটা খোলা, আঁচল-খসা আঙুরিকেও দেখেছি। সেখানে মধ্যঋতু আশ্বিনের ভরা ভরতিতে একটা বন্যতা দেখেছিলাম। সে দেখাতে মনের এক ভাব। দুলির হলো খর স্রোতের চল্‌কানো ঢেউ। চোখে যেন ছিটা লাগে। নজর ধাঁধিয়ে যায়। নাকে-মুখে জল ঢুকে হৃদে ধাক্কা লাগে। তার জন্যে দুলিকে দোষ দেবো না। তার কথা বলার তাগিদ যে কোথায়, তাও অনুমানে আছে। মুরগির গতি হলে নারাণদার কাছে তার দায় চোকে, তবু আমাকে বলতে হয়, 'খাই, কিন্তু আজ খাবো না।'

মুখ ফেরাতে গিয়ে বুঝতে পারি, দুলি আমার মুখটা একটু ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে চায়। বোধ হয়, কথার ভাব খোঁজে, কার্যকারণের সন্ধান। কিন্তু কিছু বলে না।

এবার গাজী যেন কী ভেবে বলে ওঠে, 'কেন বাবু, খান না!' এ হলো তার আতিথেয়তা। নিজের ঘর না হোক, বাবুর সুখ-সুবিধা দেখা তার নিজের বিষয় করেছে।

বলি, 'না, ইচ্ছে নেই।'

নারায়ণ চলে যেতে যেতে বলে, 'তা হলে মাছ-ভাতই করি গে।'

গাজী বলে ওঠে, 'তা হলি ঠাকুরমশাই, আপনি নিজিই সেবা করি ফ্যালেন।'

আর দেখতে হলো না। তৎক্ষণাৎ ধমক ভেসে আসে, 'মেলা বাজে প্যাচাল পেড়ো না, বুঝলে? আমি মুরগি খাই, কেউ দেখেছে কোনোদিন?'

গাজী সঙ্গে সঙ্গে ঘাট মেনে বলে, 'আ ছি-ছি, সে কথাখানি তো এয়াদ ছিল না।'

আমি ভাবি, ইয়াদ তার ঠিকই ছিল। গাজীর এটা ফাজিল-রঙ্গ নিশ্চয়। ওদিক থেকে নারায়ণ ঠাকুরের আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। দুলিও দরজার কাছ থেকে সরে যায়। অন্য গলা শুনতে পাই ঘরের মধ্যে। বোধ হয়, ফোঁচার সেই কালো-কুলো বউটি কথা বলে দুলির সঙ্গে। বুকের ওপর বাচ্চাটি আছে সম্ভবত। ছোটখাটো ধমক শুনতে পাই। অস্পষ্ট বলাবলি শুনে বুঝতে পারি, তারা সুখ-দুঃখের কথা বলে। দুলি বলে, 'মরণ! মুখে আগুন অমন ভালোবাসার!' আর বউ বলে, 'মানুষের ধারা বোঝা যায় না।'...

এই হলো কথার সার। একজন ভালোবাসার মুখে আগুন দেয়। আর ফোঁচার বউ মানুষের ধারা বোঝে না। যে মানুষের কথা বলে, সে নিশ্চয় পুরুষ-মানুষ। জানতে ইচ্ছা করে, সেই পুরুষ-মানুষটা কে? নারায়ণ ঠাকুর, না ফোঁচা? আর দুলি কোন্ ভালোবাসার মুখে আগুন দেয়? অনন্তর না তার নিজের?

তারপরে এক সময়ে নিজের মনেই চমক লাগে। ভাবি, সবই বেয়াজ, সবই বিপরীত। দেখ, নগর ছানিয়া ফিরি। আর এখন বসে আছি কোথায়। অচেনা এক গাজী আমার পাশে। সে যে কী দিয়ে কী কেড়েছে, চেনা-অচেনার দাগ রাখলে না। ঘরের মধ্যে

কথা বলে এক বিমুখ প্রেমিকা দেহজীবিনী। ফোঁচার বউকে কী বলব, বুঝতে পারি না। স্বৈরিণী? তাও বলতে পারি না। গৃহিণীই বলব। কার গৃহিণী, সে জবাব চাইব না। তবে নারায়ণ ঠাকুর তার গতি, ফোঁচা পতি। তারা সবাই মিলে সকলের সঙ্গে জড়ানো। একে বিচিত্র বলব কিনা, জানি না। হয়তো গঞ্জ-হাটের সমাজ এমনিই। তার রীতি-প্রকৃতির ধরন-ধারণ এইরকম। জীবিকা আর পেশার দায়ে সবাই হেথা জড়ো। জনপদের নিয়মকানুন এখানে নয়। একটু পরেই ফোঁচা আসে জলের বালতি নিয়ে। দাওয়ার ধারে বালতি বসিয়ে ঘটি রেখে সেই তার দম-আটকানো গলায় বলে, 'হাত-মুখ ধুয়ে নেন, বাবু।'

সারা দিনের ক্লান্তি এবার আমাকে ভারী করে তুলেছে। হাত-মুখ ধোয়া হতে হতেই ওদিকে ফোঁচা দড়ির চারপায়া পেতে দেয় ঘরের মধ্যে, দরজার কাছে। বিছানা দেখে নাক কোঁচকাবো না। নিচে যা-ই থাকুক, গোটা একখানি লালপাড় ধোয়া ধবধবে শাড়ি চাদর হিসেবে পেতে দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওরই বউয়ের। ঠাকুরের এবার তাড়াহুড়া। খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিতে দেরি করে না। গাজীর নিরামিষ খাওয়া সেই দাওয়ায় বসে।

দুলিকে খাবার জন্যে ঠাকুর আর বউ দুজনেই টানাটানি করে। কিন্তু মন থেকে যার ক্ষুধা গিয়েছে, তাকে খাওয়ানো যায় কেমন করে! অতএব, পাশের ঘরে গাজীদের খাওয়া মিটে যায়। পাশে ক'টি ঘর আছে, কিছুই জানি না। বুঝতে পারি, সেখানে হেঁশেলের পাট মিটে গিয়েছে। সকলে নিদ্রা যায় কিনা, জানি না। একটা নিঃঝুমতা নেমে আসে। ফোঁচার বাচ্চাদের গলা একটু-আধটু শোনা যাচ্ছিল। তাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। এমন কি, একটু আলোর আভাসও সেখানে পাওয়া যায় না। তাতেই মনে হয়, হয়তো সবাই ঘুমোয়।

এ ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। হাত তুলে ঘড়ি দেখি। রাত্রি মাত্র সাড়ে ন'টা। অথচ মনে হয়, রাত কেবল গভীর নয়, একটা আরণ্যক স্তব্ধতা যেন জগৎ গ্রাস করেছে।

আমার মাথার সামনেই খোলা দরজা। দরজার পাশে গাজী এখনো বসে বসে বাবুর কাছে পাওয়া, ভারী মিঠে বাসওয়ালা ছিরগেট টানে। আমার মাথার ওপরে মশারি চাঁদা করা রয়েছে। পয়সা দিয়ে হয়তো অনেক সুখ পাওয়া যায়। এমন একটি সামান্য ব্যবস্থা অসামান্য হয়ে ওঠে না।

হ্যারিকেনটার কী ব্যবস্থা হবে। এই প্রশ্ন যখন মনে, তখন দেখি ফোঁচার উদয় হয়। ভিতর ঘরের অন্ধকার থেকে সে আসে। হাতে তার একটা হোগলা। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়ি। একদিকে হোগলা পেতে বসে সে বিড়ি খায়। তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'বাবু, বাতি নেবানো থাকবে না কমানো থাকবে?'

আমি বলি, 'নিবিয়ে দাও।'

গাজী বলে, 'সারাদিন অনেক ঘোরা হয়েছে, এবারে শুয়ে পড়েন বাবু।'

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মশারিটা টেনে নামিয়ে শুয়ে পড়ি। ফোঁচা বাতি নেভায়। ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। আস্তে আস্তে খোলা দরজার কাছে বাইরের কুহেলী জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলো দেখা দেয়। ঘরের নিচু চৌকাঠের ওপর গাজী তার ঝোলাটা পেতে, তাতে মাথা রাখে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকে। মুহূর্তের মধ্যেই, ফোঁচার চাপা নাসিকাধ্বনি বাজে। আর গাজীটা, কথাহীন সুরে খুব আস্তে গুন গুন করে। এক সময়ে তাও থেমে যায়।

ঘুম আসে না এই নতুন জায়গায়। ক্লান্তিতে পাশ ফিরতে ইচ্ছা করে না। নিশ্চল নিঝুম হয়ে পড়ে থাকি।

হঠাৎ মনে হয়, একটা অস্পষ্ট চুপি চুপি ডাক যেন শুনতে পাই, 'সই সই!'

পুরুষের চাপা গলা। কোন্ সইকে ডাকে! কার সই, কে কোথায় ডাকে, কে জানে। একটু চুপচাপ। আবার ডাক। এবার যেন একটু জোরে, একটু স্পষ্ট। মনে হয়, আমার খোলা দরজার কাছেই, দাওয়ার নিচে থেকে ডাকে, 'সই, সই!'

থেমে থেমে কয়েকবার ডাকাডাকি চলে। তারপরেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে কার যেন পায়ের শব্দ আস্তে বাজে। যদি ঠিক শুনে থাকি, যেন ঠিনঠিন শব্দও বাজে তার সঙ্গে। অন্ধকারেও দেখতে পাই একটি মূর্তি, ভিতর দিক থেকে দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজার কাছে আসতেই তার অবয়ব দেখে চিনতে পারি, দুলি। অতি সাবধানে সে গাজীকে ডিঙিয়ে যায়। নেমে যায় দাওয়ার নিচে।

তারপরে তাকে আর আমি দেখতে পাই না। কেবল এইটুকু শুনতে পাই, দুলির গলা যেন কান্না ঠেকানো, স্বর নিচু। সে বলে, 'না না না, কখ্খনো না।'

আর ডাক দেওয়া সেই পুরুষের নিচু গলায় আবেগ, 'পায়ে ধরি সই।'

আবার 'না না না।' কিন্তু সেই না না শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়। কেবল ফোঁচার নাক ডাকানোর শব্দ বাজে।

কেমন একটা অস্বস্তি হয়। তবু উঠে বসতে পারি না। কৌতূহলের বেড়ায় পড়ি। যেন অনুমান করি কিছু, তবু বুঝতে পারি না। সেই মুহূর্তেই গাজীর নিচু স্বর শোনা যায়, 'বাবু, ঘুমুলেন নাকি?' জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত ভাবি। কিন্তু গাজীর সঙ্গে আমার কিসের লুকোচুরি! বলি, 'না।'

সে বলে, 'বুইতি পারলেন কিছু?'

বলি, 'দুলি বেরিয়ে গেল মনে হলো।'

'কার ডাকে জানেন তো?'

'অনন্ত?'

'তয় আর কার।'

বলে সে একটু হাসে। আমার চোখের সামনে ভাসে দুলির মুখ। খর চোখের তারায় আগুন। উপহার ফেলে দেয় ছুড়িয়ে ছিটকে। দিব্যি দেয় আর না আসতে। পাছে সে আসে, তাই নিজের ঘর ছেড়ে যায় পরের ঘরে। আর বলে, 'অমন ভালোবাসার মুখে আগুন।'

হায় গো চিন্তামণি! এখন একবার ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, মুখে যে আগুন দেবে, সে কোন্ ভালোবাসার। তোমার, না অনন্তর!

আমার অস্বস্তি যায়। নিঃশব্দ এক হাসির ধারা যেন টলটলিয়ে ওঠে। কে এক অনন্ত পাল আর এক বারোবাসরের দুলি। সমাজ যাদের অবৈধ ঘোষণা করেছে, নিষিদ্ধ বলেছে, তারা আমার প্রাণে আবেগের মুখ খুলে স্রোত বহিয়ে যায়। সংসারে এমন ঘটনা নিত্য অহরহ ঘটে। কিন্তু তা সংসারে। সংসারের সীমান্তেও যে এমন ঘটে, তা জানা ছিল না। প্রান্তে, যেখানে বিধিনিষেধ, সেখানে সকলই নিষিদ্ধ, অচ্ছুৎ, সেখানেও যে এমন সাংসারিক লীলা, তা কখনো দেখিনি।

আমার আবেগের কথা কাউকে বলতে যাবো না। কিন্তু এমন ঘটনার আবেগ ধরা যন্ত্র আমার নেই। সংসার আর সংসারের সীমান্ত, দুয়েতেই দেখি মন একাকার। এবার কি মন দুষবে? তবে মানুষের কথাটা ভুলো না। তাকে যে এত ভাগে ভাগ করে রেখেছে, তবু দেখ সে মানুষ। সবখানে সেই এক মানুষ, এক সমান। সেই কারণে বিধিনিষেধ অমর নয়, ভাগ বাঁটোয়ারা নয়, মানুষ অমর।

কে জানে, এই দুলি-অনন্তর কী ভবিষ্যৎ। কোনো দিন জানা হবে না, জানতেও আসব না। জীবনপ্রবাহে, স্রোতে, বাঁকে নানা রঙ, নানান্ রঙ্গ দেখে যাই। করেও যাই। এই দেখে যাওয়া, করে যাওয়ায় কার দেনা শোধ হয়, জানি না। চলি সবাই

আপন আপন তাগিদে।

তবু আমার হাসি-ঝরা আবেগধারা অবাক মেনে ভাবে, এত দেখা ছিল আমার একটা দিনের নিরুদ্দেশের ফেরায়! যখন আপন সুখে হাসি, কাঁদি, তখন ভাবি, জীবন এত ছোট কেন। ভুলে যাই, সে আমার নজরবন্দী নয়। ধরা দিয়ে নেই আমার চোখের সীমায়। সে আমার বুঝ-বন্দী নয়। আমার বোঝার সীমা ছাড়িয়ে সে বিরাজ করে। আমার সত্যি-মিথ্যায় তার কিছুই যায় আসে না। তার চেয়ে বলি, মন যেন না বিচারে যায়। মন খুলে রাখুক। যেখানে তার চক্ষুকর্ণ আছে।

গাজীর সাড়াশব্দ নেই। হয়তো মুরশেদের নামের মজুর এবার ঘুমোয়। আমার ঘুম আসে না। প্রহর কেটে যায়। একটা আচ্ছন্নতা জড়িয়ে আসে। তারপরেই বেড়ার এক পাশ ঘেঁষে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। ফোঁচা একটা বিড়ি ধরায়। সে উঠে বসেছে। কাঠির আলোয় তার মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পাই। তার চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা। নজর সামনের দিকে। কটা মুখে ভাবের ছায়া চোখে পড়ে না। তারপরে কাঠি নিবে যায়। অন্ধকারে শুধু বিড়ির আগুন থেকে থেকে জ্বলে ওঠে।

কী ভাবে লোকটা। কী চিন্তা করে। সেই এক দিনের কথা নাকি, যেদিন হয়তো শুভদিনের লগ্ন দিয়েছিলেন পুরুতমশাই। হয়তো সেই লগ্নে ফোঁচার ঘরে হ্যাজাক বাতি জ্বলেছিল। ঢোলক কাঁসি বেজেছিল। তার গলায় ছিল ফুলের মালা। গায়ে ছিল নতুন জামা। আর স্বজনে ঘেরা কালো একটু কচি কলাবউ।

সে কি সেই কথা ভাবে! তার কি লোমশ মস্ত বুকটা খালি খালি লাগে নাকি। পাশের ঘরে যারা ঘুমোয়, সেইখানে কি চোখ ফেরে তার।

বিড়ি নিবে যায়। অন্ধকারে ডুবে যায় সব। আর কোনো কিছুই দেখা যায় না! কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কোনো প্রশ্নেরই জবাব নেই। অন্ধকারের তলে সব হারিয়ে যায়।

হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী এক শব্দ যেন দূর থেকে আসে। আসতে আসতে কানের কাছে বাজে। সহসা চোখ মেলি। কয়েক মুহূর্ত সবই অচেনার চমকে অস্পষ্ট লাগে। স্থান কাল পরিবেশ মনে থাকে না। তারপরে সব চেনা দেখি। দেখি, অন্ধকার নেই। আবছায়া অস্পষ্ট আলো ঘরের মধ্যে। চোখ ফিরিয়ে ফোঁচাকে দেখতে যাই। সে নেই, তার হোগলার চাটাইও নেই। দূর থেকে যে শব্দ আসছিল, তা আসলে গাজীর গুনগুনানি। শিয়রের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, সে আর সামনে নেই। দরজার কাছেই বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে। ডান হাতে দাড়ি মুঠো করে ধরা। গুনগুনানির কথা শুনি,

> 'ওহে দীনদরদী, বলো না কেন।
> তুমি যদি মন্দিরেতে করো অবস্থানো
> তবে এ জগত সোম্‌সার কার নিকেতনো।
> কেউ বলে তুমি রাম, থাকো পুবে, আর পশ্চিমে আলী।
> তবে কেন হিদয়সুরে খালি। ওহে দীনদরদী—
> কেউ জানে না, তুমি মনের মানুষ, মনে অবস্থানো।'...

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গুনগুনায়। কাল থেকে শুনে শুনে এখন বুঝতে পারি, সব গানেতেই এক কথা। গাজী এক কথার মানুষ। তার জাত নেই, ঈশ্বর নেই, খোদা নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্, মনের মানুষ। কখনো সে মুরশেদ, কখনো দীনদরদী। এ ধর্মের নাম কী। কে বা সেই মনের মানুষ। মুরশেদ আর দীনদরদী বা কে!

গাজী হঠাৎ গান থামিয়ে ঘরের দিকে ফিরে তাকায়। মশারির দিকে নজর চালিয়ে

ঘাড় বাঁকিয়ে চায়। আমাকেই দেখতে চেষ্টা করে। আমার চেয়ে-থাকা যেন তাকে নীরবে ডাক দিয়েছে। বলে, 'বাবু কি জাগলেন নাকি!'

জবাব না দিয়ে মশারি সরিয়ে মুখ বের করি। গাজী বলে, 'জয় মুরশেদ। আর একটু ঘুমালি পারতেন বাবু। এখনো তেমন সকাল হয় নাই।'

আমি বলি, 'দেরিও আর নেই। দেখতে দেখতেই আলো ফুটবে।'

গাজী আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে হাসে। বলে, 'ঘুমের কথা আর পুছ করব না। একে নতুন জায়গা, তায় যে ঢপের পালা।'

ঢপের পালা আবার কী। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'সেটা আবার কী?'

গাজী বলে, 'ঢপ গানের পালা হয় না বাবু! সেই কথাই বলি। আমাদের অনন্তবাবু আর দুলি ঠাকরুনের কথা বলছি।'

সে প্রসঙ্গে আমার আর যেতে ইচ্ছা করছে না। আমি তাকে ডাক দিই, 'মামুদ গাজী।'

গাজী অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে আনে। যেন মুগ্ধ হয়ে হেসে বলে, 'বাবু দেখি আমার নামখান মনে করি রেখিছেন। কী বলেন বাবু।'

স্মৃতিশক্তির প্রশংসা সেটা নয় যে, গতকাল শোনা একটা নাম ভুলে যাবো। আসলে গাজীটার বিনয় এই রকম। এমন তুচ্ছ নামটাও কেউ মনে রাখে নাকি। জিজ্ঞেস করি, 'তোমার ধর্মটা কী।'

গাজী ভুরু কুঁচকে তাকায় অনুসন্ধিৎসু চোখে। তবু দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসি। বলে, 'সে আবার কী বাবু। কোন্ ধম্মের কথা বলেন?'

'তোমার। তোমার গান শুনে তো কিছু বুঝি না।'

গাজীর হাসিতে যেন রহস্যের ঝিলিক লাগে। বলে, 'কেন বাবু, অবুঝ কথা তো কিছু বলি না।'

আমি বলি, 'বুঝতে পারি না।'

তেমনি হেসে গাজী বলে, 'গান দিয়ি যদি না বুঝোতে পারি, তয় আর কেমন করি বুঝাব বাবু। ধম্মো মম্মো যা বলেন, সব তো ওই গানে।'

তা বটে। এ যেন সেই কবির কথা, লিখে যা বোঝাতে পারিনি, মুখের কথায় তা কী বোঝাব। ডালে পাতায় ফুটে, গন্ধ ছড়িয়ে যদি পরিচয় না দিতে পারি, তবে কেমন করে জানাব, আমি কোন্ ফুল, কী নাম!

তবু কথা থেকে যায়। অবুঝ বোঝানোর দায় নেবে কে। তাই জিজ্ঞেস করি, 'তোমার রাম নেই, আলীও নেই।'

গাজী যেন চোখ ঘুরিয়ে মস্করা করে। বলে, 'না বাবু, রাম নাই, আলী নাই। কাশী গয়া মক্কা মদিনা, কিছুই নাই।'

'তবে কী আছে, কে আছে?'

হাত মেলে ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে তর্জনী দিয়ে নিজের বুক দেখায়। ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'বাবু, এই ঘরখানি আছে।'

কাকে বলে ঘর। শরীর, না প্রাণ। গাজী নিজেই ঝুঁকে আসে আরো। যেন চুপিসারে গুপ্ত কথা বলে, 'অই যে সেই বলে না বাবু, "ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনি ভজন কর। যখন পলাবে সেই রসের মানুষ, পড়ি রবে শুধুই ঘর।" এই ঘরেতে সব আছে বাবু।'

মরণের কথা বলে, না আর কিছু, বুঝতে পারি না। কে বা সেই রসের মানুষ। কার বা ভজন, কেমন বা তার ধরনধারণ, সকলই হেঁয়ালি। দেহ কেবল দেহ নয়, তার নাম আবার ঘর। জিজ্ঞেস করি, 'আর কিছু নেই?'

বুকের কাছে দু' হাত রেখে চোখ আধবোজা করে বলে, 'আর আছেন, দীনদরদী মুরশেদ।'

জিজ্ঞেস করি, 'মুরশেদটি কে?'

'তিনি গুরু। গুরু সত্য, মুরশেদ সত্য।'

দুর্বোধ্য লাগে, বুঝতে পারি না। গুরুর নাম নিয়ে চলাই ধর্ম নাকি। এদের আর কিছু নেই। মনে পড়ে যায় গাজীর গতকালের গান, "আমি এসে এই দুনে, মন মুরশেদ না নিলাম চিনে।" আরো মনে পড়ে, "মুরশেদ আমার কোন্‌খানে বিরাজে। মুরশেদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে।"

'গুরু কি তোমাদের সব নাকি?'

গাজী মাথা দুলিয়ে বলে, 'নিশ্চয়। গুরু ছাড়া আর কে আছে বাবু। তিনি যে সব পথ দেখায় দ্যান।'

'কিসের পথ?'

'মনের মানুষের।'

'মনের মানুষের?'

'আজ্ঞা, অই যে সেই রসের মানুষের কথা আছে।'

'সে আবার কে?'

'কেন বাবু, যাকে বলে অধর মানুষ।'

যেন অন্ধকার দিয়ে তৈরি কথা। হাতড়ানো বৃথা। তার এদিক-ওদিক দেখা যায় না। গাজীর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। দেখি, তার ফাটা মুখে যেন এক ভাবের খেলা। স্বপ্নের ঘোর নামে তার আরশি-চোখে।

জিজ্ঞেস করি, 'সে থাকে কোথায়?'

গাজী হাত নেড়ে বলে, 'মন্দিরে না বাবু, মসজিদে না। আশমানেও না।'

আবার তর্জনী দিয়ে বুকে ঠেকিয়ে বলে, 'এই ঘরে, এই ভাণ্ডে।'

অবুঝের মতো জিজ্ঞেস করি, 'দেখতে কেমন?'

'রূপ নাই বাবু, তিনি নেরাকার।'

নেরাকার যে নিরাকার, তা বুঝতে পারি। নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা নাকি। বলি, 'ঘরের কথা বলছ, আবার নিরাকার হলো কেমন করে?'

গাজী বলে, 'আকারের মধ্যি নেরাকার।'

সেই অন্ধকারের কথা। কেবল রহস্যের জাল ছড়ানো। প্রায় হতাশ হয়ে বলি, 'ধরতে পারলাম না।'

গাজী বলে, 'আমিই কি পেরিচি বাবু। তা হলি আর অধর ধরা বলচে কেন।'

'ধরা যায় না?'

'যায় বই কি। না হলি আর সাধন-ভজন কিসির। তবে বড় কঠিন কাম বাবু, সবাই ধরতি পারে না।'

'কী করে ধরতে হয়? মন্ত্রতন্ত্র আছে নাকি?'

'না বাবু, মন্ত্র নাই তন্ত্র নাই, জপ নাই, তপ নাই।'

আবার সেই রহস্য। সন্দেহ হয়, গাজী বলতে নারাজ। হয়তো বলতে নেই, তাই কেবল কথার ধাঁধা। বলি, 'তোমরা তো জাত মানো না।'

'না বাবু, জাতিপাতি নাই।'

'তবে নিরামিষ খেতে হয়, না?'

গাজী হেসে বলে, 'না বাবু, খানাপিনার কোনো বারণ নাই। ইস্তক মদ মাংস যা বলেন, কোনোটা হারাম না।'

সে আবার কেমন কথা। মদ মাংসও নিষেধ নয়। তবে যে গাজীকে দেখেছি নিরামিষ খেতে। কথা বলবার আগে গাজী নিজেই আওয়াজ দেয়, 'আমার কথা আলাদা বাবু, আমি মাছ মাংস খেতি পারি না। তয়, এই সাঁই দরবেশ যা বলেন, তাদের কোনো কিছুতি বারণ নাই। সকলের হাতে সব খেতি পারে।'

গাজীর কথা শুনে এইটুকু বুঝেছি, সব কিছু বোঝা যায় না। ভারতবর্ষ একে-তে নেই, বহুতে। সব কিছু তার বুঝতে পারব, এমন আশা নেই। একবার মনে হয়, নিরীশ্বরবাদের কথা বলে। আবার মনে হয়, এর নাম রহস্যবাদ। কিন্তু সে খোঁজে আমার দরকার নেই। রহস্য যাই থাক, এইটুকু বুঝেছি, মানুষ সে যেমন হোক, গাজীর ধর্মে, সে আছে সব-কিছুতে। ধর্ম থাক, তার গান শুনেছি, সেই ভালো।

বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবো, গাজী ডাক দেয়, 'বাবু।'

আমার মুখ থেকে সে চোখ সরায়নি। ডাক দেয় যেন স্বপ্নের ঘোরে। গাঙের জলে রোদের মতো গোটা মুখটা চিকচিক করে। তার দিকে তাকাই। বলে, 'বলেন তো বাবু, সোম্‌সারে সবার বড় কে?'

তার কাছে হয়তো সেই রসের মানুষ, যার নাম মনের মানুষ। তাই জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকি। গাজী নিজেই বলে, 'মানুষ। সবার বড় মানুষ, না কী বলেন বাবু। তয়, সেই মানুষের দুই ভাগ, নর আর নারী। মরদ আর আওরত, ঠিক তো?'

মানুষ দেখে, মানুষে যার সাধ মেটেনি, সে 'না' বলে কেমন করে। এমন অহঙ্কার কবে করতে পেরেছি, মানুষ বাদ দিয়ে জীবনযাপন চলে। নিজেকে বাদ দিয়ে আর সব ধরি কেমন করে। কিন্তু গাজী আমার জবাব চায় না। সে নিজের কথা নিজের ঢঙে বলে। বলে, 'তা, জানবেন বাবু, এনাদের এই দুজন ছাড়া কোনো কিছু মিলে না। অই যে সেই অধর মানুষের কথা, তা একলা ধরা যায় না। সোম্‌সার করতি হলি যেমন মিয়াবিবি ছাড়া হয় না, মনের মানুষ পেতি হলি তেমনি দুজনার যোগ চাই, বুইলেন?'

এবার ভুরু কুঁচকে নজরে পুছ করি। কোন্ দিকে নিয়ে যায় গাজী। কী কথা বলতে চায়। যেন বহু দূরে শুনি এক পায়ের শব্দ। যে শব্দ আমার প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতায় নেই, শুধু তার কথা শুনেছি। সে কথা এক সাধন পদ্ধতির।

গাজী বলে চলে, 'তয়, আসল কথা হলো, সোম্‌সারে মিয়া-বিবি, আর এখেনে পুরুষ-পিকিতি, বুইলেন তো?'

পিকিতি যে প্রকৃতি, সেটা বুঝতে পেরেছি। অধর ধরার সাধন যে কী, তাও এবার কিছু অনুমান হয়। গাজী আবার বলে, 'আর মিয়া-বিবি সোঁতে চলে। পুরুষ-পিকিতি উজানে চলে। সেই বাবু কঠিন কাম, উজানি যাওয়া। ওতি আপনার বেহ্মচয্যি চাই।'

বলে গাজী একটু দাড়ি ঝাড়া দিয়ে চোখ বুজিয়ে হাসে। অনুমানে ভুল করিনি। এ বিষয়ে কম-বেশী কিছু যে শুনিনি, তা নয়। তার ধর্ম কী, মর্ম বা কী, তা জানি না। কিন্তু গাজীর সম্পর্কে সহসা যেন মনেতে আমার নতুন কৌতূহল ঝলকায়। গতকাল সকাল থেকে সেই যে অধর মাঝিকে ডাক দিয়ে নৌকায় উঠেছিল, তারপরে আর ছাড়াছাড়ি হয়নি। শুধু এইটুকু জেনেছি, বসিরহাট শহরের ধারে কোথায় যেন তার বাসা। ঝোলা কাঁধে করে কেবল নামের মজুরি করে বেড়ায়। এবার কথা শুনে গাজীকে যেন আমার একটু কেমন লাগে। জিজ্ঞেস করি, 'তোমারও পিকিতি আছে নাকি?'

গাজী যেন হঠাৎ চমক খায়, অবাক হয়। তারপরে দেখ, এই যে হা হা করে হাসি শুরু করে, তা আর শেষ হতে চায় না। কী ব্যাপার! মাতাল নাকি হে।

চড়া হাসিও যেন ঘোরের হাসি।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে হাসি যদি বা থামে, এবার গাজীর মুখখানি দেখ। এ যেন সেই গাজী নয়। এ যেন ছোকরা ডাগরা, শরমে মোচড় দেয় শরীরে। মুখ নীচু করে বলে, 'তা বাবু অই যা বলেন, একজন আছে।'

বটে। অমন রঙ ফেরানো দেখেই বোঝা গিয়েছিল, পিকিতি একজন আছেন। কিন্তু সাধকের অমন গৃহী জোয়ানের মতো লাজে লাজানো ভাব কেন। জিজ্ঞেস করি, 'বিয়ে করেছিলে বুঝি?'

গাজী তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলে, 'তোবা তোবা, গাজী দরবেশের আবার বে' কী বাবু? এ সোমসারে কে বা কার সোয়ামী, কে বা কার ইস্তিরি।'

তাও তো বটে। সব পুরুষ আর প্রকৃতি। কিন্তু পিকিতিটি আসেন কোথা থেকে। তাকে কি মুরশেদ পাঠিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করতে হয় না, গাজী নিজেই জবাব দেয়, 'এ সব কিছু ছিল না বাবু। সময় হলি সবেরই খোঁজ পড়ে। তা সময়-টময়ের কথা কখনো ভাবি নাই। ঝোলা নিয়ে একা একাই বেড়াতাম। এই ধরেন দশ এগারো বছর আগে হাড়োয়ার মেলায় যেয়ি এক কান্ড হলো। হাড়োয়ার মেলা জানেন তো বাবু!'

ঘাড় নেড়ে জানাই, জানি না। গাজী চোখ বড় করে বলে, 'সে এক পেকান্ড মেলা হয় বাবু। পিতি বছর ফাগুন মাসের বারো তারিখে পীর গোরাচাঁদের মেলা হয়।'

পীর, আবার গোরাচাঁদ। কী দিয়ে মিলজুল হয়, সে খোঁজে যেও না। পীরের দরগায় গিয়ে হিন্দু সিন্নি দেয়। মুসলমানে গোরা ভজে। কার্যকারণ জটিল, ভেদ করতে যেও না। নাম কী হে? আঁজ্ঞে, দুলাল আলী। ঠাকুর নয়, মানুষের নাম। দুলাল পাবে, আলীও পাবে। জিজ্ঞেস করি, 'তিনি কে?'

গাজী বলে, 'মস্ত এক সাধক ছিলেন বাবু। ওখেনে উনি দেহরক্ষা করিছেন। হিঁদু মোচলমান, সব ওঁনার ভক্ত। তা, অই পিতি ফাল্গুনের বারো তারিখে ওঁয়ার দরগায় মেলা হয়। হাড়োয়ার হাটের নাম শুনিছেন বাবু?'

ঘাড় নেড়ে জানাতে হয়, শুনিনি। গাজী বলে, 'সে এক পেকান্ড হাট বাবু, বিদ্যেধরী গাঙের ধারে। বেড়াচাঁপা থেকি যেতে হয় দক্ষিণে। যদি কোনোদিন যান বাবু, দেখিতি পাবেন।'

গেলে দেখতে পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ গাজী যে রকম সবই পেকান্ড বলছে, প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। দেখতে সাধ হয় বই কি!

গাজী কয়েক মুহূর্ত চৌকাঠে নখ দিয়ে দাগ কাটে। তারপরে বলে, 'তা সেই এগার বছর আগের কথা বলছি বাবু, সে বছরই ইনি দেখা দিলেন হাড়োয়ার মেলায়।'

জিজ্ঞেস করি, 'কে, প্রকৃতি!'

গাজী কয়েকবার ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। যদিও লজ্জার ভাবটি ঘুচতে চায় না কিছুতেই। আমার তখন কিস্যার কৌতূহল। না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'কী করে?'

গাজী যেন কেমন মনোভঙ্গভাবে বলে, 'সে আর বলেন কেন বাবু। পিতি বছর যেমন যাই, সে বছরও তেমনি গেছি। তা, সকালের দিকি যেয়ি দরগার লুটের বাতাসা খান কয়েক যোগাড় করি একটু বেড়ায়ি নিলাম। তারপর ভাবলাম কি যে, কমনে আর ঘুরি বেড়াব। এক জায়গায় বসি, একটু গান করি। দু'-চার পয়সা যা পাই, না-হয় চাল ডাল সন্ধেবেলা সেবা করা যাবে। তা যাবো আর কমনে, দরগার উঠোনে এক পাশে বসি ডুপ্‌কি ধরলাম।'

গাজীর বয়ান এই রকমঃ উঠোনে এক বটগাছের ছায়ায় সে ভাব্য হয়ে বসে গান

ধরেছিল। ডুপ্‌কি আর ঘুংগুরের তাল ছিল। তার ধারণা, লোকজনের ভালো লেগেছিল, তাই পয়সা চাল ডাল মন্দ পায়নি। সে যেখানে বসেছিল, তার কাছেই একটা নাকি দল বসেছিল। দেখে মনে হয়েছিল, ন্যাড়া নেড়ী ভাবেরই কোনো দল। দলের তো অভাব নেই। যদি জানতে চাও তবে গাজী তোমাকে শত নাম শুনিয়ে দিতে পারে।

যাই হোক, সেই দলের কেউ কেউ কাছে বসে তার গান শুনেছিল। সেই দলেই ছিল এক মেয়ে। তা বয়স প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হবে। গায়ে পাড় ছাড়া গেরুয়া, কপালে রসকলি, আতেলা চুল ছড়ানো। 'বুইলেন বাবু, দেখি মনে হলো, গাজীর গান তারই সব থেকি ভালো লেগিছে।' তাই, সে তো আর কাছছাড়া হয় না। লজ্জার মাথা খেয়ে গাজী আর কী বলবে। যতবার চোখ তোলে, দেখে সেই বোষ্টমী আর চোখ ফেরায় না। আবার নাকি চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলে, 'বাবাজীর গান শুনে যে মরণ ধরে গো।'

কিন্তু তা বলে, সেসব কী আর দলের লোকের ভালো লাগে। তাদের মুখ ভার, রাগ রাগ ভাব। বোষ্টমীর সেদিকে খেয়াল নেই। যত শোনে, তত শুনতে চায়। গাজী বা করে কী। গান নিয়ে কথা। শুনতে চাইলে না শুনিয়ে কি পারা যায়? 'না কি বলেন বাবু।'

তারপরে সে বোষ্টমীর পাগলামি দেখ, দলের সবাই যখন খিচুড়ি অন্ন খেতে বসেছে, সে তখন কলাপাতা ভরে গাজীকে খেতে দিলে। গাজীর তো ভারী লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু ও রকম করে দিলে না খেয়ে কি পারা যায়। আর গাজীর কী-ই বা যায় আসে। আজ মৌত, কাল ফৌত। পরদিন ভোরবেলাই তো সে চলে যাবে। তখন এসব কোথায় থাকবে। সে পরিতোষ করেই খেয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলতে হবে, মানুষটার মন ভালো। প্রাণখানিও বেশ তাজা। মেজাজ একটু ঝাঁজালো।

এ সময়ে একবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আর দেখতে?'

গাজীর আবার সেই হাসি, যে হাসি শেষ হতে চায় না। বলে, 'বাবুর যে কথা! তা বাবু, কালোর ওপরি খারাপ বলতি পারব না। সোমত্ত মেয়েছেলে, ছাওয়াল-পাওয়াল হয় নাই। বেশ শক্ত পোক্ত ডাঁটোসাঁটোটি ছিল। রঙটা একটু কালো, তা বাবু, তাতে একটু ছিরি ছিল। ওইরকম কালো মুখি রসকলি বড় মানায়।'

তা বলে, বাবু যেন মনে না করে, গাজীর সেদিকে কোনো খেয়ান ছিল। এদিকে যত সন্ধ্যা ঘনায়, ভিড় তত বাড়ে। সারা রাত্রের মেলা তো। রাত্রে কত কবিগান, ঢপ, যাত্রা, তার সংগে ম্যাজিক, সার্কেস—রাজ্যের ফুর্তি। তাতে আর গাজীর কী করার আছে। তবে একটু ঘুরে ফিরে দেখতে ইচ্ছা করে। গাজী ভাবল, যাই, একটু হাতমুখ ধুয়ে দু'-এক দন্ড নদীর ধারে বসি গিয়ে। তারপরে ঘোরা যাবে।

নদীর জল তো মুখে দেবার উপায় নেই। নোনা জল। দরগার পাশেই চাপাকল। গাজী সেখানে হাতমুখ ধুয়ে নদীর ধারে যাবার আগে সেই দলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যদি তাকে দেখা যায়। এত গান শুনল, খুশি হয়ে পেট ভরে খাওয়াল, আবার দেখা হয় কি না হয়, একটু দেখা করে যাওয়া উচিত। কিন্তু দলের কোথাও তাকে দেখা গেল না। গাজী তাই আস্তে আস্তে বিদ্যাধরীর ধারে গেল। মেলাই লোকজন। নিরিবিলি খোঁজবার জন্যে হাঁটতে হাঁটতে একটু ফাঁকায় গিয়ে বসল।

আকাশে সে সময়ে চাঁদ। তবে বড় নয়, জ্যোৎস্না একটু ফিকে। নদীর মাঝখানে এক চড়া। তাতে গোমাকেওড়ার জঙ্গল। গাজী সেদিকে চেয়ে বসে আছে। সে সময়ে কে যেন পিছন থেকে এস ডাক দিলো, 'কী হলো সাঁইবাবাজী, বিবাগী হয়ি এখানে চলি এলে যে?' গাজী দেখে সেই বোষ্টমী। বলে, 'না, বিবাগী হবো কেন। সারা দিন লোকজনের মধ্যি ছিলাম। এবার একটু নিরালায় এসিছি।' কিন্তু, গাজী কি

বলবে, সেই মেয়ে একেবার তার পাশে এসে বসল। বসে বলে. 'আমার জ্বালায়
বলবে, সেই মেয়ে একেবারে তার পাশে এসে বসল। বসে বলে, 'আমার জ্বালায় কী কেউ পলায়। তোমার কাছে থেকি জুড়ায়।'

সে বলে, 'কই, সাঁইকে দেখি তো সে রকম মনে হয় না। তা হলি তো একবার কাছে ডাকতি হয়, বসতে বলতি হয়, নিদেন নামখান জানতি মন করে।'

হ্যা, মিথ্যে বলবে না, তখন যেন গাজীর মনটা একটু কেমন কেমন করে। একটু যেন ব্যথায়, নিশ্বাস পড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'নাম কী?'

সে বলে, 'তারা।'

তখন গাজীর একটু ঠাট্টা করতে ইচ্ছা করে। বলে, 'কোন্ তারা? নয়নতারা, না আশমানতারা?'

তারা বলে, 'যে যেমন দেখে। সাঁইজী কেমন দেখে?'

'সাঁই না, লোকে আমাকে গাজী বলি ডাকে।'

তারা বলে, 'বেশ, গাজীই না-হয় হলো। গাজী কেমন দেখে?'

তা এতে মানুষের মন একটু মজে কি না, বাবুই জবাব দিক। গাজীর তাই নিশ্বাস পড়ে। বলে, 'আনার তো মনে হয়, আশমানতারা।'

'কেন?'

'চোখ চাইলি দেখা যায়, হাত বাড়ালি ধরা যায় না।'

তারা তখন খিল খিল করে হাসে। গজীর মনে হয়, বিদ্যাধরীর জলে বুঝি জোয়ার আসে। তারা বলে, 'আর নয়নতারা?'

'সে তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে, নিজির মধ্যি।'

তারা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'তা নাও তো থাকতে পারি।'

গাজী কি বলবে বাবুকে! তার যেন মনে হলো, ভিতরে তার কোটালের বান ডাকে। ভাবে, এ বুঝি মুরশেদের লীলা। অধরধরার ফাঁদ তুলে দেয় হাতে। গাজী জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের লোকজনেরা কী বলবে?'

তারা বলে, 'কী আবার বলবে। আমি কারুর দাসী না। কাউকি কিছু বলবও না।'

তখন গাজী তাকে নয়নতারা নামে ডেকে বলে, 'তবে নয়নতারা, তোমাকে নিয়ি আমি মনের মানুষ ভজব।'

তারা বলে, 'যে তোমার মনের মানুষ, সেই আমার ছিকেষ্ট।'

গাজী বলে, 'কবে যাবে?'

'আজই যাবো, এখুনি।'

'তোমার জিনিসপত্তর?'

'কিছু নেবো না।'

গাজী যে কী বলবে বাবুকে! এ যেন সমুদ্র থেকে আসা জোয়ার। যতক্ষণ তার কাল, ততক্ষণ সে পিছন ফিরে তাকায় না। সেই তার নিয়ম। বেশ, তবে তাই চলুক নয়নতারা, এখান থেকেই সোজা হাঁটা ধরা যাক।

এই পর্যন্ত বলে গাজী চুপ করে। আর ভুরু কুঁচকে ঠোঁট টিপে আমি ভাবি, বাঃ গাজী, এর নাম প্রকৃতি-প্রাপ্তি।

গলায় আমার ঠেক লেগে যায়, খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি না। মনে মনে বাহবা দিয়ে কেবল গাজীটার দিকে চেয়েই থাকি। আর গাজীটার, দেখ, মুখ তোলবার নাম নেই। ময়লা কালো কালো নখে ঘষে ঘষে চৌকাঠসুদ্ধ না খুঁড়ে ছাড়ে। আমার কানে তখনো বাজতে থাকে, 'সাগরের বান বাবু, জোয়ারে সে যতক্ষণ

চলতি থাকে, ততক্ষণ আর ফিরি চায় না। সেই তার নিয়ম, বুইলেন তো। তা নয়নতারার তখন সেই হাল। মিছা বলব না বাবু, গাজীরও। ভাবলাম, কি বলে যে, তবে তাই চলুক নয়নতারা।'...ভাবো, এর পরে বাহবা না দিয়ে তুমি করো কী। এ বিয়ে না, শাদীও না। তাতেও তো আবার 'তোবা তোবা। সোম্সারে কে কার সোয়ামী, কে কার ইস্তিরি।' তবে ওই কথাটিও ভুল। সবই পুরুষ-প্রকৃতি নয়। যাঁর ভজন-সাধন, তিনিই সব। তাঁর কাছে আবার স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় কী। এই হলো মোদ্দা কথা।

তা হতে পারে। কিন্তু এটাকে কী বলে। আমরা তো সাধক নই। একে কি হরণ বলে! তাও হয়তো তোবা তোবা। প্রকৃতি হরণ! এমন কি হতে পারে! এ কি তোমার বীর্যবানের বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! অতএব এর নাম বিয়ে না, শাদী না, হরণ না, ভোগ না। এর নাম প্রকৃতি-প্রাপ্তি। মুরশেদের মিলিয়ে দেওয়া। জয় মুরশেদ! জয় মুরশেদ! ঘর করা তো নয়, মনের মানুষ ভজন।

এতক্ষণে একটা ধন্দের নিরসন। তাই তো ভাবি, গাজী অমন ঠেকা বুঝে সবখানে তাল দেয় কেমন করে। লঞ্চে দেখেছি মা-মেয়েকে সামলাতে। এদিকে দেখেছি, আঙুরি-মাহাতো, দুলি-অনন্তর বিষয়ে ঠিক তাল দিচ্ছে। এমন কি, নারায়ণ ঠাকুর আর ফোঁচার বউয়ের ব্যাপারেও দাড়ি কাঁপানো লহরায় মোক্ষম তাল দিয়েছিল। ওসব শুধু মুরশেদে হয় না। মুরশেদের মিলিয়ে দেওয়া লীলা-মাহাত্ম্যে মাতোয়ারা যে! আর আমি কেবল কথা শুনে, ভাব দেখে ভাবি, গাজীটা পাজী।

পাজী তো বটেই, নইলে আর এমন হয়। যে কালোমুখে রসকলি আঁকার মানান দেখেছে, সে তালে ভুল করবে কেন। এখন দেখ, বেত্তমেজ ব্যাদ্ড়া গাজী শরমে মরে যায় হে। মুখ তুলতে পারে না! জিজ্ঞেস করি, 'তা, সেখান থেকেই তা হলে হাঁটা ধরলে?'

গাজী ঘাড় কাত করে বলে, 'আজ্ঞা, মুরশেদের নাম নিয়ি।'

সে তো নির্যস কথা। মুরশেদের নাম না নিলে, পায়েই বা জোর দেওয়া যায় কী করে। বলি, 'তা, নয়নতারা সবই ফেলে গেল, নিজের কিছুই নিয়ে গেল না?'

গাজী নিজের ঝোলা দেখিয়ে বলে, 'নেবার আর কী ছিল বাবু, ওইরকম একখানা ঝোলা তো!'

'তা হতে পারে। একেবারে এক কাপড়ে গেল, একটা বাড়তি কাপড়ও তো দরকার।'

'তয় আর জোয়ারের টান কেন বাবু।'

সেও তো কথা, মুখ বন্ধ আগেই হয়েছে। কিন্তু সে নিজেই আবার বলে, 'তয়, তার দলের মানষির জন্যি যে আমার মনটা একটু দোমনা হয় নাই, তা বলতি পারব না। ভেবিছিলাম, কী জানি দেখতে পেয়ি যদি একটা ঝগড়া-বিবাদ লাগায়, তা হলি মেলার মধ্যি একটা সোরগোল পড়ি যাবে। সবাই বলবে, মামুদ গাজী মেয়েছেলে লুট করে। তা সে কথা যেমনি নয়নতারাকে বলিছি, তেমনি একেবারে ফণা তোলা সাপের মতন ফোঁস করি উঠিছে। সে যে মুত্তি বাবু, কী বলব আপনাকে। চোখে আগুন, মুখে আগুন, গোটা নয়নতারাখানি আগুন।'...

গাজী বলে এমন করে, স্বর শুনে, মুখ দেখে মনে হয়, অমন আগুনের চেয়ে সুন্দর আর ত্রিভুবনে নেই। অমন আগুনে পুড়ে মরতে না জানি তার কত সুখ। বলে, 'নয়নতারা ঠোঁট বেঁকায়ি, রসকলি কাঁপায়ি বলে, "ইস্সি হে, কেন, আমি কারু কেনা বাদী নাকি যে, ঝগড়া-বিবাদ করবে। তারি বোষ্টমী কারুর দেবদাসী না। আসুক দিকি কেউ কিছু বলতি, মুখে নুড়ো জেবলি দেবো।" তা হলি আর গাজীর

দোমনা করবার কী আছে, বলেন। মনে হরিছিল, গোটা মেলার তাবৎ লোকে এসিও যদি আটকাত, তা হলিও নয়নতারাকে ঠেকাতি পারত না। বাবু মিছা বলব না, এমন মেয়েছেলে আর দেখি নাই।'

গাজীর মুখে মেয়েছেলে মানায় না। বলা উচিত পিকিতি। আর অমনটি যে সে কস্মিনকালেও দেখেনি, তার বাত শুনলেই বোঝা যায়। মাত হওয়া দেখেই অনুমান হয়। আমি তো কানেও শুনিনি। কী গান যে গাজী শুনিয়েছিল, কে জানে। গানেরই গুণে, না কী গুণ হওয়ার গুণে, কে জানে, সারাদিনের দেখাদেখি, সাঁঝবেলাতে প্রকৃতি একেবারে হাত ধরে জীবনসঙ্গিনী। খাঁটি প্রকৃতি সন্দেহ নেই। খাঁটি প্রকৃতির ধরন এমনি বোধ হয়। তার লুকোছাপা ছলচাতুরি নেই। যেমন ঋতু, তেমনি সাজ। খরায় খরায় খরো, ঝরায় ঝরঝর। লাগল বান তো নামল ঢল। ভেসে চলে যায়। গাজীর দোষ কী বলো। তার দোষ দিও না।

সে বলে, 'সারারাত হেঁটি চলি গেলাম বসিরহাট।'

জিজ্ঞেস করি, 'সারারাত হাঁটলে?'

'হ্যাঁ। তা বাবু, দূর তো কম না। বিশ-পঁচিশ মাইল তো হবে।'

শোনো এবার কথা, আর পুছ করবে কী। দু'-দশ নয়, বিশ-পঁচিশ মাইল: না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'সে কি হে, অত দূর হেঁটে গেলে, কষ্ট হলো না?'

গাজী হেসে বলল, 'আমাদের আবার পথ চলাতে কষ্ট কী বাবু। চলিই তো আছি।'

তারপরে দেখি, গাজীর দাড়িতে একটু লাজে লাজানো হাসি ফোটে। বলে, 'আর সে চলা তো বাবু গোণের চলা। গাঙে যেমন আপনার অমাবস্যে পুন্নিমের গোণ লাগে, সেই রকম আর কী। অল্পস্বল্প জোছনা ছিল। সড়ক ধরি যাই নাই। শুকনার কাল, মাঠ দিয়ি হেঁটে গেছি।'

তারই বা আর দরকার কী ছিল। গোণ কোটালের চলা, জ্যোৎস্নাতেই বা কী করে, আর সড়কেই বা কী প্রয়োজন। আলাদা করে আর নয়নতারার কষ্টের কথাও পুছ করার জরুরত নেই। তারও তো গোণের চলা। কেবল আমার চোখের সামনে ভাসে, আলখাল্লা গায়ে, ঝোলা কাঁধে, বাবরি আর দাড়ি ওড়ানো এক পুরুষ। তার পাশে কালোর ওপরে মুখখানির ছিরি ভালো, কপালে রসকলি আঁকা, পাড়হীন গেরুয়াপরা, চুলখোলা এক যুবতী। ফিকে জ্যোৎস্নায়, মাঠের ওপর দিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। সূর্যোদয়ের আগে যাদের মুখ চেনাচিনি ছিল না, সূর্যোদয়ের পরে তারা পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক পাতিয়ে চলে যায়। এবার অবাক হয়ে থাকো গিয়ে। কিন্তু জীবনকে ছকে ফেলতে যেও না। ভাবো, তখন তাদের চোখে চোখে কী কথা। প্রাণে বা কিসের রোল।

ইতিমধ্যে নারায়ণ ঠাকুরের উদয় না হলে আর না জানি কী বাতপুছ হতো। নয়নতারার কথা আর জিজ্ঞেস করা হয় না। গাজীর মুখ তখনো লজ্জাহানা হাসিতে ঝলকায়। নারায়ণ জিজ্ঞেস করে, 'ঘুম-টুম হয়েছিল তো?'

'ওই একরকম।'

জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। ভোর-ভোরের অস্পষ্টতা আর নেই, রোদ উঠে পড়েছে। তার মধ্যে গাজী আওয়াজ দেয়, 'দুলি ঠাকরুন কমনে গেল ঠাকুরমশায়!'

নারায়ণ ঠাকুর মুখখানির আকৃতি বদলে বলে, 'যে চুলোয় যাবার, সেই চুলোতেই গেছে। টের পেয়েছিলে নাকি?'

গাজীর পালটা দাবি, 'আপনারা পান নাই?'

'তা আবার না পাই! পেত্থম তো পেছনে গিয়েই ডাকাডাকি করেছে।'

গাজী বলে, 'তয়, আওয়াজ দিলেন না যে?'

নারায়ণ ঠাকুর তার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, 'দিয়ে কী হবে। নাকাল করা ছাড়া আর তো কিছু না। তা সে হলে তো। সেই বলে না, হাগন্তির লাজ নাই, দেখন্তির লাজ। নতুন তো না, এবার নিয়ে বার তিনেক হলো।'

বলে নারায়ণঠাকুর আমার দিকে চায়। গাজী বলে, 'সেই তাই। জয় মুরশেদ!'

বলতে বলতে সে ওঠে। ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবু জানেন নাকি?'

গাজী যেন বড় সহজে বলে, 'বাবুর পাশ দিয়িই গেল কি না। তখন আমরা জেগি রয়িছি।'

কথাটা যেন নারায়ণ ঠাকুরের সম্মানে লগে। বলে, 'নাঃ, আর ওসব আশকারা দেবো না। দাদা দাদা বলে এসে ন্যাকামি করবে, ওসব আর হবে না। তবে ওই, ভালোর কাল নেই। কাঠ খেলে আংরা ছাড়তে হবে, আমাদের আর কী।'

কিন্তু এ প্রসঙ্গ ভুলে যাই, যখন দেখি, ফোঁচার বউ গরম চায়ের গেলাস নিয়ে ঢোকে। তৃষ্ণা ছিল মনের অগোচরে। দেখে তৃষ্ণা বাড়ে না কেবল, প্রাপ্তির আশায় মন ঝলকে যায়। তা বলে যদি ভাবো, ফোঁচার বউয়ের কাঁখে ছেলেটি নেই, তা হলে ভুল। এক হাতে সেটি ঠিক ধরা আছে, আর এক হাতে চা।

গাজী তাড়াতাড়ি হাঁকে, 'আমার একটু হবে তো গো ঠাকরুন।'

ঠাকুরের সেই বিরক্তি। বলে, 'হবে, গেলাসখানি বের করো।'

'করিই আছি।'

বলে ঝোলা থেকে অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস বের করে আঙুল দিয়ে তাল বাজিয়ে দেয়। ফোঁচার বউ নিঃশব্দে একটু হাসি ছিটিয়ে যায়। ফোঁচা জল এনে দেয় বারান্দায়। ঠাকুর বলে গাজীকে, 'চা খাওয়া হলে বাবুকে নিয়ে একটু মাঠ ঘুরে এস।'

নির্দেশের মধ্যে ইঙ্গিত আছে। অতএব চায়ের পর মাঠে। মাঠ ঘুরে ফেরার পথে, গাজী পথঘাটের খোঁজ-খবর করে। খেয়াঘাটে গিয়ে জেনে আসে, ওপারের পথঘাটের অবস্থা, মোটর-বাসের ক্ষণ সময়। এদিকে লঞ্চের খবর নিতেও ভোলে না। তাতে জানা গেল, বাস চলাচলের সময়ে একটু গোলমাল। তবে চলাচল আছে। পথঘাট একেবারে অচল হয়ে নেই। কিন্তু গোসাবা থেকে লঞ্চ এসে পৌঁছুবে সাড়ে নটায়। থামাথামি নেই, লোক তুলে নিয়েই চলে যাবে। গাজী বলে, 'সেই ভালো। ডাঙার রাস্তায় যখন একটু গোলমাল আছে, তখন লঞ্চে করিই চলেন। নেমিই হাসনাবাদ থেকি বাস পাবেন।'

মতলবটা মন্দ না। তবে মনের মধ্যেই একটু যেন ঠেক খেয়ে যায়। ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখখানি মনে পড়ে যায়। তাঁর কথাই যে শেষ পর্যন্ত ফলে যাবে, কে জানত। আজ যে আবার তাঁদের সঙ্গেই আমাকে ফিরতে হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী আগেই ঘোষণা করেছিলেন। গোটা পরিবারের কাছে আর এক প্রস্থ নাকাল। তাই বলি, 'না গাজী, তার চেয়ে ডাঙার পথেই যাই চলো।'

'কেন বাবু, উপায় থাকতি গোলমালে যাবেন কেন?'

ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তীর কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিই। গাজী হেসে লুটায়। বলে, 'বাবুর যে কথা! চুরি তো করেন নাই।'

তা করিনি। এ যেন তার চেয়ে বড় অপরাধ। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে যে বচন সম্ভাষণ জুটবে, তা এখনই অনুমান করতে পারি। তাইতেই আমার ভয়। তাঁর উপদেশ তখন শুনিনি। মাস্টার মশাই এমনি ছাড়বেন না।

গাজী আবার বলে, 'কিন্তু ওঁয়ারা তো কলকেতাতি যাবেন। এদিকি আর আসবেন

কেন, ক্যানিং থেকি রেল করিই চলি যাবেন।'

'কিন্তু এ পথে ফিরবেন বলেছিলেন।'

গাজী বলে, 'তা হোক গে। দেখা যদি হয়, মন্দ কী। সে বাবু বড় মজার বাবু।'

সবাই তার কাছে মজার বাবু। চক্রবর্তী মশাইয়ের ধমকধামক রুক্ষভাষের মধ্যে যে একজন মজার মানুষ আছে, রসকে গাজী তাতে ভুল করেনি। মনে ভাবি, সেই ভালো। দেখা যদি হয়, মন্দ কী। ব্রহ্মনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়ে, মাথা দুলিয়ে, দাঁত কাঁপিয়ে, টাক ঝলকিয়ে বচন দেবেন। তাই ভোগ করব।

নারায়ণ ঠাকুরের ঘরে ফিরে এসে মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিই। সকালবেলার চা জলখাবারের ব্যবস্থাটাও একেবারে মন্দ নয়। মুড়ি, গরম জিলিপি, চা। তারপরে হিসাবপত্র করে টাকা মেটানো। কিন্তু হিসাবে কেবল আহারের দাম কেন। আশ্রয়ের মূল্য তো চায় না ঠাকুর। জিজ্ঞেস করতে বলে, 'সে কি আবার একটা কথা হলো মশাই। আটকে পড়েছেন একটা রাত্রের জন্যে, তাই একটা ব্যবস্থা করা। ওর আর কিছু দিতে হবে না।'

ফোঁচা দাঁড়িয়েছিল সামনে। তাকে কিছু না দিলে মনটা খুঁত খুঁত করবে। কিন্তু দিতে যেতেই সে তার দম আটকানো সরু গলায় বলে ওঠে, 'না না, আমাকে আবার পয়সা দেন কেন।'

ভুলে যাই, এটা শহরের পান্থশালা নয়। যেখানে চাকর-বেয়ারারা পয়সা না পেলে কানে কম শোনে, চোখে কম দেখে। ফোঁচা এতে অভ্যস্ত নয়। সে রকম চল্ নেই এখানে। তবু দিতে চেয়েছি, সে নিলে সুখী হই। বলি, 'তাতে কী হয়েছে। আমি খুশি হবো।'

গাজী আওয়াজ দেয়, 'নেও গো ফোঁচাদা, বাবু দিচ্ছেন।'

ফোঁচা পয়সা নেয়। ভিতরের দরজার কাছে দেখি, তার বউ ছেলে-কাঁখে দাঁড়িয়ে আছে। তাকাতে সে নজর নামিয়ে নেয়! বোঝা যায়, সবাই দাঁড়িয়ে বিদায় দেয়। এমন কিছু ব্যাপার নয়। এক বেলা এক রাত্রি, তাও পান্থশালায়। তবু, এক মুহূর্তের একটু স্তব্ধতা। তার মধ্যেই যেন সকলের মনে একটা সুর বেজে যায়। অনেক যাত্রার অনেক পালা। দেখি, অনেক ভুলে যাই, অনেক ভুলতে পারি না। এখানকার না ভোলার পালা। তাই বোধ হয় একটু চুপ করে দাঁড়াতে হয়। না জানার অচিনে চলায়, এমন অনেক হয়। পা বাড়িয়ে বলি, 'চলি।'

নারায়ণ ঠাকুর বলে, 'এদিক পানে এলে আবার আসবেন।'

'আসব।'

গাজী বলে, 'চলি ঠাকুরমশায়।'

ঠাকুর একেবারে রামগরুড়ের ছানা। প্রায় খেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আবার আপনি উদয় হচ্ছেন কবে?'

এখন বুঝে দেখ, এ কি আপদ বিদায়, না আবার নিমন্ত্রণের কথার ফের। গাজী বলে, 'তা কি বলা যায় ঠাকুরমশায়। মুরশেদ যে কোন্‌দিন কম্‌নে নিয়ি যায়, বলতি পারি না। যেদিন তিনি আনবেন সেদিন আসব।'

নারায়ণ ঠোঁট উলটে ঘাড় বাঁকায়, 'খালি বাজে প্যাচাল পাড়ে।'

এতে প্রেম আছে কি না, কে জানে। হাটের ভিতর দিয়ে, ভেড়ি বাঁধের ওপর এসে দাঁড়াই। সাড়ে নটা বেজে গিয়েছে। দূরের এক বাঁকে নদী গিয়েছে হারিয়ে। সেদিকেই যেন কোথায় শব্দ বাজে গুর গুর করে। গাজী জানায়, লঞ্চ আসছে, তারই শব্দ বাজে। জোয়ার লেগেছে। সূর্যছটায় চলকানো জলে নৌকা পারাপার করছে। মালপত্র ওঠানামা চলছে গতকালের মতোই। নদীর মাঝখানে জলের চিহ্নগুলো দোলে।

মাছমারার কেউ জাল ফেলে, কেউ গোটায়। আকাশে কোথাও একটু মেঘ নেই। নদীর ধারে ধারে গেমো পাতায় রোদ চিকচিক করে। জোয়ারের জল অনেকখানি ভরে উঠেছে, তাই বোধ হয় পলির পোকা খাওয়া পাখিদের ঝাঁক দেখা যায় না। কিন্তু মাঠের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখ, বনচড়াইয়ের ঝাঁক সেখানে।

দূরের বাঁকে লঞ্চ দেখা দিলো। দেখতে দেখতে ঘাটে এসে ভেড়ে। বাঁধের ওপর পাটাতন এসে পড়ে। নামে না কেউ। ওঠবার যাত্রী দু'জন মাত্র। আমরা উঠে পড়ি। এক মিনিটও লাগে না যেন। আগেই চোখে পড়ে ছাদের ওপর প্রথম শ্রেণীর কামরায়। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। সেখানে কেউ নেই, একেবারে ফাঁকা। গোটা রাজত্বটা আমার।

সোজা ওপরে গিয়ে বসি। গাজী তেমনি বাইরে। বলে, 'বাবু বড় ভেবেছিলেন। দ্যাখেন, বুড়াবাবু আসেন নাই।'

তা আসেননি। একে বলে মন। তাদের না দেখে যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস এইমাত্র পড়েছিল, এই খোপের মধ্যে বসতে গিয়ে, তা হঠাৎ যেন কেমন একটু ঠেক খেয়ে যায়। একে বলে আশাভঙ্গ। কেননা, কেবলই গতকালের কথা মনে পড়ে যায়। খোপটা যেন ফাঁকা লাগে। বেমানান খোপটাকে যেমন দেখেছিলাম, তেমন যেন নেই। সেই যে একলষেঁড়ে মনটা, সে যে আসলে জনের সঙ্গ চায়, এটা অনেক সময় মনে থাকে না। তা ছাড়া 'চাই না, চাই না' কখন যেন 'চাই, চাই' হয়ে রয়েছে, টের পাওয়া যায়নি। ফাঁকা খোপে ঢুকে বসে টের পাওয়া গেল। তাই এক মুহূর্তের জন্যে, আমার জানালার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়া আরশি-আকাশের থইথই-এর মধ্যে একটু মনোভঙ্গের সুর বেজে যায়।

কিন্তু সে একটু সময়। তারপরেই দিগন্তের সেই অশেষে আমার টান লেগে যায়। শুনতে পাই, গাজী যেন কী গুনগুন করে। তার কথা আমার মনে পড়ে যায়। তার আর নয়নতারার কথা। মনে ভাবি, যে মনের মানুষ ভজবে বলে নয়নতারাকে বলেছিল, সেই অধর মানুষ ধরা হয়েছে কিনা। এখন আর কথা বলতে ইচ্ছা করে না। মনে মনে বলাবলি করি। কথাটা মনে পড়ে তার গুনগুনানির কথা শুনে। শুনতে পাই, বাতাসের গায়ে সুর মিলিয়ে সে বলে, 'অধরকে ধরব বলে, দড়ায় বাঁধা পড়েছি। এখন আপন ধরা, বেজায় কড়া, এমন মরা মরেছি।'...

পুরুষ-প্রকৃতির কার্যকারণের এসব ব্যাখ্যা জানি না। সাঁই দরবেশ ফকিরদেরও যে সাধনভজনের এসব রীতিকরণ আছে, জানা ছিল না। যতটুকু জানা ধারণা, সেটা তন্ত্রমন্ত্রের কথা। কিন্তু গাজীর কথায় সেই ইশারা পেয়েছি। সেই সুরেই বেজেছে মিয়া-বিবির ঘর-করা স্রোতের টানে চলা। সাধক চলে উজানে। ব্রহ্মচর্য চাই। বলে এই পথে-ফেরা, ধূলিঝাড়া আলখাল্লাওয়ালা গাজী।

সেই সব রীতিপদ্ধতির মহত্ত্ব কী, তাও আমার অজ্ঞাত। বোধ বুদ্ধির বাইরে। জানতে যে ইচ্ছা না হয় এমন নয়। গাজীর কাছে জানতে ইচ্ছা করে, তার আর নয়নতারার উজান চলার রীতি কেমন। তাদের সাধনরীতি ব্রহ্মচর্যে প্রেমের লেনাদেনা আছে কিনা। তার গানেতে তার কথা। 'যেজন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।' আমার চোখের সামনে ভাসে, বিদ্যাধরী নদীর কূলে বসে এক ডাগরা গাজী। পাশে ডাগরী যুবতী। সাধন-ভজন যাই থাক। আমি যে স্রোতের টানে চলা মানুষ। তাই সেই ফিকে জ্যোৎস্নায় চারি চক্ষে দেখি কেবল পঞ্চশরের তীর বেঁধাবেঁধির খেলা। জোয়ারের রোল তো বিদ্যাধরীর জলে নয় হে। কলকলিয়ে বাজে যেন দুই প্রাণের ধারায়।

সে আবার পাপ কি না জানি না। হতে পারে। তবে পাপের ঊর্ধ্বে মন চলে না যে। সেই পাপেতে যেন এক দিলখুশানো দিলদরদী দেখি। তাকেই আমার শুদ্ধ

মনে হয়। বিদ্যাধরীর কূলের কথায় এক নিপাট সহজ পবিত্রতা আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল।...

এমনি ভাবের ভাবনাতে ঘুম-কাড়ানো রাত্রির শোধ যেন নেমে আসে চোখে। ঘুম-ঘুম লাগে। যন্ত্রের গুড়্গুড়ানি, জলকাটানোর কলকলানো, আমেজ ধরা রোদে আর অল্প হিমেল বাতাসে কোথায় যেন তলিয়ে যাই। তার মধ্যেই ঘাটে ঘাটে লাগে নাও, যাত্রী নামে ওঠে, টের পাই। একটা ঘোরের মধ্যে কাটে।...

একসময়ে গাজীর গলায় ঘোষণা হয়, 'বাবু, হাসনাবাদ এসি গেল।'

ফেরার পালায় গাঙের অধ্যায় সাঙ্গ। সূর্য তখন মাথার ওপরে। হাতের ঘড়িতে দেখি, দুই কাঁটা মাঝখানে প্রায় একাকার। লঞ্চ ঘাটে ভিড়বার আগেই নামবার তাড়ায় সবাই ভিতরের খোল থেকে বেরিয়ে সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে। সারেঙ মশাই ধমক দেন, 'এই দেখ, সব সামনে আগলে দাঁড়ায়। আরে বাপু নামবেই তো।'

বলে জোরে জোরে ভেঁপু বাজিয়ে দেয়। তা বললে কি যাত্রী শোনে। তার তখন মনের তাড়ায় গায়ে ধাক্কা। কে যেন আবার বলে, 'বসিরহাটের আদালতে তো সে কথা শুনবে না গো। সেখানে যে ঘন্টা বেজি যায়।'

আদালতে ঘন্টা বেজে যায়। বিচারকের ডাক সেখানে। ত্বরায় চল, ত্বরায় চল। গাজী বলে, 'বাবু, ভিতরের লোকজন নামুক, তারপরে ধীরে-সুস্থে নামবেন।'

শিরোধার্য, ঠেলাঠেলি করে লাভ নেই। সম্ভবত, প্রথমেই যে মোটর-বাস বসির-হাটের দিকে যাবে, তাতে জায়গা পাওয়া কঠিন। আমারও তাড়া। কিন্তু সে আদালত আলাদা। তা বসিরহাটের আদালত নয়। তাই এইটুকু বিলাস, আলস্যে বসে দেখি যাত্রীদের ব্যস্ত হয়ে নামা। যখন নামার স্রোতে প্রায় ভাঁটা পড়ে আসে, সেই সময়ে... কী বেয়াজ দেখ, বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে যায় প্রায়! অবাক হয়ে গাজীর দিকে চাই। গাজী চায় আমার দিকে। তার ফাটা মুখে হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি হাসি, চুল দাড়ি পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

দেখি, খোলের ভিতর থেকে স্রোতের মুখে শেষ দিকে প্রথম বেরোয় ঝিনি, তারপরে গিন্নী, তারপর স্বয়ং ব্রহ্মনারায়ণ। টাকের কাছে যে কয়খানি চুল সিড়িঙ্গে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় ব্রহ্মনারায়ণের তর্জনীর মতো যেন শূন্যে বিঁধে আছে।

খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসি। ব্রহ্মনারায়ণ সপরিবারে তখন লঞ্চ থেকে সাঁকোয় পা দিয়েছেন। পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। পিছনে লোকের তাড়া। পিছন থেকেই মনে হয়, মাস্টারমশাইয়ের গায়ে ঘুম-ভাঙা বিরক্তি জড়ানো। গিন্নী তেমন গোছালো নন। ঝিনির সাজগোজের তেমন ঝলক ঝলকানো নয়। মায়ের চেয়ে বেশী গোছালো নয়। বরং একটু বেশী আগোছালো লাগে। কারণ, তার মাথায় ঘোমটা নেই। রুক্ষু চুলের গোছায় কোনোরকম বাঁধন-কষণ নেই। বোঝা যায়, সবাইকেই বিছানা ছেড়ে দৌড়তে হয়েছে। একটা কেবল অবাক লাগে, কালীনগরের ঘাটে কি এঁরা আমাদের দেখতে পাননি। নিচের দিকে ভিতরে আমার নজর যায়নি। আমার নজর কেড়ে রেখেছিল ওপরতলার খোপ।

সাঁকো পেরিয়ে ডাঙায় উঠে, প্রথম মুখ ফিরিয়ে চায় মেয়ে। জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, কোন্ বাসে উঠব?'

কথা শেষ করতে পারে না ঝিনি। ওর চুলের গোছায় ঢাকা পড়া এক চোখেতেই থমকানো বিস্ময়। আর এক চোখের চুল সরাতে ভুলে যায়। কোঁচকানো আঁচল কোথায় পড়ে আছে, সে খেয়াল নেই। এবার দেখে নাও, অলকে নেই কুসুম, চোখেতে নেই কাজল। ঠোঁট-রাঙানিয়া রঙ লাগেনি একটুও।

ব্রহ্মনারায়ণ তখন কথার জবাবে হাঁক দিয়েছেন, 'যেটাতে সবাই উঠছে, সেটাতেই

উঠে পড়।'

ততক্ষণে গাজী আওয়াজ দিয়েছে, 'আপনারা নিচির ঘরে ছিলেন বুঝি দিদিঠাকরুন।'

ব্রহ্মনারায়ণ ফিরে তাকান। সেই সঙ্গে গিন্নী। ব্রহ্মনারায়ণের নকল দাঁতে একবার ঢেউ খেলে যায়। ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে নিতে এক মুহূর্ত লাগে। তারপরেই ঠোঁট দু'খানি বিস্তৃত করে, করুণ চোখে আপাদমস্তক দেখে বলেন, 'বাঃ, চমৎকার।'...

'বাবুরা একটু রাস্তা ছাড়েন গো।'

গ্রামীণ জনেরা হাঁক পাড়ে পিছনে। আমি, গাজী, ব্রহ্মনারায়ণ তখনো সাঁকোয়। মা, মেয়ে ডাঙায়। ব্রহ্মনারায়ণ বাহবা দিয়ে সেই যে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন, তারপর পটুয়ার পটে আঁকা মূর্তি সবাই। কয়েক মুহূর্ত কারুর নড়াচড়া নেই। হাঁক পড়তে পট সচল। নড়ে-চড়ে সবাই ডাঙায় গিয়ে উঠি। তার মধ্যে ব্রহ্মনারায়ণের নির্দেশ শোনা যায়, 'ওরে ঝিনি, তোর মাকে দাঁড়াতে বল, এ বাসে আর যাওয়া চলবে না।'

ওদিকে বাসের ছোকরা সহিস ডেকে চলেছে, 'জল্দি জল্দি, আও আও আও।'

যাদের যাবার তাড়া, তারা ছোটে। ছুটতে ছুটতে হেঁকে বলে, 'দাঁড়ান গো, দাঁড়ান।'

আবেদনের পরে পরিবার-পরিজনকে ধমক, 'এইসো এইসো, চলো চলো, নইলি দাঁত ছরকুটি পড়ি থাকতি হবি নে।'

ওদিকে আবার একজন ব্রহ্মনারায়ণকে উপদেশ দেয়। খালি গা, কিষেণ না কি ঘাটের মজুর, গা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'এর পরের মটরে যান বাবু। মা ঠাকরুনদের নিয়ি আর এটায় উঠতি পারবেন না।'

ব্রহ্মনারায়ণ জিজ্ঞেস করেন, 'এর পরেরটা ছাড়বে কখন?'

জবাব দেয় পানবিড়ির দোকানওয়ালা, 'কুড়ি মিনিট পরে।'

ব্রহ্মনারায়ণের মন্তব্য, 'তার মানে আধ ঘন্টা।'

সেই সঙ্গে একটু স্বস্তির নিশ্বাসও শোনা যায়। ইতিমধ্যে মা-মেয়ে যত দেখেন আমার দিকে, তত নিজেদের মুখোমুখি চেয়ে টিপে টিপে হাসেন। তবু দেখ, মা মেয়ের থেকে সরস, সহজে বিরাজ। কিন্তু মেয়ের যেন ঠেক লেগে লেগে যায়। নাগরিকার একটু বিব্রত ভাব। নজর থাকলে বুঝবে, মজা পেয়ে হাসির মধ্যেও কোথায় একটু আড়ষ্টতা। মন গুনে যে ধন। মুখে যে রঙ বুলানো হয়নি, নোনা গাঙের বাতাস লেগে তেলতেলে হয়ে আছে, নাগরিকার তাইতে একটু ঠেক লেগেছে। ঠোঁট ছোপানো নেই, চোখে কাজল আঁকা নেই। আহ্ ছি ছি, দেখ ফুল ফুল ছাপা কাপাস কাপড়খানিও কেমন কোঁচকানো দোমড়ানো। আতেলা চুলে টান দিয়ে যে ঘাড়ের কাছে একটু বাঁধন দেবে, তারও সময় হয়নি। তাই চেয়ে চেয়ে দেখা, মায়ের সঙ্গে হাসি, তবু শাড়ি নিয়ে টানাটানি। সারা শরীর আর মন দিয়ে যেন নিজেকে তুষ্টি বিধানের চেষ্টা।

তবে কি না, আমাকে যদি বলো, এই পোড়া চোখে নির্ভেজাল ভালো দেখি। শ্যামেতে যে চিকন সোনা চিকচিক করে, তাই দেখি। রোদ মাখানো স্বর্ণলতা যেমন চিকচিক করে। তাতে পালিশের ঝিলিক হানে না স্নিগ্ধতা মনের মধ্যে পশে। কাল ছিল ঝিলিক, নজরে ঝলক-হানা। আজ না হেনেও পশে। আজ যেন দৃষ্টি জুড়ায়, সাড়া জাগে গভীরে। কাজলে যে চোখ আয়ত মনে হয়েছিল, আজ তার বর্ণনা মেলে ডাগরে গভীরে। রাত্রে বুঝি নিদ্রা সুখের হয়নি। তাই জাগরণের ছায়ায় এ চোখ স্বচ্ছ বেশী। আভাঁজ-কাপড়ে সহজ অনেক। হাতে দোলে সেই ব্যাগখানি।

ব্রহ্মনারায়ণ গিয়ে দাঁড়ান কন্যার পাশে। হাসেন, না বিদ্রূপ করেন, বুঝতে পারি না। ঠোঁট দুখানি টিপে, চোখ দুটি কুঁচকে, ঘাড় কাত করে একবার দৃষ্টি হানেন আমাদের দিকে। গাজী তো প্রায় অধোবদন। বিব্রত লজ্জায়, আমারও প্রায় সেই অবস্থা। কিছু বলবার আগে, কিছু শুনে নেওয়া ভালো। তাই চোখ তুলে চাই।

কিন্তু ব্রহ্মনারায়ণ আমাকে কিছু বলেন না। ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন দেখছিস রে ঝিনি।'

ঝিনির জবাব বাজে হাসিতে। যেন প্রেমজুরিতে ঝলক বাজা ঝংকারে। সেই ঝংকারে ঝংকার লাগে মায়ের গলাতে। এমন কি, ব্রহ্মনারায়ণও, দেখি, কন্যা-গিন্নীর সঙ্গে খিক্‌খিক্ করে হাসেন। গলাবন্ধ কোটের কাছে গলার চামড়া কাঁপে তাঁর। সেই যে সিড়িঙ্গে চুলের দু'-এক গাছি বকফুলের মতো বাঁকা হয়ে ছিল, তাও বাতাসের চেয়ে হাসিতেই কাঁপে যেন। আর আমি একবার ঝটিতি তাকাই গাজীর দিকে। গাজী আমার দিকে। গলা নামিয়ে বলে, 'বড় মজার বাবু।'

তা তো বোঝাই যাচ্ছে। প্রায় এক মজাখোর ছেলের মতো মাস্টারমশাইয়ের ব্যবহার। হাসতে হাসতেই বলে ওঠেন, 'খুব দেখালে বাবা!'

বলেও হাসির দ্বিগুণ বেগ। কন্যা-গিন্নীরও সেই অবস্থা। তার মধ্যেই তবু গিন্নী আওয়াজ দেন, 'আহা, তা বলে ও রকম করছ কেন?'

কন্যা আমার দিকে চেয়ে বাবাকে বলে, 'ব্যাপারটা শোনো না, উনি কী বলছেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'তার আগে একবার দেখ, গরীবের কথা বাসী হলে কেমন কাজে লাগে। তখন পই পই করে বললুম। কে কার কথা শোনে। এখন হলো তো।'

আমার জবাবের আগেই ঝিনি বলে ওঠে, 'সত্যি, বাবার কথা যে ফলিয়ে ছাড়লেন আপনি।'

জবাব দেবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি মুখ খুলি, 'না, মানে—।'

'থামো হে, কথা বললেই হলো!' মাস্টারমশাই আগেই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'না, মানে বলে কিছু কথা নেই। আমার কথা ফলেছে কি না।'

তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে বলি, 'হ্যাঁ, ফলেছে।'

এমন হার-মানা অসহায়ের অবস্থা দেখে মা-মেয়ে ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠেন আবার। গিন্নী বলেন, 'তোর বাবা যেন এক তরো।'

ব্রহ্মনারায়ণ হাত তুলে বলেন, 'আচ্ছা এবার চলো, ফাঁকা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসা যাক, তারপরে তোমার বৃত্তান্ত শুনব।'

তারপরেও আবার বৃত্তান্ত শোনা! তবু রক্ষে। কিন্তু তাই কি তিনি যেতে পারেন। আমি পা বাড়াতেই গাজীকে তাঁর চোখে পড়ে। এতক্ষণ যেন মনেই ছিল না। যেমনি চোখ পড়া, অমনি ঠেক খাওয়া দাঁতের গোটা পাটিতে ঢেউ দিয়ে বললেন, 'এই যে বাবা, ফকির না দরবেশ, কোন্ মুণ্ডু।'

গাজী একেবারে, মুখের আর দাড়ির ভাঁজে, মায় চুলে আলখাল্লায়, হাসিতে বিগলিত। অথচ বলিহারি সাহস, তখনো ব্রহ্মনারায়ণকে শুধরে দিয়ে বলে, 'আঁজ্ঞে বাবু, গাজী।'

'যা খুশি তাই হও গে তুমি, আমার কাঁচকলা।'

গাজীও তাড়াতাড়ি ঘাড় কাত করে বলে, 'তা ঠিক বাবু।'

কী রকম পাজী দেখ, রা বুঝে সাড়া দেয়। এখন মজার বাবুর মেজাজ দেখে, কাঁচকলাই সই। ব্রহ্মনারায়ণের সেদিকে কান নেই। প্রায় রুক্ষু বিরক্তিতে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'তা বাবা, তখন যে খুব বললে, কোথায় কোন্ গ্যাঁজাট না ফ্যাজাট থেকে মোটরবাসে ফিরবে—।'

গাজী আবার তাড়াতাড়ি শুদ্ধি দেয়, 'আজ্ঞে, গ্যাজাট না, ন্যাজাট।'

'আরে রাখো তোমার ন্যাজাট। ওসব নাম ভদ্দরলোকে বলতে পারে না, তোমরাই পারো।'

ব্রহ্মনারায়ণের ধমক খেয়ে গাজী ঝটিতি বলে, 'তা ঠিক বাবু।'

না বলে উপায় আছে! তর্ক করো দেখি, কত সাহস। ব্রহ্মনারায়ণ যেন একেবারে অব্যর্থ তীর বেঁধেন, 'তা সে মোটরবাস গেল কোথায় তোমার?'

গাজী তাড়াতাড়ি কপালে আঙুল ঠেকিয়ে বলে, 'নসীবের দোষ বাবু।'

'নসীবের দোষ?'

দেখি, নসীবের নাম করে ব্রহ্মনারায়ণ ডিঙনো যাবে না। আমি বলি, 'সেটা ওর ঠিক দোষ না।'

ব্রহ্মনারায়ণ আমার দিকে ফেরেন, 'ঠিক কার দোষ?'

তাঁর ভঙ্গি দেখে হাসি সামলানো দায়। কিন্তু সে সাহস আমার নেই। বলি, 'দোষ ঠিক কারুরই নয়, বলা যায়। পথঘাট খারাপ বলে গাড়ি চলাচল অনিয়মিত হচ্ছে। কাল বিকেলের পর থেকে আর গাড়িই ছাড়েনি।'

তাতেই কি মাস্টারমশাই ছাড়েন। বলেন, 'না জেনেশুনে তা হলে ও নিয়ে গেছে কেন?'

গাজী, দেখি, ফাটা মুখে হাসি ছড়িয়ে দু' হাত দুই কানে রাখে। বলে, 'সেইটা আমার গোস্তাকি বাবু।'

'রাখো তোমার গোস্তাকি আর ফোস্তাকি।' বলে এগিয়ে যান গাড়ির দিকে। গাজী মুখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু তার দাড়ির ভাঁজে চোরা হাসি আমার চোখে ফাঁকি যায় না। হেসে আমি দৃষ্টি ফেরাতেই চোখাচোখি ঝিনির সঙ্গে। তখন ওর অসাজের আড়ষ্টতা নেই আর। সহজের ঝলক লেগেছে। যে হাসিটা আমার আর গাজীর ভিতর ছলছলিয়ে যায়, ওর চোখেও সেই হাসিরই ঝিলিক হানে যেন। চকিতে একবার বাবার দিকে দেখে আবার চোখ ফিরিয়ে চায়। তখন বাবার ওপর ওর ভালোবাসার হাসিটা চিকচিকে বিম্বোষ্ঠের ফাঁকে সাদা দাঁতে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে।

কিন্তু গিন্নীর প্রেম ঝরানো নজরে স্বামীর প্রতি ভ্রূকুটি। নাক কুঁচকে কন্যাকে বলেন, 'কী যে বক্‌বক্‌ করে। ভালো লাগে না ছাই।'

বলে ঝামটা দিয়ে মুখ ফেরাতে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেন। উনি কী বলবেন, বলো তা বাপু। স্বামী ওঁর ওইরকম। দেখ না, আবার গাড়িতে উঠতে উঠতে হাঁকছেন, 'এস এস, এ গাড়িতে এস।' যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা গাড়ি, এখনো অনেক সময়। তা বললে কী হবে। উনি কি একলা বসে থাকবেন নাকি।

সবাই একে একে গাড়িতে উঠি। বসার নির্দেশ দেন চক্রবর্তী। কন্যা-গিন্নীকে দেখিয়ে দেন জায়গা। আমি এগিয়ে গিয়ে, গাজীকে নিয়ে বসতে যাই, তাড়াতাড়ি ডেকে বলেন, 'তুমি এখানটায় এস, আমার এই পাশে।'

যে পাশেতে আর তৃতীয়ের ঠাঁই নেই। দুজনেতেই পূর্ণ। গাজীর জন্যে মনটা একটু বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু নয়নতারা-ভুলানো গাজী আগেই বলে, 'বসেন বাবু, আপনি ওখেনিই বসেন। আমি ঠিক আছি।'

সে পিছনের দিকে বসে। মা-মেয়ে আমাদের সামনে। ঝিনি কাত হয়ে মুখ ফিরিয়ে চায়। তাতে মুখোমুখি হওয়া দুষ্কর। পাশ ফিরে দেখাদেখি করা যায়। বারে বারে ঝিনি বলি। মনে মনে বলি, তাই বলা যায়। আসলে এ বিদুষী অলকা চক্রবর্তী, তা ভুলিনি। সে কী ভেবেছে, জানি না। চোখের দিকে চেয়ে বলে, 'গাজীকে অত দূরে রাখলেন কেন, কাছের সীটে এসে বসতে বলুন না।'

আমি জবাব দেবার আগেই ব্রহ্মনারায়ণ বলে ওঠেন, ‘ওই তোদের এক দোষ। সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কেন, ও কি ছেলেমানুষ যে, হারিয়ে যাবে।’

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, গাজীর নজর এদিকে নয়। তবে বলা যায় না, কান হয়তো এদিকে। মনে মনে হাসে হয়তো।

ঝিনি বলে, ‘তুমি যেন কী বাবা। ও—ও তো সঙ্গেরই লোক।’

আমি তাড়াতাড়ি বলি, ‘থাক না, ওখানেই ও বেশ আছে।’

ব্রহ্মনারায়ণ একটু স্থির হন। ঝিনি একটু হাসে। কিন্তু বাবার দিকে একটু অভিমানে দৃষ্টি হানে। আমি বলি, ‘আপনারা যে নিচেয় ছিলেন, বুঝতেই পারিনি।’

এ যে আর এক নিস্তরঙ্গে ঢেউ জাগানো, তা বুঝতে পারিনি। ব্রহ্মনারায়ণ তাঁর লম্বা রেখাবহুল আঙুল তুলে মা-মেয়েকে দেখিয়ে বলেন, ‘এই যে, এদের বলো, ওপরে বসলে নাকি এরা ঠাণ্ডায় জমে যেতো।’

মা-মেয়েতে মুখোমুখি হাসাহাসি। গিন্নীর উক্তি, ‘দেখছিস্, সব কথাতেই বেশী বেশী। সেই অন্ধকার থাকতে বেরিয়েছি। তখন কী রকম ঠাণ্ডা! তা ছাড়া ওপরে আলোও ছিল না। ভূতের মতো বসে থাকব কেন শুধু শুধু?’

ব্রহ্মনারায়ণ তৎক্ষণাৎ হাঁকেন, ‘তোমরা হাড়কাঁপানো শীতের কথা বলনি?’

এবার গিন্নীর পাল্টা অভিযোগ, ‘তুমিও তো তখন মাথায় ফেট্টি বেঁধেছিলে। সেটা বুঝি গরমে?’

ব্রহ্মনারায়ণ অবাক আর অসহায়। যেন কী বলবেন, ভেবে পান না। সেই ফাঁকেতেই ঝিনি বলে, ‘কিন্তু আমি তো তোমাকে একবারও ঠাণ্ডার কথা বলিনি বাবা।’

‘না, তুই বলিস্‌নি।’

বলে এক মুহূর্ত চিন্তা করে ভুরু তুলে বলেন, ‘তুই যেন আবার কী বললি তখন?...হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুই বললি, “আসবার সময় ছাদে বসে এসেছি, যাবার সময় নিচে বসে যাবো। লোকজনের সঙ্গে বেশ নতুন রকম লাগবে।” বোঝো, লোকজনের সঙ্গে আবার নতুন রকম কী লাগবে রে বাপু। তা নয়, আসলে তোরও তোর মায়ের মতো শীত ধরেছিল।’

বিদুষী অলকা এবার ছোট মেয়েটির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে প্রায় ভেংচি দিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ, ধরেছিল, তোমাকে বলেছে!’

বলেই নতুন পরিচিতের দিকে চেয়ে লজ্জা পেয়ে যায়। স্বর্ণলতার চিকন রঙে যেন অস্তছটার লাল লেগে যায়। মুখ ফেরাতে গিয়ে চুলের গোছায় আড়াল পড়ে।

মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কর্তাকেই আসলে ঝাঁজেন, ‘তুই চুপ করে থাক না।’

ব্রহ্মনারায়ণের খোঁচা ভুরুতে তখন যেন হাসির ঝিলিক দেখা যায়। মা-মেয়েকে রাগিয়ে দিয়ে একাধারে বাবা এবং স্বামীটি যেন বেজায় মজা পান। ইনিও, দেখছি, গাজীর থেকে কম যান না। ছদ্মবেশটা আরো শক্ত, এই যা। আমাকে বলেন, ‘আহা হা, তা নইলে দেখ, কালীনগরের ঘাটেও এত মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছিল যে, তোমাকে দেখতেই পায়নি।’

‘তুমি বুঝি দেখতে পেয়েছিলে?’

গিন্নীর তীরবিদ্ধ ঝংকার বাজে। কর্তা নির্বিকার স্বরে বলেন, ‘আমাকে তো তোমরা শুইয়ে রেখেছিলে। শুলে কি কিছু দেখা যায়?’

গিন্নী এবার সত্যিই বিরক্ত। তীব্র বিদ্রূপে বলে উঠলেন, ‘তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম!’

অসম্ভব! হাসি সামলানো দায় হয়ে ওঠে। শুধু দায় নয়, উপছে পড়া চলে,

হাসির শব্দকে আটকে রাখা গেল না। এদিকে দেখ, হালকা এক নাম-না-জানা গন্ধ ছড়ানো, রুক্ষ চুলের গোছাতে কাঁপন ধরেছে। সেই কাঁপনে, চুলের গোছা সরে গিয়ে, চিকন শ্যাম গ্রীবা জেগে ওঠে। যার মাঝখান থেকে, শিরদাঁড়া সমান একটি রেখা নেমে গিয়েছে, হাল্‌কা রঙ জামার ভিতরে। হাসিটা ঝিনিকেও সংক্রমিত করেছে। রাগ নয়, হাসি তখন ছড়িয়ে কাঁপে তার সারা শরীরে। মাথাটা নুয়ে পড়ে গিয়ে জানালার কাছে।

ব্রহ্মনারায়ণের মুখে একটি অনির্বচনীয় শিশুর হাসি দেখা যায়। দাঁতের পাটি দুলে ওঠে একটু। বলেন, 'দেখছিস ঝিনি, তোর মা কী রকম রেগে যায়।'

হাসির বেগে ঝিনির মুখ তোলা হয় না। মাও মুখ ফেরান না। ব্রহ্মনারায়ণ আমার দিকে তাকান। তাতে আমার হাসি আরো আকুল হয়ে ওঠে। ওদিকে হাসির বেগ তখন, ঝিনির শ্যাম চিকন গ্রীবায় পর্যন্ত লাল ছড়িয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে নতুন যাত্রীরা উঠতে শুরু করেছে। সহিসের চিৎকার শুরু হয়েছে। গাজীর কথাবার্তা আলাপ চলেছে চেনা মানুষদের সঙ্গে।

ঝিনির হাসি একটু প্রশমিত হলে শোনা যায়, 'তুমিই যে মাকে রাগিয়ে দাও। আমরা তো মুড়ি দিয়ে বসিনি, উল্টো দিকে ফিরে বসেছিলাম, সেজন্যে ওঁকে দেখতে পাইনি।'

প্রশ্নটা যে আমার মনে জাগেনি, এমন নয়। কিন্তু তার জন্যে এত বচনবাচন যুক্তি তর্ক মাথায় আসেনি। আসলে, যার প্রত্যাশা ছিল না, তাকে কে লক্ষ্য করে!

ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'তা বলে ওই রকম বলবে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল!'

জবাব না দিয়ে ঝিনি ঘাড় ফিরিয়ে চায়। তখনো হাসির ছটার রক্ত তার মুখে। চোখে হানা ঝিলিক। ওদিকে প্রৌঢ়ার ঝাঁজ তখনো যায়নি। আওয়াজ দেন, 'বেশ করেছি।'

ঝিনি বাবার দিকে চায়। বাবা মায়ের দিকে চেয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে হঠাৎ হাত ঘুরিয়ে বলেন, 'করো গে যাও।'

তবু হায়, মাস্টারমশায়ের হার-মানা হার চাপা থাকে না। আমার দিকে ফিরে বলেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথা বলো! কাল কোথায় থাকলে, কী করলে, শুনি।'

ঝিনিও তার মায়ের দিকে ফিরে পাশ নিয়ে বসে। আমি মহামায়া হিন্দু হোটেলের কথা বলি। গঞ্জের কথা বলি। নারায়ণঠাকুরের আতিথেয়তার কথা বলি। জানি, মাহাতো-আঙুরি বা দুলি-অনন্তদের বিষয় এখানে বলবার নয়।

সব শুনে ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'বলে তো গেলে দিব্যি, তোমার কি প্রাণের ভয় হলো না?'

গতকালের কোথায় কিসে প্রাণের আশঙ্কা ছিল, বুঝতে পারি না। তাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। বলি, 'কই, সে রকম কিছু—।'

ব্রহ্মনারায়ণ বাধা দিয়ে বলেন, 'তুমি কি আর দেখতে শুনতে পাবে। এই বাদা অঞ্চলের কথা যদি জানতে, তা হলে আর ও রকম গরম গরম খেয়ে দরজাটি হাট করে খুলে তোমার ওই পেয়ারের গাজীকে শিয়রে নিয়ে শুতে পারতে না।'

'কেন বলুন তো।'

'কেন বলুন তো?' প্রায় ধমকে বলেন তিনি, 'পকেটে কত টাকা ছিল?'

'সামান্যই।'

কথাটা যেন ঠিক মনঃপূত হলো না। বলেন, 'তা সে যত সামান্যই হোক। হাতের ঘড়িটা তো ছিল। আঙুলে একটা আঙটিও দেখছি। যেখানে পাঁচ টাকার জন্যে মানুষ খুন করে, সেখানে তো রাজৈশ্বর্য হে।'

এতটা অবিশ্যি জানা ছিল না। সে রকম কিছু মনেও হয়নি। ব্রহ্মনারায়ণ বলেন,

'জানো, এসব জায়গায় চুরি ডাকাতি লেগেই আছে। নদীর ধারে তো আরো খারাপ। যত নৌকা, তত ডাকাত। যেখানে জলে নামলে কামট-কুমীর, ডাঙায় বাঘ, ঘরে ডাকাত পড়ে, সেখানে তুমি কোন্ সাহসে রইলে?'

তা হলে তো আর এসব অঞ্চলে ঘরগৃহস্থের ঠাঁই নেই। কিন্তু সে কথা বলবার উপায় আছে বলে মনে হয় না। ব্রহ্মনারায়ণ যে রকম মুখ করে বলছেন। তারপরে তিনি আসল কথাটা বলেন, 'তার ওপরে তোমার ওই যে গাজী, সে-ই একটা ডাকাত-টাকাত কি না, তুমি তার কী জানো। যদি রাত্রে গলাটি কেটে রেখে যেতো, তখন কে সামলাতো।'

ভাগ্যিস গাজী কাছে নেই। গাড়িটাও ছেড়ে দিয়েছে। যন্ত্রের গর্জনে কথা শোনা যায় না। তবে তাকে ঘিরে যারা বসেছে, তাদের তখন সে গান শোনায় শুনতে পাই, 'মনে বলো হরি হরি, করে গোনো কড়ি কড়ি, মরি মরি, ভবেতে কী খেলা হরি।'...

ব্রহ্মনারায়ণের কথা শুনে হঠাৎ যেন খচ্ খচ্ করে লাগে কোথায়। একটা ব্যথা লেগে যায়। আমি তার ফাটা ফাটা মুখখানি দেখি। দেখি, তার আরশি-চোখে প্রাণের তলায় সেই মুখখানিই ঝিকিমিকি করে। নয়নতারার সাঁইবাবা এই মানুষ অধর মানুষ খোঁজে । যে বিচিত্রের সামনে আমার হাত উঠে যায় নমস্কারে, মন করে না সন্ধান, কিন্তু মন ভরে যায় অচিন ঝরায়, সেইখানে বলি আমি, 'না, বিশ্বাস করব না। অন্যায়ের অনেক তাপ আমার নিশ্বাসে। তবু এমন পাপ করব না। আমি তাকে অবিশ্বাস করব না।'

কিন্তু সে কথা ব্রহ্মনারায়ণকে বলায় বেয়াজ। কী দৌলত বা লাভ তাতে। তাঁকে দোষ দেবো না। সবাই যদি এক বর্গে চলে, তবে আর সংসারে রকমফেরের চালচিত্র থাকে কোথায়। তিনি তাঁর মতোই চলেন বলেন।

আমি চোখ তুলি। ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়। কখন যেন ছায়া পড়েছে আমার মুখে। তবু একটু না হেসে পারি না। বুঝতে পারি, তবু ছায়া সরানো গেল না। ঝিনির চোখে কথা ফোটে। যে কথাতে জিজ্ঞাসা। রঙ না দেওয়া সরু ভুরুতে একটু বাতাস লাগা লতার দোলন। তারপরে বাবার দিকে ফিরে বলে, 'গাজীকে উনি ভালোই চেনেন বাবা, তাই বিশ্বাস করেছেন।'

ভেবেছিলাম, ব্রহ্মনারায়ণ তাঁর স্বভাবস্বরে হাঁক দেবেন। কিন্তু এ ব্রহ্ম সে ব্রহ্ম নন। হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে যান একটু। বলেন, 'তা ঠিক। আমি একটা কথার কথা বলছি। ও যে বিশ্বাসী, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু সারা জীবন ধরে দেখলাম তো, সব ছেলেরাই এক রকম কথা বলে।'

তিনি একটু থামলেন। কথাটার খেই ধরবার আগে তিনি আবার বলে উঠলেন, 'তোকেও দেখি ঝিনি, এই পড়ে পড়ে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের মতো কথা বলিস তুই। এসব বলতে গেলেই বীরুর কথা আমার মনে পড়ে যায়।'

হঠাৎ দেখি, ঝিনির চোখে একটা বিস্ময়ের ঝিলিক খেলে যায়। তারপরেই যেন ছপ্‌টি খাওয়া আঘাত, ঠোঁট কেঁপে যায়। স্বর্ণলতা বর্ণে লাগে কালি। চকিতে একবার আমার দিকে দেখে বাবাকে বলে, 'ও কথা থাক না বাবা।'

গিন্নীও একবার স্বামীর দিকে ফেরেন। তারপরে সেই যে মুখ ঘোরান, আর ফেরান না। কেবল বুঝতে পারি, মাথাটা তাঁর নীচু হয়ে পড়ে। আর আমি যেন অনুভূতির এক দেশ থেকে দেশান্তরে যাই। সেখানে অন্য সুর, ভিন্ন কথা।

ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'থাকবে বইকি। তা নয়, দেখ একদিন বীরুও তো হেনরিকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে গিয়েছিল। কত বড় বিশ্বাসী বন্ধু ছিল হেনরি, তবু সেই যে গেল, আর ফিরল না।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই দেখি, ঝিনির চোখের কোণে শিশিরের ফোঁটার মতো দু'টি বিন্দু চিকচিকিয়ে ওঠে। সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেউ আর কোনো কথা বলে না। যন্ত্রের শব্দ বাজে। যাত্রীদের নানান্ কথাবার্তা। তার মাঝে গাজীর গলা বেজেই চলেছে, 'যখন দিন ছিল, তখন ধাঁধায় ছিলাম, এখন আন্ধারে গেরাসে, বলো কী করি।'...আমার চোখের সামনে রোদ মাখানো মাঠ ভেসে যায়। বাতাসে মাথা দোলানো নারকেল সুপারির ছায়া ছুঁয়ে যায়। তবু অনুভূতির দেশান্তরে অন্ধকার আমার চোখে। বীরু কে, হেনরি কে, কে এল না ফিরে, কেন বা।

একটু পরে গলাখাঁকারি দিয়ে ব্রহ্মনারায়ণই আমাকে বলেন, 'বীরু ছিল আমার ছেলে। এঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছিল, বাইরে-টাইরেও ঘুরে এসেছিল। ওর এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধু ছিল, নাম হেনরি-হেনরি কি যেন ঝিনি?'

ঝিনির জবাব আসে, 'ওয়াইলডেভ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হেনরি ওয়াইলডেভ। দু'জনে এক জায়গাতেই চাকরি করত। হেনরিকে ছাপিয়ে বীরুর একটা লিফ্‌টের সুযোগ আসে। হেনরির সেটা সয়নি। ডেকে নিয়ে গিয়ে বীরুকে মেরে ফেলেছিল। এই বছর পাঁচেক আগে।।'

চাবুক খাওয়া চমকটা আগেই লেগেছিল আমার মুখে। আমি যেন ভিন্ন পরি-বেশে চলে যাই। আমার পথে ফেরা অচিন খোঁজা হারিয়ে যায় যেন। বলে উঠি, 'তারপর?'

ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'তারপরে আর কিছু না, হেনরি ধরাও পড়েছে, জেল খাটছে। তা তাতে আর কী সান্ত্বনা বলো। মানুষের যেমন মন।'...

কে জানত, এই মানুষে সেই মানুষ আছে। এমন হেঁকো-ডেকো হাসানে লোকটা যে নিহত আত্মজের ঘা নিয়ে বেড়াচ্ছে, একবারও তা বোঝা যায়নি। তাও শোনো, এত বড় একটা বুকের ধস খসানো কথা বলেন, তাও কেমন অনায়াসে। কেমন স্থির গলায়।

বোধ হয় অনেক বড় ধস নামানো বলেই। এ সেই ধস নেমে যাবার পরে পাহাড়ের স্তব্ধতা। এ সেই, একেতে সব ভরা বলেই এমন নিস্তরঙ্গ স্থির গলা।

এবার বলো, কী বলবে।

বলব, তবু গাজীকে বিশ্বাস করব। বলব, তবু এই নিহত আত্মজের পিতার সংশয়কে যেন হীনতায় না দেখি। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখন আমি তাঁকে আরো বেশী চিনি। দেখছি, পথের যা কিছু পাওয়া সব কিছুতেই এক অরূপরতন আছে।

সেই এক অরূপরতন, চোখেতে তার রূপ দেখি না। তবু দেখি, কোথায় যেন এক রূপের ঝোরা ঝরে যায়। রতন বলে ঝিলিক হানা বস্তু নিয়ে ঠুঙ-ঠুঙ বাজিয়ে ঝোলায় ভরি না। তবু আমার ঝোলা ভরে যায়। কেবল ইচ্ছা করে, প্রৌঢ়কে একটু স্পর্শ করি। একবার তাঁর হাত ধরি। নয়তো হাত রাখি তাঁর বুকে।

তাও পারি না। তোমার ছোঁয়ায় কার শূন্যতা ভরে হে। আপন খাঁচা খোঁজ করো গিয়ে। যার শোক, তার কান্না। প্রবোধ, সান্তনা-ভরা ভবন যার-যার নিজের মনে। গাজীর কথায়, সেই যে 'মজার মানুষ', তা তোমার বানানো নয়। হাসানে দুষ্ট মাস্টারমশাই, সেও তাঁর নিজের মনেই। এই যে নিহত আত্মজের কথা বলেন আকাঁপা গলায়, তাও তাঁর নিজের স্বর, নিজের কথা।

তার চেয়ে যা পেলে অরূপরতন বলে, তাই নিয়ে যাও আয়ের ধনে। অরূপরতনের একটা নাম দিতে চাও; দাও—মানুষ। অরূপরতনের আরো অনেক নাম। তার আর এক নাম বলো, প্রাণ। বলো, মন।

তবু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি না। স্তব্ধতার মধ্যে ঘটনার ভয়ংকরতা যেন

নতুন করে হানে। ধস নেমে যাওয়া স্তব্ধতায় যেমন ক্রমে ক্রমে চেতন আসে, কোথায় কতখানি সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কত ঘর বস্তি মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মনে মনে একবার অনায়াসে বলা বৃত্তান্ত নিজের মনে সাজিয়ে ভাবি। 'বিদেশ-টিদেশ ঘোরা' বলতে বিলাত-ফেরত বুঝি। বিলাত-ফেরত এঞ্জিনিয়ার ছেলেকে তার বন্ধু ডেকে নিয়ে খুন করেছে। ভাবতে গিয়ে ভিতরটা আরো অন্ধকারে ভরে যায়। ছিদ্রহীন ঘেরাটোপে যেন আটকা পড়ে থাকি। তাকিয়ে দেখি, তিনজনের তিন দিকে মুখ। বাপ মা মেয়ে, একটি গোটা পরিবার। তাদের মাঝখানে, বীরু নামে এক স্মৃতি না জানি কী রূপেতে ভাসে। কী দোলাতে দোলে!

দেখি, ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী চোয়াল নাড়ান। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন দূরে। যে দূরেতে রোদ মাখানো সবুজ অথই হয়ে আছে। সবুজে যে তাঁর এত মনোযোগ আগে দেখিনি। মায়ের মুখ ফেরানো, নিচু। মেয়ের মুখ জানালার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে।

আমি শ্রোতা। কথা শুনেছি, ঘটনা জেনেছি। তারপরে একেবারে আওয়াজ দেবো না, তা হয় না। একটু পরে বলি, 'পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয় দেখছি।'

ব্রহ্মনারায়ণ চোখ ফিরিয়ে তাকান না। বাইরের দিকে চোখ রেখেই একটু মাথা নাড়েন কেবল। অস্পষ্ট শব্দ করেন, 'ঠিক।'

গাড়ির দরজার কাছে সহিস ছোকরার চিৎকার বাজে। পথের মানুষকে ডেকে কথা বলে। ওদিকে গাজী যেন কী গান করে। শুনে দশজনে দশ রকমের হাসি হাসে, বাত দেয়। কনডাকটর ঘণ্টা বাজায়, পয়সা নিয়ে টিকেট দেয়। গাড়ি তার আওয়াজ তুলে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যায়। এই কলরবের মাঝখানে আমাকে ঘিরে যেন এক সিন্ধুর মৌনতা।

এখন ফেরার পথে সেই একই ছবি। ঝোপে গাছে পুচ্ছ-দোলানো পাখি, যাদের ডাক শুনতে পাই না। আকাশ-জোড়া সেতারে যেন তার বাঁধা, টেলিগ্রাফের তার দেখে তাই মনে হয়। ল্যাজ-ঝোলা ফিঙে সেখানে দোদুল দোলে। পুকুরঘাটে বউ চান করে, বউ জল নিয়ে যায় কলসী কাঁখে, বউ ঘোমটা সরিয়ে বারেক দেখে হাওয়ার গাড়ি চলে যাওয়া।

একটু পরে আস্তে আস্তে ঝিনি মুখ ফিরিয়ে চায়। মুখ ঢেকে পড়া রুক্ষ চুলের গোছা সরিয়ে নেয়। কাজলহীন চোখের জল মুছে নিয়েছে। মোছা যায়নি জল চোঁয়ানো আরক্ত ছাপ। তবু একটু হাসতে চায়। তাতে অন্ধকার সরে বিষাদের ভার যায় না।

নিজের থেকে বীরু প্রসঙ্গ আর তুলতে পারি না। অথচ এই মানুষের মন, তার কৌতূহল ঘোচে না। বরং অন্য কথা জিজ্ঞেস করি, 'আপনারা ক' ভাই-বোন?'

ঝিনি বলে, 'ছিলাম দুই, এখন এক।'

বলেও আবার সেই হাসির চেষ্টা। যেন একটা ভার সরাবার চেষ্টা। যেন ছায়া নড়াবার ঝলকে টান। সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'কিন্তু জানেন, হেনরির ওপর আমাদের কারুর রাগ নেই। এখন ওর জন্যে আমাদের কষ্ট হয়।'

অবাক হয়ে তাকাই ঝিনির চোখে। এ আবার কেমন কথা! অহিংসা উদারতা থাকবে মানি। তা বলে ভ্রাতৃহন্তাকে ক্ষমা কিসের। রাগ না থাকতে পারে, কষ্ট কেন। ব্রহ্মনারায়ণের মুখের দিকেও চোখ ফিরিয়ে আনি একবার। প্রৌঢ় যেন কোথায়, এখানে তিনি নেই। ঝিনিকে বলি, ওর বাবার কথার খেই ধরে, 'তাতে সান্ত্বনা কোথায়!'

ঝিনি বলে, সান্ত্বনা কিছু নেই, কারণ দাদাকে ফিরে পাবো না আর। কিন্তু

ভুলকে ভুলই বলতে হবে।'

'কার ভুল?'

'হেনরির'

কথাটা যেন উদারতায় বাজে। যেন একটু চড়া সুরে ঝনঝনায়, কানে লাগে। ভালো লাগে না। ভাই হারানোর সান্ত্বনা নেই। খুনীর ভুলের বিচার কেন। জিজ্ঞেস না করে পারি না, 'কার বিচারে?'

ঝিনি বলে, 'হেনরির নিজের বিচারে।'

একটু ঠেক খেয়ে যাই, তুরন্ত কিছু বলতে পারি না। ঝিনির চোখের দিকে দেখি। দেখি, সেখানে পিছনের দূর-দূরান্তের অচিন আলো-ছায়া। বলে, 'হেনরি কোনো রকম মামলা লড়েনি, নিজেকে বাঁচাতে চায়নি। প্রথম থেকে শেষ অবধি ও অভিযোগ স্বীকার করেছে। যেদিন ওর রায় বেরিয়েছিল, সেদিন ওর মা আর বোন এসেছিল কোর্টে। কিন্তু সকলের আগে, হেনরি বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাঙলাটা ভালোই বলতে পারত। বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "কাকাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন।"

দেখি, ঝিনির চোখের কোলে আবার জল উপচায়। এবার আর কথা যোগায় না আমার। শুধু শোনা আর অবাক হওয়া। কেবল কোথায় একটা মোচড় খেয়ে নিজেকে শক্ত করে, চোখ নিচু করা। এখন দেখ, নাগরিকার চোখের জলের লাজ কেটে গিয়েছে। মুখ না ফিরিয়ে অসঙ্কোচে চোখ মোছে। তান যখন জমে, সুর তখন আপনি খেলে। আবার বলে, 'আসলে হেনরি আমাদের বাড়ির ছেলের মতো ছিল। দাদার মতোই আমাকে তুই-তোকারি করত। একসঙ্গে বসে খেত। কী বলত জানেন? ও বলত, "ওই অ্যাংলো শব্দটা বাদ, ওটার হাত থেকে এবার আমাকে রেহাই দে। আমি ইন্ডিয়ান।" অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বললে খুব চটে যেত, মনে মনে অপমান বোধ করত।'

অদেখা হেনরি সম্পর্কে এবার নতুন চেতনা জাগে। ফিরিঙ্গী ভারতীয় বলে যাদের জানি, তাদের সঙ্গে হেনরি যেন একটু অমিলে বিরাজ করে। তাদের ভারত-চিন্তা জানি না, ভারতীয় বলে ডাক দিয়ে ওঠার স্বরে তেমন জোর শুনিনি। বিব্রত সংশয়ের অস্পর্শতা দেখেছি। তাই বলি, 'এ রকম সাধারণত দেখা যায় না।'

ঝিনি বলে, 'হ্যাঁ, ও একটু আলাদা ছিল। ও যে আমাদের বাড়িতে কী ভাবে আসত, না দেখলে বোঝানো যায় না। একবারও মনে হতো না, যেন একটা অদ্ভুত কিছু করছে, যেন মজা করছে। চেঁচিয়ে চিৎকার করে দাপিয়ে ছুটোছুটি করে বাড়ি মাথায় করত। কথায় কথায় ঝগড়া আর তর্ক, গান করা, ঘুড়ি ওড়ানো, কী না করত! আর বুঝতেই পারেন, পাড়ার লোকেরা ওর আসাটা কিছুতেই ভালো চোখে দেখত না। তারা যা খুশি রটাত।'...

কথাটা যেন ঠিক শেষ হয় না। ঝিনির ঠোঁটের কোণে একটু বিরক্তির হাসি ঝিলিক দেয়। একবার চোখ নামিয়ে আবার চায়। মুখের ভাবে যে লজ্জা ফোটে, তা বলব না। পড়শী-ভাবনায় একটু যেন বিব্রত হয়ে ওঠে। তারপরে আর ভেঙে বলতে হয় না, পড়শীদের যা খুশি তাই রটনার বয়ান কী। কোথায় ইঙ্গিত করে। পড়শী বলো, পথিক বলো, আমরা তো সবাই তাই। আমিও অতএব বাদ যাই কেমন করে। কথা শুনে, নজরে একটু শান দিয়ে হানি। অলকা চক্রবর্তীর প্রাণের স্রোত কোন্ তরঙ্গে দোলে। ফুল কোথাও ফুটেছিল নাকি। অচিনে অজানায় নিভৃতে, কোথাও ফুটেছিল নাকি কুসুমকলি। হেনরি কি শুধুই হেনরি, অলি নয় মোটে?

ঝিনি আবার একটু হাসে। আমার চোখের দিকে চায়। বলে, 'হেনরি সেই কথা নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করত। আবার কী বলত জানেন? বলত, "কেন, পাড়ার লোকেরা

নিজেদের ভাই-বোন সম্পর্কে এ রকম ভাবতে পারে!" আমি ওকে হেনরিদা বলতাম। বলতাম, "তুমি তো আর সত্যি সত্যি আমার ভাই নও।" কী যে চটে যেত ও কথা বললে। বলত, "আমি তা হলে সত্যি সত্যি তোর কী?" বলতাম, "তুমি দাদার বন্ধু।" শুনেই রেগে তেতাল হয়ে উঠত। পেছনে লেগে সহজেই ওকে চটানো যেতো। আবার ও-ও আমার পেছনে লাগত।'

ঝিনি হেসে ওঠে। ব্রহ্মনারায়ণ এদিকে কখন কান দিয়েছেন, জানা যায়নি। বলে ওঠেন, 'সত্যি, একেবারে পাগলা ছিল। অথচ কী মতি দেখ।'

আবার সবাই চুপ করে যায়। দূরান্তে, সেইসব দিনের স্মৃতির গভীরে যেন ডুবে যায়। ঝিনি বলে, 'জেল থেকে প্রতি সপ্তাহেই এখনো চিঠি দেয়। চিঠিগুলো পড়লে ওর জন্যেই বেশী কষ্ট হয়। দাদা তো নেই জানি, ও আছে, সেইটাই কষ্ট। লেখে, "বেঁচে আছি, এটাই সব থেকে বড় কষ্ট।"

ঝিনি চুপ করে। পরমুহূর্তেই চোখ তুলে বলে, 'কিছু মনে করছেন?'

অবাক হয়ে বলি, 'কেন?'

'এত কথা বললাম বলে?'

এবার দেখ, নাগরিকা আত্মপ্রকাশ করে। এতক্ষণে নগর-ধর্ম মনে জাগে। সচকিত হয়ে ভাবে, পান থেকে চুন খসেছে নাকি। বলি, 'এতে কি কেউ কিছু মনে করতে পারে নাকি।'

ঝিনি বলে, 'আপনি বলেই বললাম।'

একবার পুছ-নজরে চাই, পুছ করি না। ঝিনি নিজেই বলে, 'আপনি ঠিক বুঝবেন তাই।'

ঠিক বোঝার দায় নেবো না, মনে মনে জানি। কারণ, সারা জীবনে ঠিক বোঝা-বুঝির নজির আমার শূন্য। বেঠিক যদি না হবে, তা হলে পথে পথে ফেরা কেন। কেন সব অচিন থাকে, সন্ধানের খোঁজ জানা থাকে না। বুঝি না-বুঝি এইটুকু মানি, মৃতের চেয়ে অ-মৃতের ভাবনা ভাবায় বেশী। শোকে শূন্যতা, কষ্টে আকুতি। শূন্যতায় কেবলই হাহাকার। আকুতিতে জীবনতৃষ্ণা। তাই ঝিনির কষ্ট আমাকে এখন ছুঁয়ে যায়। হেনরির কথাগুলো মনে মনে বাজে, "বেঁচে আছি, এটাই সব থেকে বড় কষ্ট।"

এমন সময় গাজীর হাঁক শোনা যায়, 'শাঁখচূড় পেরায় এসি গেল বাবু।' শোনা মাত্রই নড়ে ওঠেন ব্রহ্মনারায়ণ। দাঁড়িয়ে উঠতে যান। বলে ওঠেন, 'তাই নাকি!'

গাজী সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে সামাল দেয়, 'বসেন বাবু বসেন, এখনো একটু দেরি আছে। অই বললাম আর কী, আর বেশী দূরে নাই।'

আবার পুরনো ব্রহ্ম দেখা দেন। ভ্রূকুটি করে একবার গাজীকে দেখে, বসতে বসতে বলেন, 'তবে আর তোমার ডাকাডাকির দরকার কী।'

আমি একবার গাজীর দিকে চাই। হাসিঝরা চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ফিরে চোখে চোখ পড়ে ঝিনির। ঝিনিও হাসে।

হঠাৎ ব্রহ্মনারায়ণ মাথা দুলিয়ে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ল। তুমি এক কাজ করো না কেন?'

কাকে বলেন! মুখ ফিরিয়ে দেখি, নজর আমার দিকে। বলি, 'কী বলুন তো।'

প্রৌঢ়ার গালের ভাঁজের রেখায় যেন কেমন রহস্য ভাব। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, 'বুঝলি ঝিনি, একেও শাঁখচুড়ে নামিয়ে নেওয়া যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝিনির ঘাড়ে লাগে ঝটকা। চুলের গোছা নিয়ে যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। দেখি, যেন কিশোরী মেয়েটির চোখে খুশি ঝলকে ওঠে। বলে, 'খুব ভালো হয় বাবা।'

অমনি দেখি, গিন্নীও দৃষ্টি ফেরান। মুখে ভার আছে, তবে চোখে কৌতুকের ছটা লেগেছে। কিন্তু আমি যেন তখনো ভেবে উঠতে পারিনি, নামিয়ে নেওয়া হবে কাকে। তার জন্যে পলক অপেক্ষা করে না। ঝিনিই তাড়াতাড়ি আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে বলে, 'আসুন আমাদের সঙ্গে।'

শ্যামচিকন গ্রীবা বাঁকানো মুখে আর চোখে, অনুনয়ে আন্তরিকতা নয়। নাগরিকা যেন মুহূর্তে বালিকার বেশ ধরে, আবদারে গলে। আকাশ আমার মাথার ওপরেই, সেখান থেকে পড়িনি বটে, তবে সেই মুহূর্তে মনে হলো, তাই পড়েছি। বিস্ময়ের ধাক্কাটা পুরোপুরি লাগবার আগেই প্রায় ডুকরে উঠি, 'আমাকে বলছেন?'

জবাব যেন কানের কাছে গমগমিয়ে বাজে, 'হ্যাঁ হে। তোমাকেই। কালীনগরের থেকে খারাপ জায়গা তো নয়।'

তৎক্ষণাৎ আমার মুখ থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে, 'না না, সে কি কথা।'

এবার শোনো ব্রহ্মনারায়ণের ব্রহ্ম হুমকি, 'কেন, কথাটা এমন কি পাপের হলো।'

'না, পাপের নয়—।'

'তবে?'

কথা শেষ করতে দেন না। ঝিনি ওদিকে ঝিনঝিনিয়ে হাসে। কিন্তু চোখের পাতায়, পাখির ডানায় গুটিয়ে আনা নীরবতা। খুশি নজরে উপচে পড়া নিবেদন। তারই সংক্রমণ দেখ, মায়ের স্নিগ্ধ চোখে। আমি বলি, 'না, মানে—।'

কথা শেষ করতে দিলেই হলো! ব্রহ্মনারায়ণ হাঁকেন, 'না মানে বলে তো কোনো কথা নেই। ভদ্রলোকের বাড়ি, গঞ্জ হোটেল নয়।'

ঝিনি যোগ করে, 'বেলাও অনেক হয়েছে, একটা বাজে।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মনারায়ণের কিঞ্চিৎ যুক্তিবাচক বচন, 'পথে একটু আলাপ পরিচয় হলো, বেশ হলো। এবার নেয়েখেয়ে একটা বেলা একটু জমিয়ে গপ্পো করা যাবে। কী বলো গো?'

গিন্নীরও একটা মতামত তো চাই। তিনি তৎক্ষণাৎ একটু ঘোমটা টেনে খুশি হয়ে হাসেন। বলেন, 'এ আবার বলব কী, খুব ভালো হয়।'

এ আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই, ধন্দ দ্বন্দ্ব নেই। ছলছলিয়ে যাই এই পথিক ডাকের খুশির বিস্ময়ে। বরং নিরুপায় বলে খচখচ করে মনে। না হেসে পারি না। অসহায়ের হাসি। কিন্তু বক্তব্যের গুরুত্বটা যেন না হারাই, সেইভাবেই বলি, 'সত্যি, এভাবে বলছেন, খুব ইচ্ছে করছে নেমে যাই। কিন্তু কোনো উপায় নেই, জানেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ এবার বেশ শরীর নিয়েই বেঁকে বসেন। ভুরু দিয়ে খুঁচিয়ে, গলার আওয়াজ করেন, 'কেন?'

সংকটের কথা সহজ ভাবেই বলি, 'আপনি তো জানেনই, কাল আমার ফেরার কথা ছিল। নিতান্ত দায়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, আর দেরি করা চলে না।'

প্রৌঢ় হুমকানি দেন, 'বাজে কথা ব'লো না তো হে। গতকাল ফিরবে বলে যে এক দিন পরে ফিরতে পারে, একটা বেলাতে তার বেহ্মান্ড উল্টে যাবে! কোনো মানে হয় এসব কথার!'

গিন্নী আর একটু টানেন, 'বেলা তো প্রায় কেটেই গেল। কতটুকু সময় আর।'

ঝিনি ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে চুল সরিয়ে, স্বরে ঢেউ দিয়ে বলে, 'চলুন না।'

এবার দেখ, বিদুষী নাগরিকা আস্ত একটি মেয়ে। ফিলজফির খোঁজ করে দেখ, সবকিছু কেবল জীবনের আর মনের ছন্দে বাজে।

এমন সময় সহিসের হাঁক বেজে যায়, 'সুসাখচুড়, সুসাখচুড়।'

থামাবার ঘণ্টা বেজে ওঠে। আওয়াজ ওঠে, 'মেয়েছেলে আছে।'

ব্রহ্মনারায়ণ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'চলো হে চলো।'

টেনে নামাবেন নাকি। আমিও দাঁড়িয়ে উঠেই বলি, 'সত্যি কোনো উপায় নেই, মাপ চাইছি।'

'থাক, আর মাপ চাইতে হবে না। ভালো কথা তো শুনবে না, শুকোতে শুকোতে যাও।'

বিদায় নেবার এই শেষ কথা ব্রহ্মনারায়ণের। দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন, 'ঝিনি, তোর মাকে নিয়ে আয়।'

ঝিনি তখনো তাকিয়েছিল। গতকালের বিদায় নেবার ছবিটা মনে পড়ে। এখন তার চেয়ে বেশী অন্ধকার তার মুখে। খুশি লাগা ঝলকে হতাশার একটু ছায়া। বলতে ইচ্ছা করে, কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের চাঁদের মতন। পথ চলাতে এইটুকু ব্যাজ। তার ওপরে দেখ, মন খারাপের বাঁকটুকু লেগেছে সরু কালো ভুরুতে। এখানে লেনা-দেনার বিচার নাই। তাই, দাবিটা এমন নিটোল সহজ, বলতে পারো, মন খারাপের বাঁকটুকুর আর এক নাম অভিমান।

গাড়ি তখনো দাঁড়িয়ে পড়েনি। মা একটু বিমর্ষ হেসে বলেন, 'চলি বাবা।'

আমি ঘাড় কাত করে বলি, 'আচ্ছা। আমার দুর্ভাগ্য—।'

কথা শেষ করতে পারি না। বিদুষীর গলা ঝংকৃত হয়ে ওঠে, 'সে বিচারটা আপনি করবেন না। দুর্ভাগ্যটা কাদের, বুঝতে নিশ্চয়ই পারছেন।'

বলে, মায়ের হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'চলো।'

ঝিনি পিছন ফেরবার আগেই অসহায় হয়ে বলি, 'ভুল বুঝবেন না যেন।'

তবু ঝিনি পিছন ফেরে। কিন্তু তাকায় না। কোনো জবাব দেয় না।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসে। ব্রহ্মনারায়ণের ডাক শোনা যায়, 'আয় রে ঝিনি।'

ঝিনি দু' পা বাড়িয়ে আবার হঠাৎ পিছন ফেরে। হেসে বলে, 'ঠিকানাটা কিন্তু রেখে গেছেন।'

'মনে আছে।'

'সত্যি?'

ওর ঠোঁটের কোণে হাসি একটু বেঁকে ওঠে। পরমুহূর্তেই সারা মুখে স্পষ্ট হাসি ঝলকে ওঠে।

বলে, 'দেখা যাবে। চলি।'

'আচ্ছা।'

ওরা নেমে যাবার মুহূর্তেই গাজী হেঁকে ওঠে, 'চললেন বাবু?'

ব্রহ্মনারায়ণের তেমনি জবাব, 'তবে কি থাকব!'

গাজী তেমনি গলাতেই বলে, 'পেন্নাম হই বাবু, পেন্নাম হই মা, পেন্নাম দিদিমণি।'

গাড়ির গর্জনে তার গলা ডুবে যায়। জবাব পাবার আশায় গাড়ি আর তখন দাঁড়িয়ে নেই। এমন একটা বাঁক নেয়, জানালা দিয়ে আর কাউকে দেখা যায় না। পিছনে থাকে কেবল একটি ছায়া-ঘেরা নিবিড় আম জাম নারকেলের বাগান।

তবু যা হোক, ঝিনি একটু হাসির ঝলকে সহজ করে দিয়ে যায়। না নামতে পারার জন্যে মন যে একটু খারাপ হয় না, তা নয়। সংসারে এইটুকু আজ দুর্মূল্য। প্রীতি কেউ দু' হাত বাড়িয়ে বিলোয় না। যদি কেউ দান করে, তবে তা হাত ভরে নিতে না পারার দুঃখ তোমার।

গায়ে এসে রোদ লাগে। সূর্য পশ্চিমে ঢুলে খেয়েছে বোঝা যায়। কিন্তু প্রথম শীতের এই দুপুর রোদ, এখন আরাম দেয় না। অস্নাত রুক্ষ শরীরে একটু জ্বালা

দেয়। দিগন্তে তাকিয়ে মনে হয়, আমার গায়ের জ্বালা যেন প্রকৃতিকেও জ্বালাচ্ছে। সেখানেও দুপুরের রোদ ঝলকানো নিঝুমতা। পথের ধারে হেথা সেথা পাখি-গুলোকে আর দেখা যায় না।

পাশে শুনতে পাই, 'এবার একটু বাবুর কাছে বসি। সময় তো হয়ি এল।'

জিজ্ঞেস করি, 'আর কতক্ষণ?'

'বেশী না। দেখতি দেখতি এসে যাবে। বসিরহাটে যেয়ি, গাড়ির জন্যি আর দাঁড়াতি হবে না।'

সে কথা জানি। নতুন করে কেন আর সান্ত্বনা দেয় গাজী। সরে গিয়ে তাকে পাশে বসতে দিই।

সান্ত্বনা দেয়, তার কারণ আছে। কাছে বসে গাজী আমার মুখের দিকে তাকায়। টের পাই, কোনো দিকে সে ফিরে তাকায় না, নজর সরায় না। আমি তার দিকে ফিরে চাই। দেখ, যেন স্নেহ-করুণ নিবিড়তা গাজীর আরশি-চোখে। বলে, 'খুব কষ্ট লাগে বাবু, না?'

বলি, 'কই, না তো।'

গাজী বলে, 'এতখানি বেলা হয়ি গেল। চান খাওয়া কিছু হয় নাই, আরো কত পথ যেতি হবে আপনাকে।'

তা হবে। পথ চলার এই রীতিটুকু, আপন প্রকৃতি দিয়ে মেনেছি। বলি, 'এমন কিছু নয়।'

গাজী বলে, 'খালি মনে হয়, বাবুকে আমি কষ্ট দিলাম। হ্যাঁ বাবু, গাজীকে মনে থাকবে তো?'

হেসে তাকিয়ে বলি, 'থাকবে বইকি।'

'তয় বাবু, আপনাকে একটা কথা বলি।'

'বলো।'

গাজী বলে, 'হাতে যদি সময় থাকে বাবু, তয় হাড়োয়ার মেলায় আসবেন। ফাগুন মাসের বারো তারিখে, পীর গোরাচাঁদের মেলায়। আসবেন বাবু?'

একটু লালের আভায়, এ আরশি-চোখ ঝিনির নয়। তবু দেখ, যেন প্রেমে থরোথরো অনুনয়। জবাবের আশায় যেন দাড়ি স্তব্ধ, পট নিশ্চল। মনে পড়ে যায়, গাজীর কাছে, হাড়োয়ার মেলা কেবল পীর গোরাচাঁদের মেলা নয়। সেখানে তার নয়নতারা মিলেছিল। ও মেলা গাজীর নয়নতারার মেলা। জিজ্ঞেস করি, 'তুমি যাও নাকি প্রতি বছর?'

'জয় মুরশেদ, বলেন কী বাবু। হাড়োয়ায় না গেলি কি চলে। অত বড় মেলা আর কম্‌নে আছে।'

গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে বলি, 'তোমার নয়নতারাও যায় নাকি?'

গাজী হা হা করে হেসে বলে, 'সে কথা কি আর পুছ করতি হয় বাবু। না নিয়ি গেলি, গাজীর গর্দান যাবে না?'

সর্বনাশ, একেবারে গর্দান। তা ব্যাজ করতে পারবে না, গাজীনীর যুক্তি আছে বইকি। অধর ধরার সাধনের জন্যে যেখানে প্রকৃতি প্রাপ্তি হয়, সে তো স্মৃতিতীর্থ হে। বলো, মুরশেদের মিলিয়ে দেওয়ার তীর্থক্ষেত্র। তোমরা গিয়ে বিবাহ বার্ষিকী করো। এখানে তো সে সব চলবে না। ফাল্গুনের বারো তারিখ, হাড়োয়া হলো প্রকৃতি-প্রাপ্তিবার্ষিকীর থান। যাওয়া মানেই পালন।

বলি, 'সময় পেলে নিশ্চয় আসব। রাত্রে মেলায় থাকবার জায়গা আছে?'

গাজী বলে, 'এক রাত্তিরির তো ব্যাপার বাবু। সারা রাত আপনাকে গান

শুনাবো।’

মনে মনে ভাবি, মন্দ না। অধর ধরার সাধিকা, নয়নতারাকেও তখন দেখা যাবে। মিয়া-বিবির ঘর করা না, এ পুরুষ-প্রকৃতির উজান চলা। তার ওপরে অমন যার প্রাণের তেজ, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে।

বসিরহাট এসে গেল। এবার গাড়ির অভাব নেই। কিন্তু চায়ের তৃষ্ণা না মিটিয়ে পারি না। গাজীকেও ডেকে নিই। বিদায়ের আগে, একটু গলা ভেজানো।

চা খেতে খেতে বলি, ‘তা তুমি যে কাল থেকে ঘর ছাড়া, তোমার নয়নতারা চিন্তা করবে না?’

গাজী হেসে বলে, ‘এই কি নতুন নাকি বাবু। এমন কত বাইরি থাকি। নয়নতারা ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়ি—।’

আমার গালে যেন ঠাস করে চড় লাগে। বলে কী হে লোকটা। এতক্ষণ পুরুষ-প্রকৃতির উজান টানের কথা বলে, এখন ছাওয়াল-পাওয়াল শোনায়।

আমার নজর দেখে ঠেক খায় গাজী, বলে ‘কী হলো বাবু!’

বলি, ‘তুমি যে বলছিলে, মিয়া-বিবির ঘর করা নয়, মনের মানুষ—’

কথা শেষ করতে পারি না। গাজী একেবারে লজ্জায় নুয়ে পড়ে। টেনে টেনে হাসে, বলে, ‘বাঁধাল আর বাঁধতি পারলাম কম্‌নে বাবু। সে বড় কঠিন কাজ কিনা।’

বটে! মনে করেছিলাম আলখাল্লা পরা এই গাজী বুঝি তার দীনদরদীর খোঁজে চলে। মুরশেদ সত্য, আর সব মিথ্যা। কিন্তু এ যে বিবির মিয়া, ছাওয়াল-পাওয়ালের বাপ। আবার বলে, ‘এখন বাবু, মিয়া-বিবি হয়ি গেছি। তবে অই, মুরশেদের নামের মজদুরিটা—।’

এবার ঠেক মারি আমি। বলি, ‘ছাড়তে পারনি। তা, ছাওয়াল-পাওয়াল ক’টি?’

‘আজ্ঞে’ চারটি।’

চমৎকার! মুরশেদের নামের গুণ আছে। এখন দেখ একবার, যাকে দেখেছিলে সংসারের বাইরে, সে সংসারের খুঁটে খাওয়া কোটির এক। এবার দেখ, আরশি-চোখে যেন দাঁড়িয়ে বাবা, সন্তানের স্নেহে করুণ। বিবির প্রীতিতে প্রেম গদ্‌গদ। ঝোলা ঝুপ্‌কি আলখাল্লা, সব নিয়ে এক বাঙলা দেশের গায়ক, জীবধর্মে একেবারে সোজাসুজি মানুষ।

গাজীটা সত্যি পাজী। হাসব না রাগব, বোঝবার আগেই আমার গাড়ি হাঁক দেয়। কিন্তু কোথায় যেন ঠেক খাই, মোচড় লাগে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে নিজের সামান্য শ্রমের ধন তুলে দিয়ে বলি, ‘ছেলেমেয়েদের কিছু কিনে দিও।’

বলে দৌড়ে গাড়িতে উঠি। চকিতে একবার সেই মুখখানি দেখি। একবার যেন শুনতে পাই, ‘বারোই ফাল্গুন—বাবু—হাড়োয়ার মেলায়...।’

কেন, কী কারণে সে কথা পুছ ক’রো না। নিজেরও কি প্রত্যয় আছে যে, বাতিয়ে দেবো, কে ঘরছাড়া করে ডেকে নিয়ে যায়। সেই পাগলের নাম জানি না, কে যে ‘বাহির করেছে পাগল মোরে।’ যদি ঈশ্বরের কথা বলো, এক কথায় নাকচ। তার সঙ্গে কোনো চিন্‌-পরিচয় নেই। না এক-কে, না বহুকে। জানা কেবল শোনায়, পড়ায়, পটে-প্রতিমায়। মোকাম সাকিন নিবাস, কোনো খোঁজই জানা নেই। সংসারের কথা বলতে পারো। তাতে ক্ষতি বই লাভ হয়নি। মজ্জাগত সংস্কারটা কাজের কাজ কিছু করে না। মনের ভাবে অ-ভাব আনে। অকাজ বাড়ায়। আমি ওর মধ্যে নেই।

তবে আছ কিসে? এত বাহির বাহির কেন। যেন কেবল হাতছানি, ঘরেতে

রইতে নারি। কেবলই ছটফট, ফাপর ফাপর, তখন একটু আগল খোলা পাওয়া যায়। ফাঁক পেলেই ঝোলা নিয়ে দে দৌড়। যেন, 'শুনিয়া বাঁশীরো গান, মনো করে আনচান্, গেহকার্য্য রয় না আমার স্মৃতিতে।' কেন, দায় দায়িত্ব কর্ম নেই?

আছে, সর্বাঙ্গে মুড়ে আছে, পিছমোড়া করে বেঁধে আছে। কিন্তু মর্ম মানে না যে। কেবল ধর্মের ঋণ শুধবে, মর্ম উপোসী থাকবে, তা হয় না। একে যদি ছুটির অবকাশ বলা হয়, আপত্তি আছে। সেসব দেখ গিয়ে দেওয়ালপঞ্জীর পাতায়। সাল-তামামী ভিড়ের ঠেলায় মরসুমী ধাক্কাধাক্কি দেখ গিয়ে টিকেট-ঘরের কাছে, ইস্টিশনে, গাড়িতে। এখানে তা নেই, উচ্চস্বর, উচ্চগ্রাম, উচ্চ উচ্চ রাজভ্রমণ, ডেয়ো-ঢাকনা লটবহরের টানাটানি। এ হলো উঠোন ডিঙিয়ে, বনের পথটুকু পার হয়ে, যমুনার ধারে যাওয়া। আনচান মনের ছুট কিনা। কেবলই ফাঁকে ফাঁকে যাওয়া। ফাঁক না পেলে ছল দিয়ে ফাঁক তৈরি করে যাওয়া। কেননা, ওই সেই মর্মের তাড়া। তাই যেতেই হবে। যদি বলো, কিসের লাগি, বলতে পারব না। কত দিন তো ধোয়ামাজা ঝকঝকে, নয়তো মেঘমেদুর আকাশ দেখে মনে মনে ভেবেছি, এই তো সেই ব্যথা-ধরানো খুশির পাওয়া পরম রতন। কত দিন বনস্থলীতে দাঁড়িয়ে শ্যামচিকন চিকচিক পাতা দেখে সুখেতে চিকচিকিয়ে উঠেছে চোখের কোণ। নামী বেনামী কুসুমগন্ধে বুক ভরেছে, সব গন্ধেই যেন কেমন এক সুখদুঃখে মাখামাখি। সেখানে পাখি ডেকে যায়, ভোমরা মধু খায় ফুলে ফুলে, প্রজাপতিরা রঙের গুমরে ঝলকায়। তখন কথা করে না। এমন এক আনন্দ বেজে ওঠে, যেন চোখ ফেটে ঝরঝরিয়ে যেতে চায়। আর মন বলে, এই চাওয়াতেই ফিরি, এই ভরাতেই ডুবি। তখন যে সব ভরেই ওঠে।

তবু কী যেন বাকী থেকে যায়। সব কিছুর মধ্যে যেন কী 'তবু ভরিল না...।' সেই নামহীন অচিনের কী যে নাম, কোথায় সন্ধান, প্রাণে সেই আফসানি এ 'শূন্য মাঝারে।' তা-ই চলো যাই দেখি, কী মেলে, মেলে কিনা কিছু।

পথ একটু ঘোরালো, ঘুরে যেতে হচ্ছে। গন্তব্য ছাতিমতলায়। ছাতিমতলার মেলায়, পৌষ যেখানে ডাক দিয়েছে, তোরা আয় আয় আয়। সেখানে মহাঋষির স্মৃতি-তীর্থ, উপাসকের আশ্রম। সেখানে আছে বটতলা, যেখানে ঋষি সূর্যোদয় দেখতেন। যবে ঋষি দীক্ষা নিয়েছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেইদিন তাঁর জন্মান্তর। জন্মান্তরের সেই দিনটি, সাতুই পৌষের স্মরণোৎসব। এবার সেই লীলাভূমি যাত্রা, গেরুয়া রঙে ছোপানো মৃত্তিকাদেশ বীরভূমের অন্তঃপাতী। তার সঙ্গে দেখবে চলো ঋষিপুত্রের কীর্তি। সে এক তিল তিল রূপে গড়া তিলোত্তমা নয়, বিশ্ব ছেনে বিশ্ববিদ্যালয় গড়া। সে হলো কীর্তিমানের কর্ম। মর্মের কথা আলাদা। মহর্ষির ধ্যানের বীজে সেই মরমের জন্ম, যে মরমের ধ্যানের কথা শ্রুতিগোচর গানের সুরে। সে মরমিয়ার ব্যাকুল চাওয়া, ধ্যানের চাওয়া, অরূপরতন, তার নিজের মিলে ছিল কিনা, কে জানে। আলো আলো আলো বলে আর্তরবে অন্ধকারে তাঁর চোখের তীরে আলো জেগেছিল কিনা, কে জানে। সেই ক্ষ্যাপার কথা যে মনে পড়ে যায়, খুঁজে ফেরার পরশমণি যে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের হাত তো ভরে গিয়েছে সোনায় সোনায় অরূপরতনের কাব্যবিতানের মালিকায় যা গাঁথা। আমাদের চোখের তীরে তো আলোর ঝলক, চারু সম্ভারের আলোতে। তাই সেখানে যাই। মহর্ষির তীর্থে, মরমীর থানে, কর্মীর বিশ্বলোকের প্রাঙ্গণে। সেই এক ছাতিমতলা ঘিরে যার বিস্তার। উপলক্ষ, মহর্ষির দীক্ষাদিনের সাতুই পৌষ। সাতুই পৌষের মেলা। সেখানে বঙ্গ রঙ্গ করে নানা রূপে, নানান্ উপচারে। এ কথা পাড়ায় জানা, সংবাদে শোনা। একবার দেখে আসি গিয়ে।

তবে সেই কথা, ছাতিমতলায় যাত্রাটা সোজাসুজি হয়নি। একটু ঘুরপথে চলা।

সাঁওতল পরগণা ঘুরে আসা, রাজধানী থেকে যাত্রা নয়। তাই অণ্ডাল থেকে সোজা সড়ক ছেড়ে বাঁকা পথে ঢোকা। দেখ, গায়ে বুঝি এখনো দক্ষিণের দরিয়ার নোনা লেগে আছে। গাজীর কালো মুখের হাসির আলো ঝিকিমিকি করে। তথাপি, রাঢ়ের ধুলোয় রাঙা হয়েছি। রঙ মাখামাখি হয়েছে সাঁওতাল পরগণার পথে প্রান্তে। একা আমি নয়। দেখে এস গিয়ে, উত্তরীয়া হাওয়ায় যেটুকু ওড়ে, তাতেই মানুষ পশু ছার, ইস্তক গাছপালাতেও গেরুয়ার ছোপ লগেছে। এর পরেও যদি ফাল্গুনের কথা ভাবো, দিশা পাবে না।

এ গাড়ি যাবে সাঁইথিয়া। আবার বদলের পালা। সাঁইথিয়া থেকে বোলপুর নাম ইস্টিশন। আসলে নাম শান্তিনিকেতন। সেখান থেকে ছাতিমতলা। আসল শান্তিনিকেতন। ডান পাশে বুড়ো বসে ছিল। দেখে জীবিকা বোঝবার উপায় নেই। চেহারায় পোশাকে গ্রামীণ জন বুঝি কৃষাণ হতে পারে। আমার হাতে খোলা বইটার দিকে অনেকক্ষণ ধরেই তার নজর করা দেখেছি। দু-একবার ঠোঁট নড়াও চোখে পড়েছে। যেন বানান করে করে পড়ছে। ফিটফাট ভদ্রলোক পড়ো হলে একটু অস্বস্তি হতো। এখানে তা নেই। তবু ঠোঁটের কোণটা একটু টিপে রাখতে হয়। পাছে ঠোঁট ছড়িয়ে গিয়ে হাসি ধরা পড়ে। এ হাসি বিদ্রূপে দোষাবহ হতে পারে, কিন্তু মজা লাগে বেশী। নইলে বইটা নিজের কোলের ওপর এমন করে খুলে রাখার কারণ নেই। কারণ, নজরকে বই ধরে রাখতে পারেনি। জানালা দিয়ে দূরান্তরে টেনে নিয়েছে।

প্রথম ক্ষেপের এক বাক্য শুনতে হয়েছিল অণ্ডাল ছাড়বার পরেই। এক জিজ্ঞাসা, 'কুথাক্ যাবেন?'

এ সেই 'যাওয়া হবে কম্‌নে' নয়। এখানে সুর স্বর উচ্চারণ, বেবাক আলাদা। এখানে নোনা গাঙের ছলছলানি, কলকলানি, ভেজা ভেজা ভাব নেই। যেন উপ্‌ছে পড়া, ঢল নামা গহীন গাঙের তরতরিয়ে যাওয়া। যেন কালো নরম সমতলে সোজা চলে যাওয়া না। এখানে কাঁকরে পাথরে যেন রক্তে সেঁচা মাটি, চড়াই-উৎরাইয়ে চলে! কথার সুরে পাবে সেই পাথুরে ওঠানামার তাল। এ আর এক রসের সুর। জাত আলাদা। ছন্দে একটু বাঁকাচোরা, ঠেক-খাওয়া ঠেক-খাওয়া। ভাটিয়ালির লম্বা টানের থেকে গুপ্‌গুপাগুপ্ গোপীযন্ত্রের গানের সুরে মিশবে ভালো। ঝুমুর বাউলের ওঠা-নামা এই প্রকৃতিতে আছে। কাঁদনেও সেই সুর। উজানিয়া গাঙের মাঝির শোকের সুর না। সুখের তরতরানো ছলছলানি না। এখানে রসের ধারা নিচে দিয়ে বহে। ছোটে যখন ঝরণা তালে, লাফিয়ে নেচে ঘুরে ঘুরে ছোটে। যখন উত্তাপে রক্ত-মাটি ফাটে, তখন কেটে দেখ, তালশাঁসে টলটলে রস, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। নদীতে জল নেই, পুকুর খটখট। মহুয়ার গন্ধ ছড়িয়ে যায়, মৌমাছি গুনগুন করে। কথাবার্তা যা শুনবে, সব সেই রকম। যেন ভিতর থেকে খোঁচা খেয়ে খেয়ে ওঠে, শোনায় এক নতুন সুরের ছন্দে। এক ভিন্ রসের সন্ধান পাবে। তার নাম রাঢ়ের রস।

জবাব দিতে গিয়ে ছাতিমতলা বলিনি। শান্তিনিকেতনও না। বলেছি, 'বোলপুর।'

'অ। সাঁইতে যেয়ে বদলাতে হবে।'

এই সংবাদটি দেবার পর থেকেই কী যে কাল কেতাবে নজর পড়ে। সেই থেকে পোষরুক্ষু মুখখানিতে নানান ভাব। চোখ কুঁচকে কুঁচকে দেখার ঘটা। আর ওই, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ানো। একবারটি মুখ ফুটে চাইলেই ছাতিমতলার বাংলা ইতিহাসখানি দিয়ে দিই। তাও চায় না। অতএব মেলে ধরে কোলে নিয়ে বসে আছি।

এইটুকু এক রঙ্গ, তার ফাঁকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এক অনন্ত আকাশ।

এ আকাশকে কেবল মাজা বলব না। শীতের বেলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটু ঘষা-ঘষা। সকালবেলা যেমন নীল, নীলকান্ত মণির স্বচ্ছতা ছিল; কী জানি, মুখ বাড়ালে না জানি মুখখানিই দেখা যেত আরশির মতো, এখন তেমন নয়। রোদ খেয়ে খেয়ে এই বেলায় একটু যেন রুখু। নিচে ধানকাটা মাঠ গাড়ির ছোটায় যেন পাক খেয়ে খেয়ে যায়। তার মাঝে কখনো গ্রাম। রাঢ়ের মাটির ঘর, খড়ের চাল। হেথা হোথা তালগাছ, যেন আনিমানি জানি না, এমনি সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাবলা কেয়া বন। আম-জাম যে চোখে পড়ে না, এমন নয়। আর এই রক্তিম তেপান্তরে, পথে ঘাটে গ্রামে আরো যে কত গাছ দেখি, যারা বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে, তাদের নামই জানি না। বট অশ্বত্থ চিনতে অসুবিধা নেই। গ্রামের পথে দেখি, ল্যাংটা ছেলেরা খেলা করে। কেন, শীত কি নেই। পৌষ কি তোদের হাড় কাঁপায় না। বড়দেরও দেখ না কেন, খালি গায়ে রোদ নিয়ে এখানে ওখানে দঙগল পাকিয়ে বসে আছে। রেল-লাইনের ধারে যেসব জলাশয় সেখানে মেয়েদের স্নান, কাপড় কাচা চলেছে। কাছে দূরে রাখালেরা লাঠি হাতে ধেনু চরিয়ে ফেরে। এখন আগলানো শুধু মুগ মটর কলাইয়ের ক্ষেত। দেখ হে রাখাল, তোমার গাই গরু যেন ছোঁচাবৃত্তি না করে। মাঝে মাঝে আখের ক্ষেত, বাতাসে মাথা দোলায়। গরুর গাড়ি চলে গ্রামের পথে। কোনোটা ছই-ঢাকা, পরিবার পরিজনে ভরা। কোনো গাড়ি খালি, খোলা। কোনোটাতে খড়ের বোঝা। এই যত লোক, সবাই একবার গাড়ি দেখে। এমন দেখি না, একবার কেউ ফিরিয়ে রাখে।

তারপরে মাঝে মাঝে দেখ, হঠাৎ যেন ছোট এক তালবন। আসলে, জলাশয় ওখানে। রাঢ়ের এই এক বৈশিষ্ট্য। বিশেষ, দূর উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ে। যেখানে জলাশয়, সেখানেই তালবনের বেষ্টনী।

বৈদ্যনাথপুর নামে এক ইস্টিশন পার হয়ে দেখি, ভূমি নেমে যায়। যেন উৎরাইয়ের ঢলে নামে, সঙ্গে নামে সকল প্রকৃতি। আমার পায়ের নীচে কী এক গুম্‌গুম্‌ শব্দ যেন বাজে। তারপরে দেখি, হঠাৎ আকাশ আরো দূরান্তে ছড়ায়। মাঝে লাল রঙ বালির চর ধু-ধু গায়ে পাক দিয়ে, মোচড় খেয়ে, এলিয়ে পড়ে রোদ পোহায়। এপারে ওপারে লাল মাটির পাড় এবড়ো-খেবড়ো, বিস্তীর্ণ গাছপালা বন তার গায়ে। পুলের উঁচু থেকে মনে হয় একমেটে রঙ প্রকাণ্ড সাপ, আলস্যে আরামে রোদে পড়ে আছে। বড় উদাস তার ভঙ্গি। তার গা চিরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে এক নীল নীল শিরা। তাতে রোদ চিকচিক করে, ক্ষণে ক্ষণে যেন টলটলিয়ে যায়। সেই শিরার গায়ে। ছোটো ছোটো কালো মূর্তি নড়েচড়ে ওঠে। হয়তো কাপড় কাচে, চান করে।

এ নদীর নাম কী, যেন মনে মনে জানি। তবু নতুন দেখার একটু সংশয়। তাও দূর হয়। আমার উৎসুক চোখের সামনে, পাশের বুড়োর কথা শোনা যায়, 'ইটি অজয় নদী।'

অজয় নদ।। মুখ ফিরিয়ে দেখি, বুড়ো অজয় দেখে না। আমার মুখের দিকে দেখে। আমি যেমন মজা পেয়েছিলাম তাকে দেখে, সেও যেন, সেইরকম মজা পায়। আকাটা গোঁফদাড়িতে একটু হাসে। বলে, 'আগে কখনো দ্যাখেন নাই?'

ঘাড় নেড়ে জানাই, না। বুড়ো বলে, 'এর পরে, কস্তগেরাম, বীরভূম পড়ছে।'

নতুন লোককে একটু জানান দেওয়া আবশ্যক বোধ করে। সেটাই ভব্যতা। আমি দেখি, অজয় পিছনে পড়ে থাকে, বীরভূমে প্রবেশ। নতুন ইস্টিশনে ওঠা-নামার ছোটা-ছুটি হাঁকডাক পড়ে। এক ঝাঁক সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ ওঠে। দু'-একজনকে একটু অসাব্যস্ত লাগে। বেলা হয়েছে তো, রস গেঁজেছে। হাসাহাসি দাপাদাপি কম নেই।

'কেন, আমার মেয়ে নাই? আমার চাঁপা নাই-ঘরে?'

শুনে মাহাতো আর গাজী একযোগে অট্ট হেসে মাঠ কাঁপায়। আমি ভাবি, ছোঁড়া ধরবার ফাঁদ যে মেয়ে, সে বিষয়ে আঙুরির নিজস্ব মতে ভুল নেই। কিন্তু সন্তানের মানত করে যে ফেরে সেই রাঢ়ের তারকেশ্বর থেকে, তার আবার চাঁপা নামের মেয়ে কোথায় থাকে।

হাসি শুনে আঙুরি বলে, 'তা অত হাসবার কী আছে। মেয়ে কি আমার ফ্যাল্না নাকি। এমন একটা ছেলে কি পাওয়া যাবে না?'

যাক্, সে মেয়ে যেই হোক, এটা জানা গেল, আঙুরি শাশুড়ী হয়ে আমাকে ধরে রাখতে চায়। এমন নির্যস ঠাট্টা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখব, ভাবতে পারি না। মাহাতোও সেই কথাই বলে, 'তাই বল্, তোর চম্পাবতীকে দিয়ি ছেলে ধরবি। তা, মেয়েকে আমাদের কেউ ফ্যাল্না বলতি পারবে না।'

আঙুরি আবার বলে, 'আর আজকাল জাতের কথা অত কেউ ভাবে না।'

এতখানিও আঙুরির জানা আছে। সে আরো বলে, 'ঘর দেবো, জমি দেবো, মেয়ে দেবো, কোনো কিছুতে ফাঁক রাখব না। দেখ, রাজী আছ?'

আমাকেই জিজ্ঞস করে। এমন দুর্দিনে এরকম ঘর-জামাই ব্যবস্থা মন্দ কী। হাসতে হাসতে বলি, 'আর আমি চোর না ডাকাত, সে ভাবনা নেই?'

আঙুরি বলে, 'তা আমরা বুঝব।'

তাও তো বটে। আঙুরির তাতে থোড়াই ডর। ডাকাতের রক্ত আছে তার হাতে। বেশী এদিক ওদিক করলে তার ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পারবে। জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু মেয়ে এল কোত্থেকে?'

আঙুরি জবাব দেয়, 'যেখান থেকে আসে। বাপ-মায়ের মেয়ে। দু' বছরের মেয়ে যখন, বাপ-মা দুটোই গেল ওলাওঠায়, সেই থেকে আমার কাছে। এখন বয়স তের বছর।'

তা কম নয়, উপযুক্ত বয়স বটে। আজ ও বেলাতেই তার নমুনা দেখেছি। লঞ্চে উঠতে গিয়ে সাঁকো থেকে পাঁকে পড়ে-যাওয়া সেই ভোট জড়ানো বউ। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যার ছায়া কখন অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ চলেছি, তার হিসাব নেই। খেয়াল হলো, মাটিতে ছায়ার নড়াচড়া দেখে। দেখি, মাথার ওপর প্রায় আধখানা চাঁদ, অন্ধকারের সঙ্গে লড়ে। তাতে আলোও আছে, অন্ধকারও দূর হয় না। দুয়ের এ ভাগাভাগিতে সকলই স্পষ্ট-অস্পষ্টের মাঝামাঝি খেলা করে। দূরে গাছের অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যায়। চেনা যায় কেবল মাঠের মধ্যে দু'-একটি নারকেল-সুপারি গাছ। ঝিঁঝির ডাক সহসা যেন চড়া সুরে বেজে ওঠে।

আঙুরি কখনো বলে, 'মেয়েও আমাদের দেখতে সুন্দর, তাই না? কি বলো গো?'

মাহাতোর জবাবে আবার একটা হাসির জোয়ার লাগবে, সেই আশাতে থাকি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে শুনি, মাহাতোর গলায় কেবল শব্দ বাজে, 'হুম্।'

এতক্ষণে সহসা আমার সন্দেহ হয়, আঙুরি ঠাট্টা করে না। একে সারল্য বলে না অজ্ঞানতা বলে, বলতে পারি না। কিন্তু নিজের ভাগ্যের দিকে চেয়ে মনে মনে না হেসে পারি না। কোন্ এক মাহাতো-বউয়ের কল্পনাকে যে আমি এতখানি উস্কে দিতে পারি, ধারণা ছিল না। আঙুরি কথা বলে না, প্রস্তাব করে। বলে চলে, 'ফরসা রঙ, একপিঠ চুল, এত বড় চোখের ফাঁদ...।'

আঙুরি কথা শেষ করতে পারে না। মাহাতো বলে ওঠে, 'এই দেখ্ আঙুরি, এবার থাম। পাগল হলি নাকি।'

অস্পষ্ট আলোয় দেখি, আঙুরি আমার দিকে একবার চায়, আবার স্বামীর দিকে। মাহাতো তখন তার স্ত্রীর পাশে। আবার বলে, 'সোম্সারটা ভগবান তোর মতন গড়ে

একটু অন্যরকম। এলোপাথাড়ি হাঁক নয়, ওর মধ্যেই একটু সাজানো। সবাই একটু ঠেক খেয়ে যায়। বক্তার দিকে ফিরে তাকায়।

এক বুড়ো সাঁওতাল হেসে বলে, 'ক্যানে, তুকে কী বলা হ'য়েছে।'

বক্তা বলে, 'আমাকে কী বলবি। এত চেঁচামেচি করছিস ক্যানে।'

বুড়ো চুপ করে চেয়ে থাকে। বাকীরাও তাই। কেবল গায়ক যুবার দল থেকে একটা গলা শোনা যায়, 'ল্যাখাপড়া করছে হে, বুঝছ না ক্যানে।'

দেখ, একটা তুলকালাম লাগে বুঝি। কিন্তু লাগে না। ওদিকে হাসাহাসি কথা-বার্তা সমানেই চলে। একটু স্বর নামিয়ে, এই যা। অথচ এই অধমের হাল দেখ। পড়ো বক্তার সোজা নজর আমার দিকে। যেন চোরদায়ে আমি ধরা পড়েছি। অর্থাৎ নিঃশব্দে আমাকেই সাক্ষী মানে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাতে যাই আর তখনই শুনতে পাই, 'মুখ্খুদের কী বুঝাব, বলেন তো। আজ বাদে কাল আমার শমন ধরা, আমার কি বসে থাকবার সময় আছে।'

শমন ধরা! সে আবার কী। আপনা থেকেই চোখ বড় হয়ে ওঠে। বক্তা বইখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বইটা দেখছেন তো। বাংলার মসনদ। থেটার নয়, যাত্রার বই, আমার মশায় সিরাজের পাট, সব থেকে বড়। লোকো শেডের কাজ, চার্জম্যান তো ছুটিই দিতে চায় না। পথে যেতে যেতে মুখস্ত করতে হচ্ছে। এসব কে বুঝাবে এদের, বলেন।'

আমি ঢোঁক গিলে বলি, 'তাই নাকি?'

সিরাজ ঝুঁকে বলে, 'তবে আর বলছি কেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতনের কথা জানেন তো?'

এবার থতমত। বাংলার মসনদের নায়ক সিরাজের সঙ্গে শান্তিনিকেতন কেন। একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলতে হয়, 'জানি।'

'সেখানে মেলা হয় জানেন?'

'শুনেছি।'

'আর কাল বাদ পরশু সেই মেলা। নয়ুই পোষ সেখানে আমাদের যাত্রা। তা সে কথা এদের কী বুঝাবো বলেন তো।'

পৌষ মেলায় যাত্রা! এবার হঠাৎ লোকটাকে অনেক কাছাকাছি মনে হলো। ছাতিমতলার উৎসবে যাত্রার নায়ক আমার সহযাত্রী। বাংলার মসনদের সিরাজ চলেছে সঙ্গে।

দিকে দিকে না, দেহে দেহে মনে মনে রোমাঞ্চ জাগে। শুধু যাত্রার কথায় না, যাত্রার নায়ককে দেখে। মন কবুল করো। একদিন তো এই হতে চেয়েছিলে হে। ছেলেবেলায় যাত্রা দেখতে দেখতে নয় কেবল। দেখতে দেখতে, আসর চড়াও হয়ে, একদিন তো ঘরের টান ভুলেছিলে। নাম লিখিয়েছিলে খাতায়। আহ্, তখন সে কি গৌরব, এ ছেলে 'যাত্রার দলের ছেলে।' এ ছেলে প্রহ্লাদ সাজে, পীত বসনে মুরলীধর। পদে থাকতে চির নারাজ, আপদে থেকে সুখী। ইস্কুল পালানো, ঘর পালানো, যাত্রার দলে ঘুরে বেড়ানো। অথচ এমন বলতে পারবে না, ঘরের কোণে একটু স্নেহের কোল ছিল না। বলতে পারবে না, মুখের ভাত বেড়ে নিয়ে মায়ের উদ্বেগ দুই চক্ষু ঝরঝরিয়ে যায়নি। সারা রাত আঁধার ঘরে মায়ের দু' চোখের আকুল চাওয়ায় নিরুদ্দিষ্টের কত খোঁজ। কিন্তু অই, বলে কে! ব্যাখ্যা চাও পাবে না। তবে হ্যাঁ, তারপরে কাকে বলে পিঠের ওপর ডুগডুগি বাজানো, তাও কম জানা নেই। পিঠের ওপর ডুগডুগির তালই তো তারপরে যাত্রাদলের আসর ছাড়িয়েছিল।

তবু দেখ, স্বপ্ন এখনো চোখ ভরে। রোমাঞ্চ দেহে মনে। কী যেন এক রহস্যপুরী

যাত্রার দল। সেখানে যত রহস্যমানবের ভিড়। এক বিচিত্র লোক। ছেলেবেলায় তার দরজা খোলা পেয়েছিলাম, ভিতরে ঢোকা হয়নি। সেই থেকে এক তৃষ্ণা ইহকালে গেল না। তখন স্বপ্ন ছিল, হাতে পায়ে বড় হয়ে আমিও একদিন রাজা হব, বাদশা বনব। এখন দেখ, স্বপ্ন মিথ্যা। রাজা উজির দূরস্ত। পকেটে কলম, কাঁধে ঝোলা। নবাব সিরাজদৌল্লা তোমার সম্মুখে বসে। একে লোকো শেডের চার্জম্যানের নিষ্ঠুরতা। তিনি ছুটি দিতে চাননি। তায় আবার কানের কাছে ব্যাজর ব্যাজর। এতে কি পাঠ মুখস্থ হয়। সত্যিই তো, কী বুঝাবে এই যাত্রীদের। কিন্তু লোকো শেডের চাকরিটা কিসের। একবার জিজ্ঞেস করে তৃপ্ত হতে চাই। 'কী কাজ করেন!'

জবাব আসে, 'কিলিনার।'

খুব কিলিন জবাব, বলতে পারো। কিন্তু কথা তো সেখানে নয়। কথা হলো বাঙলার মসনদ, তাতে সিরাজদৌল্লার ভূমিকা। অতএব, কিলিনার কি ফায়ারম্যান, ওসব কথা ছাড়ো। আসল কথা শোনো, 'একে তো, পালা হবে কি হবে না, তারই ঠিক ছিল না। সবই তো পরের হাতে, বুঝছেন না? মানে, মেলার কত্তাদের কথা বলছি।'

ছাতিমতলার মেলায় নানান রঙ্গ, সে কথা আগেই শুনেছি। কিন্তু সেখানে যে যাত্রাগানও হয়, এ খবর জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করি, 'মেলাতে যাত্রাও হয়?'

সিরাজের হাবভাব বেশ ভার-ভারিক্কি। রুক্ষু চুলের গোছা কান ঢেকে লম্বা জুলপির কাছে এগিয়ে এসেছিল। মাথা ঝাঁকুনির ঝটকা দিয়ে চুল সরিয়ে বলে, 'বন্ধই হয়ে গেছিল। আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। সে দেখেছি স্‌সার আমরা ছেলেবেলায়, কত বড় বড় কোম্পানি, সে কি বাঘা অ্যাকটর। আর অ্যাকটিনের কথাই বা কী বলব, বাব্বা!'

বলতে একেবারে চোখ উলটে যায়। স্মৃতির ঝলকে বেদম তরর্‌র্‌। তার ওপরে নাও, এক চোটে অনেক পেয়েছ। আগে ছিল 'মশায়', এখন পেলে 'স্‌সার', যার মানে স্যার। তারপরে কোম্পানি, অ্যাকটর, অ্যাকটিন। তবে যদি নজর ঠিক রেখে থাকো, দেখেছ, সিরাজবাবুরও গলার স্বরে সুর বাচনভঙ্গিতে একটু অ্যাকটিন অ্যাকটিন ভাব। আর, সে তো হতেই হবে গ। এমন কথা আর কী। তারপরেও শুনে যাও, বিষাদ কাকে বলে। তুমি উপলক্ষ, দেখ সিরাজের কোল-বসা চোখের নজর জানালা দিয়ে দূরে উদাস। বলে, 'সেসব কোম্পানিও নাই, সে রকম অ্যাকটিনও আর কেউ দেখবে না। হেঁজিপেজি না, বামুনের ঘরের লেখাপড়া জানা, তা বড় তা বড় লোকেরা অ্যাকটিন করত।'...

তারপরে হঠাৎ নজর ফিরিয়ে হাসে। বলে, 'সে রকম এখন পাবেন না। তখন নল ভেঁপুতে যে রকম ফুঁ দিতো, দশটা গাঁয়ের লোকে শুনতে পেতো, প্যাঁ-পোঁর—প্যাঁ-পোঁর—প্যাঁ।...এখন ও রকম দিতে গেলে বাই জম্‌মে যাবে। আর ফুলুটের কী রব ছিল, বাপস্‌। মনে হতো বাঁশীয়ালার বুকে কুড়িটা হাপর আছে।'

অবাক হচ্ছ কি না বলো। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছ তো! সিরাজ যে সেইরূপে ভাষে। অবাক খবর দিয়ে একটু ঠোঁট টিপে হাসে। মুখের দিকে চেয়ে মাথা দোলায়। একটু ঘাঁটিয়ে দেখ, অজানা বৃত্তান্তের হাঁড়ি খুলে দেবে।

আমার যে তার চেয়ে বেশী। অবাক, মন্ত্রমুগ্ধ, যা বলো সব ছাপিয়ে সিরাজ যে সেই ছেলেবেলাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সেইসব ঘুম-পাড়ানো উত্তেজনা-ভরা রাতগুলোতে। ফুলুট বাঁশীর সেই রব আর বাজে কোথায়। রাজা কাঁদে, রানী কাঁদে, আর কাঁদে ফুলুটের সুর। কোথায় বা সেই পাখোয়াজের রণদামামা, ঝাঁঝরের ঝমঝম, 'ওরে নরাধম, আয় তবে দেখি, মুণ্ডুচ্ছেদ করে তোরে দিব উচিত শিক্ষা!'

তেমন বাজনদার আর অভিনেতা এখন আছে কিনা জানি না। তবে, সেই নজর আর কোথায় পাবো। সেই শ্রবণ বা কোথায়।...তবে, তোমাকে আওয়াজ দিতে হবে না। তার আগেই সিরাজ হাত ঘুরিয়ে দেয়। বলে, 'এখন হয়েছে সব আড়ালে আবডালে। তিন দিক ঢাকা, যেন ঘরে বসে পালা হচ্ছে। পাঠ মুখস্থ করার দরকার নাই, পর্দার আড়াল থেকে সব বলে বলে দেবে। ইশারা করে দেখিয়ে দেবে। বাজনা বাজে, তাও মিনমিন করে। খালি থেটার আর থেটার। ওতে কী হয়। যাত্রাপালায় ক্ষ্যামতা চাই, কী বলেন, আঁ?'

ঘাড় নাড়তে গিয়ে ঠেক। দাঁড়াও, অন্য দিক থেকে আওয়াজ এসেছে, 'সে কথা ঠিক বটে।' আমার সঙ্গে সিরাজও ফিরে তাকায়। সেই বুড়ো, আমার পাশের লোক আকাটা গোঁফদাড়িতে ভাঁজ খেলেছে হাসিতে। বলে, 'থেটার-টেটার খালি দ্যাখন বাহার, উ কি আর আমাদিগের ভালো লাগে বাপু। আসর হবে দশজনের মাঝখানে, তবে না!'

এ যেন দরবারে জঙ্ বাহাদুর খান বাহাদুর থাকতেও ছোট উজিরের গায়ে-পড়া বাত। সিরাজের ঠোঁট বেঁকে যায় হাসিতে। যেন করুণা করে বৃদ্ধকে, কিন্তু আমল দিতে পারবে না। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'সেই কথাই—।'

দাঁড়ান জাঁহাপনা, উজিরকে অতটা হাতঝাড়া দেবেন না। বুড়ো বলে ওঠে, 'আমাদিগের রামপুরহাটের রেলের টিকেটবাবু লোচন রায়, দুটো বাজনা বাজাত, নিজের চকে দেখ্যাছি। অই যাত্তার আসরে বসেই একবার ফুলুট, একবার বেয়ালা। হাত থেকে ফুলুট নামে ত বেয়ালা ওঠে, বেয়ালা নামে ত ফুলুট ওঠে। অ মশায়, ঘাম মুছবার সোময় ছিল না গ। শিষ্যি-সাগ্‌রেদরা গামছা লিয়ে কাছে বসে থাকত, ঘাম মুছে দিতো। কী বুলব, শুনবার মতন বাজনা বটে।' এবার কী বলবে সিরাজ! বুড়ো তো সটান মানুষ। অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে কথা গিলেছে। গিলতে গিলতে পেট ফুলেছে। এখন তুমি চাও বা না চাও, উগরে দেবার পাত্র চাই। তারও তো স্মৃতিমন্থন। কিন্তু সিরাজের যেন একটু লড়াই লড়াই ভাব। ঠোঁট-বাঁকানো বিরাগের হাসিটা দেখ, নবাব সাহেব যেন বাতুলের প্রলাপ শুনছেন। খাঁটি দেশী বোলে বলে, 'বাজনদার তো আর কুস্তিগীর লয় হে। লোচন রায়ের বাজনা অনেক শুনেছি বাজায় বটে, তবে মন মজে না।'

লোচন রায়ের বুড়ো ভক্তের লড়াইয়ে মন নেই। তোমরা বলছ, মনে পড়ে গেল। চুপ করে থাকা যায় না। হাত উল্টে বলে, 'তা কী জানি, আমাদিগের ত মন মজত বাপু। তা' পরে সি গোলায়ালা কিষ্ট চৌধুরি, তার পালাও শুনেছি। যেমন গলা, তেমন চেহারাখানি। রামেও যেমন, রাবণেও তেমন।'

সিরাজ একখানি হাসি দিলে, চমৎকার। আসরে হলে হাততালি না দিয়ে কোথায় যেতে। যেন ঘসেটির অভিশাপের মুখে দাঁড়িয়ে সিরাজদ্দৌলা হাসে। বলে, 'আরে, বল না ক্যানে হে, রামপুরহাটের কিষ্টদাকে কি তুমি চিনাবে। একসঙ্গে অনেকবার দু'জনে এক আসরে নেমেছি।'

বুড়ো বলে, 'তবে আর বুলব কী, তুমার ত জানাই আছে।'

সিরাজ বলে, 'কিষ্টদার সব ভালো, তবে মোশন নাই। লড়তে-চড়তেই সময় চলে যায়। তবে হ্যাঁ, বয়সকালে ভালোই ছিল।'

বুড়োর সেই এক কথা। বলে, 'তা কী জানি। এই ত সেদিন করলে ছিন্নমস্তা। কিষ্ট চৌধুরি শিব সেজ্যাছিল। দেখবার মতো হয়েছিল বটে।'

বুড়োর কথা যেন সিরাজের কানে যায় না। গায়ে গতরে লাগে না। নবাব সাহেব একবার আমার দিকে চেয়ে তেমনি ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে। আড়চোখে দেখে বুড়োকে।

আমার কথা তো বাজে, রামপুরহাটের টিকেটবাবুর বাজনা শুনিনি কখনো। কিন্তু চৌধুরীর পালাও দেখিনি। তবে কথা শুনে একটা ছবি ভাসে। সেই ছবিতে যেন মনে হয়, লোচন রায়কেও চিনি, কিন্ত চৌধুরীকেও চিনি। বিলাতী জিনিস তো না, খাঁটি দেশী জিনিস। একের কিছু রকমফের, বাহান্ন-তেপ্পান্ন গোছের। পদ্মার ওপারে যা দেখেছি ছেলেবেলায়, অজয়ের এপারে তার চেয়ে আর কত তফাত হবে।

সিরাজের হাবেভাবে বুড়োর ভাবে-বচনে ঝিম্ খায়। সে একবার অ্যাকটরের আপাদমস্তকে চোখ বুলায়। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ভাবি, সিরাজও এবার পাঠ মুখস্ত নিয়ে বসবে। না, সে আগের কথার খেই ধরে, 'সেই কথাই বলছি. এদের কী বুঝাব বলেন। সেই দু' বছর আগে করেছি, কিছু কি মনে থাকে! মহড়া নাই, কিছু নাই, তাই ভাবলাম, যতটা পারা যায়, দেখে নিই। গিয়ে তো নাওয়া-খাওয়ার সময় পাবো না।'

তা বটে। নিশ্চুপে ঘাড় নেড়ে সায় জানাই। তবে কিনা, ছাতিমতলার পৌষমেলায় যাত্রা, এ সিরাজ কোন্ কোম্পানির, তা একটু জানতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞেস করি, 'আপনাদের কোথাকার দল?'

সিরাজের মুখে একটু বিষাদের হাসি ফোটে। বলে, 'আমাদের বোলপুরেরই দল। এখন আর নাম-ধাম কিছুই নাই। তবে হ্যাঁ, একসময়ে ছিল। বুঝেন ত, যা দিনকাল, তাতে আর যাত্রা গানে চলে না। অই যদ্দিন বে-থা না করা যায়, ছেলেপিলে না হয়, তদ্দিন চলে।'

বিষাদের কারণ আছে বটে। শিল্পীর জীবনধারণের তাগিদ। কোথায় লোকের মনোহরণ করবে, না রেলের লোকো শেডের এঞ্জিনের জাম ছাড়াতে হচ্ছে। ভাত বড় ব্যাজ, কোনো জাত রাখে না। তবু বলে, 'তবে অই, ডাক পেলে আর থাকতে পারি না। একবার শুনলেই হলো, ঠিক ছুটে আসব।'

নামের মহিমা, শুনলেই অস্থির। কিন্তু খুঁটিনাটি আরো আছে, শুনে নাও। সিরাজ আবার বলে, 'নিজেরা খরচ-খরচা করে তো করতে পারি না। কেউ একটু ডাকলে-টাকলে—তা এবার আমাদের কপাল পুড়েছে, মেলাতে ডাক পড়েছে।'

ঘাড় নেড়ে বলি, 'বোলপুরেই থাকেন বুঝি?'

'অনেককাল। বাপ ঠাকুদ্দারও আগের আমল থেকে।'

সব কথাতেই একটু ভার-ভারিক্কি ভাব। কোনো কিছুতেই অল্পস্বল্প একটু-আধটু না। গায়ের সেই আলখাল্লার মতো মুনকে ওজনের কোটে একটু ঝাড়া দিয়ে বলে, 'আমার বাপ আবার ওখানেই কাজ করত কি না, মানে শান্তিনিকেতনে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

বলে কী, হঠাৎ যেন লোকটার মূল্য বেড়ে যায় অনেক। সম্মাননীয় মনে হয়। শান্তিনিকেতন একটা নামমাত্র নয়, আরো কিছু। সেখানে কাজ করেছে, এমন একটা যোগসূত্রও যেন সকৌতুক গাম্ভীর্য এনে দেয়। হতে পারে, মনের এক সংস্কার। তবু মরামিয়ার থানের মানুষ, তাকে দেখার নজরে যেন একটু ভিন্ন রঙের ছোঁয়া লাগে। যা চোখে দেখিনি, অথচ বাঁশী শুনেছি। তাতে এক কল্পনা বিস্ময় জড়াজড়ি করে জমাট বেঁধে আছে মনের গহিনে। সেখানেই যেন একটা দোলা লেগে যায়। লোকটাকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়।

কাজের রকম পুছ করতে হয় না, বোলপুরবাসী নিজেই বলে, 'অই আপনার ঘরদুয়ারে ঘরামির কাজ করত, মাঠের কাজ করত, বার মাসের লোক ছিল। সেই আপনার কত্তা ঠাকুরের আমলে।'

কত্তাঠাকুর কে। ঠিক যেন ধরতে পারি না। পুছ-নজরে তাকাই। সিরাজ নিজেই বলে, 'মানে অই রবিঠাকুর।'

কানে যেন খচ্ করে লাগে। বহুদিনের, বহুবারের শোনা একটা নাম এই লোকের মুখে যেন বেসুরে বাজে। দেখ, শ্রবণের কী বিড়ম্বনা। একে সংস্কার বলতে পারো। এই লোকের মুখে যেন এ নাম মানায় না। কত্তাঠাকুর বেশ শোনায়। অথচ, সেই ছবিটা মনে করে নিজে যে কত্তাঠাকুর উচ্চারণ করব, ভাবতেও পারি না। তোমরা দূরের মানুষ, রবিঠাকুর বলো, তাতেই ভালো। কাছের মানুষের অমন দূর-সম্ভাষণ মানায় না। এবার কৌতূহলীর নাড়িতে টান, না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'তাঁকে দেখেছেন কখনো!'

ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ জবাব, 'কতবার!'

এ লোকের কাছে একটু-আধটুর কারবার নেই। দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই এই জবাব। লোকো শেডের কিলিনারের চোখের দিকে তাকাই। ওই চোখে কি সেই ছবিটা আঁকা আছে। রক্ত-মাংসের সেই মানুষটা, সেই মরমীর ছবি। লোকটার প্রতি ঈর্ষা আসে না। কেবল ভাবি, এ লোকটাও সেই জীবন্ত মূর্তি দেখেছে। বই লেখে না, কেতাব লেখে না, সভা-সমিতিতে বচন দেয় না। লোকো শেডে কাজ করে, যাত্রা-পালায় অভিনয় করে। অথচ আমি দেখতে পাইনি।

তারপরেও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, লোকটা কোনোদিন কথাও বলেছে নাকি ওঁর সঙ্গে। নিজেই বলে, 'আমরা তো উদিকটায় বেশী যেতাম না, ছেলেবেলায় ভয়ও করত। তবে অই মেলার দিনে, পথ চলতে ইস্টিশনে। কাছেপিঠে থাকলে যেমন দেখা যায়।'

লোকটার যেন খেয়ান নেই, কার কথা বলছে। তাতেই তার খাঁটি চালের খোঁজ ধরা পড়ে। ছেলেবেলায় সে রবিঠাকুরকে দেখেনি, তার বাবার কত্তাঠাকুরকে দেখেছে। কথার সুরের ব্যঞ্জনায় তাই গদ্‌গদ ভাব নেই। যেমন দেখা, তেমনি বলা।

এবার বাতপুছের পালা বদল। সিরাজ জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'বোলপুরে।'

'বোলপুরে? বোলপুরে থাকেন নাকি?'

সিরাজের চোখে ভ্রূকুটি, ধন্দ। তাড়াতাড়ি বলি, 'না।'

সে ঘাড় নেড়ে বলে, 'তাই তো বলি, তা হলে তো চিনতে পারতাম। শান্তি-নিকেতনে কাজ করেন বুঝি?'

'না। মেলা দেখতে যাচ্ছি।'

সিরাজ এবার আর-একটু নড়েচড়ে বসে। বলে, 'অ, তাই বলেন।'

বলতে বলতেই সিরাজের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া। জিজ্ঞেস করে, 'আগে এসেছেন কখনো?'

'না।'

'কোথা থাকবেন, তার ব্যবস্থা আছে তো?'

খবর ছিল আগেই, মেলা বড় ভারী। তিলধারণের ঠাঁয়ের যোগাড় আগে না দেখলে গাছতলাতে ঠাই নিতে হবে। রাঢ়ের এই পৌষের ব্যাঘ্রথাবার বড় ধার। মনের গরম যতই থাক, দেহের গরমে অতটা লড়াই চলবে না। তাই ব্যবস্থা একটা আগে থেকেই করা আছে। টিকে থাকলে সেই ব্যবস্থাই আছে। অন্যথায়, শুধু তেপান্তরের একলা যাত্রী তো না হে। দশের সঙ্গে একটা দশা হবেই। বলি, 'একটা ব্যবস্থা তো আছে।'

সিরাজ বলে, 'দেখবেন স্‌সার, না হলে বড় বিপাক। আজকাল যা ভিড় হতে

লেগেছে, আমাদের জন্মে দেখি নাই।'

সর্বনাশ, জন্মকালের ভর দেখায় যে। একটু খোঁজ না নিয়ে পারি না। জিজ্ঞেস করি, 'খুব ভিড় হয়?'

সিরাজের চোখে যেন ইংরাজের কামানের গোলা। মুখের খানাখন্দ কুঁকড়ে বলে, 'আরে বাস্! বোলপুরের বাজারের দর চড়ে যায়। কত লোক যে আসে, লেখাজোখা নাই। দেখবেন, মেয়েমানুষ, যে যেখানে পেরেছে, সেখানেই আস্তানা নিয়েছে।'

ভিড়ের কথা শুনে যে ভয় পাই না, তা নয়। তবু, সেই আবার ভরসা। মানুষ পাওয়া যাবে অন্তত। কেবল কি আর ছাতিমতলায় যাই। ছাতিমতলায় যারা যাবে, তাদেরও কি দেখব না একটু। তা নইলে আর মেলায় কেন। বে-দিনের নিরিবিলিতে এলেই হতো। বঙ্গদেশের রূপের রঙ্গও তো সেথায় বটে। আর ভিড়ের কথা যদি বলো, প্রয়াগের কুম্ভমেলার থেকে বেশী নয় তো। অতএব মা ভৈঃ বলো, পৌষের ডাকে চলো।

সাঁইথিয়া এল। এবার গাড়ি বদলের পালা। সিরাজ আমার সঙ্গ ছাড়েনি। বরং আমার বড় ঝোলাটার এক পাশ ধরে বলেছে, 'দু'জনেই নিয়ে যেতে পারব, চলুন।'

গাড়িতে তেমন ভিড়ের বাড়াবাড়ি ছিল না। সিরাজ আমার পাশে বসে পুছ করে, 'আপনি এলেন কোত্থেকে।'

বলি, 'বেড়াতে বেড়াতে, সাঁওতাল পরগনার দিক থেকে।'

'তাই বলেন। বোলপুরে যেয়ে দেখবেন, কলকাতার দিক থেকে কী-রকম লোক আসছে।'

তারপরে সিরাজের মুখে একটু হাসি দেখা যায়। নজর করলে, হাসি যেন একটু লাজে লাজানো। বলে, 'যাক্, মেলাতেই যাচ্ছেন যখন, নয়ুই পোষ আমাদের পালাটাও দেখবেন স্যার।'

'নিশ্চয়ই দেখব।'

মনে মনে ভাবি, কত দিন যাত্রা দেখা হয়নি। তাও আবার শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। এর স্বাদ কেমন লাগবে, কে জানে।

সিরাজের মুখে হাসি। বলে, 'তবে আপনাকে তো বললাম, রিস্যেল মহড়া কিছু নাই, পাঠ মুখস্থ নাই, অই হবে একটা রকম আর কি। ক্ষমা-ঘেন্না করে দেখবেন।'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, তা কেন। যাত্রা দেখতে আমার ভালো লাগে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা!' বেশ একটা অন্তরঙ্গ দরাজ হাসি দেয় সিরাজ। বলে, 'তা হলে আপনাকে আমিই নেমন্তন্ন করছি। বলা রইল, এসে আমার খোঁজ করবেন। গিরিনরুমে যেয়ে বলবেন, অতুলদাসকে ডেকে দাও। তা হলেই হবে। আমি আপনাকে বাজনদারদের সঙ্গে বসিয়ে দেবো।'

অতুলনীয় অতুলদাস। তবু একটু যেচে মান দিতে চেয়েছে। আর, যাত্রা দেখতে যারা যায় না, তারা কোনো দিন জানবে না, আসরের একেবারে সামনের সারিতে বাজনদারদের কাছে বসে দেখার রোমাঞ্চ কী। নেহাত ছেলেবেলাটা নেই। নইলে এ সংবাদে সুখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। এই বয়সেও তার ইশারা যেন পাই। বলি, 'যাবো।'

অতুলদাসের মুখে হাসির ঝলক, মুখের খানাখন্দ গভীর করে তোলে। বলে, 'তবে অই কথা, খুশি করতে পারব না, চেষ্টা করব।'

বলে, জোরে নিশ্বাস ফেলে উদাস গলায় আক্ষেপ করে, 'চেষ্টাই বা কী করব। আগের সেদিন নেই, আর পারিও না। তবু জানেন, বাংলার মসনদে এই সিরাজ করে দু' বছর আগেও মেডেল পেয়েছি।'

'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ। কী বলব, পেত্যেক বছরে জোর কমে যাচ্ছে গলার। একটা হাঁক যে দেবো, কী খেয়ে দেবো বলেন। অ্যাকটিনের আসল জিনিস হচ্ছে দম। দম থাকবে কোত্থেকে বলেন। যা আক্‌কারার বাজার। আপনাকে বলেই বলছি, ছেলেপিলে নিয়ে পেট ভরে খাওয়াই জোটে না।'

কেবল আমাকে কেন, সবাইকে বলা যায়। লোকো শেডের ক্লিনার তবু জীবন একরকম কাটায়। কিন্তু এখানে শিল্পী কথা বলে। তার বুকে দম নেই, গলার স্বর ফোটে না। কেমন যেন সংকোচে কুঁচকে যাই একটু। অতুলদাস অন্যমনস্ক হয়ে জানালা দিয়ে শেষবেলার মাঠের দিকে তাকায়।

ইচ্ছা করে, পুছ করি, সংসারের ওজন কত। কত ভার বহন করে শিল্পী অতুলদাস। কিন্তু তার কী প্রয়োজন হে। দুনিয়ায় যে দানা খুঁটে খায়, তার নজর দুনিয়া-জোড়া। নিজের আঁতে ভাবো না কেন। পুছ করলেই কি সব জানা যায়, 'ওহে, তোমার পুষ্যি কত!' মনে মনে দেখ, ক্লিনারের মাসান্তের মুদ্রার মুখ চেয়ে কত পুষ্যি আছে। ধুলা-রুক্ষু, ল্যাংটা আধল্যাংটা, আধপেটা খাওয়া ছেলেমেয়েদের ছবি কি দেখতে পাও না! যারা তবু হাসে, কনুই দিয়ে সিক্‌নি মোছে, ধুলা খেলে অপরাজিত। পলে পলে মরণ ঝাড়ে মন্ত্র, শুষে নিতে চায়। জীবন হেসে-খেলে আগলে রাখে, প্রাণের তেজে ডগডগায়।

তাকিয়ে দেখ অতুলদাসের দিকে। নজর যার দূরের মাঠে, কথা না বলে চুপ করে থাকে। তার চোখের চাওয়ায় দেখতে পাবে, স্নেহে উদ্বেগে টলটলায়। যাদের নিয়ে তার পেট ভরে খাওয়াই জোটে না, তাদের মুখগুলো যেন দুলদুলিয়ে ভাসে। দেখ, ওই দূরে আর একখানি মুখ, যার সঙ্গে তার ঘর-করনা মিলন-গড়ন, যার ঘোমটা খসা মুখখানি হাসিতে ভরা, চোখ দুখানি ঝাপসা ঝরা, সেই ঘরণী। তবু দেখ শিল্পী হার না মানে। কিলিনার তবু ভাঙাচোরা মুখখানি কামিয়ে, চোখের ফাঁদে কাজলের সূক্ষ্ম প্রলেপ দিয়েছে। দানার ভাবনা পিছনে রেখে, শিল্পী এখন আসরে চলেছে। ক্লিনার কেবল পেটে বাঁচে। শিল্পী বাঁচে অধরায়। তার ধরা ছোঁয়া অনেক দূরে, যখন ভাববে, 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।'...

না, তাকে ডাক দেবো না। সে থাক তার আপন ভাবে। আমিও চোখ ফিরিয়ে চাই বেলাশেষের মাঠে। যেখানে লাল মাটিতে লাল লেগেছে রাঙা আকাশের আলোয়। লাল লেগেছে ধানকাটা মাঠে, কাছে দূরের গাছে গাছে। ভূমির উঁচুতে-নিচুতে ধাপে ধাপে ছায়া, যে ছায়ার রঙ ধূসর নয়, কালো নয়, লালের ওপর যেন বেগুনী ছাপ পড়েছে। গাছগুলো অনেক চেনা অচেনা, দুইয়ে মিলে মাখামাখি ভাব। তার মধ্যে দেখ, তালপাতার ধারালো ধারে লাল কেমন শানানো, যেন অসি ঝকঝকায়। এমন কি, ছোট ছোট ছেউটি বাবলার বনেও লালের আভা। শীতের এই রাঙা আকাশের আলো যখন এমনি মাখামাখি, তখন মনে হয়, চক্ষে জল নেই, তবু যেন কোথায় একটা কাঁদন লেগেছে। এমন কি, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়তে চায় না। আর মন যেন চলে যেতে চায় কোন্‌ দূরে!

রাঢ়ভূমির এই লাল বিকেল আজ নতুন দেখা না। প্রথম দেখেছি, কয়েক বছর আগে। আজ চলেছি, ছাতিমতলার ধ্যানের আসন লক্ষ্য করে। এখনো তার রঙ রূপ কিছুই জানা নেই। কিন্তু নানানভাবে একটা ধারণা হয়েছে। আর সেই যে প্রথম দেখা, তার রঙ রূপ সবই আলাদা। কেতাবিতে সেই যে বলে, প্রথম দর্শনের প্রেম, সে দেখা সেইরকম। সে দেখার সঙ্গে একটা তোলপাড়ের দোল-দোলানো তরঙ্গ। রাঢ়ের সে রূপে ছিল এক মত্ত মাতনের ঝঞ্ঝা। সেখানেও লাল বিকাল দেখেছিলাম।

কেবল রাঙা আকাশের আলোর লাল নয়। রক্ত নিয়ে হোলি খেলার লাল। ছাতিমতলার সঙ্গে যার কোথাও মিল নেই। সেখানে ধ্যানের মৌন গাম্ভীর্য ছিল না। ছিল নাচের ছন্দে মানবলীলার অকপট শিশুর খেলা। সেথায় নরের কোলে নারী ছিল অনাবরণ ঐশ্বর্যে, আদিম খেলার মাতনে। রক্তে রমণে ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখের কোলে হাত দিতে চেয়েছি। কিন্তু তাই কি কখনো হয়! রূপ দেখবে বলে বেরিয়েছিলে। সব কি তোমার মনের মতন হবে! যেমন রূপ তেমনি দেখা।

সে যাত্রা এ পথে ছিল না। যে সাঁইথিয়া পেরিয়ে এলাম, রাজধানী থেকে, সোজা সেই পথে যাত্রা ছিল। বোলপুর নামে এক ইস্টিশন তখন দেখেছিলাম, গভীর রাত্রের নিরিবিলিতে। তখন একবার ছাতিমতলার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু যাত্রা ছিল অন্যত্র। ইস্টিশনের শেষ ছিল সেখানে, যেখানে একটু আগে শোনা, ফুলুট আর বেয়ালা বাজিয়ে লোচনবাবু ছিলেন টিকেটবাবু, সেই রামপুরহাটে। তখন আমার কাছে যতটুকু বোলপুর, ততটুকুই রামপুরহাট। শেষ রাত্রের প্রায় অন্ধকারে গিয়ে নেমেছিলাম। ইস্টিশন তখন ঘুম জড়ানো। গাড়ির আওয়াজে একবার উঠে বসে আবার পাশ ফিরে শোবার মতন। এখন নাকি সেখানে অনেক আলো, অনেক ঝলক। তখন তত নয়। যাদের সঙ্গী ছিলাম, সহযাত্রীরা রাজপরিবারের লোক। এখন রাজা শুনলেই যদি চোগাচাপকান অসি দেখ, তবে নাচার। আবার যিনি রাজপুরুষের বংশধর, তাঁর গায়ে একখানি মোটা হাফশার্ট, মোটা কাপড় পায়ের কবজি ছাড়িয়ে নামেনি। হাতের কব্জিতে একখানি যেমন-তেমন ঘড়ি, মোটেই রাজরাজসিক নয়। পায়ে ফিতে বাঁধা ধ্যাবড়ামুখো কালো জুতা। সারা রাত কচকচিয়ে পান চিবানোর দাগ কেবল ঠোঁটে কষে দাঁতে ছিল না, ছিটাফোঁটা জামাতেও ছিল।

তবে হ্যাঁ, চেহারার কথা যদি বলো, যাকে বলে চোখ ঝলসানো গোরা, সে রাজপুত্রের তাই ছিল। সে রঙের নাম গোরা না, আগুন বলা যায়। চোখের তারায়, মাথার চুলে কালোর ঝিলিক কম। চোখের তারায় আশমানী নীল ঝলক, চুলে রাঙা ছাপ। বুকের ছাতি মাপতে চাইলে, দু'হাতে বেড় পাওয়া দায় ছিল। পরিচয়ে রায় মশাই। পেশায় সেই লোচনবাবু, ইনিও একজন টিকেটবাবু ছিলেন রেলের অন্য সীমানার। তা বলে, রাজপরিচয় মিথ্যা না। এবার সেই রাজ্যে যাত্রা, যার নাম মলুটি। ইনি সেই রাজ্যের রাজাদের ছয় তরফের, বড় তরফের বড় কর্তা। সঙ্গে গৃহিণী। দিনকাল থাকলে, বড় তরফের বড় রানী বলতে হতো। তখন প্রবাসে রেল কলোনি-বাসিনী, টিকেট কালেক্টরের গিন্নী। তাঁকে ঘিরে কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে, যাদের চোখে তখন শেষ রাতের ঘুম। রাঢ়ে প্রথম যাত্রায়, তাঁরাই আমার সহযাত্রী।

কার্তিকের শেষরাত, একটু শীত-শীত ভাব। সবাই মিলে ইস্টিশনের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখেছিলাম, দুটো কালো কুচকুচে মনুষ্যপ্রাণী কোত্থেকে ছুটে এসে একেবারে রায় মশাইয়ের পায়ে পড়েছিল। রায় মশাইয়ের আগুন রাঙা মুখে রাঙা হাসি ফুটেছিল। খাঁটি মলুটির ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কে রে, সানা বটে?'

একজন জবাব দিয়েছিল, 'হ'য় গ, কত্তা।'

'উটি কে বটে, চিনতে লারছি?'

তখন উটি জবাব দিয়েছিল, 'অ্যাই দ্যাখ গ, বড় কত্তা আমাকে চিনতে লারছে। আমি তো লারান।'

লারান! অর্থাৎ নারায়ণ। সেই প্রথম উঁচু রাঢ়ের বুলি শোনা। শ্রবণ যত অবাক উৎকর্ণ, আমার চোখের ফাঁদ তত বড়। সানা নাম এর আগে কখনো শুনিনি। লারাণ তবু শোনা শোনা। দু'জনেই তখন গিন্নীকে প্রণামে ব্যস্ত। রাজা তখন বলছিলেন, 'অ, তু আমাদিগের গদাইয়ের ব্যাটা?' লারাণ যেন এমন হাসির কথা কভু শোনেনি।

খ্যালখ্যাল করে হেসে বলেছিল, 'তবে না ত কী গ!' সানা আর লারান, তার মধ্যেই অপরিচিতকে দেখে নিচ্ছিল। ওদের চোখের রঙ যে কী ছিল, বুঝতে পারিনি। হলদে মনে হয়েছিল। আর অমন কালো, ডগমগিয়ে বলতে পারব না, কালো তা সে যতই কালো হোক, কালো হরিণ চোখ তো দেখিনি। মনে হয়েছিল, দু' হাত সরে গেলে, সেই শেষ রাতের আঁধারে আর চোখে দেখতে পাবো না।

বড় কর্তা তখন বলেছিলেন, 'চিনতে লারলে আর দোষ কী বল্। বছরে একবার করে আসা, সব ভুলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে।'

সানা বলে উঠেছিল, 'তা ক্যানে হবেক নাই। কালে ভদ্দে আসা। নেহাত কী যে, মা কালীর টানে তবু একটা বাঁধন।'

বড় কর্তা হেসে বলেছিলেন, 'তা যা বুল্যেছিস। গাড়ি ক'খানা এনেছিস!'

সানা-ই জবাব দিয়েছিল, 'ক্যানে, দু'খানা। চিটিতে তাই লিখ্যাছিলেন যে।'

'হুঁ হুঁ, অই তাই জিগেসাঁ করছি।'

লারান ছেলেমানুষ যুবা। সে বেশী কথা বলেনি, খালি হাসছিল। সানা আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ই বাবুটো কে বড় কত্তা, চিনতে লারছি?'

বড় কর্তা বলেছিলেন, 'বেড়াতে এসেছে, আমাদিগের কালী পুজো দেখবে।'

আমি তখন রাজা-প্রজার কথা শুনছিলাম। রাজা-প্রজার অমন ভাব ভাষা আগে কখনো দেখা জানা ছিল না। এমনি দু'-চার কথার পর, সবাই গাছতলাতে গাড়ির কাছে গিয়েছিলাম। সে গাড়ির নাম গো-শকট। বলদগুলো আলাদা বাঁধা ছিল। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে, গাড়িতে বলদ যুতে অন্ধকারে যাত্রা শুরু হয়েছিল। এক গাড়িতে কয়েকটি শিশুকে নিয়ে গৃহিণী। আর এক গাড়িতে, আমি আর বড় কর্তা। তাঁর কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু। দুই চাকা গাড়ি। সামনে পিছনে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। একেবারে পিছন দিকে বসেছিলাম, তাই আকাশটা তবু চোখের ওপর ছিল। শুকতারাটা চিনতে পারিনি। কিন্তু নাম-না-জানা সেই তারাটা দেখেছিলাম, যেটা অনেক নিচে, চরকির মতো পাক খেয়ে ঘোরে। আর ঝিলিক দিয়ে দিয়ে ওঠে লাল হলুদ নীল রঙে। তাকে দেখে, বুঝতে পেরেছিলাম, যাত্রা পশ্চিমে।

মাঝে মাঝে দেখেছিলাম, চোখের সামনে পাহাড়ের মতো উঁচু কালো রেখা। গরুর গাড়ি ধীরে ধীরে সেইখানে উঠছিল। আবার নিচে গড়িয়ে নামছিল। কখনো কখনো, দূর অন্ধকারে, আকাশের তারার গায়ে ঠেকানো খোলা জায়গায় কী যেন অস্পষ্ট হয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। আন্দাজ করেছিলাম, ধানের খেত। আর চিনতে পেরেছিলাম তারা-ছিটানো আকাশতলায় তালগাছের সারি। কখনো কখনো জলের শব্দ। গরুর পা আর গাড়ির চাকার ছপ ছপ চল্কে যাওয়া। সেই সঙ্গে বিশেষ করে সানার গলায়, বলদ শাসনের ভাষা, 'ই দ্যাখ, দ্যাখ ক্যানে, কানার মরণ দ্যাখ গ—। অরে, ও রাস্তা ছেড়্যা যাল্ছিস কুথা, আঁ? আঁই আঁই আঁই, হোইত্তেরি...।' তারপরেই পাঁচনবাড়ির ঠাস্ ঠাস্।

সেই অন্ধকার, সেই আকাশ নক্ষত্র, সেই চড়াই উৎরাই, অস্পষ্ট ধানখেত, তালের সারি, বিচিত্র ভাষা আর শব্দ, সব মিলিয়ে, আমি যেন ছিলাম এক স্বপ্নের ঘোরে। কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা জবাব আপন মনে চলছিল; কোথায় চলেছি? এক নতুন রাজ্যে, নাম তার মলুটি। কখন একসময়ে যেন বড় কর্তা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, 'মলুটি কথা কোথা থেকে এল জানো? এল, মৌলীক্ষা থেকে।'

যখন বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন রায় মশাইয়ের ভাষা আলাদা। তখন এক রঙের কথা নয়, এক সীমানায় বাঁধা নয়। তখন সীমাহীন সার্বজনীন বাঙলা। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মৌলীক্ষা কী?'

বলেছিলেন, 'দেবী। রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী, মা মৌলীক্ষা রাজবংশের দেবী, গ্রাম্য দেবীও তিনিই। ইনি তান্ত্রিক দেবী। মৌলীক্ষা থেকে গ্রামের নাম মলুটি! শোনো, তোমাকে রাজবংশের কাহিনী বলি।'...

গাড়ি চলেছিল, ধিকিয়ে ধিকিয়ে, উঁচুতে নিচুতে। আকাশ-জোড়া তারা ছিটানো। বাতাসে শীতের আভাস। তখন এক রূপকথা শুনেছিলামঃ

যদি রাজা না থাকে, তবে রাজার কথা বলবে কেমন করে। তারও আগে বলো, রাজা কেমন করে হয়। শোনো, এইরকম করে হয়। সে অনেক—অনেক—অনে-ক দিনের আগের কথা। প্রায় তিন শো বছর হবে। দিল্লীর বাদশা তখন ছোটখাটো কেউ না, মস্ত শাহানশা।

সেই সময়ে এই রাঢ়ের এক গ্রামে থাকত এক ব্রাহ্মণ। তিনি বড় গরীব। সামান্য ধান জমি, তাতে বছর কুলায় না। কোনোরকমে তবু দিন গুজারি চলে, দুধে আর ভাতে। দুধ কোথা থেকে আসে? না, ব্রাহ্মণের গরু ছিল কয়েকটি। এমন অবস্থা ছিল না যে, রাখাল রেখে গরু চরায়। ছেলেই গরু চরাত মাঠে মাঠে। ঘরে তো গরুর খাবার ছিল না। মাঠের ঘাসেই পেট ভরানো।

তা সে যাই হোক, ছেলে গরু চরিয়ে বেড়ায়। অবসর সময়ে পাঠ নিয়ে থাকে। সেই ছেলে, গরু চরাতে চরাতে একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই গাছতলাতে গিয়ে শুয়েছিল। তখন গাছতলাতে ছায়া ছিল। তারপর ছায়া সরতে সরতে রোদ ছেলের মুখের ওপর এসে পড়ল। আহা, সারাদিনের রাখালি কাজ, তাতে একটু নিদ্রা! রোদের মায়া-দয়া নেই, মুখের ওপর এসে পড়ল। কে একটু ছায়া দেবে?

দেবে, যার দেবার। সে-ই ছায়া দিতে এল, কালো বিশাল নাগ, তার প্রকাণ্ড ফণা মেলে। কোথা থেকে এল, সে কথা জিজ্ঞেস করো না। ছেলের মাথার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে ছত্রধর হলো। ছেলে তখন সুখে ঘুমোতে লাগল, কিছু জানতে পারল না।

তারপরে—তারপরেতে, সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক সন্ন্যাসী। তিনি দেখতে পেলেন, কালীয়া নাগ ফণা ছড়িয়ে ছত্রধর হয়েছে। তখন তিনি আর চলতে পারলেন না, কথা বলতে পারলেন না। প্রাণ ভরে মুগ্ধ হয়ে সেই কচি মুখখানি দেখতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, 'এ তো যে-সে ছেলে না। এ তো যেমন-তেমন ব্যাপার না। এই ভাগ্যমন্ত ছেলেটি কে জানতে হয়।'

তাই তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন। তারপরে সেই ছেলে নড়েচড়ে উঠল। ঘুম ভাঙতে চলেছে তার। অমনি কালো নাগ ফণা গুটিয়ে নিশ্চুপে এক দিকে চলে গেল। ছেলে ঘুম থেকে উঠে বসল। তখন সেই দণ্ডী সন্ন্যাসী এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাছা, তোমার বাড়ি কোথায়, আমাকে একবারটি সেখানে নিয়ে চলো।'

ছেলে ভাবে, ইনি আবার কে! তবে সন্ন্যাসী মানুষ, বাড়ি যেতে চান, ভালো। সে তাঁকে নিয়ে বাড়ি গেল। ছেলের মা ছিল ঘরে। দণ্ডী সাধু মাকে বলল, 'আজ আমি এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। তাই বলছি, তোমার এই ছেলে রাজা হবে। তার আগে ওকে আমি দীক্ষা দেবো। দীক্ষা দিয়ে সীমানা না বাঁধলে, ওর বিপদের সম্ভাবনা আছে। কাশীতে আমার বাস।'

সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে মা খুশি হলেন। সন্ন্যাসী তখন সেই ছেলেকে দীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'সময় হলে আমি নিজেই আসব।'

তারপরে—দিন যায়, রাত্রি আসে, মাস যায়, বছর ঘোরে। ছেলে একদিন তেমনি গরু চরাচ্ছে। হাপুস করে এক পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে বসে একেবারে ছেলের

হাতে। আহা, কী সুন্দর পাখি! যেন সোনা দিয়ে পাখা মোড়ানো, সোনালী এক বাজ! তার এক পায়ে আবার একটা ছেঁড়া সোনার সরু শিকল।

কার পাখি, কোথা থেকে এল? তা কে জানে! যেখান থেকেই আসুক, এমন সুন্দর পাখি সে ছাড়বে না। শিকল ধরে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এল।

এদিকে কী হয়েছে, দিল্লীর বাদশা তখন সফরে বেরিয়েছে। তার তাঁবু পড়েছে সেই গ্রামের বাইরে, বন-মাঠের ধারে। আসলে সেই সোনালী বাজপাখি বাদশার নিজের। বড় আদরের পাখি, সোহাগের ধন। কোন্ বিদেশ থেকে নাকি অনেক দামে কেনা। কিন্তু দাম দিয়ে তার যাচাই হয় না, বাদশার সে চোখের মণি। নিজের হাতে খাওয়ায়, কাছে কাছে রাখে।

সেই বাজ হারিয়ে তো বাদশার আহার-নিদ্রা গেছে। খোঁজ খোঁজ, কোথায় গেল সোনার বাজ। লোক-লস্কর সেপাই, সবাই ছুটোছুটি করে। কোথাও খুঁজে পায় না। এদিকে বাদশা সকলের গর্দান নিয়ে টানাটানি করে। হয় বাজ, নয় জান। কিন্তু ছেলে তো সে খবর জানে না। সোনালী বাজকে সে খাওয়ায়। চালার বাতার খাঁচায় ঝুলিয়ে দোল দেয়।

তখন বাদশা ঘোষণা করে, যে তার বাজ এনে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন আর সেপাই লস্কর নয় কেবল, দশটা গাঁয়ের লোকে খোঁজে লেগে যায়। লাগতে লাগতে সেই বাজ-পাওয়া ছেলের মামা বোনের বাড়িতে আসে। এসে দেখে ভাগ্নের হাতে সোনালী বাজ। মামা অমনি সেই বাজ নিয়ে বাদশার কাছে যেতে চায়। কিন্তু ভাগ্নে বেঁকে বসে। না, বাজ সে কাউকে দেবে না।

মামা দেখল বেগতিক। তখন সে ভয় দেখায়। ছেলের মাও ভয় পায়, বলে বাদশা বলে কথা, প্রাণ রাখবে না। ফিরিয়ে দেওয়াই ভালো। ছেলে তবু বাঁকা, কথা শোনে না। মামা বুঝল, ছেলে বড় ত্যাড়া। তখন পুরস্কারের কথা বলে বাজ সহ ভাগ্নেকে নিয়ে গেল বাদশার তাঁবুতে। থাক, নিজের না হোক, ভাগ্নেরই পুরস্কার লাভ হোক।

বাদশা তো বাজ ফিরে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। ছেলেকে কী দিয়ে খুশি করবে তাই ভাবে। ভেবে বলে, 'বেশ, আমি খুশি হয়ে বলছি, কাল সূর্যি উঠলে তুমি ঘোড়ায় চেপে ছুটবে। যতখানি পাক দিয়ে ঘুরে আসতে পারবে, সব তোমাকে দান করব।'

পরদিন যেমনি আকাশে সূর্যি উঠল, ছেলে ছুটল ঘোড়া নিয়ে। সাঁঝবেলাতে ছেলে যখন তাঁবুতে ফিরে এল, বাদশা তখন খানা খেতে বসেছে। ফারমান তৈরি ছিল। ফিরে এলে বাদশা সেই দানপত্র হুকুমনামায় দস্তখত করে দেবে। কিন্তু খেতে বসেছে, হাতে খাবার লেগে আছে। কলম ধরা যায় কেমন করে। তার দরকার নেই, নিয়ে এস ফারমান। দস্তখতের জায়গায় এঁটো হাতে পাঞ্জার ছাপ দিয়ে বললেন, 'এই আমার দস্তখত।'

এই পর্যন্ত বলে একটু ক্লান্ত হয়েছিলেন বড় কর্তা। ইতিমধ্যে ভোরের আলো ফুটেছিল। আকাশের পুব গায়ে লালের আভা লেগেছিল। দেখেছিলাম বড় কর্তার রাঙা মুখে স্বপ্ন জড়ানো। নীল চোখের নীল মণিতে যুগ-যুগান্তের ছায়া। কোলে তাঁর টিকেটবাবুর অপুষ্ট ঘুমন্ত শিশু।

সম্ভবত কিছু পথ আসা গিয়েছিল চওড়া বাঁধানো সড়ক ধরে। ভোরের আলোয় দেখেছিলাম, চওড়ায় এক গরুর গাড়ির পথ। যেন রক্তে-ধোয়া লাল পথে গরুর গাড়ির চাকার গভীর দাগ। ভাঙাচোরা এবড়ো-খেবড়ো, কাঁকর-পাথরের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে নদী-খাতের মতো গর্ত। তাতে কোথাও গেরুয়া-রঙ অল্প জলের ধারা কুলকুলিয়ে যায়। মনে হয়েছিল, গরুর গাড়ি যেন দলামোচড়া হয়ে চলেছে। লাফিয়ে, কাত হয়ে,

গোঁত্তা মেরে, একটা প্রকাণ্ড বিদঘুটে পশুর মতো। যার ওপরে বসে আমার হাড়গোড় মড়মড়িয়ে যাচ্ছিল। অথচ, প্রায়ই ধানের খেত আকাশতলায় ঢেউ খেলছিল। তবে সেইসব ধানের খেত তেমনি এলোমেলো, উঁচু-নিচু।

বড় কর্তা হেসেছিলেন, যেন স্বপ্নে বলেছিলেন, 'বাদশার হাতের ছাপ দেওয়া সেই ফারমানটা আজও আমাদের কাছে আছে। ফারসীতে লেখা, তখনকার দিনের কাগজ। পুরনো হয়েছে, কিন্তু এখনো বেশ শক্ত।'

বাদশার ফারমান, এঁটো হাতের পাঞ্জার ছাপ। চোখে দেখিনি কখনো, কৌতূহলে যেন মরে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমাকে একটু দেখাবেন?'

বলেছিলেন, 'কেন দেখাব না! ওটা তো আমার বাড়িতে আমার কাছেই আছে। আমরা বড় তরফ কিনা, তা-ই!'

মনের কি ব্যাপার দেখ, ভেবেছিলাম, বাদশা কী খাবার খেয়েছিলেন, কেমন তার রঙ। বাদশা যখন, কাবাব কোপ্তা নিশ্চয়। কাগজে কি ঠিক সেই রঙ এখন আর আছে! আর সেই গন্ধ! সেও আবার কথা বটে, বাদশার খাবারের গন্ধ নেবে কী হে। নিষিদ্ধ খাবার না? তা হলে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা সেই অস্পৃশ্য দলিল হাত পেতে নিয়েছিলেন কেমন করে? জাত যায়নি?

সে কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। দেখেছিলাম, রাজা তখন আপন ঘোরে। অথচ, সেই সময়ে মনে পড়েছিল আর এক কিস্যা। বইয়ে পড়েছিলাম, তা বলে কবুল করতে পারব না সে কিস্যা ঐতিহাসিক। যার থেকে প্রবাদ হলো 'নবাব খানজা খাঁ, সেই নবাব খান জাঁহান খাঁ-এর দরবারে নাকি কাজ করতেন দুই ব্রাহ্মণ। নবাব তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণ করেছিল। তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জিভ কেটে বলেছিলেন 'দুর্গা দুর্গা, তাই কি কখনো হয়! সে খাদ্য আমাদের স্পর্শ করতে নেই, এমন কি ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। তাতেও পতিত হতে হয়। নবাব যেন মার্জনা করেন।'

নবাব তখন চালাকি করল, মনে মনে বলল, 'দেখাচ্ছি তোমাদের বামনাইগিরি।' এমন জায়গায় নিষিদ্ধ মাংসের রান্নার ব্যবস্থা করল, যেখান দিয়ে সেই ব্রাহ্মণদের যেতে হয়। আড়ালে রান্না চাপানো হলো, ভুরভুর করে তার গন্ধ ছড়াল। রসুনে পেঁয়াজে মসলায় ঘিয়ে যাকে বলে খোশবু। ব্রাহ্মণেরা যাবার পথে গন্ধ পেলেন। নবাবকে গিয়ে বললেন, 'কাছেই কোথাও রান্না হচ্ছে, তার গন্ধ পেলাম।'

নবাব বলল, 'পেয়েছেন? চলুন, তা হলে দেখিয়ে নিয়ে আসি কী রান্না হচ্ছে।'

দেখতে গিয়ে তো ব্রাহ্মণদ্বয়ের চক্ষু কপালে। খান জাঁহান খাঁ হেসে বললেন, 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। সংবাদটা আপনাদের সমাজপতিদের জানানো দরকার।'

জানানো হলো, তাঁরা পতিতও হলেন। তাই যখন হলেন, তখন নবাবের নিমন্ত্রণ রাখায় আপত্তি কী। নিষিদ্ধ মাংস তো খাওয়া হচ্ছে না। আর এঁদের থেকেই নাকি পীরালী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। সাচ্চা ঝুটা পুছ করো না। এই অধম ইতিহাসের কবুল খেতে পারবে না।

আমি বড় কর্তা রায় মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তারপর?'

বড় কর্তা বলেছিলেন, 'তারপর অনেক কথা। অনেক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, দেশে দেশে ছুটোছুটি। শেষ পর্যন্ত এই মলুটিতে। 'রাজা' আখ্যা পেয়েছিলাম দিল্লীর বাদশার কাছ থেকেই। এখনো সেই নামটা ঘোচেনি, আমাদের তো বাবা, দেখতেই পাচ্ছ।'

বলে নীল নীল শিরা জাগা অপুষ্ট গোরা শিশুটির দিকে তাকিয়েছিলেন। কী ভেবেছিলেন, কে জানে। বোধ হয় টিকেট কালেক্টর তাঁর কোলে আর একজন রাজার বংশধরকে দেখেছিলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলেছিলেন, 'তবে হ্যাঁ, যদি মনে করে থাকো, রাজাদের মস্ত মস্ত বাড়ি দেখবে, চকমেলানো, থাম জোড়া জোড়া

অট্টালিকা, তা হলে ঠকবে। মলুটির রাজারা নিজেদের বাস্তু কখনো পাকা করেনি। সব মাটির দেয়াল, খড়ের চাল।'

সে আবার কী। রাজার বাড়ি, অথচ মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। এমন তো শুনিনি। মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি। বড় কর্তা রাঙা মুখে হেসে বলেছিলেন, 'প্রথম আমলে হয়েছিল। তারপরে একবার নতুন রাজবাড়ি ধসে পড়েছিল। তাতে অনেকেই মারা গেছিল। সেই থেকে, মৌলীক্ষার আদেশ, পাকা বাড়ি আর কোনোদিন হবে না। হয়ও নাই।'

বাড়ি কেন ধসেছিল, মৌলীক্ষা কেন আদেশ দিয়েছিলেন, এ দুয়েতে জোড় মেলাতে যেতে তুমি এক আদি বংশের রূপকথা শোনো। বড় কর্তা আবার হাসেন। বলেন, 'তার জন্যে ভেবো না যে, রাজারা ইঁট গেঁথে কিছু করে নাই। করেছে, পূজার দালান করেছে, নাটমন্দির করেছে। মলুটি হলো মন্দিরের দেশ। যত ঘর, তত মন্দির। তার চেয়ে বেশী। পাকা মন্দির, কোটি কোটি ইঁট আছে মলুটিতে। আর হাজার হাজার ইঁটে মূর্তি ফুল আঁকা আছে।'

বলেই হঠাৎ চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। বলে উঠেছিলেন, 'ওই যে দেখা যায় মলুটি। আমরা এসে পড়েছি।'

গাড়িটা তখন গড়িয়ে নামছিল নিচে। মাজড়া পাথরের মতো কিম্ভূত আকৃতি ভূমি। পাথরই আসলে, যেন একটা অতিকায় জীব রক্তাক্ত হয়ে পড়ে ছিল উপুড় হয়ে। গাড়িটা সেই রক্তাক্ত বাঁকা পিঠের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে নামছিল। তখন রোদ উঠেছিল। ভূমির রক্তাভা দেখে যেন চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।

গাড়ির ছই শক্ত করে ধরে, চোখ তুলে দেখেছিলাম। ঘর নয়, বাড়ি নয়, গাছপালা নয়। উৎরাইয়ের পরে, চড়াইয়ের গায়ে, প্রথম দেখেছিলাম মন্দির। লাল রঙ মন্দির, গায়ে তার অস্পষ্ট কারুকার্য ছাপ।

তারপরে মলুটিতে কত মন্দির দেখেছিলাম। কিন্তু তার আগে উপুড় হয়ে পড়া মাজড়া পাথরের লাল গা বেয়ে গাড়ি যেভাবে নেমেছিল, তাতে ছইয়ের মুখছাটের কাণ্ডতে কপাল বাঁচাতে পারিনি। ঠোঁটে লেগেছিল জবর। যেন কাঠপিঁপড়ের হুল ফোটানো দংশনে একখানি ডাঁশা লাল বৈঁচিফল ফুটেছিল ঠোঁটে। রাজা রায়মশাই ডুকরে উঠেছিলেন, 'আহা, বাবা চোট পেলে?'

বলে আগুন-রাঙা হাতখানি আমার মুখে মাথায় বুলিয়েছিলেন। তারপরে কি আর চোট বলে কিছু থাকে! আমি তো তখন আর এক মফস্বল শহরের রেল-ইস্টিশনের টিকেটবাবুকে দেখছিলাম না। দেখছিলাম মলুটির রাজাদের বড় তরফের রাজবংশধর। স্নেহে বিগলিত মুখ যদি দেখে থাকো, তবে সেই রাঙা মুখে দেখেছিলে। কথার সুরে ভাবেও সেই টলটলানো তরঙ্গ। সেই যে বলে না, বাবা ছাড়া কথা নেই, বাছা ছাড়া সম্বোধন নেই, সেইরকম। তা বলে ভেবো না, দত দিয়ে কথা। একেবারে আঁত গলানো বচন। বলেছিলাম, 'না, এমন কিছু—।'

দাঁড়াও হে, কথা শেষ করবে কী, তার আগেই বড় কর্তার গলায় হাঁকাড় উঠেছিল, 'অই, আরে অই সানা, সামাল দে ক্যানে। লোক খুন করবি নাকি।'

হাঁকাড় মানে গর্জন না। সেই যে তালপুকুরে ঘটি ডোবে না, সাতপুরুষ আগের ঘিয়ের গন্ধে হাত চাটে, বারো শরিকের জমিদারি, তেরো নম্বর কর্তা তর্জন গর্জন করেন, সে রকম না। উদ্বেগে হাঁকাড় দিয়েছিলেন। অতিথির চোট লাগাতে মনেতে চোট পেয়েছিলেন যে।

প্রজাও সেইরকম। পথের পাথুরে ঢলে যে বলদ সামালের চেষ্টা করেনি, তা নয় আওয়াজেই তার প্রমাণ ছিল, 'ই দ্যাখ হে, দ্যাখ দ্যাখ দ্যাগ, শোরের গোঁ ধরাল্‌ছে,

ইঃ ইঃ...।' ইত্যাকার। বড় কর্তার কথা শুনে জবাব দিয়েছিল, 'অ গ বড়কর্তা, বুলেন ক্যানে, হারামজাদারা ঘরের গন্ধ পেয়েছে যে। গাঁয়ে ঢুকছে কি না।'

নইলে আর ঘরমুখো গরু বলেছে কেন। মানুষের কথাই বলো, সারা দিনের শ্রম সেরে ঘরের মুখে তার ঢল নামে। পশুদেরও সেইরকম। তখন যত তাড়াতাড়ি হয়, কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে টুকুস খড়ে-জলে মুখ দিতে হবে। যত নজ্দিক, তত অসবুর।

রায়মশাই হেসেছিলেন। এমতাবস্থায়, প্রজাকে কী বলবেন, বলদকেই বা কী। বলেছিলেন, 'তোমাদের তো অভ্যাস নাই এ রকম। আমরা ঠিক সামলে নিতে পারি।'

ওদিকে তখন প্রচণ্ড হাঁক উঠেছিল, 'যা যা যা, চল্ চল্ চল্ চল্ ক্যানে।'

দেখেছিলাম, সেই যে সেই গদাইয়ের বিটা লারান, তার গাড়ি আমাদের আগে আধখানা চাকা জলে ডুবিয়ে আছোড়-পাছোড় করছে। সেই গাড়িতে রায়গিন্নী ও সন্ততিগণ। অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, ই দ্যাখ, আবার জল এল কুথা থিক্যা হে। যেন কলকলিয়ে যাচ্ছিল, আওয়াজে ছলছলানো। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'খানা নাকি?'

রায়মশাই বলেছিলেন, 'না বাবা, খানা না, কাঁদর।'

কাঁদর! জলাশয়ের তেমন নাম আগে কখনো শুনিনি। সে বিষয়ে রায়মশাইয়ের ধ্যান ছিল। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'অই তোমার, নদীর মতন আর কি। কাছেপিঠে পাহাড় আছে ভো। সেখান থেকেই একটা ধারা নেমে এসেছে। এখানকার লোকেরা কাঁদর বলে, নদীও বলে। মল্টির লোকেরা বলে সতীঘাট।'

মলুটিকে 'মল্টি' সেই প্রথম শুনেছিলাম। বাঙালীর যেমন চরিত্র, সবকিছুকেই সে তার একটা চল্তি নামে ডাকে। তার মধ্যে আপন বোধের পরিচয়। কৃষ্ণ যেমন কেষ্ট, বিষ্ণু যেমন বিষ্টু। অমন করে না বললে যেন বলার যুত হয় না। কিন্তু সতীঘাট কেন? পুছ করার আগেই খবর দিয়েছিলেন, 'এই কাঁদরের ঘাটে সতীদাহ হয়েছিল। সেই সতীদাহ না যে, স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরা। কী বলব বাবা তোমাকে, সে যেন তার থেকে বেশী। বলি শোনো।'...

তখনো বুঝতে পারিনি, কোন্ রাজ্যে গিয়েছি। যে রাজ্যে কিংবদন্তীর শেষ নেই। সেথা কিংবদন্তীর মায়ের দেশ, অজস্র তার সৃষ্টি। এদিকে যখন সানা এই গাড়ি সামলে রেখেছিল লারানের অপেক্ষায়, কেননা লারানের গাড়ি কাঁদর না পেরোলে সানার প্রতিবন্ধক, তখন বড় কর্তা বলেছিলেন, 'আমাদের বংশে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম রাখড়চন্দ্র। তিনি সুখ সংসার স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে পুরীতে জগন্নাথদেবের কাছে ঠাঁই নেবেন, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। রানীকে বললেন, ছেলেরা রইল, সংসার দেখবে, রাজত্ব দেখবে; তুমি দেখবে তাঁদের। রানী বললেন, তা হয় না। আপনাকে ছাড়া আমার জগৎ-সংসারে কিছু নাই। যেতে চান, আমাকে নিয়ে চলুন। আপনাকে ছেড়ে আমি একদিনও বাঁচব না। রাজা তা শুনলেন না। তিনি যাবেনই। তখন রানী বললেন, বেশ যাবেন, তবে সামনের পূর্ণিমা পর্যন্ত থেকে যান, এই প্রার্থনা। রাজা সে কথা রাখলেন।...তারপরে সেই পূর্ণিমা এল। রানী ভোরবেলা স্নানশুদ্ধ হয়ে চেলি পরে বাড়ির তুলসীতলায় গিয়ে শুলেন। ঝিকে বললেন স্বামী আর ছেলেকে ডেকে দিতে। তাঁরা যখন এলেন, তখন তিনি স্বামীকে বললেন, আমার মাথায় পা ছুঁইয়ে আপনি বসুন, ছেলেরা আমাকে ঈশ্বরের নাম শোনাক। আমার যাবার সময় হয়েছে, বেশী দেরি নাই।

'রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর কথামত কাজ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি যাও? রানী বললেন, আজ পূর্ণিমা, কাল আপনি চলে যাবেন। তখন আর আমি থাকব না। আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।...এ কথা বলে রানী সজ্ঞানে মারা গেলেন।

তখন তাঁকে এই কাঁদরের ধারে এনে দাহ করা হয়েছিল, হুই-ই ডান দিকে, পশ্চিমে। সেই থেকে সতীঘাট, সেই থেকে সতীঘাটই মলুটির শ্মশান, বুঝলে বাবা, সেই হলো মলুটির গঙ্গা।'...

দেখেছিলাম রায়মশাইয়ের নীল চোখে দূর আকাশের বিস্তার। সেথায় স্বপ্নের খেলা, রূপসাগরের কত না ঝিকিমিকি। সে মানুষ টিকেটবাবু নন, যিনি গেট আগলে চাপকান দেখিয়ে টিকেট, মাসুল আদায় করতেন। মলুটির সেই এক রাজা রাখড়চন্দ্রের পায়ের ধ্বনি, সতীর ইচ্ছামরণের মন্ত্র শুনেছিলেন নিজের রক্তে কান পেতে। মিথ্যে বলব না, ঢেউ-তোলা রক্তমৃত্তিকা রাঢ়ে সেই প্রথম গমনে স্বপ্নে পেয়েছিল আমাকেও। আমার পথে পথে ফেরার দিশায় মলুটি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল রাঢ়ের এক রূপকথার দেশে।

ইতিমধ্যে লারানের গাড়ি ওপারের চড়াইয়ে উঠে গিয়েছিল। সানা ছুটিয়ে দিয়েছিল যেন পাণ্ডবের রথ। গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আর সানার গলার উদ্বেগব্যগ্র হাঁকাড়, দুয়ে মিলে কান পাতে, কার সাধ্য ছিল। 'যা যা, মহাদেবের চ্যালা তু, হট্ট হট্ট হট্ট, ঘাঁইক ঘাঁইক ঘাঁইক—আহ্ আহ্ লুঃ লুঃ লুঃ...।'

হুঁ, যদি মনে করে থাকো, সানার ইসব কথার মানে বুঝতে পারবেক, তবে ভুল করেছ হে। মানুষের অবোধ্য, বোঝে কেবল বলদে। ওর নাম বলদ-তাড়ানো ভাষা। তবে হ্যাঁ, সানার গাড়ি কাঁদরে ঠেক খায়নি। জল পেরিয়ে, এক হ্যাঁচকায় চড়াইয়ের ঢালুতে গিয়ে উঠেছিল। যদি একচোখো না হও, তা হলে এটাও কবুল করতে হবে, সানার গাড়িতে ভার কম ছিল। কেবল লারান আর তার বলদের দোষ না। কাছের থেকে দেখেছিলাম, যার নাম কাঁদর, সে যেন এক নির্ঝর। পশ্চিমের উঁচা থেকে পুবেতে তার বাঁক খাওয়া ঢল। নুড়ি আর বড় পাথরে জলের তলা ভরা। তখন লক্ষ্য পড়েছিল, কাঁদরের এখানে-ওখানে মলুটির ঝি-বউয়েরা স্নান করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে। তার মধ্যেই কেউ কেউ ঘোমটা টানছিল, গায়ের কাপড় সামলাচ্ছিল, তবু গাড়ির দিকে দেখছিল। কিন্তু এমন মেয়েও দেখেছিলাম, কালো কষ্টিপাথর কেটে যে মেয়ে তৈরি। ইস্তক, কী বুলব হে, উয়ার ভরা যৌবন তক্। শাস্ত্রের ভাষায় যদি বলো, তবে বলি, ক্ষীণ কটি, সুঠাম নিতম্বিনী। পীনপয়োধরা নয়, পীনোন্ধতা যাকে বলে, সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ আজানু বাহু, কালো দুটি ডাগর চক্ষু, ঝকঝকে সাদা দাঁত। দাঁড়িয়েছিল একটা বড় পাথরের ওপর। কাঁদরের জল তার দু' পাশে কল-কলিয়ে যাচ্ছিল। আর যাই হোক, সে ব্রাহ্মণী নয়, এক নজরে বোঝা গিয়েছিল। কৃষ্ণা কালিন্দী সে মেয়ে যেন সেই কোন্ যুগের শবরীবালা। গায়ের খাটোখুটো ভেজা কাপড়খানি টেনে দেবার কথাও মনে ছিল না। গলা তুলে ডাক দিয়ে বলেছিল, 'অই গ বড় কত্তা, গড় করি গ।' এবার কোমর নুইয়ে কপালে হাত ঠেকিয়েছিল। রায়মশাই রাঙা হেসে বলেছিলেন, 'হুঁ হুঁ, ভালো আছিস তো?'

হাসির সঙ্গে জবাব এসেছিল, 'অই তুমার কিপায় গ বড় কত্তা। উটি কুন্ বাড়ির জামাই গ?' আ ছি ছি ছি দ্যাখ, মেয়েটা বলছিল কী গো। রায়মশাই হেসে ধমক দিয়েছিলেন, 'আ দূর মুখপুড়ী, লতুন মুখ দেখলেই খালি জামাই বুলবে। বড় ছেল্যার বন্ধু।'

বোঝা যায়, ঘাটের ঝি-বউদের মধ্যেও একটা হাসির ঢেউ লেগেছিল। ডাগরী কালিন্দী জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'আ ছি ছি দ্যাখ, চকের মাথা খেয়্যাছি গ।'

তারপরে খিলখিল হাসিটা পিছনে পড়ে ছিল। গাড়ি তখন চড়াইয়ের অনেকখানি ওপরে। গ্রাম মলুটির প্রবেশমুখে। রায়মশাই আমাকে বলেছিলেন, 'বাউরিদের মেয়ে।'

সেরকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু মনে মনে পুছ করেছিলাম,

অমন কালো কুচকুচে ছিলছিলানো শরীরের গড়নখানি ওদের কে দিয়েছে। ছাতিমতলার নন্দলালের পুরাণের ছবিতে যেমন মহেশানি উমাকে দেখেছিলাম, এ যেন তেমনি গড়ন। কিন্তু বাউরি মেয়ে তো আর আর্যকন্যা নয়। তবে অমন ঋজু অথচ নম্রতায় ঔদ্ধত্যে মাখামাখি গড়ন পেয়েছিল কোথা থেকে।

মনের কথা তখন মনেই। গ্রামের প্রবেশমুখে প্রথম দর্শন মন্দির। পোড়া ইঁটের গায়ে দেবদেবীর নানান লীলা নজর হরে নিয়েছিল। তবে অস্পষ্ট, কালের জিহ্বা চেটেছে অনেক দিন ধরে। গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতেই মন্দির একাধিক। কোনো মন্দিরেরই দরজা নেই। দাওয়ার গায়ে অজস্র ফাটল। ইঁটখেকো আগাছার বেশ বাড়বাড়ন্ত। তাল শাল আম আমলকি গাছের ছায়ায় নিবিড়। মন্দিরের পাশেই দেখেছিলাম লাল মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, নিকচিকানো ভদ্রাসন। গাছের রঙ সবুজ, আর যে মানুষদের রঙ কালো, প্রকৃতির মধ্যে তা ছাড়া সব এক রঙ। তার নাম লাল মেটে। সেই আমার প্রথম দেখা রাঢ়ের গ্রাম।

কোথা থেকে যেন ছুটে এসেছিল গোটা কয়েক কুকুর। কেউ ডেকেছিল, কেউ ডাকেনি। ল্যাজ নাড়িয়ে, কান নাচিয়ে ভয় পাওয়া পুছ নজরে তাকিয়েছিল। তবে পথে-ঘাটে ভদ্র অভদ্র অনেকের সঙ্গে দেখা। কেউ ছিল পথ চলাতে, কেউ বসেছিল মন্দিরের রকে। কারুর খালি গায়ে উপবীত, হাঁটুর কাছে কাপড়। কারুর উপবীত নেই। বাতে ভাবেই বোঝা গিয়েছিল, কারা কে। কেউ ডেকে বলেছিল, 'কে, অমুক এলে নাকি?' জবাবে রায়মশাই হাত জোড় করে এক একবার নামতে যাচ্ছিলেন প্রায়। জবাব পাচ্ছিলেন, 'আহা থাক থাক বাবা, এখন আর লামতে হবেক না। ভালো আছ তো?' রায়মশাই কাউকে কাকা, কাউকে জ্যাঠা, কাউকে ঠাকুদ্দা বলছিলেন, আবার কাউকে নাম ধরে। কিংবা, 'হলধর, যাল্‌ছিস কুথা? হুঁ, ভালো আছি।' এমনি সব বাতপুছের সঙ্গে, প্রায় প্রতিজনাকেই অপরিচিতের পরিচয়টাও দিতে হচ্ছিল। না দিলে তো হয় না। গ্রামে একটা মানুষ এসেছে, চিনি না শুনি না, জানতে চাইব বই কি, 'ইটি কে গ?'

গাড়ি চলছিল গ্রামের ঘনবসতির মধ্য দিয়ে। কিন্তু হঠাৎ নজর ঠেক খেয়ে অবাক হয়েছিল। দেখেছিলাম প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঠাকুর-দালান পূজা-মণ্ডপ না। তার চেহারা চিনি। অমন দোতলা বাড়ি, উঁচু আল্‌সে, তালগাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে প্রায়। তাও আবার আল্‌সেতে শাড়ি ধুতি শুকোচ্ছিল। মলুটির হৈমন্তিক আকাশে চিলেকোঠাটা দেখাচ্ছিল যেন কোনো এক অবাক মনের স্বপ্ন-বোনার কুঠরি। তাও এক নয়, একাধিক। আরো দু'-একখানি ইমারত দেখেছিলাম, তাল সারির ফাঁকে, আম জামরুলের আড়ালে।

অথচ তার একটু আগেই যে শুনেছিলাম, সেই রূপকথার দেশে রাজাদের বাস খাস আম ইমাম কোনো কিছুই ইঁটে গাঁথা পাকা ইমারত নয়। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই রায়মশাই বলেছিলেন, 'ক'দিন ধরেই গ্রামের লোক সব আসছে। আজ সন্ধেবেলার মধ্যে যাদের আসবার সবাই এসে পড়বে। আর সবাই এ রকম উঁকিঝুঁকি মারবে, জিজ্ঞেস করবে, 'কে এল!'

কত যেন খুশি, সবাই ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছিল। রাঙা হাসিতে যেন প্রেম করছিল, আনন্দ আর গর্ব। মলুটির লোক কি না সব। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ সময়ে সবাই আসেন বুঝি!'

রায়মশাই বলেছিলেন, 'তাই তো আসবে বাবা, কালীপূজাই যে আমাদের সব। মলুটিতে দুর্গাপূজা নাই। রাজবংশের দুর্গাপূজা নাই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, সে একটা ঘটনা ঘটেছিল বহুকাল আগে, তখন রাজা—।'

আবার শুরু হয়েছিল এক কিংবদন্তী, সে যে কিংবদন্তীর মায়ের দেশ। সেথায় কেবল কথায় কথায় তাদের সৃষ্টি। কিন্তু কথা শেষ হয়নি। গরুর গাড়ি বাঁ দিক ফিরে মস্ত বড় এক পাকা পুজামণ্ডপের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। লারানের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল তার আগেই। রায়গিন্নী সবে তখন নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। উঠোনের এক প্রান্তে লাল মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, দু' পাশে দুটো ঘরের কোণা মিলেছে। সেই কোণের মাঝখান দিয়ে সরু গলি দেখা যাচ্ছিল। গলির ওপারে আর একটা উঠোনের এক অংশ। সেই গলি দিয়ে তখন ঘোমটা মাথায় এক বউ এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘোমটাবিহীন এক সধবা যুবতী। তাঁদের সঙ্গে এক দঙ্গল কুচো-কাঁচা। সবাই মিলে ঘিরে ধরেছিল রায়গিন্নীর গাড়ি। সকলের একসঙ্গে হাঁকেডাকে পুজা-মণ্ডপের উঠোন জুড়ে একটা হট্টগোল পড়ে গিয়েছিল।

তার মধ্যেই দেখেছিলাম খালি গায়ে একজনকে এগিয়ে আসতে। বয়স নিদেন চল্লিশোর্ধ্বে। আগুন-রাঙা বর্ণ, বুকের ছাতি প্রকাণ্ড। সেই বুকে একগাছা মেটে রঙের পইতা। পরনের কাপড়খানি উঠেছে প্রায় হাঁটুর কাছে। খালি পা। তবে হ্যাঁ, একটাই যা তোমার একটু চোখে লেগেছিল, বাঁ হাতের কব্জিতে একটা ঘড়ি। চোখে সেই আশমানী নীল, চুলে রাঙা ছাপ। বলতে হবে কেন, তিনিও রাজবংশধর। গাড়ির কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন, 'দাদা এলে?'

'হুঁ। তুরা সব ভালো আছিস?'

'অই আছি।'

বলে দাদার কোল থেকে ভাইপোকে দু' হাতে তুলে কোলে নিয়েছিলেন। তারপরেই নীল চোখে অচিনটাকে দেখে দাদাকে পুছ, 'ইটি কে বটে?'

জিজ্ঞাসার সময় মুখে একটু হাসি হাসি ভাব। রায়মশাই বলেছিলেন তাঁর বড় ছেলের নাম করে, 'আমাদিগের জ্যোছনার বন্ধু, শহরে কাছাকাছিই থাকে। তা বাবার একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখার শখ। ভাবলাম কী যে, আমাদিগের কালীপুজোটা দেখে যাক।'

'খুব ভালো, খুব ভালো, লেমে আসেন।'

সেই একই রাঙা হাসি, একেবারে মুখ ভরে। অতিথিতে এমন খুশি এ-কালে বিরল। আঁতের কি দাঁতের হাসি, দেখলে তা বোঝা যায়। ততক্ষণে রায়মশাই নেমে-ছিলেন। ছোট রায় উপুড় হয়ে প্রণাম করেছিলেন। একবার বেরাদারি দেখ, দাদা ছোট ভাইয়ের চিবুক ছুঁয়ে আবার নিজের মুখে ঠেকিয়ে চুক শব্দ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'জয়স্তু।'

গাড়ি থেকে নেমে আমি ছোট রায়কে প্রণাম করেছিলাম। ছোট রায়ের একেবারে হা হা রব, 'আহা, থাক না ক্যানে, পায়ে হাত দিবেন না বাবা। আজকাল কি আর সিদিন আছে?'

যেখানে নেই সেখানে নেই, মলুটিতে 'সেদিন' ছিল জানি। দিন কাল অবস্থার হালের পানিতে না মনের দরিয়ায়। বড়কে ছোটর প্রণাম কি কেবল প্রথা নাকি হে। শ্রদ্ধা জানাই, পরিচয় পাড়ি, কুশল জিজ্ঞাসা করি। বলেছিলাম, 'আপনি করে বলবেন না।'

ছোট রায় হেসে এক কথাতেই রাজী, 'আচ্ছা, সে হয়্যা যাবে বাবা, উ লিয়ে ভাবতে হবেক না গ।'

ততক্ষণে আমার দৃষ্টি পড়েছিল ঠাকুরদালানের দিকে। সেইদিনের মহানিশাতেই পুজা। মলুটির কালীপুজাই প্রথম দেখার উপলক্ষ। অথচ দেখেছিলাম, কুমোর মশাই

তখনো প্রতিমায় কালি লেপন করছেন। তখনো প্রতিমার চোখের ক্ষেত্র সাদা। যা দিয়ে প্রতিমার আসল পরিচয়, সেই জিভেও তখনো সাদা রঙ লাগানো। গলায় ঝোলানো নরমুণ্ড আর কাটা ছেঁড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মালাখানিও তথৈবচ। এক কুমোরে রঙ লাগাচ্ছিল প্রতিমার গায়ে। আর এক কুমোর পিছনের চালচিত্রে।

হাত তুলে ঘড়িতে দেখেছিলাম, সকাল সবে সাড়ে সাতটা। রাত্রি একটার অনেক দেরি। তার মধ্যে প্রতিমার চক্ষুদান হয়ে যাবে। তারপরে, মহানিশায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

পূজা-দালানের অনেক ধাপ সিঁড়ি। সেখানে ছোটরা অনেকেই জায়গা করে নিয়েছিল। তারা সেই কঞ্চিখড়ের বাঁধন থেকে সাক্ষী। প্রতিমার রূপ গড়ানো শেষ পর্যন্ত দেখবে। তার মধ্যেই এদিক ওদিক যারা ছিল, সবাই প্রায় খালি গা, কুচকুচে কালো মানুষ। লজ্জা নিবারণের একখানি ঢাকনা ছিল কোমরে। তারা অনেকেই বড় কর্তাকে এসে গড় করেছিল। কেবল কুশল জিজ্ঞাসা নয়, কেউ দাবি করেছিল, 'ইবারে একটো লতুন কাপড় দিতে হবেক গ বড় কত্তা।' কেউ বলেছিল, 'আমাকে দুটো হাঁড়ি মদ দিতে লাগবে কিন্তু, হুঁ। এমন বাজনা বাজাব মা জেগ্যা উঠবেন একেবারে।'

রায়মশাই হেসে কাউকে বলেছিলেন, 'হবেক রে, হবেক।' কাউকে, 'আর রে ধু—হারামজাদা।' তারপরে আমার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'চলো বাবা, বাড়ির ভিতর যাই। হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করো।'

তা করব, কিন্তু না-দেখা মলুটির রক্ত-তেপান্তর যেন আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল। অমন দেশ তো আর কখনো দেখিনি। যেখানে প্রকৃতি লালে সবুজে মাখামাখি। তাকে লাল বা বলি কী করে। লাল বলে সুখ পাই না, মেটে বলে যুত পাই না। কী আমার ভাষার দারিদ্র্য হে। এমন গরীবকে আমি নিজেই কৃপা করি। বিশ্রামের চেয়েও তখন সেই এক রাখাল-রাজার রাজ্য মলুটির প্রকৃতি আমাকে ডাক দিয়ে ফিরছিল।

রায়মশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে পড়েছিলাম একেবারে অন্দরমহলের ভিড়ে। এখন অন্দরমহল বলতে যদি সাতমহলা পেরিয়ে ভাবো, আমি নিরুপায়। মাঝখানে উঠোন. চারদিকেতে ঘর। ছেলেবেলায় পুব দেশেতে দেখার মতোই, তবে ফারাক বিস্তর। রঙে মিল ছিল না, আকারে মিল ছিল না। যে ঘরে গিয়ে বসেছিলাম, সে ঘরে অনেক মহিলা পুরুষ। প্রথমে পরিচয়ের পালা। রায়মশাইয়ের ফরমান, 'সবাইকে দেখিয়ে রাখলাম, তুমি বাবা যখন যেখানে খুশি যাও, ঘোরো বাড়ির মধ্যে, কিছু বলার নাই। তুমি বাড়ির ছেলে।'

এর মধ্যে যে কথাটা বলতে ভুলেছি, রায়মশাইয়ের বড় ছেলে, আমার বন্ধু, যে সূত্র ধরে আসা, সে তখন শহরে বসে চাকরির ইণ্টারভিউ দিচ্ছিল। তাই আসা হয়নি। হতে পারে রাজবাড়ির পূজা, বন্ধু আমার রাজবংশধর। সেকালের হিসাবে ধরলে বড় তরফের বড় ছেলে তখন সে, রাজার মুকুট তার মাথাতেই শোভা পেতো। কিন্তু অই কে বলে হে, রাজপুত্তুর তখন কেরানীর চাকরির আশায় পরীক্ষার্থী।

রায়মশাই ভাইকে ডেকে আমার কথা বলেছিলেন, 'শোন, উয়াকে আমাদিগের দক্ষিণের উপরের ঘরে লিয়ে যা, একটু নিরিবিলি পাবে। ইদিকে তো পূজাপাজার ব্যবস্থা, হই হট্টগোল।'

বলেছিলাম, 'তাতে কী, আমি তো তাই দেখতে এসেছি।'

রায়মশাই রাঙা হেসে বলেছিলেন, 'তা তো দেখবেই বাবা, দেখবে বইকি। রাত্রেই তো সব—পূজা, বলি, যা কিছু। সারা রাত জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলাটা নিরিবিলিতে একটু ঘুমিয়ে নেবে।'

কিন্তু উপরের ঘরে বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, তখন বুঝিনি। জীবনে সেই জিনিসও নতুন দেখেছিলাম, মাটির ঘরের দোতলা, মাথায় খড়ের চাল। উঠোন পেরিয়ে

দক্ষিণের ভিটায় গিয়ে মাটির সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল। কোণ ঘেঁষে। উঠে দেখেছিলাম, চমৎকার! ইঁট-সিমেণ্টের ভাঁজ নেই, গোবর-নিকানো মাটির মেঝে। তায় আবার দক্ষিণে পশ্চিমে জানালা। উত্তরে মাটির বারান্দায় দাঁড়ালে বাড়ির উঠোন। দক্ষিণের জানালায় মলুটির তেপান্তর দেখতে পাইনি। গুটিকয় গাছের নিবিড় ছায়া দেখে· ছিলাম, আম জাম তাল, আরো যেন কী। সেখানে ঘুঘুর কুররর কুররর ছাড়াও নানান পিক্ পিক্ চিক্ শিস ডাকাডাকি শুনতে পেয়েছিলাম। গাছের আড়ালে আড়ালে লাল মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল।

কিন্তু পাকাবাড়ি দেখেছিলাম যে! মলুটিতে নাকি রাজাদের পাকাবাড়ি করতে নেই। ছোট রায় তখন বলছিলেন, 'জামাকাপড় ছেড়ে নিচেয় এসো, জল দিতে বলি। হাতমুখ ধুয়ে লাও।'

না জিজ্ঞেস করে পারিনি, 'আচ্ছা, শুনেছিলাম, মলুটিতে আপনারা পাকা ঘর করেন না। কিন্তু কয়েকটা বাড়ি যেন—'

কথার মাঝখানেই ছোট রায় রাঙা মুখে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'সে বাবা তুমি ঠিকই দেখেছ, মলুটিতে মেলাই পাকা ঘর আছে। তবে, বুঝলে বাবা, সেসব আমাদিগের লয়, আমাদিগের দৌহিত্তির বংশের। রাজারা যখন মেয়্যাদের বিয়া দিতেন তখন কুলীনদের ছেল্যা লিয়ে এসে, জমি-জিরাত দিয়ে মলুটিতেই বসত করাতেন।'

চলতে চলতে দেখেছিলাম ছোট রায়ের রাঙা মুখে, রাঙা হাসিতে একটু ধনুকের বাঁক। বলেছিলেন, 'এখন কী হয়েছে জানো তো, আমাদিগের থিক্যা আমাদের দৌহিত্তিররা মলুটিতে বেশী হয়্যা গেল্ছে, হাঁ বুঝলে? তাদিগের অবস্থাও অনেক ভালো। আমাদিগের পাকা করতে নাই বটে, উয়াদের তা আছে। পাকাবাড়ি সব উয়াদের! তখন ছিলেন এক রাজা, তাঁর নাম আনন্দচন্দ্র। তিনি—।'

ছোট রায় নিজেই থেমেছিলেন। অনুমান করেছিলাম, আর এক কিংবদন্তী। বলেছিলেন, 'আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। আমি জল দিতে বলি গা, তুমি এসো।'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি দিয়েছিলাম। তিনি নিচে নেমে গিয়েছিলেন। বাসী জামা খুলতে খুলতে ভাবছিলাম, কেন, মলুটির রাজারা কি আজ সব দিকেতেই সর্বহারা? নিজেদের জন্যে কি তাঁরা কিছুই রাখেননি?

সেই সময়ে মনে হয়েছিল, মেয়ে-গলায় যেন শুনতে পেয়েছিলাম, 'ই দ্যাখ্ ক্যানে মুখপোড়া, হাত ছাড়। না হলে পিসামশায়কে যেয়ে সব বুলে দিব।'

কথাটা যেন কেমনধারা! দক্ষিণের জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়েছিলাম। বছর কুড়ি-বাইশের এক লম্বা শ্যামলা ছেলে, অই কি বলব হে, এক গোরা যুবতীর আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে। ই দ্যাখ হে, নিজের শ্রবণকে না বিশ্বাস করতে পারি, শুনতে পেয়েছিলাম, 'একটু কাছে আয় না!'

আ ছি ছি ছি, মুখপোড়াই তো বটে। যুবতীও ঠিক যুবতী নয়, ষোল সতেরো হবে। ডাগর চোখের তরাস যা দেখেলাম, আগুন ছিল হে। তারপরেই এক গোঙানি, 'তবে রে...।'

কথা শেষ হয়নি, চটাস করে এক থাপ্পড় মুখপোড়ার গালে। তৎক্ষণাৎ আঁচল শিথিল, শ্রীমতীর বেগে ছোটা। ছিরিমানের গালে হাত, তবে রাগ ঝাল ছিল না মুখে। তবে আস্তে আস্তে সরে এসে আমিও গালে হাত দিয়েছিলাম, 'ই বাবা, মলুটি যে সাংঘাতিক রূপকথার দেশ হে!'

ভিতর থেকে এমন একটা হাসির ঝোরা ঝরঝরিয়ে নেমেছিল, নিজেকেই পাগল বলে মনে হয়েছিল। হায়, কী বলব হে, বাজ-ধরা রাখাল রাজার বংশধরের ভিটায়, মাটির ঘরের দোতলায় দাঁড়িয়ে কী দৃশ্যই দেখেছিলাম! শুধু বর্ণনাতে তার রূপ

খেলে না। অনুভূতির অরূপে তার রসের ধারা বহে। ভেল্‌কিওয়ালা যেমন ডুগডুগি বাজিয়ে হাঁকে, 'লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌, লাগ্‌ ভেলকি লাগ্‌' তেমনি আমার ভিতরেও ডাক লেগেছিল, লেগেছে লেগেছে লেগেছে, কৌতুকের বান লেগেছে গো।'...কিন্তু ওহে বিদেশী, তোমার কেন গাল সুড়সুড়িয়ে উঠেছিল যে, গালে হাত বুলিয়েছিলে।

পুরুষ বলে! সব পুরুষেই এই পুরুষের লীলা কিনা! সেই চিরপুরুষের মন। মনে মনে চোখে চোখে কৌতুকের বান ডেকেছিল যে। তবু নীতিবাগীশের ভ্রূকুটিকে বড় ডরাই। সে বলতে পারে, এতে কৌতুক কোথায় দেখলে হে। দুর্নীতি মানো না কি? অধর্মের ভাবনা নেই?

মানি বই কি। ভাবিও বটে। তবে কিনা, ঘরের নিচে পিছনে সেই ষোল-কুড়ির বেলায়, নীতি আর ধর্ম খুঁচিয়ে ঘা করতে ইচ্ছা হয়নি। একা একা হেসেছিলাম অনেকক্ষণ। তারপরে ভেবেছিলাম এক্ষণে আর সেখানে নেই কেউ নিশ্চয়। ভেবে জানালার কাছে গিয়ে আর একবার উঁকি দিয়েছিলাম। আহ্‌ ওহে, ভুল দেখিনি তো। এদিকে এক কাঁঠালগাছ, ওদিকে এক তাল। তার মাঝের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তখনো শ্রীমান, আনুমানিক কুড়ি বছর। গোঁফ তেমন তেজী নয়, আ-ছাঁটা কালো রেখাটি গাঢ় দেখাচ্ছিল। মাথার চুলে বারো-চারের সূক্ষ্ম কাট, জুলপি ত্যারচা। রোগা রোগা গায়ে সোনালী সিলিকের জামা। স্পষ্ট দেখেছিলাম, জলচুড়ি তোলা কালো পাড়ের ফরাসডাঙার কাঁচি ধুতি মোটা কোঁচায় ভুঁয়ে লুটানো। পায়ে ছিল ঘি রঙের নিউকাট। তখন আর শুধু দাঁড়িয়েছিল না। সিলিক জামার পকেট থেকে বের করেছিল সিগারেটের প্যাকেট, সাহেবের মুখ ছাপানো তাতে। ইতিউতি দেখে, সিগারেট ঠোঁটে ধরে, তিন কাঠি বরবাদ করে, চতুর্থতে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ। তবু চোরের মন। ড্যাবডেবে ডাগর চোখে কেবল চারদিকে চোরা নিরীক্ষণ।

ভেবো না যে, হতাশ প্রেমিক মুহ্যমান, দমকা দমকা নিশ্বাস ফেলছিল, আর ধোঁয়ার ধীর টানে ব্যথা ভুলছিল। রীতিমতন হুসহাস টান, নাকে মুখে ভলকে ভলকে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ। যেন উত্তেজনায় রনরন্‌, কেবল মতলবের ধ্যান।

আমি ভাবছিলাম, কোন্‌ নগরের নাগর উটি। কোন্‌ গৃহের অতিথি। ও মুখপোড়া কখনো গাঁয়ের হতে পারে না। তা হলে, রাত পোহাতেই অমন সাজগোজের ঠাট থাকত না। তারপরে বলতে পারি না, হতেও পারে। জলে ডোবা বঙ্গবাসী, রাঢ়ে রঙ্গ তুমি কি বুঝবে!

আরো ভাবতে হয়েছিল। ভাবতে হয়েছিল, হাত তুলে থাপ্পড়খানি যে দিয়ে গেলে মেয়ে, ঘরের পিছনে ছায়া ছায়া ঝোপ-জমিনে তোমাকে আনল কে। নিশ্চয় সকলের সুমুখ দিয়ে আঁচল ধরে টেনে আনেনি।

গোয়েন্দা ভাবনা কতক্ষণ চলত জানি না। ঠিক সে সময়েই পিছনে ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। সে ডাক শুনে একটু অবাক লেগেছিল। গলার স্বরের জন্যে না, স্বরের মালিক মেয়েটির জন্যেও না। তাকে চিনিনি। মন বলেছিল, সে মেয়ে রাজবংশের নয়। কেননা, চেহারাতে ধরতাই মিল ছিল না। আমার পোশাকী নামখানির পিছনে একটি 'দা' জুড়ে সে অনায়াসে ডেকেছিল, 'আপনার হাত-মুখ ধোবার জল দিয়েছি নিচে।' কথাবার্তার উচ্চারণও কেমন যেন চাঁছাছোলা, সমতল, সমান সমান। রাঢ়ের চড়াই-উৎরাইয়ের উঁচু-নিচু ছিল না। রাঙা মাটির সুর ছিল না। সব মিলিয়ে তাই একটু অবাক লেগেছিল। কিন্তু ওদিকে আবার ভয়, তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলাম জানালার কাছ থেকে। অমন কৌতুকের খেলা দেখায় ধরা দিতে পারি না। বলেছিলাম, 'এই যে যাচ্ছি।'

সে দাঁড়িয়ে ছিল সিঁড়ির ধাপে। নোটিস দিয়ে নিচে নামবে, তাই ভেবেছিলাম।

অথচ কী ব্যাজ দেখ, মেয়েটি উঠে এসেছিল ঘরে। বলেছিল, 'ব্যাগ স্যুটকেস্‌ কিছুই তো খোলেননি। গাড়ির জামাকাপড়ও ছাড়েননি।'

তার ব্যস্ততায় আমার ব্যস্ততা। তাড়াতাড়ি জামা খুলতে খুলতে বলেছিলাম, 'এই যে ছাড়ি।'

শুধু ব্যস্ততা নয়। যে রকম পা বাড়িয়ে ঘরে চলে এসেছিল, যদি জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেই তরাসে আমি বেশ গলা তুলেই কথা বলেছিলাম। মুখপোড়াটা যাতে সরে পড়তে পারে। তাই আবার বলেছিলাম, 'আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।'

মেয়েটি হেসে ফিরেছিল। বলেছিল, 'আমাকে "আপনি" বলছেন! আমি অনেক ছোট।'

ততখানি চোখের মাথা খাইনি হে, যাকে অষ্টাদশী না বিংশবর্ষীয়া, কী বলে, তাকেও বড় বলে ঠাহর করব। তবে কি না, মেয়ে বলে কথা! আঠারো-বিশের অচিন মেয়েকে আপনি ছাড়া বলতে জানিনি। যাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তার বর্ণনা দিলে বলতে হয় এক শ্যামা যুবতী। শুধু শ্যামা বললে হয় না, তার চেয়ে বেশী, শ্যাম রঙেরই পোঁচড়া আর একটু গাঢ়। কালো বলবে? বলতে পারো। কিন্তু কোথায় যেন কী একটা ছিল, কালোতে একটু আলোর রোশনাই খেলছিল। ডাগর চোখের সাদায়, কালো তারার রোশনাই। সাদা দাঁতের ঝিলিক। স্বাস্থ্যে তার চড়াই ভূমির অধর উচ্চতা, ফের উৎরাইয়ের গভীরতা। অল্প চুলের গোছাটুকুই ঘাড়ের কাছে গোছানো ছিল আলগা ফাঁসে। গায়ের সামান্য জামাটা ধুয়ে ধুয়ে রঙ উঠে গিয়েছিল। গাছকোমরে বাঁধা শাড়িটার সেলাই ঢাকা পড়েনি। তার কথার স্বরে যত অনায়াস সুর, ভাবে তত ছিল না। সংকোচের আড়ষ্টতা ছিল। তবে অনায়াস সুরের মধ্যে যেমন কোনো বক্রতা ছিল না, তেমনি যেন ছিল এক বিজন বনের ছায়ায় নিবিড় নম্রতা। তার চেয়েও যদি বেশী বলতে চাও, তবে বলো, তকতকে সারল্যে কোথায় যেন একটু ব্যথা বেজে যায়। বিজন ছায়ায়, সেই বিষণ্ণতার কথা। তারপরে সেই অরূপাকে দেখে এই কথাটি মনে পড়ে যায় কি না, পরাণে ভালোবাসা যাকে দিয়েছ, তার রূপের বেলায় অমন হাতটান কেন। অবিশ্যি, দোহাই হে, সেই 'এক' রূপের ভালোবাসা ভেবো না। সেই এক ভালোবাসা, যা সকল প্রাণে বাজে। মেয়েটি কাদের?

বলেছিলাম, 'না, সে তো বটেই। আপনি এ বাড়ির—'

'ও মা! আবার আপনি বলছেন?'

তা-ও তো বটে। ঠেক খেয়ে হেসেছিলাম। ও হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'আমরা এ তরফের আত্মীয়। তবে আমাদের বাড়ি এখানে না।'

'ও, পুজো উপলক্ষে?'

কথা শেষ করা যায়নি। তার আগেই মাথা-ঝাঁকানো জবাব শোনা গিয়েছিল, 'না, না, আমরা এখানেই থাকি এখন। এ বাড়িরই লাগায়ো পশ্চিমে একটা ঘর আছে, সেখানে।'

মেয়েটির মুখে হাসি ছিল। কিন্তু হাসির মধ্যে কেমন একটা ঠেক খাওয়া আড়ষ্টতা। আবার বলেছিল, 'মানে আমাদের নিজেদের কিছুই নেই। এখন মলুটিতেই থাকি। আত্মীয়দের কাছে।'

কেমন আত্মীয়তা, এখন আর মনে করতে পারি না। কী একটা যেন শুনেছিলাম। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। একটা বিড়ম্বিত পরিবারের ছবি যেন আমার চোখে ভেসেছিল। যে বিড়ম্বনার কাছে কাছে একটি অসহায়তা পা টিপে টিপে চলে।

ততক্ষণে আমার ধোয়া জামাকাপড় বের করেছিলাম। তার সঙ্গে ধৌত প্রক্ষালনের

অন্যান্য সরঞ্জাম। মেয়েটি সিঁড়ির দিকে চলে গিয়ে আবার ফিরে তাকিয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'আপনি তা হলে আসুন। এ ঘরের নিচেই বারান্দায় জল রেখেছি।'

প্রায় ওর পিছনে পিছনেই নেমেছিলাম। উঠোনে লাল ভুঁয়ে ছোট রায় তখন তাঁর রাঙা হাত তুলে চেঁচাচ্ছিলেন, 'আহ্, তু সে কথা ক্যানে বুলছিস আঁ? তু পারবি না, পারবি না, মিটে গেল। কথা বাড়ায়ে তো কুন লাভ নাই।'

যাকে বলছিলেন, সেই খড়ি-ওঠা কালো গা, কোমরে ঠেঁটি জড়ানো লোকটার কিন্তু দন্ত বিকশিত। বলেছিল, 'ই দ্যাখ ক্যানে, আমি কি সে কথা বুলছি। সিদ্ধ শুকনো, সব করা আছে। ভাঙানটো হয় নাই। চাল দিব কুথা থেক্যা—।'

কথা শেষ করতে পারেনি সে। ছোট রায়ের রাঙা মুখে যত উত্তেজনা, গলায় তত। বলেছিলেন, 'ন্যাকামি করার জায়গা পাস নাই, না কী, আঁ? আজ রাত্তিরে পুজো, লোকজনের আসা-যাওয়া, অখন তু বলছিস, ধান রয়েছে, চাল করা নাই? ইকে কী বলে, আঁ?'

লোকটা ততক্ষণে রাঙা মুখের ঝাপটায় পিছন ফিরেছিল। বলতে বলতে গিয়েছিল, আচ্ছা গ, আচ্ছা, আধমন চাল পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হয়তো আরো কিছু বলতেন ছোট রায়। তার আগেই চোখ পড়ে গিয়েছিল আমার দিকে। তখন দ্যাখ ক্যানে, রায়ের কী বিব্রত ভাব! রাঙা মুখে অমনি হাসি ঝিকঝিকিয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'ইয়াদের কী বুলব বলো দিকিনি বাবা। লিবার সোময় লিবে, আর তারপরে...।'

মাঝপথেই কথা থামিয়ে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন, 'অ সুষি!'

যে দাওয়াতে আমি দাঁড়িয়ে, সেই দাওয়ারই এক পাশ থেকে জবাব এসেছিল, হ্যাঁ, এই যে!'

সেই মেয়েটি, যে ডাকতে গিয়েছিল ওপরে। যার নাম সুষি। পুরো নাম কী, কে জানত। ছোট রায়ের সহজ কথাই যেন ধমকের সুরে বাজছিল। বলেছিলেন, 'জল দিছিস?'

আমিই তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'অ, আচ্ছা। কিন্তু বাবা, তুমি কি মাঠে যাবে?'

মাঠে? সেই অবস্থায় হঠাৎ মাঠে যাবার কথা কেন?

কেন, তার জবাবও পেয়েছিলাম। ছোট রায়ের রাঙা হাসি একেবারে আকর্ণ-বিস্তৃত। বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা যা আছে বাবা, তুমাকে আর সিখানে যেতে বুলতে ইচ্ছা করে না। বউ-ঝিয়েরা কুনরকমে যায়, আমরা সব মাঠেই যাই।'

কী অবুঝ হে, আমি আবার তখন সুষির দিকেই চেয়েছিলাম। আর সুষির নজর মাটির দিকে। পরক্ষণেই যেন ধাঁধার জবাব মিলেছিল। বলে উঠেছিলাম, 'ও! না, তার দরকার নেই।'

ছোট রায়ের হাসিতে আপ্যায়নের আকুঞ্চন। বলেছিলেন, 'তুমি তো রাস্তাঘাট চেন না। তা হলে, কাউকে সঙ্গে পাঠাতাম। আচ্ছা বাবা, হাত-মুখ ধোও। সুষি, বৌঠানকে বলে খাবার-দাবার দিস।'

বলেই কোন্ দিকে যেন অদৃশ্য হয়েছিলেন। তাঁর কি তখন দাঁড়াবার সময় ছিল। কারুরই ছিল না। দেখেছিলাম, উঠোনের ওপর দিয়ে গিন্নী-বউ-মেয়েদের অনবরত আনাগোনা। এ ঘর থেকে ও ঘরে, এ দাওয়া থেকে ও দাওয়ায়। কারুর হাতে পেতলের পরাত, কারুর কাঁখে কলসী। কেউ চলেন শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি, কারুর হাতে ফুলের ডালি। রান্নাঘরের দিকে তো কথাই নেই।

তার মাঝেই দাওয়ার নিচে একখানি মোটা তক্তা পাতা। পাশে জলের বালতি।

লেগে যাও ধৌতকার্যে। জল নিকাশের ভাবনা নেই, ধারেই নালি কাটা ছিল। নগর চালের গোসলখানার প্রত্যাশা ছিল না। তবে কিনা, শহরের হাওয়া লাগানো শরীর কিনা। তাই একটু কুঁকড়ে যাওয়া। কিন্তু হার মানতে যাইনি। দিব্যি কাজ সেরে নিয়েছিলাম। জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতে আবার সুষির ডাক, যে-ডাকে নামের শেষে 'দা'। নিচে গিয়ে অন্য ঘরে খেতে বসেছিলাম বড় রায়ের পাশেই। খেতে দিয়েছিলেন স্বয়ং রায়গিন্নী। কাছে নির্দেশের অপেক্ষায় সুষি।

কিন্তু ই দ্যাখ গ, একে কী রকম জল-খাবার খাওয়া বলে। মস্ত বড় কাঁসার থালায় দেখেছিলম প্রায় অগুনতি লুচি। তার সঙ্গে বেগুন ভাজা, নানাবিধ মিঠাই।

সে পেট কি আর আমাদের। বলেছিলাম, 'এত দিয়েছেন! খেতে পারব না যে।'

সবাই যেন হেসে বাঁচেননি। বড় রায় মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে বলেছিলেন, 'এত কোথায় বাবা, অই তো ক'খানি। খেয়ে নাও।'

বড় রায়ের গলা ছোট রায়ের থেকে নিচু, মার্জিত। ছোট রায় থাকলে পুরো মলুটির ভাষায় হাঁকডাক করে উঠতেন। বড় গিন্নী বলেছিলেন, 'খেয়ে নাও বাবা, সেই তো কাল কখন সাঁজবেলাতে দুটি মুখে দিয়ে গাড়িতে উঠেছিলে। এদিকে দুপুরে খেতে অনেক বেলা হবে।'

উপরোধে ঢেঁকি গেলা যায় জানতাম। কিন্তু সকালবেলাতে ও রকম লুচির পাঁজা না। তখন একমাত্র সুহৃদ দেখেছিলাম সুষিকে। সে বলেছিল, 'তুলেই নিন কাকীমা, লাগলে উনি চেয়ে নেবেন।'

অতএব তুলে নিতে হয়েছিল। খেতে খেতে আরো দু'জনকে দেখেছিলাম। যিনি ঘোমটাহীনা সধবা, তিনি বড়-ছোট, দুই রায় বসানো, নীল চোখ, আগুনরাঙা বর্ণ। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, উনি রায়সহোদরা। আর একজন মাথায় ঘোমটা রেখেছিলেন বটে। মাঝে মাঝেই ঘোমটার ফাঁকে তাঁর মুখখানি উঁকি দিচ্ছিল। সে মুখে হাসির মৌরসীপাট্টা। আন্দাজে ধরা, তিরিশে ছোঁয়া সেই মুখে হাসি কেবল ঠোঁটে ঠোঁটে না। কেবল ডাগর কালো চোখের তারায় তারায়ও না। প্রতিমার মতো মুখখানিতে, কপালের গাঢ় রঙের টিপেও হাসি যেন ছলকানো। পরিচয় প্রথম ক্ষেপেই পেয়েছিলাম, উনি ছোট রায়গিন্নী। তবে যদি পুছ করতে, বড় গিন্নীর শ্যাম স্নিগ্ধ বর্ণের সঙ্গে টিকলো নাক, ডাগর কালো চোখ, মায় হাসিটির সঙ্গে ছোট গিন্নীর এত আদল কিসের, তবে জবাব পেতে, ওঁরাও দুই সহোদরা। দুই সহোদরের বউ, দুই সহোদরা। সেই জন্যে বড় রায়কে শুনেছিলাম কখনো ছোট গিন্নীকে তুইতোকারি করতে, কখনো তুমি। কী ব্যাজ বলো, শালী কি না ভাদ্দর বউ! যাঁকে একদা জামাইবাবু বলে জিভ ভেংচে কাঁচকলা দেখিয়েছে, তাঁকেই কিনা এখন ভাশুরঠাকুর বলে অন্য রেয়াত দিতে হচ্ছে।

তা হোক গিয়ে। আপনা-আপনিতে সে এক সুখে স্বস্তিতে ঘর করা। ভাদ্দর-বউয়েরও তেমন ভাশুরঠাকুরের কাছে অসূর্যম্পশ্যা থাকবার ভয় ছিল না। বড় রায়ের হাসিটি তো বড়ই মিঠা লাগছিল। যেন, 'কী রে, আর জিভ ভেংচে কিল দেখাবি? কেমন জব্দ হইছিস।'

খাওয়ার ব্যাপারে সেই দু'জনেও আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি। 'তা বুললে কি হয়, জোয়ান বিটাছেল্যা। এখন কত খাবে।'

তা বটে কথা। তবে কিনা, জোয়ান বিটা তেমন বীরপুরুষ ছিল না তো! রাজ-রাজড়ার ধরা-ছোঁয়ায় থাকেনি কভু।

খাওয়ার শেষে বড় রায় বলেছিলেন, 'সারারাত গাড়ির ধকল গেছে। এবার গিয়ে একটু বিশ্রাম করো।'

বিশ্রাম! সে শব্দের অর্থ কী হে! বিশ্রাম করতে মলুটিতে গিয়েছিলাম নাকি। আমার ভিতর দুয়ারে যে তখন বেজায় ঝাপটা। পাল্লা একেবারে হাট করে খোলা। মন তখন মলুটির রাঙা মাটির পথে রওনা হয়ে গিয়েছে। কেবল কি মলুটি নাকি। সুরে বেজেছিল, 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে।' আমার চোখে হাতছানি তখন, মন্দিরে মন্দিরে পোড়া ইঁটের চুপচাপ নিথর অনড় পুরাণের দেবদেবীদের। কাঁদরের পাথর ঝরানো, নুড়িতে নুড়িতে বাজনা বাজানো ঝোরায়। হেমন্তের নীল আকাশে, রায়মশাইদের চোখের রঙে ঝলকানো আকাশে, সবুজের চোখ জুড়ানো স্নিগ্ধতায়, আর রাজাদের গায়ের রঙে মেশানো রাঙা মৃত্তিকায়। মনের যাত্রা তখন কিংবদন্তীর দেশে।

বলেছিলাম, 'বিশ্রাম আর কী করব। তার চেয়ে একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসি।'

অমনি বড় রায়ের মুখে রাঙা হাসিতে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া। বলেছিলেন, 'তা যেতে পারো, কিন্তু একলা একলা তো পারবে না। কাউকে সঙ্গে দিতে হয়।'

কথা বলতে বলতে, ই দ্যাখ, সেই মুখপোড়া এসে হাজির হয়েছিল। মামা, না পিসেমশাই—কী বলে ডেকেছিল, এখন আর স্মরণ করতে পারি না। এসেই বলেছিল, 'কুথাক্ যেতে হবে?'

বড় রায় তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, 'আর সি খোঁজে তুমার দরকার নাই বাবা। নতুন মানুষকে তুমার হাতে দিয়ে তারপরে বিপদে পড়ি আর কী।'

মুখপোড়ার কপালে ঝাঁপানো বারো আনা চুলে লেগেছিল ঝটকা। বলেছিল, 'ক্যানে, বিপদ হবে ক্যানে। কী করতে হবে বলেন না।'

দেখেছিলাম, বড় রায়ের রাঙা মিঠে হাসিখানি দিব্যি বাঁক খেতে পারে। বলেছিলেন, 'না বাবা ধনু, তুমার হাতে ইয়াকে আমি ছাড়তে লারব।'

ধনুর বিরক্ত উৎসুক নজর তখন একবার আমার দিকে। ফিরে বড় রায়ের দিকে। আমি দেখছিলাম, তার কচি আভা গালে তখনো গোরা কিশোরীর হাতের দাগ আছে কিনা। শ্যামলা গালে সে রকম কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু কেন জানি না, কে যেন কেমন একটু নজর কাড়ছিল আমার। তার সঙ্গে মনও। সে যে কেবল কিশোরীর চপেটাঘাত খায়, তা না। তাকে স্বয়ং বড় রায়ও যেন ওলাই শীতলার মতো ভয়ে ভক্তি দেখাচ্ছিলেন। আমার মতো একটি জোয়ান বিটাকেও তার সঙ্গে ছেড়ে দিতে ভয় পেয়েছিলেন। তা হলে, সে ধনু তো যেমন-তেমন ধনু নয়।

তার প্রমাণও তৎক্ষণাৎ দিয়েছিল। ফরাসডাঙার কাঁচি ধুতির কোঁচায় ঝাপটা মেরে ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'তবে যা খুশি তাই করেন না।'

বলে চলে যাচ্ছিল। বড় গিন্নী ডেকে বলেছিলেন, 'এই ধনু, খেয়ে যা।'

তার জবাব মাত্র এক কথায়, 'এখন না।'

বড় রায় কিন্তু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'যা ছেলে বাবা, কী বলব। ওকে নিয়ে সব সময়ে চিন্তা, কোথায় কখন একটা গোলমাল বাধিয়ে বসবে। বিপদ-আপদ না ঘটিয়ে সুস্থ ছেলে দেশে ফিরলে হয়।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখানে থাকে না?'

'না, শিউড়িতে বাড়ি, আমাদের আত্মীয়।'

'খুব ডানপিটে বুঝি?'

বড় রায় রাঙা হেসে বলেছিলেন, 'ও যে কী পিটে নয় বাবা, তা জানি না। আছ তো দু' দিন, দেখবে ধনুকে নিয়ে ঠিক একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।

কথা বলতে বলতে আমরা তখন অন্দর ছেড়ে সদরে। পুজা-দালানের উঠোনে ভিড় আরো বেড়েছিল। কেবল ছোটদের না। প্রথম প্রবেশে খালি গা কালো কালো

নেংটি পরা মানুষ দেখেছিলাম দু' তিনজন। তখন পাঁচ-সাতজন। তারা কেউ সাঁওতাল, কেউ ঢাকী, কেউ পুজোবাড়ির কাজের লোক। ইতিমধ্যেই পালকের ঝাড় পরানো গুটিকয় ঢাক জড়ো হয়েছিল এক পাশে। গুটি দুই কুচকুচে কালো অজা। কাঁঠাল-পাতা তাদের মুখের কাছে। মাঝে মাঝে ম্যা ম্যা শব্দ আর পাতা চিবনো। ছোটদের হাত নিশপিশ, থেকে থেকেই ঢাকের পিঠে কাঠি পিটিয়ে দিচ্ছিল। অপটু হাতের সেই পিটুনির শব্দে যেন মহানিশার সংকেত বাজছিল। ওদিকে কুমোরদের হাত অবিশ্রান্ত। কাজ চলেছিল পুরা দমে। মুণ্ড আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মালায় হলদে রঙের প্রথম কোট লেগেছিল।

বড় রায়কে বলেছিলাম, 'আমি একলাই ঘুরে আসি না। বেশী দভরে তো যাবো না।'

তবু তাঁর দ্বিধা। বলেছিলেন, 'ঘুরে আসতে পারবে। তবে সঙ্গে কেউ থাকলে ভালো হতো। তুমি অচেনা তো, সবাই ডেকে ডেকে জিজ্ঞেসাবাদ করবে। তা বেশ, ঘুরে এস একটু। গাঁয়ের মধ্যে যেতে চাও তবে দখিন দিকে যাও।'

সে-ই ভালো। উত্তরের সতীঘাট দিয়ে ঢুকেছিলাম। দক্ষিণের অচেনাতে যাওয়াই ভালো। উঠোনের পাশ দিয়েই, গ্রামের বড় রাস্তা চলে গিয়েছিল। সেই পথে এগিয়ে-ছিলাম। বড় রায় মিথ্যা বলেননি। যা আশংকা করেছিলেন, তার চেয়ে বেশী, পথে দেখা হেন ভদ্রাভদ্র ছিল না, যে ডেকে জিজ্ঞেস করেনি, 'কোন্ বাড়িতে আগমন, কোথা থেকে।' রকে বসা ভদ্র যুবার দলবল, আর কালো কিস্কিন্দে আধ-ন্যাংটা গামছা কাঁধে লোকটাই বলো, সকলের এক প্রশ্ন। তার মধ্যে পথের ধারে লুলা মানুষটা হেসে বলেছিল, 'অই গ, চিনতে পেরেছি, অমুক বাড়ির জামাই না? দুটো পয়সা দিয়া যান গ।'

তা না হয় দিচ্ছি, কিন্তু জামাই বলা ক্যানে হে। নতুন কি কেবল জামাই নাকি। পয়সা দিয়ে এগিয়েছিলাম। চলতে চলতে চড়াই উঠেছিলাম, তারপরে আবার উৎরাই! সেই আমার প্রথম উত্তর রাঢ়ের গ্রাম দেখা। পুবের জলে ভাসা বঙ্গের সঙ্গে বিস্তর তফাত। বাড়ির পরে বাড়ি, গায়ে গায়ে বাড়ি। লাল মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। তার পাশে পাশে পাকা মোকামও কম না। তবে সেই এক কথা, যত বাড়ি তার থেকে মন্দির বেশী। এত মন্দির আর কোথাও দেখিনি, তার সঙ্গে পোড়া ইঁটের লাল গায়ে এত কারুকার্য। দেখেছিলাম পোড়া ইঁটের লাল গায়ে সেথা মহাকাব্যের রচনা। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। দশাননের সীতাহরণ, মৃত্যুবরণ, রামরাজ্যের নানা আলেখ্য। পাণ্ডব কৌরব কুরুক্ষেত্র স্বর্গযাত্রার ছবি। সেই সঙ্গে পুরাণের অনেক চরিত্র, নানান কাহিনী। শুধু কি তাই নাকি, নবাবী বাদশাহী আর ফেরঙ্গ রঙ্গ কত নানা অঙ্গেভঙ্গে। আবার, সামান্য নরনারী লীলা করে নানা প্রকৃতি-প্রকারে। তবে কিনা, সবাই পাড়ি পাড়ি মরি মরি। অনেক মন্দিরই আগাছায়, শ্যাওলায় ঢাকা পড়েছে। কোথাও বিগ্রহের দরজার কাছেই মন্দির-চূড়া মাথা লুটিয়ে পড়েছে। দেওয়ালের গাঁথনি-ভাঙা হাড়ল গর্ত, গোখরোর বাসার ফাটল। কোথাও চিহ্ন শুধু ইঁটের স্তূপে, কেবল প্রাচীনের জীর্ণ গন্ধে গন্ধে।

যেন ভুলে গিয়েছিলাম, কোথায় গিয়েছি, কোন্ সেই দেশে। বর্তমানকে ছাড়িয়ে আমার কালের সীমানা পেরিয়ে। যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম এক পরিত্যক্ত নগরে। নিজের দৃষ্টিকে বা কী বলি, শ্রবণকেই বা কী। ওহে, আমি তখন বিরাজমান দূর অতীতে। সেথা, কত হাসি, কত কান্না, কত যুদ্ধ, কত শান্তি, কত না দীর্ঘশ্বাস, ব্যথা রবে বেজেছিল। দেখেছিলাম, বাজ-ধরা রাখাল রাজা দূর থেকে চেয়ে আছেন মলুটির বুকে।

অই, কী বুলব হে, মলুটির নিশি ডাক দিয়ে নিয়েছিল আমাকে। গ্রাম পেরিয়ে

আবার উৎরাই নামিয়ে নিয়েছিল ঢলে। রাঙামাটির সেই পথের ধারে, সীমানায় দেখেছিলাম গ্রাম-সীমান্তের ঘর গৃহস্থ-পরিবারদের। বাউরি, বাগ্দি, হয়তো সাঁওতালও কিছু কিছু। তারপরে আবার চড়াই আর দক্ষিণে দৃষ্টি হারানো সবুজ মাঠ। আমার চোখে যেন ঝিলিক লেগেছিল। দেখেছিলাম সেই তেপান্তরে বনস্পতির ছায়ায়, কালের ঝাপটায় কালি লাগা লাল মন্দিরচূড়া। মনে পড়েছিল দক্ষিণে মৌলীক্ষা মন্দির। রাজ-উপাস্যা, গ্রামদেবী বিগ্রহ সেখানে।

চড়াই ঠেলে তেপান্তরে গিয়ে সহসা থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। কোথা যেন কলকল ছলছল নির্ঝরের ঝরঝর বেগে নুড়ি বাজছিল রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্। কোন্ দেশে হে, সে কি এই ধুলার সংসারে! তবু যেন মনে হয়েছিল, সেথা এক ভিন্ন দেশ। অবাস্তব অলৌকিক। এগিয়ে গিয়েছিলাম শব্দ লক্ষ্য করে। সতীঘাটের থেকে অনেক চওড়া গভীর পুবের ঢলে নামা এক নদীনির্ঝর। তীরে তীরে বাবলার বন। বড় বড় পাথর, কালো লাল, নানাভাবে শয়নে। যতই পশ্চিমে চাও, মৃত্তিকা আকারে চড়াও, তারপরে সেই দূরে আকাশের গায়ে গভীর কালো রেখা, যেন মেঘের মতন। মেঘ নয়, নজর জানান দিয়েছিল মেঘাকৃতি পাহাড়।

নদীর কূলে কূলে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মন্দিরের সামনে। সেখানেও এক নয়, একাধিক। দেবীর স্বামী মহাদেব পাশে পাশে আপনাকে ছড়িয়ে ছিলেন। ইঁটের গায়ে সেই সব মহাকাব্যপাঠ। বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় পাখিডাকা কুক্ কুক্ পিক্ পিক্ কিচিরমিচির রবের মধ্যে মলুটির নিশি ঘোরে আত্মহারা হয়েছিলাম। অচৈতন্য হে, যেন বাহ্যিক চেতন ছিল না। মৌলীক্ষার মন্দিরবেদীতে বসে সাল-তারিখের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বসে আমার প্রথম দেখা রাঢ়ের গ্রাম মলুটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যেন এক কচ্ছপের পিঠে এক জনপদ। উত্তরে কাঁদরের উৎরাই, দক্ষিণে নদীর ঢল। পশ্চিমে পাহাড়, পুবে নিচে তরতরিয়ে ছুটে যাওয়া ভূমি।

কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না। সংবিৎ ফিরেছিল গলার আওয়াজে, 'অ্যাই যে, একলাটি বস্যা আছেন দেখছি।'

চমকে চোখ তুলে দেখেছিলাম, শ্রীমান ধনু। মুখে তার জ্বলন্ত সিগারেট।

আজ্ঞে না, যদি ভেবে থাকো তোমাকে দেখে শ্রীমান ধনু মুখপোড়া মুখের জ্বলন্ত সিগারেট নামিয়ে নেবে, তবে সে ভাবনা রাখো গিয়ে নিজের ভাবনায় গুঁজে। ওসবের বালাই তার নেই। কাঁচি ধুতির কোঁচাটি ভুঁয়ে লুটিয়ে সে ধপাস করে বসেছিল মৌলীক্ষার দাওয়ায়। জবাব পাবার প্রত্যাশা করে যে সে কথা পুছ করেছিল, তা নয়। দেখতে পেয়েছিল, তাই। দাওয়ার ওপর বসে, সিগারেটে আরো গুটি কয় হুস হুস টান দিয়ে বলেছিল, 'ইঃ, শালো কোমরটা টনটনাচ্ছে।'

শালো মানে শালা এটা জানা গিয়েছিল, সানা আর নারাণের বলদ তাড়ানো বুলি থেকেই। কিন্তু এমন কি পর্যটন করে ধনু এসেছিল যে, 'শালো কোমরটা' টনটনিয়ে যাচ্ছিল।

না, জিজ্ঞেস করবার সাহস হয়নি। কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে সে নদীর ধারে মৌলীক্ষার মন্দিরেই ঠিক এসেছিল কেন। সেই অভিসারের উদ্দেশ্যে নাকি।

সে কোমরে বারকয়েক মোচড় দিয়ে পকেট থেকে বের করেছিল সিগারেটের বাক্স। সাহেবের ছবি ছাপানো সেই বাক্স। আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'খাবেন?'

বোঝো! তুমি আবার ভাবছিলে ধনু মুখের সিগারেট নামিয়ে নেবে কিনা।

তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে হাত দিয়ে বলেছিলাম, 'না না, আমার আছে!'

'থাকুক না। আমারটাই খান না মশায়!'

কাঁচা মুখে পাকা সম্বোধন। শুনলে যাদের রাগ হয় তাদের হয়, আমার যেন হাসির উদ্রেক করছিল। ততক্ষণে আমার বাক্স বের করেছিলাম। বলেছিলাম, 'ওটাতে আমার ঠিক হবে না। এটাই খাচ্ছি।'

ধনু আমার বাক্সর দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে বোধ হয় অধমের সিগারেটের ওপর একটু ছেন্দা হয়েছিল। বলেছিল, 'আপনারটা বেশী দামের। ভেতরের মালটাও বেশ ভালো, খেয়ে দেখেছি মৌজ হয়।'

বলে নিজেরটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'দিন তো আপনার একটা সিগারেট খাই।'

অই, ও হে, নিশ্চয় নিশ্চয়! শত হলেও, নেশার মর্ম বোঝবার একটা মানুষ। বয়সের কথা ভাবছিলে? তা অই সেই কুড়ির বেশী না। তখন কাছের থেকে আরো দেখেছিলাম, গালেতে ক্ষুরের টান লাগা সত্ত্বেও মহাশয়ের গাল তখনো নরম, রোঁয়া পাতলা। গোঁফ জোড়াটি কালো বটে, নতুন আর নরম। হতে পারে, তখন তোমার বয়স তার দ্বিগুণ না হোক, দেড়া। তা বলে এমন কোনো লেখাজোখা ছিল না, একটা সিগারেট চাইতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ধনু নিয়ে একবার শুঁকেছিল। বাঁয়ের বুড়ো আঙুলে ঠুকে ঠুকে আগুন ধরিয়েছিল। ধোঁয়া ছেড়ে আরামসূচক শব্দ করেছিল। তারপরে জুতো জোড়া নিচে খুলে মন্দিরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসতে গিয়ে হঠাৎ সরে এসেছিল। বলেছিল, 'না বাবা, তা'পরে চুক কর্যা একটো মেরে যাক আর কী।'

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও ধনুর ভাষায় আঞ্চলিকতার ছোঁয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু চুক করে কী মারবে। বলে আবার মন্দিরের ভিতরে বাইরের দেওয়ালে সন্দেহে দেখেছিল। তখন জিজ্ঞেস না করে পারিনি, 'কী মারবে?'

'সাপ।'

ই দ্যাখ হে, বুক ধড়াসে গিয়েছিল আমার। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সাপ আছে নাকি?

ভাগ্যিস, ন্যাকা বলেনি আমাকে, এমনই ধনুর চাহনি। ডাগর চোখ দুটি গোল করে বলেছিল, 'বলেন কি, সাপ নাই আবার? কালই তো পেল্লায় এক দুধ গোখ্‌রু দেখ্যাছি। আই বাপ্, তার ফণা কী! শালো আমার মাথা ছাড়ায়ে উঠেছিল।'

এই দেখ, কথা শুনে গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠেছিল। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তারপর?'

'চোঁচা দৌড়! সামনে একটো পাথর ছিল, তা-ই। না হলে শালো আমাকে কাল দিইছিল আর কী। মস্ত ফাঁড়া গেছে।'

সত্যি কথা তো? তা বোধ হয় হবে। মহাশয় একটু গোলমেলে মানুষ, সন্দেহ নেই। চোখমুখ দেখে মনে হয়েছিল, মিথ্যে কথা বলবার পাত্র না। নিজেই আবার বলেছিল, 'ই দেশে সাপ হবেক না ক্যানে বুলেন। মন্দিরের ঘটা দেখেছেন। আই বাপ, মন্দিরে মন্দিরে ছয়লাপ। গোটা গাঁটো ইঁটের পাঁজায় ভরতি। ইয়ারা সাপ পোষে। কিন্তু একটো ইঁটে হাত দিতে যান, ই বাবা, একেবারে খেয়্যা ফেলে দেবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন।'

'সবাই চায় তো।'

'কী চায়?'

'ইঁট। দ্যাখেন নাই, ইঁটের গায়ে ছাপা। ঠাকুরদেবতার ছাপ আছে না সব। আমার কাছে কত লোকে চেয়েছে, মলুটির মন্দিরের ছাপা ইঁট।'

'কী করবে ইঁট দিয়ে?'

ধনু সিগারেটে টান দিয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া ছেড়েছিল ঠোঁট বাঁকিয়ে। বলেছিল, 'কে জানে, কী করবে। লিয়ে যেতে পারলে পয়সা মিলবে বুলেছে। যা তা লোক না তারা, লেখাপড়া জানা লোক।'

ধনুর কথা শুনে মনে হয়েছিল, যেন সে অন্য সমাজ থেকে এসেছে। শিক্ষিত-জনদের কেউ না। যাকে বলো ভদ্রজন। যেন কথা বলছিল গ্রামের অন্ত্যজ, সানা কিংবা নারাণ। অথচ সে যে ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, তার ছাপ সর্বাঙ্গে। ইস্তক, সিলিকের পাঞ্জাবির ফাঁকে কাঁধের কাছে পইতাগাছটিও দেখা যাচ্ছিল।

আমি ভাবছিলাম শিক্ষিত ভদ্রজনদের কথা। যাঁরা মলুটির মন্দিরের পোড়া ইঁটের কারুকার্য পয়সা দিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। অজানা ছিল না, প্রাচীন বস্তু সংগ্রহের নেশা অনেক মানুষের। কেউ সাজায় আপন সংগ্রহশালা, কেউ দশজনের। তখন মনে পড়েছিল, নগরের বিশিষ্ট মানুষের ঘরে দেখেছি, হাল আমলের ঝকঝকে আসবাবের গায়ে প্রাচীন সংগ্রহ। সরকারী আর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে প্রাচীনের নানান উপচার। কাঠ, পাথর, মাটি, যা পাওয়া গিয়েছে। ধনু মিথ্যা বলেনি। এই অধমের মনেও সে ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল। কল্পনা করেছিলাম, পোড়া ইঁটের কারুকার্যে কাব্যকথা আমার ঘরের দেওয়াল জুড়ে। নিজের ঘরের সাঁঝবেলার আঁধার-আঁধার ছায়ায় দেওয়ালের দিকে চেয়ে আমি যেন চলে গিয়েছি সেই মুনিঋষির যুগে। সেই যখন পরাশর নামে মুনি দেহলগ্ন মৎস্যগন্ধা কোলে। হরিণী সোহাগে মগ্ন শকুন্তলা। কীচকে যবে বধে ভীম, অর্জুন যবে শোনে শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীকৃষ্ণমুখে। আর যবে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দেখে প্রথম নারী। তারপরে, অশোকবনেতে সীতা রাক্ষসী বেষ্টিতা, রামচন্দ্র পুজেন দশভুজা।

কল্পনা করেছিলাম, মলুটির ভাঙা মন্দিরের ধুলায় ছড়ানো সংগ্রহে আপন ঘর সাজিয়ে চলে যাবো দূরে, সেই বিস্ময়কর যুগে। যে যুগের কথা শুনি, মিটে নাই, মিটিল না, মিটিবে না আশা।

ধনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তা কী হলো, নিয়ে যেতে পারলে না?'

ধনুর মুখ একেবারে বিরক্তিতে কোঁচকানো। ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'কতবার চেষ্টা করেছি। দু'-একখান লিয়ে যে যাই নাই, তা লয়। একবার ধরা পড়ে গেছলাম, ই বাপ্‌, সবাই মিলে শালো এই মারে তো সেই মারে। ক্যানে বাবা, ইঁট গুঁড়ায়ে খাবে নাকি। যেন সোনাদানা লিয়ে যেইছি।'

বলেছিলাম, 'সব তো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।'

ধনু আমার কথায় উৎসাহ পেয়েছিল। বলেছিল, 'নষ্ট কি বুলছেন মশায়। দ্যাখেন গা, ছোট ছোট বাচ্চাগুলাতে পুতুল খেলছে ওগুলান দিয়ে। ঢ্যালা করে খেলছে। আর আমি দুটো পয়সা রোজগার করতে গেলে, মার ব্যাটাকে।'

ধনুর কথায় হাসি সামলানো দায় হয়েছিল। সত্যিই তো, যা দিয়ে ছেলেপিলেরা পুতুলখেলা খেলছে, তা দিয়ে যদি ধনুর কিছু সিগারেটের খরচ জুটত, তাতে কেন ঝাগড়া বাপু। বেচারি! আবার বলেছিল, 'উয়াদের অই এক কথা, পচুক ধসুক, গুঁড়া গুঁড়া হোক, গাঁয়ের জিনিস বাইরে লিয়ে যেতে পারবে না। লাও ইবারে ঠ্যালা। কুবেরের ধন হে, যখ দিয়ে রেখেছে।'

তা বটে। ধনুর কথায় মলুটির মনের খবর মিলেছিল। মলুটির মন ধনুর না। তার কাছে যা ছিল পড়ে পাওয়া ষোল আনা, নগদ বিদায়ের কিছু ট্যাঁকের কড়ি,

মল্লুটির মানুষের কাছে তা পবিত্র ঐতিহ্য। যে দিনগুলো হারিয়েছে, সেই দিনের কথা সেই ভাঙা ইঁটের ছাপে ছাপে। পূর্বপুরুষের স্মৃতি বুক দিয়ে আগলানো সংরক্ষণের বস্তু। মল্লুটির ইতিহাস সেইসব জীর্ণ মন্দিরে, যার ভাঙন আর ধ্বংস তাদের দেখতে হচ্ছে অসহায় চোখ মেলে। বাজ-ধরা রাখালরাজার বংশধরদের মন ধনু কোথায় পাবে হে। সে এসেছিল আত্মীয়তার সুতো ধরে শিউড়ির হাট থেকে। বাজারের কেনা-বেচায় তার লেনাদেনা। যে ভদ্রজনদের সঙ্গে তার দেওয়া-নেওয়ার কারবার, তাঁদের মনও সে জানে না।

তবে কিনা এমন বলব না, ভদ্র বিশিষ্টদের প্রাচীন সংগ্রহের মন মল্লুটির মানুষ বোঝেন। মল্লুটির কাছে যা বংশের চিহ্ন, পূর্বপুরুষের স্মৃতি, নগরের সংগ্রহকারীর কাছে তা প্রাচীন সংগ্রহ। দুয়েতে ফারাক বিস্তর, তার কোনো মিলজুল নেই। ধনুর কথায় যেটুকু ঔৎসুক্য জেগেছিল, মল্লুটির মনের কথা ভেবে তা নিবে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমার সিগারেট ফুরিয়েছিল, ধনুর না। ঘুনসি পুড়িয়ে বিড়ি খাওয়া জানতাম। অমন ঠোঁট পুড়িয়ে সিগারেট চোষা দেখিনি। ভেবেছিলাম, ধনু আগুনটুকু সুদ্ধ খাবে নাকি। তার চেয়ে সে তো অনায়াসে বলতে পারত, 'জমল না, আর একটো দিন তো মশায়।'

তবে আগুন আর তাকে খেতে হয়নি, অঙ্গারের একটি টুকরো তাকে ফেলতে হয়েছিল। ফেলেই কোঁচা দিয়ে মুখ মুছে প্রথম প্রশ্নে আওয়াজ দিয়েছিল, 'কলকাতা থেকে এসেছেন, না?'

বলেছিলাম, 'না, কাছাকাছি।'

যদি ভাবো ধনু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল, তা হলে ভুল। চোখ আর মনের এত স্থিরতা ছিল না যে, এক দিকে খেয়াল থাকবে। জিজ্ঞাসা যদি মুখের দিকে চেয়ে, জবাব শোনা আকাশের দিকে নজর করে। কেননা, তখন হয়তো একটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল। কিংবা তা-ই বা কেন হে। মনের মধ্যে যে বহু ভুবনের ভাবনা। ডাগর চোখ দুটি মেলে অন্যমনস্ক হতে কতটুকু সময় লাগে!

আমার কথা শুনে অন্য দিকে চেয়ে বলেছিল, 'অ, পিসে যেখানকে কাজ করে সেখানকার লোক আপনি।'

ধরে নিতে হয়েছিল ধনু বড় রায়ের কথা বলেছিল। বলেছিলাম, 'হ্যাঁ। রায়মশাই তোমার পিসেমশাই হন বুঝি?'

'অই আর কি, অনেক দূরের।'

তেমন গদ্‌গদ ভাব ছিল না ধনুর। রাজবংশের আত্মীয়তার গৌরব যেন তেমন তার মনে ছিল না। তার মন তখন অন্য স্রোতে বইছিল। বলেছিল, 'তবে কলকাতায় যেইছি, দু'বার যেইছি।'

সংবাদে রীতিমত গুরুত্ব আরোপিত। পকেট থেকে বাক্স বের করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'ওসব বাকী রাখি নাই। যা বুলবেন, সব দেখ্যা এসেছি কলকাতার। সিনেমা থিয়েটার চিড়িয়াখানা ভিকটোরিয়া—সব সব। ইস্কুলে পড়বার সময়েই যেইছিলাম।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কার সঙ্গে গেছলে?'

ধনু চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেছিল, 'ই বাবা, কার সঙ্গে আবার, একলাই।'

'একলা?'

'হুঁ, ইস্কুল পালিয়ে যেইছিলাম তো।'

ই বাবা। সে যে গুণধর ছেলে হে। একা একা ইস্কুল পালিয়ে মহাশয় শিউড়ি থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। শুনে মনে হয়েছিল, এ যে আত্মার কথা শুনছি। নিজের

মধ্যে পলাতকের ডানা-ঝটপটানি চিরদিনের। ধনুর গলায় যেন শ্রোতার নিজের প্রতিধ্বনি। অচিনের হাতছানি তাকেও ঘরছাড়া করত নাকি! পাগলা ডাকে ডেকে নিয়ে যেতো!

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন গেছলে?'

'দেখব বুলে।'

এর বেশী আর কী জবাব প্রত্যাশা করতে পারতে। শিউড়ির ছেলে, কলকাতা দেখবে বলে গিয়েছিল। তবু জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ভয় করেনি?'

অন্যমনস্কভাবে জবাব দিয়েছিল, 'নাঃ!'

ভয় আবার কী হে। দেখব বলে গিয়েছিলাম, ব্যস। ধনুর কথায় তেমনি ভাব। আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বাড়িতে কিছু বলেনি?'

খুব সহজ গলাতেই বলেছিল, 'খুব বেড়ন দিইছিল বাবা। হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। দোকানের পয়সা চুরি করেছিলাম কিনা।'

বাঃ, বাহ্‌বা বাহ্‌বা ধনু। ঘোরপ্যাঁচ নেই, সোজা কথা সোজাই বলেছিল। আবার বলেছিল, 'না হলে পয়সা পাবো কুথা বলেন। চাইলে তো আর দিতো না।'

অগত্যা না বলেই নিতে হয়েছিল। আর না বলে নেবার নামই তো চুরি। অতএব শাস্তি তো জরুর। কিন্তু এমন একটু সংবাদ দেবার সময়ে ধনু মন্দিরের দেওয়ালের দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিল। ভাবনা অন্য দিকে, কথা আর-এক দিকে। কী মতলবে মন ঘুরছিল কে জানে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমাদের দোকান আছে বুঝি?'

'হুঁ, শিউড়িতে। সেজন্যেই তো শিউড়িতে থাকি। আমাদিগের ঘর তো মল্লারপুরে।'

খবরে কিছু গোলমাল পাবে না। যা জিজ্ঞেস করবে, দেড়া দ্বিগুণ জবাব পাবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লেখাপড়া তা হলে শিউড়িতেই?'

সে বড় ব্যাজ কথা। ধনু চোখ ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। একটু যেন অস্বস্তি, হাসি একটু বিব্রত। এসব কথাবার্তা জিজ্ঞেস করা ক্যানে মশায়। বলেছিল, 'হুঁ, অই বেশী দূর পড়ি-টড়ি নাই। লেখাপড়া হলো না।'

কী করবে বলো। যা হলো না তা সে কী করে করবে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে কপালে ঝাঁপানো বারো আনা চুলে একটা ঝাঁকানি দিয়েছিল। বলেছিল, 'আর কতক্ষণ ইখানে থাকবেন। যাবেন না?'

হাতের ঘড়ির কাঁটা আর সূর্য একযোগে মাপামাপি, একেবারে মাঝখানে। বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, এবার ফিরব।'

ধনু মন্দিরের দাওয়া থেকে নেমে জুতোয় পা গলিয়েছিল। বলেছিল, 'পিসে ভাবলে, আমার সঙ্গে আপনাকে দিলে কুথা না কুথা লিয়ে যাবো। ক্যানে বাবা, তুমাদিগের মল্লুটিতে আবার লিয়ে যাবো কুথা। বিশ্বাস নাই লোকের, তো কী বুলব বলেন। ব্যানাগুড়ি যেইছেন?'

কস্মিনকালেও সে জায়গার নাম শুনিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেটা আবার কোথায়?'

'বেশী দূরে না। খিস্টানদের মিশন আছে সিখানে। আমার সঙ্গে দিলে সিখানে লিয়ে যেতাম। এতক্ষণ ঘুরে আসা যেতো।'

আফসোস! আমারও কপাল খারাপ, ধনুও মোটেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তবে সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'যান তো আমাকে বুলবেন, লিয়ে যাবো। কিন্তু উয়াদের বুলবেন না, তা হলেই ফস্‌কা।'

মনেতে বাসনা প্রবল, তবু কথা দিতে পারিনি। ধনুর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবার যোগ্যতাও তো চাই। তবে কিনা, আঁতের কথা যদি বলি, ধনুকে আমার খারাপ লাগেনি। তার মধ্যে আমি যেন একটি সরল সোজা স্ফটিকস্বচ্ছ ছেলে দেখেছিলাম। টগবগানো তেজে যেন বাঁধন-ছেঁড়া অশ্ব। লাফিয়ে দাপিয়ে ছুটছে জীবনের নানান মাঠে, খানাখন্দে। সব কিছু তার পায়ের তলায় গুঁড়ানো। কোথায় যে তার গতি, কে জানে।

মৌলীক্ষার চারপাশে ইঁটের পাঁচিলের বেড়া। এখানে-ওখানে ভাঙা। ফাঁকে ফাঁকে গাছ গজিয়েছে, ইঁটে ইঁটে শ্যাওলা। মন্দিরের মতোই। বেলা বারোটাতেও মৌলীক্ষার থান জুড়ে নিবিড় ছায়া। পাখিদের কূজন সেথা সর্বক্ষণ। উঠতে ইচ্ছা না করলেও সময়ের মুখ চেয়ে উঠতেই হয়েছিল। মাঠে আসতে আসতে ধনুর গালের দিকে তাকিয়েছিলাম। সেই চাপড়দৃশ্য আবার আমার মনে পড়েছিল। ইচ্ছা করেছিল, জিজ্ঞেস করি, সেই অঘটনের ঘটনাটা কী।

উ রে বাবা, সে সাহস আমার ছিল না। যা স্পষ্টবক্তা ছেলে, কী বলবে, কী শুনতে হবে, কে জানত। বরং বলেছিলাম, 'মলুটি বেশ সুন্দর—।'

কথা শেষ করতে দেয়নি ধনু। বলে উঠেছিল, 'ছাই। কী আছে ইখানে? কিছু নাই। তাই কালীপুজোটা বেশ জমে, তাই আসি ফি বছর।'

এর পরে ধনুকে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভূ-বৈচিত্র্য বলার সাহস হয়নি আমার। কিন্তু শোনো হে শোনো, এত তাড়াতাড়ি আপন চিন্তায় যেও না। ধনু আবার বলে উঠেছিল, 'তবে বিয়াটা আমি ইখানেই করব।'

আমার শ্রবণে যেন বেজায় ধাক্কার চমক লেগেছিল। কিছু আর পুছ করতে হয়নি, কেবল জোরে জোরে গলাখাঁকারি দিয়ে শব্দ করেছিলাম, 'অ!'

দেখেছিলাম, আমার সঙ্কোচে ধনুর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। তার দৃষ্টি তখন গাঁয়ের দিকে। আবার বলেছিল, 'অই পর্যন্তই, ব্যস। আর না।'

তার মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ঠিকঠাক হয়ে গেছে নাকি?'

ধনুর স্পষ্ট জবাব, 'হয় নাই, হবেক। মেয়্যাটোকে আমার পছন্দ হয়েছে। তা'পরে জানি না, ই যা দেশ বাবা, কী বুলবে কে জানে।'

তখন আর যেন ঠিক আমাকে বলেনি, ধনুর কথা আত্মগত। দেশ যে কেমন, তা তো গালেই জানা গিয়েছে। ধনুর তা হলে আরো জানা বাকী ছিল। পাত্রীটি যে কে, অনুমান করতে পারছিলাম। দেখতে বেমানান হবে না, হলফ করে বলতে পারতাম। তারপর গুণ ভেদাভেদে কোথায় যেতে পারে, কে জানত। সে মেয়ে কাদের ঘরের বালা, কোন্ বংশের কন্যা, তা-ই বা কে জানত। থাপ্পড়ের তেজ দেখে তো মনে হয়েছিল, মানিনী মহারাণীতুল্যা। তারপরেও ধনুর সাহস ছিল।

অনেকক্ষণ কথা বলেনি ধনু। আমি অবাক যত হয়েছিলাম, তত যেন ভিতরে ভিতরে তরঙ্গিয়া উঠেছিল হাসির ফোয়ারা। সে হাসি ধরে রাখা যেন দায় হয়েছিল। প্রেমের কিছু রকম দেখেছিলাম, অমন দেখিনি। কিন্তু হাসতে ভরসা পাইনি। পাছে অমন দপদপানো প্রাণটি আহত হয়ে পড়ে। কিংবা কে জানত, থাপ্পড়ের জ্বালাটা যদি আমার প্রতিই রুদ্র হয়ে উঠত।

মাঠ দিয়ে যখন উত্তরের ঢালুতে নামতে চলেছি, তখন নজর পড়েছিল, এক ঝাড় তালবনের দিকে। এতগুলো গাছ, একসঙ্গে জড়াজড়ি করা, তখনো চোখে পড়েনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওটা কি তালবন?'

ধনু আমার নজর ধরে চোখ তুলে বলেছিল, 'উইটো? না, তালবন ক্যানে হবে, উটো তো পুখর।'

পুখর অর্থে পুকুর। কিন্তু পুকুর কোথাও চোখে পড়েনি, চারপাশ ফাঁকার মাঝখানে হঠাৎ এক দঙ্গল তালগাছই শুধু দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পুকুর আছে বুঝি ওখানে?'

'হুঁ, পুখরের চারপাশে তালগাছ। ইদিকপানে সব উ রকম দেখবেন। যাবেন উখানে?'

হ্যাঁ, নজর মন সবই টানছিল। বলেছিলাম, 'চলো যাই।'

ধনুর পরবর্তী প্রশ্ন একেবারে সোজাসুজি, 'পাখানা যাবেন?'

তারপরেই অমন প্রাকৃতিক প্রশ্ন কেন। বলেছিলাম, 'না তো।'

ধনু সহজভাবেই বলেছিল, 'পুখর আছে তো। যেলে জল সরতে পারতেন।'

সেইজন্যেই বলা। আমার কথা থেকে তার বোধ হয় সেইরকমই মনে হয়েছিল। ছোট রায়ের কথা মনে পড়েছিল।

চারপাশে উঁচু পাড়, মাঝখানে পুকুর। যেন একখানি স্থির আয়না। তার ধারে ধারে তালগাছের স্পষ্ট ছায়া, মাঝখানে নীল আকাশ। দেখেছিলাম, যুবতী বুড়ী দুই বউ মাত্র স্নান করছে। বাউরি বাগ্দি হবে। কিন্তু আরো যেন কাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। অস্পষ্ট মেয়েপুরুষের দুটি-চারটি কথা, একটু-আধটু হাসি। দেখেছিলাম, ধনুও যেন সেই হাসিকথায় উৎকর্ণ। সে ক্রমে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলাম। একেবারে পশ্চিম পাড়ের পিছনের ঢালুতে, তালগাছের ছায়ায় দুই নারী, এক পুরুষ। যুবা পুরুষের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তাতে গামছা বাঁধা, খালি গা, নেংটি পরা। দুই যুবতীর গায়ে শাড়ির আঁচল, খোঁপায় গোঁজা কাঠের কাঁকই। যদি বলো শালীনতা কাকে বলে, তবে নগর চালে মিলত না। ছড়িয়ে বসা যুবতীদের অঙ্গে বাঁকা শিথিল ভাব। তিনজনের রঙই কালো কুচকুচে। চোখে একটু লালের ছোঁয়া, তাতে আবার যেন ঝলক লাগা ঝিকিমিকি। তিনজনের মাঝখানে এক হাঁড়ি। হাঁড়ির থেকে জালা বললে মানানসই। কম করে পনের সেরের পাত্র। গুটিকয় ছোট ছোট মাটির ভাঁড়। তারপরে আর পুছ করার কিছু ছিল না। গন্ধেতেই টের পাওয়া যাচ্ছিল, হাঁড়িতে কী অমৃত আছে। তিনজনের একটু পান চলছিল, সেই সঙ্গে হাসি আলাপন। দেখেই যেন চেনা যাচ্ছিল, ওরা সাঁওতাল।

দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল না, তাই ফিরতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ধনুর পা যেন মাটিতে গেঁথে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করছিস রে তুরা?'

জবাব দিয়েছিল যুবা মরদ, হেসে ঢুলুঢুলু চোখে, 'ক্যানে, দেখতে পাইছিস নাই, তাড়ি খাইছি কি বটে! আঁ, কী রে, দেখতে পাইছিস নাই, না কী? আঁ?'

একবারে পুছ হয় না, বারে বারে বলেছিল। তারপরে তিনজনেই চোখে চোখে চেয়ে হেসেছিল।

ধনু আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোন্ ঘরের প্রজা তুরা। পুজো লিয়ে আসছিস ক্যানে?'

যুবাটি ঘাড় নাড়িয়ে বলেছিল, 'হুঁ হুঁ হুঁ, হুঁ রে। আট আনার ছোট তরপের আমরা। তু কুন ঘরকে আঁছিস, তুকে চিনতে লারছি?'

ধনু বলেছিল, 'ছ তরফের বড় ঘরে।'

'অই, তা বলতে লাগে কিনা, আঁ। পা ধুলো দে।'

বলে যুবাটি টলতে টলতে উঠে এগিয়ে এসেছিল। দু' হাত দিয়ে প্রায় খামচি কেটেছিল ধনুর পায়ে।

ধনু একেবারে নির্বিকার। যেন পায়ের ধুলো দেওয়াটা তার স্বভাব ব্যাপার। তারপরেই মাতাল জোয়ানটি আমার পায়ের কাছে এসেছিল। আমি পেছিয়ে গিয়ে বলেছিলাম,

'থাক, থাক।'

'ক্যানে, থাকবে ক্যানে। তু কুন ঘরকে আঁইছিস?'

জবাব দিয়েছিল ধনু। বলেছিল, 'অই এক ঘর।'

আমি তখন ধনুকে ডাক দিয়েছিলাম, 'চলো, আমরা যাই।'

দাঁড়াও হে, এত তাড়াতাড়ি! তার আগে ধনুর কথা শোনো, 'খাবেন নাকি একটু?'

আবার সেই আমার ব্যাজ! চমকানো গলায় বলেছিলাম, 'তাড়ি?'

ধনু তো অসহজ কথা বলতে জানে না। বলেছিল, 'হুঁ, ই টাটকা তাড়ি লয় বটে, সময় তো এখন না। মসলা মেশানো দোকানের মাল। তা একটু খেলে কিছু হবে না। আসেন।'

বলে সে নিজেই বসেছিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি খাবে নাকি?'

'খেয়ে যাই একটু। কী রে, মাল আছে তো?'

একটি যুবতী বলে উঠেছিল, 'আছে বটে কি, খা না।'

ধন্য আমার প্রথম দেখা রাঢ়ের স্মৃতি। প্রথম দেখা রাঢ় আমাকে ধনুকেও দেখিয়েছিল। ই কী ছেলে গো বাবা। বলেছিল কিনা তাড়ি খেয়ে ফিরবে। কিছুতে কি মানামানি নেই। একটি মেয়ে তখন জালা কাত করে ছোট একটা হাঁড়িতে তাড়ি ঢালছিল। এমনি না, আবার নিজের ধোয়া শাড়ির আঁচল দিয়ে ছেঁকে। আর ধনুর দিকে চেয়ে হাসছিল মিটিমিটি। ধনু হাসছিল না, সে তাকিয়েছিল হাঁড়ির মুখের দিকে। আবার গান ধরেছিল, 'আমার মা বুলেছে, যা খাবি তু মায়ের নামে...।'

সুরে পুরো টপ্পা। ধনুর গলায় তেমন আসেনি। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় ছিল না। বলেছিলাম, 'ধনু, তা হলে আমি যাই?'

এক কথায়, এক জবাব, 'আসেন।'

যেন আমি তার অচেনা। এক কথায় বিদায়। বিদায় দিয়ে জালার মুখে মাছি তাড়াতে শুরু করেছিল। কিন্তু পুকুর ধারে এসে পথ একটু ঘুরতে হয়েছিল। তাই না জিজ্ঞেস করে পারিনি, 'কোন্ দিক দিয়ে যাবো?'

না তাকিয়েই বলেছিল, 'উত্তর-পুবের কোণ বরাবর যান, গাঁয়ের দিকে রাস্তা আছে।'

ফিরতে ফিরতে কয়েক মুহূর্ত মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। পরমুহূর্তেই ধনু যেন একটা বিস্ময়ের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল আমার মনে। ওর ভিতরে বাইরে কী ছিল, জানি না। মনে হয়েছিল, জগৎ-সংসারে সে যেন এক একলা পথিক। বাঁধন-ছাড়া, আত্মহারা, যেন আপন চেনাতেও নেই। যেন ওর পাওনা বলে কিছু ছিল না, তাই ভয় ছিল না। কোথায় যে গন্তব্য, কোথায় ঘর করণ, কোনো ঠিক নেই। চরাচরের সকল নিমন্ত্রণ নিয়ে যেন বসেছিল। এমন কি, গোরা কিশোরীর চপেটাঘাতও। কিন্তু তাড়ি খেয়ে সকলের সামনে বাড়ি ফিরবে কেমন করে।

সে ভাবনা ভেবে আমার লাভ ছিল না। কেবল আমি বলে নয়, বিশ্বাস হয়েছিল, ধনুর ভাবনা ভেবে কারুর লাভ ছিল না।

ছোট ছোট ঝাড়ালো বাবলাবনের মাঝখান দিয়ে পায়ে-হাঁটা লাল সিঁথে-পথ। সেই পথে চলতে চলতে, ধনুর ভাবনার মাঝখানে আমার কানে মাদলের বাজনা বেজেছিল। যেন কোন্ দূরে, দূরের প্রান্তে অস্পষ্ট বাজনা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছিল, ডিম্ ডিম্ ডিম্, ডিম্ ডিম্ ডিম্!...আমি অবাক হয়ে পিছনের সেই আকাশে-ঠেকানো কালো-রেখা পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম।

কোথা থেকে শব্দ আসছিল, বুঝতে পারিনি। কেবল মনে হচ্ছিল, এক নয়,

একাধিক অস্পষ্ট মাদলের শব্দ দূরে দূরে বাজছে। কাছে কাছে আসছে। কালের এক আদিম যুগে যেন আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমে। মলুটির সে আর এক নিশিঘোর। যেন আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করছিল।

'এই যে বাবা, কুথা গেলছিলে?'

তাকিয়ে দেখেছিলাম সামনেই ছোট রায়। তাঁর পাশে এক সৌম্য বৃদ্ধ, যাঁর বড় বড় বুকে ঠেকানো দাড়ি আর গোঁফে একটি প্রসন্ন গাম্ভীর্য ফুটেছিল। দু'জনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রামে ঢোকবার মুখে এক খড়ের চালের নিচে।

বলেছিলাম, 'মাঠে।'

ছোট রায় বলেছিলেন, 'এসো, তুমার সঙ্গে চাটুয্যে মশায়কে আলাপ করিয়ে দেই।'

পরিচয়ের পর চাটুয্যে মশায় বলেছিলেন, 'বড় সুখী হলাম বাবা। এসো, আমাদিগের বাড়ি হয়ে যাবে।'

ছোট রায়ের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'তুমি যাও, উয়াকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি পরে।'

গোঁফদাড়িতে ঢাকা, খালি গা, পইতা গলায়, হাতে একটি মোটা লাঠি চাটুয্যে মশাইয়ের।

বলেছিলেন, 'চলো, তুমার সঙ্গে একটু কথা বলি যেয়ে। মলুটির সব গল্প শুনেছ?'

'আজ্ঞে না।'

'চলো, মলুটির গল্প শুনবে।'

ইঁটের পাঁচিল, কাঠের দরজা, লাল উঠোন পেরিয়ে চাটুয্যেমশাই নিয়ে গিয়েছিলেন পাকা মোকামে। বাঁধানো দাওয়ার ওপরে দরজার চৌকাঠের কাছে নারকেল-ছোবড়ার পা-মোছা। শানের মেঝে, ঘরের মধ্যে খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা। কাঁচের আলমারিতে কেতাব। এক পাশে ঢাকনা দেওয়া টেবল, খান দুয়েক চেয়ার, একটি আরাম-কেদারা। খোলা জানালা দিয়ে ধানের মরাই চোখে পড়েছিল। ওদিকে পাঁচিলের ধারে তালগাছের আড়ালে দেখেছিলাম এক ভাঙা মন্দিরের চূড়া। তবু যেন সব মিলিয়ে পাকা মোকামের ঘরে একটু আধুনিকতার ছোঁয়া।

রাঙা মাটির ঢেউ খেলানো গ্রামে সে ঘর রাজগৃহ না। রাজাদের কুলীন জামাইয়ের ঘর। সে বাড়িতে কালীপুজোর সাজনবাজন কিছু ছিল না। লোকলস্কর হাঁকডাক তত্ত্ব-তল্লাশ, কিছু না। সেখানে ভাব আলাদা, রকম ভিন্ন। যেন মলুটির সুরে বাঁধা না, তালে কিঞ্চি অমিল। মলুটির ঘরে সেথা মলুটি দূরস্ত্। চাটুয্যে মশাইয়ের পুত্রবধূ নাতির সঙ্গে আলাপে দূর শহরের আদল মিলেছিল। কেবল ভাবে ব্যঞ্জনাতে না, ভাবে আর ভাষ্যেও। চায়ের পেয়ালাতেও দূরের ছায়া, অ-মলুটি স্বাদ। তবে কিনা, সেই অসময়ে চা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলাম। ধনু অধমকে ফেলে যেভাবে নিজের তৃষ্ণা মেটাতে বসে গিয়েছিল, সেই চমক খাওয়া হতাশায়, তৃষ্ণা লেগেছিল আমারও। নেশার তৃষ্ণা সেও বটে, তফাত কেবল তাড়ি আর চায়ে, পরিমাণের কমবেশিতে।

তারপর শ্যাম সৌম্য শ্মশ্রুগুম্ফ মোটা উপবীতের উর্দি পরা, জামাই চাটুয্যে বলেছিলেন বাঘা কুলীন কাকে বলে। তিনি সেই বাঘা কুলীনের বংশধর। একদা রাজকন্যার পাণিগ্রহন করে মলুটিতে এসেছিলেন। তবে কি না, 'সে মলুটি কী আর আছে? নাই। সে মলুটি নাই, সে মানুষেরা নাই। এখন যা দেখছ বাবা সে-কালের পাইপয়সাও না। আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন ছিটেফোঁটা দেখেছি। যজ্ঞিবাড়িতে কাজকর্ম খাওন-দাওন হয়ে গেলে, তাপরে যেমনটা হয়। সেই রকম দেখেছিলাম। এখন তাও নাই...।'

দেখেছিলাম চাটুয্যে মশাইয়ের বুড়ো চোখের নজরে উজান টান। যবে রাজকন্যার কর ধারণে কুলীন পুত্র এসেছিলেন স্বপ্নের দেশে, সেই স্বপ্নে যেন হারিয়ে গিয়ে-

ছিলেন। দাড়ি কাঁপিয়ে, নিশ্বাস ফেলে, স্বপ্ন দেখা স্বরে বলেছিলেন, 'কোথায় গেলেন বসন্ত মুখুজ্জে, আর কোথায় এসে ঠেকেছে আজকের মলুটি।'

না জিজ্ঞেস করে পারিনি, 'বসন্ত মুখুজ্জে কে?'

চাটুয্যে মশাই যেন সেই হারনো সময়ের ওপার থেকে বলেছিলেন, 'কেন, যিনি রাজা রাজবসন্ত। যিনি বাদশাহের বাজ ধরেছিলেন, যার পুরস্কার এই রাজ্য, রাজ উপাধি। তাঁর নাম ছিল বসন্ত মুখুজ্জে। বাদশা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন, রাজা রাজবসন্ত। এ'রা তো আসলে মুখুজ্জে, ভরদ্বাজ গোত্র। রায় হলো এ'দের বাদশাহী খেতাব।'

আমার চিন্তায় যিনি রাখালরাজা, তিনিই রাজবসন্ত। সেই রূপকথার পুরুষ। কিন্তু শ্রবণে আমার ঠেক লাগছিল চাটুয্যে মশাইয়ের বচনে। প্রথম সম্বোধনে যেমন মলুটি বুলি শুনেছিলাম তাঁর মুখ থেকে, ঘরে বসে কথা বলার সময় বচনের ধরন-ধারণ আলাদা।

হবে হয়তো, রাজকাহিনী ভাবতে গিয়ে নতুন শ্রোতার সামনে ভাষা বদলেছিলেন। সেটা সহবত কি না জানি না, কিন্তু আমার শ্রবণ যেন উৎকর্ণ ছিল ঢেউ খেলানো রাঙা মাটির বুলি শুনব বলে।

সে আক্ষেপ পরে আর ছিল না, যখন মলুটির রূপকথার রাজ্যে আমিও হারিয়ে গিয়েছিলাম। তবে রূপকথার গায়ে যখন নাম-ধাম সাল-তারিখের দাগ লাগে তখন তা ইতিহাস। চাটুয্যে মশাই ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যে এক কথা, সে দেশ কিংবদন্তীর মায়ের দেশ। ঐতিহাসিক বলে মানো না-মানো, জানবে কিংবদন্তীর সৃষ্টি সেথা পলে পলে। কেননা, রাজা বাজবসন্ত মারা গিয়েছিলেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। কারণ, তাঁর ওপরে যে গুরুর অভিশাপ ছিল!

সেই যে এক পথ-চলা সন্ন্যাসী বসন্তক দেখেছিলেন সাপের ফণার ছায়ায় নিদ্রিত, তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই গরু-চরানো ছেলেকে। সেটা অন্যায়। কেননা, রাজা যে তার আগেই কুলগুরুর কাছে দীক্ষিত ছিলেন। কুলগুরু তাই বলেছিলেন, 'কুলগুরু ছেড়ে তুমি নতুন গুরুর দীক্ষা নিয়েছ, ওহে তোমার অকালমৃত্যু হবে।'

তাই তাঁর অকালমৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ছেলে রাজা রামসার গল্প শুনিয়েছিলেন চাটুয্যে মশাই। বলেছিলেন, 'এ রায় পরিবার দেখে বাবা, সেই রাজাদের বুঝতে পারবে না। রাজা রামসা, তেমনি রাজা, দিল্লীর বাদশা যার বিরুদ্ধে লড়তে পাঠিয়েছিলেন লক্ষ সেপাই। সে বড় ডাকাবুকো ক্ষ্যাপা রাজা। আশেপাশে যত রাজ্য, সব তিনি থাবা দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন। সবাই গিয়ে নালিশ করলে বাদশাকে। বাদশা পাঁচ হাজার সেপাই পাঠিয়ে দিলেন রামসাকে ধরে আনতে। অত সহজে কি রামসা কাবু হন! বাদশার সেপাইদের হারিয়ে দিলেন লড়াইয়ে।

'কী, বাদশার হার! ক্ষেপে গিয়ে পাঠালেন লক্ষ সেপাই। ওদিকে কাশীতে টনক নড়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর, যিনি বসন্তকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। তিনি এসে রামসাকে বললেন—মূর্খ, করেছিস কী, এত তোর দর্প! এবার কী দিয়ে সামলাবি!

'রামসাও তখন ভয় পেয়েছে। শত হলেও এক লক্ষ বাদশাহী সেপাই, চাট্টিখানি কথা না। তবে এবার বলুন গুরুদেব, উপায় কী করি!

'গুরু বললেন, উপায় এক, চল দিল্লী। পরিবার পরিজনকে লুকিয়ে রেখে, গুরুর সঙ্গে সেই রাত্রেই দিল্লী যাত্রা। দিল্লীতে ছিলেন গুরুদেবের চেনা এক ফকির। সেই ফকিরের সঙ্গে বাদশার ভারী আশনাই। বাদশা ফকিরকে খুব ছেদ্দা ভক্তি করেন। গুরু গিয়ে ধরলেন সেই ফকিরকে, আপনি রামসাকে বাঁচান।

'ফকির ভেবে-চিন্তে বললেন, বাদশার মুখের কথা, তাকে তো একেবারে ঝুটা করা যায় না। রামসার গর্দান যখন চেয়েছেন, তখন তার বদলে কিছু দিতেই হবে। কী দিতে হবে? রক্ত, হ্যাঁ, রক্ত দিতে হবে।

'তখন ফকির রামসাকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দরবারে। রামসাকে রেখে গেলেন আড়ালে। বলে গেলেন, ঠিক যে সময়ে যে ভাবে আসতে বলেছি, সেই মতো আসবে। বলে, দরবারের মধ্যে গেলেন। বাদশা ফকিরকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, অসময়ে যে?

'ফকির বললেন, আপনার কাছে একজনের প্রাণ ভিক্ষে করতে এসেছি। শুনেই সম্রাট বললেন, কেবল বাঙলা মুলুকের রাজা রামসার প্রাণ ভিক্ষে চাইবেন না।

'তা বললে তো হয় না। ফকির বললেন, আপনি হলেন ভারতেশ্বর, প্রজারা আপনার ছেলে। আপনার রাগের সামনে কি তারা কখনো দাঁড়াতে পারে? কিন্তু সে যদি অন্যায় বুঝে আপনার কাছে ক্ষমা চায়, আপনি কি তা না করে পারেন? রামসা এখন তার অপরাধ বুঝেছে, অনুশোচনা করছে। আজ সে আপনার পায়ে পড়তে এসেছে।

'এই কথা বলা মাত্রই, রামসা ছুটে এলেন। হাতের ছুরি দিয়ে বুড়ো আঙুল কেটে বসে পড়লেন সম্রাটের পায়ের কাছে। ফকির বললেন, এই যে রামসা। আপনি ওর মাথা চেয়েছিলেন। তার পরিবর্তে ও আপনাকে রক্ত দিয়েছে। আপনি খুশি হয়ে ক্ষমা করুন।

'রামসার চোখে তখন জল দেখে বাদশার প্রাণে দয়া হলো, তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। হুকুম জারি করলেন, লক্ষ সৈন্য রাজধানীতে ফিরে আসুক। কিন্তু রামসার নামে যেন তাঁকে আর কখনো কিছু শুনতে না হয়।'

চাটুয্যে মশাই বলেছিলেন, 'সেই থেকে ক্ষ্যাপা রাজা রামসা শান্ত হলেন। কিন্তু সে সব মানুষ ছিলেন আলাদা। আজকের মলুটিতে সে রকম মানুষ আর নেই।'

তাঁর নিশ্বাস পড়েছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আজকের মলুটিতে রাজা রামসা আর কোনোদিনই ফিরে আসবেন না। কারণ, সম্রাটের ভারতবর্ষ নেই, রামসার মলুটিও নেই। তবে যদি পুছ করো, এ কাহিনী কবেকার, দিল্লীর কোন্ বাদশাহের আমলে, তা হলে বড় ব্যাজ। কিন্তু জানবে, এ কাহিনী রূপকথা না, ইতিহাস।

তা যদি না হবে, তবে আলিলাকি খাঁয়ের সঙ্গে যে রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল, সে তো আর রূপকথা নয় হে। সেই যুদ্ধের থেকে তো মলুটিতে আগমন। তার আগে রাজাদের রাজ্য ছিল ডামরাতে। ডামরার পাশে রাজনগর। তার মালেক আলিলাকি খাঁ। রামসা যেমন তাদের গায়ে এক সময়ে থাবা মেরেছিল, তেমনি থাবা মেরেছিল রাজনগরের খাঁ। তবে, দু-দুবার মার খেয়ে ফিরেছিল। তারপরে তিন বছর একেবারে চুপচাপ।

তখন রাজা ছিলেন রাজচন্দ্র। দুই ভাই তাঁর সঙ্গী। রামচন্দ্র আর মহাদেব। দাদার কথায় ওঠা বসা। দেশে যখন শান্তি, তখন রামচন্দ্র আর মহাদেব, সপরিবারে গেলেন তীর্থে। খবর গেল আলিলাকি খাঁর কানে। শেয়ালের অমনি গোঁফে হাসি। রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডামরার বুকের ওপরে।

এমন আচমকা মারের ঠেলায় রাজচন্দ্রের সেপাইরা মারা পড়তে লাগল। দেখে রাজচন্দ্র অস্থির। তিনি নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের সঙ্গে। অবস্থা যে সুবিধার নয়, তা বুঝেছিল সেনাপতি নারায়ণ দলুই। সে তাড়াতাড়ি রাজবাড়িতে গিয়ে রানীমাকে বললে, ছেলেপিলে নিয়ে চলুন, নইলে উপায় নাই। ইজ্জত প্রাণ সবই যাবে।

রানী রাজী, কিন্তু যাওয়া হবে কোথায়। দলুই বললে, কাছেই মল্লুটির জঙ্গলে! সেখানে রাজাদের এক গুপ্তঘর আছে। রানী চলে গেলেন দলুইয়ের সঙ্গে মল্লুটিতে। এই মল্লুটিতে। তখন ছিল ঘোর জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ারের রাজ্য।

রাজচন্দ্র আর ফেরেননি, আলিলকি তাঁর মুণ্ড নিয়েছিল। সেই সঙ্গে লুট করেছিল ধনাগার, কোষাগার। তারপরে ফিরে এলেন রামচন্দ্র আর মহাদেব। দাদা হারিয়ে দুজনে কেঁদে কেঁদে বাঁচেন না। ভ্রাতৃবধূ বললেন, কেঁদে লাভ নেই, আলিলকির মুণ্ড এনে দাও আমাকে। তার রক্তে পা ধোবো।

তখন মল্লুটিকে রাজধানী করে সাজো সাজো রব উঠল। আলিলকির মুণ্ড চাই। কিন্তু তার আগে খোদা তাঁর নিজের কাজ রোগে সেরেছিলেন। ভয়ংকর এক কাল রোগে আলিলকি অক্কা পেয়েছিল।

চাটুয্যে মশাইয়ের বলবার কথা সে-ই। তখন মল্লুটিতে যোদ্ধা ছিল বীর ছিল, ধার্মিক ছিল। শ্বশুরগৃহের পুরনো দিনের স্মৃতিতে বুড়ো জামাইটির বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস পড়েছিল। আর আমার চোখে ভাসছিল সেই জঙ্গলে মল্লুটির অন্ধকার রাত। যে অন্ধকার রাতে নারায়ণ দলুইয়ের সঙ্গে রানী এসে হাজির হলেন এখানে। এই মল্লুটিতে। বর্তমানের কেউ কি জানত, কোথায় সেই রাজাদের গুপ্তঘর? কোথায় এসে উঠেছিলেন রানী?

চাটুয্যে মশাইয়ের রূপকথার ঝোলা যত বড়, আমার শ্রবণ মন তার চেয়ে ছোট না। বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে গল্প, পাড়ায় পাড়ায় রূপকথা। তার ওপরে মল্লুটি, তার বৈশিষ্ট্য আরো বেশী। কেননা, চাটুয্যে মশাই জানিয়েছিলেন, মল্লুটির রায়েরা বারো ভূঁইঞার এক ভূঁইঞা। বাঙলার বারো ভূঁইঞাদের সকলেরই অনেক কাহিনী।

রাজা রামচন্দ্রের গল্প শোনা ছিল বড় রায়ের কাছেই। যাঁর স্ত্রী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে স্বামীর পায়ে দেহ রেখেছিলেন। যাঁর শ্মশানক্ষেত্র নাকি মল্লুটির সতীঘাট। তা বলে ভেবো না, ধর্ম করতে গিয়ে রাজারা গেরুয়া পরেছে, জটা রেখেছে। সেসব তাঁরা করেননি, ধার্মিক ছিলেন তাঁরা মনে প্রাণে।

আবার তেমনি বিষয়ী ছিলেন আনন্দচন্দ্র। অন্যায় ভাবে না, ন্যায়ের বিষয়ী। তিনি ব্রাহ্মণবিদায়ের নিয়ম করে গিয়েছিলেন। আনন্দ ছিলেন রসিক সুজন, তাঁর সভায় ছিল রসিকদের আনাগোনা। এক ছিল স্বভাব-কবি, নাম গঙ্গানারায়ণ। চাটুয্যে মশাই আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন সেই কবির কবিতা—'শোনো তবে বলি, মল্লুটিতে তখন কবি কেমন কবিতা লিখত। রানী কহে কহ গিরি, ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, কী রূপে করিলা রাসলীলা। গোপীগণ সঙ্গে মেলি, কৌতুকে করেন কেলি, রাসরঙ্গ কেমন করিলা।'

কবিতা তো বলেননি, বৃদ্ধ জামাইটি যেন মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। কোন্ যুগেতে বাস করো, কোন্ কবিদের কবিতা পড়ো, সেসব কথা মনে করে লাভ ছিল না। তখন মল্লুটির কথকতা, কথক চাটুয্যে মশাই, তুমি শ্রোতা। তবে মিথ্যা বলব না, সে আবৃত্তিতে আমার মন মজেছিল। কেন কিনা, আপন ধ্যানধেয়ানে মগ্ন মনে, যে যা ভাবে, তার মাধুর্য আলাদা।

শুধু কি তাই! আবৃত্তির পরে গান?

বলেছিলাম, 'শুনব।'

অমনি দাড়ি কাঁপিয়ে, ভুরু কুঁচকে, সভাকবির গান গেয়েছিলেন গুনগুনিয়ে,

'নব নীরদ বর্ণ, কি সে পূণ্য, শ্যাম চাঁদ রূপ হেরে;
হাতে বাঁশী, অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে।

গুচ্ছ শিখিপুচ্ছ শিরে তুচ্ছ কোটি কাম হেরে
উচ্চ জাতি কুল ধরম, সরমে সতী
সতী জাতি ছাড়ে।'...

কুলমজানো ঠাকুরের গান বটে, কীর্তনের সুর না। ভৈরবীতে টপ্পার ঝোঁক মেশানো। চাটুয্যে মশাইয়ের গলায় অবিশ্যি জোর ছিল না। শেল্মার দাপটও প্রবল। তবু অমন গান অনেক কাল শুনিনি। বলেছিলাম, 'বাঃ, আপনি তো বেশ গাইতে পারেন।'

আহ্, ছি, অমন করে লজ্জা দিও না হে। চাটুয্যে মশাইয়ের শ্যাম মুখখানি, দাড়িসুদ্ধ যেন রাঙা হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'না না, গাইতে আবার পারি নাকি। অই একটু তোমাকে শোনাব বলে।'...

কত কথা শুনবে হে। মলুটির কথা কি এক দুপুরে শেষ হয়! এক দিনে বা এক রাতেও কি হয়। যদি শুনতে পারতে, তবে চাটুয্যে মশাই সারা জীবনব্যাপী শোনাতে পারতেন। কথার মাঝখানে একবার পুত্রবধূ এসে বলেছিলেন, 'বাবা, মলুটির গল্প শুনে ওঁর কি হবে। আর কত বলবেন!'

চাটুয্যেমশাই হেসে ভেষেছিলেন, 'গল্প বলো না বউমা, ইতিহাস। শুনলাম কিনা, এ আবার বই-টই লেখে, এদের সব জেনে রাখা ভালো।'

সেই বিচারের পর না শুনি আমি কেমন করে। তা ছাড়া, শুনতে ভালো লেগেছিল। গানের পরে তাই আবার বলেছিলেন, 'শুনবে তবে, বাঘ মারার গল্প শুনবে! মহাদেবের নাতির ছেলে পুতি, তার নাম ছিল হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের মায়ের ছিল মইষি। মইষি বুঝলে তো বাবা, যার নাম মহিষী। সে বড় দুধেল মইষি ছিল বুঝলে। তা, এই মলুটির চারপাশে তখন ভীষণ জঙ্গল। রাখাল মইষি চরাচ্ছিল মাঠে। প্রকাণ্ড এক বাঘ সেই মইষিকে মুখে করে নিয়ে গিয়েছিল। হরচন্দ্রের মায়ের বুকে শেল হানল, সেই মইষি তাঁর বড় প্রিয়। ছেলেকে ডেকে বললেন, যে বাঘ আমার মইষির রক্ত খেয়েছে, সে-বাঘ জ্যান্ত ধরে নিয়ে আসা চাই, না হলে আমার অন্নজল বিষ।

'হরচন্দ্র তেমনি বীর। মায়ের আদেশ তখুনি শিরোধার্য। না হলে, মায়ের অন্নজল ত্যাগ। হরচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে গেলেন জঙ্গলে। রক্তের দাগ ধরে ধরে। এক ঝোপের ধারে গিয়ে দেখেন, বাঘ মইষির বুকের ওপর বসে রক্ত খাচ্ছে। তীর মারা তো চলে না, বাঘ মরে যাবে। জ্যান্ত নিতে হবে। তাই শুধু তীরটা হাত দিয়ে গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। যেমনি মারা, তেমনি বাঘের লাফ। লাফ দিয়ে পড়তে এল হরচন্দ্রের ওপর। হরচন্দ্র তাকে জাপটে ধরল গলায়। ধরে, সেইভাবেই নিয়ে এল মায়ের কাছে।

'মাও তেমনি। বললে, রাখ ওইভাবে ধরে। ওকে আমি নিজের হাতে মারব। বলে ঘর থেকে ধারালো কাটারি এনে, বাঘের মাথায় এক কোপ। তাতেই শেষ। ভাবো, এমন লোকও বংশে ছিল।'

শুনতে শুনতে বড় রায়ের মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। যাঁকে আমি আমার ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি রেলের কোট গায়ে দেওয়া, টিকেট সংগ্রহকারী। মলুটির গল্পের শেষ নেই, তবু, চাটুয্যে মশাইকেও থামতে হয়েছিল। সবেমাত্র তখন বামাক্ষ্যাপার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, 'এই যে তোমরা সাধক বামাক্ষ্যাপার কথা শোনো, জানো তো উনি এই মলুটিতে এসেছিলেন চাকরি করতে। তাঁর মা বলেছিলেন, তুমি মলুটির রাজাদের কাছে গিয়ে চাকরি চাও। কিন্তু চাইলেই তো হয় না। বামাচরণ লেখাপড়া জানতেন না। তাঁকে দিয়ে এস্টেটের কী কাজ হবে! রাজা বললেন, কী কাজ তুমি করবে?

'বামাচরণ বললেন, আমাকে আপনাদের নারায়ণের পূজারী করে দিন। তথাস্তু, তাই হলো। বছর দুয়েক সে কাজ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তারা দেবী যাঁকে ডাক দিয়েছেন, তাঁর কি ওসব নিয়ে বেশী দিন থাকা চলে? মলুটি থেকে চলে গেলেন তারাপুরে, শিমুলতলার শ্মশানে। শুরু হলো তান্ত্রিক—।'

সেই পর্যন্তই। ঘরের দরজায় একটা ছায়া পড়তে দেখেছিলাম। তাকিয়ে দেখিনি। গলার স্বর শুনে ফিরতে হয়েছিল দু'জনকেই। দেখেছিলাম, সুষি। বলেছিল, 'জ্যাঠা আপনাকে বাড়ি যেতে বললেন, অনেক বেলা হয়েছে।'

তখন হাত তুলে সময় দেখেছিলাম। বেলা দুটো। ডাক শুনে চাটুয্যে মশাইয়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাঁর বৃদ্ধ চোখে যেন কয়েক মুহূর্তের চেতনাহীন ভ্রান্তি ছিল। তারপরে, সেই যে উজান বাওয়া নজরে চলে গিয়েছিলেন দূরান্তের মলুটিতে, সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন আস্তে আস্তে। বলেছিলেন, 'সুষি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'অ, তুকে ডাকতে পাঠিয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, বেলা তো অনেক হলো, ওর চান-টান হয়নি।'

তখন পুত্রবধূ এসে বলেছিলেন, 'বাবা, এবার আপনাকেও চান করতে যেতে হবে।' নিরুপায় হতাশ বিমর্ষ চাটুয্যে মশাই। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, বেঁচে আছেন মলুটির অতীতে। এ যুগটা তাঁর কাছে রসহীন বিবর্ণ, কেবল দিনযাপনের প্রাণ-ধারণ। শেষ দিনের প্রতীক্ষা। তবু, যতদিন আছেন, ততদিন মলুটির রূপকথার কথক তিনি। মলুটির সন্তান নন, মলুটির প্রেমিক। বলেছিলেন, 'ও বেলা আবার এসো, আরো বলব, অনেক কথা বলব।'

সেখানে যে গতিবিধি সবই আমার ইচ্ছা, তা না। তবু 'আচ্ছা' বলে পা বাড়িয়েছিলাম। চাটুয্যে মশাই আবার বলে উঠেছিলেন, 'কাল দুপুরে তুমি আমাদের বাড়িতে খাবে।'

সে বিষয়েও আমার মতামত দেবার কিছু ছিল না। মতামতের অধিকার বড় রায়ের। তবু আগের মতন সম্মতি জানিয়ে এসেছিলাম। সুষির সঙ্গে রাস্তায় যখন এসেছিলাম, দেখেছিলাম, ছায়া লম্বা আর বাঁকা হয়ে পড়েছে। তবু মলুটির পথে পা দিয়ে, চাটুয্যে মশাইয়ের কথাই বারে বারে মনে পড়েছিল। যে মলুটিতে লৌকিক অলৌকিক, অনেক ঘটনা আর হাজার কিংবদন্তীর জন্ম হয়েছে।

[এরপর তৃতীয় খণ্ডে]

www.boiRboi.blogspot.com

বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়

নির্জন সৈকতে ॥ 'নির্জন সৈকতে' প্রথম বেরিয়েছিল ১৩৬৮ সালের 'জলসা' শারদীয় সংখ্যায়। প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালে। প্রকাশ করেছিলেন 'ত্রিবেণী প্রকাশন'। উৎসর্গপত্রে আছে, 'শ্রীযুক্তা নির্মলশশী দেবী পূজনীয়াসু'। ভূমিকায় লেখা ছিল— "একটি ছোট সংবাদ পাঠককে দেবার জন্যই এই ভূমিকার প্রয়োজন হল। 'নির্জন সৈকতে' ভ্রমণকাহিনীটি ১৩৬৮ সালের শারদীয় 'জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ শারদীয় লেখারই যা অবস্থা, অর্থাৎ স্থানের সীমাবদ্ধতা এবং সম্পাদকের তাড়ায় কোনোরকমে সংক্ষেপে লেখা শেষ করা, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বভাবতই গোটা বইটি এই আকারে প্রকাশের পূর্বে, সম্পূর্ণ নতুন করেই আবার লেখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বহু নতুন চরিত্র ও ঘটনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির কারণও এই। আর একটি নিবেদন, পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, চিত্রপরিচালক তপন সিংহ মহাশয় তার ওপরেই ছবি তৈরী করেছেন। অতএব 'নির্জন সৈকতে'র দর্শকেরাও অনেক নতুনের সন্ধান থেকে বঞ্চিত হবেন না।"

বাণীধ্বনি বেণুবনে ॥ এটি ১৯৭০ সালে 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পুস্তকাকারে বেরোয় 'মৌসুমী প্রকাশনী' থেকে। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১-এর মার্চ। উৎসর্গ করা হয় 'শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস শ্রীচরণেষু'। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস কালকূটের একমাত্র ভগ্নিপতি। বর্তমানে তিনি পরলোকে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এই লেখা ছিলঃ—'এটি একটি ভ্রমণকাহিনী বটে। তার চেয়েও বেশি এটি একটি নিশি পাওয়ার কাহিনী। রাজগৃহের নিশি, যেখানে কেবল মহাভারতের যুগের চিহ্নই নেই, প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিহ্নও তার বুকে ধারণ করে আছে। বুদ্ধদেব এবং মহাবীর এখানে সাধনা করেছেন, এবং স্বভাবতই রাজগৃহের বিচিত্র রাজনীতির সঙ্গেও তাঁরা মিশে গিয়েছিলেন।

রাজগৃহ—অর্থাৎ রাজগীর আমার কাছে প্রাগৈতিহাসিক স্বপ্নের দেশ। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে আমি সব কথা বলে উঠতে পারিনি। ভবিষ্যতে নতুন ও বিচিত্র অধ্যায় সংযোজনের ইচ্ছা রইল।'

—কালকূট

কোথায় পাবো তারে ॥ 'কোথায় পাবো তারে' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে। বর্তমান সংকলনে গ্রন্থটির প্রথমাংশ ছাপা হল। পুরো বইটি ডিমাই সাইজ ৪১৯ পৃষ্ঠায়। চতুর্থ মুদ্রণের বই থেকে বর্তমান সংকলনে ছাপা হল। বইয়ে কোনো ভূমিকা ছিল না। উৎসর্গপত্রটিতে লেখা ছিল—'স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশে।'